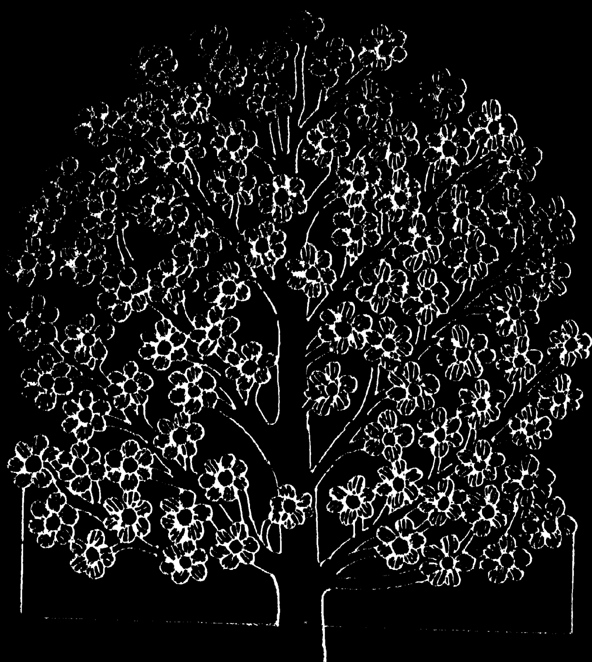
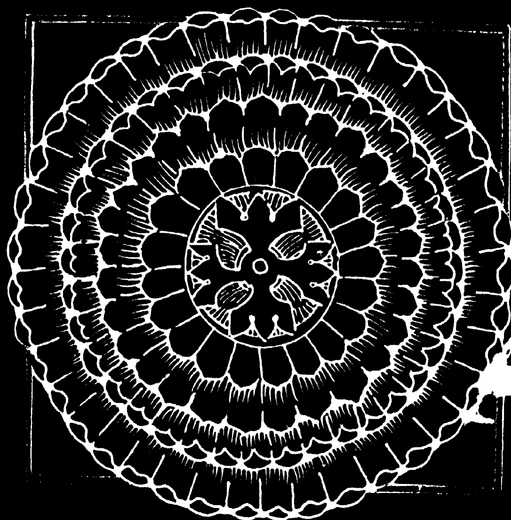




উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত



শ্রাবণ ১৩৯৫

উদ্বোধন কার্যালয়

উদ্বোধন

৯০তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯৪ হইতে পৌষ, ১৩৯৫ ; ইংরেজী : ১৯৮৮)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

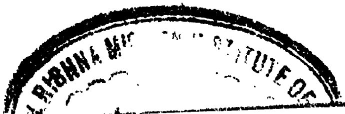
বার্ষিক মূল্য : তিরিশ টাকা ☐ সডাক ছত্রিশ টাকা প্রতি সংখ্যা : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৯০তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৯৪ হইতে পৌষ, ১৩৯৫)

অচিন্ত্য বিশ্বাস	(কবিতা) ···	অন্ধকারে প্রেমহীন মানুষ	··· ১৮৮
	(কবিতা) ···	বিশ্বাসহীনতার কবিতা	··· ৩১৭
	(কবিতা) ···	অক্ষমতা	··· ৫০৭
স্বামী অচ্যুতানন্দ	(কবিতা) ···	রাত্রির তপস্যা	··· ৫৬১
অজয় গঙ্গোপাধ্যায়	(সমীক্ষা-নিবন্ধ) ···	উদ্বোধনের কোন বিকল্প নেই	··· ১১০
স্বামী অজয়ানন্দ	(স্মৃতিকথা) ···	ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা	··· ২৫৮
অজিতকুমার মাইতি	(ভ্রমণ-কাহিনী) ···	যুগে যুগে প্রভাস	··· ৩৪৫
	(ভ্রমণ-কাহিনী) ···	নর্মদা অমরকণ্টক	··· ৭১৩
ব্রহ্মচারী অধ্যাত্মচৈতন্য	(প্রবন্ধ) ···	'সদ্গুরুসেবনম্'	··· ৪২৫
স্বামী অভেদানন্দ	(প্রবন্ধ) ···	সর্বধর্মসমন্বয়মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ	··· ১২৫
ভিক্ষু অমরনাথ	(কবিতা) ···	প্রার্থনা	··· ৩৮
অমলেশ ত্রিপাঠী	(প্রবন্ধ) ···	গান্ধী—নেহরু, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা	··· ৮৪১
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ) ···	আধুনিক ভারত গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান	··· ১২
অমিয়কুমার মজুমদার	(প্রবন্ধ) ···	সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র	··· ৭৭৯
শ্রীঅরবিন্দ	(কবিতা) ···	কৃষ্ণ	··· ৫০৬
অরুণকুমার দত্ত	(কবিতা) ···	দুটি কবিতা	··· ৩১
	(কবিতা) ···	মাগো	··· ৫৬২
অলোককুমার মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ) ···	কবির ও শ্রীরামকৃষ্ণ	··· ৬১৬
স্বামী অলোকানন্দ	(প্রবন্ধ) ···	বিবেকানন্দ-প্রাণ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার	··· ৩২৯
	(প্রবন্ধ) ···	'আরামমস্য পশ্যতি ন তং পশ্যতি কশ্চন'	··· ৭৭৪
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ) ···	জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মদর্শনের একটি দিক	··· ৩০১
স্বামী আত্মপ্রভানন্দ	(কবিতা) ···	হাজারো প্রণতি	··· ৫০৬
স্বামী আত্মস্থানন্দ	(প্রবন্ধ) ···	সকলের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	··· ১৩৩
	(স্মৃতিকথা) ···	স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের চারটি টুকরো স্মৃতি	··· ৮২৩
আনন্দ বাগচী	(অলৌকিক) ···	বিশ্বাস-অবিশ্বাস	··· ৬৬৩
আশাপূর্ণা দেবী	(সাক্ষাৎকার) ···	সূর্যের আলোর মতো, বাতাসের মতো আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছেন শ্রীমা	··· ১৬৭
	(প্রবন্ধ)	শুধু আইন প্রণয়নেই সমস্যার সমাধান হয় না	৫৮৪
ইন্দ্রাণী দে	(কবিতা) ···	হতে পারিনি	··· ৮৭
কনককুমার সিংহ	(ভ্রমণ-কাহিনী) ···	হলিউড হয়ে প্যারিস রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে	··· ৪০৪
কণিকা দেব	(কবিতা) ···	কামনা	··· ৩১৮
কবিতা সিংহ	(ধারাবাহিক-নিবন্ধ) ···	কবি সারদা	৭৬৫, ৮১৮
কমলা সেন	(কবিতা) ···	তোমার লাগি জাগেন ভগবান	··· ৭১৭



স্বামী কেদারানন্দ	(প্রবন্ধ) …	শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনা	… ৬৯৩
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা) …	ভুলে গেছি সেই স্নান	… ৭৭০
কৃষ্ণ ধর	(কবিতা) …	মন্ত্রহীন, ব্রাত্যের আপন (রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত)	… ২৫০
ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ) …	বিশ্বপরিবেশ দিবস ঃ পরিবেশ ভাবনা	… ৩৫০
স্বামী গম্ভীরানন্দ	(প্রবন্ধ) …	'ভক্তিরেব গরীয়সী'	… ৫৪১
স্বামী গর্গানন্দ	(কবিতা) …	জাগরণ-আহ্বানম্	… ৫৬৩
স্বামী গহনানন্দ	(প্রবন্ধ) …	স্বামী অভেদানন্দ ঃ একটি অনুধ্যান	… ৫১০
গোপালচন্দ্র রায়	…	শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম ঃ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সমালোচনার উত্তর	… ১৮৯
স্বামী গোপেশানন্দ	(রম্যরচনা) …	এক এবং শূন্য	… ৬৬১
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ) …	বেদে শক্তিতত্ত্ব	… ৫৪৬
গোরাচাঁদ কুন্ডু	(প্রবন্ধ) …	পাপীজনশরণ প্রভু	… ৩৮৯
গৌতম মুখোপাধ্যায়	(কবিতা) …	উত্তরাধিকারী	… ৭১৮
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা) …	বিবেক-প্রণাম	… ৮৪
	(কবিতা) …	হে রাজসন্ন্যাসী	… ২৪৯
চিত্ত রায়	(কবিতা) …	ঐশ্বর্যের সন্ধানে	… ৩৭৪
চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য	(ভ্রমণ-কাহিনী) …	সাগর দেখে ফেরা	… ৪৪৭
স্বামী চেতনানন্দ	(প্রবন্ধ) …	'শেষ জন্ম' রহস্য	২৪১, ৩০৭
জলধিকুমার সরকার	(প্রবন্ধ) …	উদ্বোধন পত্রিকার নব্বইতম বর্ষে পদার্পণ ঃ কিছু সংবাদ	… ১০০
	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ) …	আশ্চর্য এই রোগ ঃ কুষ্ঠ	… ২২৪
	(প্রবন্ধ) …	ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কি পরে 'রসেছিলেন' ?	… ৫৯৯
	(বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ) …	'জিন' পরীক্ষাদ্বারা ভাবী রোগ নির্ণয়	… ৮৪৪
জলি মোহন কল	(প্রবন্ধ) …	আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে কম্যুনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন	… ৫৮৯
জয়ন্তী সেন	(কবিতা) …	সম্ভবামি যুগে যুগে	… ৫৬৫
স্বামী জিতাত্মানন্দ	(একাঙ্কিকা) …	ভারতাত্মা বিবেকানন্দ	… ৩৯
জ্যোতির্ময় বসুরায়	(প্রবন্ধ) …	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ	… ৫৭০
	(প্রবন্ধ) …	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ তাঁর পূর্বাশ্রম-জীবনের একটি ঘটনা	… ৭৫৯
তরুণ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা) …	যৌবন ভাঙে নিষ্ঠুর আঙুলে	… ৮২২
তরুণ সান্যাল	(প্রবন্ধ) …	রিলিজিয়ন, ধর্ম ও বিপ্লব	… ৭০৪
তাপস বসু	(কবিতা) …	পূর্ণতার সে প্রতিচ্ছবি	… ৪৩৯
	(কবিতা) …	ভালবাসা	… ৭১৮
	(প্রবন্ধ) …	লালন ফকির ও তাঁর গান	… ৫৯৪
	(প্রবন্ধ) …	বাঙালী-জীবনে কৃষ্ণ	… ৪৮১
দিলীপকুমার দত্ত	(প্রবন্ধ) …	বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মদর্শন	… ৩৬৫

দিলীপকুমার দত্ত	(ধারাবাহিক-প্রবন্ধ)	কৃষ্ণচিন্তায় নব-জাগরণ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য	৪৮৮, ৭১০
	(ভ্রমণ-কাহিনী)	ত্রিপুরার তীর্থে	৮৫০
দিলীপ মিত্র	(কবিতা)	উদ্বোধন	৭৬৯
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী	(প্রবন্ধ)	আচার্য শঙ্কর ও তাঁর দার্শনিক চিন্তা	২৭০
দীপ্তিকুমার শীল	(রম্যরচনা)	ছোটরাম পণ্ডিত	৪৬১
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)	স্বামীজীর সেবামূলক কর্মভাবনা ও তার উৎস	৬১২
দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা)	প্রতীক্ষা	৭৭০
দেবাশিস নাথ	(কবিতা)	হে অনির্বাণ	৭৬৯
দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)	প্রতিবিম্ব	৭১৮
দেবিদাস বসু	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)	বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও গঠন	৭৩৬
দেবী রায়	(কবিতা)	মনে রেখো	৪৪০
	(কবিতা)	কোন পথে তার যাত্রা	৭৬৯
স্বামী ধর্মানন্দ	(স্মৃতিকথা)	স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা	১৬৫
নাচিকেতা ভরদ্বাজ	(কবিতা)	একজন সম্রাটকে নিবেদিত	২৮
	(প্রবন্ধ)	স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলা সাহিত্য	১৮১, ২৫২
	(কবিতা)	প্রতিশ্রুতি	৪৪১
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)	স্বামী বিবেকানন্দ ও উদ্বোধন পত্রিকা	৯১
	(প্রবন্ধ)	স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকার শিশুরা	৬০৪
	(প্রবন্ধ)	দ্বিজেন্দ্রলালের ধর্মচেতনা ঃ জীবনে ও কাব্যে	৮৩০
নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)	আমিই কর্ম আমিই অপেক্ষা	৫৬৪
	(কবিতা)	যে আলোকে প্রাণের প্রদীপ	৮২২
নিভা দে	(কবিতা)	তার চেয়ে যোগ্য হও	৪৩৯
	(কবিতা)	যাকে পেলে	৫৬৫
নিমাই মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)	অনাহত আহ্বান	২৯
	(কবিতা)	বিশ্বজিৎ শ্রীরামকৃষ্ণ	১৪৪
	(কবিতা)	ধ্যানস্তব্ধ	৫৬৭
স্বামী নির্জরানন্দ	(প্রবন্ধ)	স্বামীজী ও আমরা	৮২
	(প্রবন্ধ)	জাতির সামনে যে আলোকস্তম্ভ	৬৫২
নির্মাল্যকুমার সেন	(কবিতা)	ডাক শুনি	৩৭৩
নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)	শ্রীমা সারদাদেবী ঃ বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা	৮১৩
নীরদবরণ চক্রবর্তী	(প্রবন্ধ)	বুদ্ধদেবের ধর্ম	২৬১
নীহার মজুমদার	(প্রবন্ধ)	ও কেশবচন্দ্র সেন	৭৭৬
পরশুরাম চক্রবর্তী	(প্রবন্ধ)	অভিনব প্রতীক-উপাসনা	২১
স্বামী পরাশরানন্দ	(প্রবন্ধ)	দেবী-মাতা-কন্যা	৫৫৩
পলাশ মিত্র	(কবিতা)	স্বামীজীর ভারত	২৩
	(কবিতা)	ভোরের প্রতীক্ষায়	২৫১
	(কবিতা)	তোমার আনন্দসুর	৫৬৪

পলাশ মিত্র	(প্রবন্ধ)	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্তরালবাসী এক কর্মযোগী	·· ৭৮৬
পরিমলকান্তি দাস	(প্রবন্ধ)	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গণে 'রমণী'	·· ২৪৬
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ	(কবিতা)	চিরন্তনের এক নাম	··· ২০
	(প্রবন্ধ)	স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে	·· ৩৩৭
প্রণবেশ চক্রবর্তী	(প্রবন্ধ)	স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত	·· ৪৯৮
	(প্রবন্ধ)	বজবজে স্বামী বিবেকানন্দ ঃ একটি অনুচ্চারিত অধ্যায়	··· ৭৫
প্রদোষকুমার পাল	(কবিতা)	প্রণমি মা	·· ৮২১
প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	(কবিতা)	শাশ্বত	·· ৩১৭
	(কবিতা)	তবুও ডাকব তোমায়	·· ৫৬৪
প্রবীর মিত্র	(কবিতা)	মিলন	·· ৭৭০
স্বামী প্রভানন্দ	(প্রবন্ধ)	একটি হরিনামের হাটবাজার	·· ৬২৭
স্বামী প্রমেয়ানন্দ	(প্রবন্ধ)	গুরুবাদ	·· ৪২১
প্রশান্তকুমার পণ্ডিত	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)	সারা বিশ্বের ত্রাসসৃষ্টিকারী রোগ—এইড্স	·· ৪৬৩
	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)	মাসরুম	··· ৫২৪
প্রিয়নাথ মল্লিক	(প্রবন্ধ)	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	·· ৩১৪
প্রীতিময়ী কর	(প্রবন্ধ)	অমৃত-স্মৃতিকণা	··· ৭২৩
স্বামী বলভদ্রানন্দ	(প্রবন্ধ)	মূল্যবোধের সঙ্কট ও স্বামীজীর আদর্শ	·· ৫০
বিজয়া মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)	বৃক্ষমূলে	··· ৩১৭
বিবেক তীর্থঙ্কর	(কবিতা)	শঙ্করাচার্যকে নিবেদিত	·· ২৫০
স্বামী বিমলাত্মানন্দ	(প্রবন্ধ)	শশীভূষণ সান্যাল	··· ৭২৮
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ	(স্মৃতিকথা)	মহারাজের স্মৃতি	·· ৪৪২
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	(কবিতা)	স্বামীজীর প্রতি	·· ৩০
	(প্রবন্ধ)	শতাব্দীর লেখক টি. এস. এলিঅট	·· ৮৩৯
বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	(কবিতা)	সুখের সময় সুদীর্ঘ নয়	·· ২৫১
বীরেশ্বর পাল	(ভ্রমণ-কাহিনী)	বিউখী	·· ৫১৬
ব্রত চক্রবর্তী	(কবিতা)	যার জন্য	·· ৭১৮
স্বামী ব্রহ্মপদানন্দ	(প্রবন্ধ)	তিতিক্ষা	·· ৩৭৭
স্বামী ভূতেশানন্দ	(প্রবন্ধ)	অবতারের আবির্ভাবের তাৎপর্য এবং প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য	·· ১২৭
	(প্রবন্ধ)	'হৃদি সর্বস্ব বিষ্ঠিতম্'	·· ৫৪৪
	(প্রবন্ধ)	যেমন ভাব তেমন লাভ	·· ৭৫৩
ভূপেন্দ্রনাথ শীল	(কবিতা)	অপ্রকাশিত	·· ৫৬৬
মধুসূদন পাল	(কবিতা)	সহচরী	·· ৩১৮
	(কবিতা)	জননী	·· ৫৬৬
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	(কবিতা)	বিবেকানন্দ	· ৮২২
মানসী বরাট	(কবিতা)	সত্যের বিগ্রহ	· ১৪৩

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য	(ক্রীড়া-সমীক্ষা)	ভারতীয় হকি—কেন এই দৈন্যদশা ?	৬৮০
স্বামী মন্ত্রসঙ্গানন্দ	(প্রবন্ধ)	বুদ্ধ ও শঙ্কর ঃ স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে	২৭৮
রতনকুমার নাথ	(কবিতা)	তুমি এসো	১৮৮
রবীন্দ্রনাথ জানা	(প্রবন্ধ)	কিমকুর্বত সঞ্জয়	৪৯৫
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	(কবিতা)	বীরবাণী বিবেকানন্দের	২৭
	(কবিতা)	তথাপি	৩৭৪
	(প্রবন্ধ)	পুজো, ইচ্ছে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রনাথ	৪৪৩
	(কবিতা)	পরের বাগানে ফুল	৫৬৪
রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	(প্রবন্ধ)	স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যুব সমাজের দায় ও স্বামী বিবেকানন্দ	৪৩
রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী	(নিবন্ধ)	জ্যোতিষমতে রুদ্রাক্ষ ধারণের ফল	৬৭১
রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	(কবিতা)	রামকৃষ্ণমহিম্নস্তোত্রম্	৫০৭
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)	স্বামী বিবেকানন্দের একটি ভাবনা	৫৫
রেজাউল করীম	(প্রবন্ধ)	ধর্মসমন্বয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দান	৫৬৮
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ	(প্রবন্ধ)	মানুষ বিবেকানন্দ	৩২
শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়	(কবিতা)	আর এক ভুবন	৭৬৯
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	(প্রবন্ধ)	কেরালার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব	৬৩
	(প্রবন্ধ)	স্বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনাসমাজীর সাক্ষাৎকার ঃ নতুন তথ্য	৬৩৯
শান্তশীল দাশ	(কবিতা)	বিবেক-বাণী	২৯
	(কবিতা)	আমি-তুমি	৫৬৬
শান্তিকুমার ঘোষ	(কবিতা)	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে	১৪৪
	(কবিতা)	যদি অনন্ত জীবন বেয়ে	৫৬৭
শিশির কর	(প্রবন্ধ)	সন্ন্যাসী-সাংবাদিক	৭০০
শৈলেনকুমার দত্ত	(কবিতা)	কবি বিবেকানন্দ	৬০
শ্যামল সেন	(কবিতা)	রামকৃষ্ণপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্	১২৬
	(কবিতা)	সারদাদেবী-প্রাতঃস্মরণম্	৮২১
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	(কবিতা)	বিদায় বেলায়	১৮৭
	(কবিতা)	গৌরীস্তুতি	৫৬২
সংযুক্তা মিত্র	(কবিতা)	প্রতীক্ষা	১৪৩
সচ্চিদানন্দ কর	(প্রবন্ধ)	দ্রৌপদী	২০৩
সঞ্জয় ঘোষ	(কবিতা)	মহামন্ত্র	৩০
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)	কৃপা	৬৪৯
সতী দত্ত	(ভ্রমণ-কাহিনী)	দেখে এলাম ফুজিয়ামা	২০৮
সন্তোষকুমার অধিকারী	(কবিতা)	সেই বজ্রকণ্ঠে দাও ডাক	৩৭৩
	(কবিতা)	কে পারে জানতে তাঁকে ?	৭১৭
সন্দীপকুমার চক্রবর্তী	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ)	ভাইরাসজনিত শিশুরোগ	৬৭৬

স্বামী সর্বাত্মানন্দ	…	দেশান্তরের চিঠি	… ৮৮
সমরেশ মণ্ডল	(কবিতা) …	বিশ্বনাবিক	… ৮২১
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়	(কবিতা) …	সামান্য	… ২৪৯
	(কবিতা) …	শ্বেতকেতু	… ৫৬৭
সরোজকুমার গুহ	(কবিতা) …	সমুদ্রটা	… ৩৭৩
সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ) …	দেহপিঞ্জরের পাম্পঘর	… ৭৯৬
স্বামী সহদেবানন্দ	(ভ্রমণ-কাহিনী) …	নীলকণ্ঠেশ্বরের পথে	… ৭৯৯
স্বামী সারদেশানন্দ	(প্রবন্ধ) …	বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা	… ৫
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ	(স্মৃতিকথা) …	ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি	… ৬২৩
সুকুমার ঘোষ	(বিজ্ঞান-নিবন্ধ) …	ধবল বা শ্বেতী	… ৪০৭
সুধাংশুভূষণ নায়ক	(কবিতা) …	'তোরা এসেছিস'	… ৫৬৩
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	(সাক্ষাৎকার) …	স্বামী বিবেকানন্দ এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক	… ১০৭
সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ) …	শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংহতি-চেতনা	… ১৪৫
	(প্রবন্ধ) …	গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, পাঞ্জাব এবং স্বামী বিবেকানন্দ	… ৬১৯
সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ) …	কথামৃত ঃ সাহিত্যামৃত	… ২১১
সুশীলকুমার রুদ্র	(প্রবন্ধ) …	সার্ধশতবর্ষে কবি হেমচন্দ্র ঃ এক বিস্মৃত কবি-ব্যক্তিত্ব	… ৪৫৭
স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ	(প্রবন্ধ) …	রথ ও রথোৎসব	… ৩৬১
ব্রহ্মচারী সৈকতেশ	(কবিতা) …	তোমার কাছে দাঁড়ালে	… ৮২২
হরপ্রসাদ মিত্র	(প্রবন্ধ) …	রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-ধারণা ✓	… ৩১৯
হরিদাস মুখোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ) …	বিনয় সরকারকে যেমন দেখেছি	… ৩৯৬
হরিপদ আচার্য	(প্রবন্ধ) …	গুরু	… ৪৩৩
ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী	(ভ্রমণ-কাহিনী) …	হিমালয়তীর্থ গঙ্গোত্রী ও গোমুখ	… ১৬১
	(ভ্রমণ-কাহিনী) …	অমরদেবতা অমরনাথ	… ৬৫৭
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ	…	শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম ঃ গোপালচন্দ্র রায়ের উত্তরের প্রত্যুত্তর	… ১৯৬
হোসেনুর রহমান	(প্রবন্ধ) …	স্বামী বিবেকানন্দ ও আজকের ভারতবর্ষ	… ২৪

দিব্যবাণী ঃ

১, ১২১, ১৭৭, ২৩৭, ২৯৭, ৩৫৭, ৪১৭, ৪৭৭, ৫৩৭, ৬৮৯, ৭৪৯, ৮০৯

কথাপ্রসঙ্গে ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার 'উদ্বোধন'—২ ; শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ এক মহাবিস্ময়—১২৩ ; দর্পণে আপন মুখ—১৭৮ ; ধন্য বৈশাখ—২৩৮ ; জরথুস্ত্র ঃ পূর্ণতার বাণীবাহক—২৯৮ ; জগন্নাথের রথ—৩৫৮ ; তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ—৪১৮ ; ধরণীর ক্রন্দন এবং একটি মহা-আবির্ভাব—৪৭৮ ; প্রসঙ্গ অকালবোধন—৫৩৮ ; শুভ ৺বিজয়া—৬৯০ ; মায়ের পুজা—অতঃ কিম্ ?—৬৯০ ; "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি"—৭৫০ ; "আমি মৃত্যুঞ্জয়"—৮১০

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

গিরিশচন্দ্র ঘোষ / কর্ম—৩৩৪, ৩৯৩, ৪৬৬ ; বড় বউ—৭৭১, ৮৫৩ ; স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ / আনন্দময়ীর আগমন—৫৫৮ ; বিজয়া—৭০৮ ; শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী / গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী—৫২০, ; স্বামী শুদ্ধানন্দ / ব্যবহারিক ও পারমার্থিক—২৮৭ ; সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ—২২৭

মাধুকরী

অনুরূপা দেবী / স্বামী বিবেকানন্দ—৭৩২ ; অধ্যাপক রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর / স্বামী বিবেকানন্দ—৩২৬ ; কনস্তানতিন খারচেভ / সোভিয়েত রাষ্ট্র ও চার্চ—৪৫৩ ; ত্রৈলোক্যনাথ দেব / রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্মসমাজ—১৫৪ ; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় / বিবেকানন্দ কে ?—২২৩ ; সন্তোষকুমার ঘোষ / ক্রুশে, ক্যানসারে কোনও ভেদ নেই—৬৫৪ ; সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ / শ্রীরথযাত্রা—৩৮৩ ; সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত / স্বামী বিবেকানন্দ—৭৯৯ ; হামদুল্লা ফারুক / স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় যুবসমাজ—৫৯৩ ; গোপাল হালদার / বিবেকানন্দ জন্মের ১২৫ বছরে উপলব্ধি—৮২৪

আনন্দের সন্তান

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ/৮৫, ২০৭, ২৫৭, ; খেলে নন্দদুলাল—৫০৮ ; স্বামী অদ্ভুতানন্দ ঃ অদ্ভুত আনন্দময় এক পুরুষ—৭৪১ ; "পূর্ণ তিনি মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়"—৮৪৭ ; স্বামী লোকেশ্বরানন্দ / রসিকরাজ রাখালরাজ—৬৪৭ ; শঙ্করীপ্রসাদ বসু/শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে—৩৪৩ ; রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ—৩৭৫ ; 'উথলিল মহারঙ্গে সদানন্দ লহরী'—৪৪৫ ; স্বামী বিবেকানন্দ ও নামরহস্য—৭৯১

বাতায়ন

বর্তমান ইসরায়েল সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য—৪৬৯ ; সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ—৫২৮ ; লিদিয়া লিবেদিনস্কায়া / শুভ বিবাহ—৬০৯ ; জলধিকুমার সরকার (অনুবাদ ও উপস্থাপন) রোটারি ক্লাবের ইতিকথা—৭৪৩ ; আজকের জাপান—৮০১ ; পশ্চিম জার্মানী ঃ অর্থনীতি ও শিল্প—৮৪৬

গ্রন্থ পরিচয় ঃ

অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়/৩৫২, ৬৮৩ ; জলধিকুমার সরকার/১৭০, ২৯০, ৭৪৪ ; স্বামী জয়দেবানন্দ/ ২৩১ ; তারকনাথ ঘোষ / ১১৪, ৪১০, ৫৩০, ৮৫৫ ; স্বামী পরাশরানন্দ / ১১৫ ; প্রণবেশ চক্রবর্তী/৬৮২ ; বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় / ৪০৯, ৭৪৪ ; মৃণাল ব্রহ্মচারী /৮০৩ ; স্বামী শান্তরূপানন্দ / ১১৪ ; সচ্চিদানন্দ ধর / ১৭১, ৩৫২ ; সুধীরকুমার নন্দী / ২৮৯ ; হরিপদ চক্রবর্তী / ৪৭০

বিবিধ ঃ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের দুটি চিঠি ··· ৯৯

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ঃ ১১৬, ১৭২, ২৩৩, ২৯১, ৩৫৩, ৪১১, ৪৭২, ৫৩২, ৬৮৪, ৭৪৫, ৮০৪, ৮৫৬

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ১১৭, ১৭৩, ২৩৪, ২৯৩, ৩৫৫, ৪১৪, ৪৭৩, ৫৩৩, ৬৮৪, ৭৪৫, ৮০৬, ৮৫৭

বিবিধ সংবাদ ১১৮, ১৭৪, ২৩৫, ২৯৩, ৩৫৫, ৪১৪, ৪৭৪, ৫৩৪, ৬৮৫, ৭৪৬, ৮০৭, ৮৫৮

বিজ্ঞান সংবাদ ৪৭৬, ৫৩৬, ৬৮৭, ৭৪৮, ৮০৮, ৮৬০

চিত্রসূচী ৪ (ক), ৪ (খ), ৯৭, ৯৮, ৫৩৬ (ক), ৫৯৬, ৬২৮ (ক), ৬২৮ (খ), ৬২৮ (গ), ৬২৮ (ঘ)

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

সূচীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ শ্রাবণ ১৩৯৫

দিব্যবাণী : ☐ ৪১৭

কথাপ্রসঙ্গে : তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ☐ ৪১৮

প্রবন্ধ

গুরুবাদ ☐ স্বামী প্রমেয়ানন্দ ☐ ৪২১

'সদ্‌গুরুসেবনম্' ☐ ব্রহ্মচারী অধ্যাত্মচৈতন্য ☐ ৪২৫

গুরু ☐ হরিপদ আচার্য ☐ ৪৩৩

পুজো, ইচ্ছে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রনাথ ☐ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ☐ ৪৪৩

সার্ধশতবর্ষে কবি হেমচন্দ্র : এক বিস্মৃত কবি-ব্যক্তিত্ব ☐ সুশীলকুমার রুদ্র ☐ ৪৫৭

স্মৃতিকথা

মহারাজের স্মৃতি ☐ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ☐ ৪৪২

ভ্রমণ-কাহিনী

সাগর দেখে ফেরা ☐ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ☐ ৪৪৭

রম্যরচনা

ছোটরাম পণ্ডিত ☐ দীপ্তিকুমার শীল ☐ ৪৬১

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

সারা বিশ্বের ত্রাসসৃষ্টিকারী রোগ—এইড্‌স ☐ প্রশান্তকুমার পণ্ডিত ☐ ৪৬৩

কবিতা

তার চেয়ে যোগ্য হও ☐ নিভা দে ☐ ৪৩৯ পূর্ণতার সে প্রতিচ্ছবি ☐ তাপস বসু ☐ ৪৩৯

মনে রেখো ☐ দেবী রায় ☐ ৪৪০ প্রতিশ্রুতি ☐ নচিকেতা ভরদ্বাজ ☐ ৪৪১

নিয়মিত বিভাগ

আনন্দের সন্তান : 'উথলিল মহারঙ্গে সদানন্দ লহরী' ☐ উপস্থাপনা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ☐ ৪৪৫

মাধুকরী : সোভিয়েত রাষ্ট্র ও চার্চ ☐ কনস্তানতিন খারচেভ ☐ ৪৫০

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : কর্ম ☐ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ☐ ৪৬৮

বাতায়ন : বর্তমান ইস্‌রায়েল সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য ☐ ৪৬৯

গ্রন্থ পরিচয় : সাধনপথের সঙ্গী ☐ হরিপদ চক্রবর্তী ☐ ৪৭০

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ☐ ৪৭২ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪৭৩

বিবিধ সংবাদ ☐ ৪৭৪ বিজ্ঞান সংবাদ ☐ ৪৭৬

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী নির্জরানন্দ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বার্ষিক মূল্য : তিরিশ টাকা ☐ সডাক ছত্রিশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৫ সংখ্যা

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারের 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন (শারদীয়া সংখ্যা) প্রকাশিত হবে। মূল্য : ষোল টাকা।

☐ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি বারো টাকায় পাবেন।

☐ গ্রাহক-গ্রাহিকারা সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার দেওয়া খুব অসুবিধাজনক।

☐ সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ১২ সেপ্টেম্বর '৮৮-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ঐ তারিখের মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে রেজেষ্ট্রি ডাকেও আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজেষ্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ছয় টাকা ১২ সেপ্টেম্বর '৮৮-এর মধ্যে কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। ঐ তারিখের পরে টাকা কার্যালয়ে পৌঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক-গ্রাহিকার আগামী বছরের ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যালয় থেকে আশ্বিন সংখ্যাটি দেওয়া হবে।

(কার্যালয় শনিবার ১-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০ পর্যন্ত খোলা।)

১ শ্রাবণ ১৩৯৫
১৭ জুলাই ১৯৮৮

স্বামী সত্যব্রতানন্দ
কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩



৯০তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] শ্রাবণ, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

ঋষয় ঊচুঃ

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা বিদ্যা গুরুগীতা বিশেষতঃ ।/ত্বৎপ্রসাদাচ্ছ্রোতব্যা তৎ সর্বং ব্রূহি মে সূত ॥ ১ ॥

সূত উবাচ

কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তি-সাধন-তৎপরা ।/প্রণম্য পার্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ২ ॥

নমো নমো দেবদেব পরাৎপর জগদ্‌গুরো ।/সদাশিব মহাদেব গুরুগীতাং প্রদেহি মে ॥ ৩ ॥

কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।/তাং কৃপাং কুরু মে ব্রহ্মন্ নমামি চরণস্তব ॥ ৪ ॥

মহাদেব উবাচ

মম রূপাসি দেবি ত্বং তৎপ্রীত্যর্থং বদাম্যহম্ ।/লোকোপকারকঃ প্রশ্নো ন কেনাপি কৃতঃ পুরা ॥ ৫ ॥

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু তৎ শৃণুষ্ব বদাম্যহম্ ।/কিঞ্চিদ্ গুরুং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ৬ ॥

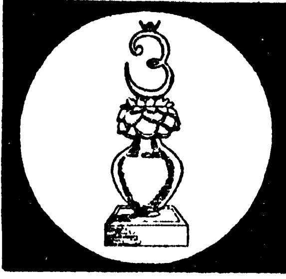
বেদশাস্ত্রপুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ ।/যন্ত্রমন্ত্রাদি-বিদ্যানাং মৃত্যুরুচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৭ ॥

শৈবশাক্তাগমাদীনি অন্যস্বহুমতানি চ ।/প্রণশ্যন্তি সমস্তানি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম্ ॥ ৮ ॥

গুরুঃ বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাত্তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্ ।/তীর্থরাজঃ প্রয়াগোঽসৌ গুরুমূর্ত্যৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥ *

ঋষিগণ বললেনঃ হে সূত, আত্মবিদ্যা গুহ্য হতে গুহ্যতর অর্থাৎ অধিকতর গোপনীয়। আবার গুরুগীতা বিশেষভাবে গুহ্যতম। তাই এই গুরুগীতা আপনার প্রসাদে শ্রবণ করা উচিত। আপনি আমাদের নিকট সেই সমস্ত বলুন ॥ ১ ॥ সূত বললেনঃ একদা রমণীয় কৈলাস-পর্বতের শিখরে ভক্তি ও তার সাধনের অনুষ্ঠানে তৎপরা দেবী পার্বতী শঙ্করকে প্রণাম করে ভক্তিপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন ॥ ২ ॥ শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর দেবতাদেরও দেবতা হে জগৎগুরু সদাশিব মহাদেব, আপনাকে প্রণাম। আমাকে গুরুগীতা প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ কোন্ মার্গ অবলম্বন করলে, হে স্বামি, দেহী ব্রহ্মময় হয়ে যায়, হে ব্রহ্মন্, আমাকে সেই (মার্গ-প্রদর্শন-রূপ) কৃপা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ মহাদেব বললেনঃ হে দেবি, তুমিই আমার রূপ। তোমার প্রীতির জন্য আমি বলছি। লোকের কল্যাণকর এই প্রকার প্রশ্ন পূর্বে আর কেউই জিজ্ঞাসা করেনি ॥ ৫ ॥ হে সুমুখি, ত্রিসংসারে যা দুর্লভ তা আমি তোমাকে বলছি শ্রবণ কর, গুরু ব্যতীত অন্য সত্য কিছুই নেই, এটি ধ্রুব সত্য ॥ ৬ ॥ বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি এবং যন্ত্র, মন্ত্র, মারণ, উচাটন প্রভৃতি বিদ্যা, তথা শৈব ও শাক্তদিগের আগম প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহু মত—এই সমস্তই ভ্রান্তচিত্ত জীবকুলের নিকট নিষ্ফল হয়ে যায় ॥ ৭-৮ ॥ গুরু সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর তারক-ব্রহ্ম, তিনিই তীর্থরাজ প্রয়াগ। সেই গুরুমূর্তিকে বারংবার প্রণাম ॥ ৯ ॥

* বিশ্বসারতন্ত্রের অন্তর্গত শ্রীশ্রীগুরুগীতাস্তোত্র থেকে উদ্ধৃত।



কথাপ্রসঙ্গে

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

"গুরু বিন জ্ঞান না পাওয়ে।"

গুরু বিনা জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না।

এক্ষেত্রে 'জ্ঞান' অর্থে অবশ্যই বুঝানো হইয়াছে পরম জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। শ্রুতিমুখে বহু সহস্র বৎসর পূর্বেও ঐ কথা উচ্চারিত হইয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাইতেছি: "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ"—যিনি আচার্য অর্থাৎ গুরু লাভ করিয়াছেন তিনি জ্ঞান লাভ করেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।১৪।২)। মুণ্ডক উপনিষদ্ (১।২।১২) বলিতেছেন: "তদ্ বিজ্ঞানার্থং···গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—তাহাকে অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার জন্য গুরুর নিকট অবশ্যই যাইতে হইবে।

হিন্দুর সকল শাস্ত্র জুড়িয়াই রহিয়াছে এই একটি নির্দেশ: জ্ঞান গুরুমুখ হইতেই নিঃসৃত হয়। সুতরাং গুরু ছাড়া গতি নাই। এমনকি স্বয়ং ভগবানের মুখেই এই কথাটি বসানো হইয়াছে: "প্রথমন্তু গুরুপূজ্যঃ ততশ্চৈব মমার্চনম্"—প্রথমে গুরুর পূজা, তাহার পর আমার। কারণ, গুরু যে জ্ঞানের আকর, জ্ঞানমূর্তি। তাই প্রয়োজন গুরুর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। এমনকি গুরু গর্হিত, শাস্ত্র-নিন্দিত কর্মে লিপ্ত হইলেও, তাঁহার চারিত্রিক স্খলন হইলেও গুরুবর্জন বা গুরুনিন্দা করা উচিত নয় বলিয়া শাস্ত্রবচন রহিয়াছে। "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব দৈবতম্।/অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ॥ (বিচার-চন্দ্রোদয়, ৩)—বিদ্যাহীন হউন অথবা বিদ্বান হউন, গুরুই দেবতা। শাস্ত্র-বিহিত পথে বিচরণকারী হউন অথবা শাস্ত্র-বিগর্হিত কর্মে লিপ্ত হউন, গুরুই শিষ্যের চিরআশ্রয়। বিষয়টি লইয়া বিতর্কের অন্ত নাই। কেউ কেউ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: "গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়,/তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'" (কথামৃত, ৩।১০।২) আবার শ্রীশ্রীমায়ের কথাতেও (১।১৭) পাইতেছি: "গুরু যেমনই হোক, তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি।" পরশুরাম কল্পসূত্রের বৃত্তিতে (১০।২৬) রামেশ্বরও লিখিয়াছেন: "গুরুবচনং স্ববুদ্ধ্যা ন পরীক্ষয়েৎ, সদসদ্বেতি ন বিচারয়েৎ।"—গুরুর বাক্য শিষ্য নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করিবে না, তাঁহার কথা সৎ কি অসৎ তাহা বিচার করিবে না। শুধু হিন্দুর ধর্মভাবনায় নয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও আচার্যের কাছে নির্বিচার আত্মসমর্পণের বিষয়টি একই রকম গুরুত্ব পাইয়াছে। খ্রীষ্টান (ক্যাথলিক) ধর্মও এবিষয়ে একই কথা বলে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক: 'সদ্গুরু লাভ হইলে সেক্ষেত্রে গুরুর আদর্শ-বিচ্যুতির প্রশ্ন নাই; কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন গুরু লাভ হয় যিনি বাস্তবিক আদর্শভ্রষ্ট, অসৎ-চরিত্র এবং অনৈতিক ও অশাস্ত্রীয় কর্মে লিপ্ত, তাহা হইলে কিভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিব?' উত্তরে বলিব যে, সদ্গুরুর আশ্রয় যে ভাগ্যবান পাইয়াছে তাহার তো কোন সমস্যা নাই। শাস্ত্রও বলিতেছেন: "তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সদ্গুরোর্দীক্ষিতো ভবেৎ" (কুলার্ণব তন্ত্র, উঃ ৩)—সর্বপ্রযত্নে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মহাপুরুষগণও সেই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু যাহার ভাগ্যে সদ্গুরু লাভ হয় নাই, যে পাইয়াছে অসদ্গুরু—সে কি করিবে? সে কি সেই নিমিত্ত হতাশায় নিমজ্জিত হইয়া গুরুত্যাগ করিবে? শাস্ত্র বলিতেছেন: না, গুরুত্যাগ কখনই নয়: "শ্রীগুরুং ন ত্যজেৎ ক্বাপি" (কুলার্ণবতন্ত্র, উঃ ১২)। শাস্ত্র-বিধান অনুসারে গুরুত্যাগ মৃত্যুর নামান্তর: "গুরুত্যাগাৎ ভবেৎ মৃত্যুঃ—রৌরবং নরকং ব্রজেৎ" (ঐ)।

শাস্ত্র বলিতেছেন : গুরু একজনই—"গুরুরেকঃ" (কৌল উপনিষদ্ ২৩)। পরশুরাম কল্পসূত্রেরও বিধান : এক গুরুর উপাসনা করিতে হইবে—"একো গুরুরুপাস্তিরসংশয়ঃ (১।২০)। অর্থাৎ গুরু-ত্যাগ অশাস্ত্রীয়। সুতরাং অসদ্‌গুরু লাভ হইলে কি কর্তব্য ? শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন, গুরু যেমনই হউক গুরুর প্রতি ভক্তিতেই শিষ্য সাধনমার্গের উচ্চতম স্তরে পেঁৗছিতে পারিবে। সে-ভক্তি ব্যক্তি-গুরুটিকে নয়, ব্যক্তিগুরু-মধ্যস্থ গুরুশক্তিকে—যাহা কিনা ঈশ্বরশক্তিরই নামান্তর মাত্র। সে-ভক্তিতে মূল গুরুশক্তির অমোঘ কৃপায় সাধক চরিতার্থতা লাভ করিবেই। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন : "গুরোঃ কৃপাবশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ।" (শান্তিগীতা, ৩৫)। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা প্রমুখের গুরুসম্পর্কিত পূর্ব-উল্লেখিত নির্দেশের বিশেষ কারণটি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের মহাভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দের আলোচনা অনুসরণ করিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিব। স্বামী সারদানন্দ বলিতেছেন : "গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ হয় না, একথা আমরা আবহমানকাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ'—ইত্যাদি স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদীক্ষা দাতা গুরুর উদ্দেশে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি। অনেকে আবার বিদেশী শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আপনাদের জাতীয় শিক্ষা ও ভাব বিসর্জন দিয়া মানববিশেষকে ঐরূপ বলা মহাপাপের ভিতর গণ্য করিয়া অনেক বাদানুবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।…যাহারা গুরু কি তাহাই বুঝে না, তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে।… ঠাকুর এই বিষয়টি বিভীষণের ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন। যথা—

"শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলা সংবরণের অনেককাল পরে কোন সময়ে নৌকাডুবি হইয়া একজন মানব লঙ্কার উপকূলে সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভীষণ অমর, তিনকালই তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন—তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ পেঁৗছিল। সভাস্থ অনেক রাক্ষসের সুকোমল মানবদেহরূপ খাদ্যের আগমন সংবাদে জিহ্বায় জল আসিল। রাজা বিভীষণের কিন্তু ঐ সংবাদ শুনিয়া এক অপূর্ব ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি গলদশ্রুলোচনে ভক্তি-গদগদ বাক্যে বার বার বলিতে লাগিলেন, 'অহো ভাগ্য!' রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া সকলে একেবারে অবাক! তৎপরে বিভীষণ তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'যে-মানবশরীর আমার রামচন্দ্র ধারণ করিয়া লঙ্কায় পদার্পণ করেন ও আমাকে কৃতার্থ করেন, বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানব শরীর দেখিতে পাইব—এ কি কম ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই পুনরায় ঐরূপে আসিয়াছেন!' এই বলিয়া রাজা পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ সকলকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও আদর করিয়া উক্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সপরিবারে অনুগত দাসভাবে তাহার সেবা ও বন্দনাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল তাহাকে লঙ্কায় রাখিয়া নানা ধন-রত্ন-উপহার দিয়া সজলনয়নে বিদায় দিলেন এবং অনুচরবর্গের দ্বারা বাটী পেঁৗছাইয়া দিলেন।

"গল্পটি বলিয়া ঠাকুর আবার বলিতেন, ঠিক ঠিক ভক্তি হলে এইরূপ হয়।… এই অবস্থা হলে গুরুর দোষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তখনই একথা বলা চলে—'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়। /তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥' নইলে মানুষের তো দোষ-গুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে।" (লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব : পূর্বার্ধ, ১৩৫৮, পৃঃ ১২৪-১২৯)

অর্থাৎ মূলকথা দাঁড়াইল দৃষ্টিভঙ্গি। গুরুকে ব্যক্তি হিসাবে দেখা নয়, দেখিতে হইবে গুরুশক্তি বা গুরুভাবের সাকার বিগ্রহ হিসাবে। সেক্ষেত্রে গুরুর আচরণ অন্যরূপ হইলেও শিষ্য যদি তাহার দৃষ্টিকে ঐ শক্তি বা ভাবের প্রতি নিবদ্ধ রাখে তাহা হইলে গুরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও পথপ্রদর্শন ছাড়াই তাহার উন্নতি হইবে। উদাহরণস্বরূপ এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ একলব্যের কাহিনীটি স্মরণ করাইতেন। ব্যাধবংশীয় একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করিতে আসিলে দ্রোণাচার্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায়

অপমান করিয়া নীচবংশসম্ভূত একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে স্বভাবতঃই গভীরভাবে আহত হন একলব্য। কিন্তু তথাপি তিনি দ্রোণাচার্যকেই মনে মনে গুরু হিসাবে বরণ করিলেন এবং গুরুর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে পরম নিষ্ঠায় অস্ত্রবিদ্যা অনুশীলন করিতে লাগিলেন। গুরুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিবশতঃ একলব্য কিছুদিনের মধ্যে দ্রোণাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য রাজবংশজাত অর্জুনাদি অপেক্ষাও অধিকতর নিপুণ অস্ত্রবিদ্ হইয়া উঠেন। ঐকান্তিক গুরুভক্তিতে ইহা সম্ভব। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। গুরু গুরুই। কিন্তু গুরুরও তারতম্য রহিয়াছে। সেই তারতম্য শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে। এবং গুরুর শক্তির উপর শিষ্যের উন্নতি যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল তাহাও অনস্বীকার্য। শ্রুতি বলিতেছেন: "ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ"—নিকৃষ্ট আচার্য কর্তৃক কথিত হইলে এই আত্মাকে সম্যগ্‌রূপে জানা যায় না (কঠ উপনিষদ্ ১।২।৮)। একই কথা শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেছেন: "গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসারবন্ধন আর কাটে না।" (কথামৃত, ১।৪।৫)। সুতরাং গুরু সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ করিয়া, সম্ভব হইলে তাঁহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইবার পর গুরুকরণ করিলে 'সদ্‌গুরু-অসদ্‌গুরু' প্রশ্নে বিড়ম্বিত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। এবং ঐ পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

গুরুর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ অবশ্যই হইবে—শাস্ত্র এই কথা বলিতেছেন এবং তাহার সমর্থন পাইতেছি মহাপুরুষদের বাণী ও জীবনেও। তাঁহারা বলিতেছেন গুরুকে নির্বিচারে ভক্তি করিতে হইবে। কারণ গুরু ইষ্টেরই সচল বিগ্রহ। অগ্নি সর্বত্র অনুস্যূত হইয়া আছে কিন্তু একটি বাতি, একটি লণ্ঠন ইত্যাদির মধ্যে অগ্নির যে প্রকাশ আমরা দেখি সে-প্রকাশ স্বরূপতঃ মূল সর্বব্যাপী অগ্নির সঙ্গে অভিন্ন এবং তাহা সাধারণের কাছেও সহজলভ্য। তেমনিই গুরু সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দের স্বরূপতঃ অভিন্ন প্রকাশবান্ মূর্তি—সে-মূর্তি মানুষেরও অতি নিকটে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সর্বশেষ মন্ত্রটিতে বলা হইয়াছে: যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।/তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।—যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণ ভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ভক্তি গুরুর প্রতিও সেরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকট (উপনিষদুক্ত) এই বিষয় (অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ-রূপ আত্মজ্ঞান) স্বানুভবযোগ্য হয়। অর্থাৎ গুরুর প্রতি ঈশ্বরদৃষ্টি ব্যতীত জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

গুরুশক্তি—যাহার অপর নাম ঈশ্বরশক্তি—সমস্ত মানুষের মধ্যেই সুপ্তভাবে বা ব্যক্তভাবে রহিয়াছে। গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের মন গুরুর প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এমন অবস্থায় উত্তরণ করে যে, সে অনুভব করে, সে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠানস্বরূপ সেই মূল পুরুষ বা মূলাশক্তি এক ও অভিন্ন। এবং মনে ঐ অনুভূতি হওয়া পর্যন্তই ব্যক্তিগুরুর ভূমিকা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "শেষে মনই গুরু হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "গুরু যেন সখী—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয় ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই।" কিন্তু এই মিলন অকস্মাৎ সংঘটিত হয় না। তাহার পূর্বে শিষ্যকে গুরুর হাত ধরিয়া (অর্থাৎ গুরু-উপদিষ্ট পথে) একটির পর একটি ভাবরাজ্যের স্তর অতিক্রম করিতে হয়। পরিশেষে গুরু যেন ইষ্টের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দেন শিষ্যকে এবং বলেন: "ঐ দেখ!" বলিয়াই গুরু অদৃশ্য হইয়া যান। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণেরই বর্ণনা। শুনিয়া একজনের ব্যাকুল প্রশ্ন: "গুরু তখন কোথায় যান?" শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর: "গুরু ইষ্টে লয় হন।"

ব্যক্তিগুরু অর্থাৎ মানুষ-গুরু লীন হইয়া যান জগদ্‌গুরুর মধ্যে। কিন্তু উহা শেষের কথা। সেখানে পৌঁছবার পূর্বপর্যন্ত এবং পৌঁছবার জন্য গুরুর ভূমিকা অপরিহার্য। অপরিহার্য তাঁহার কৃপা ও প্রসন্নতাও। শুধু গুরু-পূর্ণিমায় নয়, ভবপারাবারের কাণ্ডারী সেই গুরুকে আমরা যেন নিত্যদিন প্রণিপাত করি। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন স্মরণ রাখি, আমাদের প্রকৃত গুরু শ্রীভগবান। মানুষ-গুরুর মাধ্যমে আমরা আসলে সেই 'গুরু'কেই প্রণিপাত করি। "তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

গুরুবাদ

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

"যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্টদর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন: এ (শিষ্য) ওই (তোর ইষ্ট)। এইকথা বলেই ইষ্টরূপেতে লীন হয়ে যান, শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না।"[১]

'গুরু' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও গুরু বলতে সাধারণভাবে আমরা আধ্যাত্মিক গুরুকেই বুঝি। স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের নিকট গুরুর স্থান অতি উচ্চে। গুরু-স্তুতিতে শাস্ত্রও তাঁকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এমন কি পরব্রহ্ম পর্যন্ত বলেছেন:

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥[২]

আমরা আসলে কি চাই, কোনটা আমাদের পক্ষে ভাল, কোনটা মন্দ, কোন পথ ধরে চললে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারব—এসব বিষয় সব সময় আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আর যেটুকুও বা বুঝি বলে মনে করি তাতেও ভুলের সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। ব্যবহারিক জগতেই যখন এই, আধ্যাত্মিক পথ যা অতি দুর্গম, সে-পথে দিশারীবিহীন চলার পরিণাম সহজেই অনুমেয়।

আধ্যাত্মিক জগতে গুরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা আসলে কি চাই, কোন্‌টা আমাদের পক্ষে ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্ পথ ধরে চললে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারব—এসব বিষয় সব সময় আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আর যেটুকুও বা বুঝি বলে মনে করি তাতেও ভুলের সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। ব্যবহারিক জগতেই যখন এই, আধ্যাত্মিক পথ যা অতি দুর্গম, সে-পথে দিশারীবিহীন চলার পরিণাম সহজেই অনুমেয়। "আধ্যাত্মিক সংগ্রাম কি, তা কিছুটা যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, আমরা যখন আমাদের মন ও প্রকৃতিকে আঁকড়ে ধরে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে চাই, তখনই তারা কল্পনাতীত জটিলতার সৃষ্টি করে। মন অচিন্ত্য সব রূপ নেয়। তাতে এত রকমের প্যাঁচ, বাঁক ও আবর্ত থাকে যে, আজ আমাদের যা পছন্দ বলে মনে হয়, কালই তা আমাদের একেবারে অপছন্দ হয়ে পড়ে। এ-পর্যন্ত মনের যেসব প্রবণতাকে প্রধান বলে মনে করে আসছি, সহসা সেগুলি যেন আমাদের পরিত্যাগ করে, এবং তাদের স্থলে মনে অভিনব সব ঝোঁক দেখা দেয়। এ-অবস্থায় নিজের বিচারশক্তির উপর আর নির্ভর করা চলে না। বাইরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই গুরুর প্রয়োজনীয়তা।"[৩] স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন: "ভগবানলাভ করতে গুরুর একান্ত দরকার। গুরু শিষ্যের ভাবানুযায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট ঠিক করে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে নিষ্ঠার সহিত সাধনভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্মপথ অতি দুর্গম। সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না হলে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, যতই চেষ্টা করুক না কেন, হোঁচট খেয়ে পড়তেই হবে। চুরি করতে পর্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়। আর এতবড় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে গুরুর দরকার নেই?"[৪]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গুরু কে? তিনিই গুরু যিনি মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে চিরকালের মতো তাকে মুক্তি দিতে পারেন। শাস্ত্র ও ধীর ব্যক্তি বলেন, মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে তাকে চিরমুক্তি দেওয়া একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব, অন্য কারুর পক্ষে নয়। কাজেই গুরু হলেন স্বয়ং ভগবান। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন: "সচ্চিদানন্দই গুরু।" এই সচ্চিদানন্দ ভগবানই লোকশিক্ষার জন্য যুগে যুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৬।২
২ বিশ্বসার তন্ত্র: শ্রীশ্রীগুরুগীতাস্তোত্র, ২৬
৩ Spiritual Practice, Swami Ashokananda, 8th Impression, P. 108,
৪ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ১০ম সং, পৃঃ ২৮

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গুরু কে? তিনিই গুরু যিনি মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে চিরকালের মতো তাকে মুক্তি দিতে পারেন। শাস্ত্র ও ধীর ব্যক্তি বলেন, মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে তাকে চিরমুক্তি দেওয়া একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব, অন্য কারুর পক্ষে নয়। কাজেই গুরু হলেন স্বয়ং ভগবান। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন: "সচ্চিদানন্দই গুরু।" এই সচ্চিদানন্দ ভগবানই লোকশিক্ষার জন্য যুগে যুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমরা সাধারণভাবে যাঁদের গুরু বলি, যাঁরা অপরকে দীক্ষা ও সাধনপথের নির্দেশাদি দিয়ে থাকেন, তাঁরা কি? তাঁরাও গুরু। ভগবান স্বয়ং যেমন গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, তেমনি আবার অপরের ভিতর দিয়েও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যাঁদের ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁরা সকলেই গুরু। তবে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অবতার হলেন জগদ্‌গুরু, আর অন্যরা হলেন মানুষ-গুরু। এই মানুষ-গুরুর ভিতরেও ভগবান যাঁকে যতটুকু শক্তি দেন, তিনি ততটুকু শক্তিই প্রকাশ করতে পারেন। কাজেই শক্তির উৎস এক হলেও প্রকাশের তারতম্য হেতু তাঁদেরও স্তরভেদ আছে।

অবতার আসেন যুগ-প্রয়োজনে। তিনি সর্বভাবস্বরূপ হলেও, যে-যুগের পক্ষে যে-ভাবটির বেশি প্রয়োজন সেই যুগে তিনি সেই ভাবটিই বিশেষ ভাবে প্রচার করে থাকেন। চৈতন্য এসে আপামরে প্রেম বিতরণ করলেন, শঙ্করাচার্য করলেন জ্ঞান। এমনিভাবে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি আরও অনেক অবতার এসেছেন যাঁরা যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ ভাব প্রচার করে গেছেন। এ-যুগে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর জীবন ও সাধনার আলোকে প্রচার করলেন ত্যাগ সেবা ও সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ। জড়বাদসর্বস্ব ভোগবাদ ও পরমত-অসহিষ্ণুতার যুগে এটির প্রয়োজন সর্বাধিক। এভাবে অবতাররা এসে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন নতুন নতুন ভাবধারা দিয়ে। আরও কথা, অবতার যখন আসেন তখন তাঁকে কেন্দ্র করে একটি আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গ বইতে থাকে, যা মানুষের মনকে দোলা দেয়, আকর্ষণ করে সেই ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হওয়ার জন্য। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ—এঁদের কেন্দ্র করে উত্থিত ভাব-তরঙ্গের পরিধি ও প্রভাব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

এবার আমরা মানুষ-গুরুর কথায় আসি। তাঁরা কিভাবে মানুষকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করেন? তাঁরা নিজেরা যে ভগবানকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, যাঁকে জীবনের সর্বস্ব, ইহকাল-পরকালের পরমধন বলে জেনেছেন, অন্যের কাছেও তাঁরা সেই ভগবানের কথাই বলেন। তাঁকেই ভালবাসতে এবং আপনার থেকেও আপনার করে নিতে উপদেশ দেন। ভগবানের নাম অর্থাৎ দীক্ষাও তাঁরা দেন। কিন্তু 'গুরু' বলে অভিমান তাঁদের নেই। যে ভগবানকে কেন্দ্র করে তাঁদের জীবন, তিনি যেমন করান তেমন করছেন—এই ভাব। স্বামী শিবানন্দ বলতেন: "দেখ বাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি এ বুদ্ধি আমার মোটেই নেই। ঠাকুর কৃপা করে আমার ভিতর গুরুবুদ্ধি কখনও দেননি। জগদ্‌গুরু হলেন শঙ্কর—আর এযুগে ঠাকুর। তিনি ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে নিয়ে আসেন। আর তিনি আমার ভিতরে বসে যা বলান আমি তাই বলে দিই মাত্র। ঠাকুরই হলেন অন্তরাত্মা।"[৫] তিনি আরও বলতেন: "তাঁর ইচ্ছাতে তাঁরই নাম সকলকে দিই, প্রার্থনা করি ঠাকুর, তুমি এদের গ্রহণ কর।"[৬] মানুষ-গুরুর ভিতর আরেক রকমেরও ভাব আছে যেমন উপনিষদের ঋষিদের মধ্যে পাওয়া যায়। গুরু বলে তাঁদের যেমন অভিমান নেই, নতুন কোন কথা বলছেন বা নিজস্ব কোন কিছু দিচ্ছেন বলেও তাঁরা দাবি করেন না। পরম্পরাক্রমে গুরুজনদের কাছ থেকে যে সাধনপথ তাঁরা পেয়েছেন তাই অপরকে বলেন মাত্র।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, গুরু কেমন হবেন? শাস্ত্র বলেন, গুরু হবেন 'শ্রোত্রিয়', গুরু হবেন 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। 'শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ বেদবিধি অনুসারী যাঁর জীবন। তিনি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শুধু পণ্ডিতই হবেন

৫ শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ, (ছয় সং), ২য় খণ্ড; পৃঃ ৬৪

৬ ঐ, পৃঃ ১০৪

তা নয়, শাস্ত্রের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে তা নিজের জীবনে রূপায়িত করবেন। গুরু সম্বন্ধে স্বামীজীর কথায় আছে: "গুরু সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন।... যাহারা শব্দ লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করে ও মনকে সর্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।"[৭] যিনি শাস্ত্রের মর্ম জেনে তা জীবনে রূপায়িত করেছেন, তিনিই প্রকৃত ধর্মাচার্য। আর 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচিন্তায় রত, ব্রহ্মলাভই যাঁর জীবনের ব্রত। এসব গুণ গুরুর থাকতে হবে। তাছাড়াও গুরু হবেন নিষ্পাপ, অকপট এবং কামনাশূন্য। গুরুর এসব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, কেননা থাকা প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন:

"আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"[৯]

আত্মার উপদেষ্টা যেমন অতি বিরল, অনুভবকারীও তেমনি সুনিপুণ। অতি বিরল ব্যক্তিই এই উপদেশ ধারণা করতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, সেই বিরল ব্যক্তিটি অর্থাৎ শিষ্য কি রকম হবে? অল্প কথায় বলতে গেলে ভগবানকে লাভ করবার জন্য যার মন ব্যাকুল হয়েছে, যে শ্রদ্ধাবান্, জগতের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়-প্রত্যয়ী, জাগতিক সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তিহীন এবং বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন—এমন যে ব্যক্তি সে-ই শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত। তবে মুখ্য জিনিস হচ্ছে ব্যাকুলতা। ব্যাকুল হয়ে চাইলে তবেই তাঁকে লাভ করা যায়।

"অনেকের ধারণা, একবার যখন গুরুর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করেছেন, তখন তাঁদের আর কিছু করবার দরকার নেই। গুরু নিজেই এখন সব করবেন এবং তাঁদের ভগবানের নিকট নিয়ে যাবেন। আর একটি ধারণা, গুরু দীক্ষা দিলে শিষ্যের সমস্ত পাপের বোঝা তিনি গ্রহণ করেন। যদিও এসব ধারণার পিছনে কিছুটা সত্য আছে তথাপি এসব ধারণা জন্মানোর পিছনে আমাদের স্বভাবজ অলসতাই বেশি দায়ী। শিক্ষকও বিভিন্ন স্তরের আছেন। সকল সিদ্ধপুরুষেরই শিষ্যের সকল ভার গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। শুধুমাত্র অবতারপুরুষ এবং তাঁদের কয়েকজন বিশেষ বিশেষ শিষ্যেরই এসব শক্তি আছে। তাঁরা মুহূর্ত মধ্যে লোককে দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন এবং চিরকালের জন্য সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। অন্যেরা যতই মহৎ হোন, এরূপ করতে পারেন না। শিষ্য তাঁদের (অবতার ও তাঁর শিষ্যদের) নিকট থেকে শক্তি পাবে, যে-শক্তিস্ফুলিঙ্গ অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত অপবিত্রতা নষ্ট করে। কিন্তু শিষ্যকেই আগুনে হাওয়া দিতে হবে এবং আপ্রাণ চেষ্টায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সত্যলাভ করতে হবে। আলস্য কোন কাজে আসে না। যত শীঘ্র আমরা আত্মপ্রমাদপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করি ততই আমাদের মঙ্গল।"

তিনি অপরকে শিক্ষা দেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন: "যিনি আচার্য হবেন তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল-তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুন হলেই হয়।"[৮] কাজেই অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই গুরুকে এইসব গুণের অধিকারী হতে হবে।

গুরুর যেমন ঢাল-তরোয়াল দরকার, শিষ্যেরও তেমনি গুরুর উপদেশ গ্রহণ করবার মতো যোগ্যতা

আরেকটি কথা। "অনেকের ধারণা, একবার যখন গুরুর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করেছেন, তখন তাঁদের আর কিছু করবার দরকার নেই। গুরু নিজেই এখন সব করবেন এবং তাঁদের ভগবানের নিকট নিয়ে যাবেন। আর একটি ধারণা, গুরু দীক্ষা দিলে শিষ্যের সমস্ত পাপের বোঝা তিনি গ্রহণ করেন। যদিও এসব ধারণার পিছনে কিছুটা সত্য আছে তথাপি এসব ধারণা জন্মানোর পিছনে আমাদের স্বভাবজ অলসতাই বেশি দায়ী। শিক্ষকও

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৮৯-৯০

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৪।১।৫

৯ কঠ উপনিষদ্‌, ১।২।৭

বিভিন্ন স্তরের আছেন। সকল সিদ্ধপুরুষেরই শিষ্যের সকল ভার গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই। শুধুমাত্র অবতারপুরুষ এবং তাঁদের কয়েকজন বিশেষ বিশেষ শিষ্যেরই এসব শক্তি আছে। তাঁরা মুহূর্তে মধ্যে লোককে দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন এবং চিরকালের জন্য সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। অন্যেরা যতই মহৎ হোন, এরূপ করতে পারেন না। শিষ্য তাঁদের (অবতার ও তাঁর শিষ্যদের) নিকট থেকে শক্তি পাবে, যে-শক্তিস্ফুলিঙ্গ অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত অপবিত্রতা নষ্ট করে। কিন্তু শিষ্যকেই আগুনে হাওয়া দিতে হবে এবং আপ্রাণ চেষ্টায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সত্যলাভ করতে হবে। আলস্য কোন কাজে আসে না। যত শীঘ্র আমরা আত্মপ্রমাদপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করি ততই আমাদের মঙ্গল।"[১০]

বৈষ্ণব-সাহিত্যে একটি সুন্দর কথা আছে :

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল ॥

গুরু কৃপা করে মন্ত্র দিলেন, ভগবানেরও দয়া হল, আর বৈষ্ণব অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুকে জেনেছেন এমন ভক্তেরও কৃপা হল, কিন্তু একের দয়া মানে নিজের চেষ্টার অভাবে সবই বৃথা হল। জীব মুক্ত হতে পারল না। কাজেই শিষ্যের কর্তব্য হল গুরুর কাছ থেকে পাওয়া বস্তুকে নিজের জীবনে রূপায়িত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া। অবশ্য কে কতটা সফলতা লাভ করতে পারবে তা নির্ভর করবে তার যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও চেষ্টার উপর। মূলকথা, নিজেকে উদ্যমী হতে হবে, খাটতে হবে, তবেই হবে, নতুবা কিছুই হবার নয়।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কি দৃষ্টি হবে? প্রকৃত শিষ্যের দৃষ্টি হবে :

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥[১১]

ভগবান যিনি স্বয়ং সকলের গুরু তিনি যেমন মানুষের হৃদয়ে থেকে অখিলবিশ্বের সমস্ত মানুষকে পরিচালিত করছেন, তেমনি তিনি গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই পরিচালিত করছেন। স্বামী শিবানন্দ বলতেন : "যখন সদ্‌গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন স্বয়ং ভগবানই সেই গুরুর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করেন। স্বয়ং ভগবানই গুরু। মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।"[১২] তাই শিষ্য গুরুকে ঈশ্বরীয়ভাবের প্রকাশ রূপেই দেখবে। অন্য কোন রূপে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন : "গুরুকে মানুষবুদ্ধি করতে নেই।" সুতরাং গুরুস্তবে যে তাঁকে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি বলে স্তুতি করা হয়েছে তা বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত নয়। বিশেষ ব্যক্তির ভিতরে ভগবানের যে শক্তি রয়েছে, যাকে আমরা গুরুশক্তি বলি সেই শক্তির প্রতিই তা প্রযুক্ত। সেই ঐশী শক্তিকেই শিষ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি বলে স্তুতি করছে।

গুরু, যিনি শিষ্যের ভবসাগর পারের কাণ্ডারী, জীবনের পরম প্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক, তাঁর প্রতি যে শিষ্যের ভক্তি-বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভালবাসা থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক এবং তার প্রয়োজনও আছে। কথায়ও আছে : "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" কিন্তু তা বলে গুরুকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায় সৃষ্টি করা, তাঁকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, নিজের গুরুকে বড় করে দেখানোই গুরুভক্তি নয়; গুরুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে সেই উপদেশ অনুযায়ী জীবনগঠন করাই আসল গুরুভক্তি। আর এখানেই গুরুকরণের সার্থকতা।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥[১৩]

যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ আনন্দ প্রদানকারী, নির্লিপ্ত, জ্ঞানমূর্তি, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত অসীম আকাশ সদৃশ, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য, অদ্বিতীয়, সনাতন, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, অবস্থা বিপর্যয়শূন্য এবং ত্রিগুণরহিত, সেই সদ্‌গুরুকে আমি নমস্কার করি।

১০ Spiritual Practice, P. 118-119
১১ গীতা, ১৮।৬১
১২ শিবানন্দ-বাণী, ২।২৩
১৩ বিশ্বসারতন্ত্র : শ্রীশ্রীগুরুগীতাস্তোত্র, ৪১

'সদ্‌গুরুসেবনম্‌'

ব্রহ্মচারী অধ্যাত্মচৈতন্য

মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) বেলুড় মঠে আছেন, একদিন তিনি তাঁর ঘরের গঙ্গার দিকের বারান্দায় বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে আছেন পশুপতি মহারাজ (স্বামী বিজয়ানন্দ)। দেয়ালে একটা বোর্ড টাঙানো আছে। তাতে লেখা: "সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নঃ অধিকারী।" মহাপুরুষ মহারাজ পশুপতি মহারাজকে নিজের লাঠি দিয়ে সেটি দেখালেন। এবার বেড়াতে বেড়াতে যখন বারান্দার অপরদিকে এসেছেন তখন পশুপতি মহারাজ দেখলেন দেয়ালের আরেক জায়গায় একটি বোর্ডে লেখা আছে: "গুরুকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।" পশুপতি মহারাজ নিজের হাত দিয়ে সেটি মহাপুরুষ মহারাজকে দেখালেন। দেখামাত্রই মহাপুরুষ মহারাজ খুব খুশি। তাৎপর্য হল—মহাপুরুষ মহারাজ, পশুপতি মহারাজকে প্রথমোক্ত লেখাটি দেখিয়ে এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যদি তুমি মুমুক্ষু হও অর্থাৎ যথার্থই মুক্তিলাভের ইচ্ছা যদি তোমার হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে অধিকারী অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত লেখাটি দেখিয়ে পশুপতি মহারাজ প্রত্যুত্তরে বললেন যে, শিষ্যের পক্ষে যেটা প্রায় অসম্ভব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপায় তাও অনায়াসে সম্ভব হয়। আর আমি তো ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপালাভে ধন্য হয়েছি। পশুপতি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কৃপা পেয়েছিলেন।

তাই তো আমরা দেখতে পাই আচার্য শঙ্কর বলেছেন:

"মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।
প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্‌।"[১]

"অধিকারী বিশেষে মুক্তির ইচ্ছা কাহারও অল্প, কাহারও বা মধ্যমরূপে উৎপন্ন হইলেও সেই অল্প বা মধ্যম মুমুক্ষুতা, বৈরাগ্য এবং শমদমাদি সাধন সহায়ে ও গুরুর কৃপায় কালে তীব্ররূপ ধারণ করিয়া আত্মসাক্ষাৎরূপ ফল উৎপন্ন করে।"

অদ্বৈততত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আচার্য আবার লিখেছেন:

বিচারণীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ো গুরুঃ সদা।
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাম্‌॥
গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্‌বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা॥
যাবদায়ুস্ত্বয়া বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ॥
ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ॥[২]

—বেদান্তবাক্যসমূহ বিচার্য, গুরু সর্বদা প্রণম্য; গুরুর বাক্য শ্রবণ, গুরুর দর্শন ও সেবা মনুষ্যগণের হিতকর। গুরু স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম; মুমুক্ষুগণ গুরুর সেবা ও বন্দনা করবেন। কৃতজ্ঞ বিবেকী শিষ্য কখনো গুরুর উদ্বেগ উৎপাদন করবেন না। আজীবন মন কর্ম ও বাক্যের দ্বারা বেদান্ত গুরু ও ঈশ্বরের বন্দনা করবে—এই হল শ্রুতির নিশ্চিত উপদেশ। সর্বদা অদ্বৈতভাবনা করবে, ক্রিয়াতে কখনো অদ্বৈতভাব অবলম্বন করবে না (কারণ ক্রিয়ায় অদ্বৈতবুদ্ধি করলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যাবে না)। তিন লোকে অদ্বৈত-বুদ্ধি রাখবে, কিন্তু গুরুর সঙ্গে অদ্বৈতবুদ্ধি করবে না (কারণ গুরুর সঙ্গে অদ্বৈতবুদ্ধি করলে শিষ্যের পক্ষে জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব)।

অদ্বৈতবাদী স্বামীজী একবার শ্রীশ্রীমাকে বলে-ছিলেন: "মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।" সেকথা শুনে শ্রীশ্রীমা সহাস্যে স্বামীজীকে বলেছিলেন: "দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।" স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন: "মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরু-পাদপদ্ম উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান। গুরু-পাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?"[৩]

'কথামৃতে' আমরা দেখতে পাই সদ্‌গুরু ঠাকুর তাঁর শরণাগত ভক্ত 'মণি'কে (মাস্টার মশাইকে)

১ বিবেকচূড়ামণি, ২৮

২ তত্ত্বোপদেশ, ৮৪—৮৭

৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ (১৩৯১), পৃঃ ৪০

অভয় দিচ্ছেন। মণি সংসারী। সংসারের শত চিন্তায় ক্লিষ্ট। ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভে ধন্য হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন 'ঈশ্বরলাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য'। কিন্তু সংসারের এই বিশমন বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তাঁর পক্ষেও কি ভগবান-লাভ সম্ভব? নাকি এরূপ আশা করা তাঁর পক্ষে দুরাশা। তাই তিনি তাঁর মনের কথা সদ্‌গুরুকে জানাচ্ছেন। গুরু বলছেন, গুরুকৃপায় সব সম্ভব।

"মণি—তা হলেও অষ্টবন্ধন তো আছে?

ঠাকুর—অষ্টবন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাকলেই বা, তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কিরকম জান, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে এক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়। একটু একটু করে যায় না। ভেলকীবাজি করে, দেখেছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার নিজের হাতে ধরে; ধরে দড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়।"[৪]

এখন প্রশ্ন হল 'গুরু' কে? 'সদ্‌গুরুর' লক্ষণ কি? কি কি গুণ থাকলে আমরা একজনকে 'সদ্‌গুরু' বলে অভিহিত করতে পারি? 'সদ্‌গুরু'র লক্ষণ কি তা আচার্য শংকর তাঁর সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন:

শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্‌॥[৫]

—যিনি বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, বিষয়তৃষ্ণারহিত, ব্রহ্মবিদ্‌-বরিষ্ঠ, ব্রহ্মে সমাহিত চিত্ত, ইন্ধনের অভাবে অগ্নি যেমন শান্ত হয়, সেরূপ বিষয় চিন্তার সংস্পর্শাভাবে নির্বিকার। বিনত সদ্‌ব্যক্তিগণের প্রতি যিনি অহেতুক দয়াপরায়ণ তিনিই সদ্‌গুরু।

ভগবদ্‌দ্রষ্টা পুরুষের কাছে গেলেই প্রাণে ঈশ্বরীয়ভাব জেগে উঠে। বৈষ্ণবগ্রন্থে একটি অতি সুন্দর কথা আছে:

"যাঁহারে দেখিলে প্রাণে উঠে কৃষ্ণ নাম
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান।"

যেমন আগুনের পাশে গেলে গায়ে তাপ অনুভূত হয়, তেমনি যথার্থ সাধুপুরুষদের কাছে গেলে মন-প্রাণ ভগবদ্‌ভাবে মেতে উঠবে। মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন: "সিদ্ধ পুরুষদের সংস্পর্শে এলেও মানুষের মনে ভগবদ্‌ভাবের স্ফুরণ হবেই হবে।··· কেউ বাস্তবিক ভগবান লাভ করেছে কিনা তার পরীক্ষাও হল এই।"[৬] রাজা মহারাজ বলছেন: "গুরু ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ এসকল প্রশ্নই আসিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মবিদ্‌, তিনিই গুরু, ব্রাহ্মণাদি উপাধি মাত্র।"[৭]

রাজা মহারাজ বলতেন: "ভগবদ্‌ বুদ্ধিতে গুরুর পূজা, গুরুর ধ্যান ও চিন্তা করতে করতে দেহ-মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন গুরু শিষ্যকে ইষ্ট দর্শন করিয়ে দিয়ে সরে যান। নায়ক-নায়িকার মিলনের কাজে যেমন একজন ঘটকের দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। গুরুবাক্যে ষোল আনা বিশ্বাস করে আন্তরিকভাবে তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।'··· গুরু সখীর ন্যায়; রাধাকৃষ্ণের মিলন হলে যেমন সখীর ছুটি, তেমনি জীব ও পরমাত্মার মিলন না হওয়া পর্যন্ত গুরু রয়েছেন শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে।"[৮]

"আচার্যবান্‌ পুরুষো বেদ"—যিনি উপযুক্ত আচার্য লাভ করেন তিনি তত্ত্বজ্ঞ হন।[৯] "আচার্য-

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।৯।২
৫ বিবেকচূড়ামণি, ৩৩
৬ শিবানন্দ-বাণী—স্বামী অপূর্বানন্দ, ২য় ভাগ (১৩৫৬), পৃঃ ১১৬
৭ গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ (১৯৮৭), পৃঃ ৩৩
৮ ব্রহ্মানন্দচরিত—স্বামী প্রভানন্দ (১৯৮২), পৃঃ ২৬৫
৯ ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৬।১৪।২

ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ।"—আচার্যের থেকে বিদ্যা লব্ধ হলে বিদ্যা উৎকৃষ্ট ফল দান করে।[১০] শংকরাচার্য বলছেন: "আচার্যাধীনং জ্ঞানং, জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ ইতি সিদ্ধম্।"[১১] জ্ঞান আচার্যধীন। অর্থাৎ আচার্যের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং সেই জ্ঞান থেকেই মোক্ষ লাভ হয়। এটি প্রমাণিত।

মঠে প্রাচীন সাধুরাও বলেন: "আচার্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা অধিকোবলবত্তরা ভবতি।"—আচার্য হইতে বিদ্যা লব্ধ হইলে অধিক বলশালী হয়। 'কেন হয়?' কারণ, আচার্য যে বিষয় শিষ্যকে শিক্ষা দেন তা তিনি নিজ জীবনে আচরণ করেন।

এখানেই সদ্‌গুরুর সঙ্গে সাধারণ গুরুর তফাৎ। সদ্‌গুরু, "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" ফলে তিনি যা উপদেশ দেন তা শিষ্যের হৃদয় স্পর্শ করে, তাকে অনুপ্রাণিত করে উপদেশ পালন করার জন্য। আর সাধারণ গুরু প্রায়ই মুখে যা বলেন কাজে করেন ঠিক তার বিপরীত।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তখন মঠের অধ্যক্ষ। কথা-প্রসঙ্গে একদিন জনৈক সাধুকে বললেন: "আজকাল সবাই উপদেশ দিতে ব্যস্ত, উপদেশের সঙ্গে জীবনের কতটুকু মিল আছে ভেবে দেখবার সময় নেই। তেমন উপদেশে কাজ হয় না। প্রথমে ধর্মজীবন গঠন করা চাই। কথা আর কাজে মিল থাকলে তবে অপরে নেবে, নচেৎ নেবে না।" শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট করে বলছেন: "কথায় এবং কার্যে, মন ও মুখে যাহার মিল নাই, তাহার কথায় কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।"[১২] এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের একটি সুন্দর গল্প আছে। গল্পটি লীলাপ্রসঙ্গকার এরূপে বর্ণনা করেছেন, "কোন ব্যক্তির স্বল্পবয়স্ক পুত্র সর্বদা অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইত। পিতা তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে গ্রামান্তরে এক বিখ্যাত বৈদ্যের নিকট একদিন লইয়া যাইল। বৈদ্য বালককে পরীক্ষাদি করিয়া তাহার রোগ নির্ণয় করিলেন, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থা সেদিন না করিয়া তাহাকে পরদিবস পুনরায় আসিতে বলিলেন। পিতা পুত্রকে লইয়া ঐ দিন উপস্থিত হইলে বৈদ্য বালককে বলিলেন, 'তুমি গুড় খাওয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে, ঔষধ খাইবার প্রয়োজন নাই।'—পিতা ঐ কথা শুনিয়া বলিল, 'মহাশয় ঐ কথা তো কাল বলিলেই পারিতেন; তাহা হইলে এতটা পথ কষ্ট করিয়া আজি এতদূর আসিতে হইত না!' বৈদ্য তাহাতে বলিলেন, 'কি জান, কল্য আমার এখানে কয়েক কলসি গুড় ছিল—দেখিয়াছিলে বোধ হয়। কাল যদি বালককে গুড় খাইতে নিষেধ করিতাম, তাহা হইলে সে ভাবিত, কবিরাজ লোক মন্দ নয়, নিজে এত গুড় খাইতেছে আর আমাকে কিনা গুড় খাইতে নিষেধ করিতেছে। ঐরূপ ভাবিয়া সে আমার কথায় শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক্ কিছুমাত্র বিশ্বাস করিত না। সেজন্য গুড়ের কলসি সরাইবার পূর্বে তাহাকে ঐকথা বলি নাই।"[১৩]

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে সকলেরই কি 'গুরুকরণ' করা দরকার? 'গুরু' ছাড়া কি ধর্ম হয় না? এই যে এত ধর্মের বই আছে এগুলি পড়ে নিজের মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি-বিবেচনা করে যদি চলি তাহলে কি ধর্মলাভ হবে না? উত্তরে বলতে হয়: কিছু ধর্মলাভ হবে ঠিকই তবে ভগবানলাভ অসম্ভব। যাঁরা যথার্থই ধর্মজীবন যাপন করতে চান, আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করতে চান, জীবনে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হতে চান তাঁদের প্রত্যেকেরই গুরুকরণ অবশ্য কর্তব্য। এ-প্রসঙ্গে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন, "জেনো, ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ রাজপথ নয়, ক্ষুরের ধারের ন্যায়ই শাণিত দুর্গম সেই পথ। এ পথে আছে সহস্র বাধা, সহস্র বিপর্যয়; শত শত প্রলোভন, মোহিনীমায়া তোমায় হাতছানি দিয়ে কতবার ডাকবে; কত মিথ্যা আশা, অলীক মরীচিকা তোমায় বিভ্রান্ত করবে; শ্বাপদসংকুল এই গহন অরণ্যপথে একক যাত্রী, তোমার পথ হারাবার কতই না সম্ভাবনা! একলা পথিক ঐপথে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়—ধর্মের গূঢ় রহস্য যে গহনে

১০ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।৯।৩
১১ অজ্ঞানবোধিনী ৪০
১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৩৭৯): দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃ: ২০০
১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ: দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃ: ২০০-২০১

নিহিত তারই উদ্দেশ্যে। যুক্তিবিচার সহায়ে দীপ্ত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বহুতর বৃদ্ধি করেও সে অন্ধকার দীর্ণ করা যায় না। বহু মহাত্মা, মহাপ্রাণ সাধক এরূপ প্রয়াস করে বিফল হয়েছেন। আত্মা শুধু অপর আত্মার স্পর্শে জেগে ওঠে, অন্য কিছুতেই সে সাড়া দেয় না। আধ্যাত্মিক পথে এরূপ সহায়তা একান্ত প্রয়োজন··· সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে যে এসেছে, সে ধন্য হয়ে গিয়েছে, জীবনে তার স্বর্ণদ্যুতি ঝলকে উঠছে। সদ্‌গুরুর দিব্যস্পর্শে চৈতন্যলাভ হয়, অন্তরের সকল বাধা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, পবিত্র ও নির্মল হয়ে ওঠে সেই অশেষ ভাগ্যবান। যে ব্যক্তি এই দিব্যস্পর্শ সঞ্চার করতে পারেন, তিনিই সদ্‌গুরু। তাঁর মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত। তাঁর আদেশ বেদবাক্য বলে শিরোধার্য করতে হবে। তাঁর করুণায় সাধকের মোক্ষলাভের তরণী। জন্ম-মৃত্যুর ভয়াল অপার মহাসাগর পারাপারের পথে তিনিই একমাত্র আলোক-সঙ্কেত, তিনি একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রতি ভক্তি বিনা, অশেষ দীনতা এবং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ বিনা ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি লাভ করা অসম্ভব। একমাত্র নিষ্ঠাসহকারে গুরুপাদপদ্ম সেবা করে সাধক আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। অবশ্য তাঁকে সিদ্ধগুরু হতে হবে, যিনি নিজে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হয়েছেন। নতুবা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় গুরু-শিষ্য উভয়েরই পতন ঘটবে।"[১৪] ঠাকুর বলছেন: "যদি সদ্‌গুরু হয়, তাহলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হ'লে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।" আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে··· যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম কি হয়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধ'রেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপ ধরতো, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো। এ একটা ঢোঁড়ায় ধ'রেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।"[১৫] বস্তুতঃ সদ্‌গুরু একবার যাকে আপনার বলে গ্রহণ করেন তার সব দায়িত্বই তিনি নেন। একবার গ্রহণ করলে তাকে আর ছাড়েন না। আশ্রিত ছেড়ে যেতে চাইলেও তিনি ছাড়েন না। ঠাকুরের ভক্ত গিরিশবাবু ঠাকুরকে সব দিয়েছেন। তাঁর ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, দেহ-মন সবই ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছেন। ঠাকুরও গিরিশের দেওয়া 'বকলমা' গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেন নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হতে পারছেন না। পূর্ব-সংস্কারের প্রভাবে বিচলিত হয়ে পড়ছেন। ঠাকুর তখন তাঁকে অভয় দিয়ে বলছেন: "এ কি ঢোঁড়া সাপে তোকে ধরেছে রে শালা? জাত সাপে ধরেছে —পালিয়ে বাসায় গেলেও মরে থাকতে হবে! দেখিস্‌নে? ব্যাঙগুলোকে যখন ঢোঁড়া সাপে ধরে, তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ ক'রে হাজার ডাক ডেকে তবে ঠাণ্ডা হয় (ম'রে যায়), কোনটা বা ছাড়িয়ে পালিয়েও যায়; কিন্তু যখন কেউটে গোখ্‌রোতে ধরে, তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ তিন ডাক ডেকেই আর ডাক্‌তে হয় না, সব ঠাণ্ডা। যদি কোনটা দৈবাৎ পালিয়েও যায় তো গর্তে ঢুকে মরে থাকে।—এখানকার সেরূপ জানবি।"[১৬]

স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "স্বামীজী যদি আমার পতন হয়?" প্রশ্ন শুনে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, "হাজার পতন হোক, কিছু এসে যায় না। আমারই সে দায়িত্ব, আমিই তোমাকে বেছেছি, তুমি আমাকে বাছোনি।" একবার স্বামী প্রেমানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেন, "বাবুরাম, আমার চেলারা যদি হাজারবার নরকে

১৪ অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৩৬৩) পরিশিষ্ট (ক)—প্রবন্ধ, পৃঃ ৫১

১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।৪।৫

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৩৭৯) গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ২২২

যায়, তাহলে আমিই তাদের হাজারবার হাত ধরে তুলব। তা যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুর-আদি সব মিথ্যা জানবি।"[১৭]

তন্ত্র বলছেন :

"গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিং চ মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥"[১৮]

—গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে, ইষ্টমন্ত্রকে অক্ষরমাত্র ভাবলে, দেবদেবীর প্রতিমাকে পাথর বা মৃত্তিকা জ্ঞান করলে মানুষ নরকে যায়। অর্থাৎ ঐসবে ভ্রমাত্মক ও বিপরীত বুদ্ধির জন্যে এবং শ্রদ্ধা-বিশ্বাসহীনতাদোষে আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হয়ই না, বরং মানুষকে অধোগতি পেতে হয়।

"গুরুকে মানুষবুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন।"[১৯] ঠাকুর বলেছেন। আবার বলছেন : "সচ্চিদানন্দই গুরু"[২০] অর্থাৎ গুরু হলেন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, ভগবান। এক্ষেত্রে কেউ বলতে পারেন,'তাহলে ভগবানকেই শ্রদ্ধাভক্তি করলেই হল, দীক্ষাগুরুকে শ্রদ্ধাভক্তি ও পূজা করবার কি দরকার? দীক্ষাগুরু তো আমাকে ভগবানের পাদপদ্মে সঁপে দিয়েছেন। দীক্ষাগুরু তো আর আসল গুরু নন, তিনি হলেন একটা মাধ্যম। আসল গুরু তো ভগবান।'

এর উত্তরে লীলাপ্রসঙ্গকার সুন্দর কথা বলছেন : "শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে ভাবরূপে মানবমনের সকল প্রকার অজ্ঞান-মলিনতা দূর করেন, সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি। ঐ ভাবকেই শাস্ত্র গুরু নামে নির্দেশ করিয়াছেন ও মানবকে উহার প্রতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সবেমাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ-প্রকার মানব-মন তো আর একটা অশরীরী ভাবকে ধরিতে, ছুঁইতে, ভালবাসিতে পারে না;—এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, দীক্ষাদাতা মানবকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে। সেজন্য যাঁহারা বলেন, আমরা গুরুভাবটিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু যে দেহটা আশ্রয় করিয়া ঐ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাকে মান্য-ভক্তি কেন করিব,—ঐ ভাব তো আর তাঁহার নহে?—তাঁহাদিগকে আমরা বলি—'ভাই, করিতে পার কর, কিন্তু দেখিও যেন নিজের মনের জুয়াচুরিতে ঠকিতে না হয়, শক্তি বা ভাব এবং যদবলম্বনে ঐভাব প্রকাশিত থাকে, তদুভয়কে কখনও তো পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে দেখ নাই, তবে কেমন করিয়া আগুন ও আগুনের দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ করিয়া একটিকে গ্রহণ ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে এবং অপরটিকে ত্যাগ করিবে, তাহা বলিতে পারি না।' যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে সে প্রেমাস্পদের ব্যবহৃত অতি সামান্য জিনিসটাকেও হৃদয়ে ধারণ করে। তাঁহার স্পর্শিত কোন ফুল বা কাপড়-চোপড়খানাও সে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যান, সেখানকার মাটিটাও তাহার কাছে বহু মূল্যবান ও বহু আদরের জিনিস বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে শরীরটাতে অবস্থান করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে কৃপা করেন, সেটার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি হইবে—এটা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যাহারা গুরুভাবটি কি তাহাই বুঝে না, তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। আর যাহার গুরুভাবের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হইবে তাহার ঐ ভাবের আধার গুরুর শরীরটার উপরেও ভক্তি-শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই হইবে।··· গুরু অনেক নহেন, এক। আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে ঈশ্বরের ঐ ভাব প্রকাশিত হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক্ নহেন—ভাবরূপে এক। মৃন্ময় মূর্তিতে দ্রোণকে আচার্যরূপে গ্রহণ ও ভক্তিপূর্বক একলব্যের ধনুর্বেদ লাভরূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক-ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়াও অনেক সময় সাধন-সাপেক্ষ; এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেও, যতক্ষণ মানবের নিজের দেহবোধ থাকে, ততক্ষণ যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাহাকে

১৭ স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ, (১ম প্রকাশ) পৃঃ ২০৪ ১৮ কুলার্ণবতন্ত্র, উঃ ১২
১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫। পরি. ।৬।১
২০ ঐ, ৫।৫।১

কৃপা করেন সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।"[২১]

গুরুকে 'ভবরোগবৈদ্য' বলা হয়েছে। সদ্গুরু যথার্থই 'ভবরোগবৈদ্য'। শরীরে কোন রোগ হলে সেই রোগের চিকিৎসা ডাক্তারেরা করতে পারেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা ডাক্তারেরা করবেন কি করে? সে-রোগের চিকিৎসা করা ডাক্তারের একেবারে অসাধ্য; কেননা এপথের পথিকই তিনি নন। 'ভবরোগবৈদ্য' সদ্গুরুর কৃপা ও উপদেশ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আধ্যাত্মিক জীবনে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। যিনি সদ্গুরু তিনি এপথের বাধা-বিপত্তি যথাযথরূপে অবগত আছেন এবং কোন্ রোগের কি ওষুধ তা জ্ঞাত আছেন। তাই সাধকের সাধনরহস্য সম্বন্ধে কিছু জানার থাকলে তা গুরুর নিকটই জানা বিধেয়। এ-প্রসঙ্গে আমরা স্বামী বিরজানন্দের জীবনের একটি ঘটনা পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি।

বিরজানন্দ মহারাজ তখন অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী হয়ে আছেন মায়াবতীতে। কয়েকমাস আগে তিনি স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ শুনেছেন। মন ভাল নেই। কিছুদিন কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে নির্জনে সাধন-ভজনে কাটাবেন ঠিক করলেন। "কালীকৃষ্ণকে (স্বামী বিরজানন্দকে) আশ্রমে আদৌ আসিতে হইত না। [আশ্রম থেকে একটু দূরে একটি কুঠিয়াতে তিনি থাকতেন] তিনি কাহারও সহিত না মিশিয়া একান্তে প্রাণ ভরিয়া কঠোর সাধনায় মগ্ন হইলেন। প্রত্যহ ১৪।১৫ ঘণ্টা জপধ্যান করিতেন। ৭।৮ মাস এইরূপ একটানা চলিবার পর অত প্রবল ধ্যান করার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তিনি একটু একটু মানসিক ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। যাহা হউক সংকল্প লইয়া যখন তপস্যায় লাগিয়াছেন তখন কিছুতেই ছাড়িবেন না—এই মনে করিয়া তিনি তাঁহার উক্ত জীবনধারা পরিবর্তন করিলেন না। যখন খুব অবসাদ ঠেকিত তখন শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে আরও কয়েক মাস কাটিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল, মস্তিষ্ক যেন একেবারে জড় হইয়া গিয়াছে। শরীর এবং মনে বিষম ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন একধাপে জপধ্যানের মাত্রা অতটা বাড়ানো সঙ্গত হয় নাই। তখন মৌনব্রত এবং কঠোরতা ত্যাগ করিয়া সকলের পরামর্শে পুষ্টিকর আহারাদি দ্বারা শরীর-মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইতে যত্নবান হইলেন। জপধ্যানের মাত্রা কমাইয়া দিয়া পড়াশুনা লইয়া থাকিতেন। কিন্তু এইরূপ করিয়াও বিশেষ কিছু উপকার বোধ করিলেন না। মাথার অসুখ বাড়িয়াই চলিল। সকলে কলিকাতায় গিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করিবার পরামর্শ দিলেন··· মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির নিকট পাঠাইয়া সুচিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিন চার মাস গেল। সেই মস্তিষ্কের দুর্বলতা ও শরীরের অবসাদ কিন্তু কাটে না। রাজা মহারাজ এবং মঠস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসীরা কালীকৃষ্ণের জন্য খুব চিন্তিত হইলেন।

"১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। কালীকৃষ্ণের খুব ইচ্ছা হইল জয়রামবাটী গিয়া একবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া আসেন। পাঁচ বৎসর তাঁহাকে দেখেন নাই। রাখাল মহারাজ অনুমতি দিলেন।

"দশ বৎসর পূর্বে ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কালীকৃষ্ণের শরীর যখন শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল মা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। এবারও ঐরূপ চমকিত হইলেন। কিন্তু অন্তর্যামিণী দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন ইহা দেহের ব্যাধি নয়। জিজ্ঞাসা করিলেন—ধ্যান কোথায় কর? হৃদয়ে না সহস্রারে?—সহস্রারে, কেননা ওখানে ধ্যান করতে ভাল লাগে। খুব আনন্দ পাই।

"শুনিয়া মা আবার শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—বাবা করেছ কি? ও যে শেষ অবস্থার কথা—পরমহংস অবস্থার কথা। একেবারেই কি অত উঁচুতে মনকে রাখতে পারা যায়? প্রথমে একবার মনকে মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে নামিয়ে এনে সেখানে ইষ্টের ধ্যান করতে হয়।

২১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১৩৭৭), গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১৪-১১৯

"এত চিকিৎসা, নিয়মপালন, পথ্যাদি যাহা করিতে পারে নাই শ্রীশ্রীমায়ের এই সামান্য বিধানে তাহা সম্ভবপর হইল। কয়েকদিন ধ্যানের প্রণালী বদলাইয়া কালীকৃষ্ণ অদ্ভুত উপকার বোধ করিতে লাগিলেন। জীবনের অপরাহ্ণে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিরজানন্দজী গভীর আবেগের সহিত বলিয়াছিলেন—সিদ্ধগুরুর দরকার এই জন্যেই। মায়ের এই উপদেশ যদি না পেতুম তা হলে হয়তো জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতো, চিররুগ্ন থাকতুম অথবা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতো।"[২২]

গুরুকে 'দেশিক' নামেও অভিহিত করা হয়। 'দে', 'শি' ও 'ক' এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত 'দেশিক' শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেবতা, শিষ্য এবং করুণা এই তিন শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে 'দেশিক' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

"দেবতারূপধারিত্বাচ্ছিষ্যানুগ্রহকারণাৎ।
করুণাময়মূর্তিত্বাদ্দেশিকঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥"[২৩]

—(শিব পার্বতীকে 'দেশিক' শব্দের অর্থ বলছেন) যিনি দেবরূপধারী অর্থাৎ যাঁর চরিত্র দেবতার তুল্য, যিনি শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং যিনি করুণাময়মূর্তি, তিনিই দেশিক।

গীতাতে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন ঃ

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"[২৪]

—(অর্জুন, এতক্ষণ ধরে তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বললাম এখন সেই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় তোমাকে বলছি, তুমি শোন।) তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত, তত্ত্বসম্বন্ধে বারংবার প্রশ্ন এবং গুরুসেবার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। (তোমার সেবায় প্রসন্ন হয়ে) তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেবেন।

"ব্রহ্মবিদ্ আচার্য পরিচর্যা ঈশ্বরসেবা হইতেও অধিক ফলপ্রদ। ঈশ্বরসেবা অদৃষ্টফলপ্রদ, কিন্তু আচার্যসেবা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—উভয়বিধ ফলপ্রদ। গুরুর উপর নির্ভর না করিলে জ্ঞান পরিপক্ব হয় না। ঈশ্বরসেবা পুণ্যোৎপত্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ অদৃষ্ট ফলদান করে। আচার্যসেবা ঐ অদৃষ্ট ফল প্রদান করে এবং আচার্যের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া উপদেশরূপ দৃষ্ট ফলও প্রদান করে। পুনঃ, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। তিনি কর্মানুসারে জীবকে বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ আচার্য-কৃপা শিষ্যের কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষ-ফল প্রদান করে। এইরূপে আচার্যসেবা ঈশ্বরসেবা হইতেও অধিক ফলপ্রদ; সুতরাং মুমুক্ষুর সর্বতো-ভাবে তত্ত্বজ্ঞ আচার্যের পরিচর্যা করা একান্ত বিধেয়।"[২৫] এই কথাগুলিতে যেন তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনি ঃ "গুরোঃ প্রসাদমাত্রেণ শক্তি-তোষো মহান্ ভবেৎ। / শক্তি সন্তোষমাত্রেণ মোক্ষ-মাপ্নোতি সংবশী ॥"[২৬] —গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র শক্তির পরম সন্তোষ হয়। আর শক্তির সন্তোষ হওয়ামাত্র সাধক মোক্ষলাভ করেন।... গুরু প্রসন্ন হওয়ামাত্র সৎ শিষ্য মোক্ষলাভ করেন। শুধু গুরু-সেবার দ্বারা নিরক্ষরও দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঠাকুরের লাটু এবং শঙ্করাচার্যের গিরি।

গুরুর সেবা কি ভাবে করা উচিত সে-প্রসঙ্গে রাজা মহারাজ বলছেন ঃ "গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। ভাবতে হয় তাঁর দেহটা যেন মন্দির, তার ভিতরে ভগবানই রয়েছেন। এই ভাবে গুরু-সেবা করতে করতে গুরুতে প্রেমাভক্তি হয়। গুরুর প্রতি এই প্রেমাভক্তিই পরে আবার ভগবানের দিকে দেওয়া যায়। গুরুমূর্তি সহস্রারে (মস্তকে) ধ্যান করে তারপরে সেখানে গুরুকে ইষ্টেতে লয় করতে হয়। ঠাকুর বেশ বলতেন, 'গুরু এসে ইষ্ট দেখিয়ে বলেন, ঐ তোমার ইষ্ট। তারপর গুরু ইষ্টে লয় হয়ে যান।' গুরু তো ইষ্ট ছাড়া নন।"[২৭]

প্রশ্ন হতে পারে, 'যখন গুরু স্থূল শরীরে বর্তমান আছেন, তখন না হয় তাঁর সেবা করলাম। কিন্তু যখন তিনি স্থূল শরীরে থাকবেন না—তখন

২২ অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (১৩৬৩), পৃঃ ১৩৮—১৪১
২৩ কুলার্ণবতন্ত্র, উঃ ১৭
২৪ গীতা, ৪।৩৪
২৫ 'বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ (১৩৭৩), পৃঃ ১১৮-১১৯
২৬ রুদ্রযামলতন্ত্র, উঃ পাঁর. ১
২৭ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৩১০), পৃঃ ১৪

কি করে গুরুর সেবা করব?' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন স্বামী বিরজানন্দ: "গুরুপদিষ্ট পন্থা নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করাই তাঁর যথার্থ সেবা করা। তাতেই তিনি সব চেয়ে বেশি প্রীত হন।"[২৮]

এখন অধিকারীর প্রশ্ন। আমরা যথার্থ ধর্ম-লাভ করার উপযুক্ত কি না? সদ্গুরুর কৃপা (শক্তি) হৃদয়ে ঠিক ঠিক ধারণা করার যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা। ধরা যাক পাশাপাশি দুটি জমি আছে। তার মধ্যে একটি জমিতে ভাল করে লাঙ্গল দিয়ে ইট, পাথর, আগাছা সাফ করে, জল, সার প্রভৃতি দিয়ে মাটি তৈরি করা আছে। আর অপর জমিটাতে না আছে জল, না আছে সার। আছে শুধু ইট, পাথর ও আগাছাতে ভরা। এখন একজন চাষী খানিকটা ভাল বীজ এনে দুটো জমিতেই ছড়িয়ে দিলে। কিছুদিন পরে দেখা গেল, যে-জমিটাতে আগে থেকেই জল, সার ইত্যাদি দিয়ে মাটি তৈরি করা ছিল তাতে বেশ ভাল গাছ বেরিয়েছে। কিন্তু অন্যটাতে গাছের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। চাষী ভাবল, কি ব্যাপার? এতগুলো ভাল ভাল বীজ সব নষ্ট হল নাকি? সামনে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল যে-জমিটাতে গাছের কোন চিহ্ন নেই সেখানে বীজের অধিকাংশই পড়েছে ইট পাথরের উপরে। সেগুলো সব শুকিয়ে গেছে। আর যদিও বা কতকগুলোর অংকুর হয়েছিল আগাছাগুলোর চাপে তারা মরে গেছে। তার উপর মাটিতে না আছে জল, না দেওয়া হয়েছে সার।

একই চাষী এবং একই বীজ। কিন্তু মাটি তৈরির তারতম্য অনুসারে ফল হল ভিন্ন। সেরকম একই গুরু এবং একই মন্ত্র যিনি মুমুক্ষু বা অধিকারী তাঁর জীবনে মোক্ষফল উৎপন্ন করে তাঁকে মুক্ত করে। আর যিনি সংসারকামী তাঁকে সংসার প্রদান করে তাতে বদ্ধ করে। একই আলো—কাকেও ভাগবত পাঠ করতে সাহায্য করে, আবার কাকেও বা দলিল জাল করতে সাহায্য করে। যে যেমনভাবে ব্যবহার করে সে সেরূপেই ফল পায়। 'যার যেমন মন লয় সে তেমন'।

ছান্দোগ্য উপনিষদে 'ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি-সংবাদ'-এ আমরা দেখি, একই উপদেশ গুরু দু'জন শিষ্যকে দিলেন। কিন্তু বিরোচন, যিনি অসুররাজ তাঁর মন, বুদ্ধি মলিন ও অশুদ্ধ। তাই তিনি দেহকেই আত্মা মনে করে ফিরে এলেন। অশুদ্ধ বুদ্ধির দোষে তাঁর মনে পুনর্বার আর বিচার এল না। তিনি দেহের সুখ-ভোগেই রত রইলেন। কিন্তু ইন্দ্র, যিনি দেবরাজ, তাঁর মন, বুদ্ধি বিরোচন অপেক্ষা অনেক বেশি শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম। তাই তাঁর মনে বিচার উপস্থিত হল। তিনি পুনর্বার যথার্থ তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হয়ে গুরু সমীপে উপস্থিত হলেন এবং অধিকতর নিষ্ঠা ও সাধনার ফলে সংস্কৃত হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করলেন।

তাই তো আমরা দেখতে পাই, গীতার শেষে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন:

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম॥[২৯]

—মহারাজ, যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাণ্ডীব-ধারী অর্জুন সেই পাণ্ডবপক্ষে রাজ্যশ্রী, বিজয়, অভ্যুদয় ও অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজ করে, ইহা আমার নিশ্চিত অভিমত।

অন্যপক্ষে বলা যায়, যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মতো গুরু জ্ঞানদাতা এবং গুড়াকেশ অর্জুনের মতো দুর্লভ অধিকারী সেই জ্ঞানের গ্রহীতা সেখানেই বিজয় অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ মহৎ ফল সাধিত হয়। সাধক হন কৃতকৃত্য। উপনিষদের ভাষায় "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।"[৩০]

২৮ পরমার্থ-প্রসঙ্গ (১৯৮৬), পৃঃ ১৭

২৯ গীতা, ১৮।৭৮

৩০ মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮

গুরু

হরিপদ আচার্য

মানবসভ্যতার বিকাশের আদিকাল থেকেই শিক্ষাজগতে বিশেষ করে আধ্যাত্মিক-শিক্ষাজগতে গুরু একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। গ্রন্থাদি পড়ে যে লৌকিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায় তা দিয়ে জাগতিক জ্ঞান যদিও কিছু লাভ করা যায়, কিন্তু আত্মিক শিক্ষা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গুরু পরম্পরা-ক্রমে একমাত্র গুরুকৃপা দ্বারাই শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে পারে। আর গুরুকৃপায় জ্ঞান লাভের পর শিষ্যের ঐকান্তিক সাধনা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আসে তার পরম সাফল্য। গুরুর অনুগ্রহে শিষ্যের হৃদয়ে পরম জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে শিষ্যকে করে অভিভূত। শাস্ত্র বলেন, এ পরম জ্ঞান পাঠ-প্রবচন, তীক্ষ্ন মেধা বা পুরাণাদি শ্রবণ প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারাই লাভ করা যায় না: "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"[1] গুরুর অনুগ্রহের ফলেই শিষ্যের হৃদয়ে সকল প্রকার জ্ঞানের উদয় হতে পারে। এপ্রসঙ্গে মহাভারতে উল্লিখিত গুরু-মাহাত্ম্য উপাখ্যানটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

মানবসভ্যতার বিকাশের আদিকাল থেকেই শিক্ষাজগতে বিশেষ করে আধ্যাত্মিক-শিক্ষাজগতে গুরু একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। গ্রন্থাদি পড়ে যে লৌকিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যায় তা দিয়ে জাগতিক জ্ঞান যদিও কিছু লাভ করা যায়, কিন্তু আত্মিক শিক্ষা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান গুরু পরম্পরা-ক্রমে একমাত্র গুরুকৃপা দ্বারাই শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে পারে। আর গুরুকৃপায় জ্ঞান লাভের পর শিষ্যের ঐকান্তিক সাধনা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আসে তার পরম সাফল্য।

গুরু ধৌম্যদেবের তিন শিষ্য—আরুণি, উপমন্যু ও বেদ। আচার্য ধৌম্য শিষ্যদের ধৈর্য, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি পরীক্ষা করার জন্য তিনজন শিষ্যের উপর তিনটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আরুণির উপর ছিল জমিতে আল বেঁধে জমির জল রক্ষা করার দায়িত্ব, উপমন্যুকে দিয়েছিলেন গো-পালনের দায়িত্ব আর বেদ গুরুর অনুপস্থিতিতে গুরুগৃহের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার পেয়েছিলেন। উপাখ্যানে দেখা যায় তিনজন শিষ্যই তিনভাবে গুরুর আদেশ অনুসারে তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে গুরুকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। গুরুর প্রসন্নতায় এবং আশীর্বাদেই তাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছিল। গুরু তাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককে আশীর্বাদ করেছিলেন: জগতের সকল জ্ঞানরাশি তোমার মধ্যে প্রতিভাসিত হবে—"সর্বে চ তে বেদাঃ ত্বয়ি প্রতিভাস্যন্তি।"[2] তারই ফলে তাদের অন্তরে সকল জ্ঞানের উদয় হয়েছিল। গুরু প্রসন্ন হলে শিষ্যের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করেই জ্ঞানোদয় হতে পারে। যেমন হয়েছিল আচার্য ধৌম্যের শিষ্যদের। এমনকি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর বয়স বিচারেরও প্রয়োজন হয় না বলে শাস্ত্র বলেছেন। আচার্য শংকর তাঁর দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন।

একটি বটগাছের নিচে একজন যুবকগুরু মৌনাবস্থায় ধ্যাননিমগ্ন। মুমুক্ষু এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু বয়োবৃদ্ধ শিষ্যগণ একজন একজন করে শান্ত সমাহিতভাবে সেখানে এসে চুপ করে বসছেন। গুরু প্রসন্নমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন আর শিষ্যদের মনের সকল সংশয় দূর হয়ে তাদের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হচ্ছে। গুরু মৌন থেকেই তাদের কাছে সব জিজ্ঞাসার সমাধান করে তাদের মনের সব সংশয় দূর করে দিচ্ছেন। কী আশ্চর্য সে ঘটনা!

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥[3]

শাস্ত্র তাই মুক্তিকামিগণকে তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে উপস্থিত হয়ে পরম জ্ঞান লাভ

১ কঠ উপনিষদ্, ১।২।২৩

২ মহাভারত, আদিপর্ব, ৩য় অধ্যায়

৩ দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্, ১২

করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন : "প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।"[৪] স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধে বলেছেন : "'গুরু বিনু জ্ঞান নাহি'; শিষ্য পরম্পরায় ঐ জ্ঞানবল গুরু মুখ হইতে না আসিলে, গুরুর কৃপা না হইলে আর উপায় নাই।"[৫]

সাধনার পথ অতি দুরূহ। ক্ষুরের ধারের মতো ধারালো সে-পথ—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা।"[৬] খুব সাবধানে সে পথে চলতে হয়, অতি কষ্টে অতিক্রম করতে হয় দুর্গম সেই পথ—"দুর্গং পথস্তৎ।"[৭] তা না হলে প্রতি পদক্ষেপে থাকে পতনের সম্ভাবনা। দুর্গম গিরিপথে যেতে হলে যেমন পথপ্রদর্শক অপরিহার্য, আধ্যাত্মিক পথে চলতেও তেমনি পথপ্রদর্শক গুরু ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। "নান্যঃ পন্থাঃ।"[৮] গুরুপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে জিতেন্দ্রিয় হয়ে শান্ত ও একাগ্রমনে যথার্থ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভের ইচ্ছায় যে সাধনায় নিরত হয় মুক্তি তার করতলগত এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাধনার পথ অতি দুরূহ। ক্ষুরের ধারের মতো ধারালো সে পথ—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা।" খুব সাবধানে সে পথে চলতে হয়, অতি কষ্টে অতিক্রম করতে হয় দুর্গম সেই পথ—"দুর্গং পথস্তৎ।" তা না হলে প্রতি পদক্ষেপে থাকে পতনের সম্ভাবনা। দুর্গম গিরিপথে যেতে হলে যেমন পথপ্রদর্শক অপরিহার্য, আধ্যাত্মিক পথে চলতেও পথপ্রদর্শক গুরু ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। "নান্যঃ পন্থাঃ।"

পরম জ্ঞানলাভের তিনটি উপায়ও গুরুকে আশ্রয় করেই—শাস্ত্রে এরূপ নির্দেশিত হয়েছে। প্রথমতঃ, পরম শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর নিকট এসে পরমদেবতা জ্ঞানে তাঁর কাছে প্রণত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞেয় বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন—যেমন 'আমি কে?' 'আমার বন্ধন-দশা কেন?' 'কিভাবে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়?' 'বিদ্যা কি?' 'অবিদ্যাই বা কি?' ইত্যাদি বিনীতভাবে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তৃতীয়তঃ, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর সেবা-যত্ন করে তাঁকে প্রসন্ন করতে হবে। গুরুকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা ব্রহ্মকে জানতে হয়—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"[৯]

অধ্যাত্মপথের সাধকগণ গুরুকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে অধ্যাত্মপথ এবং অধ্যাত্মপথের সাধকের সাথে গুরুর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। গুরু অধ্যাত্মপথের একমাত্র পথপ্রদর্শক অধ্যাত্মরস-সিন্ধুতে গুরুই একমাত্র কর্ণধার। গুরুকৃপা ছাড়া সাধকের অন্তরে অধ্যাত্ম-আকুতির বীজ সঞ্চারিত বা রোপিত হতে পারে না এবং ইষ্টপ্রেম গুরুকৃপা-বারি সিঞ্চন ছাড়া অঙ্কুরিত হতে পারে না। আচার্যদের সিদ্ধান্তে গুরুকে স্বয়ং ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতে ভগবান বলেছেন : "আচার্যকে আমি বলে জানবে। কখনও তাঁর অবমাননা করবে না। মানুষ মনে করে তাঁর প্রতি অসূয়া দেখাবে না। কারণ গুরু সর্বদেবময়।

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥"[১০]

শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেও এ মতের অনুরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে : "গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর এবং গুরুই পরব্রহ্ম। সেই গুরুকে প্রণাম।"

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"[১১]

এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন : "সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়।"[১২]

গুরু সম্বন্ধে এরূপ ধারণা প্রায় সব সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। তবে যাঁরা গুরু আর ইষ্টদেবতাতে

৪ কঠ উপনিষদ্‌, ১।৩।১৪
৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১৩৬৯), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৮
৬ কঠ উপনিষদ্‌, ১।৩।১৪
৭ ঐ
৮ শুক্লযজুর্বেদ উত্তরনারায়ণম্‌, ১৮
৯ গীতা, ৪।৩৪
১০ ভাগবত, ১১।১৭।২৭
১১ বিশ্বসারতন্ত্র : গুরুগীতাস্তোত্র, ২৬
১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।৮।২

অভেদ স্বীকার করেন না, তাঁরা উভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করলেও গুরুকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ঈশ্বরের আভাস বলে স্বীকার করেন। তাই তাঁরাও ধর্মচর্চার সময় গুরুকে সকলের আগে স্থান দিয়েছেন। মন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে ইষ্টপূজার আগে গুরুপূজার বিধান দিয়েছেন। তাঁদের মতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: 'প্রথমে গুরুর পূজা, তারপরে আমার অর্চনা করা উচিত" :

"প্রথমস্তু গুরুঃ পূজ্যঃ ততশ্চৈব মমার্চনম্।"[১৩]

স্বামীজী বলেছেনঃ "সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।"[১৪]

শাস্ত্রে গুরুর এরূপ মাহাত্ম্য দেখে সহজেই মনে হতে পারে, কোন সাধারণ ব্যক্তি এরূপ গুরু হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। যদিও মন্ত্রদাতা মাত্রকেই গুরু বলা হয়েছেঃ "গুরুঃ মন্ত্রদাতা"[১৫] তবু গুরুকে বিশেষ গুণসম্পন্ন হতে হয়। যে-গুরু নিজ সাধনা দ্বারা মন্ত্রকে সিদ্ধ করে নিয়েছেন তাঁর মন্ত্রই শিষ্যের পক্ষে হয় কল্যাণকর। কারণ গুরুই মন্ত্রের মূল। এপ্রসঙ্গে কালিকা পুরাণের উক্তিটি স্মরণ করা যায়। সেখানে বলা হয়েছেঃ "গুরু হলেন মন্ত্রের মূল আর সে মূল শুদ্ধ, পবিত্র এবং সদাচারী হলেই সর্বদা শুভকর হয়।" "গুরুর্মন্ত্রস্য মূলং স্যাম্মূলশুদ্ধৌ সদাশুভম্।"[১৬] সদ্‌গুরু সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কুলার্ণবতন্ত্রে পাওয়া যায় ভগবান শিব পার্বতীকে বলছেনঃ "হে দেবি, প্রদীপ দর্শন করা মাত্রই যেমন অন্ধকার দূর হয়ে আলোর প্রকাশ দেখা যায়, তেমনি সদ্‌গুরুর দর্শনমাত্র পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

দীপদর্শনমাত্রেণ প্রণশ্যতি তমো যথা।
সদ্‌গুরোর্দর্শনাদ্দেবি তথা জ্ঞানং প্রকাশতে॥"[১৭]

স্বামীজী 'বিবেকচূড়ামণি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ "যিনি বিদ্বান্, নিষ্পাপ ও কাম-গন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু।"[১৮] অগস্ত্যসংহিতায় গুরুর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ "যিনি দেবতার উপাসক, শান্ত, কামিনীকাঞ্চনে বীতস্পৃহ, প্রকৃতি-পুরুষ এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, যন্ত্র (সাধনরহস্যচক্র) এবং মন্ত্রাদির মর্ম ও রহস্য বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত তিনিই সদ্‌গুরু।

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষু চ নিস্পৃহঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্মবেত্তা রহস্যবিৎ॥"[১৯]

বৈষ্ণবাচার্য নরহরি গোস্বামী তাঁর বোধসার গ্রন্থে লিখেছেনঃ "যাঁদের দর্শনমাত্র মোক্ষলাভের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়, যাঁদের কথার মাধুর্যে ধর্মবিষয়ে সকল সংশয় দূরে যায় তাঁদেরই যথার্থ সাধু বলা হয়।

যেষাং দর্শনমাত্রেণ মোক্ষে শ্রদ্ধা বিবর্ধতে।
যেষাং চ বাগ্‌বিলাসেন সংশয়ো বিনিবর্ততে॥"[২০]

এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ, স্থিতধী সাধুরাই সদ্‌গুরু হতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেবও সেরকম নির্দেশই দিয়েছেনঃ

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥[২১]

এমন যে কৃষ্ণগতপ্রাণ বৈষ্ণব তাঁরাই তো যথার্থ সদ্‌গুরু হওয়ার যোগ্য। এপ্রসঙ্গে বিষ্ণুস্মৃতির সিদ্ধান্তটি স্মরণ করা যেতে পারেঃ "যে-সাধক শিষ্যের কাছে কোনরূপ সেবা-শুশ্রূষা বা যশঃলাভ করতে ইচ্ছা করেন না, কৃপাপরায়ণ, সর্বজীবের উপকারের জন্য চেষ্টা করেন, সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা বর্জিত, মন্ত্রাদিতে সিদ্ধিলাভ করেছেন, সর্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী, পরমতত্ত্ব বিষয়ে কোনরূপ সংশয় দেখা দিলে তা খণ্ডন করতে এবং সমাধান করতে সক্ষম এবং আলস্যহীন তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি।"[২২] তাছাড়া তন্ত্রসার, আগম-সংহিতা, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি

১৩ শ্রীগুরুতত্ত্বকুসুমাঞ্জলিঃ—শ্রীভাগবতস্বামী, পৃঃ ৩
১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১৩৬১), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮
১৫ শব্দকল্পদ্রুমঃ গুরুবর্গ
১৬ কালিকাপুরাণম্, অধ্যায় ৫৪
১৭ কুলার্ণবতন্ত্রম্, উচ্ছ্বাস ১৩
১৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১৩৬১) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১
১৯ অগস্ত্যসংহিতা (দীক্ষা ও সাধনা), পৃঃ ৩৩
২০ বোধসার, সৎসঙ্গসুধা, শ্লোক-৪
২১ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, পরি ১৬শ
২২ বিষ্ণুস্মৃতি (দীক্ষা ও সাধনা), পৃঃ ৩৩

গ্রন্থে সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে গুরুর মুখ-নিঃসৃত মন্ত্রকে বলা হয়েছে শব্দব্রহ্ম আর গুরুকে বলা হয়েছে পরমেশ্বর।

'গুরু' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাস্ত্রে নানাভাবে দেখানো হয়েছে। উপদেশদানার্থবাচক 'গু' ধাতুর সাথে 'কু' প্রত্যয় যোগ হয়ে উপদেশ দাতা অর্থে, কখনওবা স্তবযোগ্য মহান অর্থে গুরু শব্দটি সাধিত হয়েছে। গুরু শব্দটির উভয় অর্থই কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি পরম জ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দেন তিনিই শ্রেষ্ঠ উপদেশ দাতা এবং শিষ্যের কাছে গুরু হলেন পরমদেবতা, স্তবযোগ্য, পরম পূজনীয় এবং মহান। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার থেকে যিনি জ্ঞানালোকে নিয়ে যান তিনিই গুরু। 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু' শব্দের অর্থ তার নিরোধক। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবারক হেতুই গুরু শব্দটি অভিহিত হয়ঃ

গু-শব্দ স্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রু-শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥[২৩]

গুরু অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে শিষ্যকে জ্ঞানালোকের সন্ধান দেন এবং শিষ্যের হৃদয়কেও সে আলোতে উদ্ভাসিত করেন। বিশ্বতন্ত্রসারের গুরুগীতাস্তোত্রে বলাহয়েছেঃ অজ্ঞানতার অন্ধকারে অন্ধ যে ব্যক্তি তার চক্ষু জ্ঞানের অঞ্জন-শলাকা দিয়ে যিনি উন্মীলিত করে দেন তিনিই প্রকৃত গুরু।

গুরু অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে শিষ্যকে জ্ঞানালোকের সন্ধান দেন এবং শিষ্যের হৃদয়কেও সে আলোতে উদ্ভাসিত করেন।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥[২৪]

মহানির্বাণতন্ত্রে গুরুকে "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" রূপে প্রণাম জানানো হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "গুরু সর্বপাপ বিনাশক, জ্ঞানদৃষ্টি প্রদর্শনকারী, ঐহিক সুখভোগ ও পারত্রিক মোক্ষ বিধায়ক, নরদেহধারী গুরু অজ্ঞানতার হরণকারী এবং পরব্রহ্মস্বরূপ।"[২৫] গুরু শব্দটি বিশ্লেষণ করে গুরুগীতায় তাঁকে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ বলেছেন। গুরুশব্দের প্রথম বর্ণ 'গু'। এর দ্বারা মায়াদিগুণভাসক ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণ 'রু' দ্বারা মায়া-ভ্রান্তিবিমোচক ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হয়েছে।[২৬] অর্থাৎ গুরু শব্দ দ্বারা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে একাধারে বুঝাচ্ছে। ভক্ত সগুণ ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম যাঁরই উপাসক হোক না কেন গুরুর শরণাপন্ন তাকে হতেই হবে।

শৈবগণ বিশ্বাস করেন, গুরু শিবরূপে সিদ্ধি দান করেন। তাঁরা বলেন, গ-বর্ণের অর্থ সিদ্ধি-দাতা, র-বর্ণের অর্থ পাপহরণকারী আর উ-বর্ণের অর্থ শিব। গ্+উ+র্+উ—এরূপ চারটি বর্ণের দ্বারা নিষ্পন্ন গুরু শব্দটিদ্বারা সিদ্ধিদাতা শিব ও পাপহারী শিবকে বুঝায়। বৈষ্ণবেরা গুরু আর হরিকে অভেদ মনে করেন। হরিভক্তিবিলাসে বলা হয়েছেঃ যা মন্ত্র তাই সাক্ষাৎ গুরু; যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি। গুরু যার প্রতি সন্তুষ্ট হন, হরি নিজেও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥[২৭]

এসকল আলোচনা থেকে সহজেই বলা যায়, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানীরাও গুরু এবং ইষ্টকে অভেদ মনে করেন। বিশ্বসারতন্ত্রের গুরু-মাহাত্ম্য বিষয়ক উক্তিগুলি এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। "শ্রীগুরুর চরণকমল সকল শ্রুতির শিরোমণিস্বরূপ, বেদান্তরূপ কমলের সূর্যস্বরূপ। তিনি চিদ্‌ঘনমূর্তি, সনাতন, শান্ত, জ্ঞানাতীত, নিরঞ্জন, বিন্দু-নাদ-কলা প্রভৃতির অতীত। সদ্‌গুরু আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে শিষ্যের বহুজন্ম প্রবাহিত কর্মধারা রুদ্ধ করেন এবং কর্মবন্ধনের ছেদন করেন। গুরু হলেন সর্বতত্ত্বের মূলতত্ত্ব, সকল তপস্যার সেরা তপস্যা, বিশ্বসংসারের অধিপতি এবং সর্ব

২৩ বিশ্বসারতন্ত্র : গুরুগীতাস্তোত্র, ২০
২৪ ঐ, ২৭
২৫ মহানির্বাণতন্ত্র, উল্লাস ৫
২৬ বিশ্বসারতন্ত্র : গুরুগীতাস্তোত্র, ১১
২৭ হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪০

জীবের আত্মাস্বরূপ। গুরুর শ্রীমূর্তিধ্যান হল সকল ধ্যানের মূল, তাঁর শ্রীচরণপূজা হল সকল পূজার মূল, তাঁর শ্রীমুখের বাক্য হল সকল মন্ত্রের মূল এবং তাঁর কৃপালাভ হল মুক্তির প্রধান উপায়।"[২৮] অর্থাৎ ভগবানলাভের উপায়ও তিনি। কারণ, স্বয়ং ভগবান যে তিনিই।

গুরুর শ্রীমূর্তিধ্যান হল সকল ধ্যানের মুল, তাঁর শ্রীচরণপূজা হল সকল পুজার মুল, তাঁর মুখের বাক্য হল সকল মন্ত্রের মুল এবং তাঁর কৃপালাভ হল মুক্তির প্রধান উপায়।

ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস এবং ভক্তির দ্বারাই ভগবান লাভ হয়। গুরুকৃপায় শুধু ভক্তিলাভ হলেই হবে না। সে ভক্তিভাবের রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্যও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করে ভাগ্যক্রমে কারো অন্তরে ভক্তিভাবের অঙ্কুর দেখা দিলেও সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধান এবং আশ্রয় ছাড়া তা বাড়তে পারে না এবং রক্ষা পায় না। গুরুকৃপা লাভের পর সব অনুরাগের ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে গুরুদত্ত বীজ (মন্ত্র) থেকে ঈশ্বরানুরাগের অঙ্কুর দেখা দিলেও কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর অত্যাচারে তা অংকুরেই বিনষ্ট হয়। সদ্‌গুরু সে-সময় সদ্‌ভাবে জীবন যাপন এবং ধর্ম-চর্চার উপদেশ দিয়ে শিষ্যের অন্তরের ভক্তিকে সে-সকল উপদ্রব থেকে রক্ষা করেন। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর ভক্তিযোগ গ্রন্থের গুরু-শিষ্যের লক্ষণ অংশে বলেছেন: "গুরুই ধর্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সাথে তার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত শিষ্যেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়, নম্র-আচরণ, তাঁহার নিকট শরণ গ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে না।"[২৯]

শুধু তাই নয়, গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করে তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার ফলে পরমতত্ত্বলাভ যে অনিবার্য তারও আশ্বাস দিয়েছেন স্বামীজী। বলেছেন: "এই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর; তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান সত্যশিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।"[৩০]

গুরু যদিও শিষ্যের নিকট সর্বদা আরাধ্য, সদা স্মরণীয় এবং নিত্য পূজনীয়, তবুও শাস্ত্রকারগণ বছরের একটি বিশেষ দিনকে গুরুর স্মরণ-মননের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। সে পবিত্র দিনটি হল ব্যাসদেবের জন্মতিথি—আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি যা 'গুরুপূর্ণিমা' বা 'ব্যাসপূর্ণিমা' নামে বিখ্যাত। এই শুভ দিনটি গুরু ও শিষ্য উভয়ের কাছেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাস হলেন জগতের আদি গুরু। তিনি বেদবিভাগ এবং আঠারটি পুরাণ ও আঠারটি উপপুরাণ রচনা করে গুরু-শিষ্যের পঠন-পাঠনের

গুরু যদিও শিষ্যের নিকট সর্বদা আরাধ্য, সদা স্মরণীয় এবং নিত্য পূজনীয়, তবুও শাস্ত্রকারগণ বছরের একটি বিশেষ দিনকে গুরুর স্মরণ-মননের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। সে পবিত্র দিনটি হল ব্যাসদেবের জন্মতিথি—আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি যা 'গুরুপূর্ণিমা' বা 'ব্যাসপূর্ণিমা' নামে বিখ্যাত। এই শুভ দিনটি গুরু ও শিষ্য উভয়ের কাছেই খুব তাৎপর্যপুর্ণ।

পদ্ধতিটিকে সুগম করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সে অমূল্য জ্ঞানরাশির বহুল প্রচারের মানসে নিজেই শিষ্য পরম্পরাক্রমে শিক্ষাদান করে গুরু-শিষ্য ধারাটিরও সৃষ্টি করে গেছেন। এ-প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উপাখ্যান[৩১] প্রচলিত আছে।

সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পরমাত্মার

২৮ বিশ্বসারতন্ত্র ঃগুরুগীতাস্তোত্র, ৩১-৩৯

২৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১৩৬১) চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭

৩০ ঐ, পৃঃ ৩১

৩১ ঈশ উপনিষদের আভাষ—দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, পৃঃ ৯

চিন্তায় যোগনিমগ্ন ছিলেন। একসময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁর শান্ত হৃদয় উদ্বেলিত করে একটি অস্ফুট নাদধ্বনি প্রকাশিত হল। সে অস্ফুট নাদধ্বনির স্ফুটরূপ থেকেই প্রথমে সর্ববেদের সার প্রণব অর্থাৎ ওঁ এবং ক্রমে ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে উচ্চারিত হল বেদ-বিদ্যা। ব্রহ্মা নিজেই সে অপূর্ব সুন্দর বেদবিদ্যার প্রচারের জন্য মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ক্রমে সে-বেদবিদ্যা প্রচারিত হতে হতে সত্য ও ত্রেতাযুগ পেরিয়ে দ্বাপরে এসে পড়ল। তখন সেই বেদরাশিকে শ্রেণীবিভাগ করে সংকলন করার জন্য ভগবান নারায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে ঋষিশরীর গ্রহণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন। বেদবিদ্যার শিক্ষাপদ্ধতিকে সরল, সুগম ও সহজবোধ্য করার জন্য তিনি একত্র মিশ্রিত বিভিন্ন প্রকার বেদমন্ত্র-গুলিকে চারভাগে ভাগ করে তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামে সংকলন করেন। বেদবিভাগের জন্য তাঁর নাম হল বেদব্যাস। তিনি শুধু বেদবিভাগ করেই ক্ষান্ত হলেন না। চতুর্বেদের বহুল প্রচারের জন্য প্রথমে তিনি তাঁর চারজন প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তুকে পর্যায়ক্রমে চতুর্বেদসহ সকল পুরাণাদি শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরা আবার তাঁদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সে জ্ঞানরাশি শিক্ষা দিতে লাগলেন। এভাবে শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে বেদ-বিদ্যা ও সর্বশাস্ত্র প্রচারিত হতে লাগল।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ব্যাস কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। বেদবিদ্যাসহ পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রকে সহজ ও সরলতর করার জন্য যে লেখক-মণ্ডলী লোকহিতার্থে কাজ করে গেছেন তাঁরা সকলেই ব্যাস নামে পরিচিত। সে যাই হোক, বেদবিভাগ এবং পুরাণাদি রচনার পর থেকে ব্যাসই আদি গুরুরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, “চার মুখ নেই অথচ যিনি ব্রহ্মা, দুই হাতযুক্ত অথচ বিষ্ণু এবং ললাটে নেত্র নেই অথচ শিব, তিনিই বাদরায়ণ ব্যাসদেব।”[৩২]

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ব্যাস কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। বেদবিদ্যা-সহ পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রকে সহজ ও সরলতর করার জন্য যে লেখকমণ্ডলী লোকহিতার্থে কাজ করে গেছেন তাঁরা সকলেই ‘ব্যাস’ নামে পরিচিত।

প্রাচীনকাল থেকে শিষ্যগণ তাই চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভের প্রথম দিনে অনধ্যায় (অধ্যয়নের বিরতি) পালন করে আদিগুরু ব্যাসদেব এবং নিজ নিজ গুরুদেবকে পূজা করে পুনরায় পঠন-পাঠন আরম্ভ করেন। সে-থেকেই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিটি আদিগুরু ব্যাসদেবের পূজার দিন বলে ‘গুরু পূর্ণিমা’ বা ‘ব্যাস পূর্ণিমা’ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। সাধারণভাবে মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণী-নক্ষত্রযুক্ত দিন, অক্ষয়তৃতীয়া এবং মাঘী সপ্তমীর দিন-গুলিকে অনধ্যায় বলে ঠিক করে সেদিনগুলিতে গুরুগণ শিষ্যদের পড়ান না। আবার বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজার জন্য শ্রীপঞ্চমী আর গুরুপূজার জন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেও শিক্ষার্থিগণ বা শিষ্যগণ অনধ্যায় পালন করে থাকেন।

দ্বাপর যুগ থেকে সাধারণের মধ্যে বেদবিদ্যার সাথে পুরাণাদি নানা শাস্ত্র পঠন-পাঠনের বাহুল্য দেখা দেয় এবং সেসময় থেকেই গুরুপূজার জন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সেদিন আদিগুরু ব্যাসদেবকে সর্বজ্ঞ ও কবি-স্রষ্টারূপে “নমঃ সর্ববিদে তস্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে”[৩৩] বলে প্রণাম করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। আর নিজ নিজ গুরুদেবকেও জগদ্‌গুরু রূপেই প্রণাম জানিয়ে বলে ঃ

“মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।”[৩৪]

৩২ সুভাষিতরত্ন ভাণ্ডাগার, পৃঃ ৩৬
৩৩ ঐ, পৃঃ ৩৬
৩৪ বিশ্বসারতন্ত্র ঃ গুরুগীতাস্তোত্র, ৫৭

তার চেয়ে যোগ্য হও

নিভা দে

জীবনের কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি
ভিক্ষা চেয়ে
আজীবন—অগাধ কৌতূহলে।

জানি যাবো আমি পেয়ে—
আমার যা পাওয়ার আছে সময়ের কাছে।

সুচারু সজ্জায় যাবতীয় সাজানো তো আছে
পৃথিবীর কোষে কোষে—অনুপম ঐশ্বর্যসম্ভার
হাত বাড়াইলেই হয় না সব আমার তোমার।

উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষার তীর বিঁধে ছটফট করা ?
অহেতুক খুব। তার চেয়ে যোগ্য হও।
যোগ্য হও অর্জুনের মতো।
অর্জুনের মতো যে
তাকেই মানায়—
পৃথিবীর প্রতিযোগী ধনুকে কেউ যদি পরায়
সেই জ্যা, অন্তঃপুরে বেজে উঠবে অমনি
অসংখ্য সুরেলা আন্তরিক মঙ্গল শঙ্খধ্বনি।

পৃথিবী স্বয়ং চিহ্নিত করে বিজয়ীকে—
যে পারে ফেরাতে মুখ তার
একান্তই নিজের দিকে।

পূর্ণতার সে প্রতিচ্ছবি

তাপস বসু

নিজস্ব আঙিনায় স্তূপীকৃত ভুল।
পায়ে পায়ে দলিত বাঞ্ছিত প্রভাতী ফুল
জমাট অন্ধকার ভিতরে বাইরে ডানে বাঁয়ে
লোভ টুকিটাকি জমে জমে
পাথর হয়েছে হৃদয়।
নিজস্ব প্রতিচ্ছবিতে ধরেছে ঘুণ
চারদিকে হাত বাড়ালে সবই শূন্যময়
উচ্চারণে মিথ্যের ফুল ঝরে ঝরে
চেতনার আকাশটিকে করেছে ক্ষয়।

এটাই শেষ কথা নয়।
নিজেকে চেনার, নিজেকে জানার অঙ্গীকারে
বন্ধ কপাট খুলে দিলে মুক্ত বাতাস বয়
বাতাসে ঝরে পড়ে পাথর
বাতাসে খসে পড়ে মিথ্যের আবরণ
নড়ে চড়ে ওঠে প্রেতাত্মা
জ্বলে ওঠে অন্তরে আলো।

বিকট কালো অন্ধকার, টুকিটাকি লোভ
শূন্যতার মাঝে—
পূর্ণতার সে প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বল হয়।

মনে রেখো

দেবী রায়

[বিবেকানন্দ বলেছিলেন : 'ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান।
মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।']

তুমি যেই হও
পুরুষ অথবা নারী
জেনো
একান্তভাবে তারি।

তুমি যেই হও
দেহ অথবা মন
জেনো
একান্তভাবে তারি।

তুমি যেই হও
কার্য অথবা কারণ
জেনো
একান্তভাবে তারি।

তুমি যেই হও
মান-হুঁশ ভিন্ন
আর কেউ নও

তুমি যেই হও
পুরস্কার বা তিরস্কার
জেনো, আলোর পর
রয়েছে এক ঘোর-আঁধার।

মন তোমায় বেঁধে রাখে
লোভের হাতছানি ডাকে
নানান কৌতূহলে
টানা পোড়েনের ছলে

যদি সজাগ রাখি কান
ভাবি, কোথায় প্রতিধ্বনি
কোথায়
সেই সুমধুর গান

খুঁচিয়ে দিলে আগুন
সে-ও কি কিছু বলে
নাকি,
বৃথাই শুধু জ্বলে

তুমি যেই হও
পুরুষ অথবা নারী
জেনো,
একান্তভাবে তারি।

প্রতিশ্রুতি

নচিকেতা ভরদ্বাজ

[স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদিত]

মাঝে মাঝে ভাবি তুমি এখানে কী করে এলে আমাদের দেশে
এই নষ্ট অন্ধকারে? এত বড় দিগ্বিজয়ী আলোর মশাল
কী করে জ্বললো?—এই যুক্তিহীন প্রাণহীন দাসত্বের হিংস্র বেড়াজাল
কী করে ছিন্ন করে এলে দৃপ্ত পরিপূর্ণ মানুষের বেশে?
এমন মানব-কণ্ঠ উচ্চকিত উতরোল—কৈ আমরা শুনিনি এখানে
কোন দিন, এত তীব্র ভর্ৎসনা, নির্মম ধিক্কার,
এত মুগ্ধ ভালবাসা, এমন সর্বস্ব ত্যাগ, এত শুদ্ধ বিবেকী চেতনা,
এত বড় অহঙ্কার। রিক্ত ভ্রষ্ট আমাদের স্তিমিত উদ্যানে
এত বড় রক্তগোলাপ, কৈ ফোটেনি তো আর।

এত ভালবাসা নিয়ে, এত শ্রদ্ধা, আত্মনিবেদনের অর্হণা,
এত বড় দৃঢ় ঐক্যে—কেউ কৈ দেখেনিকো চেয়ে
মৃন্ময়ী মায়ের দিকে। আর্ত মানুষের জন্য অশ্রুমগ্ন এমন যন্ত্রণা,
এত বড় হৃদয়ের এমন মর্মের হাহাকার,
এত স্নিগ্ধ শুভ ইচ্ছা, এত শান্তি বৃহৎ হৃদয়-মন ছেয়ে!
এ যেন অন্তহীন গোমুখীর মুক্ত উৎস! শিলাপদ্ম জলের চারণা
অবিচ্ছিন্ন—আমাদের অন্তঃপুরে, সর্বগ্রাসী প্রথম তৃষ্ণার
অনন্য অনুভূতি এবং নির্মাণ আমরা দেখেছি বিস্ময়ে।

ভক্তির দেশ এটা। বহু ফুল, নৈবেদ্য, চন্দন, ধূপ
নিবেদিত হয়ে আসছে চিরকাল। প্রথম পেলাম আমরা
নিরপেক্ষ বিজ্ঞান, যুক্তির নিষ্ঠার
নব ধর্ম, শক্তির সম্মিলিত রূপ।
আত্মবিস্মৃত সিংহ—তার মুখ আমরা সেই প্রথম দেখেছি
মৃত্যুহীন আমাদের অস্তিত্বের আবিষ্কৃত প্রথম আয়নায়।
কালবোশেখীর মতো তুমি তীব্র তীক্ষ্ণ সর্বব্যাপ্ত ঝড়ে
আমাদের নব জন্মে করেছ নন্দিত।
কবেকার পরিলুপ্ত অভিজ্ঞান আমরা ফের মুঠোয় পেয়েছি,
আমরা জেগেছি আজ ঊর্ধ্বায়ত—দৃপ্ত বড় জীবনের দায়
আমরা নিয়েছি—এই সমুদ্র-মেখলা মহা পৃথিবীর ঘরে
আমরা আজ মুক্তিতে স্পন্দিত॥

মহারাজের স্মৃতি

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

কাশীধামে আমি মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) সঙ্গে ছিলাম। একদিন আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়েছি। আমাদের দলে অনেকে ছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে মহারাজ দেখতে পেলেন একজন ঝাড়ুদার মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিচ্ছে। মহারাজ লোকটির হাত থেকে ঝাড়ুটি নিয়ে নিজেই ঝাঁট দিতে লাগলেন। আমরা অনুভব করলাম মহারাজ আমাদের দেখাতে চাইছেন দেবমন্দিরে কিরূপ দীন ভাব নিয়ে আসতে হয়। মহারাজের দেখাদেখি একজন ভক্তও অনুরূপভাবে ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর আচরণে একটু কৃত্রিমতা ছিল। মহারাজের ঝাড়ু দেওয়া কত স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল! মহারাজকে তখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, খুব প্রেরণাপ্রদ মনে হচ্ছিল।

একবার বলরামবাবুর বাড়িতে দেখা হতেই মহারাজ বললেন: "তোমরা ধ্যানজপ কর, করে হয়তো সামান্য একটু উন্নতি করলে, তারপর আবার সব শুকনো হয়ে যায়। মনে হয় যেন তোমরা দরজা এঁটে বন্ধ করে দিয়েছ। এসময় প্রয়োজন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তোমাদের সাধন-ভজন চালিয়ে যাওয়া। এরূপ চালিয়ে গেলে তারপর একসময় দেখতে পাবে যে বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছে। তখন সে কি আনন্দ। ধর্মজীবনে এরকম অনেক বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়।" একবার মহারাজ একজন ভক্তকে বলেন: "তুমি যখন ধ্যানভজন করবে, মনে করবে ভগবান তোমার সম্মুখে পুরাণ-বর্ণিত কল্পতরুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন।" আর একদিন তিনি আরেকজন ভক্তকে বললেন: "ধ্যান করতে করতে মনে করবে তুমি সাগরের মাঝখানে রয়েছ, চারদিকে পর্বতপ্রমাণ বিশাল ঢেউয়ের রাশি। আর ঈশ্বর তোমার সামনেই আছেন, তোমাকেই রক্ষা করবার জন্য।" মাদ্রাজে থাকতে একদিন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। একসময় কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বললেন: "এক কাজ করবে, সব সময় ঈশ্বরের স্মরণ মনন করবে। আমিও তাই করি।"

কাশীধামে একদিন মহারাজ সেবাশ্রমের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে একটি ভুল করবার জন্য তীব্র তিরস্কার করলেন। পরে আমি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি যদি আমাদের ভুলচুকের জন্য অপরাধ নেন, তাহলে আমাদের উপায় কি হবে? আমরা দুর্বল, ভুলচুক করে ফেলা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।" একথায় মহারাজ আঙুল দিয়ে নিজ ওষ্ঠ স্পর্শ করে বললেন: "এসব (রাগারাগি) নয়।"

আমার ওষ্ঠের। ভিতরের (বুক স্পর্শ করে)

আমি একদিন মহারাজের হাত-পা ম্যাসাজ করছি। অনেকক্ষণ হয়েছে। শেষে আমার খুব ক্লান্তি বোধ হতে লাগল, মনে হল আমি যেন আর পারছি না। হঠাৎ মনে হল যদি সংসারে থাকতাম তাহলে কি কঠিন পরিশ্রমই না আমায় করতে হতো, তার বদলে আমি মহারাজের সেবা করবার সুযোগ, সৌভাগ্য ও সুবিধা অর্জন করেছি, আর আমি কিনা ক্লান্তি বোধ করছি! যে-মুহূর্তে একথা মনে হল, আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। ভিতরে আমি দারুণ একটা শক্তি অনুভব করলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। মহারাজ আমাকে বললেন: "ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর দরকার নেই।" মহারাজ মানুষের অন্তরের কথা জানতে, বুঝতে পারতেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করছিলেন।*

* 'ETERNAL COMPANION', থেকে।

ভাষান্তর: সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

পুজো, ইচ্ছে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রনাথ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

না গো, এই যে ধুলো আমার না এ।
তোমার ধুলোর ধরার পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে ॥
কালবৈশাখী প্রতিদিনের বৈকালীতেই।
ধুলোয় ধূসর হয়ে জীবনের
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলছেই চলছেই চলছেই।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন :
দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি রচলে দেহ পূজার থালি—
শেষ আরতি সারা করে ভেঙে যাব তোমার পায়ে ॥

জাগতিক মালিন্যকে আপন মলিনতা না ভাবতে ভাবিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই গানে : "না গো, এই যে ধুলো আমার না এ।" তাই ভাবনায় রাখা ভরসন্ধ্যায় একে উড়িয়ে চলে যেতে হবে। কোন অনুশোচনা নয়, কোন হতাশায় হাঁপিয়ে ওঠা নয়—স্রষ্টার ধুলোট ধরায় লুটোপুটি করা জাগতিক জীবন। এই জীবনে মাটির প্রদীপ প্রজ্বলিত করা পূজোর উপচারের থালায় সাজিয়ে, কিন্তু আর সব থেকে যা সত্যি তা হল—"শেষ আরতি সারা করে ভেঙে যাব তোমার পায়ে"।

জীবনযাত্রায় পূজোর নৈবেদ্য রচিত হয়ে চলে, হয়েই চলে। অসংখ্য বাসনার বীজ বুনে বুনে পূজোর উপচারে অগণিত ফুলে আর সচকিত প্রদীপমালায় থালা ভরা হতে হতে উপচিয়ে যায় উথলিয়ে অজান্তেই।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

ফুল যা ছিল পূজার তরে
যেতে পথে ডালি হতে অনেক যে তার গেছে পড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে সাজিয়ে ছিল আপন হাতে—
কত যে তার নিবল হাওয়ায়, পৌঁছল না চরণছায়ে ॥

সাংসারিক জীবনপ্রবাহের গতিছন্দের গীতিকার রবীন্দ্রনাথ। তিনি জীবনজিজ্ঞাসায় তৎপর থেকেও উর্ধ্বমুখী সীমাহীন ঐশ্বর্যের অভিলাষীরূপে মানবমনীষাকে উপলব্ধির উপান্তে উপনীত করেন। ঐশ্বর্যের অমরাবতীতে শাশ্বত মানসিকতার অধিবাস। প্রতিদিনের এই পৃথিবীর পথচারী দেহসর্বস্ব কিন্তু মনে দেহাতীত। দেহ সীমায়, কিন্তু মন অসীমায়। সীমার মাঝেই অবশ্য অসীম তিনি বাজিয়ে চলেন আপন সুর। রবীন্দ্র-কণ্ঠের গানে আবার তাই আছে :

আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্যপানে চেয়ে আছে,
সে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে ॥

বাসনার প্রতীকী উপমায় প্রদীপ বা প্রদীপশিখা অপূর্ব ভাবদ্যুতির সঞ্চার করে মাঙ্গলিক চিন্তা-মানসে। যা উধার দিগন্তেই বাসনার চরিতার্থতায় উর্ধ্বমুখী। যদিও এর উৎপত্তি ব্যর্থ বাসনার অথবা নতুন বাসনার তৈল-সংযুক্তির ফলেই। এবং এই শিখায় বৈজয়ন্তীরও চলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। তাই তো রবীন্দ্রনাথের উক্তি :

ললাটে তার পড়ুক শিখা
তোমার লিখন ওগো শিখা—
বিজয়টীকা দাও গো এঁকে, এই সে যাচে ॥

শেষ-বাসনায় বিজয়-বৈজয়ন্তী। ললাট লেখায় ঔজ্জ্বল্যটুকুর একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

তবে মন আশাবাদী। শেষের মাঝে জানে অশেষ আছে। যার গতি সাগর-সন্ধানী। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত :

জীবনে যত পূজা হল না সারা।
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥

হৃদয়-নৈবেদ্য উপচারে ভরিয়ে পূজোর অনুরাগ চলছে চলছে চলছেই। তবে কতটুকু সহজ পরিপূর্ণতা আসছে, তা কে বলতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার এক-জায়গায় ('প্রার্থনার সত্য') বলেছিলেন : "ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়ম-রূপে তাঁর প্রকাশ হত, তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু তিনি নাকি 'আনন্দরূপামৃতম্', তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানিনে—ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথ উপাসনার ধ্যান ও প্রার্থনা এই যুগল অবস্থিতিকেই স্থান দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন। বলেছেন : "যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।"

অর্থাৎ সজীব ঈশ্বরের উপাসনায় প্রার্থনার সত্যই স্বীকার্য। কারণ আশা নিয়েই ধ্যান-উপাসনার ব্রতী হয় সংসারবন্ধ জীব। তাই সুন্দর একটি কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ : "ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্য-সাধন করে প্রার্থনা।" তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলছেন : "দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে ওই প্রার্থনা-দূতী। এই জন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশির যে নানা সুর বেজে উঠছে সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা।"

একটি বহু-উচ্চারিত বাণীবদ্ধ-মন্ত্র—'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে বলেছেন : "মানব-হৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পূজোপহার-টিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে ?"

মানুষের মোহময় চিত্তের বিস্ময়ের রূপরীতির অনুসঙ্গে যে বাসনার প্রকাশ তা পরমপ্রাপ্তির প্রার্থনায়। রবীন্দ্রনাথ মানব-মানসের একান্ত আশাবাদকে স্বীকার করেন এবং 'ইচ্ছা' বলেই তার সহজ নামের শব্দটিকে চিহ্নিত করেছেন। আসলে মনের আকুতিকে অভাবিত বাসনার ভাবমার্গে উপলব্ধি করিয়ে বলছেন ইচ্ছাই সর্বস্তরের মনোগত বিকাশলাভ করে প্রার্থনায়। আমরা শুধু তো নিত্যচলমান মানুষের কথা ও কাহিনী নিয়ে যুগজীবন ও জাগতিক সুখ-দুঃখের স্তর থেকে উত্তরণের পথ-অভিসারী। যে-আনন্দ মহত্তের পরমতম প্রকাশে তার আদিম রূপের বিভূতি-সন্ধানে প্রার্থনা ঈশ্বর সমীপে। অর্থাৎ ইচ্ছা ও আশা নিয়ে আশ্বাসের অনুধ্যান। রবীন্দ্রনাথ 'ইচ্ছা' প্রসঙ্গে তাই বলছেন : "আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড় ভাবনা করেই ভাবতে হয়, কেননা সেটা যে আমারই ভাবনা।"

এই যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন মন ও মনন, এই যে ইচ্ছাকৃত অভীপ্সিত হওয়া—তার স্বকীয়তাকে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় উক্তি : "ইচ্ছা যে অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে।" একথা বোঝাতে গিয়ে গৃহকর্ত্রীর আত্মসমর্পিত চিত্রটিকে তিনি আদর্শরূপে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন : "সে যদি সকলের সেবক না হয় তবে সে কর্ত্রী হতেই পারে না।"

স্রষ্টার সৃষ্টি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু মনের বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা তা কিন্তু দৈব-নির্দেশিত কি? রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "বিশ্ব-সাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ঐ একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেননি—সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা।" আর তাই বলছেন : "ওইটি তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন।" অনেক উপচারে আমরা ঈশ্বর-আরাধনায়, পূজোপার্বণে নিযুক্ত হই। সেসবই সৃষ্টির সম্পদ স্রষ্টারই সৃষ্টি। কিন্তু মনের ইচ্ছেটি একান্তই ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তা স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।"

একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্বনিত হয়েছে : "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে।" কিম্বা অন্যত্র উচ্চারিত : "আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" সেইজন্যেই ঈশ্বরের লীলা মানবমানসে এবং ঈশ্বরীয় ভাব অভিব্যক্ত মানব-মননে। তিনি ইচ্ছার শক্তি দিয়েছেন তাঁর কাছে প্রার্থিত পদে নিযুক্তির জন্যে এবং সেই ভাবে ইচ্ছা-পূরণের ফলে ঈশ্বরীয় মহিমারও হয় বিকাশ। তাই প্রার্থনার চরম কথা পরমরূপে প্রকাশ করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথই : "তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তো তুমি এত কাণ্ড করেছ।"

আর শেষকথারূপে তাঁর সঙ্গীতের সাবধান-বাণীই স্মরণ করতে হয়, যেখানে বলছেন : "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।" অর্থাৎ স্মরণে-মননে ধ্যানে-বচনে পূজোর শুধু উপচার-আড়ম্বরে নিমগ্নতা নয়, ঐকান্তিক ঈশ্বরমুখী প্রার্থনায় ভরা ইচ্ছা নিয়ে মনকে উন্মুখীন করা। নিষ্ঠার নৈবেদ্যই রচিত হবে চিরন্তন কর্মপ্রবাহে ঐশ্বরীয় বিভূতির ধ্যানে ও জ্ঞানে। আরতি, আকুতি ও অভিলাষে।



আনন্দের সন্তান

'উথলিল মহারঙ্গে সদানন্দ লহরী'

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া-বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনের ঢঙ দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনী সেজেগুজে সম্প্রদায়-সঙ্গে গান গাহিতেছে—কীর্তনী দাঁড়াইয়া—হাতে রঙিন রুমাল, মাঝে-মাঝে ঢঙ করিয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে—আবার যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাহিতে-গাহিতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে, বলিতেছে, 'আসুন'।—আবার মাঝে-মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

"অভিনয়-দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া মাস্টারকে বলিতেছেন—'ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে) তোর বাবাকে এসব কথা বলিসনি। যাও (আমার প্রতি) একটু টান ছিল, তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশ-ম্যান লোক।"

সংসারে মূল্যবোধের তারতম্য সম্বন্ধে একটি সরস শিক্ষাপ্রদ কাহিনী ভক্তগণ শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঃ

"যার যেমন পুঁজি—জিনিসের সেইরকম দর দেয়। একজন বাবু তার চাকরকে বললে, 'তুই এই হীরেটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কিরকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা।' চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে-চেড়ে দেখে বললে, 'ভাই, নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'ভাই আর একটু ওঠো। না হয় দশ সের দাও।' সে বললে, 'আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে যাও।' চাকর তখন হাসতে-হাসতে হীরেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাবুর কাছে বললে, 'মহাশয়, বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশি একটিও দেবে না। সে বললে, বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।' বাবু হেসে বললে, 'আচ্ছা, এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে? কাপড়ওয়ালার পুঁজি বেশি, দেখি ও কি বলে?' চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, 'ওহে, এটি নেবে? কত দর দিতে পার?' কাপড়ওয়ালা বললে, 'হাঁ, জিনিসটা ভাল; এতে বেশ গয়না হতে পারে। তা ভাই, আমি নয় শো টাকা দিতে পারি।' চাকরটি বললে, 'একটু ওঠো, তাহলে ছেড়ে দিয়ে যাই। না হয়, হাজার টাকাই দাও।' কাপড়ওয়ালা বললে, 'ভাই, আর কিছু বলো না। আমি বাজার-দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। নয় শো টাকার বেশি একটি টাকাও আমি দিতে পারব না।' চাকর মনিবের কাছে হাসতে-হাসতে ফিরে গেল। আর বললে, 'কাপড়ওয়ালা বলেছে যে নয় শো টাকার বেশি একটি টাকাও সে দিতে পারবে না। আর বলেছে, আমি বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।' তখন তার মনিব হাসতে-হাসতে বললে, 'এইবার জহুরীর কাছে যাও—সে কি বলে দেখা যাক।' চাকরটি জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একেবারে বললে, 'এক লাখ টাকা দেব'।"

এই গল্পের একটি পরিশিষ্ট-অংশ আছে। জহুরী যখন হীরেটির দর বলে দিয়েছে, তখন দেখা গেল, আর একজন জহুরী সেই দিকে আসছে। পাছে অন্য জহুরী বেশি দর দিয়ে ফেলে, সেই ভয়ে এই জহুরী তাড়াতাড়ি হীরেটা পায়ের জুতোর মধ্যে গুঁজে রাখলে। অন্য জহুরী চলে যাবার পর এই

জহুরী হীরে বার করে দেখে—অবাক কাণ্ড। হীরে ফেটে গেছে। হীরে ফাটল কেন? হীরে বললে, 'বেগুনওয়ালা, কাপড়ওয়ালা যা করে করুক, তারা আমার মূল্য বোঝে না, কিন্তু তুমি জহুরী, তুমি কি বলে আমাকে পায়ের তলায় রাখলে! সেই অভিমানে আমার বুক ফেটে গেল!'"

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি সুগভীর গল্পে—নীরবে রক্তাক্ত যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে বরণ করেছিল একটি প্রাণী। রাম ও লক্ষ্মণ একদিন বনপথে চলতে-চলতে থেমে বিশ্রাম নেবার জন্য তাঁদের ধনুক দুটি মাটিতে পুঁতে রাখলেন। বিশ্রামশেষে রামচন্দ্র ধনুক তুলে দেখেন, তার প্রান্তে রক্তের ছিটে। কি ব্যাপার? কোন জীবহত্যা বুঝি হল। রাম তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণকে মাটি খুঁড়ে দেখতে বললেন। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে একটি রক্তাক্ত মুমূর্ষু ব্যাঙকে তুলে আনলেন। কাতর রামচন্দ্র তাকে বললেন, 'তোমরা সর্বদা এত চিৎকার করো, কিন্তু আমি যখন তোমার গায়ে ধনুক পুঁতলাম চেঁচালে না কেন?' সে বললে—বোধহয় মরণ-হাসি হেসেই বললে—'প্রভু, অন্যেরা মারলে ডাক ছেড়ে বলি, রাম, বাঁচাও! স্বয়ং রাম মারলে কাকে ডাকব!'"

ভক্তেরা জানলেন—শিক্ষার শেষ নেই। তাঁরা আরও জানলেন—কারো-কারো ভবিতব্য বোধহয় চির অশিক্ষা!—"সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে-গাছে লাগে তারা সব চন্দন হয়ে যায়, কিন্তু শিমুল, অশ্বথ, আমড়া—এরা হয় না। কেউ-কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য।"

ভক্তেরা জানলেন বিচিত্র মানবভাগ্যের কথা—

"একজন বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে-মাঝে বলছে—'রাজা, টাকা দেও, কাপড়া দেও'। এমন সময়ে তার জিভ তালুর মূলের কাছে উল্টে গেল, অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পন্দন নাই। তখন সকলে তাকে ইঁটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই পুঁতে রাখলে। হাজার বৎসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে, একজন যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। তারা তাকে সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময়ে নাড়াচাড়া দিতে-দিতে তার জিভ তালু থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হল, আর সে চিৎকার করে বলতে লাগল—লাগ ভেল্কি লাগ! রাজা, টাকা দেও, কাপড়া দেও—"

ক্ষুদ্র বুদ্ধির অভিমান সম্বন্ধে একটি গভীর রসিকতা।

"চিনির পাহাড়ে একটি পিঁপড়ে গিছল। একদানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর একটা দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব।"

জীবনযন্ত্রণা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি হিউমার, যা বলছে—যন্ত্রণা কেবল তার নয় যে মার খাচ্ছে—যে মারছে তারও দুঃখনিয়তি—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) একটা কোলাব্যাঙ হেলে-সাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না। আর কোলাব্যাঙটার যন্ত্রণা—সেটা ক্রমাগত ডাকছে। ঢোঁড়া সাপটারও যন্ত্রণা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও হাসির সঙ্গে অতঃপর যোগ করে দিয়েছেন—"'কিন্তু গোখরো সাপের পাল্লায় যদি পড়ত, তাহলে দু'-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত।"

তেমন গোখরো সাপের মুখস্থ হয়ে চির শান্তির সৌভাগ্য ক'জন পায়? ক'জন হাসতে পারে এই চূড়ান্ত হাসি, যা রামকৃষ্ণের?—

"কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময়ে একটা ভারী শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করল—'ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হল?' শিব বললেন—'রাবণ জন্মগ্রহণ করল, তাই শব্দ।' খানিক পরে আবার একটি শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করল—'এবার কিসের শব্দ?' শিব হেসে বললেন—'এবার রাবণ বধ হল।'"

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছেন। হাসাচ্ছেন সবাইকে। এবার আর গভীর থেকে উঠে আসা কোন তত্ত্বকে সরস করতে নয়। পরিবেশ যখন গভীর হয়ে উঠেছে কোন গভীর তত্ত্বের পরিবেশনে তখন হয়তো সেই থমথমে পরিবেশকে গমগমিয়ে দেবার জন্য ছুঁড়ে দিলেন আলতো করে একটা চুট্‌কি :

"হ্যাঁ, একজন যেমন বলেছিল, 'মাতারং ভাতারং খাতারং'। অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।" থমথমে বাতাবরণ-টিতে ছলাৎ করে উঠল হাসির ফোয়ারা। রামকৃষ্ণ রসের গুরু। বিবেকানন্দ বললেন: "তাঁরই শক্তি, তিনিই ছড়াচ্ছেন—কুড়িয়ে নাও। কুড়িয়ে নাও—যদি বাঁচতে চাও।"

উপস্থাপনা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সাগর দেখে ফেরা

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

সাগরে একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। সেই উপলক্ষে সেখানে সদ্য তৈরি মাঠে একটি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের বর্তমান এবং সদ্যোতীত খেলোয়াড়দের নিয়ে। সঙ্গে যাচ্ছেন দূরাতীত খেলোয়াড়েরা। যাঁরা এখন প্রবাদপুরুষ। নিষ্কর্মা বলতে শুধু আমি এবং আমার সহকর্মী প্রোজ্জ্বল।

মধুকবি লিখেছেন : 'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে—দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'। বর্তমানে রাজারা অন্তর্হিত। অতএব দীন আমার রাজেন্দ্র-সঙ্গম ঘটার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজা না থাকলেও মন্ত্রীরা আছেন, আর মন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েই আমার এই সাগরযাত্রা। সাগর মানে সাগরদ্বীপ। যেখানে সাগর-সঙ্গম। এই 'সাগর-সঙ্গম' কথাটা শুনলেই আমার দুটো জিনিস মনে পড়ে যায়। এক, বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'র অংশ বিশেষ—সাগর-সঙ্গমে নবকুমার, দুই, একটি গান—সাগর-সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত, কখনো তো হই নাই ক্লান্ত... ।'

মধুকবি লিখেছেন : 'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে—দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'। বর্তমানে রাজারা অন্তর্হিত। অতএব দীন আমার রাজেন্দ্র-সঙ্গম ঘটার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজা না থাকলেও মন্ত্রীরা আছেন, আর মন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েই আমার এই সাগর-যাত্রা। সাগর মানে সাগরদ্বীপ। যেখানে সাগর-সঙ্গম।

কিন্তু ক্লান্তির কথা এখন থাক। এখনও তো শুরুই হয়নি। মন্ত্রীর সি. এ. বাপ্পাই (ভাল নাম নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে, কিন্তু সেটা শুনিনি কখনো) জানিয়েছিল সাত সকালে ময়দানের গোষ্ঠ পালের মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। সেখান থেকেই যাত্রা হবে শুরু। কিন্তু আমার সহকর্মী প্রোজ্জ্বল এসে বলল : "সাতটা নয়। সকাল ছ'টা।" আমি থাকি কলকাতার দক্ষিণতম প্রত্যন্ত প্রদেশে। কেউ ঠিকানা শুধুলে বলি : "আমার বাড়ির পরের স্টপেই সোঁদরবন।" সেখান থেকে ময়দান—অত ভোরে। একটু কষ্টকর বই কি। কিন্তু ভ্রমণে আমার চিরকেলে স্ফূর্তি। তাছাড়া নিঃখরচায় হচ্ছে যখন সেটা। সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নই। আর তো মন্ত্রীর কাছ থেকে ডাক নাও পেতে পারি।

সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। মনে পড়ল এর আগেও একবার যাত্রার দিনক্ষণ স্থির হয়েছিল; কিন্তু আগের দিন রাত থেকেই বৃষ্টিতে ভাসল কলকাতা। পাড়ায় পাড়ায় এক কোমর জল। ব্যবস্থা ছিল গাড়ির, নৌকোর নয়। তাই যাওয়া বাতিল।

সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। মনে পড়ল এর আগেও একবার যাত্রার দিনক্ষণ স্থির হয়েছিল; কিন্তু আগের দিন রাত থেকেই বৃষ্টিতে ভাসল কলকাতা। পাড়ায় পাড়ায় এক কোমর জল। ব্যবস্থা ছিল গাড়ির, নৌকোর নয়। তাই যাওয়া বাতিল। পাঁচ মিনিটের লেট। দেখি সব শুনশান। আশঙ্কা—সবাই চলে গেছে বোধ হয়। এদিক ওদিক তাকাই। দূরে দেখি প্রোজ্জ্বল ময়দানের মাঝে জগিং-রত। ডাকতে কাছে আসে। বলে : "সবাই জগিং-টগিং করছে তো, তাই ভাবলাম আমিও একটু করে নিই। ফ্রেশ এয়ার।" আমি বললুম : "ফ্রেশ এয়ার ময়দানে নেই। সমীক্ষা পড়নি? ময়দানেই সবচেয়ে

বেশি পলায়ন। ক্লেশ এয়ারের রাজ্য সাগরেই তো যাচ্ছি। কিন্তু সবাই চলে গেল নাকি?" প্রোজ্জ্বল কাঁচুমাচু মুখে বলল: "না। আসেইনি কেউ। সময়টা বোধহয় সাতটাই।"

এদিক ওদিক তাকাতেই দেখি, যুব-কল্যাণ বিভাগের সদা-উৎসাহী অফিসার সৌরীনবাবু এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ভট্টাচার্য সাহেব হাজির রয়েছেন অদূরে। আর হাজির ঢাউস এক বাস। দুই অফিসারই বললেন: "সাড়ে সাতটায় রওনা হব আমরা।" প্রোজ্জ্বল তখন অন্যমনস্ক। বোধহয় গোষ্ঠ পালের পায়ের ফুটবলটার সাইজ নির্ণয় করতে ব্যস্ত। একটু পরেই দেখি বলরাম—সেই অতীতের জাদুকর ফুটবলার—এসে হাজির। এলেন মেওয়ালাল, নিখিল নন্দী, চন্দন সিং, প্রদীপ ব্যানার্জী। প্রদীপ ব্যানার্জী এসেই গলার শির ফুলিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁকে ঘিরে ভিড়। আর একটি ভিড় স্পোর্টস কাউন্সিলের কান্তি গাঙ্গুলিকে ঘিরে। কান্তিবাবু যাত্রার ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে থাকলেন ভারপ্রাপ্ত স্বেচ্ছা-সেবীদের। খেলোয়াড়দের একটা দল উঠবে মোহন-বাগান মাঠ থেকে শৈলেন মান্নার তত্ত্বাবধানে। এখান থেকে উঠবে ইস্টবেঙ্গলের ছেলেরা। ক্রমে ক্রমে সবাই হাজির হতে বাস ছাড়ল। আমার পাশের সিটে সুদীপ চ্যাটার্জি। সামনে ভাস্কর, পেছনে জানালার ধারে চিমা, পাশে জনি। চিমার কানে ওয়াকম্যান। সে শুধু সেটা শুনতেই ব্যস্ত। আমাদের বাসের সামনে চলেছে পুলিশের পাইলট কার, সাইরেন বাজিয়ে। রাস্তার লোক ভয়-চকিত হয়ে সরে যাচ্ছে। তারপর দেখছে কারা যায়। জানালায় অচেনা মুখ দেখলে তাদের বিরক্তি। তারপরেই চিমাকে দেখে উৎফুল্ল। এভাবেই এগিয়ে চলা। ক্রমশঃ বেহালা, জোকা, পৈলান, ভাস.-বিষ্টুপুর, আমতলা, সরিষা হয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা টুরিস্ট লজ। এখানে প্রাতরাশ-বিরতি।

বাস থেকে নামতেই মন্ত্রী এগিয়ে এলেন। প্রতিটি আগন্তুকের কর নিজের মুঠিতে নিয়ে জানালেন অভ্যর্থনা। লাউঞ্জে ঢুকতেই দেখি আরও অনেকে আগেই হাজির হয়েছেন। তার মধ্যে দু-তিনটি বালক-বালিকা রয়েছে। রয়েছেন জনা তিনেক মহিলাও। পর পর টেবিল জোড়া দিয়ে খাবার জায়গা করা হয়েছে। চট করে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসে পড়া গেল। ম্যাগনাম সাইজের লুচি—তৎসহ আলুর দম, ডিম, কলা, মিষ্টি। আলুর দমের স্বাদটি ভাল হওয়ায় আমি এবং প্রোজ্জ্বল উভয়েই আরেক প্রস্থ চেয়ে নিলুম।

আমাদের খাওয়া হতে না হতেই দ্বিতীয় রিজার্ভ বাসটি এসে পৌঁছুলো। কান্তিবাবু এলেন এ বাসে। ওঁরা বসলেন। আমরা উঠে ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলুম। সাগরিকার পেছনে একটি ঝিল। পূর্বে দেখেছি এটিকে আবর্জনার নালারূপে। বর্তমানে সংস্কৃত হয়ে মাছ-ধরিয়েদের স্বর্গ। ছিপ ধরে বসবার জন্য বহু মাচা তৈরি হয়েছে। ব্যবস্থা করেছেন পর্যটন বিভাগ। ছুটির দিনে জানা গেল ভিড় হয় বেশ ভালই। মন্ত্রীমশাই-এর কাছে প্রস্তাব রাখলুম সেখানে বোটিং-এর ব্যবস্থা রাখবার। মনে হল তাঁরও মাথায় রয়েছে ব্যাপারটা।

বর্ষাশেষে গঙ্গার বিস্তৃতি উদারতর। নৌকো এবং ছোট ছোট জাহাজ চলছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে গেল মাস কয়েক আগেই এসেছিলুম এখানে। সেবারেও মন্ত্রী বলেছিলেন: "যাবেন নাকি?" আমার তো, 'পাগলা খাবি'?—না 'আঁচাবো কোথায়' অবস্থা। সেবারে এখান থেকে গিয়েছিলুম গাদিয়ারা নৌকোযোগে। সঙ্গে ছিলেন দুই ভট্চাজ। অলোক-নাথ ভট্টাচার্য—রাজ্য পর্যটন দফতরের ডিরেক্টর এবং আদিনাথ ভট্টাচার্য, রাজ্য পর্যটন কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দুজনেই সাহিত্যিক, কবি। সেবার মন্ত্রীমশাই বেরিয়েছিলেন পর্যটন-গ্রামের সন্ধানে। তাঁর ইচ্ছে গঙ্গা বা সমুদ্রের ধারে একটি পর্যটন-গ্রাম গড়ে তুলবার। যেমন আছে ডিজনি ল্যান্ড। এখানে হয়তো হযবরল বা আবোল তাবোলের দেশ তৈরি হতে পারে। সেবারের যাত্রাটি বড়ই মনোরম হয়েছিল। এবং গঙ্গার নির্মল হাওয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্ষুধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলুম আমরা বৃকোদরের মতো ভোজন দ্বারা।

এইসব স্মৃতিচারণ করতে না করতেই বেজে উঠল বাঁশি। না শ্যামের বাঁশের বাঁশি নয়, বাসের বাঁশি। অতএব চটপট উঠে পড়া গেল। শোনা গেল ভাস্কর 'এই একটু আসছি' বলে

বেরিয়ে এখনও ফেরেনি। তার জন্য একটি ছোট গাড়ি এবং উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধিকে রেখে যেতে হল।

সেবারের যাত্রাটি বড়ই মনোরম হয়েছিল। এবং গঙ্গার নির্মল হাওয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্ষুধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলুম আমরা বৃকোদরের মতো ভোজন দ্বারা।

এই সব স্মৃতিচারণ করতে না করতেই বেজে উঠল বাঁশি। না শ্যামের বাঁশের বাঁশি নয়, বাসের বাঁশি।

রাস্তা এবার অপেক্ষাকৃত সরু। দুধারের বসতির চেহারা গ্রাম্য। খড়ের চালে চালে লতায় হলুদ ফুল ধরেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল ঝিঙে। পরে দেখলুম ধুঁদুল ঝুলছে। এক জায়গায় দেখি রাস্তার ধারে সারি সারি গাছের নিচে দুপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাগল। উন্মুখ হয়ে পাতা খাবার চেষ্টা। আমার মতো শহুরে-চোখে দৃশ্যটি অভিনব বৈ কি। এছাড়া মাঝে মধ্যে ছোট ছোট জলাশয়, তাতে কিছু ফুলের কুঁড়ি ধরেছে। সেগুলোর ভেতরে সিঁদুরের মতো রক্তাভা। পদ্ম? না, শালুক? আমি গোপাল ঠাকুর নই। তাই চিনতে পারলুম না।

বাসের ভেতরে সবাই ঢুলছে, চোখ বুজে। চিমার চোখ বোজা, তবে সে ঘুমোচ্ছে, না ওয়াকম্যান শুনছে ঠিক বোঝা গেল না। এই ভাবেই 'আধো ঘুমে আধো বসিয়ে' হাজির হলুম ঘাটে। কথায় বলে সাত ঘাটের জল খাওয়া। আমাদের এটা দ্বিতীয় ঘাট। 'হারউডস পয়েন্ট'—এর নাম। এখান থেকে লঞ্চে যেতে হবে ওপারে। কচুবেড়িয়ায়। দুটি লঞ্চ প্রস্তুত। পি. কে. খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা সীমারেখা টানলেন। জুনিয়াররা এক লঞ্চে। ভেটারানরা অন্যটিতে মন্ত্রীর সঙ্গে। সকাল থেকে দেখছিলুম একটি সরষের তেলের টিন চলেছে সঙ্গে। ভেবেছিলুম সাগরে খাঁটি ভোজ্য তেলের অভাব তাই কলকাতা থেকে যাচ্ছে। পরে জানলুম ওটি রসগোল্লার টিন। বিশ্বস্ত একজনের জিম্মায় রয়েছে। হারউডস পয়েন্টে দেখা গেল জিম্মাদার টিনটিসহ একবার লঞ্চে চড়ছেন, আবার মিনিট পাঁচেক বাদেই নেমে বাসের দিকে যাচ্ছেন। বার কয়েক এটি ঘটার পর বোঝা গেল সমস্যা কোথায়। ঐ লোভনীয় খাদ্যবস্তুটি কি সাগরে গিয়ে খাওয়া হবে, না সাগর থেকে ফিরে সেটির সদ্ব্যবহার হবে তাই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত। অবশেষে রসগোল্লার সাগরযাত্রা মধ্যপথেই স্থগিত রইল। আমরা ভটভটিয়ে রওনা দিলুম।

লঞ্চের ভটভটির আওয়াজ ছাপিয়ে পি.কে.-র গলা। তাঁর চেয়েও পুরনো দিনের খেলার সব গল্প হচ্ছে। বর্ণনায় মনে হয় তিনি যেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেন্ট জেমস্ স্কোয়ারে খেলা। সেভেন-এ-সাইড। সে-খেলায় শৈলেন মান্না, মেওয়ালালও ছিলেন। তিন দিন ধরে ড্র চলেছে। চতুর্থ দিনে মাঠে দাঁড়ায় কার সাধ্য। বৃষ্টিতে এঁটেল মাটি কাদা হয়ে গেছে। সুতরাং বল মারার আগেই ধপাধপ্ পতন। এরই মধ্যে একটি দল পেনাল্টি পেয়ে গেল। পেনাল্টি শট করবে মুৎসুদ্দী। কিন্তু মুৎসুদ্দী দৌড় শুরু করল উল্টোদিকের গোল পোস্ট থেকে। রেফারি বললেন: "একি অতদূর থেকে দৌড়চ্ছ কেন?" মুৎসুদ্দি তার ওপার বাংলার ভাষায় বলল: "আপনে আমারে দ্যাখান, কোনখানে ল্যাখা আছে পেনাল্টি শটের লাইগ্যা উল্টা দিকের গোল পোস্ট থিকা দৌড়াইতে পারুম না।" রেফারি অগত্যা নির্বাক্। কাদার মধ্যে সাপের মতো এঁকে বেঁকে সে ছুটে এল। গোল-কীপার রেডি। কিন্তু মুৎসুদ্দি বলে লাথি মারল না। বলের সামনে এসে দুদিকে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। ফলে বলটা রইল তার দুই থাই-এর মাঝে। এবং সেই অবস্থায় ঐ বিশাল দৌড়ের মোমেন্টামে সবেগে গোলের দিকে পিছলে চলল সে। গোল-রক্ষকের এমনিতেই নিজের পায়ের উপর খুব আস্থা ছিল না, তার মধ্যে টর্পেডোর মতো বল সমেত খেলোয়াড়কে তার দিকে ভীমবেগে আসতে দেখে সে কোনক্রমে পালাল। গোলে তখন নেট টেট থাকত না এসব খেলায়। মুৎসুদ্দী স-বল গোল ভেদ করে নালায়। সেইখান থেকেই তার চিৎকার—'আমারে টাইন্যা তোল—টাইন্যা তোল।' এদিকে সারা মাঠ তখন চেঁচাচ্ছে—'গো-ও-ল—গো-ও-ল।'

এমনি সব গল্প-গুজবের মধ্যে আমরা বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে হাজির হলুম কচুবেড়িয়ায়। এটি সাগরদ্বীপের একপ্রান্ত। আমাদের যেতে হবে অন্যপ্রান্তে। কচুবেড়িয়ার মাটিতে পা দিতে না দিতেই গান শুনতে পেলুম, 'ওহে সুন্দর মরি মরি।' আমি সুন্দর নই বলে তাড়াতাড়ি পেছনে লুকোলুম।

গল্প-গুজবের মধ্যে আমরা বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে হাজির হলুম কচুবেড়িয়ায়। এটি সাগরদ্বীপের একপ্রান্ত। আমাদের যেতে হবে অন্যপ্রান্তে।

এদিকে ঘাটের উপরেই একদল মেয়ে গানটির সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে নাচতে শুরু করেছে। এইরকম স্থানে ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে রীতিমতন হকচকিয়ে গেছলুম। এদিকে আরেক দল মেয়ে আমাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছে আর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে একটি করে গোলাপ ফুল। এই ছোট্ট অভ্যর্থনার আন্তরিকতা সত্যি-কারের মন স্পর্শ করল। শুনলুম মেয়েরা স্থানীয় স্কুলের ছাত্রী।

ওখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক প্রভঞ্জন মণ্ডল। তিনিই আয়োজনের হোতা। মণ্ডল মশাই আমাদের অপেক্ষারত গাড়িগুলিতে তুলে দিলেন। ভাগ্যক্রমে আমি মন্ত্রীর গাড়িতে স্থান পেলুম। গাড়ি রওনা দিল। তখনই টুপুরে টাপুরে বৃষ্টিও শুরু হল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি চারিদিকে ক্ষেত। শুনলুম এখানে তরমুজ খুব হয়। ধান চাষ তো হয়ই। দেখলুম বেশ কিছু লোক শুকনো লঙ্কার বস্তা নিয়ে যাচ্ছে, এখানে লঙ্কার ফলনও খুব। মন্ত্রীমশাই জানালেন, এই দ্বীপে সাক্ষরতার সংখ্যা শতকরা পঁচাশি ভাগ। রাস্তার দুপাশে দেখি সুন্দর গাছের সারি। আগে এগুলো ছিল না। সাগর ছিল ধু-ধু প্রান্তর। এখন স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের চেষ্টায় গাছ লাগানো হচ্ছে। মন্ত্রীমশাই বললেন উল্লেখযোগ্য-ভাবে বেড়েছে নারকেল গাছ। যেটা আগে ছিল না বললেই হয়। পথে দলে দলে লোক চলেছে হরিণবাড়ির দিকে। বাস-রাস্তার ধারেই তার অবস্থিতি। সেখানেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। ক্রমে আমরাও ঐ অঞ্চলে এসে পৌঁছুলুম। দেখি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন বিশাল জনতা টিকিটের জন্য। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তাতে ভ্রুক্ষেপও নেই। ভিড়ের মধ্যে গাড়ির গতি একটু শ্লথ। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে একজন পি. কে.-কে উদ্দেশ করে বললেন: "আপনাদের নাম আর ছবি দেখি কাগজে। আপনাদেরকে যে কখনও চাক্ষুষ দেখতে পাব একথা চিন্তাও করিনি কখনও। কলকাতায় গিয়ে তো খেলা দেখা আমাদের হয়ে ওঠে না।" কথাটা সত্যি। বাংলার বহু গ্রামই অত্যুৎসাহী হয়েও বড় বড় খেলোয়াড়, শিল্পীদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত। সেখানে যদি এধরনের খেলার ব্যবস্থা করা যায় তবে একাত্মবোধ গড়ে ওঠে বৈকি। অন্যথায় নিজের অজ্ঞাতেই অধিবাসীদের মধ্যে জমে ওঠে ক্ষোভ। ক্ষোভ আবার কখনো পরিণত হয় বিদ্বেষে। শহরের মানুষের সঙ্গে গ্রামের মানুষের একটা দূরত্ব গড়ে ওঠে। অথচ কত সহজেই একটি সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরি হতে পারে। তার দৃষ্টান্ত এইসব খেলা।

টুকিটাকি কথাবার্তায় জানতে পারলুম সাগর-দ্বীপ যদিও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অঙ্গ, এখানকার লোকজন বেশির ভাগই মেদিনীপুরাগত। এই দ্বীপ এবং আশে-পাশের অঞ্চলকে বলা হয় লাট। লাটে চাষবাস করতেই আগে আসতেন ঐ জেলা থেকে চাষীরা। ক্রমে তাঁদের অনেকেই থিতু হয়েছেন জমি-জায়গা কিনে। জানা গেল এই দ্বীপে সাত আটটি খেলার মাঠ নির্মিত হয়েছে গত পাঁচ ছ-বছরের মধ্যে। কিন্তু তাতে কুলোচ্ছিল না। তা-ছাড়া স্থানীয় যুবকদের খেলাধুলোর বিভিন্নতর বিভাগের প্রতি উৎসাহই কর্তৃপক্ষকে আগ্রহ জুগিয়েছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করার ব্যাপারে।

হরিণবাড়ি ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি আরও বেশ খানিকটা চলল। তারপর আমরা একটি ছায়াঘন স্থানে এসে হাজির হলুম। নারকেল ঝাউ সোনা-ঝুরির মেলার মধ্যে একটি অট্টালিকা রাস্তার ডান-পাশে। এটি ইয়ুথ হস্টেল। দোতলা। ওপরে নিচে পাঁচটি করে দশটি ভি. আই. পি রুম। অর্থাৎ দুই বিছানাযুক্ত কামরা। লাগোয়া স্নান ঘর। তাছাড়া

দুতলাতেই বিশাল বিশাল ডরমিটরি। ঘরের ভাড়া অত্যল্প। ভি. আই. পি রুমের জন্য দৈনিক চোদ্দ টাকা। আর ডরমিটরির প্রতিটি বিছানার জন্য পাঁচ টাকা।

আমরা পৌঁছুতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা। অবশ্যই মন্ত্রীমশায়ের জন্য। এদিকে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে টুপ টাপ করে। একটু কমতেই মন্ত্রীর আহ্বান : "চলুন সাগর দেখে আসি।" আমার মন অনেকক্ষণ ধরেই এটা চাইছিল। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে রওনা দিলুম। সঙ্গে পি. কে., সৌরীনবাবু। বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল জল। জল এবং রাস্তার শেষ সীমার মাঝে অনেকটা জমি। এসব জায়গায় মেলার সময় তাঁবু পড়ে। ইতিমধ্যেই সাধুদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ কয়েকটা খুপড়ি দখলও করে ফেলেছেন। এখানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস।

আমরা পৌঁছুতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা। অবশ্যই মন্ত্রীমশায়ের জন্য। এদিকে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে টুপ টাপ করে। একটু কমতেই মন্ত্রীর আহ্বান : "চলুন সাগর দেখে আসি।" আমার মন অনেকক্ষণ ধরেই এটা চাইছিল। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে রওনা দিলুম। সঙ্গে পি. কে., সৌরীনবাবু। বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল জল। জল এবং রাস্তার শেষ সীমার মাঝে অনেকটা জমি। এসব জায়গায় মেলার সময় তাঁবু পড়ে। ইতিমধ্যেই সাধুদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ কয়েকটা খুপড়ি দখলও করে ফেলেছেন। এখানে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস।

[redacted]

কিন্তু দুপা হাঁটতে না হাঁটতেই বৃষ্টি। দৌড় দৌড়। বাঁয়ে ছিল একটি মন্দির। সেখানে আশ্রয় নেওয়া গেল। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন ওখানে এসে পৌঁছেছেন। মন্দিরের পুরোহিতগণ সাগ্রহে স্বাগত জানালেন সকলকে। মাটিতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। আমরা সেখানে বসলাম। প্রসাদ বিতরণ হল। নকুল দানা, বাতাসা এবং নারকেল ফালি। এ-মন্দিরটিই কপিল মুনির আশ্রম। দাবি অনেক প্রাচীনত্বের। কিন্তু তার প্রমাণ নেই। প্রধান পুরোহিত শ্রীমহন্ত দীনবন্ধুদাসজীকে ইতিহাস শুধোলে যে উত্তর দিলেন তাতে মন ভরল না। তিনি শোনালেন সেই রামায়ণ-কথা। সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়ার খোঁজে তাঁর ষাট হাজার পুত্র এসে হাজির পাতালে। ঘোটকটি সেখানে দেখতে পেয়ে রাজপুত্রগণ মুনিবরকে চোর-অপবাদ দিলে ধ্যানরত কপিল মুনির ক্রোধদৃষ্টিতে তাঁরা ভস্মীভূত হন। অতঃপর ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করে তাঁর বারি-স্পর্শে সকলের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তবে এই মন্দিরটি নাকি আদি মন্দির নয়। জলের তলায় সেটি তলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এসে নতুন মন্দির গড়তে হয়েছে। সেটিও জলগর্ভে গেলে এটি নির্মিত হয়। কিন্তু সেই প্রাক্-রাম যুগে কপিলমুনি দক্ষিণবঙ্গে এসে তপস্যা করেছিলেন! অবাক হওয়ারই কথা। বিশেষতঃ আর্যরা বঙ্গদেশকে এড়িয়ে গেছেন বলেই জানা যায়। যাই হোক, মন্দিরের ভেতরের মূর্তিকটির দিকে তাকালুম। মধ্যস্থলে কপিলমুনির পাদদেশে ভগীরথ। তাঁর একপার্শ্বের দেওয়ালে ইন্দ্রদেব এবং শ্যামবর্ণ ঘোটক, অপর পার্শ্বে বিশালাক্ষী দেবী। মাঝে একস্থলে দেবনাগরী হরফে লেখা—'শ্রীপঞ্চ রামানন্দজী নির্বাণী আখড়া—হনুমানজী নগঢ়ী শ্রীঅযোধ্যাজী, শ্রীগদ্দীনশীন শ্রীমহন্ত দীনবন্ধুদাসজী সখরাকার শ্রীকপিল-মুনি মন্দির, গঙ্গাসাগর।' প্রধান পুরোহিত অযোধ্যার লোক বলে দাবি জানালেন।

এদিকে বৃষ্টি কমে গেছে। অতএব আবার সঙ্গম-পানে চলা। এসে পৌঁছে দেখি তিনদিকে বিশাল জলরাশি। নবকুমারের কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি মনে পড়ল, 'আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেধরািনিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।' এ-জলরাশি বছরে একবারই মানুষের পদপিষ্ট হয়ে থাকে। পৌষ-সংক্রান্তিতে। তাছাড়া সারা বৎসর আপন মনে বয়ে যায়। এর জলে ভেসে থাকে না ডাবের খোসা, পানমুড়ির ঠোঙা কিংবা মুরগির পালক। তাই এর জল বুক দিয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ঢেউ এখানে পুরীর মতো উদ্দাম নয়। তবে উচ্ছলতা আছে। সেটা বোধহয় ভাগীরথী তটিনীর

ছোঁয়ায়। সাগরের পুরুষোচিত গাম্ভীর্যে এই তরলতার স্পর্শ একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে। তাকে আর ততটা ভীষণ, ততটা পর মনে হয় না। আমরা জলের মধ্যে অনেকখানিই এগিয়ে গেলুম। ...বক্ষে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম দূরের দ্বীপ, জাহাজ ইত্যাদির দিকে।

ইতিমধ্যে চন্দন সিং এবং মেওয়ালাল এসে হাজির হ্যাফ্ প্যাণ্ট পরে। তাঁরা সমুদ্রে অবগাহন করবেন। চন্দন সিং নেবে গেলেন জলে। আর মেওয়ালালজি একটা টিনের মগ নিয়ে সাগর থেকে জল তুলে গায়ে ঢালতে শুরু করলেন। সবাই অবাক। এগিয়ে গিয়ে জিগেস করলুম: "এমন ব্যাপার তো দেখিনি কখনও।" তাঁর উত্তর: "ছোটবেলায় বাবা বলেছিলেন 'কখনও জলে নেমে স্নান করো না।' বাবার কথা তো ফেলতে পারি না।"

বেশ কিছুক্ষণ সাগর-সৌন্দর্য উপভোগ করে ফিরে চললুম যুব আবাসের দিকে। এবার একটু ঘুর পথে। পর্যটন বিভাগ এখানে একটি জায়গা নিয়েছেন যেটি দেখে যাব। দেখি স্থানটি বিশাল। বর্তমানে একটু নিচু। ভরাট করতে হবে। তবে এখান থেকে সমুদ্র-শোভা চমৎকার দেখা যাবে। মন্ত্রীমশাই-এর ইচ্ছে সাগর-মেলার সময় এখানে বিভিন্ন ধরনের তাঁবুর ব্যবস্থা করার, প্রয়োজনে হেলিকপ্টার সার্ভিসও করা যেতে পারে কলকাতা থেকে—বিদেশী পর্যটকদের জন্য। সারা বছর যাতে ভ্রমণার্থীরা এখানে সহজে আসতে পারেন তার জন্য যানবাহন পদ্ধতির সরলীকরণের কথাও তিনি ভেবে রেখেছেন। আমার কেমন যেন মনে হল আবোল তাবোল বা হযবরল গ্রামটি এখানে হলেই জমবে ভাল।

পথের দুধারে বেশ ঘন ঝাউবন তৈরি হয়েছে। সেটিও বেড়াবার জায়গা হিসেবে চমৎকার। মন্ত্রীমশাই বললেন এখানে তিনি বসবার জায়গা করে দেবেন ভ্রমণার্থীদের জন্য। আমারও মনে হল এই নির্জন ঝাউবীথিতে বসে ঘন ঘন হাওয়ায় শন-শন সাপ খেলাবার বাঁশী শুনতে শুনতে দিব্যি হারিয়ে যাওয়া যায়।

হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছুলুম যুব আবাসে। আসতেই কান্তি গাঙ্গুলী তাড়া দিলেন খেয়ে নেবার জন্য। একদলের ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এই পর্ব। অতএব আমরাও বসে পড়লুম।

ব্যাপারটা যে প্রভঞ্জনবাবু এতটা রাজকীয় করে তুলবেন বুঝতে পারিনি। থালায় দেখি বিশাল বিশাল রুই বা কাতলার পেটি। সঙ্গে ভাজা, ফুল-কপির তরকারি, এবং দৃষ্টি তির্যক করে দেবার মতো আরও নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন। স্যালাড, পাঁপড়, চাটনি, মিষ্টি ইত্যাদি তো আছেই। লালায়িত ব্রাহ্মণসন্তান আমি এবং প্রোজ্জ্বল বসে পড়লুম মন্ত্রীর পাশেই। টেবিলের ওপাশে পি. কে.। মন্ত্রীমশাই খেতে খেতেই বলছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ একটি পরিকল্পনার কথা। উপজাতিদের মধ্য থেকে বাছাই করা কিছু ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ শিক্ষার ভার তিনি নিতে চান ক্রীড়া বিভাগের পক্ষ থেকে। তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলে অবশ্যই পশ্চিম-বাঙলার ক্রীড়ামানের উন্নতি ঘটবে। তারাও পেটের চিন্তায় খেলাধূলাকে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হবে না প্রস্ফুটিত হবার আগেই। ওখানে উপস্থিত প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সাহায্য চাইলেন তিনি। বলা বাহুল্য সবাই সোৎসাহে সায় দিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে মিনিট পনের কাটতে না কাটতেই কান্তিবাবুর তাড়ায় গাড়িতে উঠে পড়তে হল। খেলার মাঠে উপস্থিত হতে হবে। অতএব রওনা দিতে বাধ্য হলুম।

গাড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে পৌঁছুতে দেখি সেখানে বিশাল জনসমুদ্র অপেক্ষা করছে খেলোয়াড়দের জন্য। প্রত্যাশিত স্বপ্নের মানুষগুলিকে দেখে তাদের হর্ষের বাঁধ ভেঙে পড়ল। যথাবিহিত রীতি অনুসারে স্পোর্টস কমপ্লেক্সটির উদ্বোধন করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। আইনমন্ত্রীও উপস্থিত সেখানে। সংক্ষিপ্ত ভাষণাদির পর খেলা। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দুই দলকে মিলিয়ে দুটি পক্ষ তৈরি হল। একপক্ষ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা একাদশ। অপরপক্ষ কলকাতা একাদশ। সুভাষ ভৌমিকের দেওয়া একমাত্র গোলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বিজয়ী হল। বর্ষীয়ান খেলোয়াড়েরা মাঠ পরিক্রমা করলেন বিরতির সময়। বৃষ্টির মধ্যেও প্রতিটি দর্শক স্বস্থানে উপস্থিত ছিলেন। এই শৃঙ্খলা দেখবার মতো।

খেলার শেষে পুরস্কার বিতরণান্তে পুনরায় গাড়িতে ওঠা। এইবার যাত্রা কচুবেড়িয়ার দিকে। সেখানে অপেক্ষা করছে লঞ্চ। নিয়ে যাবে হারউডস পয়েন্টে। কিন্তু না, থাক সেকথা। সে এক রীতিমত এ্যাডভেঞ্চারের গল্প। সুযোগ মতন বলা যাবে। আজ সাগরের মধুস্মৃতি দিয়েই শেষ করি।



মাধুকরী

সোভিয়েত রাষ্ট্র ও চার্চ

কনস্তানতিন খারচেভ

গত জুন মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা এবং রাশিয়ান অর্থডক্স চার্চের সহস্র বর্ষপূর্তি উৎসব মস্কো ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যত্র মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উৎসবের প্রাক্কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের ধর্ম বিষয়ক পর্ষদের সভাপতি কনস্তানতিন খারচেভের এই প্রবন্ধটি ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগ প্রকাশিত 'সোভিয়েত সমীক্ষা' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।—সংযুক্ত সম্পাদক

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিকে দেশে অত্যন্ত স্ববিরোধী ও অভিনব এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সোভিয়েত সরকার যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরে তাকে রক্ষা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিরাই ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ। সরকারের প্রথম পদক্ষেপগুলি—জমি, কলকারখানা ও খনি জাতীয়করণ, শান্তি ডিক্রি—তাঁদের কাছে পরিষ্কার করে দিচ্ছিল এই সরকার কাদের পক্ষে এবং কাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর যাজকদের একটা বড় অংশ ও চার্চের নেতৃত্ব ছিল প্রতিবিপ্লবের শিবিরে, ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের ওপর তাদের কর্তৃত্বও ছিল যথেষ্ট।

এই সবের দরুণ একদিকে ধর্ম থেকে জনসাধারণ সরে দাঁড়ান, কিন্তু তাতে জটিল, নাটকীয় সংঘাত এবং নানা ধরনের বাড়াবাড়ির মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সোভিয়েত সরকারের সুবিবেচিত ও সুষম নীতি রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার ব্যাপারে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায়ই লেনিনের স্বাক্ষরিত রাষ্ট্র থেকে চার্চকে এবং চার্চ থেকে বিদ্যালয়কে বিচ্ছিন্ন করার ডিক্রিটি গৃহীত হয়। চার্চ তাই আর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকল না এবং ধর্ম-বিশ্বাসীদের শুধু ধর্মীয় চাহিদাগুলি পূরণের কাজেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার এক বাস্তব সুযোগ লাভ করল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া চলেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। ১৯৮৫-র এপ্রিলের পর বিভিন্ন ধর্মের ১৭৩টি নতুন সংগঠনকে এদেশে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয় এবং ওই সময়ে ১০৭টি সংগঠনের নাম বাদ যায়। আজ ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষদের ধর্মাচরণের নানা প্রয়োজন মেটাতে চার্চ ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা এক কঠিন সময় ছিল। গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলে চারদিকে অনাহার, মহামারী ও বিশৃংখলা দেখা দিল। সেসময়ে অনেক ধর্মীয় সঙ্ঘই সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করল। দুখোবোর সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী যে অনাহারক্লিষ্টদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল এবং যাজক সম্প্রদায়ের লোকজন যে স্বেচ্ছায় আক্রান্ত ব্যারাকগুলিতে গিয়ে চিকিৎসার কাজে সাহায্য করেছেন সেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

চার্চের সংবাদপত্র ও পত্রিকা সেসময়ে প্রকাশিত হত। ধর্ম-বিশ্বাসীদের কোন কোন গোষ্ঠী সামরিক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাগরিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে সোভিয়েত আইনে তাদের চিকিৎসার ইউনিটে কাজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও যাজকদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সমস্ত সম্ভাবনাই নীতিগতভাবে রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়; লেনিনবাদী মান অনুযায়ী এই সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। তাদের কাজকর্ম জনগণের সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলে অন্য কথা। তখন জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য চরম ধরনের ব্যবস্থা সমেত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, যখন আর বাধা-নিষেধের এবং বিশেষ পরিস্থিতির দরুন নিষেধাজ্ঞা জারী রাখার প্রয়োজন ছিল না তখনও তার অনেকগুলিই বলবৎ থেকেছে।

দুঃখের বিষয় হলেও, জনগণকে ধর্ম থেকে সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া জোরদার করার বাসনায় অনেক স্থানেই অমানুষিক ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়; ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের অধিকারে বেআইনী বিধিনিষেধ আরোপ করে হস্তক্ষেপ করা হয়। সময় সময় স্থানীয় সরকারী সংস্থাগুলির কাজকর্ম অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে; মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে যাজককে নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, গীর্জার ঘণ্টা বাজানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে, প্রার্থনাভবন মেরামত করতে কিংবা তাতে বিদ্যুৎ দিতে অস্বীকার করার ঘটনাও ঘটেছে।

[সোভিয়েত ইউনিয়নে]
২৫ হাজার ধর্মযাজক রয়েছেন।
২৬ কোটি রুবল বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের
মোট বাৎসরিক আয়।

পার্টি ও রাষ্ট্র 'ধর্মের বিরুদ্ধে এই ধরনের 'লড়াইকে' অবিচলভাবে নিন্দা করে এসেছে এবং একে সমাজতান্ত্রিক নিয়মানুগতা, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা লঙ্ঘনের এবং ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের প্রতি মনোভাবের লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লঙ্ঘনের ঘটনা হিসেবে ধিক্কার জানিয়েছে। ধর্ম-বিষয়ক পর্যদ্ এই ধরনের লঙ্ঘনের ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এর প্রতিকারের চেষ্টা করে। পর্যদকেও ঢেলে সাজাতে হবে এবং আমলাতন্ত্র মুক্ত করতে হবে, আর ধর্ম সংক্রান্ত আইনও উন্নত করতে হবে।

পুনর্গঠনের প্রভাব যে ধর্মীয় পরিস্থিতির উপরও পড়তে শুরু করেছে পরিসংখ্যান থেকেই তা দেখা যায়। সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির এপ্রিল মাসের পূর্ণাঙ্গ সভার পর নানা ধর্মে বিশ্বাসীদের ১৭৩টি সমিতি রেজেস্ট্রি হয়েছে। (সেইসঙ্গে ১০৭টি সমিতি রেজেস্ট্রি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে) ১৩৮টি প্রার্থনাভবন (রাশিয়ান অর্থডকস্ চার্চের ৩৫টি, ইভানগেলিক্যাল ক্রিশ্চান ব্যাপটিস্টদের ৪৯টি, সেভেনথ ডে এ্যাডভেনটিস্টদের ১২টি, পেন্টেকোস্টালদের ৯টি এবং মুসলমানদের ১১টি সমেত) গত ২৫ বছরে নির্মিত বা পুনর্গঠিত হয়েছে।

পর্যদ্ এ দেশে গত ২০-২৫ বছরের ধর্ম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করেছে। ধর্মীয় সমিতি প্রায় ৩৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে এরকম ১৫,০০০-এর বেশি সমিতি রয়েছে। ব্যাপটিজম-এ দীক্ষিত হওয়ার সংখ্যা কিছুটা করে কমেছে। আর ধর্মীয় উপাসনা বাড়ছে মোলদাভীয়, তাজিক, এস্তোনীয় প্রজাতন্ত্রে এবং রুশ ফেডারেশন ও উক্রাইনের কোন কোন অঞ্চলে। একথা, সর্বোপরি, শেষকৃত্যের বেলায় প্রযোজ্য; মধ্য এশিয়া, আজারবাইজান ও উত্তর ককেশাসে স্থানীয় অধিবাসীদের যাঁরা মারা যান তাঁদের প্রায় সবাইকেই নিজ নিজ ধর্মীয় প্রথায় কবর দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত সারণী চিন্তার খোরাক যোগাবে। প্রথমটিতে গত প'চিশ বছরে ধর্মীয় সমিতির সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সংখ্যা (১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এই সংখ্যা রাখা হচ্ছে) দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় সমিতির সংখ্যা

বিশ্বাস	১৯৬১	১৯৬৬	১৯৭১	১৯৭৬	১৯৮১	১৯৮৬
রাশিয়ান অর্থডকস্ চার্চ	১১,৭৪২	৭,৫২৩	৭,২৭৪	৭,০৩৮	৭,০০৭	৬;৭৯৪
ক্যাথলিক চার্চ	১,১৭৯	১,১১৬	১,০৮৭	১,০৭০	১,১০২	১,০৯৯
ইসলাম ধর্ম	২,৩০৭	১,৮২০	১,০৮৭	১,০৬৯	৯৫৪	৭৫১
ইহুদী ধর্ম	২৫৯	২৩৮	২২০	১৮৯	১৩০	১০৯
ইভানগেলিক্যাল ক্রিশ্চান ব্যাপটিস্ট	২,৯১৭	৩,০৫৪	২,৯৬৪	২,৯৮১	৩,০৭৮	২,৯৬৭
পেন্টেকোণ্টাল	১,০০৬	৯০৪	৯৬৫	৭৭৫	৮৬৩	৮৪৩
সেভেনথ্ ডে এ্যাডভেণ্টিস্ট	৩১৯	৩৭২	৩৫০	৩৮১	৪৩৪	৪৪৫
জেহোভাস উইটনেস	৬০৭	৪৬৮	৪৮০	৪১১	৪১১	৩৭৮
মোট (অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস মিলিয়ে)	২২,৬৯৮	১৭,৫০৭	১৬,০২৩	১৫,৬১৭	১৫,৭১৩	১৫,০৩৬

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান

(ধর্মীয় সংগঠনসমূহের তথ্য অনুযায়ী)

আচার অনুষ্ঠান	১৯৬৬	১৯৭১	১৯৭৬	১৯৮১	১৯৮৬
ব্যাপটিজম	১০১৭,২২৮	৯৬৫,১৮৮	৮০৮,৪৭৮	৮৩০,৫৯৬	৭৭৪,৭৪৭
এর মধ্যে : শিশুদের ব্যাপটিজম	১০,২৬১	২৯,৩৩৫	২৫,৬৮২	৪০,২৫৩	৪০,৪৬৯
প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যাপটিজম	—	২১,৬৮০	২৬,৮১৮	৪৫,১৭৮	৫১,৮৬৪
কনফারমেশন	—	২৩,০৪৯	২৪,৩৮৩	২৭,৩৩৩	২৫,১৪৫
বিবাহ	৬০,৫১৬	৭৯,৩৫৬	৭৪,৯৮৮	১০৬,২৫৯	৭৯,৮৪০
শেষকৃত্য	৮৪৮,৮০৫	৯৯০,৬১৮	১০৯৬,১৯০	১১২৫,০৫৮	১১৭৯,০৫১

দেশের ধর্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি চার্চের যাজক ও অন্যান্য কর্মীদের যোগান দিচ্ছে। ষাটের এমনকি সত্তরের দশকেও যাজকদের প্রধান অংশের বয়স ৬০ বছর বা তারও বেশি ছিল। বর্তমানে সেটা ৪০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। বিশপদের ৮০ শতাংশই এখন উচ্চ ধর্মশিক্ষাপ্রাপ্ত। গত ১৫ বছরে ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে এখন ২৫০০ হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, ধর্মবিশ্বাসীদের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপক সুযোগ এখন চার্চের রয়েছে সমস্ত ধর্মবিশ্বাস একত্রীকৃত ধর্মীয় সংস্থাগুলির নগদ রাজস্বের পরিমাণ গত ২০ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬ কোটি রুবল হয়েছে। এটা প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাসীদের স্বেচ্ছায় দান করা অর্থ। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, অগুস্ত অনুসারে, জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ এই অর্থ দান করছেন।

রাশিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের সহস্রতম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মে। জাতীয় উৎসবের দিনের মধ্যে একে আমি ফেলব না। কিন্তু এটি এ দেশের বিভিন্ন ক্রিশ্চান ধর্মমতে বিশ্বাসীদের কাছে, আর অবশ্যই রাশিয়ান অর্থডকস্ চার্চের কাছে উৎসবের দিন।

রুশ এবং পশ্চিমের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রসারিত করায় এবং লিখিত ভাষা, স্থাপত্যশিল্প ও চিত্রকলার বিকাশ ঘটানোতে অর্থডক্সি যে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে তা অস্বীকার করা ভুল হবে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠনেও চার্চের ভূমিকা ছিল এবং দেশাত্মবোধক কর্মপ্রয়াসে এর প্রতিনিধিদের অবদানও তর্কাতীত। নাৎসী হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের মহাযুদ্ধের সময় চার্চ তার নিজের তহবিল থেকেই আলেকজান্দার নেভস্কির নামানুসারে একটি স্কোয়াড্রন এবং দমিত্রি দোনস্কোই ট্যাংক কলম গঠন করেছিল।

অবশ্য একথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে অর্থডকস্ চার্চ রুশ এলাকায় চিন্তার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সেখানকার খ্রীষ্টপূর্ব সংস্কৃতির প্রাচীন স্মারকগুলি ধ্বংস করেছিল এবং রুশ সাম্রাজ্যের বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ 'হেটেরোডকস্' (যারা অর্থডকস্ নয়) ও অ-রুশ অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে শরিক হয়েছে। অর্থডকস্ চার্চ কেবল যে শাসকশ্রেণী ও জারতন্ত্রকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছে এবং শ্রমজীবী মানুষকে বন্ধনদশায় আবদ্ধ রাখতে তাদের সাহায্য করেছে তাই নয়, কালক্রমে তারা পরিণত হয়েছে বড় বড় ভূস্বামীতে ও রুশ জনগণের শোষকে। এটা ইতিহাসেরই কথা, আর নিরীশ্বরবাদ বা ধর্মের পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী তা বদলানো যাবে না।

কেউই অবশ্য অর্থডকস্ চার্চকে তার জয়ন্তী পালন করা থেকে নিবৃত্ত করছে না, যে-কথা পশ্চিমে বলা হচ্ছে। ওই সমস্তই নিছক কুৎসা। বরং উল্টোটাই হচ্ছে, ধর্মবিষয়ক পর্ষদ্ অর্থডকস্ চার্চকে তার উৎসব পালনের জন্য নানাভাবে যথেষ্ট সহায়তা করছে।

জয়ন্তীর প্রাক্কালে সোভিয়েত সরকার চার্চের হাতে তুলে দিয়েছে মস্কোর সেন্ট দানিয়েলের মঠটি। এসব কিছুই করা হচ্ছে ধর্মীয় উপাসনা সংক্রান্ত আমাদের আইনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে।*

---

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সোভিয়েত সমীক্ষা (প্রকাশক : ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগ, কলিকাতা), ২৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৮, পৃঃ ২৫-২৯

সার্ধশতবর্ষে কবি হেমচন্দ্র ঃ এক বিস্মৃত কবি-ব্যক্তিত্ব

সুশীলকুমার রুদ্র

উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যে এক উজ্জ্বল কবি-ব্যক্তিত্ব হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলার মিলটন' হিসেবেই একসময় তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। হেমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই অভিধা যেমন কবিসত্তার দিক থেকে সত্য, তেমনি উভয় কবির ব্যক্তি-জীবনের পরিণতির দিক থেকেও যথার্থ। হেমচন্দ্র শেষ বয়সে অন্ধত্বের অন্ধকারে জীবন কাটিয়েছিলেন; মিলটনেরও একই পরিণতি ঘটেছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল (৬ বৈশাখ ১২৪৫ বঙ্গাব্দ)। সুতরাং বছরে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হল। ভাবলে বিস্ময় জাগে, গত শতাব্দীতে যে-কবি বাংলাদেশের কাব্যরসিকজনকে অজস্র কাব্য উপহার দিয়ে তাঁদের হৃদয়-মনকে জয় করে নিয়েছিল, আজ আর তাঁর কাব্য আমাদের আধুনিক মনকে তেমন রসসিক্ত করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুক্ত, কিন্তু সেক্ষেত্রে কাব্য-পাঠ নিতান্তই পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হওয়ার তাগিদে। কিন্তু আমরা যারা ঐ শতকের জীবন ও সাহিত্যকে গভীরভাবে জানতে ইচ্ছা করি, তাদের কাছে হেমচন্দ্রের কাব্য অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। শুধুমাত্র গত শতাব্দী কেন, বর্তমান কালের সমাজ ও সংস্কৃতির দুর্দিনে এই কবির কাব্য-কবিতা আমাদের অশেষ প্রেরণা জোগাতে পারে। স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, স্বদেশের মুক্তি ও সার্বিক উন্নতি কবির কাঙ্ক্ষিত ছিল। শুধু কবিতার জন্য কবিতা নয়, জাতীয় জীবন ও মানব-কল্যাণের স্বপ্ন ও চিন্তাতে বিভোর হয়েই তিনি কবিতা-চর্চা করেছিলেন। হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সার্থকতা ঐ নিরিখেই বিচার্য।

উনিশ শতকের কবিতাকুঞ্জে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় কবির মধ্যে হেমচন্দ্র নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। মধুসূদন সর্বশ্রেষ্ঠ। মধুসূদনের প্রতিভাকে অতিক্রম করার শক্তি বা সামর্থ্য হেমচন্দ্রের ছিল না; কিন্তু তাঁর প্রতিভাকে অস্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত হবে না। সে-যুগের বাংলাকাব্যে তিনি ছিলেন একজন আধুনিক কবি। বলাবাহুল্য, তাঁর কাব্যের সেই আধুনিকতা কালধর্মে চিহ্নিত। কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন ঃ 'কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক' (কুরুক্ষেত্র, ৯ম সর্গ)। মধু-হেম-নবীন —এই তিন কবি যুগধর্মের দ্বারা বেশিমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। নব-মানবতাবাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বদেশচিন্তা, নারীজাগৃতি, বিজ্ঞান-মনস্কতা—প্রভৃতি ছিল গত শতকের নবীন মানুষের জীবনধর্ম। সাহিত্যেও এর ছাপ সুস্পষ্ট। চিরকালীনতা যদি আধুনিকতার অন্যতর বৈশিষ্ট্য হয়, তবে ঐসব কবিদের মধ্যে তা দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মূল ভিত্তি হিসেবে রসের নিত্যতাকে নির্দেশ করেছেন তাঁর 'সাহিত্য' প্রবন্ধে। এঁদের কাব্যে রসের নিত্যতা খুঁজলে আমরা ব্যর্থ হব। আর সে-কারণেই মধু-হেম-নবীনের কাব্য এখন আমাদের মনে আর হিল্লোল তোলে না; কিন্তু কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আবেদন আজও অম্লান, ক্রিয়াশীল মানুষের হৃদয়-মনে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যুগ কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আজও আধুনিকতম। জোর করে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে একদিন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, শেষ অবধি তাঁদেরকেই রবীন্দ্র-ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছে।

কবি হেমচন্দ্রের প্রতিভা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যের দিক দিয়ে তিনি নিতান্তই অবহেলিত ছিলেন না। হেমচন্দ্রের কবিতা যখন বিহারীলালের 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তখন বালক রবীন্দ্রনাথ সেসব কবিতা পড়ে মুগ্ধ হচ্ছেন। নিয়মিতভাবে তিনি ও কাদম্বরী দেবী একত্রে বঙ্কিমের উপন্যাস ও হেমচন্দ্রের কবিতাবলী পাঠ করছেন। অপরদিকে বয়সে চোদ্দ বৎসরের বড় মধুসূদনের 'মেঘনাদ-

বধ কাব্য' বয়ঃকনিষ্ঠ হেমচন্দ্রের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। সেটা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মধুসূদনের বয়স তখন আটত্রিশ, হেমচন্দ্রের চব্বিশ। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন তাঁর পত্রিকায়। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ থেকেই হেমচন্দ্রের কবিতা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এবং স্পষ্টতই তিনি ঐ পত্রিকার নিয়মিত এবং প্রধানতম কবি। দ্বিতীয়বর্ষে যখন বঙ্গদর্শন, সেসময় মধুসূদনের তিরোভাব ঘটল—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন। ভাদ্র সংখ্যায় 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' এই শিরোনামে মাইকেলের পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ মুদ্রিত হয়েছিল। এতে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এবং পরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দুটি শোক কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। নবীনচন্দ্রের কবিতার সূত্র ধরেই বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিম মন্তব্য করেছিলেনঃ "কিন্তু 'বঙ্গকবি সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনো রোদন করিব না।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। আর একটি দিক থেকে হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ যে-বছর জন্মগ্রহণ করেন, সে-বছরই হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তাঁর নিজস্ব প্রতিভা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত হেমচন্দ্র সমকালীন বাঙালী পাঠকের মন ও রুচিকে তাঁর অসংখ্য কাব্য উপহার দিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। তাঁর কাব্যে এমন কি ছিল যা সমকালীন পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিল? তাঁর কাব্য থেকে আধুনিকতার কোন সোমরস পান করে সেকালের শিক্ষিত পাঠকেরা নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন? হেমচন্দ্রের কাব্যে সেইসব আধুনিক সূত্র সন্ধান করলেই উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

মধুসূদন তাঁর সৃজনীশক্তির মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যে যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন; আর কবি হিসেবে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব তারই অন্যতম ফলশ্রুতি। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য যে, হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ছিল ভিন্নমুখী। তিনি মহাকাব্য লিখেছেন, গীতিকাব্য লিখেছেন। কিন্তু গীতিকবিতার জগতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন। অসংখ্য কাব্য-কবিতা লিখেছেন একজন প্রধান কবির মতোই। সেকালের পাঠক-পাঠিকারা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', বিহারীলালের 'অবোধবন্ধু', এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা থেকে নিয়মিতভাবে হেমচন্দ্রের কবিতা উপহার পেতেন। বঙ্কিমের উপন্যাসও সেইসময় বাঙালীর সাহিত্য-রুচিকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। আধুনিক জীবন-ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় হেমচন্দ্রের কবিতায়। সময়কে ঘিরেই তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল আধুনিকতার সুর। কবির আধুনিক-মানস গঠনে যুগ-জীবন গভীরভাবে সক্রিয় ছিল। উনিশ শতকের বাংলাদেশে এক চিত্ত জাগরণ ঘটেছিল। এই জাগরণের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল বেকন-লক-পেইন-এর জীবনজিজ্ঞাসা। এঁদের পথে পা বাড়িয়ে বাঙালী এক বুদ্ধিসর্বস্ব জীবনচেতনায় ঝুঁকে ছিল। মধুসূদনের মননে Deist Philosophy গভীর রেখাপাত করেছিল। আর হেমচন্দ্র বা সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মনে কোমৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) এবং মিলের হিতবাদ (Utilitarianism) স্থান করে নিয়েছিল। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙালীর বুদ্ধি মুক্তি ঘটল। দেশীয় ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের নানা কথা আবিষ্কার হল। আর্যদর্শন, বান্ধব, ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি পত্রিকায় দেশপ্রেমের জ্বলন্ত বাণী উৎসারিত হল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন করলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' হিন্দু বিষয়ক এক বক্তৃতা প্রকাশিত হল; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ দেশপ্রেম ও হিন্দু জাতীয়তাকে কল্পনাবৃত্তি ও হৃদয়ানুভূতির মাধ্যমে বাণীরূপ দিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলবার্ট

বিলের বিরুদ্ধে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যে আন্দোলন করেছিল, তাতে ভারতীয়রা বিক্ষুব্ধ হল। ব্রিটিশ সরকারের শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতি এদেশের মানুষদের চরম অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ঐ শতকের শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে এবং স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-যুবক এক যুগান্তকারী ভাবান্দোলনের সূচনা করলেন। সব মিলিয়ে সেসময় বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার বুকে নতুন ভারতবর্ষ গড়ার এক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। হেমচন্দ্রের প্রগতিশীল আধুনিক মন এসব থেকে দূরে থাকতে পারেননি।

১৮৫০ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ—হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কালপর্ব। এর পরের কুড়ি-বাইশ বছর তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির স্বর্ণযুগ। বহির্মুখী মন নিয়ে কবি কাব্যরচনায় ব্রতী হলেও সৃষ্টির প্রাচুর্যে বাংলা কাব্য-ভাণ্ডারকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। আমাদের মনে হয়, এদিক থেকে বিবেচনা করেই হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁকে মধুসূদন-বিহারীলালের পাশাপাশি 'Major poet' রূপেই পরিগণিত করেছেন। এমনও হয়েছে তিনি মক্কেল-মামলা ভুলে গিয়ে নিভৃতে কাব্যরচনা করে চলেছেন। ১৮৬১ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ এই দীর্ঘ সময় তিনি কাব্যরচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা মোট আঠারোটি। বেশির ভাগ কাব্যের মধ্যে হেমচন্দ্রের যে মনোভাবটি প্রকটিত তার মূল উৎস স্বদেশপ্রীতি ও হিন্দুজাতীয়তাবাদ। হিন্দুধর্মাচারণের প্রতি কবির ছিল স্বভাবসুলভ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। এ থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কবিত্বের আধারটি গড়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্মের প্রাচীন আদর্শের প্রতি কবির কী গভীর অনুরাগ ছিল সে-সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। কেশবচন্দ্র সেন একবার তাঁর মতো শিক্ষিত হিন্দু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেছিলেন; হেমচন্দ্র তার উত্তরে 'Brahmo Theism in India' পুস্তিকাটি লিখেছিলেন। এতে তিনি শিক্ষিত বাঙালীর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্যে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকাশ সুস্পষ্ট।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লেখা। বন্ধুর আত্মহননকে কেন্দ্র করে এ-কাব্যের পরিকল্পনা। একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিই এ-কাব্যের উপজীব্য। যেটুকু আধুনিকতার সুর শোনা যায় তা হল : এ-কাব্যে দেশপ্রেমের পরিচয় আছে, ভিক্টোরিয়ান কবি-দার্শনিকের মতো নারীমুক্তির প্রতি সহানুভূতি আছে এবং সমস্ত কিছুর উপর আছে কবির স্বভাব-সুলভ বিষণ্ণতা। এই বিষণ্ণতার মাঝে ফুটে উঠেছে নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন। 'চিন্তাতরঙ্গিনী'তে কবি বলেছেন :

ইচ্ছা করে একবার পৃথিবী ঘুরিয়া।
নূতন মানবজাতি আনি হে গড়িয়া॥
কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথর পরে কেন ডুবাইল॥

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র মধ্যে যে দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অনুতাপের অশ্রুজল বহমান, কিন্তু হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি বলিষ্ঠ চেতনায় ভরপুর। হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য 'বীরবাহু'তে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনর্গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রচেষ্টার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

মধুসূদনের সমস্ত খ্যাতি যেমন, 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে ঘিরে, হেমচন্দ্রের তেমনি 'বৃত্রসংহারে'র সুবাদে। দুটি খণ্ডে এই কাব্যখানি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭-এর ১৫ সেপ্টেম্বর। বিরাট পরিসরে বহু ঘটনা ও বহু চরিত্রের সমাবেশে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। মহাকাব্যিক বিশালতা-বিস্তৃতি সবই এ-কাব্যে আছে, নেই কেবল মহাকাব্যিক ঊদাত্ততা (sublimity)। নবজাগরণের যুগে বাংলাসাহিত্যে পুরাণ ও ইতিহাসের নব ব্যাখ্যানের যে-ধারাটি শুরু হয়েছিল রঙ্গলাল ও মধুসূদনের হাতে, হেমচন্দ্র সেই ধারাটিকেই অনুসরণ করেছিলেন। মধুসূদন পুরাণের রসাবেদন, ঘটনা ও চরিত্র ভাবনাকে আমূল পরিবর্তন করে বাংলাকাব্যের আধুনিকীকরণ করেছিলেন। হেমচন্দ্র অবশ্য এত গভীরভাবে পারেননি। তিনি পুরাণ বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মানবিক দৃষ্টি, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীরতর যুক্তিবাদের আলোকে প্রকাশ করেছেন। এসব ব্যতীত স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধও এ-কাব্যে

ঘনীভূতরূপে প্রকাশ পেয়েছে। বৃত্রের প্রবল পরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের পরাভব ও স্বর্গচ্যুতি গৌরবহারা সমকালীন ভারতবাসীর অন্তর বাণীটিই বেজে উঠেছে। ইন্দ্রের কঠোর সাধনা দধীচির আত্মদানে হারানো স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরে পাবার কল্পনায় ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উঁকি দিয়েছে। শচীর মুখে স্বাধীনতা-প্রীতির কথায় নবযুগের বাণীই প্রকাশ পেয়েছে ঃ

স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস ;
সসর্গ গৃহেতে বাস, পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ,
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ।

ঐন্দ্রিলার কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে নারীমুক্তির বাণী। কোমতের 'Subjection of women'-এর প্রভাবই হেমচন্দ্রের এ চরিত্র-সৃষ্টি। বর্তমান বিশ্বে নারী-মুক্তি নিয়ে যে আন্দোলন সোচ্চার, সেই নারীমুক্তি তথা অধিকারের কথা হেমচন্দ্র গত শতাব্দীতেই ঐন্দ্রিলার মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছেন ঃ

বামা আমা, দনুজেন্দ্র, রমণী কি হেয় ?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা ?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী

উনিশ শতকে বাঙালীজাতির মধ্যে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল, যে নতুন দেশ গড়ার ইচ্ছা জেগেছিল, হেমচন্দ্র তাঁর মহাকাব্যে তাকেই কাব্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। যেকোন দেশের, যেকোন ভাষার মহাকবিই সমকালীন যুগভাবনাকে তাঁদের কাব্যে বাণীরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ভার্জিল, মিলটন, প্রভৃতি সকলেই স্বকালের বিশাল অভিজ্ঞতা ও যুগসত্যকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছিলেন। ভার্জিল চেয়েছিলেন রোমের ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা করতে, মিলটন ভাষাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ভগবৎ অনুগ্রহের চিরন্তনী বাণী। হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বদেশের স্বাধীনতা ও মানব-মুক্তির বাণীই বিঘোষিত। সে-কারণে উনিশ শতকে এ-কাব্যের যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন হেমচন্দ্র সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন ঃ "সেযুগে বৃত্রসংহার যে শিক্ষিত যুবকগণের চিত্ত প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, উহার কারণ এই যে, তদানীন্তন শিক্ষিত জন-মানসের নবজাগ্রত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।"[১] দেবগণের কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগ ঘটনার মধ্য দিয়ে কবি হেমচন্দ্র যুগপৎ স্বদেশপ্রেম ও মানবতার আদর্শ স্থাপন করেছেন। দধীচির আদর্শ পৌরাণিক, কিন্তু হেমচন্দ্রের দধীচি যেন পাশ্চাত্যের 'ন্যাশন্যালিজম' এবং 'হিউম্যানিজম'-এর প্রাণপুরুষ। কবির 'ভারত-সঙ্গীত' 'কবিতাবলী' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যেও দেশ-প্রেমের কথা, জাতীয়তাবাদের কথা আছে। একারণে এসব কাব্য সেযুগে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

হেমচন্দ্র আর একটি কাব্যের জন্যও বেশ কিছু খ্যাতি পেয়েছিলেন। তা হল 'দশমহাবিদ্যা'। এই কাব্যে পুরাণ-তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির সুগভীর ইতিহাসচেতনা। পুরাণ-তন্ত্রের মধ্যে সমাজ-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলিকে কবি লক্ষ্য করেছেন। কবির সুপ্রখর বিজ্ঞান-দৃষ্টি ঐ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল ছিল। এ-প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন ঃ

"দশমহাবিদ্যা বুঝিতে হইলে এই কথা কয়টি মনে রাখিতে হইবে। যে মহাতত্ত্বের ভিত্তিতে এই গীতি-কাব্য দাঁড়াইয়াছে তাহা এখানে Evolution বা ক্রম-বিকাশ নামে সুপরিচিত। আমাদের কবি বৃত্রসংহার কাব্যের নানা স্থানে জড়-জগতের বিকাশমাত্র দেখাইয়া-ছিলেন।··· উপস্থিত কাব্যে তাঁহার লক্ষ্য জীব-জগতের বিকাশ। সেই বিকাশ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া তিনি মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন।"[২]

হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে এখন আমরা তেমন উৎসাহ দেখাই না। কারণ, সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন ঘটেছে রুচি ও মানসিকতার। সাধারণ কবিতা-পাঠক তাই হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতা পড়ার তাগিদ পান না। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের জাতীয়-সঙ্কটে হেমচন্দ্রের ঐ স্বদেশপ্রেম—ঐ মানবপ্রেম আমাদের কি কোন প্রেরণা যোগাতে পারে না ?

১ উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২২৪
২· দ্রঃ হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২১০

ছোটরাম পণ্ডিত

দীপ্তিকুমার শীল

আমি যে সাহিত্যিক হব এটা বলেছিলেন ছোটরাম পণ্ডিত অনেক দিন আগে আমার ছোটবেলায়। ছোটরাম পণ্ডিতের খুব দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি লম্বা ক্লাসঘরের শেষ প্রান্তে—লাস্ট বেঞ্চে বসে-থাকা আমাকে লক্ষ্য রাখতেন ঠিক। আমার বহুমুখী প্রতিভা বহুধারায় প্রকাশিত দেখে উনি সদা-সর্বদা আমায় চোখে চোখে রাখতেন।

একদিন ছোটরাম পণ্ডিত ক্লাসে ঢুকে সটান আমার পাশে এসে টান টান হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন: "এই যে বাবু-ছেলে, পড়া করে এসেছ?" আমি বললাম: "কোন পড়া?" উনি বললেন: "কাল যে পড়া দিয়েছিলাম; 'নর' শব্দ মুখস্থ করা। লিখে আনতেও বলেছিলাম। দেখি, খাতা দেখি।" আমার দেখানোর আগেই তিনি সামনে পড়ে-থাকা আমার খাতার পাতা ওলটাতে লাগলেন। যতই পাতা ওলটান ততই দেখি ওনার চোখ-মুখের ভাব পালটায়। আমি তো ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছি ওঁর দিকে। হঠাৎ উনি চিৎকার করে বলে ওঠেন: "এটা কি?" আমি বলি: "এটা শব্দ-রূপ।"

"কোন শব্দ-রূপ?"

আপনার দেওয়া শব্দ-রূপ, পণ্ডিতমশাই। 'আমার দেওয়া শব্দ-রূপ?' বলে নিজেই খাতার একটার পর একটা পাতা দেখে যেতে লাগলেন তিনি। আমি তো জানি কি লিখেছি। প্রথম পাতায় লেখা আছে:

নরঃ নরৌ নরাঃ
বেঞ্চির ওপর দাঁড়া।
ছোটরামের বেতটি খেয়ে
প্রাণটা খাঁচা-ছাড়া॥

পরের পাতায় লেখা:

ছোটরামের গাঁট্টা
খাও যদি আটটা।
চোখ বুজেই দেখবে খাসা
সর্ষে ফুলের মাঠটা॥

পণ্ডিতমশায়ের চোয়াল ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে দেখছি অসহায় চোখে। তারপর সেই রণহুংকার! রেগে আগুন ছোটরাম পণ্ডিত দুরদর্শনের রাবণের মতো এক হুংকার ছেড়ে বললেন: আয় বেরিয়ে আয় এদিকে। ছড়াকার হয়েছ! বেত মেরে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে তাদিয়ে বাঁদরনাচের ডুগ্‌ডুগি বানাবো।

পণ্ডিতমশাইয়ের লম্ফ-ঝম্প দেখে আমি তো হাই বেঞ্চের খাঁজে নিজেকে আটকে রেখেছি। আর উনি হুংকার দিয়েই চলেছেন। তারপর আমার হাত ধরে বেঞ্চের খাঁজ থেকে বের করে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চললেন—তাঁর বসার প্ল্যাটফরমের কাছে। অনেকটা সীতা-হরণের দৃশ্যের মতো।

পাঁঠা জবাই করার যেমন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকে, তেমনি ক্লাসঘরের প্ল্যাটফরমটা হলো ছোটরাম পণ্ডিতের ছেলে পেটাবার আদর্শ জায়গা। আমি ঐ আদর্শ জায়গায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই—না গাঁট্টা নয়—তাঁর বেতের বাঁকানো লাঠি দিয়ে প্রথমেই দমাদম দু-ঘা। বেতের সেই দুটো-স্ট্রোক পিঠে পড়ার পরই আমি তো এক লঙ্ জাম্পে ক্লাসের দরজা পার। সেদিনের মতো আর ক্লাসে ঢুকিনি।

আর একবার পরীক্ষার পর খাতা নিয়ে ক্লাসে এলেন পণ্ডিতমশাই। ঘরে ঢুকেই আমাকে ডাকলেন। বললেন: এই যে বাবু-ছেলে, এটি তোমার খাতা?

আমি বললাম: আজ্ঞে হ্যাঁ।

এ লেখা তোমার?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি নিজে লিখেছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উনি বিকট একটা শব্দ তুলে বললেনঃ ফের মিথ্যে কথা। আমি খুব নরম সুরে বললামঃ হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই, আমি সব নিজে লিখেছি। পণ্ডিত-মশাই বললেনঃ তবে তোমার লেখার সঙ্গে বইয়ের লেখা হুবহু মিলে যাচ্ছে কেন? আমি তো বই দেখেই হুবহু লিখেছি। বই দেখে লিখলে বইয়ের সঙ্গে মিল থাকবে না?

যেই না এ-কথা বলা উনি সজোরে টেনে মারলেন এক কান-চাপাটি চড়। সেই চড় খেয়ে আমি আধ ঘণ্টা মাটিতে জড়ের মতো চিৎপাত হয়ে পড়ে রইলাম। আমার নড়া-চড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পর যখন জ্ঞান হল, চোখ মেলে দেখলুম ছোটরাম পণ্ডিত আমার মাথার গোড়ায় বসে আমায় বাতাস করছেন। চোখ খুলে পণ্ডিত-মশাইকে দেখে আমি আরও আধ ঘণ্টা একস্ট্রা টাইম অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

তার পরদিন সকালে বাড়িতে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে-কানে চড়টা পড়েছিল সে-কানের ধারটা প্যাঁড়াকীর মতো মুড়ে গেছে। সেই সকালে একটু পরে পণ্ডিতমশাই এলেন আমাদের বাড়িতে। দেখলাম পড়ার ঘরে বসে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন; চা খাচ্ছেন। কথা উনি বেশ জোরেই বলতেন।— শুনলুম বাবাকে বলছেন: "আপনার ছেলেতো বেশ ছড়া-টড়া লিখছে, বই দেখে টুকে লিখছে; আপনার ছেলে বড় হয়ে সাহিত্যিক হবে দেখছি।" শুনে আমি আর বাড়ির ত্রিসীমানায় থাকিনি সেদিন।

আর এক দিনের কথা। ইংরেজী রচনা-ক্লাসে সেদিন এসেছেন ছোটরাম পণ্ডিত। যাঁর ক্লাস তাঁর অনুপস্থিতিতে 'স্লিপ'-এ। ছুটির আগের পিরিয়ড। পণ্ডিতমশাই বেশ বিরক্তভাবে এসে ঢুকলেন ক্লাসে। কোন কথা না বলে তিনি চুপচাপ চেয়ারে গিয়ে বসলেন। কিছু সময় যেতে না যেতেই দেখি পণ্ডিতমশাই ঢুলছেন। একসময় দেখা গেল তাঁর হাঁটু আর মাথা প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। সেই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম: "পণ্ডিতমশাই, আমরা এখন কি করব?" পণ্ডিতমশাই ঐ অবস্থায় নিজেকে রেখেই বললেনঃ "তুমি কি করবে জানি না। তবে আমি এখন ঘুমুব। এ-ক্লাস আমার নয়; 'স্লিপ'-এ এসেছি—অতএব 'স্লিপ' করব।"

'কাউ' সম্বন্ধে রচনা লিখব?

না, 'অ্যাস' সম্বন্ধে লেখ। তুমি যা, সেই সম্পর্কেই তোমার ধারণা পরিষ্কার। সুতরাং ওটাই তুমি পারবে। আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন এখন করলে মারতে মারতে তোমায় মাঠে বেঁধে রেখে আসব। কত পড়ুয়া-ছেলে সেতো আমার জানা আছে। ইংরেজীতে বার্ণাড শ, বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র আর সংস্কৃতে বিদ্যাসাগর। বকা ছেলের বকবকানি বেশি। চুপচাপ বসে থাক। আর একটা কথা বলেছ কি মাঠে বেঁধে রেখে দেব।

আমার কথায় ওঁর কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় দেখলাম উনি খুব রুষ্ট। তবু সাহস করে কাছে গিয়ে বললামঃ "পণ্ডিতমশাই, একটু জল খেয়ে আসব?" পণ্ডিতমশাই বললেনঃ "হ্যাঁ যাও। পেট ভরে জল খাও আর পাশের মাঠে চরে চরে ঘাস খাও।" বলেই তাঁর ডান হাত দিয়ে আমার আহত মোচড়ানো কানটিকেই ঘড়িতে দম দেওয়ার মতো সজোরে মোচড় দিলেন। আমি সেই দমেই পরিত্রাহি আর্তনাদ করে এক লাফেই ক্লাসের বাইরে।

এই বড় বয়সে কদিন আগে চশমার দোকানে দোকানদার চশমার মাপ নিতে গিয়ে আমার মোচড়ানো কান দেখে বললেনঃ "কি ব্যাপার আপনার এ-কানটা এমন মোচড়ানো কেন?" আমি বললামঃ "ছোট বেলায় বক্সিং লড়তে লড়তে কানের ঐ দশা হয়েছে।" ছোটরাম পণ্ডিতের হাত-যশের কথাটা আর চশমাওয়ালাকে বলি কি করে? তবে আজও কিন্তু ছোটরাম পণ্ডিতকে আমি ভুলিনি। আর একটা কথা হলফ্ করে বলছি, এ-লেখা কিন্তু কারোর লেখা থেকে টুকিনি। এটা আমার নিজের থেকেই লেখা।

সারা বিশ্বের ত্রাসসৃষ্টিকারী রোগ—এইড্‌স

প্রশান্তকুমার পণ্ডিত

সম্প্রতি যে রোগটি নিয়ে গোটা বিশ্ব তোলপাড় হচ্ছে, তা হল এইড্‌স। (AIDS) বা Aquired Immune Deficiency Syndrome, যার বাংলায় অর্থ করা যেতে পারে 'অর্জিত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি।' বর্তমান যুগে অন্য কোন রোগ এত কম সময়ের মধ্যে এইড্‌স-এর মতো এত প্রচার লাভ করেনি। রোগের পরিচিতির সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি যখন একদল আমেরিকান ডাক্তার এই রোগ লক্ষ্য করেন সমকামীদের মধ্যে। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, এই রোগ হলে রোগীদের রোগপ্রতিরোধক্ষমতা একেবারে থাকে না, যার ফলে তারা অল্পকালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কারণ, এই রোগের প্রতিকারক হিসাবে কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত বের হয়নি। কিছুদিনের মধ্যে চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করলেন যে, অসমকামী এবং ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে যেসব নেশাখোর মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে, তাদের মধ্যেও এই রোগ বহুল পরিমাণে বর্তমান। যেসব দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তা হল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চিলি, হাইতি প্রভৃতি; ইউরোপের সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ইংল্যন্ড, ইটালি প্রভৃতি; আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডা, মাদাগাস্কার, কঙ্গো প্রভৃতি এবং এশিয়া মহাদেশের জাপান, ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া প্রভৃতি। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার হিসাব মতে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ মার্চ পর্যন্ত ১০১টি দেশে এই রোগ ধরা পড়েছে; রোগীর সংখ্যা ৪৫,৬৯৭ (আমেরিকা—৩৬,৭৮২, ইউরোপ—৪,৭৩২, আফ্রিকা—৩৫৩১, এশিয়া—১১২)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ইউরোপের দেশগুলিতে রোগীর সংখ্যানুপাতে, প্রথম সুইজারল্যান্ড, দ্বিতীয় ডেনমার্ক, তৃতীয় বেলজিয়াম। বলাবাহুল্য, যেসব রোগী চিকিৎসকদের নজরে আসেনি তাদের সংখ্যা ধরলে সারা পৃথিবীতে রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে।

সম্প্রতি যে রোগটি নিয়ে গোটা বিশ্ব তোলপাড় হচ্ছে, তা হল এইড্‌স। বর্তমান যুগে অন্য কোন রোগ এত কম সময়ের মধ্যে এইড্‌স-এর মতো এত প্রসার লাভ করেনি।

সম্প্রতি লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতি ১০ মিনিটে একজন নতুন এইড্‌স রোগী ধরা পড়ছে এবং ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হবে। ইউরোপে এই রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ১৩,০০০। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংখ্যা আগামী বছরের শেষে দাঁড়াবে ৫৬,৪০০-তে, অর্থাৎ চার গুণেরও বেশি।

রোগটি ভাইরাস (virus—জীবপরমাণু) ঘটিত। আগে এই ভাইরাসের নামকরণ নিয়ে গোলমাল ছিল। এল. এ. ভি. (LAV—Lymphadenopathy virus), এইচ. টি. এল. ভি-৩ (HTLV-III, Human T-Lymphocytic Virus-III) অথবা এল. এ. ভি/এইচ. টি. এল. ভি-৩ (LAV/HTLV III) ভাইরাস বলা হত। বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা কর্তৃক এই ভাইরাসের নামকরণ হয়েছে এইচ. আই. ভি (HIV—Human Immunodeficiency Virus)। শরীর গঠন অনুযায়ী এই ভাইরাসকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে (HIV-1 and HIV-2)। এই ভাইরাস শরীরে ঢুকে টি-৪ (T-4) নামক রক্তের শ্বেতকণিকা (white blood-cell)-র মধ্যে প্রবেশ করে বংশবৃদ্ধি করে ও কণিকাগুলিকে ধ্বংস করে। এই শ্বেতকণিকার কাজ হল শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার সৃষ্টি করা। টি-৪ কণিকাগুলির সংখ্যা কমে যাওয়ায় নানাধরনের কমক্ষতিকারক জীবাণু,

ভাইরাস, ছত্রাক (Fungus) প্রভৃতি আণুবীক্ষণিক জীবাণু এইড্‌স রোগীদের শরীরে প্রবেশ করলে তারা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রোগীদের একধরনের চর্মক্যানসার (Kaposi's sarcoma)-ও বেশি হয়। এইড্‌স রোগের প্রধান লক্ষণ হল—জ্বর, ওজন হ্রাস, দুর্বলতা, লসিকা গ্রন্থিগুলির আকার বৃদ্ধি (Lymphadenopathy) এবং পাতলা দাস্ত। রোগলক্ষণ দেখা দিলে পাঁচ বৎসরের আগেই রোগীর মৃত্যু হয়। তবে দেখা গেছে যে অন্য জীবাণু—বা জীবপরমাণু-ঘটিত অসুখের ন্যায় এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই সকলের এইড্‌স রোগ হয় না। দশ থেকে তিরিশ শতাংশের এইড্‌স হয়। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশের সামান্য মাত্র রোগলক্ষণ দেখা দেয় (AIDS-related syndrome) যারা খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক দিন বেঁচে থাকে। বাকি লোকেরা সুস্থ থাকলেও সারা জীবনভোর রক্তে এই ভাইরাস বহন করে এবং অন্যের মধ্যে রোগ-সঞ্চারের মাধ্যম হয়। রোগী হতে এইড্‌স ভাইরাস তিনভাবে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে: (ক) যৌনমিলনের মাধ্যমে; রোগ আক্রমণের এইটিই প্রধান পথ। (খ) রক্ত বা রক্তাংশ বাহিত

এইড্‌স রোগের প্রধান লক্ষণ হল—জ্বর, ওজন হ্রাস, দুর্বলতা, লসিকা গ্রন্থিগুলির আকার বৃদ্ধি (Lymphadenopathy) এবং পাতলা দাস্ত। রোগলক্ষণ দেখা দিলে পাঁচ বৎসরের আগেই রোগীর মৃত্যু হয়। তবে দেখা গেছে যে অন্য জীবাণু—বা জীবপরমাণুঘটিত অসুখের ন্যায় এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই সকলের এইড্‌স রোগ হয় না।

হয়ে (through blood and blood products)। এই পর্যায়ে পড়ে আপাতসুস্থ এইড্‌স ভাইরাস বহনকারী রক্তদানকারীরা (blood donors), বিদেশ হতে আনা শুষ্ক রক্তাংশ (যেমন Dried plasma), ভাইরাস-বাহিত রোগীকে ইন্‌জেকশন দিয়ে সিরিঞ্জের সূচ যথাযথ না পরিশ্রুত (sterilised) করে অন্যকে ইন্‌জেকশন দেওয়া প্রভৃতি। শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবনকারীরা, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা একই সিরিঞ্জ ও সূচ পরস্পর ব্যবহার করে। (গ) ভাইরাসবাহী মায়ের থেকে জন্মকালে বা গর্ভে থাকাকালীন শিশুর মধ্যে ভাইরাস যাওয়া। বর্তমান যুগে আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে অবাধ যৌনমিলনের ফলে এবং ইন্‌জেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণের অভ্যাসের প্রসারতার ফলে অনেক দেশেই রোগীর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে পুরুষ ও মহিলা রোগীর সংখ্যার অনুপাত বিভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি দশজন পুরুষ-রোগীতে একজন মহিলা-রোগী, কিন্তু ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের হাইতিতে প্রতি তিনজন পুরুষ-রোগীতে একজন মহিলা রোগী।

চিকিৎসা হিসাবে এই রোগের কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত বের হয়নি। তবে এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। এ্যজাইডোথাইমিডিন (Azidothymidine) ও রাইবাভিরিন (Ribavirin) এই দুটি ওষুধের উপর অনেকে আশা স্থাপন করছেন। রোগ প্রতিরোধক টিকাও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এই

চিকিৎসা হিসাবে এই রোগের কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত বের হয়নি। তবে এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। এ্যজাইডোথাইমিডিন (Azidothymidine) ও রাইবাভিরিন (Ribavirin) এই দুটি ওষুধের উপর অনেকে আশা স্থাপন করছেন।

রোগে টিকা তৈরির একটি প্রধান অন্তরায় হল—এইড্‌স-ভাইরাসের ক্রমাগত শারীরিক গঠনের পরিবর্তন (Antigenic variation), যেমন দেখা যায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের। এক শারীরিক গঠনের বিরুদ্ধে তৈরি টিকা, শারীরিক পরিবর্তন হলে তখন আর কার্যকরী হয় না।

কোন লোকের শরীরে লুকানো এইড্‌স-ভাইরাস আছে কিনা তা ল্যাবরেটরিতে রক্তপরীক্ষায় জানা যায়। এই পরীক্ষায়, রক্তে ভাইরাস বা তার অংশ অথবা রোগীর দেহে তৈরি এইড্‌স-রোগপ্রতিরোধক বস্তু (এ্যান্টিবডি—antibody) আছে কিনা, তা এই পরীক্ষায় ধরা পড়ে। যে দুই রকমের পরীক্ষায়

কথা খবরের কাগজে মাঝে মাঝে বের হয়, তা হল, এলিসা (ELISA—Enzyme-linked immono-sorbent assay) ও ডবলু-বি (Western Blot) পরীক্ষা।

ভারতবর্ষেও এইড্‌স-বিভীষিকার ঢেউ এসে গেছে। রোগটি সাংঘাতিক এবং এর সংক্রমণ-ক্ষমতা প্রচুর বলে ভারত সরকার ও তার চিকিৎসা-গবেষণা বিভাগ—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR), রোগটি কি পরিমাণে দেশে বর্তমান ও কিভাবে এই বহিরাগত রোগকে প্রতিহত করা যায়, সে-বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। দেশের কয়েকটি জায়গায় এই রোগের নির্ণয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং শীঘ্রই একটি বড় গবেষণাকেন্দ্র খোলা হবে। বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা ও আমেরিকা সরকার এ-বিষয়ে অর্থ সাহায্য করতে প্রস্তুত। কারণ বর্তমান যুগে এই ধরনের রোগ যে কোন দেশে যে কোন সময় চলে যেতে পারে। যাদের এই রোগের সম্ভাবনা বেশি (যেমন সমকামী, ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারী বারবনিতা) তাদের রক্ত পরীক্ষার উপর

ভারতবর্ষেও এইড্‌স-বিভীষিকার ঢেউ এসে গেছে। রোগটি সাংঘাতিক এবং এর সংক্রমণ ক্ষমতা প্রচুর বলে ভারত সরকার ও তার চিকিৎসা-গবেষণা বিভাগ—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR), রোগটি কি পরিমাণে দেশে বর্তমান ও কিভাবে এই বহিরাগত রোগকে প্রতিহত করা যায়, সে-বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে।

জোর দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান এমন ছকে বাঁধা যে, তাদের মধ্যে এইড্‌স রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। ঘটনাও সেইরূপ দাঁড়াচ্ছে। যাদের মধ্যে রোগ-জীবাণু থাকতে পারে সেরূপ হাজার হাজার লোকের রক্তপরীক্ষা করে, ভাইরাস সংক্রমণের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে এরূপ লোকের সংখ্যা ১৫।২০ জন হবে কিনা সন্দেহ। এ-পর্যন্ত এদেশে এইড্‌স রোগীর সংখ্যা ৫।৭ জনেরও কম। এদের মধ্যে আবার বিদেশী নাগরিকরাই প্রধান। গত জুন মাসের শেষের দিকে বোম্বাই সহরে এই রোগে একজন বারবনিতার মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যদি এই রোগের জীবপরমাণু ধরা পড়ে, তাহলে এটাই হবে ভারতবর্ষে প্রথম এইড্‌স রোগীর মৃত্যু।

রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায় হল জনগণকে এই রোগ সম্বন্ধে অবহিত করানো—রোগ কত সাংঘাতিক, কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে, একজন হতে অন্যেতে কিভাবে সংক্রমণ হয়, কিভাবে এই রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়—এইসব তথ্য জানানো বা প্রচার করা। এই শিক্ষা রোগীর পক্ষেও দরকার যাতে তারা রোগ-প্রসারের হেতু না হন। রক্তদান-কারীদের পরীক্ষা করতে হবে—তাদের মধ্যে এই রোগ লুকিয়ে আছে কিনা। জনগণ যাতে অহেতুক ভয় না পান, তাও দেখতে হবে। রোগ-বিস্তার বাতাসের

রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায় হল জনগণকে এই রোগ সম্বন্ধে অবহিত করানো—রোগ কত সাংঘাতিক, কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে, একজন হতে অন্যেতে কিভাবে সংক্রমণ হয়, কিভাবে এই রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়—এইসব তথ্য জানানো বা প্রচার করা। এই শিক্ষা রোগীর পক্ষেও দরকার যাতে তারা রোগ প্রসারের হেতু না হন।

মাধ্যমে (হাঁচি-কাশির মাধ্যমে) বা স্পর্শের মাধ্যমে হয় না। শুশ্রূষাকারীরা যেমন সাধারণ সংক্রামক রোগে সাবধানতা নেন, তা নিলেই যথেষ্ট হবে। আজ পর্যন্ত এইড্‌স রোগীর শুশ্রূষাকারীদের খুবই অল্পসংখ্যকের এই রোগ হয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, এই হতভাগ্য রোগীদের ঘৃণা না করে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সেবা করা, তাদের যতটা সম্ভব আনন্দ দেওয়া ও তাদের মধ্যে বেঁচে থাকার মানসিকতা আনা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই রোগের ভাল ওষুধ ও টিকা বের হয়ে যাবে।



অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

কর্ম্ম

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

অবিদ্যা বারাঙ্গনার ন্যায় হাবভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত বারাঙ্গনার হস্তে পরিত্রাণ আছে; যেখানে তাহারা থাকে, সেস্থান পরিত্যাগ করিলে হয়, হাবভাব না দেখিলে হয়, কুৎসিৎ রোগের ভয়ে, লোকলজ্জায়, ঘৃণায় অনেকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু এ নটী তোমার বাসনা। দিবারাত্র যাহাকে ধ্যান করিয়াছ, নিদ্রার সময় যাহাকে ইষ্ট-স্মরণ ত্যাগ করিয়া আদরে বক্ষে ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছ, যাহার নিমিত্ত ভগবান মোক্ষপ্রদ হইয়া সম্মুখে দন্ডায়মান হইলে ভয়ে পলায়ন কর, এ-নটী তোমার বাসনা, সুন্দর বেশভূষা করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আশা দূতীবেশে কত কথা কহিয়াছে, কল্পনা কতই সম্ভোগ রচনা করিয়াছে, তাহাকে পাইবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত, হাত বাড়াইলেই পাও, কিন্তু নটী সরিয়া দাঁড়াইল। ধরি ধরি, ধরা যায় না। ধরা দিলে দেখ, অতি কুৎসিতা। কিন্তু বহুরূপিণী আবার অন্য মনোহারিণীরূপে সম্মুখে দন্ডায়মানা। আবার ছুট, আবার ঐ ফল। ফলাকাঙ্ক্ষার অর্থই, কুৎসিতা বারাঙ্গনা অবিদ্যামায়ার উপাসনা। ফলকামনার ধর্ম কর—ধর্ম বিশ্বাসঘাতক নন—মুটে বিদায় করিবেন। মনে কর, একবার ধন-কামনায় ধর্ম করিয়াছ, ধন পাইবে, সংসারে ধন অতি অবিদ্যাবলশালী। ধন পাইয়াছ, আর ধর্মের উপাসনা নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও। দেখিতে পাও, অনেকেই ধনমদে ধর্ম ভুলিয়াছেন। তোমারও ভুলিবার সম্ভাবনা। যাহাতে লোক মুগ্ধ থাকে, সেই সমস্ত তাহার সর্বস্ব হয়, অন্য চিন্তা স্থান পায় না। এ কথাটি বালককেও যুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারিরা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছিল। বলে, টাকা দিতেছি, আপনি ভান্ডারা খুলুন, এ-টাকা তো আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি? এ কথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিলেন, আমি বললুম 'না'। আমি বুদ্ধিমান, জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, এতে আপত্তি কি?" তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাঁহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্তকালস্রোতে কেহ কখন দেখে নাই, ভঙ্গীর সহিত পরমহংসদেব বলিলেন, (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে) "ও মনে পড়বেক্, আবার আসতে হবেক্।" যে মহাত্মা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শত শত জন্মগ্রহণে কৃতসংকল্প, সুকর্মফলভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে দেহধারণে কুণ্ঠিত দেখিলাম।

তিনি উপদেশ দিতেন, সে উপদেশের মর্ম আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলি। তিনি ধ্যান করিতে বলিতেন; ধ্যান করিতে করিতে কুকুর, বিড়াল, বাঁদর, বেশ্যা, লোটো, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাতে বলিতেন, ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখিতেছ, মনে করিবে, কিন্তু যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান,

আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না।' ধ্যানস্থ বাসনা আশু ফলপ্রদ হয়, সে ফল অতি কুফল। অবিদ্যার ফল—মানবকে নিরয়গামী করিবার ফল। কুতর্ক উঠিয়া মনকে বলিতে থাকে, ফলের কামনায় ঈশ্বর-উপাসনা করিব না, তবে কেন তাঁর উপাসনা ? ধন পাইব, মান পাইব, নরনারী দাসদাসী হইবে, এই তো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সিদ্ধ-পুরুষের তো ইহাই হইয়া থাকে, আর কি হয় ? ইহাই হয় সত্য, যাহা সংসারী জীব বাসনা করে, ঈশ্বরসেবায় তাহাই পায়, কিন্তু সে তাহা পাইয়াছে কিনা, তাহা জানে না, যদি জানে, জানিলেও কিছু তৃপ্তি নাই। কি এক পরম তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাতে তাহার সকলই তুচ্ছ, ঈশ্বরের সেবায় তাহার আনন্দ, শিশুর পিতা-মাতার সেবার ন্যায় তাহার আনন্দ ; শিশু দেখে, তাহার পিতার ভোজনের সময় ভৃত্য আসিয়া ব্যজন করে, সেও আনন্দে পাখা হাতে করিয়া ভৃত্যের উপর ঈর্ষা করিয়া ব্যজন করিতে গিয়া পাখা গায়ে মারিয়া কি একটি অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করে ; তাহার পিতাও ব্যজন পরিবর্তে পাখার আঘাত খাইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই শিশুর কথা যেথা সেথা বলে, শিশুকে নানাবিধ বসন ভূষণ ভোজ্য-সামগ্রী দেয়, কিন্তু তাহাতে শিশুর লক্ষ্য নাই ; ভোজন অন্তে ভৃত্য পদসেবা করিতেছে, টর টর করিয়া আসিয়া পদসেবা করিতে বসে, পদসেবা না করিতে পারিলে তাহার ক্ষোভ। সে সেবা করে, পিতা হাসে, সেও হাসে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। জগৎপিতার সেবকও সেইরূপ। পিতার সেবার নিমিত্ত কোটী কোটী দেবদূত উপস্থিত আছে, পিতার সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি সেবক সেবা করিতে যায়। আনন্দময় পিতা আনন্দে হাসেন, সেবকও আনন্দে হাসে ; মান, মর্যাদা, ধন, জন যাহা আনন্দময় পিতা তাহাকে আনন্দে বিতরণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপও নাই। বালভাবাপন্ন ঈশ্বর-সেবক সেবায় কি আনন্দ, কেবল তিনিই বুঝেন ; এ জগৎপিতার বালক পিতৃসেবার প্রয়াসী, আনন্দময় পিতৃসেবায় আনন্দময় হইয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্ববিৎ হিউম (Hume) সাহেব বলেন যে, সৎকার্য এতই সৎ, তাহাতে ঐহিক এত আনন্দ যে, পাদরিরা তাহার পারমার্থিক ফল কেন বর্ণনা করেন, তাহা বুঝিতে পারেন না। এই কার্যই পিশাচী জানিয়াও পিশাচী বলে না—মুগ্ধচিত্ত বিবেক-রহিত।

যৌবন-পদার্পণে, ভোগ্যবস্তুদর্শনে, আশার প্রলোভনে, সংসার সুখাগার ভাবি। মায়ার বৈষম্য উপলব্ধি হয় না, বুঝিতে পারি না যে, সুন্দর সংসার মৃত্যুর ক্রীড়াস্থল। ক্ষয়ের নাম বৃদ্ধি ; যতই দিন যায়, ততই মৃত্যুর নিকট অগ্রসর হই। সুখ দুঃখের সূচনা মাত্র। দেখিতে পাই, যে সকল বস্তুর আমার প্রয়োজন বিবেচনা করি, ধন-বিনিময়ে তাহা পাওয়া যায় ; কিন্তু ধন হইলে ধনের মায়ায় ধন বিনিময় করিতে পারিব কিনা, সে সকল বস্তু ভোগের শক্তি আছে কিনা, ভোগের শক্তি থাকিলে সে সকল সুখ-প্রদ কিনা, এসকল প্রশ্ন হৃদয়ে উঠে না। ধনই একমাত্র কামনা হইয়া উঠে। ভোগের নিমিত্ত, সঞ্চয়ের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের নিমিত্ত, ধন সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়, কিন্তু চিত্তের তমোগুণবশতঃ তাহা সুলভ পরিশ্রমে অর্জন করিতে চাহে। কেহ বা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, পরিশ্রমে কাতর না হইয়া নিয়ত কার্যে বিরত থাকে, কিন্তু কার্যের এমনই গুণ, সকাম কার্য হইলেও অনেক পাপস্পৃহা নিবারণ করে। শ্রমী লোক মিথ্যা কথা, মিথ্যা গল্প, পরচর্চা, অহেতু পরের অনিষ্ট, কল্পনা, জুয়াচুরি, ঠকবৃত্তি প্রভৃতি কার্য হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। যিনি যথার্থ কার্যকুশল, তিনি অনেকটা বুঝিতে পারেন, নীতি-বিরোধী হইলে কার্যে তাদৃশ সুফল ফলে না ; ষোল আনা দেওয়া নেওয়া করেন, নিজ লাভের নিমিত্তই প্রতারণা করেন না। সকাম কার্যে যদি এরূপ হয়, তবে নিষ্কাম কার্যে যে অমৃত উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? আপত্তি উঠে যে, আমার পুত্রকলত্র ভাসাইয়া দিয়া কি নিষ্কাম কর্ম করিব ? পরমহংসদেব উপদেশ দিয়াছেন, সত্য যে, "ঈশ্বরের কার্য ভাবিয়া কার্য করিব", কিন্তু পরকে আপনার পুত্রের ন্যায় কিরূপে করিব ? চেষ্টা, আর অপর উপায় নাই। তুমি যদি নিষ্কাম কার্য কর, তাহাতে যদি অমৃত লাভ হয়, তোমার পুত্র পরিবারও তোমার দৃষ্টান্তে নিষ্কাম কার্যে ব্রতী হইয়া আনন্দের

অধিকারী হইবেন। সকাম হইয়া পরিবারের জন্য তো আনন্দ, যিনি সৎকার্যশীল, একথার মর্ম কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন। পাপের পথ যে কণ্টকময়, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বহুরূপিণী মায়া মনোহরণ করিতেছেন, মুগ্ধচিত্ত কাঁটার উপর ছুটে, অর্থ রাখিয়া যাইতে চাও, কিন্তু নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও যে, সংসারে সকলেই অর্থ রাখিয়া যায়, কিন্তু যাহাদের নিমিত্ত রাখে, প্রায় তাহাদের ভোগ হয় না। যদি কোন উত্তরাধিকারী ধনরক্ষায় সমর্থ হন, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যকের ন্যায় ধন রক্ষা করিতেছেন এবং শত শত কুকার্য করিতেছেন, যাহার জন্য তুমি দায়ী। দেখিতে পাইবে, স্ত্রীর নিমিত্ত ধন রাখিয়া গিয়া অনেকেই পিতৃপিতামহের আবাস ব্যভিচারের বিহারস্থল করিয়াছেন, পুত্রকে ধন দিয়া লম্পট, পরপীড়ক, অত্যাচারী করিয়াছেন। অর্থ-দানে দুষ্কর্মান্বিত উত্তরাধিকারী প্রায়ই দেখিতে পাইবেন, কিন্তু যে মহাত্মা নিজের সন্তানের নিমিত্ত নিষ্কাম ধর্ম রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উত্তরাধিকারী এই অতুল সম্পত্তি করগত করিয়াছেন, তিনি আপনার হিত, উত্তরাধিকারীর হিত, জগতের হিত, পরহিত উদ্দেশ্যে, হিতকারী দৃষ্টান্তে, মহাহিত সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি যথার্থ মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। পশুর সহিত কেবল তাঁহারই মনুষ্যত্ব প্রভেদ, নচেৎ স্বার্থদ্বারা পাশবকার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য হয় না, যিনি মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান, মনুষ্যত্ব যাঁহার আকাঙ্ক্ষা তিনি নিষ্কাম কার্যের আদর করিবেন।

উপসংহারে আমার ভক্তের চরণে প্রার্থনা, যেন কার্যে আমার অধিকার হয়, কিন্তু ফলাফল ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারি। আমি মনে মনে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমি যতই কেন নিষ্কাম কার্যের চেষ্টা করি না, আমার কলুষিত মন অতি সৎকার্যের সহিত দোষ মিশ্রিত করিবে; ফল তো আমার আয়ত্তাধীন নয়। সুফল ফলিবে বিবেচনায় কার্য করিতে গিয়া কত অন্যায় ফল ফলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চোর অন্যের বাটীতে চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাকে জীবন উপেক্ষা করিয়া ধরিলাম, জেলে দিলাম, তাহাদের পরিবারবর্গকে অনাথ করিলাম; দয়া করিয়া একজনকে চাকরি দিলাম, কর্মক্ষম শত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলাম; নিষ্কাম কার্য করিবার চেষ্টা করিলে সক্ষম হই না, আমার মন কলুষিত। নিষ্কাম কর্ম মুখে বলা যায়, কিন্তু দেখিতে পাই, কেবল ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম করিতে পারেন। অতএব কার্যের ফল যেন আমি ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করি। অতি কঠিন কার্যে সক্ষম হইয়া যেন কার্যগরিমা না রাখি। শাস্ত্রে শুনিতে পাই, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, কার্যের গরিমা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহাদের একটি তৃণের উপরেও অধিকার নাই। সত্যই, কাহারও কার্যের উপর অধিকার নাই। নিজ জীবন সমালোচনায় পদে পদে তাহার উপলব্ধি হইবে। আমি কর্তা নই, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য হয় নাই, একটু স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর আমার কার্যে অধিকার দিন, কিন্তু ফলাফল ও কার্যগরিমা তাঁর, 'আমার' যেন স্বপ্নেও না বলি।*

* উদ্বোধন- ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৪৮-৫১



বাতায়ন

বর্তমান ইস্‌রায়েল সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

জনসংখ্যা ঃ চল্লিশ বৎসর (১৯৪৮-১৯৮৮) বয়স্ক রাষ্ট্র ইস্‌রায়েলের জনসংখ্যা এখন প্রায় ৪৪ লক্ষ ; ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ। এদের মধ্যে ইহুদিদের সংখ্যা ৮২ শতাংশ, মুসলমান ১৪ শতাংশ, খ্রীষ্টান ও অন্যান্যরা ১'৭ শতাংশ। দেশের জনসংখ্যা বৎসরে ১'৫ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে—১'৩ শতাংশ ইহুদিদের মধ্যে এবং ২'৫ শতাংশ অন্যদের মধ্যে। আশা করা যাচ্ছে যে ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশে ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়াবে চল্লিশ লক্ষ, এবং সমগ্র জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ। এদেশে ইহুদিদের মধ্যে ৬১'৪ শতাংশ জন্মেছে ইস্‌রায়েলে, ১৭'২ শতাংশ আফ্রিকা ও এশিয়ায় এবং ২১'৪ শতাংশ ইউরোপ ও আমেরিকায়। পৃথিবীর সমগ্র ইহুদিদের মধ্যে ২৭ শতাংশ ইস্‌রায়েলে বাস করে।

ইহুদিদের মধ্যে ৮৭ শতাংশ শহরে বাস করে, যার ৬৬ শতাংশ ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে থাকে। দেশের রাজধানী জেরুসালেমের জনসংখ্যা ৪'৭ লক্ষ, যার মধ্যে ইহুদিরা ৭২ শতাংশ। তেল আভিভ্ শহরের লোকসংখ্যা ৩'২ লক্ষ ; হাইফার ২'২ লক্ষ। 'জুইশ এজেন্সি' যে ৭০০টি উপনিবেশ করে দিয়েছে, সেখানে ইহুদি জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ বাস করে। দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৮ লক্ষেরও বেশি লোক বিদেশ থেকে এসে বসবাস করছে। সম্প্রতি বিদেশ থেকে আগতদের সংখ্যা কমে গিয়ে বৎসরে ১০ থেকে ১৫ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

আর্থিক অবস্থা ঃ ইস্‌রায়েলের সার্বিক বার্ষিক আয় ২৬ বিলিয়ন ডলার। মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪৫০ শতাংশ থেকে নেমে শতকরা ১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বেকারদের সংখ্যা শতকরা ৫'৯ জন। ইস্‌রায়েল থেকে বৎসরে ৭ বিলিয়ন (৭ হাজার কোটি) ডলার মূল্যের মাল রপ্তানি হয় ; আমদানি হয় ৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মাল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্‌রায়েল মাত্র ৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মাল রপ্তানি করেছিল। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ আছে ১'৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পালিশ করা হীরক, ২'১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ইলেক্‌ট্রনিক দ্রব্য ও ১'১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য ও প্লাস্টিকজাত সামগ্রী। রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশ যায় ইউরোপে এবং ৩০ শতাংশ যায় উত্তর আমেরিকায়। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ লক্ষ ভ্রমণকারী ইস্‌রায়েলে এসেছিল, যে সংখ্যা ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১১ লক্ষ। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণকারীরা ইস্‌রায়েলে খরচ করেছিল ১'৫ বিলিয়ন ডলার। ইস্‌রায়েলে ৩০৪টি হোটেল আছে, যেগুলিতে কামরার সংখ্যা ৩২০০০।

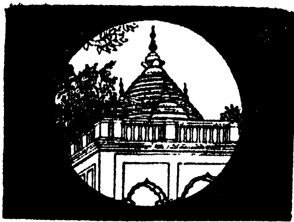
ইস্‌রায়েলে সমস্ত ব্যাঙ্কের সমবেত সম্পত্তির মূল্য ৯০ বিলিয়ন ডলার। এখানকার তিনটি ব্যাঙ্ক সারা বিশ্বের ২০০টি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ ইস্‌রায়েলে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ১৪ লক্ষ। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ছিল এর এক দশমাংশ। ইউনিভার্সিটির ছাত্রসংখ্যা ৭০,০০০।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় ইস্‌রায়েলিরা গড়ে বেশি সংখ্যায় থিয়েটার দেখে। শতকরা ১৫ জন প্রতি মাসে একবার থিয়েটার দেখে। এদেশে প্রতি বৎসর ৪০০০ নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয় ; এই সংখ্যা সুইডেন ও জাপানের সংখ্যার সঙ্গে তুলনীয়।

স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ ঃ ইস্‌রায়েলের ৫০টি হাসপাতালে ২৭৪০০টি শয্যা আছে। জনগণের গড় আয়ু ৭৪ বৎসর (মহিলাদের ৭৭ বৎসর) যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৬১ বৎসর। দেশের পেনসন-প্রাপ্তরা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জনগণের ৩ শতাংশ ছিলেন, এখন ১০ শতাংশ। ৭৫ বৎসরের অধিক বয়স্কদের সংখ্যা বর্তমানে ১৭০০০ (৩'৫ শতাংশ) যা ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৫২০০০ (১'৫ শতাংশ)।

[**News from Israel, May 1988, Page. 8—9**]



গ্রন্থ পরিচয়

সাধনপথের সঙ্গী

হরিপদ চক্রবর্তী

দীক্ষা প্রসঙ্গে -মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ। জগদীশ্বর পাল। ১০, গ্যালিফ স্ট্রীট (সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১), কলিকাতা ৭০০০০৩। পনের টাকা।

'দীক্ষা' শব্দটি এসেছে 'দীক্ষ্' ধাতু থেকে (দীক্ষ্ —অ+স্ত্রিয়াম্ টাপ্)। অভিধান মতে দীক্ষা শব্দটির অর্থ—মুণ্ডন, অভিষেক, উপনয়ন, যজন, নিয়মগ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান ও উপদেশ। অর্থাৎ যজ্ঞব্রতাদি বিশেষ অনুষ্ঠানের উপদেশ।
তন্ত্রসারে বলা হচ্ছে ঃ

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥

কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হচ্ছে ঃ

দীয়তে জ্ঞানসম্ভাবঃ ক্ষীয়তে পশুবাসনা।
দীনক্ষপণসংযুক্তা দীক্ষা তেনেহ কীর্তিতা॥

অন্যান্য তন্ত্রগ্রন্থে এবং কোন কোন পুরাণেও এই-জাতীয় উক্তি পাওয়া যায়। দীয়তে অর্থাৎ দান করে—'দ', আর ক্ষীয়তে অর্থাৎ ক্ষয় করে—'ক্ষ'। এই দুই মিলে দীক্ষা। মনের পাপ-পশুকে নাশ করে সেখানে জ্ঞান ও শিবের প্রতিষ্ঠা করে যে ক্রিয়া, তা-ই দীক্ষা। পারিভাষিক অর্থে 'দীক্ষা' শব্দটির মধ্যে পারমার্থিক আকুতিটি প্রধান। দীক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দীক্ষাদাতা গুরু, দীক্ষাগ্রহীতা শিষ্য, দীক্ষার মন্ত্র, ইষ্টদেবতা, জপ ইত্যাদি নানা বিষয়। এগুলি অত্যন্ত জটিল ও গুহ্য বিষয়। প্রাচীনগণ যা ভেবেছেন ও বলেছেন তা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত আচরণগুলি সাধুসন্তের জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠলে, ব্যক্তিচরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠলে, তবেই শাস্ত্রের প্রামাণিকতা। দুটিই চাই। মহাপুরুষরা বলেন যে, শাস্ত্র আর সন্তজীবন মিলিয়ে দেখতে হবে। এ-দুটির অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ ও মহাপুরুষ দর্শন ও সঙ্গ করা। এর পর তৃতীয়টি হচ্ছে মহাপুরুষ-আশ্রয়ে থেকে নিজের জীবনে সত্যকে লাভ করা। কালে কালে মানুষের ভাব-ভাবনার পরিবর্তন হয়। পরিবর্তিত কালে মানুষের পরিবর্তিত ভাব-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে শাশ্বত সত্য বুঝতে গেলে বা বুঝাতে গেলে স্থান-কালোপযোগী বিদ্যা ও ভাষার আবশ্যক হয়। বর্তমানকালে যে-সব দার্শনিক সাধক পণ্ডিত ভারতীয় দর্শন বিশেষতঃ সাধন-শাস্ত্রে সেই দুর্লভ শক্তি ও অধিকার অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ। তিনি বহু শাস্ত্রনিষ্ণাত, বহু মহাপুরুষের সঙ্গধন্য ও সর্বোপরি সদ্‌গুরু-আশ্রিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় তিনি দীক্ষাপ্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তারই সংকলন বর্তমান গ্রন্থখানি। এই ছড়ানো মূল্যবান উক্তিগুলিকে সংগ্রহ করে আচার্যের আশ্রিত জগদীশ্বর পাল নানা রত্নের একটি মূল্যবান মালার মতো এই সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশ করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তবে এই সংকলন-গ্রন্থটিতে দু-একটি ত্রুটিও রয়েছে। এ জাতীয় সংকলন-গ্রন্থে আলোচিত প্রতিটি বিষয়বস্তু, পারিভাষিক শব্দ, প্রসঙ্গাদি সম্বন্ধে সূচীপত্র ও বিস্তৃত নির্দেশিকা থাকা অত্যাবশ্যক। এ-দুটি এখানে না থাকার ফলে সুরভিত পুষ্পবনের পথ দুর্গম হয়েছে। পাঠককে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে চলতে হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থখানির প্রধান ত্রুটি এইখানে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই ত্রুটি অবশ্যই সংশোধন করা প্রয়োজন।

দীক্ষা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক যে বিষয়গুলি সাধারণের মনে থাকে তা মোটামুটি এইরকম : দীক্ষা কি ও কেন, গুরুর ভূমিকা, ইত্যাদি। বিভিন্ন দিক থেকে বহু জিজ্ঞাসুর কৌতূহল নিবারণের জন্য আচার্য গোপীনাথ কখনো আলাদাভাবে কখনো সামগ্রিকভাবে এসব তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সুতরাং সংকলক যে আশা করেছেন—"অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু তথা

অধ্যাত্মমার্গের পথিক এই জ্ঞানগঙ্গায় নিস্নাত হয়ে সত্যপথের সন্ধান পাবেন”—তাতে সন্দেহ নেই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় আচার্য গোপীনাথের সিদ্ধান্তমূলক কিছু কিছু বাক্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

“পুরুষকারের মূলে ইচ্ছাশক্তি এবং কৃপার মূলে গুরুশক্তি। একটু অন্তর্মুখ হইয়া অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, গুরুশক্তি ইচ্ছাশক্তিরও মূল। এক হিসাবে উভয়ই এক, তথাপি ভেদদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে গুরুশক্তি হইতেই ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা গুরুশক্তির উপর নির্ভর করে। গুরুশক্তি মহাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি সংকল্প-বিকল্পাত্মক হইলে জীবের শক্তি, এবং শুদ্ধ সংকল্পাত্মক হইলে উহাই ঈশ্বরের শক্তি। সংকল্পের সহিত দ্বিতীয় সংকল্পের মিশ্রণ থাকিলে উহাই বিকল্পরূপে পরিণত হয়। বিকল্পের অভাবে অথবা সংশয়ের অভাবে উহাই সত্যসংকল্পরূপ ধারণ করিয়া ঐশী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ উভয়ই ইচ্ছা।” (পৃঃ ১০-১১)

“শক্তিপাত হইতেছে ইচ্ছাশক্তি আর দীক্ষা হইতেছে ক্রিয়াশক্তি। ··· আমি বাড়ির কর্তা—আমি ইচ্ছা করিলাম পিঠা খাইব। তারপর সেই ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্য বাড়ির লোকেরা যেমন সীতারাম, শম্ভু, বামুনমা মিলিয়া পিঠা তৈয়ার করিল। এই ইচ্ছাশক্তি হইতেছে শক্তিপাত আর এই ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্য যে ক্রিয়া তাহা হইতেছে ক্রিয়াশক্তি ···।

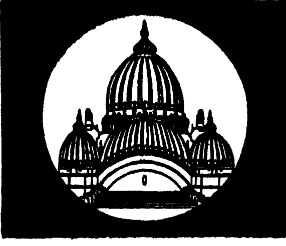
“দীক্ষা দিবার পূর্বে সদ্‌গুরু দেখেন দীক্ষাপ্রার্থীর মধ্যে শক্তিপাত হইয়াছে কিনা—যদি হইয়া থাকে তাহা হইলেই দীক্ষা দেন নচেৎ দেন না—এবং দীক্ষার প্রকার নির্ভর করিবে কতখানি শক্তিপাত হইয়াছে তাহার উপর। সুতরাং দীক্ষাপ্রার্থী হইলেই দীক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরুর সেই দেখিবার ক্ষমতা থাকা চাই।” (পৃঃ ১৬—১৭)

“দীক্ষা বস্তুতঃ আত্মসংস্কারেরই নামান্তর। আণব, মায়ীয় ও কার্মমল অথবা পাশ দ্বারা সংসারী আত্মা আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের প্রভাববশতঃ তাহার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণত্ব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে আত্মা পূর্ণ ও শিবস্বরূপ হইলেও আণবমলের আবরণবশতঃ স্বরূপগত সংকোচ-নিবন্ধন নিজেকে অপূর্ণ মনে করে। নিজে অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও নিজেকে সর্বপ্রকারে পরিচ্ছিন্নবৎ অনুভব করে।

“··· বদ্ধ আত্মাতে তিন প্রকার আবরণ সর্বদাই থাকে। দীক্ষার দ্বারা মলিন আত্মার সংস্কার হইয়া থাকে। মলনিবৃত্তি তো হয়ই, নিবৃত্তির সংস্কার পর্যন্ত শান্ত হইয়া যায়।” (পৃঃ ২৩—২৪)

“গুরু ও সদ্‌গুরু একই বস্তু। কারণ অসদ্‌গুরু বলিয়া কোন বস্তু নাই। তবে বুঝাইবার সুবিধার জন্য গুরু হইতে সদ্‌গুরু শব্দের বৈলক্ষণ্য দেখান হয়। যাঁহার কৃপায় পূর্ণ সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ হয়—যে প্রত্যক্ষের পর আর কোন আবরণ থাকে না—তিনিই সদ্‌গুরু। যিনি আবরণের আংশিক নিবৃত্তিতে সহায়ক হন তাঁহাকে গুরু বলা হয়। যিনি আবরণ অংশতও নিবৃত্ত করিতে সাহায্য করিতে পারেন না তাঁহাকে গুরু বলা যায় না। তান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেও দীক্ষা ব্যাপারের যিনি অনুষ্ঠাতা তিনিই গুরু। প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু একমাত্র ভগবান, দ্বিতীয় কেহই নহে। কিন্তু জীব সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে ধরিতে পারে না। এইজন্য তিনি যোগ্য আচার্যের আধারে শিষ্য-উদ্ধারের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। আচার্যকেও এইজন্য গুরু বলা হয়। দুর্গা প্রতিমাতে যেমন মহাশক্তি জগদম্বার অধিষ্ঠান হয় বলিয়া ঐ প্রতিমাকেও দুর্গা বলা হয় তদ্রূপ যে দেহকে আশ্রয় করিয়া নিত্য গুরুশক্তি কার্য করিয়া থাকে সেই দেহকেও গুরু বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাই আচার্য দেহ।··· আচার্য জীবোদ্ধার ব্যাপারে নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃত গুরুরূপী ভগবানই যথার্থ উদ্ধার-কর্তা। প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ নিমিত্ত আশ্রয় না করিয়া সাক্ষাৎভাবে কি ভগবান অনুগ্রহ করিতে পারেন না? ইহার উত্তর এই, নিশ্চয়ই পারেন। তবে সাধারণতঃ তাহা করেন না।” (পৃঃ ২)

এই সমস্ত তথ্য, তত্ত্ব, মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণের আকর-গ্রন্থ আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের ‘দীক্ষা প্রসঙ্গে’ সংকলন পুস্তকটি। তার দিব্য সৌরভে জিজ্ঞাসুর মন-মধুকর নিশ্চয় আকৃষ্ট হবে, আমরা বিশ্বাস করি।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী-উৎসব

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (মোরাবাদী) স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব, জাতীয় যুবদিবস এবং জাতীয় যুবসপ্তাহ পালন করেছে। ১১ জানুয়ারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১২ জানুয়ারি ছিল জাতীয় যুব-দিবস। ঐদিনের যুবসমাবেশে রাঁচির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২,৫০০ জন যুবক-যুবতী অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামেও ২৫টি ক্লাবের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ১৩ এবং ১৪ জানুয়ারি দুদিনের এক যুবসম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলনে ৩০০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশ-গ্রহণ করেন। সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসিগণ এবং যুব-প্রতিনিধিগণ জাতীয় সমস্যা সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর অধিবেশনটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাছাড়া গত ডিসেম্বর '৮৭তে ১০ দিন ব্যাপী 'ইয়ুথ লিডারশিপ ক্যাম্প' ও জানুয়ারি (১৯৮৮) মাসে 'কিষাণ মেলা' এই জন্ম-বার্ষিকী-উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে গ্রামোন্নয়ন কাজ হিসাবে বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ২৫টি কমিউনিটি সেণ্টার নির্মাণ এবং ১৫০টি কূপ খনন করার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী-উৎসবের ২য় পর্যায়ে গত ১৯—২১ মে পর্যন্ত এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ। ১৫৭ জন যুবপ্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। তার মধ্যে ৮৩ জন ছিলেন আবাসিক। প্রতিদিন দুটি করে অধিবেশন হয়েছে। এই তিনদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং যুব-প্রতিনিধিগণ 'বিবেকানন্দ ও যুব-সমাজ', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয় পুনর্গঠন', 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শ', 'জাতীয় অখণ্ডতা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা', 'সমাজে স্বল্প সুযোগপ্রাপ্তদের জন্য যুবকদের কর্তব্য' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষে ২২মে পুরী রামকৃষ্ণ মঠে এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজনও করা হয়েছিল। ঐদিন পুরী রামকৃষ্ণ মঠের সহযোগিতায় ১৫০ জন গ্রামের এবং ১৫০ জন শহরের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়।

ত্রাণ

রাজস্থান খরাত্রাণ : বিকানির তহশিলের শিব বাড়ি পশুশিবিরে গত এপ্রিল মাসে ২০৭টি গরুর জন্য ২৭,০০০ কিলোঃ শুকনো খাবার (বিচালি ইত্যাদি), ৯১০ কিলোঃ খৈল, ১৪২৫ কিলোঃ অন্যান্য পশুখাদ্য, ৬০০ কিলোঃ গমের ভুষি এবং ৭৮ কিলোঃ লবণ বিতরণ করা হয়েছে।

মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম' অনুযায়ী বারমার জেলার ৩৫৯০ জন খরাপীড়িত লোকের মধ্যে মাথাপিছু মাসে ৮ কিলোঃ করে মোট ২৮,৭২০ কিলোঃ পুষ্টি-কর খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

উড়িষ্যা খরাত্রাণ : গত মে মাসে গঞ্জাম জেলার মস্তাদি ও পাত্রপুরের খাদ্যবিতরণ শিবিরে ২৭টি গ্রামের ৯৩,০৫৯ জন মানুষকে খাওয়ানো হয়েছে।

গুজরাট খরাত্রাণ : গত মে মাসে রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে জুনাগড়, সুরেন্দ্রনগর, জামনগর

এবং রাজকোট জেলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ২০,০০০ কিলোঃ বাজরা, ১,৪৬৩টি শাড়ি, ১,৫৪৮টি কম্বল, ২০৪ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ এবং ১,৪০,০০০ লিঃ জল বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ঐসব জেলায় ৫,৬৭৩টি পশুর জন্য ৭,১৪,৬২৯ কিলোঃ পশুখাদ্য এবং ৩,০০,০০০ লিঃ জল সরবরাহ করা হয়েছে।

চক্ষুশিবির

গত ১৭—১৯ মার্চ আঁটপুর আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে এক চক্ষু অস্ত্রোপচার-শিবির পরিচালনা করে। মোট ৪৫ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে চশমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বহির্ভারত-সংবাদ

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারে জুন মাসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবার এবং শুক্রবার স্বামী আদি-শ্বরানন্দ গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রের ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ৩ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী। 'আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে তিনি ভাষণ প্রদান করেন। নিউইয়র্ক কমিউনিটি চার্চের ধর্মযাজক ডি. এস. হ্যারিংটন এবং নিউইয়র্ক সারা লরেন্স কলেজের ধর্মীয় বিষয়ের অধ্যাপক এ. ডব্লিউ স্যাডলার স্বামী বিবেকানন্দের উপর বক্তব্য রাখেন। ঐদিন অপরাহ্নে বিভিন্নদেশের সত্তরটিরও অধিক বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে ঐকতান বাদনের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বেদান্ত সোসাইটিতে (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া) গত জুন মাসে প্রতি রবিবার এবং বুধবারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ধর্মীয় আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করেছেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ১৯ জুন রবিবার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির স্বামী প্রমথানন্দ 'ভগবৎকৃপা' বিষয়ে আলোচনা করেন। বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে গত ৫ জুন ভগবান বুদ্ধের উপর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া ৩০মে এই আশ্রম একদিনের জন্য সাধন-শিবিরের (রিট্রিটের) ব্যবস্থা করেছিল।

দেহত্যাগ

গত ৬মে রাত্রি ৩-৩০ স্বামী শর্মানন্দ (সাধন) বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি বহুমূত্র, উচ্চরক্তচাপ ও অন্যান্য উপসর্গে ভুগছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা গদাধর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯৪৮—১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বরিশাল (বর্তমান বাংলাদেশ) কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। এছাড়া তিনি সবসময়ই গদাধর আশ্রমের কর্মী ছিলেন এবং ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আশ্রমের প্রধান হন। দেহত্যাগের এক বছর পূর্বে তিনি অবসর নিয়ে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বাস করছিলেন। অনাড়ম্বর সাধুজীবন এবং মধুর স্বভাবের জন্য তিনি অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

গত ৩ মে স্বামী শ্রীদেবানন্দ (অমল) হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দেওঘর আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর।

তিনি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসানসোল আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনি দেড়বছর বেলুড় মঠের এবং শেষে দেওঘর বিদ্যাপীঠের কর্মী ছিলেন। ভদ্র ও বিনম্র ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ প্রত্যেক শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।



সংবাদ

উৎসব

গত ২৭ মার্চ, হাওড়ার বেলাড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন দুপুরে প্রায় নয় হাজার ভক্তের মধ্যে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে স্বামী শরণ্যানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৫ ও ৬ মার্চ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, আমলাদাহি (চিত্তরঞ্জন) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেছে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। দুদিনই ধর্মসভায় স্বামী নির্জরানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

গত ৫—৭ মার্চ, রামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির, ডোমজুড় (হাওড়া), নগর পরিক্রমা, প্রসাদ বিতরণ, বস্ত্রবিতরণ, ধর্মসভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করেছে।

গত ৭ মার্চ, নববারাকপুর (উত্তর ২৪ পরগণা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত উৎসব পালন করেছে। এই উপলক্ষে ৮ মার্চ ট্রাস্ট পরিচালিত বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ উৎসবও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৭—২৯ ফেব্রুয়ারি, সোদপুর রামকৃষ্ণ সেবক সংঘ উক্ত উৎসব পালন করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ধর্মসভা ও তৃতীয় দিন ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

গত ২৭ মার্চ, বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সংঘ সারাদিন ব্যাপী আনন্দোৎসবের মাধ্যমে উক্ত উৎসব উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে উপনিষদ্‌ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলিপুরদুয়ার স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মোৎসব কমিটি গত ১২ জানুয়ারি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভাত ফেরী দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসবের সূচনা করে। এই উপলক্ষে ১২ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষায়তনে প্রবন্ধ, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও সঙ্গীত, প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২০ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপ্যাল হলে। ঐদিন কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, গীতি-আলেখ্য, নাটকাভিনয়, বিভিন্ন প্রতি-যোগিতায় সফল প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১০ এবং ১২ এপ্রিল '৮৮ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর (উত্তর ২৪ পরগণা) স্বামী বিবেকানন্দের ১২৬তম আবির্ভাব-তিথি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে এক ছাত্রসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনে সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রতি-যোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবের দুদিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ '৮৮ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং এই সঙ্গে দোল, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং কেন্দ্রের ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।

গত ৩ এপ্রিল '৮৮ চণ্ডিতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ (হুগলী) শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। পথপরিক্রমা, পূজা, হোম, প্রসাদ

বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। অপরাহ্নে স্বামী সমাত্মানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পায়রা-ডাক

উড়িষ্যায় পুলিশ বিভাগ রাজ্যের ৫টি কেন্দ্রে পায়রার ডাক-ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। সর্বমোট ৯৪০টি পায়রা এই সার্ভিসে নিযুক্ত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই ডাক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে আছেন ৬৮ জন পুলিশ কর্মী এবং একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল।

'পায়রা-ডাক'-এর বিশেষ সুবিধা হল, এরা এদের পায়ে বাঁধা চিঠি নিয়ে কোথাও না থেমে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে চলে বলে নিরাপদ। বন্যা পরিস্থিতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে একমাত্র সহায় এরাই। আবার দুর্গম স্থানেও বার্তাবহ হিসেবে এরা উপযুক্ত বাহক। উল্লেখ্য ৮২ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ বন্যা-পরিস্থিতিতে এই ডাক-ব্যবস্থা খুব উপকারে আসে।

অথ হস্তিশাবক কথা

বছর দুয়েকেরও কম বয়সের দুই ভাই ছেরান আর জাম্বু, প্রাতরাশের আগেই চলে যায় প্রাতঃস্নান করতে নদীতে। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এসে গণেশের মন্দিরে ঢোকে শুঁড় দিয়ে ঘন্টা নেড়ে। নিষ্ঠাভরে নতজানু হয় বিগ্রহের সামনে। মন্দির প্রদক্ষিণ করে ৩ বার। উপোস করে এতক্ষণ ধরে পুজো করার পর আবার চলে যায় বনের মধ্যে এবং গিয়ে খাবার খায়। তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলার মুদুমালাই অভয়ারণ্যে এই হস্তিশাবকদুটির নিত্যকর্ম ঠিক এইরকম।

মরু-আয়তন বৃদ্ধি

সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত পরিবেশ-বিশেষজ্ঞ ডঃ এস. ডি. রিপ্লে ভারতে আসেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন সাহারা, রাজস্থান, পশ্চিম গুজরাট এবং অন্ধ্র প্রদেশের কিছু অঞ্চলে খরার অত্যধিক প্রকোপের কারণ নির্বিচারে অরণ্যনাশ। এতে মরুভূমি-অঞ্চল বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে এই মরু-অঞ্চল ক্রমশঃই পশ্চিম থেকে পূর্বে এগিয়ে আসছে।

পরলোকে

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ** গত ১৫ মে ৮২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে অধুনা বাংলা-দেশের লালমণির হাটে তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর কুচবিহারে আশ্রমটিকে স্থানান্তরিত করেন। মন্দির, স্কুল, ছাত্রাবাস ও লাইব্রেরী সমন্বিত আশ্রমটি স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর অনাড়ম্বর সাধুজীবন এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য ভক্তদের কাছে তিনি খুব শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

গত ৩১ মার্চ ১৯৮৮, লিলুয়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সদস্য **মদনমোহন ঘোষ** পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং নানাভাবে তিনি মঠ ও মিশনের কাজে সহায়তা করতেন।

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ খাসিয়া-ভক্ত **সরোজিনি ডিংডো** (কঙ্ মুম্ নামে সমধিক পরিচিত) গত ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। অবিবাহিতা শ্রীমতী ডিংডো বহু বছর যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা হিসাবে চেরাপুঞ্জি আশ্রমের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের অনেকাংশ স্বহস্তে প্রত্যহ পরিষ্কার করতেন। আশ্রমের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। উৎসবে যোগদানের জন্য বহু খাসিয়া-ভক্তকে তিনি সংবাদ দিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁর মৃত্যুতে চেরাপুঞ্জি আশ্রম একজন একনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ-অনুরাগী খাসিয়া-ভক্তকে হারাল।



বিজ্ঞান সংবাদ

জলবসন্তের টিকা চালু হবার মুখে

গুটিবসন্তের (smallpox) বিরুদ্ধে ভাল টিকা ঐ অসুখকে পৃথিবী হতে বিদায় দিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। পানবসন্তের বা জলবসন্তের (chickenpox) বিরুদ্ধে ভাল টিকা না থাকায় ঐ রোগ দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে চলছে। অনেকেরই জানা আছে যে জলবসন্তের জীবপরমাণু (ভেরিসেলা ভাইরাস), হারপিস জস্টার (Herpes zoster) নামক যন্ত্রণাদায়ক রোগের জন্যও দায়ী। পানবসন্তের টিকা তৈরি হলে দুটি রোগকেই প্রতিহত বা প্রশমিত করতে পারবে। সেজন্য এই টিকা তৈরির ব্যাপারে গবেষণা চলে আসছে নানা দেশে। ভেরিসেলা (Varicella) ভাইরাসকে নানা প্রক্রিয়ায় চাষ করে তাকে অ-ক্ষতিকর ভাইরাসে পরিণত করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। কয়েকটি ল্যাবরেটরিতে এই বিষয়ে সফলতা এসেছে; টিকাও তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি সুস্থ বালক-বালিকাদের শরীরে এই টিকা ইনজেক্‌সন দিয়ে এর নিরাপত্তা ও রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা যাচাই করা হয়েছে। এখন এই টিকা লাইসেন্স পাবার মুখে।

গুটিবসন্তের জীবপরমাণুকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার-আশঙ্কা

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেছিল যে পৃথিবী হতে গুটিবসন্ত (smallpox)-কে নির্মূল করা হয়েছে। তার আগে, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৫০টি দেশ 'জীবাণুকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার বিষয়ক সম্মেলন' (Biological weapons convention) ডেকে অঙ্গীকারপত্রে সই দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল যে এই ধরনের অস্ত্র তারা ব্যবহার করবে না। আন্তর্জাতিক এই সম্মতি সত্ত্বেও ইউনাইটেড স্টেট্‌স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সেনাবাহিনীকে বসন্তের টিকা দিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ, উভয় দেশই সন্দেহ করে যে অপর পক্ষ জীবাণু (bacteria) বা জীবপরমাণু (virus)-কে যুদ্ধে অস্ত্রহিসাবে ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে পারে। বসন্ত-টিকা অনেকাংশে নিরাপদ হলেও সম্পূর্ণরূপে অ-ক্ষতিকারক নয়; উভয় দেশেরই সেনাবাহিনীতে টিকার জীবপরমাণু দ্বারা কিছু কিছু অসুখের সৃষ্টি হওয়া চলছে। উভয় দেশের সেনাবাহিনীতে এই টিকা দেওয়া বন্ধ হলে মানুষের মনে গুটিবসন্ত হতে আশংকার শেষচিহ্ন দূর হবে।

[Immunisation survey of recent Research. Dec. 1987, P. 94]

আশ্চর্য বীজ

সম্প্রতি ভাবা পরমাণু গবেষণাকেন্দ্র আশ্চর্য শস্যবীজ উদ্ভাবন করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে। পরমাণু পদ্ধতিতে রশ্মি ব্যবহার করে এই জাতীয় বীজ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চাষীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সরষে, আখ এবং চিনাবাদামের এই বীজ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর বহু দেশ ভারতের কাছে ঐ অধিক ফলনশীল বীজ প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানিয়েছে। উল্লেখ্য, মিউটেশন পদ্ধতিতে বীজ উদ্ভাবন ছাড়াও জমির উর্বরতা, জলের পরিমাণ, মাটি ও উদ্ভিদের সম্বন্ধে পোকামাকড় ও আগাছা দমন এবং ফসল সংরক্ষণে অপচয় নিবারণ প্রভৃতি বিষয়েও ভাবা পরমাণু গবেষণাকেন্দ্র বিবিধ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সূচীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ ভাদ্র ১৩৯৫

দিব্য বাণী ঃ ☐ ৪৭৭
কথাপ্রসঙ্গে ঃ ধরণীর ক্রন্দন এবং একটি মহা-আবির্ভাব ☐ ৪৭৮

প্রবন্ধ

বাঙালী-জীবনে কৃষ্ণ ☐ তাপস বসু ☐ ৪৮১
কৃষ্ণচিন্তায় নব-জাগরণ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য ☐ দিলীপকুমার দত্ত ☐ ৪৮৮
নিষ্কর্মতার সঞ্চয় ☐ রবীন্দ্রনাথ জানা ☐ ৪৯৫
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত ☐ প্রণবেশ চক্রবর্তী ☐ ৪৯৮
স্বামী অভেদানন্দ ঃ একটি অনুধ্যান ☐ স্বামী গহনানন্দ ☐ ৫১০

ভ্রমণ-কাহিনী

বিউখী ☐ বীরেশ্বর পাল ☐ ৫১৬

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

সাগরদ্রুম ☐ প্রশান্তকুমার পণ্ডিত ☐ ৫২৪

কবিতা

কৃষ্ণ ☐ শ্রীঅরবিন্দ ☐ ৫০৬ ☐ হাজারো প্রণতি ☐ স্বামী আত্মপ্রভানন্দ ☐ ৫০৬
রামকৃষ্ণমহিম্নস্তোত্রম্ ☐ রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ☐ ৫০৭ ☐ অক্ষমতা ☐ অচিন্ত্য বিশ্বাস ☐ ৫০৭

নিয়মিত বিভাগ

আনন্দের সন্তান ঃ খেলে নন্দদুলাল ☐ ৫০৮
মাধুকরী ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় যুবসমাজ ☐ হামদুল্লা ফারুক ☐ ৫১৩
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ঃ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ☐ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ☐ ৫২০
বাতায়ন ঃ সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ☐ ৫২৮
গ্রন্থ পরিচয় ঃ ভাগবত-ভক্ত-ভগবান ☐ তারকনাথ ঘোষ ☐ ৫৩০
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ☐ ৫৩২ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ☐ ৫৩৩
বিবিধ সংবাদ ☐ ৫৩৪ বিজ্ঞান সংবাদ ☐ ৫৩৬

সম্পাদক
স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ ঃ রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বার্ষিক মূল্য ঃ তিরিশ টাকা ☐ সডাক ছত্রিশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা ঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

উদ্বোধন আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৯৫ সংখ্যা

যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে তাঁদের কয়েকজন

প্রবন্ধ ☐ স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, রেজাউল করীম, আশাপূর্ণা দেবী, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, জলি মোহন কল, জলধিকুমার সরকার, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, তাপস বসু, জ্যোতির্ময় বসুরায়, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ☐ **বিজ্ঞান-নিবন্ধ** ☐ সন্দীপকুমার চক্রবর্তী ☐ **স্মৃতিকথা** ☐ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ☐ **রম্যরচনা** ☐ স্বামী গোপেশানন্দ ☐ **অলৌকিক সত্যকাহিনী** ☐ আনন্দ বাগচি ☐ **ভ্রমণ-কাহিনী** ☐ ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী ☐ **সমীক্ষা-নিবন্ধ** ☐ মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ☐ **কবিতা** ☐ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী অচ্যুতানন্দ, শান্তিকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ শীল, জয়ন্তী সেন, নিভা দে, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন পাল, অরুণকুমার দত্ত, শান্তশীল দাশ, পলাশ মিত্র, নিমাই মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ☐

নিয়মিত বিভাগ

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে ☐ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, ☐ **আনন্দের সন্তান** ☐ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ☐ **মাধুকরী** ☐ সন্তোষকুমার ঘোষ ☐ **বাতায়ন** ☐ লিদিয়া লিবেদিনস্কায়া ☐

বিজ্ঞপ্তি

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারের 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন (শারদীয়া সংখ্যা) প্রকাশিত হবে। মূল্য : **ষোল টাকা**।

☐ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকাদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি বারো টাকায় পাবেন।

☐ গ্রাহক-গ্রাহিকারা সাধারণ ডাকে এই সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার দেওয়া খুব অসুবিধাজনক।

☐ সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ১২ সেপ্টেম্বর '৮৮-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ঐ তারিখের মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ সাধারণ ডাকে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে রেজেষ্ট্রি ডাকেও আশ্বিন সংখ্যাটি নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রেজেষ্ট্রি ডাক ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ছয় টাকা ১২ সেপ্টেম্বর '৮৮-এর মধ্যে কার্যালয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। ঐ তারিখের পরে টাকা কার্যালয়ে পৌঁছালে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক-গ্রাহিকার আগামী বছরের ডাকমাশুল বাবদ জমা রাখা হবে।

☐ ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা পত্রিকা সংগ্রহ করবেন তাঁদের **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত** কার্যালয় থেকে আশ্বিন সংখ্যাটি দেওয়া হবে।

(কার্যালয় শনিবার ১-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০ পর্যন্ত খোলা।)



৯০তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]   ভাদ্র, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

শুক উবাচ

অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্ ॥

*   *   *

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জ্জুরনুসাগরম্ ॥
নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে ।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥
তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্ ।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্ ।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥*

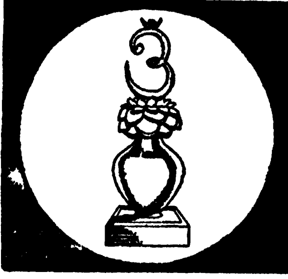
শুকদেব বললেন,

(হে রাজন।) অনন্তর যখন সর্বগুণসম্পন্ন পরম রমণীয় সময় উপস্থিত হল, প্রাকৃত জন্মরহিত শ্রীভগবানের জন্মনক্ষত্র (রোহিণী) উদিত হওয়ায় অপর নক্ষত্র গ্রহ ও তারাগণ প্রশান্তভাব ধারণ করল।

দেবতা ও মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। ঘোর অন্ধকার দ্বারা যখন জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই অর্ধরাত্রে ভগবান জনার্দন জন্মগ্রহণ করার উপক্রম করলে সাগর-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জলধরসকল মন্দ মন্দ গর্জন করতে লাগল। সেই সময় সর্বান্তর্যামী শ্রীভগবান সর্বাংশে পরিপূর্ণ হয়ে পূর্ব দিকে পুষ্কল অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন।

তখন বসুদেব সেই অদ্ভুত বালককে দর্শন করলেন। তাঁর নেত্রযুগল নীলকমলসদৃশ, তিনি চতুর্ভুজ এবং ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আয়ুধ বিদ্যমান। তাঁর বক্ষস্থলের লোমাবলী শ্রীবৎস-চিহ্নিত, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পীত বসন, নবীন নীরদ বর্ণ, মহামূল্যবান বৈদূর্যমুকুট ও কুণ্ডলের দীপ্তিতে বহুল কেশসকল দেদীপ্যমান এবং তিনি অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ ও কংকণ প্রভৃতি অলঙ্কারে প্রদীপ্ত।

* ভাগবত, ১০।৩।১, ৭—১০



কথাপ্রসঙ্গে

ধরণীর ক্রন্দন এবং একটি মহা-আবির্ভাব

রাজোবাচ

অবতীর্য্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ। কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥

*　　　*　　　*

শুক উবাচ

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ। আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ। উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥
ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ। জগাম স-ত্রিণয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্। পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥
গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥
পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥
বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে … ॥

(ভাগবত, ১০।১।৩, ১৭—২৩)

ভাগবতের দশম স্কন্ধের সূচনা হইতেছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ মহর্ষি শুকদেবের নিকট উদগ্র আগ্রহ লইয়া জানিতে চাহিতেছেন যদুবংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের আবির্ভাবাদি বৃত্তান্ত। শুকদেব বলিলেন: মদগর্বী রাজবেশধারী দৈত্যগণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যসামন্তের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া ধরিত্রী প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ধরিত্রী শীর্ণা অশ্রুমুখী গাভীরূপ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ দুঃখ বৃত্তান্ত বলিলেন।

ইহাই কৃষ্ণের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ। ধরিত্রীর ক্রন্দন। ইহসর্বস্ব, দৈত্যবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের ভোগলোলুপতা, ভ্রষ্টাচার, দুর্বল ও শিষ্টজনের উপর নির্মম নিপীড়ন সর্বংসহা ধরিত্রীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে। অগণিত মানুষের বেদনা, হাহাকার ও আর্তনাদের বিগ্রহভূতা ধরিত্রী তাই সৃষ্টিকর্তার শরণাপন্ন। নূতন যুগসৃষ্টির আর্তি তাঁহার কণ্ঠে। ধরিত্রীর সেই আর্তিতে বিচলিত লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ধরিত্রী, অন্যান্য দেবতা ও মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে যাত্রা করিলেন। সেখানে অধিষ্ঠান পরমদেবতা বিষ্ণুর। ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় আকাশবাণী ঘোষিত হইল। কিন্তু শুধু ব্রহ্মাই শুনিলেন সেই বাণী এবং দেবতাদের বলিলেন: "হে অমরগণ! পরমপুরুষ শ্রীভগবানের বাণী আমার কাছে শ্রবণ কর। আমাদের নিবেদনের পূর্বেই সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর ধরিত্রীর সন্তাপ-বিবরণ অবগত হইয়াছেন। ধরিত্রীর দুঃখভার মোচন করিবার জন্য তিনি নিজেকে মর্ত্যলোকে প্রকটিত করিবেন। যতদিন তিনি স্বীয় কালশক্তিপ্রভাবে ভূভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন ততদিন তোমরাও নিজ নিজ অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর। ভগবান পরমপুরুষ স্বয়ং বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন।"

অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর ভাদ্রমাসের (চান্দ্র শ্রাবণমাসের) মহানিশা। বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তানরূপে কংসের কারাগারে ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন। সুদূর অতীতে বহু শত বৎসর পূর্বে দ্বাপরযুগের শেষপাদে এক ভাদ্র (চান্দ্র শ্রাবণ) কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে বুধবার পৃথিবীর ভাগ্যে এই শুভলগ্নটি সমাগত হইয়াছিল। পণ্ডিতদের মতে, সে আজ প্রায় সার্ধপাঁচসহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনা। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায়"—সৎব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য, ধর্মসংস্থাপন করিবার জন্য যিনি "ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাম্"—ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, আবার একই সঙ্গে যিনি "ভক্তানাং অভয়ংকরম্"—আশ্রিত ভক্তগণের অভয়দাতৃ সেই পরমপুরুষ অন্ধকার কংস-কারাগারের অপরিসর প্রকোষ্ঠে আবির্ভূত হইলেন। জন্মমুহূর্তটিতে প্রকৃতি শান্ত থাকিলেও তাহার পরেই গভীর রজনী ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ও বর্ষণমুখর হইয়া উঠিল, আকাশ ক্ষণে ক্ষণে ভয়াল বিদ্যুতের ঝলকে বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

কিন্তু কারাগার কেন? কংস কি তাঁহার ভগিনী দেবকী ও ভগিনীপতি বসুদেবকে রাজপ্রাসাদের কোন অংশে অথবা অপর কোন অট্টালিকায় কঠোর প্রহরায় রাখিতে পারিতেন না? আবার, যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার অতিলৌকিক বিভূতিতে কারাপ্রহরীগণকে নিদ্রাভিভূত করিয়া, উত্তাল যমুনাকে ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিণত করিয়া বসুদেবের নন্দগৃহে গমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি কি ইচ্ছা করিলে মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইবার পূর্বেই স্বীয় জনক-জননীকে তাঁহার অতিলৌকিক ক্ষমতাবলে নিশ্ছিদ্র নিরাপদ স্থানে স্থাপন করিতে পারিতেন না? তাঁহার জন্মমুহূর্তটিকে ঐরূপ দুর্যোগময় করিবারই বা কী প্রয়োজন ছিল?

এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে, কৃষ্ণ কারাগারে জন্মগ্রহণ না করিয়া কোন সুরম্য অট্টালিকায় অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন, পারিতেন বসুদেব ও দেবকীকে নিশ্ছিদ্র নিরাপদ স্থানে স্থাপন করিতেও এবং রজনীটিকে সেক্ষেত্রে দুর্যোগময়ী করিয়া তুলিবারও কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু কেন করিয়াছিলেন? করিয়াছিলেন কারণ, প্রত্যেকটির পশ্চাতে যে শ্রীভগবানের একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি যে পাপভারে জর্জরিত ধরিত্রী ও তাঁহার সন্তানগণের ক্লেশ ও যন্ত্রণাকে মানবের অনুভূতি দিয়া অনুভব করিবার জন্য তাঁহার দিব্যধাম হইতে অবতীর্ণ হইবেন। কারাগার ধরিত্রী ও তাঁহার সন্তানগণের উপর কংসের নিপীড়ন ও অত্যাচারের প্রতীক। পার্থিব লাঞ্ছনার মধ্যে কারাগারের লাঞ্ছনা ও অপমানই সর্বাপেক্ষা নির্মম। শৃঙ্খলিত বসুদেব ও দেবকী যেন নিপীড়িত মানুষের অসহায়তা ও দুঃখকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কৃষ্ণাষ্টমীর রজনী সেই দুঃখী, অসহায় ও অত্যাচারিত মানুষের অন্তরের আলোড়নকে প্রকৃতির রূপের মধ্যে প্রতীকী করিয়া দিয়াছিল। অবিশ্রাম বর্ষণ যেন আর্ত মানুষের ক্রন্দনের দ্যোতক, আর বিদ্যুৎচমক যেন বেদনাবিধুর প্রাণের বহ্নিমান দীর্ঘশ্বাস। ভগবান আসিয়াছেন শোষণ ও অপশাসনের কারাগারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য, নিপীড়িত মানুষকে মুক্তি, স্বস্তি, আনন্দ ও শান্তির অমেয় আস্বাদ প্রদান করিবার জন্য।

আরও কারণ ছিল। যিনি সেদিন অবতীর্ণ হইলেন তিনি যে দরিদ্রের সখা—অসহায়ের সহায়। দরিদ্রের কুটিরেই তো সমাজ, দেশ, পৃথিবী। জগন্নাথ জগৎকে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। জগতের অধিকাংশ মানুষ যে দারিদ্র্য, যে দুর্দশা, যে দৈন্যের মধ্যে পৃথিবীর আলোক প্রথম দর্শন করে জগত্তারণ সেই দারিদ্র্য, সেই দুর্দশা, সেই দৈন্যের প্রবাহ ধরিয়াই আসিতেছেন—নতুবা কেমন করিয়া তিনি জগতের হইবেন, সকলের হইবেন? সাধারণ দুঃখী-দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলে উল্লসিত শঙ্খধ্বনি তাঁহার জন্মমুহূর্ত ঘোষণা না করিলেও, পরিবারের লোকজনের মধ্যে আনন্দের অপ্রতুলতা হইত না। কিন্তু কারাগারে জন্মগ্রহণ করায় কোন শঙ্খধ্বনি তো তাঁহার জন্মমুহূর্তকে ঘোষণা করেই নাই, তদুপরি কারাগারে নিক্ষিপ্ত বসুদেব ও দেবকীর এই পুত্রসন্তান সকলের অগোচরে, নিঃশব্দে জন্মগ্রহণ করায় আত্মীয়-পরিজনদের বক্ষেও আনন্দ-স্পন্দন তুলিতে পারে নাই। কংসের ভয়ে

বসুদেব ও দেবকী এই আনন্দদলনটিকে যেন বাতাসেরও অগোচর রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দরিদ্রের কুটির অপেক্ষাও নিরানন্দ ও ভীতব্যাকুল পরিবেশে জগৎস্বামীর আবির্ভাব। প্রভু অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিতেছেন, দুর্যোগের ভিতর দিয়া আসিতেছেন, ত্রাস ও নিরানন্দের ভিতর দিয়া আসিতেছেন। প্রভুর জন্মসময়ে কোন মঙ্গলশঙ্খ প্রতিবেশীদের সচকিত করে নাই, কোন নিকট আত্মীয়কে উৎফুল্ল হইতে দেখা যায় নাই। কংসের অপশাসনে চতুর্দিকে কী শ্বাসরোধকারী ত্রাসের বাতাবরণ রচিত হইয়াছিল জগতের সমক্ষে তাহা দেখাইবার জন্যই প্রভুর কারাগারে এইরূপে আবির্ভাব।

প্রভু অষ্টম সন্তান হইয়া আসিয়াছেন, ইহাও তাৎপর্যবিহীন নহে। একজন এইভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন: দরিদ্র পিতামাতা একটিমাত্র সন্তানকেই আদরের সহিত ভরণপোষণ করিতে পারে না, অষ্টম সন্তান তো তাহাদের বিরক্তি, নৈরাশ্য ও অনাদরের ভিতর দিয়াই আসিয়া উপস্থিত হয়। বহু ভ্রাতার জন্মের পর প্রভুও যেন চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে বহুমানব চক্ষুর সমালোচনা-দৃষ্টির অন্তরালে একখণ্ড অন্ধকারময় কক্ষে চতুর্দিকে ঘনায়মান কৃষ্ণা রজনীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া আসিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইতেছেন। দরিদ্রের শিশুর অনাদর আস্বাদন করিবার জন্যই তো এবার অষ্টম পুত্ররূপী ভগবানের আবির্ভাব। আরও আসিয়াছেন পিতামাতার ঘোরতর বিপদের দিনে। পুত্রশোকাতুর জনক-জননী হয়তো আর পুত্রশোক সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন, অসহায় হইয়া নিষ্ঠুর কংসের হস্তে শিশুহত্যা দেখিবার ধৈর্য আর তাঁহাদের নাই।

এইরূপ বিপদের দিনেই তো মানুষের জীবনে ভগবানের কৃপা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন মানুষ নিজেকে চরম অসহায় বলিয়া মনে করে, যখন মানুষ পৃথিবীতে একান্তই সর্বপরিত্যক্ত, যখন পুরুষকার প্রয়োগ করিবার সামর্থ্যও সে হারাইয়া ফেলে, সেই নিশ্চেষ্ট আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়াই তো হয় তাঁহার "তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়"। আজ সমগ্র পৃথিবীতে বসুদেব ও দেবকীর মতো অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতো ঈশ্বরের কৃপার পাত্রও জগতে কেহ নাই। তাই তো ঐ কংস-কারাগার আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। অচিরেই তাঁহাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে। কারাগার হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবেন সূর্যকরোজ্জ্বল উন্মুক্ত পৃথিবীতে।

শুধু কি বসুদেব আর দেবকীই কারামুক্ত হইবেন? না—বৃহত্তর কারাগার সমগ্র মথুরাভূমি। কংসের নিষ্ঠুর পীড়নে জর্জরিত মথুরাভূমির সকল নরনারীর প্রতিনিধি বসুদেব এবং দেবকী। আবার ব্যাপকতম অর্থে কারাগার সমগ্র ভারতভূমি। কংস, জরাসন্ধ, নরকাসুর, দন্তবক্র, শিশুপাল, দুর্যোধন প্রমুখের মদগর্ব আর অপশাসন সমগ্র ভারতভূমিকে ক্রমেই অত্যাচার আর নিপীড়নের বধ্যভূমিতে পরিণত করিবে আমরা দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে অনাচারীর পাশব উল্লাস। দেখিতে পাইব সমগ্র ভারত জুড়িয়া সৎ ও ধর্মাশ্রয়ী মানুষের লাঞ্ছনা, ক্লেশ আর অবমাননা। ভারতরূপী বৃহত্তম কারাগারের ভূমি তাই জগন্নাথের চরণ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত। সেই চূড়ান্ত ক্রান্তিলগ্নেই হইল তাঁহার মহা-আবির্ভাব। শুধু সেই প্রাচীন অতীতেই নহে, তিনি স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, যখনই এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তখনই জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে তাঁহার জগত্তারণ মহা-আবির্ভাবকে।

জন্মহীন জন্মগ্রহণ করিলেন। ভাগবতে দেখিতেছি, শুকদেব বলিতেছেন, সেই মুহূর্তটি ছিল সর্বগুণসমন্বিত কাল—"সর্বগুণোপেতঃ কালঃ"। মানুষ সাধারণতঃ দশ মাস দশ দিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়া জন্মলাভ করে। কিন্তু হরিবংশ-মতে জগৎস্বামীর জন্ম হইয়াছিল অষ্টম মাসে। অষ্টমী তিথি, অষ্টম গর্ভ, অষ্টম মাস। অষ্টম মাস হইলেও সেই অদ্ভুত শিশু পরিপূর্ণতার সমস্ত সংজ্ঞাকে অতিক্রম করিয়া পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জননীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন:

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

(ভাগবত, ১০।৩।৮)

বাঙালী-জীবনে কৃষ্ণ

তাপস বসু

প্রবহমান ভারতীয় ঐতিহ্যে শিব, কালী এবং কৃষ্ণের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের শুরুতেই প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন—"ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ-দেশে চিরকাল।"[১] বিবেকানন্দের অভিমত উজ্জ্বলভাবেই সত্য। আজ সারা ভারতে এই তিন-জন দেব-দেবী নানাভাবে পূজিত হচ্ছেন। এঁদের নিয়ে নিরন্তর নানা চর্চাও চলেছে। তুলনামূলক বিচারে সাধারণ মানুষজনের মধ্যে কৃষ্ণচর্চা প্রসারিত হয়েছে বিশেষভাবে। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট থেকে দৃষ্টি যদি আমরা বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি তাহলে দেখব যে, নিরবচ্ছিন্নভাবেই কৃষ্ণচর্চা চলেছে বাঙালী-জীবনে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-সহ অসংখ্য পদাবলী রচয়িতার বৈষ্ণব পদগুলিতে আমরা যে কৃষ্ণের ছবি প্রত্যক্ষ করি তাতে ভারতীয় দেবতা কৃষ্ণ যেন পুরোপুরি বাঙালী দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট রচনায় মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা বাংলাদেশের পল্লী-প্রকৃতির শ্যামল আঙিনায় একাকার হয়ে গেছে। মালাধর বসুর[২] 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে আমরা যে-কৃষ্ণকে পাই তিনি বরং তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ভারতীয়।

বাংলাদেশে এই কৃষ্ণচর্চা শুরু হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের সময় থেকে। অবশ্য সেসময় নারায়ণরূপের কাছেই বাঙালীরা নতজানু হয়েছে। বগুড়া জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) প্রাপ্ত মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায় রচিত মহাস্থান চক্রলিপি বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিষ্ণু তথা কৃষ্ণ উপাসনায় প্রাচীনতম প্রত্ননিদর্শন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের যে লিপিটি বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে খোদিত অবস্থায় বর্তমানকালে পাওয়া গিয়েছে তাতে বিষ্ণু-চক্রের নিচে উৎকীর্ণ আছে সংস্কৃত ভাষায়—'পুষ্করণাধিপতের্মহারাজা শ্রীসিংঘবর্মণঃ পুত্রস্য / মহারাজা শ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ / চক্রস্বামিণঃ দোস-গ্রেণাতিসৃষ্টঃ।'[৩] এই উৎকীর্ণ লিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মহারাজ চন্দ্রবর্মা নিজেকে বিষ্ণু তথা কৃষ্ণের পূজক রূপে অভিহিত করেছেন। পঞ্চম শতাব্দীতে শিবনন্দী গোবিন্দস্বামীর দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বাংলায়। এ-তথ্য জানা যায় পঞ্চম শতাব্দীর একটি তাম্রশাসনপত্র থেকে। 'গোবিন্দস্বামী' নামটিও বিষ্ণু তথা কৃষ্ণেরই অপর নাম।

কৃষ্ণের জীবনের নানা ছবি পাওয়া গিয়েছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে খোদিত পাহাড়পুরের প্রত্ননিদর্শন থেকে। সরাসরি কৃষ্ণ এই সময় থেকেই বাঙালীর চিত্তাকর্ষণ করতে থাকেন।[৪] এরপর পাল ও সেন-যুগে কৃষ্ণচর্চার প্রবাহিত ধারাটির কথা সর্বজনবিদিত। শুধু সেকালের পাথুরে ভাস্কর্যে, শিল্পকলায় নয়—সাহিত্যে, লোকজীবনে ব্যাপকভাবে কৃষ্ণচর্চার কথা আমরা সমকালীন প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য থেকে জানতে পারি। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত হালের 'গাথাসপ্তশতী' গ্রন্থে লোকজীবনে কৃষ্ণলীলার প্রসারিত ছবিটি আমরা প্রত্যক্ষ করি নানাভাবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—'নচ্চন-সলাহন ণিহেন পাস—পরিকংঠিআ নিউণ গোবী। / সরিস গোবিআন' চুমুবই কবোল পড়িমা—গঅং কণ্হ ॥'[৫]

১ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৩৬৯) পৃঃ ১৫১

২ মালাধর বসু ১৩৯৫—১৪০২ শকাব্দের মধ্যে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তৎকালীন গৌড়ের সুলতান তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিও দিয়েছিলেন। এটি ভাগবতের ১০ম—১১শ এই দুই স্কন্ধের অনুবাদ।

৩ Epigraphia Edica, Vol XIII p. 133

৪ K. N. Dikshit, Excavations at Paharpur Bengal, p. 44

৫ গাথাসপ্তশতী (পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), ২/৫১

এখানে কৃষ্ণকে ঘিরে গোপিনীদের যে নৃত্যের ছবি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তা রাসনৃত্যের অনুরূপ। কৃষ্ণ-মুখ চুম্বনে গোপীদের গভীর কৃষ্ণপ্রেম লোক-জীবনের অনুসরণে উল্লিখিত হয়েছে। 'গাথাসপ্তশতী' ছাড়া প্রাকৃত পৈঙ্গল, শ্রীধর দাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত, পদ্যাবলী, প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদিতে কৃষ্ণ এবং রাধার কথা যুগ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাকারেরাও সেকালের সব বিখ্যাতজন, লক্ষ্মণসেনের সভাকবিও কেউ কেউ। এঁরা হলেন উমাপতি ধর, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন প্রমুখ। আর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'—বাঙালী-জীবনে কৃষ্ণচর্চার এক উজ্জ্বল গ্রন্থ। ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, চিত্রকল্প, ভাবাবেগ—এসবের সাহায্যে জয়দেব কৃষ্ণ এবং রাধাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা এককথায় অপূর্ব। সভাকবিদের সংস্পর্শে লক্ষ্মণ সেন এবং তাঁর পুত্র কেশব সেন কৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে সদুক্তিকর্ণামৃত ও পদ্যাবলীতে।

বাঙালীর কৃষ্ণচর্চার উন্মেষ ও বিকাশের পর্বটি ছিল এমনই পল্লবিত। বাংলাভাষায় সরাসরি কৃষ্ণকে নিয়ে প্রথম যে-কাব্যটি রচিত হয়েছিল তার নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস। কাব্যের ঐ নামকরণ অবশ্য করেছেন কাব্যটির আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন রায়। লোকজীবনে কৃষ্ণ-রাধার যে ছবিটি বহমান তাকেই বড়ু চন্ডীদাস তুলে ধরেছেন এই কাব্যের মধ্যে। কাব্যটি রচনার সময় ভাগবত পুরাণ তিনি যে পড়েছিলেন তার ছাপও আছে, আর নির্মাণের দিক থেকে তিনি পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন জয়দেবকে। এই কাব্যটি বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হয়নি। অশ্লীল বলে পরিত্যাজ্য হয়েছে। এই কাব্যটিতে বড়ু চন্ডীদাস হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ-জীবনের যে-ছবি মেলে ধরেছেন তাকে বিবর্ণ বলে আমরা কখনই বাতিল করে দিতে পারি না। আসলে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রমুখ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত কৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর মধ্যে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব, দর্শন, ভক্তি, বিনম্রতাকে যেভাবে মেলে ধরেছিলেন আপন আপন পরিশীলিত বৈষ্ণবীয় ভাবনা থেকে গ্রামীণ কবি বড়ু চন্ডীদাসের মধ্যে সেই পরিশীলন ও অনুশীলন—কোনটাই ছিল না। বিদ্যাপতি মিথিলার মানুষ। বাংলাভাষায় লেখেনওনি। লিখেছেন বাংলার সঙ্গে মৈথিলীকে মিশিয়ে, অর্থাৎ ব্রজবুলি ভাষায়। তবুও বাঙালী-জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে তাঁর পদাবলী, তাঁর চিত্রিত কৃষ্ণ ও রাধা। তিনি যখন কৃষ্ণ-বিহনে রাধার গভীর আর্তি প্রকাশ করে লেখেন—"এ ভরা বাদর / মাহ ভাদর / শূন মন্দির মোর"—তখন আমরা দেখি রাধা যেন বাঙালী নারীর হৃদয় ছেঁচা বেদনাকেই তুলে ধরেছেন। চন্ডীদাস যখন আপন তন্ময়তা থেকে লেখেন পূর্বরাগের এই পঙ্‌ক্তিগুলি—"সখী কেবা শুনাইল মোরে শ্যাম নাম / কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"—তখন আমরা বুঝি রাধার মতো সমগ্র বাঙালী-চিত্তেই কৃষ্ণ নাম পৌঁছে গিয়েছে। মধ্যযুগের পরিমন্ডলে কৃষ্ণ আরাধনা, কৃষ্ণকে নিয়ে কাব্যরচনা এরই সার্থক ফলশ্রুতি। শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামী এই পর্বে কৃষ্ণচর্চায়, কৃষ্ণ-আরাধনায় এক তীব্র গতি সঞ্চার করেছিলেন। সেই গতি-সঞ্চারিত পথেই বাঙালী-জীবনে কৃষ্ণচর্চা পল্লবিতভাবে বহু যোজন পথ অতিক্রম করেছে উত্তরকালে।

বাঙালী-জীবনে আধুনিককালে কৃষ্ণচর্চার প্রসারিত রূপটিও আমরা নানাভাবেই প্রত্যক্ষ করি। আমাদের আলোচনাও প্রধানতঃ আধুনিককাল নিয়েই। আধুনিক কালসীমার শুরুটা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। বাংলাদেশে সেই সময় অগণিত কৃষ্ণপ্রেমী মানুষ-জনেদের মনোরঞ্জনের জন্য কৃষ্ণযাত্রা যেমন অভিনীত হয়েছে, তেমনি কবিগান, তরজাগান, লোকসঙ্গীত ইত্যাদিতে কৃষ্ণকথা বারেবারেই উঠে এসেছে বাংলার পথে-প্রান্তরে। ইউরোপীয় মিশনারীরা সেসময়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তাতে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা প্রাধান্য পেয়েছিল বিশেষভাবে। আর সেই হিন্দুধর্মের বিরোধিতা মানে কৃষ্ণচর্চার বিরোধিতা। অবশ্য শৈব, শাক্তচর্চাও সেসময়ে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে কৃষ্ণপ্রেমী মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুধর্মের কিছু আচার-আচরণ, সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেমী বৈষ্ণব-সমাজের আচার-আচরণও তিনি মেনে নিতে পারেননি। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থে

তিনি কৃষ্ণপ্রেমী মানুষজনেদের আক্রমণ করেছেন। মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে সম্পন্ন সাহিত্য রচনার পরিবর্তে কবিগানে, টপ্পায়, খেউড়ে কৃষ্ণকথার যে বিকৃতি ঘটেছিল তা রামমোহন তাঁর শিক্ষিত মানসে মেনে নিতে পারেননি। Defence of Hindu Theism গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি জানিয়েছেন যে কৃষ্ণের ভক্তেরা কৃষ্ণ এবং গোপী সেজে অশ্লীলভাবে নাচগান করে এবং কৃষ্ণের প্রেম ও লাম্পট্যের অভিনয় করে। এ থেকে বোঝা যায় যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আদর্শে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

রামমোহনের বিশ্বাসহীনতা, মিশনারীদের আক্রমণ সত্ত্বেও গত শতাব্দীতে বাঙালী-জীবনে কৃষ্ণচর্চার গতি ছিল অব্যাহত। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিতা এবং মিশনারীদের আক্রমণের জবাব দিতে কৃষ্ণপ্রেমী মানুষজনেরা 'বিষ্ণুসভা' গঠন করেছিলেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে কৃষ্ণ তথা সনাতন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন। এই সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল—সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ রত্নাকর, সংবাদ তিমির নাশক, হিন্দুধর্ম, চন্দ্রোদয়, হিন্দুবন্ধু, ধর্মমর্মপ্রকাশিকা ইত্যাদি। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা উচ্ছেদ করে ব্যাপকভাবে সমাজে কৃষ্ণপূজা প্রচারের জন্য নন্দকুমার কবিরত্নের সম্পাদনায় 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' কৃষ্ণপূজার প্রচেষ্টাকে সাগরস্রোতরোধে বালির বাঁধের মতো উপহাসের কারণ বলে অভিহিত করে।৬

এই সময়ে কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য মহাভারত ও ভাগবত বাঙলায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। এছাড়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, হরিভক্তিরসামৃত, গোপালস্তোত্র, বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র ইত্যাদিও মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়।

গত শতাব্দীতে কৃষ্ণপ্রেমী, কৃষ্ণভক্ত মানুষজনদের মধ্যেই কৃষ্ণচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল না। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মননশীল বাঙালীরা কৃষ্ণচর্চায় যুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন—মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথও গত শতাব্দীর অন্তিম পর্বে রচনা করেছিলেন 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪)।

মধ্যযুগের কাব্যরচনার সিংহভাগ জুড়েই ছিলেন কৃষ্ণ। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত আখ্যান-কাব্যেও কৃষ্ণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদন রচিত ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুসরণে রচিত। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেও আছে মধুসূদনের কৃষ্ণবিষয়ক দুটি কবিতা,—'জয়দেব' এবং 'ব্রজবৃত্তান্ত'। ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার আগে কৃষ্ণকে ভালভাবে বুঝবার জন্য মধুসূদন ভালভাবে জয়দেব, বিদ্যাপতির কবিতা পড়েছিলেন। 'জয়দেব' ও 'ব্রজবৃত্তান্ত' কবিতায় মধুসূদন ব্রজাঙ্গনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমঘন রূপটিই তুলে ধরেছেন। একটা কথা বলা ভাল যে, মধুসূদনের কাব্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন। রাধার আকুলতা, উন্মত্ততা, অনুরাগ, বিরহ—এসবই অবশ্য কৃষ্ণের জন্যে। মধুসূদনের পর যে কবির নাম আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে তিনি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র সরকারী কর্মসূত্রে পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণজীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই আগ্রহের সূত্রেই রচিত হয়েছিল তাঁর কৃষ্ণকেন্দ্রিক তিনটি আখ্যান-কাব্য—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। রৈবতক (১৮৮৭) কাব্যে কৃষ্ণজীবনের প্রথম পর্বের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) কাব্যে কুরুক্ষেত্র সমরের পটভূমিকায় কৃষ্ণের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই কাব্যে আমরা দেখতে পাই যে, বহু রাজ্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিভেদে জর্জরিত ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধবার জন্য কৃষ্ণের উদ্যমী প্রয়াস। প্রভাস (১৮৯৬) কাব্যে আছে যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ। কৃষ্ণের প্রেমধর্মের কথা গুরুত্ব পেয়েছে এখানে। গীতায় অর্জুনের উদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান, ধর্ম, নিষ্কাম কর্মবিষয়ে কৃষ্ণ যে-কথাগুলি নানাভাবে উচ্চারণ করেছিলেন

৬ বাংলার নবচেতনার ইতিহাস—স্বপন বসু পুস্তক বিপণি, (১৯৮৫) পৃঃ ২৫৩

রৈবতক কাব্যে নবীনচন্দ্র অর্জুনের উদ্দেশে কৃষ্ণের মুখে সেই কথাই শুনিয়েছেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণকে নিয়ে বড় কোন কাব্য না লিখলেও তাঁর কবিতায় কৃষ্ণকথা বারেবারেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর চিত্তবিকাশ (১৮৯৮) কাব্যগ্রন্থের 'ব্রজবালক' ও 'স্মৃতিসুখ' কবিতায় আছে কৃষ্ণকথা। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁর পিতামহী কিন্তু ছিলেন বৈষ্ণব। জোড়াসাঁকোয় শৈশবে তিনি দেখেছিলেন নীলকণ্ঠ ও মতি রায়ের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রা। এছাড়া তিনি যে পাঁচালীগান শুনেছিলেন কৈশোরে, তাও ছিল কৃষ্ণকেন্দ্রিক। অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকাশিত বৈষ্ণবপদাবলী কবিতাগুলিও তিনি নিবিষ্টচিত্তে পড়েছিলেন। ঐ অল্পবয়সে তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ সুর করে পড়তেন মনের আনন্দে। রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ প্রসঙ্গটি নবীন বয়সে রবীন্দ্রনাথকে কতটা আন্দোলিত করেছিল তা বুঝতে পারা যায় তিনি যখন তেইশ বছর বয়সে লেখেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই কাব্যটি তিনি লিখেছিলেন বিদ্যাপতির আদর্শে ব্রজবুলি ভাষায়। কৃষ্ণকে নিয়ে সেকালে কবিতা লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, অধরলাল সেন এবং একালে কালিদাস রায়, সুধেন্দু মল্লিক, জিয়া হায়দার প্রমুখ।

গত শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে কৃষ্ণ পর্যালোচনা কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল তা আমরা টের পাই কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের কৃষ্ণকেন্দ্রিক রচনা ও বক্তৃতাদি পাঠ করে। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম হলেও তাঁর ছিল এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি। কলুটোলার বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বৈষ্ণবীয় ভাব-ভাবনার সঙ্গে ছোটবেলা থেকে তিনি যুক্ত ছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিমূলক যে-সকল রীতি-নীতি প্রবর্তনে কেশবচন্দ্র উদ্যোগী হয়েছিলেন তার মূলে ছিল একদিকে পারিবারিক ঐতিহ্য অন্যদিকে কৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। কেশবচন্দ্র কৃষ্ণকে নিয়ে ইংরেজীতে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন Sunday Mirror[৭] এবং New Dispensation[৮] পত্রিকায়। এইসব প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণকে জাতীয় বীররূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনবেদ'-এর নানা স্থানে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে কেশবচন্দ্রের কৃষ্ণ-অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষভাবেই। কেশবচন্দ্রের অনুগত শিষ্য গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় কেশবচন্দ্রের নির্দেশে কৃষ্ণচরিত্রকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করেছিলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায়। এই 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় কৃষ্ণ-বিষয়ক নানা নিবন্ধ নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পণ্ডিতদের ভারততত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ, বিদেশে ভাগবতের অনুবাদ প্রকাশ এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গের কৃষ্ণলীলাত্মক পুরাণগুলির প্রতি আগ্রহ এদেশের যুক্তিবাদী মানুষজনের কৃষ্ণচর্চায় গতি আনে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে নাস্তিক ছিলেন। একথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানিয়েছেন: "আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমের।"[৯] বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে নাস্তিক হলেও তাঁর পিতা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁদের বাড়িতে ছিল রাধাবল্লভের বিগ্রহ। উত্তরকালে—"বঙ্কিমচন্দ্র পিতার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পবিত্র ধর্মজীবনের প্রভাবে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁহার পরবর্তী রচনাসকলে সেই ধর্মভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।... দেবী চৌধুরাণীর বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সেই ধর্মজীবনের আভাসে বলিয়াছিলেন—'তাঁহার কাছেই প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি। তিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মব্রত করিয়াছিলেন।'"[১০] উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি গভীরতর হয়েছিল তা বোঝা যায় তাঁর ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কৃষ্ণ-সম্পর্কিত তিনটি গ্রন্থ পাঠ করে এবং

৭ 10, 24 December, 1876, 14 August 1886

৮ 9 June, 22 July, 1881, 23 Sept. 1883

৯ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদিত) নবপত্র প্রকাশন (১৯৮২) পৃঃ ১১১ ১০ ঐ পৃঃ ১৭৬

গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের আদর্শে রচিত তিন উপন্যাস আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের মধ্যে। জীবনের উপান্তে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন বিশেষভাবেই কৃষ্ণপ্রেমী। তাঁর নিরন্তর কৃষ্ণভাবনার উজ্জ্বল নিদর্শন 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটি। অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (১৮৭৪—৭৭) গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং গোবিন্দ দাসের পদ সংকলন করে প্রকাশ করলে একশ্রেণীর নব্যশিক্ষিত মানুষজন তাঁকে 'গোঁড়া', 'পুরাতন-পন্থী' বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং ঐ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সংকলিত গ্রন্থটিকে আক্রমণ করেছিলেন অপবিত্র, অরুচিকর, অশ্লীল বলে অভিহিত করে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কলম হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১২৮১ বঙ্গাব্দের, চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে ঐ আক্রমণের জবাবে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেনঃ "যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীত কখনও এতকাল স্থায়ী হইত না। কারণ, অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ-বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।" বঙ্কিমচন্দ্র প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ আলোচনায়। এই সূত্রেই রচিত হয়েছিল তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র'। কৃষ্ণচরিত্র প্রথম প্রবন্ধাকারে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়, তারপর 'প্রচার' পত্রিকায় (১৮৮৪ খ্রীঃ) ধারাবাহিক ভাবে কুড়ি মাস ধরে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হয়। ছ' বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে প্রথম ভাবনার কাল থেকে এই সময়ের ব্যবধান ছিল আঠারো বছর। সময়ের এই ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচিন্তা, ও কৃষ্ণচর্চা থেমে থাকেনি। নিরন্তর কৃষ্ণকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন বলেই তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেনঃ "কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। ...ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ।" বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচরিত্র শুরু করেছেন এইভাবেঃ "ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি. সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলী, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না, কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী 'জয় রাধে কৃষ্ণ' না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে 'রাধে কৃষ্ণ'! বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে 'রাধে কৃষ্ণ' নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।"[১১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমতে ভারতবর্ষে কৃষ্ণ সম্পর্কে বিবেকানন্দের পূর্বোল্লেখিত উক্তির ('আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন') একটি সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ কৃষ্ণ সম্পর্কে নানা অভিমত নানা সময়ে জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি রাম ও কৃষ্ণের সমন্বিত রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কৃষ্ণ-চিন্তায় দ্যুতি আসবে এতো স্বাভাবিক। ১৯০০ খ্রীঃ ১ ফেব্রুয়ারি, ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনার সেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত 'মহাভারত' সম্পর্কিত বক্তৃতায়, ৩ ফেব্রুয়ারি 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ' বিষয়ক বক্তৃতায় এবং ঐ একই বছরে ১ এপ্রিল স্যানফ্রান্সিস্কোয় প্রদত্ত 'কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা' বক্তৃতায়—কৃষ্ণের স্বরূপটি তিনি তুলে ধরেন। শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত বাণীগুলিকেই বিবেকানন্দ প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাঁর ঐসব বক্তৃতাগুলিতে। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি পাশ্চাত্যবাসীদের নানা কথা শুনিয়েছিলেন। সংসার-জীবন নির্বাহে, নিষ্কাম কর্ম-প্রবাহে শ্রীকৃষ্ণের বাণীর

১১ বঙ্কিম রচনাবলী, পাত্রজ সংস্করণ, (১৯৮৩), পৃঃ ৩৭৫

অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছিলেন : "হিন্দুরা বলে, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান, সকল আত্মার অন্তরাত্মা, সুতরাং যদি আমরা সকল সৎকর্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ, আর ঐ ফল নিশ্চয়ই সমগ্র জগৎ পাইবে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার একটি দিক। তাঁহার অন্য শিক্ষা কি? সংসারের মধ্যে বাস করিয়া যিনি কর্ম করেন, অথচ সমুদয় কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি কখনও বিষয়ে লিপ্ত হন না।... প্রবল কর্মশীলতা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের আর একটি দিক। গীতা বলিতেছেন, দিবারাত্র কর্ম কর, কর্ম কর, কর্ম কর।"[১২] স্বামী বিবেকানন্দ আপন অনুভবে কৃষ্ণকে যেভাবে অনুভব করেছিলেন সেভাবেই তিনি চিত্রিত করেছেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও রাজযোগের সমন্বয় সূত্রটিও শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীতেও শ্রীকৃষ্ণচর্চা চলেছে নানাভাবে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে এই অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জে. এন. ফারকুহার নামে এক পাদ্রী এদেশে ধর্মপ্রচারের জন্যে উপস্থিত হয়ে 'গীতা এণ্ড গসপেল' নামের পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অহেতুক কালিমা লেপন করেছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব এর বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা করেন। ১৯০৪ এর ২৫ জুলাই মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ এন. এন. ঘোষের সভাপতিত্বে 'Personality of Sri Krishna' শিরোনামে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এই সভায় ফারকুহার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মবান্ধবের বক্তৃতা শুনে কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারেননি বরং মুগ্ধ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। ঐ একই বছরের ২ অক্টোবর শোভাবাজার রাজবাড়িতে আয়োজিত সাহিত্য সভায় তিনি 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধটি 'সাহিত্য সংহিতা' (১৩১১, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব' ও 'দোললীলা' নামে কৃষ্ণ-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধ দুটি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'পালপার্বণ' (১৩৩১) গ্রন্থে। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগের ছবিটি যুগগত সঙ্কট মোচনের পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে ধরা পড়েছে : "পুরাতন যুগের অন্তে নূতন যুগের প্রারম্ভে স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম সংস্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই আমাদের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া অনেকে মানেন বটে কিন্তু তিনি যে আমাদের নূতন জীবনের মূল—এ-তথ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ...ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহংবিন্দুগুলিকে কৃষ্ণচরণবিনির্গত জাতীয় জীবন-জাহ্নবীতে নিমজ্জিত করিতে হইবে। হিন্দুর ঐতিহাসিক পারম্পর্য শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে প্রসূত। আইস এই জন্মাষ্টমীর দিনে সেই পারম্পর্য স্বীকার করিয়া সকলে কৃষ্ণপদ-কল্পতরুমূলে অভেদসূত্রে এক হই।"[১৩] বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'Sri Krishna' নামক ইংরেজী গ্রন্থে কৃষ্ণকে 'ভারতাত্মা'-রূপে চিত্রিত করেছেন।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৃষ্ণবিষয়ক আরও যাঁরা প্রবন্ধ-নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীঅরবিন্দ, দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, গিরীন্দ্রশেখর বসু, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, প্রমুখ। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর 'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটি বৃন্দাবনলীলার অনুসরণে রচিত। 'প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ' নামক একটি গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ তিনি যেমন রচনা করেছিলেন তেমনি সম্পাদনা করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', 'শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত' ইত্যাদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ী প্রাচীন গ্রন্থগুলি। বিদ্যাসাগর 'বাসুদেব চরিত' রচনা করেছিলেন; কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'পবিত্র বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থের কলঙ্ক-কালিমা মোচনার্থ' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।

কৃষ্ণকেন্দ্রিক নাট্য রচনাও হয়েছে অনেক। তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন (১৮৫২) নাটকেই

১২ বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড (১৩৬৯) পৃঃ ৩৩১

১৩ পালপার্বণ—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, প্রবর্তক পাবলিশার্স, (১৩৩১), পৃঃ ৪

প্রথম কৃষ্ণের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি। কৃষ্ণ এই নাটকে খানিকটা সরলভাবে চিত্রিত। হরচন্দ্র ঘোষের কৌরববিয়োগ (১৮৫৭) নাটকের অন্যতম চরিত্র হলেন কৃষ্ণ। এই নাটকে কৃষ্ণের ভূমিকা উজ্জ্বল। রামনারায়ণ তর্করত্নের দুটি নাটক রুক্মিণী হরণ (১৮৭১) এবং কংসবধ (১৮৭৫)-এ কৃষ্ণ আপন মহিমায় দেদীপ্যমান। দুর্গাদাস করের স্বর্ণশৃঙ্খল (১৮৬৩) নাটকটি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে রচিত। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণের উপস্থিতি ঘটে যায় এই নাটকে। মনোমোহন বসুর রাসলীলা (১৮৮৯), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাস-মিলন (১৮৮৭) ও নন্দবিদায় নাটকের নায়ক চরিত্র হলেন কৃষ্ণ। গিরিশচন্দ্র একাধিক পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। এর মধ্যে অভিমন্যু বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, প্রভাসযজ্ঞ, জনা, পাণ্ডবগৌরব নাটকে কৃষ্ণ উজ্জ্বল মহিমায় বিচরণ করেছেন। রাজকৃষ্ণ রায় কৃষ্ণকে নিয়ে লিখেছিলেন প্রহ্লাদ চরিত্র, দ্বাদশ গোপাল, জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ইত্যাদি নাটক। অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন ব্রজলীলা নাটক। অতুলকৃষ্ণ মিত্র লিখেছিলেন নন্দবিদায় ও গোপী-গোষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণকে নিয়ে কোন নাটক লেখেননি। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখেছিলেন তিনটি নাটক—বৃন্দাবনবিলাস, রাধাকৃষ্ণ এবং নরনারায়ণ। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক পটভূমিতে লিখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আর মন্মথ রায় পরাধীন ভারতের পটভূমিতে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রচনা করেছিলেন কারাগার নাটক। এদেশে যাত্রার উন্মেষ পর্বটিও ছিল কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। সাম্প্রতিক কালেও যাত্রার সিংহভাগ জুড়ে আছেন কৃষ্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণযাত্রাও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে 'মীরার বঁধুয়া', 'দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ', 'কৃষ্ণার্জুন', 'কৃষ্ণ যুগে যুগে' প্রভৃতি যাত্রাপালা মানুষের চিত্তাকর্ষণ করেছে বিশেষভাবেই। 'জয়দেব', 'মীরাবাঈ', 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রভৃতি বাঙলা চলচ্চিত্রেও কৃষ্ণ অন্যতম প্রধান চরিত্র।

বিমল করের 'কৃষ্ণকথা' গ্রন্থ ও গজেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসের উপজীব্য কৃষ্ণ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারতের কথা'য় কৃষ্ণ সম্পর্কে বিশদভাবে লিখেছেন। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস রচিত হয়েছে দুটি; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রাধাকৃষ্ণ এবং সমরেশ বসুর শাম্ব। এছাড়া বঙ্কিমের নানা উপন্যাসে এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের ৪র্থ পর্বে কৃষ্ণকথা আলোচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন লেখকের আলোচনার কেন্দ্রপুরুষ হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। এঁদের মধ্যে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুধা বসু, গীতা চট্টোপাধ্যায়, অশোক রুদ্র, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, শংকরীপ্রসাদ বসু এবং সত্যবতী গিরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কীর্তন, ভজন ও বাউল গানে কৃষ্ণই প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছেন এখনও। বহু বিখ্যাত শিল্পীর শিল্পকর্মের বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ তাও আমরা জানি। আবার বাংলার টেরাকোটা শিল্পের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে কৃষ্ণজীবনী।

শুধু নাটক, উপন্যাস, কাব্য, সঙ্গীতও শিল্পে নয়, বাঙালী-জীবনে কৃষ্ণের অনুসরণে নামকরণ করার রীতি চালু হয়েছে মধ্যযুগ থেকে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণকমল, কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণচরণ, কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণপ্রসন্ন, কেশবচন্দ্র, নন্দদুলাল, নন্দগোপাল এবং মহিলাদের কৃষ্ণকুমারী, কৃষ্ণভামিনী, কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণপ্রিয়া—এইসব নাম আজও চালু রয়েছে। আর কানু, কানাই, কেষ্ট ডাকনামের ক্ষেত্রে তো হামেশাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃষ্ণপুজো আজও বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম অঙ্গ। এইসঙ্গে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক তীর্থ-স্থানগুলি পরিদর্শনেও বাঙালীরা বিশেষভাবে উন্মুখ। তাই বছরের পর বছর বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, প্রভাস, পুরীতে হাজার হাজার বাঙালী ছুটে যান আপন প্রণতি পোঁছে দিতে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা আমাদের বলতেই হবে তা হল বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবনে কৃষ্ণের মহিমা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গত শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং বাঙালী-জীবন আজও বহুক্ষেত্রে অবিভাজ্য। বাঙ্গালীর দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি পরিবার-জীবন—এক কথায়, বাঙালীর সম্পূর্ণ মানস জুড়েই রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি যে কত সত্য তা আমরা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারি।

ধারাবাহিক রচনা

কৃষ্ণচিন্তায় নব-জাগরণ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য

দিলীপকুমার দত্ত

॥ ১ ॥

"কানু ছাড়া গীত নাই।"—তত্ত্বতঃ বা তথ্যতঃ যাই হোক না কেন, এ-শিরোভূষণ দৈবীচেতনাসর্বস্ব মধ্যযুগের শেষ পাদ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য ছিল। এ-'কানু'র সঙ্গে অবশ্যই অদৃশ্যভাবে একাত্ম হয়ে আছেন 'রাই'—রাইকিশোরী অর্থাৎ শ্রীরাধা। রাই-বিহীন কানু বা কৃষ্ণের অন্য-বিধ অস্তিত্ব গীতা-ভাগবত-মহাভারত পাঠে নিত্য অভ্যস্ত সত্ত্বেও সে-যাবৎ বাঙালী-মানসিকতায় ছিল একান্তই বিরল। আর, সুজলা-সুফলা-কোমলপ্রাণা বাংলার মাটির সঙ্গে প্রাণের যোগ যে বাঙালী কবি-কুলের, তাঁরা একদিকে বঙ্গ-ঋতুরঙ্গের সহস্রদল একটির পর একটি উন্মোচন করে তার অপরূপ লাবণ্যকে যেমন চিরপ্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন তাঁদের কাব্যজগতে, তেমনি অপরদিকে সে-লাবণ্যের সঙ্গে একাকার করে তার অভ্যন্তরে ঢলঢল-রস-প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেলেন যে-দুটি কোমল প্রাণের চিরন্তনী প্রণয়লীলাকে, তারা এই রাই-কানু,—রাধাকৃষ্ণ। বর্ষার মেঘমেদুর অন্ত-র্গভীর প্রাণময়ী, শারদ-বাসন্তীর জ্যোৎস্নাপ্লাবী-পুষ্পিতা প্রফুল্লা, শীত-হেমন্ত-গ্রীষ্মের কুয়াশাব-গুণ্ঠনবতী-শিশিরসিক্তা রৌদ্রোজ্জ্বলা লাবণ্যময়ী প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের মধ্যে নিত্যো-দ্ভাসিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাকথাকে বাঙালী কবিবৃন্দ পরিণত করেছিলেন একান্ত প্রাণের বস্তুতে। অর্থাৎ বাঙালী-মানসে কৃষ্ণ নিত্যকালই গোপিকাকান্ত-রাধাকান্ত-বৃন্দাবনবিহারী-বংশীধারী, রাসলীলা-রসের রাধাপ্রেমরসের রসিক। এ মানসিকতার নিত্য রক্ষণে তাঁদের প্রেরণাও ছিল যথেষ্ট। প্রথমতঃ, রাধাতনু শ্রীচৈতন্যের মহাভাবাত্মক কৃষ্ণপ্রেমাদর্শের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠায় রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক বৈষ্ণব-পদাবলীর সীমাহীন বিস্তার। দ্বিতীয়তঃ বাঙালীর চির-আদৃত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধার গৌরববিস্তারে তাঁর প্রতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্ ॥[১]

—(হে রাধা।) তোমার সাহচর্য-বিহীন অবস্থায় লোকে আমায় (কেবল) কৃষ্ণনামে অভিহিত করেন, কিন্তু তোমার সহচর্য-যুক্ত অবস্থায় তারাই আমাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' নামে (অভিহিত করে) পরম গৌরবান্বিত করেন।

তৃতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' কাব্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রায়ানুরূপ শ্লোক :

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্ব-মোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥[২]

—(শ্রীকৃষ্ণ) যখন রাধাসহ বিরাজ করেন, তখন তিনি মদনমোহন (অর্থাৎ কামদেব মদনকেও মোহিত করেন), অন্যথায় (অর্থাৎ রাধা-বিযুক্ত অবস্থায়) তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর চিত্তকে মোহিত করলেও স্বয়ং মদনের দ্বারা বশীভূত।

চতুর্থতঃ কবিরাজ গোস্বামীর সমগ্র চৈতন্য-চরিতামৃত জুড়ে বিশেষতঃ রাধা-তত্ত্বাত্মক আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের 'জীবাতু' রূপে শ্রীরাধার রূপ-গুণ-প্রেমমহিমার বিস্তার[৩] ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারা ক'টিকে স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে—কৃষ্ণের অজস্রবিধ দৈবী মহিমা সমেত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ধারাটিই ছিল তার মুখ্য অবলম্বন।

১ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ১৫/৬২

২ গোবিন্দলীলামৃত, ৮।৩২

৩ "...জগতের সুখে আমি হেতু,
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥"
চৈতন্যচরিতামৃত (১৯৭১), দেব সাহিত্য কুটীর, পৃঃ ৪১

ঊনবিংশ শতকের অব্যবহিত পূর্বে বা বলা চলে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পশ্চাৎকাল থেকেই সামগ্রিক বাংলার বুকে যে পালা-বদলের পূর্বাভাস সূচিত হচ্ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবল সংঘাত-সংঘর্ষে নানা উত্থান-পতন, ভাঙাগড়ার এক সামগ্রিক আলোড়ন সৃষ্টি করে—যে কালটিকে চিহ্নিত করা চলে যুগসন্ধির অব্যবস্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপর্যস্ত কাল বলে, তারই কিঞ্চিৎ প্রশমনে, কিঞ্চিৎ স্থিতাবস্থায় পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বাহন করে গতিশীল বহির্প্রাচ্যদেশীয় মানবমুখী ভাবধারায় শনৈঃ শনৈঃ উপলব্ধি এদেশের মননশীল শিক্ষিত-সমাজের মানসিকতায় দৈব-নির্ভরতার শৃংখলে অবরুদ্ধ একদেশদর্শী চিন্তাধারার,—মানসিক অন্ধত্বের,—মানবিক-মূল্যহীনতার মোচন ঘটিয়ে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল স্বচ্ছ চিন্তাপ্রবাহের পথ, রামমোহন থেকেই যার প্রাথমিক সূচনা ; আর, পার্থিব কল্যাণ-চিন্তা-চেতনার প্রসার, পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব অর্জন, মানুষের মূল্য-মহিমাকে সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠাদান, প্রতিটি মানুষের অন্তর-নিবদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার-প্রথার বশবর্তী হয়ে নয়—যুক্তি ও মননের আলোকে তাদের গুরুত্ব বিচার, স্থাণুত্ব নয়—গতি-সংকীর্ণতা নয়—উদারতা প্রভৃতিই ছিল যার মৌল-বৈশিষ্ট্য। চিন্তাধারার এই প্রসার ও তার প্রয়োগের কালকেই আমরা বলি নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের কাল। ভাষান্তরে পুনর্জাগরণও বলা চলে কেননা এ-সকল চিন্তা-চেতনায় আমাদের প্রাচীন ভারত মৌন থাকেনি, অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গেই প্রাচীন ভারতের ঋষিরা শুনিয়েছিলেন মানুষ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা—"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু··· ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধু",[৪] (এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু··· এই মানবজাতি সর্বভূতের মধু)। শুনিয়েছিলেন নিত্য গতিশীলতার মন্ত্র—'চরৈবেতি', কিংবা 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'[৫] নিষ্কাম "কর্মপ্রবৃত্তির মন্ত্র—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"[৬] (কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।) শুনিয়েছিলেন মালিন্য-মোচন ও অন্ধকার-মুক্তির প্রার্থনা—"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়"[৭] (অসৎ থেকে আমাকে সৎস্বরূপে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোকে নিয়ে যাও) ইত্যাদি। কিন্তু প্রয়োগক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়নি বিশেষ। পাশ্চাত্য-চিন্তার আশ্রয়ে নবোজ্জীবিত রেনেসাঁস-কালে তাই প্রাচীন ভারতবর্ষেরও ঘটেছে নব মূল্যায়ন। তার মানবকল্যাণমুখীনতার শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহ নবজাগরণ—পথিকৃৎগণের রচনাশ্রয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে বার বার। একালে কৃষ্ণচিন্তার ক্ষেত্রেও এসেছে এই নবজাগরণ, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অস্বীকৃত হয়নি, বরং তাতেও একটা জোয়ার-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে দেশ ও জাতির পূর্ণাঙ্গ গঠন ও কল্যাণ-সাধনে কল্পনায় নয়, — গীতা-ভাগবত-মহাভারত-হরিবংশ প্রভৃতি অবলম্বনে কৃষ্ণের মানবিক মাহাত্ম্য তথা ঐতিহাসিক মানব-মহিমা, নৈতিক-আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব, দেশ ও জাতির ঐক্য গঠনে তাঁর মহৎ ভূমিকা, কুরুক্ষেত্র-ধর্মযুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বদানের চিরকালীন শ্রেষ্ঠ আদর্শের রূপ, নিরন্তর কর্মব্রতী সত্তা, হৃদয়-প্রসারিত মানবপ্রেম প্রভৃতির সংযোজন এবং সেগুলি-কেই মুখ্য জ্ঞান করে মানবাদর্শে পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণচরিত্রকে বিভেদ-পরিপূর্ণ অসহায় দেশ ও জাতির সম্মুখে এক আদর্শ কর্ণধাররূপে, তাদের কল্যাণমার্গের দিশারীরূপে এবং দেশব্যাপী মনুষ্যত্বের আদর্শগঠনে মনুষ্যত্বের চির-অনুকরণীয় আদর্শস্থল হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস সেদিন দেখা গিয়েছিল সমাজ-সাহিত্য-রাষ্ট্রচিন্তনের সর্বক্ষেত্রেই, আর কবি-সাহিত্যিকরাই ছিলেন সে নব-চিন্তাযজ্ঞের পুরোহিত।

॥ ২ ॥

কৃষ্ণচিন্তার এই জাগরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য, যদিও গীতা-মহাভারতাদির চর্চায় রামমোহনের রচনাধারা থেকেই কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ মাঝে মাঝেই উত্থাপিত হয়েছে। কৃষ্ণ-সম্পর্কিত রামমোহনের মনোভাবটি একটু বিশদ করা যাক। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ রামমোহন-পরিবারের কুলদেবতা হলেও প্রতিমা

৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৫।১,
৫ কঠ উপনিষদ্, ১।৩।১৪,
৬ গীতা ২।৪৭
৭ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৩।২৮

পূজার বিরোধী ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসক রামমোহন শুধু যে কৃষ্ণভাবনায় কোনদিন ভাবিত হতে পারেননি তাই নয়, অন্যান্য দেবদেবীর মতোই কৃষ্ণের অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কৃষ্ণের মধ্যে মানব-মহিমার মূল্যও কোনদিন তিনি উপলব্ধি করেননি যদিও উপনিষদ্, বেদান্তসূত্রসহ গীতা-ভাগবত-মহাভারতাদি সম্পর্কে তাঁর সনিষ্ঠ অধ্যয়ন, প্রজ্ঞা ও অধিকার ছিল সেকালের এক পরম বিস্ময়। আসলে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ক্ষেত্রে উপনিষদ্ বিশেষতঃ বেদান্তসূত্রকেই তিনি একমাত্র মান্য করেছেন এবং সে উপাসনা-প্রতিষ্ঠায় ও প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধাচরণে বেদান্তসূত্রের সঙ্গে গীতা-ভাগবতাদি থেকে অনুকূল বক্তব্য আহরণে আপন মতের প্রতিষ্ঠা সম্পাদনের জন্যই তিনি ভাগবতাদির সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধাচরণে "শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিশ অধ্যায়ে কপিল-বাক্য "যো মাং সর্বেষু ভূতেষু..." ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার ও অনুবাদ সহ আপন মতের প্রতিষ্ঠাদান করেছিলেন মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভূমিকায়।[৮] কিম্বা 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' পুস্তিকায় মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'তেত্রিশকোটি দেহবিশিষ্ট দেবতারূপে গণিত পরব্রহ্ম'-বাদের খণ্ডনে বিভিন্ন উপনিষদের সঙ্গে গীতা-ভাগবতের কৃষ্ণকথিত বিভিন্ন বাক্য যুক্তি হিসাবে আহরণ করেছেন,[৯] কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন প্রকার মানব-মূল্যবোধের সম্প্রসারণ তাঁর রচনায় ঘটেনি, এমনকি বেদান্তসূত্রে কৃষ্ণের উল্লেখহীনতা রকারণে "বেদান্ত-সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্কমাত্র নাই" বলে কৃষ্ণজীবনভিত্তিক ভাগবতকে খুব একটা মূল্যও তিনি দিতে চাননি,[১০] শুধু তাই নয়, 'গোস্বামীর সহিত বিচার' পুস্তিকায় গোস্বামীর ভাগবত-প্রতিপাদ্য—"ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্তি হয়েন" উক্তির জবাবে 'ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ' গোস্বামীজীকে সুতীব্র পরিহাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত এবং ভাগবত-বর্ণিত ব্রজলীলাকে 'সর্বলোকবিরুদ্ধ' বলে ভাগবতের কৃষ্ণস্বরূপকে অস্বীকার ও নিন্দাই করতে চেয়েছেন রামমোহন।[১১] অথচ উনিশ শতকেরই শেষার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণজীবনে দেখেছেন "অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা..., চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন;[১২] স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি।"[১৩] এককথায়, রামমোহন-চিন্তায় কৃষ্ণের স্থানটি একান্তই নেতিবাচক।

অপরপক্ষে, রামমোহন-পরবর্তী প্রাক্-বঙ্কিম-যুগ থেকে বঙ্কিম-সমকালীন যুগ পর্যন্ত কাব্য-কবিতা-গদ্য-নাটকাবলম্বনে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা নেহাৎ কম নয়, কিন্তু সে-সকল ক্ষেত্রের ধ্যান-ধারণায় মধ্যযুগীয় কৃষ্ণভাবনারই পুনর্জাগরণ—আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনা-প্রবল ভক্তিরস, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে অবতীর্ণ কৃষ্ণের ঐশী-মাহাত্ম্য জ্ঞাপন, রাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিরহাত্মক প্রেমলীলাকীর্তন প্রভৃতিই যার মূল কথা। গতানুগতিক এ-সকল আদর্শে পূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে আছে কবি জয়রামের উদ্ধব-সংবাদ (১৮৫৫) জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারকাবিলাস (১৮৫৫) দীননাথ ধরের কংসবিনাশ (১৮৬১), বনওয়ারীলাল রায় রচিত দ্বারকাকেলিকৌমুদী (১৮৬৩), হরিলাল গোস্বামীর নরক সংহার (১৮৯৬) প্রভৃতি। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই পদাবলী-আশ্রিত বৈষ্ণবীয় ভাবরসের নব-রূপারোপে কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোবিন্দ অধিকারী, পীতাম্বর অধিকারী, কালাচাঁদ পাল প্রভৃতির কৃষ্ণযাত্রার আশ্রয়ে ভক্তি-রসাপ্লুত সম্প্রসারিত কৃষ্ণজীবনের নানা দেবীলীলা ও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরাগের এক অপূর্ব ভাবোন্মাদনাও এ-সকলের একটা মুখ্য পটভূমিকা রচনা করেছিল যা মধুসূদনকে "রাখালরাজ পীতধড়া গলে" বা "নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে, রাধিকারমণ।...

৮ রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী (১৯৭৩), পৃঃ ১৪৬

৯ ঐ, পৃঃ ১০৮, ১২১—১২২

১০ ঐ, পৃঃ ১৬০

১১ ঐ, পৃঃ ১৬০, ১৬৩

১২ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড (১৩৭১), সাহিত্য সংসদ পৃঃ ৬৬১

১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৩০১

গোকুল-রতন" প্রভৃতি রূপে কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনেই প্রভাবিত করেছিল। নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ কৃষ্ণকথাকে বৈষ্ণবীয় ভক্তি-প্রেমরস অলৌকিক ঐশী-মহিমায় উপস্থাপিত করেছিলেন। সমকালেই ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, জীবনবেদ, মাঘোৎসব, ব্রহ্মোৎসব, আচার্যের উপদেশ, সেবকের নিবেদন ইত্যাদি গ্রন্থ-সমূহের আত্মবিশ্লেষণ উপদেশ বক্তৃতাধর্মী অসংখ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে উনিশ শতকের অন্যতম ব্রহ্মোপাসক কেশবচন্দ্র সেনের মনোধর্মে কৃষ্ণ-ভাবনার প্রবল উদ্দীপন তৎকালীন জনমানসে যে বিরাট মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছিল তাও মুখ্যতঃ ভাগবতের প্রেম-ভক্তি-বিশ্বাসের বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলের পথ ধরেই প্রবাহিত।

চিন্তা ও মানবহিত ভাবনা নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের জাতীয় চিত্ত-জাগরণে অনেকখানি সহায়তা করেছে; কিন্তু কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সে চেতনার সমৃদ্ধি সেখানে বিশেষ চোখে পড়ে না।

॥ ৩ ॥

এই পরিস্থিতিতে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম ভক্তি-বিশ্বাস-আবেগের পথ ছেড়ে বিচার ও মানবিক মূল্য-বোধের প্রয়োগে দেশ ও জাতি গঠনের স্বতন্ত্র পথে কৃষ্ণচরিত্রকে উপস্থাপিত করলেন চিরন্তন আদর্শের পরাকাষ্ঠারূপে—যার প্রথম সূচনা ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা (১৮৭৫ / মার্চ-এপ্রিল) 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে, যেখানে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল কৃষ্ণচরিত্রের আদি মহাভারতে এবং "এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত।··· ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য— ···উচ্চতর মানসিক বলই ইঁহার বল।··· কৌশলে সর্বকর্তা··· তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশমাত্র নাই—গোপবালকের চিহ্নমাত্র নাই।" ইত্যাদি[১৪] অংশটিতে কৃষ্ণের অনন্ত মানব-সত্তারও ব্যঞ্জনা মিলবে 'বিধাতৃতুল্য' শব্দটিতে। কৃষ্ণের এ-সকল আদর্শেরই পরিপূর্ণতা পরবর্তী নিরবচ্ছিন্ন রচনাধারার প্রশ্রয়নে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশে। সত্যে, মনুষ্যত্বে, প্রেমে-নিঃস্বার্থপরতায়, অনুশীলিত দেহ-মন-আত্মার সামগ্রিক মঙ্গলচেতনায় উদ্বুদ্ধ যে পূর্ণাঙ্গ ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন তাঁর ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে, সে-আদর্শেরই পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলনে মনুষ্যত্বে-প্রেমে-করুণায়-বীর্যে-নৈতিকতায় সুমহান মানব-চরিত্রের আদর্শরূপেই তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কৃষ্ণচরিত্রের কৃষ্ণকে। কৃষ্ণসম্বন্ধে লোকমানসে এ-যাবৎ পোষিত ধারণাকে ঊর্ধ্বায়িত করে অলৌকিকতা বর্জিত মানবতার পূর্ণতায় অভিষিক্ত কৃষ্ণকে তিনি উপস্থাপন করলেন স্বদেশ, সমাজ ও স্বধর্মের কেন্দ্রভূমিতে। ধর্মতত্ত্বে যে-আদর্শ কেবল সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত, দেবী চৌধুরাণীকে যার অনুশীলিত দৃষ্টান্তের প্রতিষ্ঠা, পার্থিবলোকে ঐতিহাসিক মানবদেহবিশিষ্ট করে সে-তত্ত্বেরই পূর্ণ বিকশিত স্বরূপের প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণচরিত্রে। গ্রন্থের সূচনাংশেই বঙ্কিম তাঁর উদ্দেশ্য প্রাঞ্জল করেছিলেন—"এই গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানব-চরিত্রেরই সমালোচনা করিব।"[১৫] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একটি পত্রেও (২৫ আশ্বিন ১২৯২) ব্যক্ত করেছিলেন সেই একই অভিমত: "কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১৬]

ধর্মতত্ত্বে শারীরিকী-জ্ঞানার্জনী কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্বিধ বৃত্তির অনুশীলনের মাধ্যমে যথার্থ বিকাশ ও চরিতার্থতায় পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের আদর্শকে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম জ্ঞান করেছিলেন গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে এবং একমাত্র হিন্দুধর্মে যার পরিপূর্ণতার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর কৃষ্ণচরিত্র সে-আদর্শেরই একান্ত মানবিক দৃষ্টান্ত। তাই কৃষ্ণের মধ্যে তাঁর ঐশীসত্তাকে তিনি কখনই প্রাধান্য দেননি, এ-সম্বন্ধে তাঁর প্রাঞ্জল বক্তব্য ছিল মানুষের কোন অলৌকিক শক্তি নেই এবং সেই শক্তিদ্বারা কার্যসাধনকারী ব্যক্তি মনুষ্যপদবাচ্যও হতে পারে না।[১৭] এমনকি কৃষ্ণকে তিনি দৈববলে আস্থাবান-মানুষরূপেও দেখেননি যেকারণে কৃষ্ণের জন্ম থেকে লোকপ্রচলিত ধারণায় অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশগুলিকে অমূলানুগ, প্রক্ষিপ্ত কিংবা রূপক

১৪ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০-৪

১৫ ঐ, পৃঃ ৪০৭

১৬ ঐ, পৃঃ ৯২৩

১৭ ঐ, পৃঃ ৫০৭

হিসাবে গ্রহণ করে সমগ্র কৃষ্ণজীবনকে ঐতিহাসিক রসচেতনায় পরিমার্জিত করে নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত,—শিশুপাল বধকালে চক্রাস্ত্রকে স্মরণ করা মাত্র কৃষ্ণহস্তে তার আগমন ও তদ্দ্বারা শিশুপালের মস্তক-কর্তনের অনৈসর্গিক কাহিনীকে না মেনে মূল-মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বের দ্বাদশ অধ্যায় থেকে ধৃতরাষ্ট্র-কথিত শিশুপাল-বধের ইতিহাস বর্ণনা করে বঙ্কিম বলেছেন যে, কৃষ্ণ রথারূঢ় হয়ে সম্পূর্ণ মানুষিক সংগ্রামেই শিশুপাল ও তার অনুচরবর্গকে পরাভূত করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য—"যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুইপ্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই—একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণে রাখেন।"[১৮]

দেশবাসীর সামনে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের আদর্শরাজির প্রতিফলনে একটি পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যচরিত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাদের চরিত্রে সেই বিশুদ্ধ গুণাবলী প্রতিফলনের একান্ত সচেতন বাসনা নিয়েই যাকে চেষ্টা করেও অস্বীকার করা যায় না। ধর্মতত্ত্বে তিনি লিখেছিলেনঃ "ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না।...কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা।...তাঁহার সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে।...তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে এক স্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।... মোক্ষ আর কিছুই নহে, ঐশ্বরিক-আদর্শনীতি ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা হইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।"[১৯]

মহাভারতাদির মাধ্যমে বিবর্তিত সগুণ সাকার ব্যক্তিক ঈশ্বরের স্বভাববিশিষ্ট মানুষ কৃষ্ণই পরিপূর্ণ মানব, শ্রেষ্ঠ বিশ্বমানবরূপে গৃহীত বঙ্কিমদৃষ্টিতে, যিনি কেবল সর্বগুণাধার পাপশূন্য আদর্শচরিত্রই নন, সর্বলোকের হিতব্রতে রত, শারীরিক ও মানসিক শক্তিবলে সমস্ত নীচতা স্বার্থপরতা দূরীকরণে বিশুদ্ধ ধর্মের অনুধ্যান ও সম্প্রসারণে মানুষী আদর্শের পরম পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণের মধ্যেই বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেই সম্পূর্ণ মানবসত্তাকে যা তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়, বিভিন্ন পুরাণ, মহাভারত, গীতা, কাব্য, দর্শন ধর্মসাহিত্যকে আশ্রয় করে যা পূর্বাবধিই ছিল। কিন্তু লোক-প্রচলিত ধারণায় তাদের যথাযথ প্রতিফলন ও বিবর্তন ঘটেনি। প্রচলিত সে-ধারণায় কৃষ্ণ কেবল বৃন্দাবনবিহারী রাসবিলাসী রাধা-পার্শ্বচর বংশীধারী প্রেমের ঠাকুর, কিংবা বাৎসল্য-রসাঙ্গনে দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-সর-নবনীতলোভী বালগোপাল। হিন্দুর ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণ ও বালগোপাল—এই দুই মূর্তিতেই কৃষ্ণ এ-যাবৎ পূজিত। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে কৃষ্ণের এ-সকল মূর্তি একান্তই খণ্ডিত, যে-কারণে বৃন্দাবনলীলার মধ্যে তিনি ঐতিহাসিকতা-বিরল-অতি-প্রাকৃত উপন্যাসোচিত পুরাণ-কথারই সমাবেশ দেখেছেন।[২০] বৃন্দাবন-লীলা সম্পর্কে বঙ্কিমের দৃষ্টি সমর্থনযোগ্য না হলেও তাঁর উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রে একদেশ-দর্শিতার অভিযোগ অস্বীকার্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের যে-আদর্শ-মূর্তিকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তা কেবল প্রেমরসাঞ্জিত বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণে নেই। ধর্মতত্ত্বে গুরুর কণ্ঠে কৃষ্ণ-সম্পর্কে এই অসম্পূর্ণ ধারণার জন্য দেশবাসীকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন কৃষ্ণের মধ্যে কয়েক সহস্রাব্দের বিবর্তন-সঞ্জাত শারীরিক বৃত্তিসকলের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে অননুভবনীয় সৌন্দর্য ও অপরিমেয় বল, মানসিক বৃত্তিরাজির উদ্বোধনে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য ও জ্ঞান এবং প্রীতিবৃত্তির সম্যক্ পরিণতিতে সর্বলোকের সর্বহিতে রত পূর্ণ রূপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন বুদ্ধ বা খ্রীষ্টে

১৮ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬
১৯ ঐ, পৃঃ ৫৯০
২০ ঐ, পৃঃ ৪৭৬

এই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা নেই, কেননা তাঁরা কেবল 'উদাসীন কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা'। এঁদের ঊর্ধ্বে ধর্ম পরিবর্ধক আদর্শের বিবর্তনে তিনি দেখেছেন "জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠির-অর্জুন-লক্ষ্মণ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরো সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত আদর্শ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ-সকলেরও বিবর্তিত শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: "কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়,—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম-শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই।" সে-চরিত্রই কৃষ্ণ "যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়।"[২১]

ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের স্বর্গ বৈকুণ্ঠ বা অন্তরীক্ষে নয়, মর্ত্যজগতেই, যা 'বিবিধ প্রবন্ধে' গৌরদাস বাবাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এই ভাষায়: "যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরের ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, ...তুমি তখন বৈকুণ্ঠে।"[২২] তেমনি তাঁর বৈকুণ্ঠেশ্বর কৃষ্ণও অন্তরীক্ষবাসী কায়াহীন নন, তিনি মর্ত্য-গোলোকেরই অধিবাসী কায়াযুক্ত মানুষ। এ তাঁর কল্পনা নয়, লুপ্ত অথচ পূর্বাবধি ব্যাখ্যাত পূর্ণাঙ্গ সত্যকেই তিনি কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শে পুনরুদ্ধার করেছেন মাত্র। কিন্তু সাধারণ্যে তা অপ্রচলিত থাকার কারণেই সেই প্রকৃত সত্য গ্রহণে দেশবাসী সংশয়ে দ্বিধান্বিত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দ্বিধা-সংশয়ের পূর্ণ অপসারণ ঘটিয়ে কৃষ্ণকে মানবের ভূমাচেতনা-সমন্বিত জাগতিক জীবনের কল্যাণ ও সত্যোদ্বোধনের একাগ্র লক্ষ্যে পরমাশ্রয়রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন আর সে-কারণেই কৃষ্ণের অখণ্ড সত্তার অনাদর হেতু জাতির প্রতি তাঁর সুতীব্র ভর্ৎসনা:

> "কৃষ্ণের আত্মীয়গণ··· জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব-দোষরহিত, সর্বলোকোত্তম, সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ,—আমরা জানি তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্মের চরমাদর্শ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, তাঁহাকে যে-জাতি এ-পদে অবনত করিয়াছে, সে-জাতির মধ্যে যে ধর্ম লোপ হইবে, বিচিত্র কি?"[২৩]
>
> "জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ-পুরুষকে জাতীয়-হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।"[২৪]

কিংবা আরও স্পষ্ট ভাষায়: "আমরা যদি ভক্তিসহকারে এই কৃষ্ণোক্ত হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। ...আমরা ·· তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্মগ্রহণ করিব। তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।"[২৫] এ-প্রসঙ্গেই পাদটীকায় একটি আশান্বিত আবেদনবাহী প্রশ্ন: "বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল, কৃষ্ণের কথা ভারত-বাসী শুনিবে না?" এখানেই বঙ্কিমের কালোত্তীর্ণ কৃষ্ণচিন্তায় নবজাগরণচেতনার পূর্ণ উজ্জীবন। আমাদের জাতীয় জীবনে আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও পুরুষকারের যে একান্ত অভাব, আধ্যাত্মিকতা সহ রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নানা ঘূর্ণাবর্ত-ব্যভিচার-সংকীর্ণতা-বিপর্যয় কলুষতা, কৃষ্ণচরিত্রানুসরণে সমকাল থেকে অনাগত ভাবীকালের জাতীয়-চরিত্র ও পরিমণ্ডলে সেই অভাবের মোচন ও বিপর্যয়-মুক্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম। তাই কৃষ্ণকে দৈবশক্তিতে বলীয়ান বা তার প্রতি আস্থাবান না করে তার পরিবর্তে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে কৃষ্ণকণ্ঠে দৈবানুষ্ঠানে আপনার অক্ষমতা ও পুরুষকারের প্রতি যে একান্ত নিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছিল। —"অহং হি তৎ করিষ্যামি

২১ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯৪
২২ ঐ, পৃঃ ২৬০
২৩ ঐ, পৃঃ ৫০৯
২৪ ঐ, পৃঃ ৫১৭
২৫ ঐ, পৃঃ ৫০৭

পরং পুরুষকারতঃ” ইত্যাদি শ্লোকে, একান্ত যত্নে সেগুলিকেই উদ্ধার করে পুরুষকার ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যাদর্শই কৃষ্ণচরিত্রে তিনি প্রতিফলিত করে দিয়েছিলেন।[২৬]

কৃষ্ণের কংসবধ ঘটনায় বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন প্রথম প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ এবং সেই আপাত-নৃশংস কার্যের মধ্যেও দেখেছিলেন কৃষ্ণের বিশ্বহিত-ব্রতী সত্তারই পরিস্ফুটন যা মহাভারতের জরাসন্ধ শিশুপালাদি নিধন কার্যেও দেখেছেন। এ-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ধর্ম ও ন্যায়বোধ প্রসূত একটি উক্তি স্মরণীয়ঃ “অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।”[২৭] কৃষ্ণের মধ্যে সে-বোধ প্রথমাবধিই সাঙ্গীকৃত ছিল। কংসবধ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে-ছিলেনঃ কংসবধেই দেখি যে কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ-মানুষ।”[২৮] তাই বলে যুদ্ধবাসনা মানুষের আদর্শ নয়, তাই কৃষ্ণ সর্ব গুণ ও শৌর্যান্বিত হয়েও স্বেচ্ছায় কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত নন। যেখানে যুদ্ধ-ব্যতীত অন্য পথাবলম্বনে বিরোধের শান্তি সম্ভব, সেখানে সেই পথই অবলম্বন করেছেন, কিন্তু ধর্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তিকে অধর্ম ক্লীবত্ব জ্ঞানে ঘৃণা করেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সারকথা হিসাবে এসকল আদর্শ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা এক পত্রেও ব্যক্ত করেছিলেন বঙ্কিম।[২৯] দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণের আচরণে সে-আদর্শের প্রতি-ফলন বঙ্কিম-বর্ণিত বহু দৃষ্টান্তের একটি। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের জয়লাভে তাঁর সঙ্গে ধর্মবিস্মৃত নৃপতিগণের যুদ্ধ-বিবাদের উপক্রমকালে ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ প্রবৃত্তিজনিত সে-যুদ্ধ থেকে নৃপতিগণকে নিবৃত্ত করেছিলেন। কৃষ্ণ দুর্বল হলে সে-নিবৃত্তি সম্ভব হত না, তাই এ ঘটনাকে কৃষ্ণের সার্বিক বৃত্তি অনুশীলনেরই ফল বলে বর্ণনা করে বঙ্কিম সেরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্মতত্ত্বেরই পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটন দেখেছিলেন।[৩০] বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণের এই পূর্ণতা আরও উজ্জ্বল, কেননা তাঁরা শুধুই ধর্মপ্রচারক; নীতিজ্ঞতা ও রাজকার্যের উপযুক্ততা তথা রাজ্যশাসন-পরিচালন-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাঁদের ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণে সে-সকলই পরিপূর্ণ অনুশীলিত ও পরিস্ফুট, তাই কৃষ্ণই বঙ্কিম-দৃষ্টিতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ, বুদ্ধ বা খ্রীষ্টে সে-আদর্শ অসম্পূর্ণ।[৩১]

এইভাবে গীতা-মহাভারতের সমস্ত অন্তর্গভীর ও পরিব্যাপ্ত আদর্শধারাই বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের মহাসমুদ্রে মিশে তাকে সুসমঞ্জস পরিণতি দিয়েছে যা ‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রণয়নে বঙ্কিমেরও ছিল গূঢ় অভিপ্রায়। এক কথায় বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শে ভারতের চিরায়ত আত্মিক মর্যাদার, স্বধর্ম নিষ্ঠার, চারিত্র্য-মর্যাদার উজ্জ্বলতম রূপায়ণ। সুদীর্ঘ তিন সহস্রাধিক বৎসরের বিবর্তনে গড়ে ওঠা ভারতাত্মার যে মর্মসত্তাটির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ ফ্রেডারিখ ম্যাক্সমুলার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা ও প্রেম উজাড় করে দিয়ে দেখেছিলেন, মানবমনের চিরকালীন শ্রেষ্ঠ বিকাশ—জীবনের চরম জটিল সমস্যারও সমাধানে গভীরতর ধ্যানচিন্তা সমন্বিত অন্তর্গভীর শ্রেষ্ঠ জীবনবোধের পরিপূর্ণ রূপায়ণ একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত বিশ্বের আর কোথাও ঘটেনি,[৩২] নব যুগের প্রাণরসবাহী কৃষ্ণচরিত্রের প্রণয়নে তাঁর সিংহনাদী বল-বীর্য-পৌরুষের সঙ্গে ভারতের আন্ত-ভূর্মির পরিপূর্ণ আলোক-ঝর্ণার দ্বারও উন্মোচন করে বঙ্কিম দেশবাসীকে অবগাহন করাতে চেয়েছেন সে-ধারায়।

[ক্রমশঃ]

২৬ বঙ্কিম রচনাবলী, পৃঃ ৫৩৭ (পাদটীকা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য)

২৭ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৬

২৮ ঐ, পৃঃ ৪৭৮

২৯ ঐ, পৃঃ ৯২০

৩০ ঐ, পৃঃ ৪৯৫

৩১ ঐ, পৃঃ ৫১৬—১৭

৩২ India, What Can It Teach Us (1961) p. 6 (2nd Indian edn. Delhi.)

কিমকুর্বত সঞ্জয়

রবীন্দ্রনাথ জানা

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে সঞ্জয়কে উদ্দেশ করে ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি ঃ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥

—হে সঞ্জয়, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে কি করেছিল? মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বরে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। মহাভারতের মহাসমর দেখার জন্য জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মহর্ষি ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বজননিধন নিজচক্ষে দর্শন করতে হবে বলে তিনি মহর্ষির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু আবার যুদ্ধের বার্তা পেতেও প্রাণ চায়। তাই তিনি উক্ত দিব্যদৃষ্টি সঞ্জয়কে দান করার জন্য মহর্ষিকে অনুরোধ করেন। মহর্ষি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই জন্য হস্তিনার রাজপ্রাসাদে বসে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দর্শন করে, যুদ্ধের বার্তা ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছিলেন।

...তে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্ন জ্ঞানহীনের ন্যায়। কেননা, যুদ্ধার্থিগণ যুদ্ধের নিমিত্ত সমবেত; তাঁরা যুদ্ধই করবেন, সেক্ষেত্রে 'তারা কি করল'?—এই জিজ্ঞাসা অর্বাচীনের ন্যায় নয় কি? কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অন্য অভিপ্রায়ে এই প্রশ্ন করেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্ন জ্ঞানহীনের ন্যায়। কেননা, যুদ্ধার্থিগণ যুদ্ধের নিমিত্ত সমবেত; তাঁরা যুদ্ধই করবেন, সেক্ষেত্রে 'তারা কি করল'?—এই জিজ্ঞাসা অর্বাচীনের ন্যায় নয় কি?

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অন্য অভিপ্রায়ে এই প্রশ্ন করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যখন জানলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি নিজ পুত্রদের যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছেন। যুদ্ধ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রে। কিরূপ কুরুক্ষেত্র? তার বিশেষণ ধর্মক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র তীর্থবিশেষ। কারণ দেবতাদের যজ্ঞভূমি; সব প্রাণীর ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভবক্ষেত্র। জাবাল উপনিষদে (১।২) পাওয়া যায় ঃ "যদনু-কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্"। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে ঃ "তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমানস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্"।

সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম। পিতা সংবরণ। কুরু এই ভূভাগের অধিপতি ছিলেন বলে তার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতের শল্যপর্বে দেখা যায়, কুরু এই স্থান কর্ষণ করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম 'কুরুক্ষেত্র'। কুরুকে সর্বদা কর্ষণ করতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ কর্ষণের কারণ জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে কুরু দেবরাজ ইন্দ্রকে বলে-ছিলেন ঃ যে-সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করবে, তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। দেবরাজ উপহাস করে চলে গেলেন। কুরু দেবরাজের উপহাসে নিরাশ হলেন না, তিনি কর্ষণকার্য হতে নিরস্ত না হয়ে কর্ষণ করে যেতে লাগলেন। অবশেষে দেবরাজ দেবতাগণের পরামর্শে কুরুকে জানালেন ঃ "রাজর্ষি! যাঁরা এই স্থানে আলস্যশূন্য হয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করবে; অথবা যুদ্ধে নিহত হবে তারা অবশ্যই স্বর্গে গমন করবে।"

মহাভারতের বনপর্বে মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে বলেছেন সর্বপ্রাণী এই তীর্থ দর্শনে পাপমুক্ত হবে। কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণাও দুষ্কৃতকারীকে পরমপদ প্রদান করবে। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী —এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্তী স্থান কুরুক্ষেত্র। মনুসংহিতা অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রই 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে প্রসিদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের আর একটি নাম 'সমন্ত-পঞ্চক'।

এহেন কুরুক্ষেত্রে আজ যুদ্ধার্থীরা সমবেত। এই কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত। স্থান-মাহাত্ম্য কি উভয় পক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না? স্থানমাহাত্ম্যে মানুষের সত্ত্বগুণের উদয়

হয়, এবং এই গুণের প্রভাবে মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত হয়; অতীতের অন্যায় কর্মের জন্য অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন করে। স্থানমাহাত্ম্যের ফলে ধর্মশীল পান্ডবগণ পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, ও আত্মীয়-স্বজন নিধন হতে বিরত হতে পারে এবং রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগ করে ভিক্ষুধর্মে বনবাসী হওয়া শ্রেয় মনে করতো পারে। অথবা পাপাত্মা দুর্যোধনাদি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্যে সত্ত্বগুণের সঞ্চারে ধর্মপ্রবণ ও উদার হয়ে পান্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে পারে। কিন্তু স্থানমাহাত্ম্যের ফলে উদারতার বশবর্তী হয়ে দুর্যোধন পান্ডবদের

কুরুক্ষেত্রে আজ যুদ্ধার্থীরা সমবেত। এই কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত। স্থানমাহাত্ম্য কি উভয় পক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না? স্থানমাহাত্ম্যে মানুষের সত্ত্বগুণের উদয় হয়, এবং এই গুণের প্রভাবে মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত হয়; অতীতের অন্যায় কর্মের জন্য অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন করে। ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা যদি পুত্র দুর্যোধন ক্ষেত্র-প্রভাবে রাজ্য প্রত্যর্পণ করে।

রাজ্য প্রত্যাবর্তন করুক ধৃতরাষ্ট্র মনেপ্রাণে তা চাননি। তাঁর পুত্রেরা রাজ্যের অধিকারী হোক, তা-ই তাঁর অন্তরের ইচ্ছা। দুর্যোধন যদি পান্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করে, তবে বিনা যুদ্ধেই তারা বিনষ্ট হল। কেননা রাজ্যহারা হয়ে বেঁচে থাকা বিনষ্টেরই সমান। সুতরাং নিজপুত্রগণের রাজ্যলাভ এবং পান্ডবগণের রাজ্য-অপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন নিশ্চিত ধারণা করতে না পেরে ধৃতরাষ্ট্রের মনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। সেজন্য তিনি নিজের পুত্রগণ ও পান্ডুর পুত্রগণকে যুদ্ধার্থী জেনেও সঞ্জয়কে প্রশ্ন করেছিলেন 'কিমকুর্বত সঞ্জয়'।

এই উক্তির পরবর্তী অধ্যায় পর্যালোচনা করলে ধৃতরাষ্ট্রের মনের প্রথম আশাটিই বাস্তব সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছিল বলে মনে হয়। রাজ্যলিপ্সু দুর্যোধনের উপর ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাব বিন্দুমাত্র পড়েনি। মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে, দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধনের জন্ম কলির অংশে। কলি অর্থাৎ কলহ। কলহপরায়ণ দুর্যোধন আজীবন পান্ডবদের সঙ্গে কলহ করে গিয়েছেন। পান্ডবদের রাজ্য তিনি প্রত্যর্পণ করেননি। এমনকি পাঁচখানি গ্রাম দানের আবেদনও প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন—"তিলার্ধং যবষড়্‌ভাগং সূচ্যগ্রে বিদ্যতে মহী, বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদামাহম্।" 'আমি সত্য সত্য করে বলছি তিলার্ধ ও যবষড়্‌ভাগ কিংবা সূচীর অগ্রভাগে যতখানি ভূমি উঠে তাহাও বিনাযুদ্ধে প্রদান করব না।' পাপাশয় ক্রূরমতি পরস্বলোলুপ দুর্যোধনের হৃদয়ে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়নি।

সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক ও উদারচরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গোপন আশঙ্কা মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিলেন।

সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক ও উদারচরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গোপন আশঙ্কা মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে (২—১১) দুর্যোধনের কার্য ও বাক্যের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা দূর করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা যদি পুত্র দুর্যোধন ক্ষেত্র-প্রভাবে রাজ্য প্রত্যর্পণ করে। না, তা হবার নয়। সঞ্জয় জানালেন যে পান্ডবদের ব্যূহরচনা দর্শনে দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের নিকট গমন করলেন।

দুর্যোধন রাজনীতি ও কূটনীতি বিশারদ ছিলেন। নিজে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিকারী এবং বহুরথী, মহারথী ও অতিরথী তাঁর পক্ষে থাকলেও পান্ডবদের ব্যূহরচনা দর্শনে ভীত হয়ে তিনি গুরু দ্রোণের সন্নিধানে গিয়েছিলেন। "পান্ডবসৈন্য-প্রভাবদর্শনহেতুকং তস্যান্তর্ভয়ং গুরুগৌরবেন তদর্শিতকং স্বয়মাগতবানস্মীতি ভয়সঙ্গোপনঞ্চ ব্যজ্যতে" (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত গীতাভূষণ ভাষ্য)।

গুরু দ্রোণের প্রতি দুর্যোধনের উক্তির মধ্যে রাজনীতি বা কূটনীতি নিহিত রয়েছে। গুরু

দ্রোণের হৃদয় পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহে পরিপূর্ণ। পাছে স্নেহবশতঃ তিনি এই যুদ্ধ থেকে বিরত হন, এরূপ আশঙ্কা করে দুর্যোধন দ্রোণকে 'আচার্য' সম্বোধনে সম্মান দিয়েছেন, এবং পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশে বলেছেন যে, পাণ্ডবগণ তাঁর শত্রু দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা ব্যূহ রচনা করেছেন। আবার ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মও দ্রোণাচার্যের বধনিমিত্ত যজ্ঞাগ্নি হতে। দুর্যোধনের মনের ইচ্ছা, 'এই পাণ্ডবগণ আপনার প্রিয়, দেখুন, তারা আপনার বিরুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দিয়ে ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের সজ্জা করেছে। পাণ্ডবগণের ধৃষ্টতা দেখুন। আপনাকে গুরুজন বলে ভ্রূক্ষেপ না করে, আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এরূপ অবস্থায় পাণ্ডবদের প্রতি আপনার স্নেহ পরিত্যাগ করা বিধেয়।' মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের মনের আশংকা হৃদয়ঙ্গম করে এরূপ উত্তর দিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চাইলেন, 'আপনার মনে দুর্যোধনের পঞ্চপাণ্ডবকে রাজ্য প্রদানের আশংকা অমূলক'।

দ্রোণের নিকট দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যের পরিচয় দিয়ে কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদলের পরাক্রম ও পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যও রয়েছে। দ্রোণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, দ্রোণ যদি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহাতিশয্যে যুদ্ধ ত্যাগ করেন, তবু দুর্যোধনের চিন্তার কোন কারণ নাই। কারণ, তাঁর পক্ষে বহু রথী-মহারথী রয়েছেন। অবশ্য 'ভবান্' বলে দুর্যোধন দ্রোণকেও তাঁদের মধ্যে ধরেছেন। এই সমস্ত রথী-মহারথী নিয়ে পিতামহ ভীষ্ম যে যুদ্ধজয় করবেন, সে-সম্বন্ধে দুর্যোধন নিশ্চিত। ভীষ্মকে সব দিক থেকে রক্ষা করতে হবে। দুর্যোধনের আদেশ। এই আদেশের উদ্দেশ্য হল, যদি দ্রোণ ভীত হয়ে বা স্নেহবশতঃ যুদ্ধ না করেন তথাপি সেনাপতি ভীষ্ম নিরাপদে থাকলেই তাঁর বিজয় সিদ্ধ হবে।

দেখতে দেখতে ভীষ্ম শংখধ্বনি করে যুদ্ধারম্ভের সংকেত দিলেন। রণবাদ্যসমূহ বাদিত হতে লাগল। অন্যদিকে শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত মহারথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ-ধনঞ্জয় যথাক্রমে পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত মহাশঙ্খ ধ্বনি করলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথীদের শঙ্খ নিনাদিত হল। অর্জুন স্বীয় সখা-সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয়দলের মধ্যে রথস্থাপন করতে বললেন। এই রথস্থাপনের উদ্দেশ্য দুর্যোধনের প্রিয়কামী যুদ্ধোৎসুক বীরগণকে অবলোকন করা। পার্থ-সখা সখার ইচ্ছানুযায়ী উভয় সৈন্যদলের মধ্যে রথস্থাপন করলেন। কিন্তু, একি? অর্জুন কি দেখছেন?

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥

—তখন অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ শ্বশুরগণ ও সুহৃদ্‌গণকে দেখলেন। এই দেখার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের উক্তি:

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥

—কুন্তীতনয় অর্জুন সমুপস্থিত বন্ধু-বান্ধব সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষণ্ণ হয়ে বললেন:

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥

—অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধেচ্ছু এই সকল স্বজনদিগকে সম্মুখে অবস্থিত দেখে আমার শরীর অবসন্ন এবং মুখ শুষ্ক হচ্ছে। তিনি বললেন, 'স্বজননিধন শ্রেয়স্কর দেখছি না।' "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।" আমি বিজয় এবং রাজ্যসুখ আকাঙ্ক্ষা করি না। অতঃপর অর্জুন বিলাপ করতে লাগলেন এবং পরিশেষে—"বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।"—ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকমগ্ন হয়ে বসে রইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মনের গভীরে কি এই পরিণতির আশা নিহিত ছিল? তাই কি তাঁর উৎসুক প্রশ্ন: 'কিমকুর্বত সঞ্জয়'?

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মহাভারত

প্রণবেশ চক্রবর্তী

মানবসভ্যতায় ভারতবর্ষের সুমহান অবদান মহাভারত নামক মহাগ্রন্থ এবং বিশাল ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির বাঙ্ময় বিগ্রহও এই মহাভারত। মহর্ষি বেদব্যাসের এই মহান সৃষ্টি অনন্তকালের সম্পদ। কাহিনী আছেঃ এই গ্রন্থের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব পরিমাপ করার জন্য দেবতারা একসময় সম্মিলিত হন। তুলাদণ্ডের একদিকে মহাভারত, এবং অন্যদিকে চতুর্বেদ স্থাপন করার পর দেখা গেল মহাভারতের ভারই বেশি। সেই গুরুত্ব ও মহত্ত্বের জন্য এই গ্রন্থ 'মহাভারত' নামে পরিচিত হল। ইউরোপের মহাকাব্য ইলিয়ড এবং ওডিসির একত্রিত আয়তনের আটগুণ বড় হচ্ছে মহাভারতের পরিসর।

মানবসভ্যতায় ভারতবর্ষের সুমহান অবদান মহাভারত নামক মহাগ্রন্থ এবং বিশাল ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির বাঙ্ময় বিগ্রহও এই মহাভারত। মহর্ষি বেদব্যাসের এই মহান সৃষ্টি অনন্তকালের সম্পদ। কাহিনী আছেঃ এই গ্রন্থের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব পরিমাপ করার জন্য দেবতারা একসময় সম্মিলিত হন। তুলাদণ্ডের একদিকে মহাভারত, এবং অন্যদিকে চতুর্বেদ স্থাপন করার পর দেখা গেল মহাভারতের ভারই বেশি। সেই গুরুত্ব ও মহত্ত্বের জন্য এই গ্রন্থ 'মহাভারত' নামে পরিচিত হল।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জীবনাদর্শের মহত্তম মর্মবাণীই মহাভারতের প্রাণবন্ত ও শাশ্বত উপদেশ। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিপুল কর্মসংঘাতের অন্তরালে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অবিচল স্থিতিই হল এই মহাগ্রন্থের বাঞ্ছিত পরিণতি। আবার ভারতীয় সমাজব্যবস্থা, ধর্মজীবন এবং নিষ্কাম কর্মসাধনার বাণীরূপও এই মহাগ্রন্থ।

এই মহাকাব্য আমাদের হাজার হাজার বছরের সুমহান ঐতিহ্য এবং প্রাণবন্ত অস্তিত্বের সাক্ষী। তাই ভারতাত্মার সার্থকতম প্রতিনিধি, যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনাকে ভারতের জীবন-সাধনায় পরিণত করেছিলেন, যিনি ক্ষাত্রবীর্য এবং আত্ম-বিশ্বাসের বিজয়-পতাকা হাতে নিয়ে এই মৃতপ্রায় ভারতের বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাভারতের কথা স্মরণ করেছেন।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসাডেনার 'সেক্সপীয়র ক্লাবে' মহাভারত শীর্ষক যে বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন, সেটা প্রকৃতপক্ষে বিদেশীদের কাছে মহাভারতের বাণী তুলে ধরার সার্থকতম প্রথম উদ্যোগ।

তিনি বলছেনঃ ধর্মভীরু অথচ দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনে একদিকে ধর্ম ও ন্যায়, অন্য দিকে পুত্র-বাৎসল্যের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পিতামহ ভীষ্মের মহৎ চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের মহান ধর্মভাব, অন্য চারজন পাণ্ডবের উন্নত চরিত্র, যাতে একদিকে মহাশৌর্যবীর্য অন্যদিকে সর্বাবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অপূর্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ; মানবীয় অনুভূতির পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র; এবং তপস্বিনী রাজ্ঞী গান্ধারী, পাণ্ডবগণের স্নেহময়ী জননী কুন্তী, সদা ভক্তিপরায়ণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীদের চরিত্র যা পুরুষগণের চরিত্রের তুলনায় কোন অংশে কম উজ্জ্বল নয়,—এই কাব্যের এই সব এবং অন্যান্য শত শত চরিত্র এবং রামায়ণের চরিত্রসমূহ বিগত সহস্র বৎসর ধরে সমগ্র হিন্দুজগতের সযত্নে রক্ষিত জাতীয় সম্পত্তি, এবং তাঁদের ভাবধারা ও চরিত্রনীতির ভিত্তিরূপে বর্তমান রয়েছে। বাস্তবিক এই রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যগণের জীবন-চরিত ও জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। এতে সভ্যতার যে আদর্শ চিত্রিত হয়েছে। তা লাভ করবার জন্য

সমগ্র মানবজাতিকে এখনও বহুকাল ধরে চেষ্টা করতে হবে।[১]

এখানে আমরা স্বামীজীর আরেকটি উক্তিকেও স্মরণ করতে পারি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন আমেরিকায় ক্রমাগত বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে-সময় নিউইয়র্ক থেকে কিছু দূরে সহস্রদ্বীপোদ্যানে বা 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক' নামক স্থানে কিছুদিন নির্জন বাস করেন। সে-সময়েই তিনি একদিন বলছেন, 'চরিত্র-হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়, তারপর খ্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন তার মতো মহান উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেইসব বিরল মহাত্মাদের একজন, যাদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক নবজীবনের স্রোত বয়ে যায়। যিনি গীতা রচনা করেছেন, তার মতো আশ্চর্য মাথা মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখতে পাবে না।"[২]

॥ ২ ॥

এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বিদেশের বুকে দাঁড়িয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের মহিমা-কীর্তন করেছেন, তেমনি তিনি স্বদেশের বুকে দাঁড়িয়ে ভারতের যাবতীয় গ্লানি, কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বিদেশে মুক্তকণ্ঠে ভারতের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু স্বদেশে আত্মসমালোচনা করেছেন কঠোরভাবে। আসলে, তিনি একই সঙ্গে ক্লীবতায় সুপ্ত এবং বিদেশী মোহে আবিষ্ট ভারতকে জাগিয়ে তুলতে হয়েছিলেন আপোসহীন সংগ্রামী।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখব, তিনি অতীত ভারতের গৌরব এবং ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বর্তমান ভারতের যা-কিছু পতনের লক্ষণ, তার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠে জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতের সুনিশ্চিত উত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বলেছেন: "ভারত আবার উঠবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে।"[৩]

তাঁর এই প্রজ্ঞা-প্রসূত অন্তর্ভেদী বক্তব্য অনেক-সময়েই পুষ্টিলাভ করেছে বেদ, উপনিষদ, গীতা এবং রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণ সংযোগে। তিনি ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আচ্ছন্ন বিদেশী ভাবধারায় আক্রান্ত ভারতীয় জনমানসের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছেন সেদিকে। তিনি ভারতীয় জাতিভেদ-প্রথার মৌল-স্বরূপ, নিষ্কাম-কর্মযোগের বাস্তব প্রয়োগ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, জগৎকল্যাণে কর্তব্যপালনের অঙ্গীকার এবং দুর্জয় সাহস ও ক্ষাত্রবীর্যের মহিমা প্রতিষ্ঠায় বার বার মহাভারত থেকে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা এবং গীতা ও মহাভারতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিয়েও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে, বর্তমানে যেটি বলরাম মন্দির নামে বিখ্যাত, রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২তম অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ 'নিষ্কাম কর্ম' সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি দুটি বিষয়ের সংশয় নিরসন করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

প্রথমটি হচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডনির্ভর ধর্মাচরণ সঠিক পথ, না জ্ঞানযোগের পথই সঠিক? এই প্রশ্নের সমাধান করতে স্বামী বিবেকানন্দ মহাভারত তথা গীতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন: গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ চলছিল। একদল বৈদিক যাগযজ্ঞ, পশুবলি এবং ঐ প্রকার কর্মসমূহকেই ধর্মের সমগ্র রূপ বলে মনে করত। অপর দল প্রচার করত যে, অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা করা ধর্ম নামে অভিহিত হতে পারে না। শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্ন্যাসী ও জ্ঞানমার্গী। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্মত্যাগ করে

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ২৭৬

২ ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৫

৩ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫

আত্মজ্ঞানলাভই মোক্ষলাভের একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁর নিষ্কাম কর্মের মহতী বাণী প্রচার করে পরস্পর বিরোধী এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান করলেন।[৪]

দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, অনেক পণ্ডিত এবং গবেষক যেমন সেকালে, তেমনি একালে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, গীতা মহাভারতের সঙ্গে বা যুগে রচিত হয়নি। এটা পরবর্তী কালে রচিত এবং মহাভারতের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বললেন: অনেকের ধারণা যে, গীতা মহাভারতের যুগে লিখিত হয়নি—পরবর্তী কালে মহাভারতের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল। এটা ঠিক নয়। মহাভারতের প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণী-গুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীতা যদি মহাভারতের অংশ হিসাবে বিবেচিত না হয়, এবং বাদ দেওয়া হয়, তবে মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলিতে, যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেগুলিও (বর্জন করার কথা) সমভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।[৫]

এখানে প্রসঙ্গটিকে আরেকটু বিস্তৃত করার প্রয়োজন বোধ করছি। স্বামীজী যখন আলমবাজার মঠে ছিলেন, তখন কলকাতার অনেক যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। নানা প্রসঙ্গে তখন কথা হত। সেরকমই একদিনের আলোচনায় কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন, যেগুলি সঙ্গত কারণেই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজী বলছেন (যে-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি): গীতা গ্রন্থখানি মহাভারতের অংশবিশেষ। এই গীতা বুঝতে চেষ্টা করার আগে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। প্রথম—গীতাটি মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ, অর্থাৎ উহা বেদব্যাস-প্রণীত কিনা? দ্বিতীয়—কৃষ্ণ নামে কেউ ছিলেন কিনা? তৃতীয়—যে যুদ্ধের কথা গীতায় (যা মহাভারতে) বর্ণিত হয়েছে, তা যথার্থ ঘটেছিল কি না? চতুর্থ—অর্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা?

এই সন্দেহগুলি কেন দেখা দিয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেমন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি ঐসব সন্দেহ নিরসনে যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণও উত্থাপন করেছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর তিনি প্রথমেই দিয়েছেন, বলেছেন: "গীতা মহাভারতের অংশবিশেষ। ...তবে শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করার আগে পর্যন্ত গীতা সর্বসাধারণে ততদূর পরিচিত ছিল না।"[৬]

প্যারিস কংগ্রেসের একটি সভায় পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে স্বামীজী দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন: গীতার ভাষা, মহাভারতের ভাষা এক। গীতায় যে-সকল বিশেষণ অধ্যাত্মসম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই বনাদি পর্বে বৈষয়িক সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ঐ সকল শব্দের প্রচুর প্রচার না হলে এমন ঘটা অসম্ভব। পুনশ্চ, সমস্ত মহাভারতের মত আর গীতার মত একই এবং গীতা যখন তৎসাময়িক সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনা করেছেন, তখন বৌদ্ধদের উল্লেখমাত্র কেন করেননি? বুদ্ধের পরবর্তী যে-কোন গ্রন্থে বিশেষ চেষ্টা করেও বৌদ্ধোল্লেখ নিবারিত হচ্ছে না।[৭] অর্থাৎ, শঙ্করাচার্য গীতার রচয়িতা—এই যুক্তি স্বামীজী প্রকারান্তরে খণ্ডন করেছেন। কারণ তিনি বুদ্ধের পরবর্তী।

আর কৃষ্ণ? স্বামীজী বলছেন: কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজা ছিলেন। এটা খুব সম্ভব এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে তিনি বলছেন: ছান্দোগ্য উপনিষদে এক জায়গায় পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোরনামা কোন ঋষির কাছে উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতের কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা, আর 'বিষ্ণুপুরাণে' গোপীদের সঙ্গে বিহার-কারী কৃষ্ণের কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে দু-একটি গুরুত্বহীন স্থান ছাড়া অন্য কোথাও গোপীদের কোন উল্লেখ নেই। যথা—দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র।[৮]

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড (১৩৮৯), পৃঃ ১৬৬
৫ ঐ,
৬ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮
৭ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫১
৮ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪

আবার স্বামীজী যুবচিত্তের জাগরণকে ত্বরান্বিত করার মানসে বলছেন: এখন বৃন্দাবনের বাঁশী-বাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা।[৯]

এবার তৃতীয় প্রশ্ন। অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন: 'কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে কুরুপাঞ্চাল নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অর্জুনের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য: 'শতপথ ব্রাহ্মণ' অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাতে সমস্ত অশ্বমেধ যজ্ঞকারীদের নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেখানে অর্জুনাদির নাম-গন্ধও নেই, অথচ পরীক্ষিত জনমেজয়ের নাম উল্লিখিত আছে। এ দিকে মহাভারতাদিতে বর্ণনা—যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন।[১০] স্বামীজী আর এক জায়গায় বলছেন: আধিপত্য লাভের জন্য কুরু-পাঞ্চাল যে-যুদ্ধে পরস্পরকে ধ্বংস করেছিল, সে-যুদ্ধের ইতিহাস প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি।[১১]

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে আমরা স্বামীজীর স্বতন্ত্র একটি বক্তব্য এবং সেই বক্তব্য-প্রসূত ব্যাখ্যা অনায়াসেই স্মরণ করতে পারি।

মাদ্রাজে বিখ্যাত 'হিন্দু পত্রিকার' পক্ষ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল, যেটি "স্বামীজীর সঙ্গে মাদুরায় একঘণ্টা" শিরোনামে বাণী ও রচনায় সংযোজিত হয়েছে।

এই সাক্ষাৎকারের সময় স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: কেউ কেউ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নেই—উচ্চতম আদর্শগুলি বোঝাবার জন্য পুরাণকার কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন মাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ বা মহাভারতের কথা ধরুন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাস্তবিক কি ওগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা কিছু আছে, অথবা ওগুলি কেবল দার্শনিক সত্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করবার জন্য উচ্চতম আদর্শসমূহের দৃষ্টান্ত, কিংবা ওগুলি মিল্টন, হোমর প্রভৃতির কাব্যের ন্যায় উচ্চভাবাত্মক কাব্যমাত্র?

এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন বলেছিলেন: কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানা-ভাবে পরম সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর যদিও সেগুলিতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি ওগুলি যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়ে থাকে, সেই হিসেবে আমাদের কাছে খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে, তা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; সুতরাং তাঁদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়েও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির কাছে উপদিষ্ট মহান ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে পারা যায়।[১২]

॥ ৩ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকায় নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলছেন:

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব বলে এবং 'অহিংসাই পরম ধর্ম'—এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে—প্রতিরোধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কাপুরুষ ও কপট বলেছেন। এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, সকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত প্রান্ত দুটি দেখতে একই প্রকার। চূড়ান্ত 'অস্তি' ও চূড়ান্ত 'নাস্তি' সকল সময়েই সদৃশ। আলোক-কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন তা আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না, অতি দ্রুত কম্পনও আমরা দেখতে পাই না। ··· প্রতিকার ও অপ্রতিকারের প্রভেদও এইরূপ। একজন কোন অন্যায়ের প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল, অলস ও প্রতিকারে অক্ষম, প্রতিকারের ইচ্ছা নাই বলে প্রতিকার করে না, তা

৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, (১৩৬৯), পৃঃ ১৬ ১০ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫০
১১ ঐ, পৃঃ ৩৮৯
১২ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭

নয়। আরেকজন জানে, ইচ্ছা করলে সে দুর্নিবার আঘাত হানতে পারে, তথাপি সে শুধু যে আঘাত করে না তা নয়, বরং শত্রুকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি দুর্বলতাবশতঃ 'প্রতিকার' করে না, সে পাপ করছে; সুতরাং এই 'অপ্রতিকার' থেকে সে কোন সুফল অর্জন করতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি প্রতিকার করে, তবে পাপ করবে।

…আগে সযত্নে বুঝতে হবে, প্রতিকার করবার শক্তি আমাদের আছে কিনা। শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকারচেষ্টা-শূন্য হই, তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের কাজ করছি; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, এবং নিজেদের মনকে বুঝাবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্রেরণায় কাজ করছি, তবে আমরা ঠিক তার বিপরীত আচরণই করছি। অর্জুনও তাঁর বিপক্ষে প্রবল সৈন্যব্যূহ সজ্জিত দেখে ভীত হয়েছিলেন। 'স্নেহ-ভালবাসা' বশতঃ তিনি দেশের ও রাজার প্রতি তাঁর কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কপট বলছেন, বলছেন 'তুমি পণ্ডিতের মতো কথা বলছ, অথচ কাপুরুষের মতো কাজ করছ; ওঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।' এটাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানেন অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ আদর্শ—তিনি আরও জানেন যে, এটাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ এবং অন্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার-রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের সোপান মাত্র। এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হওয়ার পূর্বে মানুষের কর্তব্য—অশুভের প্রতিরোধ করা।[13]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, স্বামীজী একবার তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন: সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকাজে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠবে। যাতে বাধা নেই, প্রতিকূলতা নেই, তা মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন।[14]

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার্থীদের জীবনগঠন ও চরিত্রগঠনের উপর জোর দিতে গিয়ে মহাভারতের উদ্যোগপর্বের ৩৭ অধ্যায়ের ১৭ নম্বর শ্লোকটিকেই যেন বাংলায় অনুবাদ করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন: বাল্যকালে এক বৃদ্ধ আমাদের নীতি বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক মুখস্থ করিয়েছিলেন, যার একটি শ্লোক এখনও আমার মনে আছে, 'গ্রামের হিতের জন্য পরিবার, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য গ্রাম, মানবতার জন্য স্বদেশ এবং জগতের হিতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবে।'[15]

সেই ত্যাগের মন্ত্রটিই তিনি উচ্চারণ করেছেন "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।" প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জীবনবেদও তাই। আশ্চর্যজনক-ভাবে তাঁর এই জীবনপাতের সংকল্পটি যেন মহাভারতের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত।

মহাভারতের দার্শনিক প্রেক্ষাপটটি স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: আগুনের চারদিকে যেমন ধোঁয়া থাকে, তেমনি কর্মের সঙ্গে কিছু অশুভ সর্বদাই থাকে। আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যার দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়। অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করেছিলেন। এটা না করলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হত না, অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আসত। একদল গর্বিত অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করত এবং তাতে প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হত। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ—কংস জরাসন্ধ প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন। কিন্তু একটি কাজও তিনি নিজের জন্য করেননি। প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[16]

॥ ৪ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝতে হলে আমাদের জানা প্রয়োজন, কর্তব্য কাকে বলে। … জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে কর্তব্যের ভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী মহাভারতের একটি কাহিনীর অবতারণা করলেন।[17]

১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৫৪-৫৫
১৪ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪
১৫ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪২
১৬ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮
১৭ ঐ, পৃঃ ১১-১৩

কাহিনীটি কি ?

এক যুবক-সন্ন্যাসী বনে গিয়ে বহুকাল ধ্যান-ভজন ও যোগাভ্যাস করতে লাগলেন। বারো বছর কঠোর তপস্যার পর একদিন একটি গাছের নিচে তিনি বসে আছেন, এমন সময় তাঁর মাথায় কতকগুলো শুকনো পাতা ঝরে পড়ল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটি কাক ও একটি বক সেই গাছের উপর লড়াই করছে। এটা দেখে তিনি খুব রেগে গেলেন, বললেন, 'কি তোরা আমার মাথায় শুকনো পাতা ফেলতে সাহস করিস ?'

এ-কথা বলে ক্রোধে যেমনি তিনি পাখি দুটির দিকে তাকালেন, অমনি তাঁর মাথা থেকে একটি আগুনের শিখা বেরিয়ে গিয়ে ঐ পাখিদুটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। যোগসাধনার ফলে তার এমনই শক্তি হয়েছিল।

এভাবে নিজের শক্তির প্রভাব দেখে তাঁর খুবই আনন্দ হল এবং নিজের এরূপ শক্তির বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আমি কাক-বক ভস্ম করে দিতে পারি।

এই ঘটনার কিছু পরেই ভিক্ষা করতে তাকে শহরে যেতে হল। এক বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন : 'মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন।' ভিতর হতে উত্তর এল, 'বৎস। একটু অপেক্ষা কর।' যোগী-যুবক মনে মনে বলতে লাগলেন, 'হতভাগিনী, তোর এতদূর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করতে বলিস ? এখনও তুই আমার শক্তি জানিস না।'

তিনি মনে মনে যখন এরকম বলছিলেন, তখন আবার সেই কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল, 'বৎস। এত অহংকার করো না। এখানে কাক বা বক নেই।' যুবক যোগী এতে বিস্মিত হলেন। তথাপি তাঁকে অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে সেই নারী বাইরে এলেন। যোগী তাঁর পদতলে পড়ে বললেন, 'মা, আপনি কিভাবে ওকথা জানলেন ? সেই নারী উত্তরে বললেন, 'বাবা, আমি তোমার যোগ-তপস্যা কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্যা নারী। তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কারণ আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁর সেবা করছিলাম। সারাজীবন আমি কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি। বিয়ের আগে আমি মা-বাবার প্রতি কন্যার কর্তব্য পালন করেছি। এখন বিয়ের পর আমি আমার স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করছি। এটাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য পালন করেই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে—এবং তাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানতে পেরেছি। তবে তুমি যদি এর থেকেও উচ্চতর কিছু জানতে চাও, তাহলে অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাধকে দেখতে পাবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দেবেন, 'যা শিক্ষা করলে তোমার পরম আনন্দ হবে।'

এ-কথা শুনে সেই যোগী ভাবলেন, একজন ব্যাধের কাছে কেন যাব? কিন্তু এই নারীর মধ্যে তিনি যে শক্তির প্রকাশ দেখলেন, তাতেই তার কিছুটা চৈতন্যোদয় হয়েছিল। তাই তিনি সেই নগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

নগরের কাছে এসেই তিনি একটি বাজার দেখতে পেলেন। দূর থেকে দেখলেন, সেখানে এক অতি স্থূলকায় ব্যাধ বসে বড় ছুরি দিয়ে মাংস কাটছে, নানা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে এবং কেনাবেচা করছে। এ দৃশ্য দেখে যোগী ভাবলেন, হায় ভগবান, রক্ষা কর! এই লোকের কাছে আমাকে শিখতে হবে! এতো দেখছি একটা পিশাচের অবতার!'

ইতিমধ্যে ঐ ব্যাধ চোখ তুলে তাকিয়ে বলল : স্বামিন্! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন ? আমার বেচাকেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুগ্রহ করে একটু বসুন।

সন্ন্যাসী ভাবলেন, 'এখানে আমার কী হবে ?' যা-হোক, তিনি বসলেন। ব্যাধ নিজের কাজ করতে লাগল। কাজ শেষ হলে পর সে টাকাকড়ি সব নিয়ে সন্ন্যাসীকে বলল, 'আসুন মহাশয়, আমার বাড়িতে আসুন।' বাড়িতে পৌঁছে ব্যাধ তাঁকে একটি আসন দিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন' তারপর বাড়ির ভিতরে গিয়ে তার পিতামাতার হাত-পা ধুইয়ে দিল, তাদের খাওয়াল, সব ব্যাপারে তাদের সন্তোষবিধান করল।

তারপর সন্ন্যাসীর কাছে এসে একটি আসনে বসে বলল, 'আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন, বলুন—

আমি আপনার কি করতে পারি'। তখন সন্ন্যাসী তাকে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। সেই সব প্রশ্নের উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, মহাভারত-গ্রন্থের অংশরূপে তা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দ এই কাহিনী বলার পরই বলছেন, ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদান্ত-দর্শনের চরম সীমা। স্বামীজী তাঁর কর্মযোগ গ্রন্থে 'কর্তব্য কি' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছেন: তোমরা ভগবদ্-গীতার নাম শুনেছ, ওটা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করে তোমাদের এই 'ব্যাধ-গীতা' পাঠ করা উচিত। এটাই বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।'

মহাভারত অনুসরণ করে এই প্রসঙ্গের উপসংহারে স্বামীজী বলছেন: ব্যাধের উপদেশ শেষ হলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্মিত হলেন এবং বললেন, 'আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধ-দেহ অবলম্বন করে এরূপ কুৎসিৎ কাজ করছেন কেন?' তখন ব্যাধ উত্তর দিল: 'বৎস, কোন কর্মই অসৎ নয়, কোন কর্মই অপবিত্র নয়। এই কাজ আমার জন্মগত। এটা আমার প্রারব্ধ-লব্ধ। আমি বাল্য-কালে এই ব্যবসায় শিক্ষা করি। অনাসক্তভাবে আমি আমার কর্তব্যগুলি ভালভাবে করবার চেষ্টা করি; আমি গৃহস্থের কর্ম পালন করি ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখী করবার চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি না এবং সন্ন্যাসীও হইনি। আমি কখনও সংসার ত্যাগ করে বনে যাইনি। তথাপি সমাজে আমার অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য অনাসক্তভাবে করেই আমার এই জ্ঞান জন্মেছে।'[১৮]

॥ ৫ ॥

বিশ্ববিজয় করে ভারতে ফিরে আসার পথে তিনি প্রথম আসেন শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয়। তারপর সেখান থেকে তামিল অধ্যুষিত জাফনায়। এখানে 'বেদান্ত' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন: বর্তমান যুগে যা বিশেষ প্রয়োজন, তেমন একটি বিষয় আমি তোমাদের বলব। মহা-ভারতকার বেদব্যাসের জয় হোক। তিনি বলে গেছেন, 'কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম।' অন্যান্য যুগে যে-সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তা আর এখন চলবে না। এ-যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান—অপরকে সাহায্য করা। 'দান' শব্দে কি বোঝায়? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান; অন্নবস্ত্র দান সর্বনিম্নে। যিনি ধর্মজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে রক্ষা করে থাকেন। যিনি বিদ্যাদান করেন, তিনিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে সহায়তা করেন। অন্যান্য দান, এমনকি প্রাণদান পর্যন্ত তার তুলনায় অতি তুচ্ছ।[১৯]

আবার দক্ষিণভারতের কুম্ভকোণম বক্তৃতায় স্বামীজী মহাভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলছেন: আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই—সত্যযুগে একমাত্র এই ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহা-ভারতে পাঠ করি: প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই তাদের অবনতি হতে লাগল, ততই তারা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলেন; আবার যখন যুগচক্র ঘুরে সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হবেন।[২০]

আমরা মহাভারতে পাঠ করি: প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন; ক্রমে যতই তাদের অবনতি হতে লাগল, ততই তারা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলেন; আবার যখন যুগচক্র ঘুরে সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হবেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এটাই তাঁর অবতরণের মহান

তারপরই সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ যেন ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টি সঞ্চালন করে উদাত্তকণ্ঠে বলছেন: সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরে সত্যযুগের অভ্যুদয় সূচিত হচ্ছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করছি। সুতরাং উচ্চবর্ণকে নিম্ন করে, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করে কিঞ্চিৎ

১৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৯০

১৯ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০

২০ ঐ, পৃঃ ৮৭

ভোগ-সুখের জন্য স্ব-স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করে জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হবে না।

ভারতের বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে অনেক সংস্কারক বা সংস্কারবাদী বিরূপ মন্তব্য করলেও স্বামী বিবেকানন্দ এ-ব্যাপারে সনাতন প্রথা ও রীতির তাৎপর্যকে স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। জাতিভেদ প্রথার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তিনি পেয়েছেন মহাভারতেই। স্বামীজী বলছেন: জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শোনা যায়, তন্মধ্যে এটাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।[২১]

তারপরই স্বামীজী বলছেন: ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য তার গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় এটা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এটাই তাঁর অবতরণের মহান উদ্দেশ্য।

তবে আগেই আমরা দেখেছি, সমকালীন দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করে, বিশেষ করে পরাধীন ভারতের জড়তাগ্রস্ত চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন স্বামীজী বলছেন: "বৃন্দাবন লীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতা সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজো চালা। ...বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি-সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।"[২২]

স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন "...হৃদয়ে সিংহের মতো বল রাখবি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়? পরে অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা হয়ে যুদ্ধ করলেন।"[২৩]

মহাভারতের মহান আদর্শকে তিনি দেশ ও জাতির সামনে বার বার তুলে ধরেছেন, জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনেই তিনি বলছেন: "শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কী হবে রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়েচেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।"[২৪]

মহাভারতের মহান আদর্শকে স্বামীজী দেশ ও জাতির সামনে বারবার তুলে ধরেছেন, জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনেই তিনি বলছেন: "শরীরে বল নেই, হৃদয়ে উৎসাহ নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কী হবে রে, জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়েচেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। প্রকৃতপক্ষে এই সুপ্তিমগ্ন মহাভারতের মহাজড়তা বিনাশ করতেই তিনি মহাভারতের কথা বার বার কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এই সুপ্তিমগ্ন মহাভারতের মহাজড়তা বিনাশ করতেই তিনি মহাভারতের কথা বার বার কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

২১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড (১৩৬১), পৃঃ ১৯০
২২ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫
২৩ ঐ, পৃঃ ১৮৫
২৪ ঐ, পৃঃ ১৬৪

কৃষ্ণ

শ্রীঅরবিন্দ

এই শঙ্কাকুল মধুর বিশ্বে
কেন যে জীব করে জন্মগ্রহণ
অবশেষে খুঁজে পেলাম তার অর্থখানি···
এই পৃথিবীর ক্ষুধিত হৃদয়কে
অনুভব করেছি আমি—
সে যে স্বর্গের সীমানা ছাড়িয়ে
কৃষ্ণেরই চরণে ঠাঁই পেতে ব্যাকুল···

আমি যে দেখেছি
অমর ওই দুটি নয়নের কী অফুরান রূপ।
শুনেছি শ্রবণে
আবেগ-বিহ্বল প্রেমিকের সেই বাঁশী···
জেনেছি মৃত্যুহীন মহানন্দের
সে কী—অপার বিস্ময়।

তাই তো সব দুঃখ-বেদনা
চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল হৃদয়ে আমার···

সে যে আসে আরো কাছে—
আরও কাছে শুনি তার মোহন বাঁশী···
কী এক বিচিত্র পুলকে
এ দেহ-মন-প্রাণ শিহরিত হয়ে ওঠে···
নিখিল প্রকৃতি যেন প্রশান্ত স্থির প্রেমমুগ্ধ···
দয়িতের স্পর্শ চায়, চায় আলিঙ্গন
চায় প্রিয়তমের সাথে এক হয়ে যেতে···

এই একটিমাত্র মুহূর্তের জন্য
কত-না যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেল।
জগৎ-সংসার আজ স্পন্দিত হয়ে যায়
অবশেষে আমারই মাঝে কী পরিপূর্ণতায়···*

* ইংরেজী KRISHNA কবিতার ভাষান্তর : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

হাজারো প্রণতি

স্বামী আত্মপ্রভানন্দ

সূর্যের সহস্র শিখা নিদাঘের মধ্যদিনে
যে আগুন জ্বালে,
রজনীর চন্দ্রালোক ধরণীর আঙিনায়
যে সুষমা ঢালে,
হিমাদ্রির ঋজুদেহ সমুন্নত শিরে
যে আঘাত সয়,
উত্তরের ধ্রুবতারা যে প্রত্যয় বুকে নিয়ে
রাত জেগে রয়,
বিস্তৃত সৈকত জুড়ে সাগরের শত ঢেউ
তোলে যে কল্লোল,
দখিনের সমীরণ যে উচ্ছল প্রেরণায়
শাখে দেয় দোল,
বনস্পতি বাহু মেলি যে দরদে গড়ে তোলে
বনবীথি ছায়া,
স্নেহসিক্তা জননীর বুকভরা যে স্নেহার্দ্র
সকরুণ মায়া—

সবিতৃর সে আগুন
চন্দ্রমার সেই মাধুরিমা—
ভূধরের সে দৃঢ়তা
জ্যোতিষ্কের প্রত্যয়-গরিমা
সমুদ্রের সে কল্লোল
দখিনের মধুর বাতাস
স্নেহময়ী জননীর প্রাণভরা
সেই স্নেহাশ্বাস—
এসবই মিলেছে এসে
তোমার ও সুদুর্লভ দেহে
আজিও যা নিরন্তর
ঝরে পড়ে অকৃপণ স্নেহে।
বয়ে যাক সে আশিস
যুগ হতে যুগান্তের প্রতি
বিবেক-আনন্দ তুমি
তোমায় হাজারো প্রণতি।

রামকৃষ্ণমহিম্নস্তোত্রম্

রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

সকলকলুষহন্তা মুক্তিদো জ্ঞানমূর্তি-
র্নিখিলভুবনবন্ধুঃ সর্বকল্যাণবর্ষী ।
বিপথগমনমার্গাৎ সারথিঃ সৎপথস্য
প্রণতভয়বিনাশী পাতু নো রামকৃষ্ণঃ ॥

জননরহিতজাতো ধর্মসংস্থাপনার্থং
সুরসরিদিব মর্ত্যে পাবনী বারিধারা ।
সততশরণমার্তো যাচতে পাদপদ্মে,
বিজয়তু ভগবাঞ্ শ্রীরামকৃষ্ণশ্চিরং নঃ ॥

সতি কতিপথভেদে গম্যমেকং নরাণাং
ন সদিহ বহু বিশ্বে সর্বথাতৎসদেকম্ ।
প্রতিপথমনুসৃত্য বেদবেদান্তগম্য
সকল মতবিরোধো নাশিতস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা ॥

দশরথতনয়ো যো রাবণারিঃ পুরাসীদ্
যদুকুলতপনঃ স দ্বাপরে কংসশত্রুঃ ।
অবতরণমিদানীং তস্য লোকাশ্রয়স্য
কলিযুগবহুভাগ্যাদ্ রামকৃষ্ণস্বরূপে ॥

রঘুযদুপতিসত্ত্বাং ধারয়ন্নেককায়ে
বিগলিত করুণাদ্রির্জন্মগৃহ্নন্ নৃমূর্তৌ ।
জগদপগতপাপং কর্তুকামোঽবতীর্ণঃ
কুমতিকুকৃতিসিন্ধৌ ত্রাতুকামশ্চমগ্নান্ ॥

দনুজদলনযুদ্ধে নাপি বাণো ন চক্রং
ন চ কুটিলনখাস্তে যাদৃশঃ পূর্বমাসন্ ।
নয়নজলধরাভ্যাং পাতিতা প্রেমবৃষ্টি-
রসুরহৃদয়ভাবান্ ধাবিতুং বৈ সমর্থা ॥

মনুজশিবনিবাসঃ সেব্যতাং দেববুদ্ধ্যা
নিখিলনরহৃদি সংবিদ্যতে ব্রহ্ম নিত্যম্ ।
করতলগতসিদ্ধির্দর্শিতা মুক্তয়ে যা
চরণশতদলৈস্তেঽপার্থিবং বিত্তমেতৎ ॥

অখিলভুবনমাতুর্যোষিতো রূপভেদা-
স্ত্রিভুবনজননী যা কালিকা সারদা সা ।
করুণফলসমেতৈঃ পুষ্পমাল্যোপচারৈ-
র্ভবহরদয়িতা সা পূজিতা মাতৃমন্ত্রৈঃ ॥

নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যমবতারবরিষ্ঠ হে ।
দীনে কুরুকৃপাং দেব রামকৃষ্ণদয়ানিধে ॥

অক্ষমতা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

যতটা নিচে নামার প্রয়োজন ছিল
ততটা নামতে পারিনি বলে আমি সোজা পথে
হেঁটে যেতে পারলাম না ।
অনেকেই বলেছিল বিবেকের ফুল ছিঁড়ে ফেলতে,
একটাও ফুল ছিঁড়তে পারিনি ;
কান্নার আখরে তাই জীবনের অর্ঘ্য সাজিয়েছি ।
কোন এক হোমড়া-চোমড়া লোক বলেছিল—
"আরও কয়েকটা সিঁড়ি পেরোলে
বনমানুষের খাঁচার সন্ধান পেয়ে যেতেন ।"
বনমানুষের খাঁচার চেয়ে আমার আকাশ দেখতে
ভাল লেগেছিল ।
এবং চিরকালই ভাল লাগে । হয়তো সেই জন্যেই
বৃষ্টিতে ভিজতে হল ।
এখন আকাশে বৃষ্টি ; দুচোখেতে কান্না ;
তবু বিবেকের ফুল ছিঁড়তে
আজও আমি ভয় পাই,
বনমানুষের খাঁচার কাছে যেতে এখনও আমার
গা ছমছম করে ।



আনন্দের সন্তান

খেলে নন্দদুলাল

বালক কৃষ্ণের দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ব্রজের গৃহিণীরা। কখন যে সেই দস্যি বালকের মাথায় কোন দুষ্টুবুদ্ধি খেলবে কেউ জানে না। কেমনভাবে যে সেই দুষ্টুবুদ্ধি রূপ নেবে তাও সকলের অজানা। নাজেহাল গোপগৃহিণীরা তাই দল বেঁধে এসেছেন যশোদার কাছে তাঁর গুণধর ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

গোপীগণ—তোমার দস্যি ছেলের দৌরাত্ম্যে আমরা আর তিষ্ঠোতে পারছি না।

যশোদা—কেন, কি করেছে আমার গোপাল?

গোপীগণ—কি করেছে! কি করতে বাকি রেখেছে তাই বল! অসময়ে চুপিচুপি দলবল নিয়ে বাড়িতে এসে বাছুরগুলোর বাঁধন খুলে দেয়। বাঁধন-ছাড়া বাছুরগুলো যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালায়। তাদের খুঁজে-পেতে ধরে নিয়ে আসতে আমাদের প্রাণান্ত।

যশোদা—কৃষ্ণ আমার দুধের ছেলে। সে না বুঝে ঐসব করেছে। তা, তোমাদের বাড়ির লোকেরা তো বাছুরগুলোকে সামলে রাখতে পারে।

গোপীগণ—তোমার কৃষ্ণ যে মহা চতুর। সে জানে কোন সময়ে লোকেরা বাড়িতে থাকবে না বা অন্য কাজে থাকবে ব্যস্ত। আর কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই তোমার পুত্ররত্নটি বাছুরগুলোকে খুলে দেয়।

যশোদা—তোমরা তো বাড়িতে থাক। তোমরা তো জান। তোমরা কৃষ্ণকে ধমকে দিতে পার না?

গোপীগণ—কাকে ধমকাব? ওর ভয় আছে, না লজ্জা আছে? ধমক দিলে বা রাগ করে কিছু বললে সে শুধু হাসে।

যশোদা—কেন সে বাছুরগুলোকে খুলে দেয় তোমরা জান?

গোপীগণ—জানব না কেন? বাছুরগুলোকে খুলে দিলে বাছুরগুলো সব চারিদিকে ছুটে পালায়। কেউ-কেউ বা গাভীদের সব দুধ খেয়ে ফেলে। আমরা ও বাড়ির অন্যান্য সকল লোক তখন বাছুরগুলোকে সামলাতে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে ব্যস্ত সেই সুযোগে সে বাড়ির ভিতর ঢুকে দুধ, দই, ক্ষীর, ননী চুরি করে খায়। এই চুরি করে খাওয়ার জন্যই সে বাছুরগুলোকে খুলে দেয়।

যশোদা—তোমরা কেন তাকে দুধ, দই এসব খেতে দাও না? দিলে তো সে ঐকাজ করত না।

গোপীগণ—তোমার কৃষ্ণ যে চুরি-করা খাবার ছাড়া অন্য কিছু খাবে না!

যশোদা—তোমাদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। কৃষ্ণ বালক, সে কেমন করে তোমাদের সুরক্ষিত দুধ, দই চুরি করে খাবে?

গোপীগণ—ওরে বাবা! তোমার কৃষ্ণ বয়সে বালক, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধির শিরোমণি। তার মাথায় নিত্য-নতুন ফন্দি। চুরি করার জন্য কখন যে সে কোন ফন্দি-ফিকির করবে তা আমরা কেউ জানি না। যা কখনো দেখিনি শুনিনি এমন সব কলা-কৌশল তার নখদর্পণে।

যশোদা—তোমাদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য যে, তোমাদের মতো হাড়-কৃপণের দুধ-দই সে খায়।

গোপীগণ—শুধু সে খায় না, হনুমানগুলোকেও খাওয়ায়। হনুমানদের সঙ্গে ভাগ করে সে খায়। যদি কোন হনুমান না খায় তাহলে সে নিজেও খাবে না। রাগ করে দুধ-দইয়ের ভাঁড় ভেঙে ফেলে।

যশোদা—তোমরা তো উঁচুতে দুধ-দইয়ের ভাঁড়গুলোকে তুলে রাখতে পার যাতে সে নাগাল না পায়।

গোপীগণ—আমরা তো তার ভয়ে অনেক উঁচু সিকেতে ভাঁড় ঝুলিয়ে রাখি। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। সে পিঁড়ি বা ঐরকম কিছু দিয়ে রেখে তার

উপর তার কোন দোসরকে দাঁড় করাবে। দরকার হলে তার কাঁধে দাঁড় করিয়ে দেবে আর এক দোসরকে। আর তার কাঁধে থাকবে সে নিজে। যদি তাতেও নাগাল না পায় তাহলে রেগে লাঠি দিয়ে ভাঁড় ফুটো করে সেই ফুটো থেকে পড়া দুধ-দই হাত পেতে খাবে। কখনও আবার সে কাঁধে করে তুলবে অন্যদের।

যশোদা—এসব করতে তো সময় লাগে। তোমরা তখন থাক কোথায় ?

গোপীগণ—আর বলব কি—ব্রজের সব বালকই যে তোমার ছেলের অনুচর। তারা সব খবরাখবর যোগান দেয় ওকে—কোন বাড়ির গিন্নীরা এখন কাজে ব্যস্ত, কোন বাড়ির পুরুষরা এখন বাইরে ইত্যাদি। যদি কারও বাড়িতে কিছু না পায় তাহলে রেগে গিয়ে গৃহস্থকে মুখ ভ্যাঙচাবে। বলবে—'তোমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।' কখনো বা বাড়ির ঘুমন্ত বাচ্চাগুলোকে বিরক্ত করে কাঁদিয়ে দিয়ে পালায়। যদি কেউ ওকে বলে চোর, তাহলে রুখে দাঁড়িয়ে বলবে: 'তুমি চোর। তোমার চোদ্দ-পুরুষ চোর।' আমরা ওর আর ওর বাহিনীর ভয়ে অস্থির। ওর দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

এদিকে কৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছে দিয়েছে তার সাকরেদরা যে, গোপীরা মা যশোদাকে নালিশ জানাচ্ছে। মাকে বড় ভয় কৃষ্ণের। বুঝেছে আজ ভাগ্যে নির্ঘাত প্রহার জুটবে। হয়তো মা কিছু খেতে দেবে না, কিংবা ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে আটকে রাখবে। দস্যি শিরোমণির তখন বেহাল অবস্থা। চোখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। ভীত-ব্যাকুল সেই দামাল বালকটিকে দেখে কে বলবে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, দেবতা-দানব তারই ভয়ে কম্পমান।

নালিশ জানিয়ে গোপীরা যে-যার বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু যশোদা কি করলেন? বোধ হয় ভেবেছিলেন কৃষ্ণকে খুব তিরস্কার করবেন, প্রয়োজনে প্রহারও করতে পারেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণকে দেখলেন, দেখলেন ভীত-ব্যাকুল দস্যি ছেলেটার করুণ অপরাধী মুখ, তখন তার সব রাগ কোথায় উড়ে গেল। তবে কৃষ্ণের বন্ধুদের তিনি খুব ধমকে দিলেন পরের বাড়িতে চুরি করে খাওয়ার জন্য এবং কৃষ্ণকে তাতে সাহায্য করার জন্য।

এদিকে যশোদার ভয়ে কৃষ্ণর বন্ধুরা আর কৃষ্ণের সঙ্গে দুধ-দই চুরি করতে যেতে চাইছে না। কৃষ্ণ দেখল মহা মুস্কিল! মায়ের উপর খুব রাগ হল তার। বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি চুরি করে খাওয়াতেই যে তার আনন্দ। খাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয়। তাদের বাড়িতে তো দুধ-দই-ক্ষীর-ননীর ছড়াছড়ি। তার আসল মজা ঐ দুষ্টুমিতে, গোপ-গৃহিণীদের বিরক্তি উৎপাদনে। নির্দোষ, নির্মল আনন্দ। মনে হয় গোপ-গৃহিণীরাও মনে মনে চাইতেন কৃষ্ণ ঐরকম দস্যিপনা করুক। দস্যি ছেলেটা শুধু যশোদারই চোখের মণি নয়, সারা ব্রজেরই যে সে আদরের লালা—লাডলা। কৃষ্ণ আর আসছে না তাঁদের বাড়িতে, আসছে না তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও। সারা ব্রজমণ্ডল জুড়ে যেন এক মহাস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এই স্তব্ধতা যেন ভাল লাগছে না ব্রজগৃহিণীদের। যে দস্যি ছেলেটাকে তাঁরা এত মুখ ঝামটা দিয়েছেন তাকে আর লজ্জার মাথা খেয়ে কি করে বাড়িতে ডেকে আনেন—'ওরে লালা, তুই আয়—সঙ্গে নিয়ে আয় তোর চেলা-চামুণ্ডাগুলোকে। যত পারিস দুধ-দই-ক্ষীর-ননী খা। তুই চুরি করে না খেলে, হুড়োযুদ্ধি না করলে যে আমাদের ভাল লাগে না।'

ওদিকে আর এক কাণ্ড। মায়ের উপর রাগ করে কৃষ্ণ বাড়ি থেকে কিছু না খেয়ে খেলতে বেরিয়েছে। খেলতে খেলতে সে মাটি খাচ্ছে। সবাইকে বোঝাতে চাইছে যে, বাড়িতে মা তাকে খেতে দেন না। দাদা বলরাম ও অন্যান্য সাথীরা এসে যশোদাকে বললেন: 'কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।' হন্তদন্ত হয়ে যশোদা ছুটলেন কৃষ্ণের কাছে। রেগে গিয়ে যশোদা বললেন: "ওরে দুষ্টু, কেন তুই মাটি খেয়েছিস?" মায়ের অগ্নিমূর্তি দেখে কৃষ্ণের মুখ ফ্যাকাশে। ভয়ে ভয়ে কোন রকমে বলল: "না না, মা আমি মাটি খাইনি।" যশোদা বললেন: "খাসনি? ঐ তো বলরাম বলছে, তোর সব বন্ধুরা বলছে, তুই মাটি খেয়েছিস।" কৃষ্ণ বলল: "ওরা সব মিথ্যা কথা বলছে। আমি হাঁ করছি, তুমি আমার মুখ দেখ সেখানে মাটি লেগে আছে কিনা।" বলেই হাঁ করল কৃষ্ণ। যশোদা দেখলেন সে-মুখে বিশ্ব-চরাচর, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র ভাসছে।

স্বামী অভেদানন্দ ঃ একটি অনুধ্যান

স্বামী গহনানন্দ

২৭ অক্টোবর ১৮৯৬। স্থান—লন্ডনের ক্রাইস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি। সেখানে লন্ডন শহরের বিশিষ্ট মানুষদের সামনে ভাষণ দিলেন স্বামী অভেদানন্দ। সেটিই তাঁর জীবনের প্রথম ভাষণ। শ্রোতারা সকলেই তৃপ্ত এবং উল্লসিত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি আর উল্লাস স্বামী বিবেকানন্দের। প্রিয় গুরুভ্রাতার সাফল্যে তাঁর আনন্দ আর গর্ব যেন আর ধরে না। শোনা যায় সেদিন স্বামীজী বলেছিলেন: "আমি পৃথিবী থেকে চলে গেলেও আমার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার মুখ দিয়ে আমার বাণী প্রচারিত হবে।" সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন ভারতের ধর্ম ও বাণী প্রচারে তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতা কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছেন।

২৭ অক্টোবর ১৮৯৬। স্থান—লণ্ডনের ক্রাইস্ট থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি। সেখানে লণ্ডন শহরের বিশিষ্ট মানুষদের সামনে ভাষণ দিলেন স্বামী অভেদানন্দ। সেটিই তাঁর জীবনের প্রথম ভাষণ। শ্রোতারা সকলেই তৃপ্ত এবং উল্লসিত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি আর উল্লাস স্বামী বিবেকানন্দের। প্রিয় গুরুভ্রাতার সাফল্যে তাঁর আনন্দ আর গর্ব যেন ধরে না! শোনা যায় সেদিন স্বামীজী বলেছিলেন: "আমি পৃথিবী থেকে চলে গেলেও আমার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার মুখ দিয়ে আমার বাণী প্রচারিত হবে।"

তিনি জানতেন যে-পতাকা তিনি পাশ্চাত্যে উড্ডীন করে দিয়েছেন তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ স্বামী অভেদানন্দ। স্বামী অভেদানন্দের জীবনীকারগণ বলছেন, লন্ডনের সেই প্রথম ভাষণের পর স্বামী অভেদানন্দের প্রতি উচ্চারিত শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর আশীর্বাদের ফল প্রত্যক্ষ হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা একদিন অভেদানন্দজীকে আশীর্বাদ করেছিলেন: "তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।"

লন্ডন থেকে অল্পদিনের মধ্যে অভেদানন্দজীর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত হল আমেরিকায়। আমেরিকার বিদ্বৎসমাজে ক্রমেই তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছিলেন। আমেরিকার বহু মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন এক বরেণ্য আচার্য। এই প্রতিষ্ঠালাভ অবশ্য নির্বাধ হয়নি। বহু বাধা, বহু সমস্যা, বহু বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার শুভেচ্ছা, গুরুর প্রতি একান্ত নির্ভরতা এবং নিজের অদম্য আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে সমস্ত বিঘ্নকে তিনি অতিক্রম করেছিলেন।

আমেরিকায় দীর্ঘ চব্বিশ বছর (১৮৯৭—১৯২১) এবং তারপর ভারতবর্ষে দীর্ঘ সতের বছর (১৯২১—১৯৩৮) বহু মানুষকে তিনি দিব্যজীবনের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তা দিতে পেরেছিলেন এইজন্য যে তিনি ছিলেন স্বয়ং এক দেবজীবন। সাধারণ মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু আসলে ছিলেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। বস্তুতঃ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের দেবজীবন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাঁদের মহান আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই এখন অতীতের ঘটনা। যে-যুগসৃষ্টির প্রয়োজনে এই মাটির পৃথিবীতে তাঁদের অবতরণ হয়েছিল, তা অবশ্য এখনও পূর্ণাবয়ব ধারণ করেনি। তার পরিপূর্ণ বিকাশ এখনও রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তবে এটিও অতি স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, সে-যুগবিকাশের কার্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাই তাঁদের প্রত্যেকেরই দেবজীবন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাঁদের জীবন, তাঁদের বাণী আমাদের অনুধ্যানের বিষয়। সেই অনুধ্যানে আমাদের জীবন পবিত্রতর হয়ে উঠবে। জীবনে আমরা লাভ করব নতুন শক্তি, নতুন প্রেরণা।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলতেন: "এই দেখ, ঠাকুরের যারা শিষ্য—direct disciples,

তাদের মধ্যে কত ভালবাসা। প্রত্যেকের মত এক তা নয়। স্বামী বিবেকানন্দের, আমার এবং সারদানন্দের—সব আলাদা আলাদা ভাব। কিন্তু এক ভালবাসা সবার ভিতর আছে। চন্দ্র, সূর্য, গাছ, পালা সব রয়েছে, অথচ ভিতরে এক ব্রহ্ম—এই হচ্ছে Unity in Variety (বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব)।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান কালীপ্রসাদ (পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ) তখন দক্ষিণেশ্বরে নতুন যাতায়াত করছেন। একদিন ধ্যানকালে তিনি দর্শন করেন, তাঁর আত্মা দেহ ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে চলেছে। বহু মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে একটি সুন্দর প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন, সেখানে সর্বধর্মের সেই প্রাসাদের এক বিরাট কক্ষে প্রবেশান্তে দেখলেন, চতুষ্পার্শে বেদীতে বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবী ও অবতারগণ বসে আছেন, আর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে সব দেব, দেবী ও অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় বিরাট দেহে একীভূত হলেন। এ-সমস্ত শুনে ঠাকুর বললেন: "তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল; এখন হতে তুই অরূপের ঘরে উঠলি; আর রূপ দেখতে পাবি না।"

প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলেছিলেন: "কালী, তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" তিনি তাঁকে আরও বলেছিলেন: "তুই কালে সব জানতে বুঝতে পারবি।"

স্বামী অভেদানন্দের চিন্তাধারার মূলে ছিল তাঁর বিজ্ঞানী মন। তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম ও বেদান্তের ভাবধারায় তাঁর হৃদয়-মন ছিল অনুপ্রাণিত। বিজ্ঞানের যুগে যে-ধর্ম বিজ্ঞান-ভিত্তিক নয় তা চিন্তাশীল মনের উপর কোন রেখাপাতই করতে পারে না। ধর্মের এ-দিকটায় অভেদানন্দ মহারাজ অতি জোর দিয়েই দেশে-বিদেশে মানুষের মন আকর্ষণ করেছেন। বেদান্তের অধ্যাত্মবাদ পুরোপুরিই বিজ্ঞানগ্রাহ্য। তাই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও যুক্তির পরিবেশের মধ্যে একমাত্র বেদান্ত-ধর্মই দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্যদেশে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল বেদান্তের সেই বিজ্ঞানভিত্তিক ভাব ও আদর্শকে সেখানকার বিদগ্ধ-সমাজের সামনে অতি দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছিলেন। আমরা জানি, তাঁর সে-প্রয়াস হয়েছিল সার্থক।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাগমনের পর থেকে তিনি পাশ্চাত্যদেশের ভূমিতে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুধু যে তাঁর বেদান্ত-প্রচারই সফল হয়েছিল তা নয়, ভারতের বাইরে ভারতের গৌরবকেও তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। 'India and Her People' নামক তাঁর বক্তৃতা-সংগ্রহটি এ-কথার স্বাক্ষর বহন করছে। শুধু তাই নয়, তাঁর সব বক্তৃতাতেই তাঁর ভারতপ্রেম ও ভারতের গৌরবদীপ্তি অনিবার্যভাবেই শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করত।

বহু নতুন চিন্তা যুক্তি-নির্ভর ভাষায় অতি জোরালোভাবে স্বামী অভেদানন্দ আমাদের সামনে রেখে গেছেন। কি মাতৃভাষা ও সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব, কি স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্ক-শিক্ষার প্রয়োজন, কি সাধারণ জ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধির বিকাশ, কি কারিগরী শিক্ষা ও হস্তশিল্প—সব কিছুর উপরই তিনি তাঁর চিন্তার আলোকপাত করে গেছেন। এ-প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকায় এক Educational Conference-এ এক মনোজ্ঞ ভাষণে পাশ্চাত্য জাতীয় জীবনের মূল নীতি the doctrine of right-এর সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূলনীতি the doctrine of duty-এর তুলনা করে তিনি ভারতীয় নীতির অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বের কথাটি চিত্তাকর্ষক ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। যদিও অভেদানন্দজী তাঁর বিশ্লেষণটি ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর যুগ-সন্ধিক্ষণে উপস্থাপিত করেছিলেন, তবুও তাঁর মন্তব্য আজও চিন্তাশীল মনীষীদের অনুধাবনযোগ্য; কেননা পাশ্চাত্য দেশ থেকে আহৃত এবং ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত 'মৌল অধিকার' (Fundamental rights) আমাদের দিনে দিনেই অত্যন্ত স্বার্থপর করে তুলেছে। আমরা শুধু নিজেদের দাবি নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু অন্যের অধিকার রক্ষা করাও যে আমাদের কর্তব্য তা আমরা ভেবেও দেখি না। সবাই ধর্মঘট করে নানা দাবির কথা জোরালো ভাষায় বলছে। কিন্তু প্রত্যেকের যে নাগরিক হিসাবে বিরাট দায়িত্ব

ও কর্তব্য আছে সে-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা কর্তব্যের কথাই বলেছেন, অধিকারের কথা বলেননি। ভারতবর্ষে জীবনের চারটি অবস্থা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম এমনভাবে বিন্যস্ত ছিল যাতে ধীরে ধীরে নিজেদের বর্ণাশ্রম অনুমোদিত কর্তব্য পালন করে স্তরে স্তরে সব মানুষই মুক্তি লাভের অধিকারী হতো। তাই দেখা যাচ্ছে যে অভেদানন্দজীর বিশ্লেষণটি আজও আমাদের জাতীয়-জীবনে কতখানি প্রযোজ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন ঃ "কালে তুই সব কিছুই জানতে বুঝতে পারবি।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি আমরা তখনই সঠিক উপলব্ধি করতে পারি যখন আমরা ভাবি যে অভেদানন্দ মহারাজ জন্মেছিলেন অপার যোগজ শক্তি নিয়ে, যোগীর মন ও শুভ সংস্কার নিয়ে। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে হৃষিকেশের বিখ্যাত মহাত্মা ধনরাজ গিরি স্বামী বিবেকানন্দকে পরবর্তী কালে বলেছিলেন ঃ "অভেদানন্দ। অলোকিকী প্রজ্ঞা।" বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই তিনি যোগিসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে প্রাকৃত অপ্রাকৃত, জাগতিক আধ্যাত্মিক সব কিছুরই মূলে পেঁছিতে, সব রহস্যের মূল উদ্ঘাটন করতে স্বভাবতঃই প্রয়াসী হতেন এবং সর্বদা সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পেঁছিাতেই চেষ্টা করতেন—তা ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনই হোক, বা ইতিহাস, সমাজনীতি বা রাজনীতিই হোক, অথবা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাই হোক, কিংবা পরলোক বা প্রেততত্ত্বই হোক। সব বিষয়েরই মূল কথাটি তুলে ধরে মানব জীবনের উদ্দেশ্যের শেষকথা যে বেদান্তের অধ্যাত্ম-অনুভূতি, তা তিনি দৃঢ়তার সাথে দেখিয়ে গেছেন।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন তেজ, বিক্রম, আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনচিত্ততার মূর্ত বিগ্রহ। সত্য ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। কোন অবস্থায়ই তিনি অসত্যের সঙ্গে আপোষ করতে পারেননি।

তাঁর কয়েকটি উপদেশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি ঃ

তোমরা যাই করনা কেন, ভগবানকে বাদ দিয়ে থাকলে সংসারে দুঃখে পড়তেই হবে, তা বলে কি যারা ভজনাদি করে তারা দুঃখে পড়বে না? তারাও পড়বে—তবে তারা নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না। সব হাসি মুখে সয়ে যেতে পারবে। অশান্তি পাবে না।

শক্তিপূজা না করলে কি দেশ জাগে? সব জড় হয়ে পড়ছে; দেখ না বীরের ভাব একদম নেই। সব কাপুরুষ। জগজ্জননীর কাছে শক্তি চাইতে হয়।

বাপ ছেলেকে শেখাতে পারে না কেন? বাপ নিজেই সৎভাবে থাকবে না, ছেলের কি দোষ? নিজে ভাল হলে তখন আর ছেলেকে বলতে হয় না, তুমি ভাল হও; তখন ছেলে আপসে আপ্ ভাল হবে। তুমি নিজে সাধু হও, তোমার দেখাদেখি আরও কত লোক সাধু হবে। তোরা চাস্ নিজে ভাল না হয়ে অন্যকে ভাল করতে। তা কি হয়? ধাপ্পা দিয়ে কদিন চলে? একদিন না একদিন নিজের স্বরূপটিও প্রকাশ হয়ে পড়বেই।

ঘরে যদি আলো আনতে চাও তো ফুটো বা জানালা দরজা রাখতে হবে। বিবেক-বৈরাগ্য আনতে হয়—তবে ভগবানের প্রতি ভালবাসা আসে। বিচার কর—সৎ অসৎ বিচার সর্বদা করবে। সৎভাবে সংসারে থাকবে। ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকবে। তোমরা নিজেরাই তো অনেক অনর্থ ঘটিয়ে সংসারকে বিষময় করে তুলছ।

সৎ-স্বরূপ ভগবানকে পেতে হলে সৎ চরিত্র, সত্যবাদী হতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলো স্ববশে রাখতে হবে। সত্য বলতে বলতে মনের ময়লা কেটে গিয়ে মনরূপ দর্পণ নির্মল হয়ে যায়। তখন যা সংকল্প করবে তাই ফলে যাবে। সত্যের শক্তি অসীম।*

* গত ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ স্বামী অভেদানন্দের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির ভাষণ।



মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় যুবসমাজ

হামদুল্লা ফারুক

জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দকে যুববর্ষ হিসেবে ঘোষণা থেকে প্রমাণ হয় আধুনিক বিশ্বে যুবশক্তির গুরুত্ব কতখানি। ঐ থেকে ভারত সরকার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারি 'যুবদিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন; এবং তখন থেকে প্রতি বছর ভারতব্যাপী 'যুবদিবস' পালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী এবছর 'যুবদিবসে' এক বেতার ভাষণে যুবকদের তথা সমগ্র জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ-এর আদর্শ ও তাঁর বাণী অনুধাবন ও অনুসরণের জন্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দিনটি পালিত হয়েছে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। রেডিও এবং টেলিভিশনেও স্বামীজীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনামালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ-এর আদর্শ অনুসরণের এক ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র।

'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় যুবসমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'যুবদিবস' উপলক্ষে ভারত বিচিত্রার তরফ থেকে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে প্রকাশিত হল।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা চিন্তা করলে আমাদের সামনে এমন একজন মহান গেরুয়া বস্ত্রধারী উষ্ণীষ-মণ্ডিত মস্তক নবীন সন্ন্যাসীর চিত্র ভেসে ওঠে যিনি তাঁর জীবৎকালে ভারতীয় যুবকের সর্বোত্তম আদর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের মনে এই চিত্র চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষ থেকে নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, বর্ণভেদ-প্রথা, দারিদ্র্য এবং সর্বোপরি আলস্য দূর করার জন্য স্বামীজী যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন তার মধ্যমণি ছিল যুবসমাজ। যুবসমাজের মাধ্যমে তিনি ভারতকে একটি আধুনিক, শিল্প-সমৃদ্ধ জাতিতে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই যুবক বিধায় যুবসমাজের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিলেন। একারণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভারতের যুবসমাজ তাঁকে তাদের অবিসংবাদিত নেতারূপে বরণ করে নিয়েছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী নায়কদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণা এসেছিল স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। প্রতিটি বিপ্লবী সংগঠনের কার্যালয়ে বিবেকানন্দের ছবি শোভা পেত এবং মহাবিপ্লবী মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির লেখার সঙ্গে স্বামীজীর লেখাও পাঠ করা হত বিপ্লবীদের প্রতিটি গোপন আস্তানায়। তৎকালীন Sedition Committee-র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে নিহত এবং এই অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের শতকরা ৮৫ জনের বয়স ছিল ১৬ থেকে ৩০-এর মধ্যে। অর্থাৎ বিপ্লবীদের অধিকাংশই ছিলেন যুবক। বিবেকানন্দের অগ্নি-বর্ষী লেখা ও অনুপ্রেরণাময় বাণী ব্যতীত বাংলায় তথা সারা ভারতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এভাবে প্রসার লাভ করত কিনা সন্দেহ। ইতিহাসের উত্থান-পতন এবং গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি বলেছিলেন, সকল সামাজিক বিবর্তন এবং পরিবর্তনে একমাত্র যুব-সমাজই প্রকৃত বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি স্বামীজীর ছিল অগাধ

শ্রদ্ধা। তিনি বিশ্বাস করতেন, শূদ্ররাজ অর্থাৎ কর্মজীবী-সম্প্রদায়ের শাসন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলে তিনি শ্রমজীবী-মানুষকে একমাত্র বৈপ্লবিক শ্রেণী বলে ঘোষণা করেননি। যুবসমাজের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এবং তিনি বার বার তাদের বিপ্লবী অগ্রনায়কের ভূমিকা পালনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বামীজী বহুবার বলেছেন, উদীয়মান যুবকদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। তারাই সাহসিকতার সাথে সমাধান করবে সেই সব সমস্যা যা দেশের উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ। যুবকদের কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন: এখনই প্রকৃষ্ট সময় তোমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ পথ ঠিক করে নেবার। যতক্ষণ তোমাদের যৌবনের শক্তি আছে, যতক্ষণ তোমরা কাজে প্রতিরোধ করবে না, যতক্ষণ তোমাদের যৌবনের শক্তি ও সজীবতা থাকবে ততক্ষণই উপযুক্ত সময়।

প্রতিটি যুবকের মধ্যে অশেষ শক্তি আছে এবং বিভিন্ন পন্থায় সে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটাতে চায়। এতে বাধা এলেই সে বিদ্রোহ করে। এই তার স্বভাব। সে তার কাজের এবং চিন্তার সামাজিক স্বীকৃতি চায়। সে চায় নেতৃত্ব এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা। সে সমাজে তার চিহ্ন রেখে যেতে চায়। বয়স্করা যুবকদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা সুনজরে দেখেন না। তাদের ধারণায় যুবকমাত্রেই একরোখা, উচ্ছৃঙ্খল এবং অসহিষ্ণু; তারা শুধু ভাঙ্গতে জানে, গড়তে জানে না। এখানেই যুবক এবং বয়স্কদের সংঘাত। একেই আজকাল সাধারণতঃ 'জেনারেশন গ্যাপ' বলে অভিহিত করা হয়। যুবকদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েও স্বামীজী তাদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, অশেষ শক্তির আধার এই যুবশক্তিকে একমাত্র ভালবাসার মাধ্যমেই দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব। যুবকরা ভাবপ্রবণ। তারা যুক্তির চেয়ে ভাবপ্রবণতাকেই বেশি প্রশ্রয় দেয়। স্বামীজী যুবকদের এই ভাবপ্রবণতাকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তৎসঙ্গে তিনি যুবকদের ভাবপ্রবণতাকে শিক্ষার মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী করার কথা বলেছেন। আর একথা বোধ করি সকলেই জানেন যে, শিক্ষা বলতে স্বামীজী সেই মানুষ গড়ার শিক্ষার কথাই বলেছেন যার মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিদ্যমান দেবত্বের স্ফুরণ হয়। স্বামীজীর কথায়: "Education is the manifestation of the perfection already in Man." স্বামীজী বলেছেন, শিক্ষার মাধ্যমে অপ্রতিরোধ্য, লাগামহীন ভাবপ্রবণতাকে সংযত করতে হবে, বশীভূত করতে হবে এবং তখনই তা সৃষ্টিশীল পথে প্রবাহিত হবে। রাগান্বিত হলে শিল্পী গান রচনা করতে, ছবি আঁকতে বা কবিতা লিখতে পারে না। একটি খরস্রোতা প্রলয়ঙ্করী নদীকে তখনই সেচকাজে ব্যবহার করা যায় যখন তার উপর একটা ড্যাম তৈরি করা হয়। এইজন্যই স্বামীজীও যুবশক্তিকে সৃষ্টিধর্মী পথে প্রবাহিত করে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করতে চেয়েছেন। স্বামীজী চেয়েছেন মানুষ নিজেই যেন তার নিজের শিক্ষক হতে পারে। মানুষের মধ্যে যে অসীম সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে রয়েছে তার পরিপূর্ণ প্রকাশই মানব-জীবনের লক্ষ্য। ধর্মের মাধ্যমেই মানুষ পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। মানুষ সর্বক্ষণই চেষ্টা করে প্রকৃতিকে জয় করতে। একাজে সফল হতে হলে মানুষকে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ শ্রদ্ধাবোধ। 'শ্রদ্ধা' শব্দটির গভীরতর অর্থ আছে। এর মধ্যে রয়েছে শুভবুদ্ধি, সংকল্প, শুভবুদ্ধির জয় অনিবার্য—এই বিশ্বাস এবং সমাজসেবার ব্রত। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, পুরনো ধারণায় নাস্তিক হলেন তিনি যিনি ঈশ্বর মানেন না। কিন্তু আধুনিক ধর্ম বলে, যার নিজের উপর বিশ্বাস নেই তিনিই নাস্তিক। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাসের জগতে সব কিছুই হ্যাঁ-বোধক, সত্য এবং গ্রহণযোগ্য; কিছুই অগ্রহণীয় বা বর্জনীয় নয়। সেইজন্য তিনি বলেছেন: We don't move from darkness to light; from dim light we enter the world of bright light. We don't pass from untruth to truth but from fragmented truth to whole truth.

অসীম সাহসী, মৃত্যুঞ্জয়ী, কর্মযোগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যুবকদের সাহসী হতে বলেছেন: Make your nerves strong. I want iron muscles and nerves as strong as thunder.

My young friends, be strong. You will be nearer to heaven if you play football instead of reading the Gita. And if your body becomes stronger you will understand the Gita better. If your blood becomes fresh then you will be able to understand Sri Krishna's great talent and strength. Your motherland is looking for brave sons. The weak cannot achieve anything.

যাঁরা যুবসমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বা আলোচনা করেন তাঁরা প্রায়ই বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। স্বামীজী এ-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, সমস্যার প্রতিটি দিক বিশ্লেষণ করে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন। স্বামীজীর মতে, ক্ষমতার অপব্যবহার থেকেই সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং যুবশক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। যুবসমাজের অস্থিরতার প্রধান কারণ যুবকদের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের বিস্ফোরণের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থতা। আর একটি কারণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্ম, দর্শন এবং সাহিত্যের বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্বেও সমাজের উঁচু স্তরে বিদ্যমান কপটতা, ছলচাতুরী, মিথ্যাচার প্রভৃতি চারিত্রিক দোষ-দর্শনজনিত হতাশা। এইসব কারণে যুবসমাজ স্বকীয় সত্তা ও বাহ্যিক সত্তার নিরন্তর সংঘাতের ফলে আজ ভ্রান্ত, ক্লান্ত, হতাশা-গ্রস্ত। এজন্যেই স্বামীজী যুবসমাজকে শ্রদ্ধাশীল হতে এবং ব্রহ্মচর্য, আত্মসংযম এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে উপদেশ দিয়েছেন।

সর্বব্যাপী ঘনায়মান মূল্যবোধ ও চরিত্রের সংকট, যা সমাজকে পঙ্গুত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, স্বভাবতই যুবসমাজের মনে সৃষ্টি করেছে চাপা উত্তেজনা। এই সংকটময় মুহূর্তে আবার প্রয়োজন হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের তেজোময় ও প্রেরণাদায়ী বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে মোহমুক্ত করে নবজীবন দান করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন, অনুরূপভাবে স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষকে তন্দ্রা থেকে জাগাবার জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম করে গেছেন। মহামানব, মহান সাধক, পুরুষসিংহ এবং যুবমানসের সর্বোত্তম আদর্শ, স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত বাণী তাঁর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণ ও অনুসরণের দাবী রাখে: আমি কিছুসংখ্যক অগ্নিগর্ভ যুবক সহযোদ্ধা চাই যারা সাহসী ও বুদ্ধিমান, যারা সাঁতার কেটে সাগর পার হতে এমনকি মৃত্যুকে বরণ করতে সদা প্রস্তুত। আমি এই রকম শত শত যুবক ও যুবতী চাই। এক মহা আধ্যাত্মিক জোয়ার ধেয়ে আসছে যার ফলে নীচ উন্নত হবে, মূর্খ হবে মহাজ্ঞানী। সম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু। অতি দাম্ভিক যারা নিজ নিজ সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত তাদের নরকেও স্থান হবে না। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত··· মহাপ্লাবন এগিয়ে আসছে। চরৈবেতি চরৈবেতি, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। মহাসমরে ঝাঁপিয়ে পড়, পিছে হটো না। মহাকাশ থেকে নক্ষত্র পতন হতে পারে, সমগ্র বিশ্ব তোমার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে তবুও তোমাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যদি সত্যি সত্যি সারা বিশ্ব অস্ত্র হাতে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবুও কি তুমি সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে পারবে? যদি তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তোমার সমস্ত সম্পদ হারাবার ভয় থাকে তবুও কি তুমি সত্যকে আঁকড়ে থাকতে পারবে? মনে রেখো, মাতৃভূমি ভারত ন্যূনপক্ষে এই রকম হাজার হাজার যুবকের আত্মদান কামনা করে।*

ভারত বিচিত্রা, মার্চ ১৯৮৮, পৃঃ ৬-৭ (পত্রিকাটি ঢাকাস্থ দূতাবাসের মাসিক মুখপত্র)

সংগ্রহ: তাপস বসু

বিঁ

বীরেশ্বর পাল

সেপ্টেম্বর মাস এলেই মনটা চঞ্চল হয়ে পড়ে। মনকে উদাস করে দেয় হিমালয়ের অপরূপ রূপের ডালি। হিমালয়ের কি দুর্নিবার আকর্ষণ ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। এবারও সেপ্টেম্বর মাসে বেরিয়ে পড়লাম হিমালয়ে—পঞ্চকেদার ভ্রমণে। সমস্ত গাড়োয়াল হিমালয় জুড়ে পঞ্চকেদারের অবস্থান। বাসপথ ছাড়া পায়ে হেঁটে ঘুরতে সময় লাগে আঠারো দিন। পঞ্চকেদার অর্থাৎ কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর। আমি অবশ্য এখন পঞ্চকেদারের ভ্রমণ-কাহিনী শোনাব না, শোনাব এই ভ্রমণ-কাহিনীর শিরোনাম বিঁউখীর কথা।

সেপ্টেম্বর মাস এলেই মনটা চঞ্চল হয়ে পড়ে। মনকে উদাস করে দেয় হিমালয়ের অপরূপ রূপের ডালি। হিমালয়ের কি দুর্নিবার আকর্ষণ ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। এবারও সেপ্টেম্বর মাসে বেরিয়ে পড়লাম হিমালয়ে—পঞ্চকেদার ভ্রমণে। সমস্ত গাড়োয়াল হিমালয় জুড়ে পঞ্চকেদারের অবস্থান। বাসপথ ছাড়া পায়ে হেঁটে ঘুরতে সময় লাগে আঠারো দিন। পঞ্চকেদার অর্থাৎ কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর। আমি অবশ্য এখন পঞ্চকেদারের ভ্রমণ-কাহিনী শোনাব না, শোনাব এই ভ্রমণ-কাহিনীর শিরোনাম বিঁউখীর কথা।

ঋষিকেশ হতে ভোর পাঁচটার বাস ধরে বিকেল চারটায় এসে পৌঁছলাম গুপ্তকাশী। গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ-মন্দির-চত্বরে আশ্রয় নিলাম। কথিত আছে, কাশীর বিশ্বনাথ এখানে গুপ্ত অবস্থান করেছিলেন। তাই এখানকার নাম গুপ্তকাশী। হিমালয় ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কত বারই এই গুপ্তকাশীর উপর দিয়ে বাসে করে চলে গেছি। কখনই এখানের বিশ্বনাথকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়নি। তাই আজ বিশ্বনাথের কোলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হলাম। গুপ্তকাশীর দৃশ্য অতি মনোহর। এখান হতে চৌখাম্বা শৃঙ্গের রূপ মনোমুগ্ধকর। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছা হয় না।

সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ মন্দিরে শাঁখ ও কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। মন্দিরে ঢুকলাম। বিশ্বনাথের অপূর্ব শৃঙ্গার-বেশ। নাগকেশর ও হিমালয়ের দুষ্প্রাপ্য ফুলে ফুলে সুসজ্জিত বিশ্বনাথ। অপূর্ব সুমিষ্ট গন্ধে মন্দির অভ্যন্তর মাতোয়ারা। কিছুক্ষণ পর সাড়ে সাতটা নাগাদ একটি ছোট্ট দোকানে রাতের আহার রুটি-তরকারি খেয়ে আশ্রয়স্থলে ফিরলাম। সারাদিনের বাসযাত্রার ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে ঘুম আসতে দেরি হল না।

এবারের পঞ্চকেদার ভ্রমণে আমার সাথী পঞ্চপাণ্ডব। অর্থাৎ আমরা পাঁচজন সঙ্গী। পঞ্চকেদার ভ্রমণে এখানেই অর্থাৎ গুপ্তকাশীতেই বাসপথের শেষ। এরপর পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে পঞ্চকেদার। প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য মালপত্র বইবার জন্য গুপ্তকাশী থেকে দুজন কুলি নেওয়া হল। নাম রামু ও নারাণ। যাত্রাপথে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

হাঁটা পথে রওনা দিলাম কালিমঠের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে কালিমঠ পাঁচ কিঃ মিঃ পথ। উতরাই পথে ছোটখাট গাছের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। মাঝে মধ্যে ঝর্ণার অপরূপ শোভা ও পাহাড়ী পাখীর ডাক পদযাত্রীর পথশ্রম ভুলিয়ে দেয়।

সকাল ন'টায় কালিমঠে পৌঁছলাম। কালিমঠ তন্ত্রপীঠ। টিনের আটচালার মধ্যে এই পীঠ। এই আটচালার মধ্যস্থলে দুই বর্গফুট পরিমাণ চারচৌকো একটি গর্ত। রূপোর কভার দেওয়া। এই অংশটিই পীঠস্থান। হিমালয় লোকগাথায় প্রচলিত—ঐ গর্তে

কি আছে তা কেউ জানে না। বছরে একদিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের শ্যামাপুজোর দিন অমাবস্যার রাত্রে পুরোহিত চোখ-বাঁধা অবস্থায় রুপোর কভার খুলে পুজো করেন এবং পুজান্তে আবার কভার পরিয়ে দেন। একবার এক পুরোহিত নাকি সাহসে ভর করে পুজো করতে গিয়েছিলেন চোখ না বেঁধে। রুপোর কভারটি খোলামাত্র তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং রক্তবমি করে মারা যান। কালিমঠে পর্বতগাত্রে কয়েকটি গুহা আছে। গুহার মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর অপূর্ব সব মূর্তি। তার মধ্যে হর-পার্বতী মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মীর মূর্তির দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। এই কালিমঠের পাশ দিয়ে খরস্রোতা কালিগঙ্গা প্রবাহিত।

সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার খেয়ে সবাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। এবার গাত্রোত্থান করতে হবে। কিন্তু আর হিমালয়ের চড়াই-উতরাই পথ ভাঙ্গতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রামু একটি প্রস্তাব দিল: "বাবু আপনারা কোটিমাহেশ্বরী ও কালিশীলা দেখবেন না?" আমাদের নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছিল কালিমঠ হয়ে পঞ্চকেদারের পথে পাড়ি দেওয়ার। কিন্তু রামুর প্রস্তাব মতো আজকের রাতটা কালিমঠে কাটালে কোটিমাহেশ্বরী ও কালিশীলা দেখে সন্ধ্যায় এখানে ফিরে আসা যায়। রামুর কথায় আমরা রাজি হয়ে গেলাম। ফলে পঞ্চকেদার ভ্রমণের আর একটা দিন বেড়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম রামুর প্রস্তাবমতো কোটিমাহেশ্বরী ও কালিশীলা দেখার আগ্রহ কারও কম নয়। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যায় ফিরে এসে আমরা এখানে রাত কাটাব। তাই আমরা শুধু মাত্র দিনের আহার্য ও পানীয় জল নিয়ে রওনা দিলাম কোটিমাহেশ্বরী ও কালিশীলা দর্শনের উদ্দেশ্যে। তখন সকাল দশটা। রামু চলল পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। নারাণ রয়ে গেল কালিমঠে বাকি মালপত্র নিয়ে।

পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ী বিছুটি মারাত্মক। গায়ে লাগলে অসম্ভব জ্বলুনী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইলেকট্রিক শকের মতো ঝনঝনিয়ে ওঠে। জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র প্রাণীর যত না ভয়, তার চেয়েও বেশি ভয় বিছুটির। তবে রেহাই আমরা পাইনি। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দুপুর গড়িয়ে গেছে। এমন সময় আমরা পৌঁছলাম কোটিমাহেশ্বরী। গুহার মধ্যে ঢুকলাম। দেবী দুর্গার পাষাণ মূর্তি। এই গভীর জঙ্গলে গুহার মধ্যে পুজারী ছাড়া আর কেউ নেই। কথিত আছে, দেবী দুর্গা এখানে কোটি অসুর বধ করেছিলেন। তাই নাম কোটিমাহেশ্বরী। গুহার মধ্যে খুব ভারি ধরনের রুপোর ও তামার বাসনপত্র রয়েছে যা দেখে তাক লেগে যায়। কিন্তু ঐরকম নির্জন পরিবেশে মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি যাওয়ার কল্পনাই করতে পারে না হিমালয়ের মানুষ।

কোটিমাহেশ্বরী দেখে এখন আমরা কালিশীলা মায়ের দর্শনে যাচ্ছি। কোটিমাহেশ্বরী একটি পাহাড়ে, অন্য একটি পাহাড়ে কালিশীলা দর্শন করতে যেতে হবে। একটি খরস্রোতা নদী পার হয়ে অপর পাহাড়ে যেতে হবে। আমরা যদি নদী পার না হই তাহলে রাস্তা ঘুরে যেতে হলে আজ আর কালিশীলা পৌঁছানো সম্ভব হবে না। তাই নদী পারাপার হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। নদীটি অত্যন্ত খরস্রোতা। ভয় হচ্ছে জলে নামতে, যদিও জলের গভীরতা তেমন নয়। রামু দড়ি বার করল। প্রয়োজন হতে পারে জেনেই রামুর দড়ি আনতে ভুল হয়নি। আমরা সবাই এক দড়িতে বাঁধা পড়লাম। খুব সাবধানে নামলাম নদীর জলে। এখন আর জলে ভেসে যাওয়ার ভয় রইল না। অসাবধানতাবশতঃ জলে কেউ পড়ে গেলেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। রামু দড়ির অগ্রভাগে। বাকি আমরা পাঁচজন রামুর পিছু পিছু লাঠির সাহায্যে নদী পার হলাম। নদী পার হওয়ার দুর্ভোগ কাটল। নদীর পারে পাহাড়ের কোলে একটু বিশ্রাম নিয়ে—সঙ্গে নিয়ে আসা কিছু শুকনো খাবার খেয়ে আবার চড়াই পথে হাঁটা শুরু করলাম। একটানা চড়াই পথ ভেঙ্গে চলেছি। চির ও পাইন গাছের হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ ও অজানা এক মিষ্টি মধুর গন্ধে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

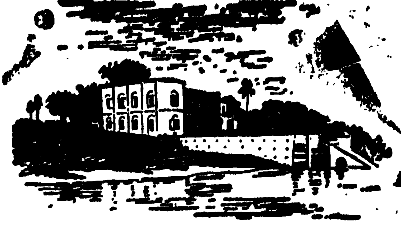
বৈকাল পাঁচটায় এসে পৌছলাম ছোট্ট একটি গ্রামে। ২০/২৫ ঘর লোকবসতি নিয়ে এই গ্রাম। গ্রামের নাম বি'উধী। গ্রামের সব ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় জমল আমাদের দেখতে। আমাদের প্রত্যেকের

কাছে কিছু লজেন্স ছিল। বাচ্চাগুলি লজেন্স পেয়ে খুব খুশি। দেখতে দেখতে গ্রামের কিছু বয়স্ক পুরুষ-মহিলাও আমাদের দেখে জড় হল। তাদেরই কেউ একটা ঘরের দাওয়ায় কম্বল বিছিয়ে দিল। ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা নিয়ে বিশ্রাম নিতে মন্দ লাগছে না। মনেই হচ্ছে না যে এখনই আমাদের আবার হাঁটা শুরু করতে হবে। পিপাসা মেটাতে জল চেয়েছি। এক বর্ষীয়ান মহিলা একটি বড় তামার পাত্রে ঝর্ণার জল এনে দিল। পিপাসা মিটল। এবার গাত্রোত্থানের পালা। কিন্তু খিদেয় পেটে জাঁতা পাক দিচ্ছে। সঙ্গের খাবারও শেষ। এ-অবস্থায় আবার চড়াই-উতরাই শুরু হবে। ভেবে যেন গায়ে জ্বর আসছে। উঠতে যাচ্ছি। এমন সময় গ্রামের মেয়েরা পাত্র হাতে উপস্থিত। কেউ এনেছে ঘোল, কেউ মাঠা, কেউবা এনেছে রুটি। ঘোল মাঠা সহযোগে রুটি খেয়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম। বড় স্পর্শ করল গ্রামবাসীদের আতিথেয়তা। আমাদের খাইয়ে গ্রামের মেয়েরা ততোধিক খুশি। তাঁদের আনন্দের যেন সীমা নেই। গ্রামের মোড়লের সাথে কয়েকজন গ্রামবাসী—আমাদের কাছে এসে বসল। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। আমরা কোথায় যাব—কেনই বা এখানে এসেছি ইত্যাদি। আমরা উত্তর দিলাম—হিমালয়ে পঞ্চকেদার ভ্রমণে এসেছি। ভ্রমণের পথে কোটিমাহেশ্বরী ও কালিশীলা দর্শন করে আমরা রাতের আশ্রয় কালিমঠে ফিরে যাব। সেখানেই আমরা আজ রাতে ফিরে যাব। আমাদের কথা শুনে মোড়ল হতবাক্। ফ্যালফেলিয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল : "আজ কালিশীলা পৌঁছানো অসম্ভব। সন্ধ্যারও দেরি নেই। সুতরাং কালিশীলা দেখে আপনাদের রাতের আশ্রয় কালিমঠে আজ ফিরে যেতেও পারবেন না।" আমরা সকলেই একবার রামুর মুখের দিকে তাকিয়ে নিলাম। রামু নির্বিকার। গ্রামবাসীর একান্ত অনুরোধ যেন আজকের রাতটা এই গ্রামেই কাটিয়ে যাই। এই কথায় গুরুত্ব না দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। আতিথেয়তা ও গ্রামবাসীদের সাথে গল্প করে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কালিশীলা যাওয়া মন থেকে বাদ দিয়ে রাতের আশ্রয় কালিমঠে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। তাই গ্রামবাসীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা দিলাম। গ্রামবাসীরা মোটেই খুশি নয়। যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় ততক্ষণ তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের এমন আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করে চলে আসায় মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বার বার এই গ্রামের মানুষগুলোর কথা মনে হচ্ছিল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক আমরা হেঁটেছি। সূর্যালোক ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। যতই তাড়াতাড়ি হাঁটি না কেন—এখন বেশ বুঝতে পারছি গন্তব্যস্থল কালিমঠে ফিরে যেতে পারব না। বার বার মনে হচ্ছে গ্রামবাসীদের কথা। কেন উপেক্ষা করে চলে এলাম। হেঁটেই চলেছি। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে। পথের ধারে পড়ল একটা পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটির। আর এগুবার সাহস কারও নেই। আর এগুলে অন্ধকারে খাদে পড়ে মৃত্যু নিশ্চিত। কুটিরটির আবার ছাউনি বলতে কিছুই নেই। শুধুমাত্র পাথরের দেওয়ালগুলো খাড়া হয়ে আছে। সকলের রাগ গিয়ে পড়ল রামুর উপর। কারণ রামুর কথামতোই এ-পথে পাড়ি দিয়েছি। কিন্তু রামু কি করবে? রামুর ধারণা অনুযায়ী আমরা হাঁটতে পারিনি। রামু পাহাড়ী ছেলে। তার পক্ষে এ-পথ অতিক্রম করা কিছুই নয়। আমরা যে এ-পথ একদিনে অতিক্রম করতে পারব না সেটা রামু মোটেই চিন্তা করতে পারেনি। রামু মুখ নিচু করে আমাদের ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা সব হজম করল। দেখতে দেখতে রাতের ঘন অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এখন উপায়? কনকনে ঠাণ্ডায় হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে। এখনই শীতে জড়সড়। দাঁতে-দাঁত লাগছে। সমস্ত রাতটা এখনও বাকি। কি হবে? এই ভীষণ ঠাণ্ডার রাত কাটাবার মতো গরম জামা-কাপড়ও সঙ্গে আনিনি। পেটের ক্ষুধা সহ্য করে থাকা যায়। কিন্তু ঠাণ্ডার অসহ্য কন্‌কনানি তো সহ্য হয় না। এখনই প্রাণ ওষ্ঠাগত। বারে বারে গ্রামবাসীদের কথা মনে হচ্ছে। কেন তাদের আন্তরিক আতিথেয়তাকে উপেক্ষা করে চলে এলাম। গ্রামের মোড়ল ঠিকই বলেছিল যে, আমরা পৌঁছতে পারব না। এখন বাঁচার তাগিদে গ্রামে ফিরেই বা যাব কি করে?

এই ঘন অন্ধকারে পাহাড়ী পথে গ্রামে ফিরে যেতে গিয়ে খাদে পড়ে শেষ হয়ে যাব। কারও মুখে কোন কথা নেই। কঠিন ঠান্ডায় সকলেই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে জড়সড় হয়ে বসে আছি। হঠাৎ নজরে পড়ল দূরে একটা আলো। আলোটা ক্রমশঃ আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই মশাল হাতে চারজন লোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কি জানি কোন দস্যুর খপ্পরে পড়লাম কিনা। মোড়লের গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম গ্রামবাসীরাই আমাদের কাছে এসেছে। হাঁটু হতে মুখ তুলে মোড়লের মুখের দিকে করুণা ভিক্ষার চাহনিতে তাকিয়ে আছি। মোড়ল বলল ঃ "আপনাদের খুঁজতেই আমরা এসেছি। আমরা জানতাম যে আপনারা গন্তব্যস্থলে পেঁছিতে পারবেন না। পথে নিশ্চয়ই আটকে পড়বেন এবং বিপদে পড়বেন। আপনাদের সাহায্য করতেই আমরা এগিয়ে এসেছি। এখন আপনারা আমাদের সাথে গ্রামে ফিরে চলুন।" ঠান্ডায় আমাদের হাত-পা কাঁপছে। বাঁচার তাগিদে গ্রামে ফিরে যাব না এমন কথা আর মুখ দিয়ে বেরুবে না। তথাপি এই রাত্রে হাঁটার মতো পরিস্থিতি আমাদের নেই। দিনের আলোয় গ্রাম থেকে এখান পর্যন্ত আমরা এক ঘন্টায় এসেছি। এখন এক ঘন্টা তো দূরের কথা—এই অবস্থায় সারা রাত্রেও গ্রামে ফিরে যেতে পারব কিনা সন্দেহ। শীতের কাঁপুনিতে আমাদের কাহিল অবস্থা দেখে মোড়ল বলল ঃ "আপনারা কিছু চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।" আমাদের সাথী রামুকে নিয়ে তারা গ্রামে ফিরে গেল। রামু ফিরে না আসা অবধি আমরা অসহায় বোধ করছি। প্রায় এক ঘন্টা বাদে গ্রামের মোড়ল বেশ কিছু লোকজন নিয়ে ও আমাদের রামুকে নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে এনেছে রাত্রে আহারের উপকরণাদি—চাল, ডাল, ঘি, সব্জি, কাঠ ও রান্নার বাসনপত্র। রাত্রে কঠিন শীতে রক্ষা পাবার জন্যে উপযুক্ত সংখ্যক কম্বল ও লেপ। গ্রামবাসীরা নিঃসন্দেহে গরিব। তাদের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ লেপ, কম্বল আছে বলে মনে হয় না। তথাপি তারা নিজেরা কষ্ট পেয়েও আমাদের জন্যে লেপ, কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল। রামু রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে এক পাকে খিচুড়ি তৈরি হয়ে গেল। ক্ষিদেও পেয়েছে দারুণ। ক্ষিদের জ্বালায় খিচুড়ির স্বাদ যেন অমৃতের মতো লাগল। এখন ঠান্ডার হাত হতে রেহাই পেলেই বাঁচি। ছাদবিহীন জীর্ণ কুটিরে কম্বল ও লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মোড়ল লোকজন নিয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

রাত পোহালেই মোড়ল লোকজন নিয়ে এসে হাজির। তাদের ডাকে ঘুম ভাঙল কিন্তু কনকনে ঠান্ডায় লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মোড়ল আমাদের দেখে নিশ্চিন্ত। এরপর বিদায় নেবার পালা। কি বলে যে মোড়ল ও গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতা জানাব তার ভাষা আমাদের জানা নেই। যে ঘোর বিপাকে পড়েছিলাম গ্রামবাসীদের দয়ায় তা থেকে এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মোড়লের হাতে একশ টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু বহু অনুরোধ করেও এই টাকাটা মোড়লের হাতে দিতে পারিনি। পরন্তু মোড়লের কথা শুনে আরও অবাক হলাম ঃ "আপনারা আমাদের মেহমান—দেবতাস্বরূপ। এই অবস্থায় যদি আপনাদের আমরা না দেখতাম তাহলে আমাদের গ্রামের অমঙ্গল হত।" এরা অত্যন্ত গরিব। কিন্তু অন্তঃকরণ এদের কত মহৎ! হিমালয়ের মতো উদার এদের হৃদয়। দেবতাত্মা হিমালয়ের কোলে বেড়াতে এসে নতুন দেবতাদের দর্শন পেলাম। অখ্যাত সেই গ্রাম বিঁউখী আর তার মানুষ আমাদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য একটা স্থান করে রইল। আসার সময় মোড়ল বলল ঃ "দেখবেন কিছু ফেলে গেলেন না তো?" আমরা বললাম ঃ "হ্যাঁ, ফেলে গেলাম। আমাদের হৃদয়টা বিঁউখীতে—তোমাদের কাছে—ফেলে রেখে যাচ্ছি।"



অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

রামদাস নামক পূর্ববঙ্গীয় জনৈক ব্রাহ্মণ ইংরেজী ও সংস্কৃতভাষায় মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বহুদিন গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি পেনসন পাইয়া নিশ্চিন্তমনে হিন্দুধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহ যেন সদাচারের লীলাভূমি, অতিথিজনের পান্থশালা ও দীনদুঃখীর পিত্রালয় বলিয়া অনুমিত হইত। রামদাস কপটতার ধার ধারিতেন না; স্পষ্টবক্তা বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার গৃহিণী যেন সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী, দয়ার প্রতিমূর্তি, স্বামীভক্তির সর্বোচ্চ আদর্শস্থানীয়া। রামদাসের বদান্যতা, সহৃদয়তা, মিষ্টালাপ, অতিথি-সৎকার ও ভগবদ্‌ভক্তি দেখিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমীর আদর্শ বলিয়া অনুমান করিতেন। হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া রামদাস বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

স্বীয় গুরু, পুরোহিত, তিন চারিটা গ্রামিক বন্ধু ও স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া তীর্থদর্শন উপলক্ষে একদা তিনি বারাণসী যাত্রা করেন। চিরকাশীবাসী হইবার জন্য তিনি একবার তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন কিনা আমরা অবগত নহি; তবে যাত্রাকালে স্বীয় সুযোগ্য পুত্রকে সংসারের বিষয়-সম্পত্তি বুঝাইয়া দিতেছিলেন দেখিয়া গ্রামিকলোক মনে করিয়াছিল, রামদাস আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না।

যথাকালে বারাণসী উপস্থিত হইয়া রামদাস দশাশ্বমেধ ঘাটের অনতিদূরে বাঙ্গালিটোলায় বাসা লইয়াছিলেন। অর্ধচন্দ্রাকৃতি সুরধুনীর অনুপম শোভা, বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণচূড় মন্দির, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকা দর্শন করিয়া রামদাস মধ্যে মধ্যে নির্জনে অশ্রু বিসর্জন করিতেন। প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া রামদাস সকলকেই নারায়ণ-জ্ঞানে অভিবাদন করিতেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিয়া দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া রামদাস দুই ঘণ্টাকাল জপধ্যানে নিরত থাকিতেন।

একদিন রামদাস জপধ্যান-সমাপনান্তে গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় অমিততেজা কোন এক যুবক সন্ন্যাসীকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন; সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় দীপ্তি, চক্ষুতে উদাসীনতা, হৃদয়ে নির্ভীকতা ও প্রশান্তি অবলোকন করিয়া রামদাস পথপ্রান্তে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, প্রভো! অনেক ভাগ্যবশে আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শনলাভ আজ ঘটিল। অনুগ্রহ করিয়া যদি এ-দাসের অবস্থান-গৃহ একবার পবিত্র করেন, আমি কৃতার্থ হই। দেখিয়া বোধ হইল, যেন সন্ন্যাসীটি পথশ্রমে পরিশ্রান্ত, অনশনে ক্লান্ত-মুখ; তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। রামদাসের ভক্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে চলিলেন; কিন্তু বলিলেন, ভিক্ষাগ্রহণান্তে পুনরায় তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাত্রিযাপন করিবেন।

রামদাস গৃহে সমাগত হইয়া পাদ্যাদিদানে সন্ন্যাসীকে যথাবিধি পূজা করতঃ গৃহিণীকে সাধু-সেবার আয়োজন করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার ফল-মূল ও মিষ্টাদি দ্রব্যে সন্ন্যাসীকে জলযোগ করানো হইল। অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ করিবেন বলিয়া, পরে তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর নামধাম জিজ্ঞাসা করিতে নাই, একথা রামদাস অবগত ছিলেন। সুতরাং কি উপায়ে ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন, রামদাস প্রথমতঃ তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে সেইজন্য প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভৌতিক দেহ কোন্ দেশের পবিত্র মৃত্তিকায় গঠিত হইয়াছিল?" সন্ন্যাসী প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "কলিকাতার নিকটবর্তী পাণি-হাটীর"। রামদাস তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী অবগত হইয়া যেন একটু সাহস পাইলেন; বলিলেন, আমিও বঙ্গদেশী; তবে একটু পূর্বদেশীয় 'বাঙ্গাল'। সন্ন্যাসী রামদাসের সরলতা দেখিয়া একটু অস্ফুট হাস্য করিলেন। স্বদেশীয় লোকের নিকট যেমন অসঙ্কুচিত চিত্তে কথা বলিতে পারা যায়, ভিন্নদেশীয় লোকের নিকট তেমনটি হয় না। তাই নবাগত সন্ন্যাসীকে সাহস করিয়া এবার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহার নাম ধীরানন্দ।

রামদাস ও ধীরানন্দের যে কথোপকথন হইতেছিল, রামদাসের সহযাত্রী জনৈক গ্রামবাসীর নিকট তাহা অবগত হইয়া পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

রামদাস। মহাশয়, সন্ন্যাসীর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, শাস্ত্রমুখে ইহা অবগত হইয়াও আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ধীরানন্দ। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু আপনাকে সাবহিত করিয়া দিতেছি; সন্ন্যাসীকে কখনও আর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিবেন না। অভ্যাগত অতিথি কি সন্ন্যাসীর সেবা হইয়াছে কিনা, গৃহস্থের ইহাই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

রামদাস। যদি অভয় দেন, তবে দুই একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি; ইহাতে আমার বড় উপকার হইবে; পরহিতকল্পেই আপনাদের বাক্য-স্ফূর্তি হয়।

ধীরানন্দ। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

রামদাস। আপনার নবীন বয়স, শরীর সুগঠিত, অথচ আকৃতি প্রতিভাব্যঞ্জক, অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং জ্ঞানী। আপনি তো সংসারাশ্রমের যুদ্ধে বেশ সফল হইতে পারিতেন। এ অবস্থায় গৃহধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন কেন? সত্য কি তবে, গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম লাভ হয় না?

ধীরানন্দ। গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা পরাভক্তি লাভ করা অতীব সুকঠিন। চতুর্দিকে প্রলোভনের জিনিস, কামকাঞ্চনের লেলীহমতী জিহ্বা বিজ্ঞ গৃহস্থকেও ভীতি দেখায় এবং অবশেষে হয় তো বিনাশ সাধনও করিতে পারে।

রামদাস। সন্ন্যাসী হইলেই কি কামকাঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

ধীরানন্দ। প্রলোভনের জিনিস হইতে দূরে অবস্থান করিলে, শীঘ্র কি কামকাঞ্চনে প্রলুব্ধ হইতে পারে?

রামদাস। সন্ন্যাসীকেও প্রতিনিয়তই গৃহস্থের সঙ্গ করিতে হয়। পরন্তু কামকাঞ্চনের রাজ্য কোথায় নাই?—বিশ্বামিত্র ঘোর অরণ্যে অবস্থান করিয়াও শকুন্তলার জন্মদাতা হইয়াছিলেন।

ধীরানন্দ। আপনি যাহা বলিলেন সত্য বটে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রলোভনের ও পতনের যত সম্ভাবনা, সন্ন্যাসাশ্রমে তত নয়।

রামদাস। সে কথা আমি তো স্বীকার করি। কিন্তু কেহ এরূপ তর্ক করেন যে, প্রকৃত ত্যাগ মনের; গীতাও বলিয়াছেন "কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ"; কাম্য কর্মের ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তাঁহাদের বিবেচনায় গৃহে থাকিয়াও তাহা সাধিত হইতে পারে। জনকাদি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

ধীরানন্দ। জনক হওয়া কি সহজ কথা। অনেক তপশ্চর্যা করিলে 'জনক' হওয়া যায়। 'জনক' অর্থে

তো আমরা 'পরমহংস' বুঝি। পরমহংস হওয়া কি মুখের কথা! অনেক সাধনার পর আগে পরমহংস হউন; তবে 'জনক' উপাধি লইবেন। কেবল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলে কি ত্যাগী হইতে পারে? ত্যাগী পুরুষের প্রকৃতিই পৃথক্। জনক ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী অন্য কোন গৃহস্থের নাম অবগত হইয়াছেন কি?

রামদাস। আচ্ছা,—স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়া প্রতিবারেই গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বন কেন করিয়াছিলেন?

ধীরানন্দ। ভগবানের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানবের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না। আরও, বুদ্ধ-গৌরাঙ্গাবতারে তো তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

রামদাস। আচ্ছা,—প্রথমাবস্থায় সকলেই গৃহী, তৎপর সন্ন্যাস; ইহাই তো ধর্মের ক্রমনিয়ম ও শাস্ত্রানুমোদিত?

ধীরানন্দ। তীব্র বিবেকীর পক্ষে দৃষ্টান্তও প্রযুজ্য নয়, শাস্ত্রানুশাসনও প্রযুজ্য নয়। তাঁহার বিধি-নিষেধ নাই। সাধারণ লোকের ক্রমোন্নতি পন্থা। তীব্র বৈরাগ্যবানের এক লম্ফেই সাগর পার। এই শ্রেণীর লোকই ব্রহ্মচর্যাবস্থা হইতে একেবারে সন্ন্যাস লয়েন। শাস্ত্রেও তাহার বিধান আছে। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" শ্রুতিও সেমত সমর্থন করিতেছেন।

রামদাস। তবে মন্বাদি শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে না। ব্রহ্মচর্যাদির পর গৃহধর্ম; তৎপর বানপ্রস্থ তার পর সন্ন্যাস। ইহাই তো শাস্ত্রাদিষ্ট পন্থা। জীবনের অন্তকালেই সন্ন্যাস অবলম্বনীয়।

ধীরানন্দ। এ সকল নিয়ম নিম্নাধিকারীর পক্ষে। মন্বাদি শাস্ত্র বেদের পরে রচিত; ইহা সত্য হইলেই শ্রুতিমতে "যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনি সন্ন্যাস লইবে" একথার সার্থকতা থাকে। সন্ন্যাস অবলম্বনের কালাকাল নাই; জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত কাল জানিবে। আর ভারতবর্ষে বর্তমানকালে দুইটি মাত্র আশ্রম দৃষ্ট হয়। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাশ্রম। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্যের প্রচলন দৃষ্ট হয় না। আর, হয় গৃহী নয় সন্ন্যাসী এই দুয়ের একেতর অবলম্বন করাই বর্তমান যুগে এক্ষণে ধর্ম বা জ্ঞানলাভের উপায়।

রামদাস। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম এক্ষণে ভারতবর্ষে চতুরাশ্রমের বিধান নাই। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য এই দুইয়ের একেতর অবলম্বন ধর্মলাভের উপায় হইলেও, গৃহস্থের জ্ঞান হইবে না, একথা আপনি বলিতে পারিবেন না।

ধীরানন্দ। আমি অবশ্য সেকথা বলিতে পারি না। তবে গৃহস্থের জ্ঞান হওয়া বর্তমান কালে বড়ই দুরূহ।

রামদাস। সন্ন্যাসীর পক্ষেও সে কথা। আজকাল কত গেরুয়াধারী দেখা যায়; বলুন দেখি, কয় জনের জ্ঞান হইয়া থাকে?

ধীরানন্দ। যদি কাহাদেরও ভিতরে বেশি জ্ঞান হইয়া থাকে; তবে সন্ন্যাসীদের মধ্যেই হয়। গৃহস্থ-দের মধ্যে যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। তবে, যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণতঃ নীচসংসর্গ, কুটিলতা, স্বার্থপরতা ও পরদোষান্বেষণই গৃহীদের প্রধান সাধন।

রামদাস। তেমন, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর মধ্যেও ঘোরতর ভণ্ডামি ও মূর্খতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে, তাহাদের বাহ্যিক ত্যাগব্রত গৃহস্থের শিক্ষার বিষয় বটে, এই মাত্র যা উপকার।

ধীরানন্দ। যে সকল সন্ন্যাসী ভণ্ড বা মূর্খ, তাহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে। কেন?—ভাল সন্ন্যাসী, ভাল সাধু কি কখনও কোথাও দেখ নাই?—এত তো বেড়ালেন।

রামদাস। হাঁ, তা বটে। তবে যে সকল গৃহী কুটিল স্বার্থপর ও পরদোষান্বেষী তাহারাও প্রকৃত গৃহী নহে। গৃহীদের মধ্যেও অনেকে ভাল আছেন।

ধীরানন্দ। তার সন্দেহ কি? কিন্তু দেখুন, ত্যাগ না হইলে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ না করিলে, অপরোক্ষানুভূতি বা সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

রামদাস। সন্ন্যাস অর্থ যদি গেরুয়া কাপড় পরা হয়, তবে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারি না। মনুও বলিয়াছেন, "ন লিঙ্গং ধর্ম-কারণং"। আর সন্ন্যাস অর্থ যদি বাসনাত্যাগ হয়, তবে গৃহীও সে সাধনার অধিকারী।

ধীরানন্দ। লিঙ্গ (অর্থাৎ ত্যাগের কোনও রূপ চিহ্ন) ধারণ করিলে অনেকে ত্যাগের পথে বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন, "তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ"। অলিঙ্গ বা সন্ন্যাসের কিছু চিহ্ন-রহিত তপস্যায় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং

লিঙ্গধারণেরও আবশ্যকতা আছে। মনু হইতে বেদের প্রমাণ অধিক।

রামদাস। বেদে ইহাও আছে—"বিদ্বান্ লিঙ্গ-বিবর্জিতঃ"। আমার মতে বাসনাত্যাগই সন্ন্যাস। তা গৃহে থাকিয়াও হইতে পারে। শিহ্লোন মিশ্রও বলিয়াছেন, "গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ" "নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং"। গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপস্যা করা যাইতে পারে। নিবৃত্তবাসনা-লোকের পক্ষে গৃহই তপোবন।

ধীরানন্দ। 'বিদ্বান' মানে—যাঁর জ্ঞান হইয়াছে। জ্ঞান হইলে তো সন্ন্যাসাশ্রমেরও পারে যাওয়া হইল। তখন আর 'লিঙ্গ'-ই বা কি, আর 'অলিঙ্গ'-ই বা কি? সন্ন্যাসের প্রথমাবস্থায় লিঙ্গাদি বড়ই উপকার দেয়। আর দেখুন, কামকাঞ্চনের ঘরে বাস করিয়া নিবৃত্তি-পথে যাওয়া সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। কালো ঘরে থাকিলে কোন সময়ে বঁদ লাগিবেই লাগিবে।

রামদাস। সাবধানীর কাছে অসম্ভব কিছুই নাই। অনেক গৃহীও সন্ন্যাসীর অনুকরণীয় আছেন।

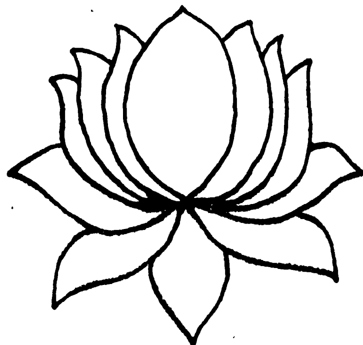
ধীরানন্দ। যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে আমরা নমস্কার করি। তাঁহারা যে প্রকৃত বীর সাধক, সে-কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

রামদাস। সন্ন্যাসীর মধ্যে তো যাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞানী, তাঁহারা আমাদের আদর্শ। কিন্তু নামমাত্র সন্ন্যাসী, ভণ্ডগেরুয়াধারী, আমাদের গৃহী অপেক্ষাও অধম। আর দেখুন,—বেদের উপনিষদ্ ভাগের বক্তা অনেকেই ক্ষত্রিয় রাজা। পুরাণপ্রণেতা বেদব্যাস গৃহী ছিলেন। মন্বাদিধর্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণও গৃহী ছিলেন। তবে আমি একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি যে, সন্ন্যাসীরাই হিন্দুধর্মশাস্ত্রের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছেন।

ধীরানন্দ। গৃহস্থ যদি ঠিক্ ঠিক্ গৃহধর্ম পালন করিতে পারেন, তবে তাঁহার জ্ঞান হইতে না পারে এমন নয়। কিন্তু তাহা বড়ই কঠিন। লক্ষ গৃহস্থের মধ্যে যদি একটি প্রকৃত গৃহস্থরূপে উতরাইয়া যায় তো ঢের; কিন্তু লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে কমবেশি একশটা সাধু নিশ্চয়ই উতরাইবে।

এইরূপে রামদাস ও ধীরানন্দ কথোপকথন করিতেছিলেন। রামদাসের গ্রামবাসী সহযাত্রী তাঁহাদের কথা শুনিতে শুনিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং উভয়ের কথোপকথন আমরা এই পর্যন্তই জানিতে পারিয়াছি।*

উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, পৃঃ ৩৫১—৩৫৬



মাসরুম

প্রশান্তকুমার পণ্ডিত

'মাসরুম' হলো একধরনের ছত্রাক। মাসরুম সাধারণতঃ ছাতার মতো দেখতে হয়। একটি লম্বা দন্ড ও ছত্রাবৃতির অংশ দিয়ে তৈরি। এছাড়াও অন্যান্য আকৃতির দু-এক প্রকার মাসরুম প্রজাতি আছে। মাসরুম বা ছত্রাকের ভূমিকা জীবজগতে অনস্বীকার্য—উপকারী ও অপকারী উভয় দিক থেকেই। যে-সমস্ত ছত্রাক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ও বিষাক্ত নয়, তাদেরকে বলা হয় 'মাসরুম' (Mushroom) এবং যে-সমস্ত ছত্রাক বিষাক্ত ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না তাদেরকে বলে টোডস্টুল (Toadstool)। মাসরুমকে মানুষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই (ঋগ্বেদের আমল থেকে) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে আসছে আর খাদ্যমূল্য সঠিকভাবে না জেনে শুধুমাত্র সুস্বাদু হওয়ার জন্য। বহু প্রাচীন গ্রন্থেও মাসরুম খাবার উল্লেখ আছে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য হিসাবে। মাসরুম বিশেষ ঋতুতে বিশেষ জায়গায় এমনিই জন্মায়। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকালে পচা খড়ের উপর একধরনের ছত্রাক জন্মায় স্থানীয় ভাষায় একে 'পোয়াল ছাতু' বলা হয়। ঝাড়গ্রামের শালবনে একধরনের লম্বা দাঁতওয়ালা ছত্রাক পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ ছত্রাক খায় এবং বাজারেও বিক্রি করে। পোয়ালছাতুর বৈজ্ঞানিক নাম হল ভলভ্যারিয়েল্লা (volvariella) প্রজাতি ও ঝাড়গ্রামের ঐ ছত্রাকের নাম হল টার্মিটোমাইসেস্ (Termitomyces) প্রজাতি। আরও দু-এক প্রকার প্রজাতির ছত্রাক পাওয়া যায় যা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আগেকার দিনে মাসরুম নিয়ে কোন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা হয়নি। অনেকে না জেনে বিষাক্ত ছত্রাক খেয়ে মৃত্যুবরণ করে প্রমাণ করে গেছে ঐ সমস্ত ছত্রাক বিষাক্ত। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী যেমন ভালুক, হরিণ এবং গৃহপালিত পশুরাও মাসরুমকে ও অন্যান্য ছত্রাককে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। বর্তমানে মাসরুম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা হয়।

মাসরুমের খাদ্যমূল্য

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য মুখ্য তিনপ্রকার খাদ্যের প্রয়োজন হয় যেমন প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। এছাড়া আরো তিন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন হয় যেমন জল, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। প্রথম তিনপ্রকার খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও শক্তি উৎপাদনে সহায়ক, তাই তাদের দেহ-পরিপোষক খাদ্য বলে। শেষোক্ত তিন প্রকার খাদ্য দেহকে রোগ-সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই তাদেরকে দেহ-সংরক্ষক খাদ্য বলে। মাসরুমের মধ্যে উপরোক্ত সব খাদ্যগুণ কমবেশি বর্তমান। প্রোটিনের দিক থেকে দেখতে গেলে মাসরুম যে-কোন সব্জি অপেক্ষা প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং তা প্রায় মাংসের সমতুল্য। মানুষের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যে নয়টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের দরকার তার সবকটি মাসরুমের মধ্যে বিদ্যমান। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য-উপাদান মাসরুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐ কার্বোহাইড্রেট মানুষের কাজে লাগে এমন ধরনের বিভিন্ন প্রকার শর্করা দ্বারা গঠিত। ফ্যাট জাতীয় খাদ্যগুণও মাসরুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। শুকনো মাসরুমের ওজনের শতকরা গড়ে ২ থেকে ৮ ভাগ ফ্যাট জাতীয় ও ৪ থেকে প্রায় ৪০ ভাগ প্রোটিন। বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন যেমন ভিটামিন B, C, D ইত্যাদিও কমবেশি মাসরুমে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ না করলেই নয় যে, সব মাসরুমই ভিটামিন A বিহীন। বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস কমবেশি থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রোটিন খাদ্য-ঘাটতিপূরণে মাসরুমের একটা বিরাট ভূমিকা আছে এবং ঐ প্রোটিন খাদ্যের ঘাটতি

আমাদের উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য দেশগুলিতে একটি বিরাট সমস্যা। এ-সমস্যার আশু সমাধান একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার বিরাট একটা অংশ অপুষ্টিতে ভোগে। মাসরুমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে এর হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যগুণ থাকার জন্য পশ্চিমী দেশগুলিতে হোটেলে ও রেস্টুরেন্টে মাসরুমকে দৈনিক অত্যাবশ্যক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এজন্যে রীতিমতো মাসরুম-শিল্প গড়ে উঠেছে ঐসব দেশগুলিতে।

কিভাবে বিষাক্ত ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত ছত্রাকদের চেনা যায়

বিষাক্ত ও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত ছত্রাকদের চেনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, বিষাক্ত ছত্রাক খেলে মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। মাসরুম সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণার আগে পর্যন্ত নিম্নলিখিত ধর্মগুলির উপর ভিত্তি করে (যেগুলি সম্পূর্ণ চাক্ষুষ পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল) বিষাক্ত ছত্রাকদের আলাদা করা হত। যেমন—

আঁশ (scale) এর উপস্থিতি
ফাঁপা দন্ড
রঙচঙে মাসরুম
ভলভার (দন্ড ঘিরে একধরনের ছোট্ট আবরণী) উপস্থিতি
দুধের মতো তরুক্ষীরের উপস্থিতি
দন্ড ও ছাতার উপর বিশেষ কোন কারুকার্য
সিলভার চামচের পরীক্ষা

কিন্তু অত্যন্ত সুখের ব্যাপার এই যে, উপরোক্ত ধর্মগুলি আর এখন বিষাক্তের আওতায় পড়ে না। কারণ, কতকগুলি মাসরুমে আঁশ থাকা সত্ত্বেও খাওয়া হয়, যেমন অ্যামানিটা হোমিবাফা। টারমিটোমাইসিস প্রজাতি যা ঝাড়গ্রামের বনে এমনিতেই পাওয়া যায়, তা বিশাল দন্ডযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিষাক্ত নয় ও খেতে বেশ সুস্বাদু। বিভিন্ন প্রকার রঙচঙে মাসরুমও বর্তমানে খাওয়া হয়। ভলভ্যারিয়েল্লা প্রজাতিতে ভলভা (volva) থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশেই এর চাষ করা হচ্ছে। আবার কিছু মাসরুম প্রজাতিতে তরুক্ষীর ও বিশেষ কারুকার্য থাকা সত্ত্বেও খাওয়া হয়। যেমন, অ্যামানিটা প্রজাতি ও ল্যাকটেরিয়াম প্রজাতি। সবশেষে আসা যাক সিলভার চামচের পরীক্ষায়। রাঁধবার সময় সিলভারের চামচ ব্যবহার করলে যদি তার রং কালো হয়ে যায় তাহলে মনে করা হতো ঐ মাসরুম বিষাক্ত। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষার সাহায্যে জানা গেছে যে, মাসরুমের মধ্যে জারণ ধর্মী (oxidising) উৎসেচক থাকার জন্য সিলভার চামচের রং কালো হয়ে যায়—বিষাক্ত পদার্থ থাকার জন্য নয়। বর্তমানে মাসরুম-এর বিষক্রিয়া, উৎসেচক, অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ গবেষণাগারে বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষার পরই ঘোষণা করা হয় কোন্ মাসরুম বিষাক্ত ও কোন্ মাসরুম অবিষাক্ত।

পশ্চিমবঙ্গে মাসরুম চাষ

ভারতবর্ষের মানুষ মাসরুমকে সেই সুদূর ঋগ্বেদের আমল থেকেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। তথাপি প্রচন্ড পরিতাপের বিষয় এই যে, যদিও মাসরুম উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ প্রোটিন খাদ্যের ঘাটতিতে ভোগে তবুও অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি অপেক্ষা মাসরুম চাষ ও মাসরুমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণে আমরা অনেক অনেক পিছিয়ে। মাসরুম এমনই এক প্রোটিনযুক্ত খাদ্য যা সকলেই খেতে পারে। নিরামিষাশীরা মাসরুম খেতে পারে প্রোটিন খাদ্য হিসাবে। আমাদের দেশে কতকগুলি বিশেষ ঋতুতে এমনিতে জন্মানো মাসরুমই শুধু খাওয়া হয়। কোন উন্নত বিজ্ঞানসম্মত ফার্ম এখনও গড়ে ওঠেনি যেখানে সব ঋতুতে, সব তাপমাত্রায় মাসরুমের চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সম্ভব। অথচ পাশ্চাত্য এমনকি প্রাচ্যের বহু উন্নয়নশীল দেশে আজকাল উন্নতমানের মাসরুম-শিল্প গড়ে উঠেছে সরকারি উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে-সমস্ত গবেষণাগারে মাসরুম চাষ সম্পর্কে গবেষণা হয় তা হল:

(ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগের মাইকোলজি এ্যান্ড প্ল্যান্ট প্যাথোলজি শাখায় যথাক্রমে ডঃ এন. সমাজপতি ও ডঃ আর. পি.

পুরস্কারশ্রেষ্ঠের তত্ত্বাবধানে। এ-দুটি গবেষণাগারে আন্তর্জাতিক মানের বহু কাজকর্ম হয়েছে ও বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রশংসিত হয়েছে।

(খ) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যান্ট প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি।

(গ) চুঁচুড়া রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চুঁচড়া, হুগলী।

(ঘ) কালিম্পং সীড ফার্ম, কালিম্পং, দার্জিলিং।

(ঙ) ফুড টেকনোলজি ল্যাবরেটরি, যাদবপুর, কলকাতা।

উপরিউক্ত গবেষণাগারগুলি ছাড়াও শ্যামনগর (২৪-পরগনা) ও কুলতলিতে (সুন্দরবন) দুটি মাসরুম ফার্ম আছে। মেদিনীপুরের কাঁথিতে একটি ফার্ম আছে যেখান থেকে মাসরুমের বীজ অন্যান্য জায়গায় সরবরাহ করা হয়। শুধু তাই নয় ২৩টি মাসরুম চাষকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে—যেমন মেদিনীপুরে ১১টি, হুগলীতে ৩টি, ২৪ পরগনাতে ৭টি এবং নদীয়া ও কলকাতায় যথাক্রমে একটি করে। পশ্চিমবঙ্গে মাসরুম চাষ ও গবেষণা এখনও গর্ব করার মতো না হলেও উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে চলেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে যখন পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে মাসরুমকে প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় গ্রহণ করেছে ও বিজ্ঞানসম্মত চাষযোগ্য উন্নতমানের ফার্ম গড়ে তুলছে সেখানে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ই—মাসরুম-এর প্রোটিনসমৃদ্ধির ও অন্যান্য খাদ্যমূল্য সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়। মাসরুম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই অজ্ঞতাই এদেশে মাসরুম-শিল্প গঠনের প্রধান অন্তরায়।

ভারতবর্ষে মাসরুম-শিল্প সম্ভাবনা

কোন শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জাতীয় চাহিদার ও রপ্তানির উপর। জাতীয় চাহিদা বাড়লে মোটামুটি শিল্পের একটা উন্নতি ঘটে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করতে হলে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন ও ঐ উৎপাদন অন্যান্য দেশের সমান বা কম খরচে হওয়া দরকার, নতুবা লভ্যাংশ থাকবে না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের মাসরুম আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী সহ অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। তবে ঐ সমস্ত মাসরুমই আমাদের মাসরুম শিল্প ও ফার্ম থেকে উৎপাদিত নয়। বর্ষাকালে বা অন্যান্য ঋতুতে এখানে-সেখানে যে স্থানীয় খাদ্যোপযোগী মাসরুম জন্মায় ঐ মাসরুমই রপ্তানি হয়। মজার ব্যাপার এই যে, ঐসব মাসরুম রপ্তানি করে আমাদের দেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসে। বিদেশে ওগুলির চাহিদাও প্রচুর। জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ মাসরুম আমাদের দরকার তার খুব কম পরিমাণই আমরা উৎপাদন করি। যদি ভারতবর্ষে মাথাপিছু প্রতিদিন ১০ গ্রাম (বিদেশে যার পরিমাণ ২২০ গ্রাম) মাসরুম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে বাৎসরিক চাহিদা হবে ২৪,৬১,৬৮০ টন (১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের লোকসংখ্যার হিসাব অনুযায়ী); যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন ১০ গ্রাম মাসরুম খায় তাহলে দৈনিক চাহিদা হয় ৫৪৪৮ কুইন্ট্যাল (১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের লোক সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী)। অবশ্য এখন জনসংখ্যা আরো বেড়ে গেছে, তাই স্বাভাবিকভাবে চাহিদাও বেড়ে যাবে।

মাসরুম উৎপাদনের জন্য প্রধান উপাদান খড় এদেশে খুব সহজলভ্য। এখন যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বীজ সরবরাহ, ঋণদান ও উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের শ্রম কাজে লাগিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাসরুম উৎপন্ন হবে ও দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের অর্থ-নৈতিক উন্নতিসাধনও সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা অপুষ্টিতে ভোগে তারা তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। ভারতবর্ষের সহজলভ্য শ্রম ও খড়কে যদি মাসরুম চাষের কাজে লাগানো যায় তাহলে বাৎসরিক উৎপাদন হবে প্রায় ৩,১২,৯১,৯০০ টন যার দাম তিন হাজার কোটি টাকার বেশি।

শুধু তাই নয় মাসরুম চাষের জন্য ব্যবহৃত খড় বা অন্যান্য সামগ্রী চাষের পর তাদের কোষপ্রাকারের সেলুলোজ, লিগানিন ইত্যাদির decomposition হয়। তাদের কিছুটা মাসরুম খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বাকিটা সব নাইট্রোজেন,

ফসফরাস ও পটাশযুক্ত উচ্চমানের কম্পোস্ট সারে পরিণত হয়। S. T. Chang নামে এক চীনদেশের তথা বিশ্বের এক খ্যাতনামা মাসরুম-বিজ্ঞানী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন (১৯৮১) যে, মাসরুম চাষের পর ব্যবহৃত খড় বা অন্যান্যগুলি উচ্চমানের কম্পোস্ট সারে পরিণত হয় এবং ঐ সার ব্যবহার করে লেটুস, চাইনিজ রেডিস ও টম্যাটো চাষ করলে অনেক বেশি পরিমাণে ফলন হবে। ভারতবর্ষ সার তৈরিতে আজও অনেক পিছিয়ে। প্রতিবছর বহু টাকার রাসায়নিক সার বাইরের দেশগুলি থেকে আমদানি করতে হয়। শুধু মাসরুম চাষ করেই নয়, মাসরুম চাষের পর ব্যবহৃত খড় থেকে উচ্চমানের যে কম্পোস্ট সার তৈরি হয় তা ব্যবহার করে একদিকে যেমন সবজির ফলন বাড়ানো যায় অন্যদিকে তেমন প্রচুর টাকার রাসায়নিক সার আমদানির পরিমাণও কমানো যায়। তার উপর আবার মাসরুম চাষের লাভ তো আছেই।

জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে অর্থনীতির উন্নতি-সাধনে মাসরুম চাষের ভূমিকা নিয়ে অনেক সুদূর-প্রসারী আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী, উড়িষ্যা, কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং জম্মু ও কাশ্মীরে মাসরুম চাষের অগ্রগতি বেশ উল্লেখযোগ্য।

মাসরুম চাষের সুবিধা

বর্ধিত জনসংখ্যার চাপে ও আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার অবদানস্বরূপ বিভিন্ন শিল্প কারখানার ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশঃই কমে আসছে। তাই বর্তমানে যেটা আশু প্রয়োজন সেটা হল কম জায়গা থেকে বেশি পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন; কারণ সমগ্র পৃথিবীতে জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। মাসরুম চাষের মাধ্যমে আমরা খুব অল্পপরিমাণ জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন করতে পারি।

ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। অনেকে ধর্মীয় কারণে শুকরের মাংস খায় না, আবার অনেকে গরুর মাংস খায় না। অনেকে আবার নিরামিষাশী—মাছ, ডিমও খান না। অথচ প্রোটিন খাদ্য সকলেরই দরকার। মাসরুম এমনই এক প্রোটিন খাদ্য যা সবাই খেতে পারে। প্রোটিন খাদ্য গ্রহণে শুধুমাত্র পশ্চিমী দুনিয়াই নয় প্রাচ্যেরও বহুদেশ যেমন মালয়েশিয়া, চীন, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, এমন কি পৃথিবীর 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' মহাদেশ আফ্রিকা অপেক্ষাও আমরা পিছিয়ে।

খাদ্যোপযোগী মাসরুমের ঔষধি গুণ

মাসরুম শুধু প্রোটিন যুক্ত ও সুস্বাদু খাবার নয় অন্যান্য প্রোটিন খাদ্যের মতো মাসরুমের মধ্যে নানা প্রকার ঔষধিগুণ আছে যা আমাদের নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। তবে কাঁচা মাসরুম কখনই খাওয়া উচিত নয় তাতে রোগ কমার বদলে অন্যান্য নানা রোগের সূত্রপাত হয়। মাসরুমের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, আদ্যপ্রাণী, টিউমার ও ছত্রাকপ্রতিরোধক ক্ষমতা বিদ্যমান। এছাড়া মাসরুম অন্যান্য আরও নানা রোগ-সৃষ্টিকারী আণুবীক্ষণিক জীবদের প্রতিরোধে ও লিপিড নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাসরুম রক্তে কোলেস্টেরল তো দমন করেই, কিছু কিছু মাসরুম প্রজাতির মধ্যে আবার এক ধরনের পদার্থ পাওয়া যায় যা রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে। সুতরাং মাসরুমকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে জন-সাধারণ প্রোটিন খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করে এক-দিকে যেমন অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন এই খাদ্যের গুণে বহু দুরারোগ্য রোগের হাত থেকেও রক্ষা পেতে পারে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এটি এখন বোধহয় পরিষ্কার করে বোঝাতে পেরেছি যে, পুষ্টিকর খাদ্যের সমস্যা সমাধান, অর্থনীতির উন্নতি সাধন, বেকার সমস্যার সমাধান এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রেও মাসরুম আমাদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। আবার দেশের বাইরে উচ্চমানের মাসরুম রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রাও অর্জন করা সম্ভব। অবশ্য এজন্যে সরকার, বিজ্ঞানী ও শিল্প-পতিদের আগ্রহ ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার। আমরা আশা করি, ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে উন্নত মানের মাসরুম-শিল্প গড়ে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের সামনে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।



বাতায়ন

সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ

সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যাত্মিক নবজাগরণ নূতন কিছু করার চেষ্টা, বিশ্বের অন্যান্য মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—এই সব অন্তঃপ্রবাহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এগুলি সবই ঢাকাঢুকি সংবাদ, এবং ওখানকার সরকারি সংবাদপত্রে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। এটা সত্যি যে খ্রীষ্টান ধর্মের নবজাগরণ হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এইমাত্রই নয়। যদি কেউ সত্তরের দশকের শুরু থেকে আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত যেসব নামকরা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে—সে বিখ্যাত লোকদের জীবনীই হোক বা বাছাই করা কবিতার বই-ই হোক—লক্ষ্য করেন, তা হলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাতে অবশ্য যা জানা যাবে, তা হিমশৈলের উপরের অল্পাংশ মাত্র, বাকিটা জলের নিচে লুক্কায়িত।

তাছাড়া, এই প্রবন্ধে 'আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ' বলতে কেবল ধর্মের পুনর্জাগরণ বোঝানো হচ্ছে না, আধুনিক বুদ্ধিজীবী রাশিয়ানদের মধ্যে অ-মার্ক্সীয় আধ্যাত্মিক আন্দোলন—প্রাচ্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ, রাশিয়ান দর্শন হতে ভূতপ্রেত রহস্য বিষয় (occultism) ও ইন্দ্রিয়াতীত মনোবিজ্ঞান (parapsychology) সবকিছুকেই এর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই সব আন্দোলন যদিও ষাটের দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে, তবুও সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত তত জোরদার হয়নি। সোভিয়েত দেশ হতে যেসব লোক চলে আসছে তাদের কাছ থেকে যা ওদেশের পত্র-পত্রিকা হতে এই সব খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সোভিয়েত রাশিয়ায় আধ্যাত্মিক নবজাগরণ, নতুন কিছু করার চেষ্টা, বিশ্বের অন্যান্য মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—এই সব অন্তঃপ্রবাহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য এগুলি সবই ঢাকাঢুকি সংবাদ, এবং ওখানকার সরকারি সংবাদপত্রে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। এটা সত্যি যে খ্রীষ্টান ধর্মের নবজাগরণ হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এইমাত্রই নয়। যদি কেউ সত্তরের দশকের শুরু থেকে আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত যেসব নামকরা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে—সে বিখ্যাত লোকদের জীবনীই হোক বা বাছাই করা কবিতার বই-ই হোক—লক্ষ্য করেন, তা হলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাতে অবশ্য যা জানা যাবে, তা হিমশৈলের উপরের অল্পাংশ মাত্র, বাকিটা জলের নিচে লুক্কায়িত।

তাছাড়া, এই প্রবন্ধে 'আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ' বলতে কেবল ধর্মের পুনর্জাগরণ বোঝানো হচ্ছে না, আধুনিক বুদ্ধিজীবী রাশিয়ানদের মধ্যে অ-মার্ক্সীয় আধ্যাত্মিক আন্দোলন—প্রাচ্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ, রাশিয়ান দর্শন হতে ভূতপ্রেত রহস্য বিষয় (occultism) ও ইন্দ্রিয়াতীত মনোবিজ্ঞান (parapsychology) সবকিছুকেই এর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই সব আন্দোলন যদিও ষাটের দশক থেকেই আরম্ভ হয়েছে, তবু সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত তত জোরদার হয়নি। সোভিয়েত দেশ হতে যেসব লোক চলে আসছে তাদের কাছ থেকে বা ওদেশের পত্র-পত্রিকা হতে এই সব খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাশিয়ায় 'আধ্যাত্মিক

'জিজ্ঞাসা' ব্যাপারটিকে যদি কেউ সুনির্দিষ্ট বিভাগে ভাগ করতে চায়, তাহলে দুই ধরনের বিবিদিষা ধরা পড়বে। প্রথমটা সরাসরি ঈশ্বরকে জানার জন্য অনুসন্ধান, যা চিরন্তন আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা এবং যার ভিত্তি হচ্ছে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার। স্বভাবতই এই ধরনের ধারণার সঙ্গে গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্ম ও প্রাচ্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ এবং উচ্চস্তরের যোগ সংশ্লিষ্ট। অন্য ধরনের অনুসন্ধান-স্পৃহার সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ নাই, আছে পৃথিবীর সঙ্গে যোগ, কিন্তু সে-পৃথিবী অদৃশ্য জগৎ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে। এই শেষোক্ত ধরনের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভূতপ্রেতরহস্য, হিন্দুদের সৃষ্টিরহস্য, নিম্নস্তরের যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মধ্যযুগের অপরসায়ন (alchemy) প্রভৃতি।

এসম্বন্ধে দুটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এই পুনর্জাগরণের বিস্তার কতটা? কতজন রাশিয়ান এই সব চিন্তা করে? এসম্বন্ধে ঠিক খবর পাওয়া মুশকিল, কারণ অনেক পরস্পরবিরুদ্ধ খবর আছে। কিন্তু যদি অল্প কয়েকশ্রেণীর লোকও এই ধরনের চিন্তা করে, ভবিষ্যতে সেই চিন্তা ধীরে ধীরে সমগ্র জাতিকে প্রবুদ্ধ করবে।

বাস্তবক্ষেত্রে জানা দরকার যে, এই আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে সরকার কি চোখে দেখে? সকলেই এটা জানেন যে, রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় অনীশ্বরবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা কাল্পনিক নিখুঁত রাষ্ট্র-(utopia) ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত—পৃথিবীতে সকলকে সর্বসুখী করবার এক ধরনের ধারণা। এইভাবে সোভিয়েত দেশে দার্শনিক বস্তুতান্ত্রিকতার (philosophical materialism) মধ্যে একটা 'রাশিয়ানদের ভাষায়' 'আদর্শগত ঝোঁক' ('idealist slant') আছে। যতদিন বিশ্বে সর্বসুখময় আদর্শ রাজ্য স্থাপনের (ideal state) আশা থাকবে, ততদিন এই আশা উৎসাহ-শক্তি (energy) যোগাবে। কিন্তু যেই সেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আশা ভেঙে যাবে; তখনই দার্শনিক বস্তুতান্ত্রিকতা ও নিরীশ্বরবাদের উৎসাহশক্তি উধাও হয়ে তার জায়গায় আসবে পচন ও ক্ষয়, এবং তা থেকে জাগবে অসম্ভাব্যের (absurdity) ধারণা।

অন্য একটি ব্যাপারও অবহেলা করলে চলবে না। আধুনিক রাশিয়া সামাজিকতা ও মানসিকতার দিক থেকে খুবই জটিল। এর ফলে এক, দুই বা তিনটি আদর্শবাদ, যারা স্ববিরোধী নয়, তাদের সবগুলি একই সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব নয়।

যে ভাবেই হোক, রাশিয়াতে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ঘটছে। এই আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা, তা সে গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মীয়ই হোক বা প্রাচ্যের আন্দোলন-প্রসূতই হোক বা উভয়ের মিলনের ফলেই হোক, তা হয়েছে কিন্তু 'ভিতরের মানুষ' (inner man) জেগেছে বলে। একে কোন বহিঃশক্তি রোধ করতে পারবে না। রাশিয়ান জনগণ নিজেকে জানতে চাইছে। মানুষের 'আমি' (human 'I') এবং যাকে সাধারণভাবে আত্মা বলা যায় তার রহস্য সমাধান রাশিয়ান কৃষ্টির একটি পুরাতন সমস্যা যা লালসুতোর মতো সেই কৃষ্টিকে বেঁধে রেখেছে।*

* সোভিয়েত রাশিয়ার একটি পত্রিকা Kontinent-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি Vedanta for the East and West, January—February 1988—সংখ্যায় ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বাঙলা অনুবাদটি করেছেন জলধিকুমার সরকার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত জুন মাসে (১৯৮৮) সোভিয়েত রাশিয়ায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার সহস্র বর্ষ-পূর্তি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। —সংযুক্ত সম্পাদক



গ্রন্থ পরিচয়

ভাগবত-ভক্ত-ভগবান

তারকনাথ ঘোষ

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত (ভাগবত ভাষ্য সহ) : রামপদ চট্টোপাধ্যায় ; ফার্মা, কে এল, এম, প্রাইভেট লিমিটেড. ২৫৭বি বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২। পঁচিশ টাকা

ভাগবত ধর্ম (শ্রীনবযোগীন্দ্র-সংবাদ) : ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। দ্বিতীয় সংস্করণ ; ১৩৯২, সপ্ত আশ্রম, বি ৬/১২৫, কল্যাণী, পোঃ কল্যাণী, জেলা— নদীয়া। দশ টাকা।

শ্রীশ্রীনগেন্দ্র-উপদেশামৃত [দ্বিতীয় পর্ব] সঙ্কলক : ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ, ২ বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০৯। পঁচিশ টাকা।

আনন্দময়ী মা : গঙ্গা সমীরণ। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭ মাতৃমন্দির, ৫৭।১, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৯। পনের টাকা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্ত সুগভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জন্য বিদ্যাপরায়ণ সাধক ও সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। পুরুষ-সাংখ্যদর্শনের পুরুষ নন, তিনি বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর ; সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত হয়ে আছেন আবার সর্বাতিশায়ী—'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্', 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'। এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে তিনি—তাঁর থেকেই বিশ্বরূপাত্মক 'বিরাট'-এর উদ্ভব। যজ্ঞের সাধনভূত সেই বিরাটাখ্য পুরুষ থেকেই যাগযোগে দৈবীশক্তি, বেদাদি, প্রাণিকুল—তাবৎ বিশ্বলোকই সমুদ্ভূত হয়েছে। সমগ্র সৃজনক্রিয়া আর সৃষ্টিকে যজ্ঞক্রিয়া আর যজনফল রূপে ভাবনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটির বিশেষত্ব—ভাগবতভাষ্য। লেখক শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে প্রতি মন্ত্রেরই ভাবদ্যোতক কয়েকটি শ্লোক উৎকলন করে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভাগবতভাষ্য-সম্বলিত হলেও গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা ভক্তিপ্রধান নয়, জ্ঞানপ্রধান ; তিনি সাধারণভাবে শাঙ্কর-দর্শনের অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি আচার্য শঙ্করের মতো কর্ম পরিহার করতে বলেননি। 'উপোদ্‌ঘাতে' (পৃঃ ১৫) তাঁর বিশ্লেষণ : "কর্ম দ্বারাই কর্ম হইতে উদ্ভূত উক্ত আবরণ ['প্রাগ্‌ভবীয় কর্ম আবরণ'] নষ্ট করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এই শিক্ষা দিবার জন্যই বিশ্বসৃষ্টি, পুরুষযজ্ঞের প্রবর্তনা।"—ব্যাখ্যাসূত্রে বিভিন্ন উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে মন্ত্র বা শ্লোকাদি উদ্ধার করা হয়েছে। পাণ্ডিত্য তথা শাস্ত্রের যথার্থবোধের সঙ্গে অধ্যাত্মমুখী ভাবনায় সুসমঞ্জস সমন্বয়ে গ্রন্থটি অনবদ্য।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তিগ্রন্থরূপে সমাদৃত ও ভক্তি-ভাবাশ্রয়ী সাধনব্রতীদের নিয়ত অনুধ্যানের বিষয়। এই মহাগ্রন্থের একাদশ স্কন্ধ জ্ঞানাশ্রয়ী ও অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রতিপাদক (অবশ্যই ভক্তির সঙ্গে অবিরোধে)। 'ভাগবত ধর্ম' গ্রন্থটি ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ শ্লোক থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকের সংকলন (অধ্যায় অনুসারে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত), অন্বয়, অনুবাদ ও অনুধ্যান। ভাগবতের এই অংশে বিদেহরাজ নিমি সমাগত নবযোগীন্দ্রকে ধর্মপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন, তাঁরা যথোচিত উত্তর দিয়েছেন। নবযোগীন্দ্র বিষ্ণুর অংশে জাত ঋষভদেবের নয় ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র—কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। নিমির প্রশ্ন যথাক্রমে—ভাগবত ধর্ম কী?, ভগবৎ-প্রিয় অর্থাৎ ভক্তের লক্ষণ কী?, মায়া কী?, মায়া-অতিক্রমের উপায় কী?, নারায়ণনামা পরমাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ কী?, কর্মযোগ কী?, ভগবানের

অবতারের ক্রিয়া কী কী?, ভগবদ্‌ভজনহীন ব্যক্তিদের গতি কী?, যুগধর্ম কী?

নবযোগীন্দ্র প্রথম পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, শেষ চারটি প্রশ্নের উত্তরে ভক্তি-আশ্রয়ী সাধনার বিবরণ প্রধান হয়ে উঠেছে। ভক্তিবাদ দিয়ে সাধনার প্রবৃত্তিই হয় না; আদিতে ভক্তি-আশ্রয়ে পূজাদি (আবির্হোত্র একেই কর্মযোগ বলেছেন) সহায়ে সাধনার পরিণামে সর্বভূতে পরমাত্মার অনুভূতি (অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠা)—নবযোগীন্দ্রের ধর্মোপদেশের এই তাৎপর্য। কলিতে নামসংকীর্তনের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে।

ব্রহ্মচারীজী বন্ধনীমধ্যে বংগানুবাদ দিয়ে অন্বয় ও সেই সঙ্গে অনুবাদ দিয়েছেন। এর পর তিনি 'অনুধ্যান' নামে যে বিশ্লেষণ করেছেন সেটিতে তাঁর প্রগাঢ় শাস্ত্রবোধ আর গভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব এই যে দুরূহ তত্ত্বকে তিনি যতদূর সম্ভব সরল ও সরস ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। অপেক্ষাকৃত কঠিন বা সন্দিগ্ধ অংশ এড়িয়ে না গিয়ে তিনি একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করে সম্ভাব্য সংশয় নিরসন করেছেন।

ঊনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি ধর্ম-আন্দোলন দেখা যায়। ধর্ম-আন্দোলনের প্রবল প্রভাব না থাকলে বাঙালী হয়তো ভারতের চিরায়ত ধর্মগত বা আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে একান্তভাবে পাশ্চাত্যপন্থী হয়ে পড়ত। প্রথমে রাজা রামমোহন রায় উপনিষদ্‌ আদর্শ অনুসারে একটি নব্য-ধর্ম-ভাবধারার প্রবর্তন করেন; সেটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ধর্ম-জিজ্ঞাসুর প্রয়াসে পুষ্টিলাভ করে একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অবলম্বন করে ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। ঐকালে ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ বাংলায় বিভিন্ন ধর্মসাধক বা ধর্মপ্রচারক আবির্ভূত হয়েছেন। নগেন্দ্রনাথ (১৮৪৬—১৯২৬) তাঁদের অন্যতম। তাঁর ধারানুসারী ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী তাঁর উপদেশাবলীর এই পর্বটি সংকলন ও প্রকাশ করেছেন। স্থান, কাল ও ভক্তমণ্ডলীর বিবরণ সহ এই সংকলনটি মুখ্যতঃ উপদেশমূলক। তিনি বিভিন্ন সাধনশাস্ত্র থেকে প্রসঙ্গানুসারী প্রমাণবাক্য উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন, কখন বা পৌরাণিক কাহিনী অথবা লোকায়ত গল্পসহায়ে সরস ভঙ্গিতে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্টাচার্য 'নগেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে' নামক নিবন্ধে নগেন্দ্রনাথের নিবন্ধের দার্শনিক বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া ডঃ সুকুমার সেন, সংকলক, ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী ও ডঃ রমা চৌধুরীর পরিচায়ক নিবন্ধ (সংক্ষিপ্ত) মূল গ্রন্থের পুরোভাগে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ ত্রিগুণা সেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ যে ভূমিকা লিখেছিলেন সেটিও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থটি মূলতঃ স্মৃতিমূলক।

লেখক আনন্দময়ী মার করুণার নানা চিত্র রচনা করেছেন। ক্বচিৎ তাত্ত্বিক আলোচনার আভাস থাকলেও লেখক সাধারণভাবে সেবিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট না হয়ে মাতৃকথা পরিবেশনেই আগ্রহী হওয়ায় গ্রন্থটি উপাদেয় হয়েছে। মাঝে মাঝে অলৌকিকতার আভাস থাকলেও লেখক সৌভাগ্যক্রমে তাতে মেতে ওঠেননি।

অন্তরঙ্গ ভক্তজন সমুচ্চ অবস্থায় আরূঢ় সাধকের ভাগবত প্রকাশ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনুভব করেন। সে-প্রকাশের আধার মাতৃমূর্তি হলে আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডল ছাপিয়ে করুণার স্নিগ্ধ অনুভবই মুখ্য হয়ে ওঠে। গ্রন্থটি পাঠক সাধারণের মধ্যে সেই অনুভব সঞ্চার করতে পারবে বলে মনে হয়। এই দিক দিয়ে গ্রন্থটির সার্থকতা।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী: স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন গত ১৯ জুন থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী জাতীয় সংহতি শিবির সংগঠিত করে। ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে ছয়টি শিবির হচ্ছে। এই পর্যায়ে ভুবনেশ্বরে ছিল তৃতীয় শিবির। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৭০ জন প্রতিনিধি শিবিরে যোগদান করেন। শিবিরের উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার রাজ্যপাল বিশ্বনাথ পাণ্ডে। বিভিন্ন দিনে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যা বিধানসভার অধ্যক্ষ পি. কে. দাস, ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্তুত্যানন্দ, উড়িষ্যা সাহিত্য একাডেমির অধ্যক্ষ মহাপাত্র নীলমণি সাহু প্রমুখ। আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্যসূচী ছিল শিবিরের প্রধান অঙ্গ, শেষের দিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও বার করা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর: নরেন্দ্রপুর আশ্রমের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমি এবং লোকশিক্ষা পরিষদ পৃথক্ পৃথক্-ভাবে জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত শোভাযাত্রা, প্রদর্শনী, বক্তৃতা, রক্তদান শিবির, পাঠচক্র এবং কিছু কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই উৎসব পালন করেছে। এ-উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের উপর চারদিনের এক আলোচনাচক্রও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক: গত ৩—৭ এপ্রিল পর্যন্ত তমলুক আশ্রম শোভাযাত্রা, আবৃত্তি প্রতি-যোগিতা, প্রশ্নোত্তর এবং জনসভার মাধ্যমে উক্ত উৎসব পালন করেছে। বহু ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা: সারা বছর ব্যাপী এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আগরতলা আশ্রম গত ৪ জুন এক জনসভার আয়োজন করেছিল।

বার্ষিক উৎসব

গত এপ্রিল মাসে কালাডি আশ্রমে তিনদিন ব্যাপী আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৯ এপ্রিল এ উৎসবের উদ্বোধন করেন কেরালার রাজ্যপাল রামদুলারী সিন্‌হা।

উদ্বোধন

গত ১ মে হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রে 'রামকৃষ্ণ-দর্শনম্' নামে একটি পিকটোরিয়্যাল মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠানের স্মরণে একটি স্মারক-গ্রন্থও প্রকাশ করা হয়।

ত্রাণ

রাজস্থান খরাত্রাণ: গত মে মাসে বিকানীর জুহশিলের শিববাড়ি পশুশিবিরে ২১০টি গরুর জন্য ২৭,৮৫৮ কিলোঃ শুকনো খাদ্য (খড়, বিচালি ইত্যাদি), ৪,০৬৫ কিলোঃ খইল, ২,৪০০ কিলোঃ অন্যান্য পশুখাদ্য, ৭২০ কিলোঃ গমের ভুষি এবং ৪০ কিলোঃ লবণ সরবরাহ করা হয়েছে।

জুন মাসে বারমার জেলার ৩,৪১৮ জন খরা-পীড়িত লোকের মধ্যে মাথাপিছু ৮ কিলোঃ করে মোট ২৭,৩৪৪ কিলোঃ 'বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য' বিতরণ করা হয়েছে।

উড়িষ্যা খরাত্রাণ: গত জুন মাসে উড়িষ্যার মন্ত্রীদি ও পাত্রপুর খাদ্যবিতরণ শিবিরে দৈনিক ৩,৯২১ জন খরাপীড়িত মানুষকে খাওয়ানো হয়েছে।

গুজরাট খরাত্রাণ: রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে জুন মাসে রাজকোট, পঞ্চমহল, জামনগর এবং সুরেন্দ্রনগর জেলার খরাপীড়িত মানুষের মধ্যে

১০,০৫৩ কিলোঃ গম, ৬,৯২০ কিলোঃ বাজরা, ৬৫৩টি শাড়ি, ১৫৮ মিটার কাপড়, ২৮৪টি শিশুদের পোশাক, ৮০৬টি কম্বল, ৪০টি ত্রিপল, ২৬৪ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ এবং ১,৫০,০০০ লিটার জল বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জামনগর, জুনাগড়, রাজকোট এবং সুরেন্দ্রনগর জেলার ৫,৭৬৩টি পশুর জন্য ৪,৯৯,৪৫২ কিলোঃ তাজা ও শুকনো পশুখাদ্য এবং ৩,১০,০০০ লিটার জল সরবরাহ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ: বাঁকুড়া কেন্দ্র ঐ জেলার খাতড়া মহকুমার মোশিয়ারা অঞ্চলের বামনী গ্রামে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে ৩৯৫ কিলোঃ চাল, ৭৫ কিলোঃ ডাল, ১১৬ কিলোঃ আলু, ১১২ কিলোঃ চিড়া, ৪৪ কিলোঃ গুড়, ১৫ কিলোঃ সরিষার তেল, ৬৫ কিলোঃ লবণ, ৫৩টি শাড়ি, ২৬ সেট্ অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র এবং পুরনো কাপড় বিতরণ করেছে।

শিলচর আশ্রম গত ডিসেম্বর '৮৭ থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছে।

বহির্ভারত

সিয়াটল্ বেদান্ত সোসাইটি (ওয়াশিংটন): গত ২৯ এপ্রিল থেকে ২১ মে পর্যন্ত আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। বিশেষ পূজা, সন্ধ্যায় যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের উপর শিশুদের নাট্যাভিনয়, স্লাইড শো, টেলিভিশনের মাধ্যমে আশ্রমের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। উৎসবে বহু ভক্তসমাগম হয়েছিল।

সানফ্রান্‌সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া): গত জুলাই মাসে প্রতি রবিবার এবং প্রতি বুধবার স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ধর্মপ্রসঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাছাড়া ৩১ জুলাই পূজা, ভক্তিগীতি, আলোচনা, ভজন, স্লাইড শো প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি (ক্যালিফোর্নিয়া): গত ১৭ এবং ২৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বক্তৃতানুষ্ঠানগুলি স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসবের অন্তর্গত। বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ এবং স্বামী তথাগতানন্দ।

জুলাই মাসে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় স্বামী প্রমথানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উপর ক্লাস নিয়েছেন। তাছাড়া স্বামী প্রমথানন্দ এবং রবার্ট রীড্ প্রতি শনিবার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণীর উপর আলোচনা করেছেন। ২০ জুলাই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উপনিষদের উপর একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন।

দেহত্যাগ

গত ১৮ জুন স্বামী হংসেশ্বরানন্দ (বিভূতি) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে বিকাল ৩-৩০ মিঃ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি এক-বছর যাবৎ চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

স্বামী হংসেশ্বরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোয়ালপাড়া আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কোয়ালপাড়া এবং জয়রামবাটীতেই তাঁর জীবন কেটেছে। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। দয়ালু প্রকৃতির এই সাধুর গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি ছিল গভীর সহানুভূতি। কঠোর জীবন এবং সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হলে স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মাসের (ইং) প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।



বিবিধ সংবাদ

উৎসব

রামকৃষ্ণ আশ্রম, পূর্ণিয়া (বিহার): গত ২০—২২ মার্চ '৮৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। ঐ সময়ে এক যুব সমাবেশেরও আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করে। আবৃত্তি, গান, আলোচনা, অভিনয় প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বক্তৃতা করেছেন স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী ভাগবতানন্দ, স্বামী সত্যরূপানন্দ, শ্রীধর প্রসাদ, মনোজকুমার মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম: এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, গীতি-আলেখ্য, শোভাযাত্রা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। তিন দিনই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনা করেছেন যথাক্রমে নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী ভৈরবানন্দ ও স্বামী তত্ত্ববোধানন্দ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রাণিয়া কুলটুকারী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা): গত ৩০ মার্চ এ আশ্রমে উক্ত উৎসব প্রভাতফেরী, পাঠ, ভক্তিগীতি, লীলাগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেছেন স্বামী শিবনাথানন্দ। দুপুরে ১০০০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কাটোয়া (বর্ধমান): গত ২৩ ও ২৪ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গীতি-আলেখ্য, ব্যায়াম প্রদর্শন, শোভাযাত্রা, ধর্মসভা প্রভৃতি ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। দুদিনের ধর্ম-সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী শিবময়ানন্দ ও স্বামী অনাময়ানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ ন'পাড়া বারাসত: গত ৫ জুন পূজা, হোম, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ, সঙ্গীত পরিবেশন, গীতি-আলেখ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৫৩তম আবির্ভাব-উৎসব সঙ্ঘ-প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। অপরাহ্ণে এক ধর্মসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতিত্ব করেন কিরণচন্দ্র ঘোষাল এবং প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যানন্দ ও ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতিতীর্থ, বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর): গত ২১ ও ২২ মে, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই আশ্রমে দুইদিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। এই দুদিনের অনুষ্ঠানে বৈকালিক ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী প্রকাশা-ত্মানন্দ এবং তাপস বসু। এ উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণও করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেল্লা: গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উভয় দিনই সন্ধ্যারতির পর স্বামীজীর জীবন ও বাণীর উপর আলোচনা হয়েছে। আলোচনা করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী সত্যরূপানন্দ, এম. সি. দে তরফদার, বি. বি. মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ উপলক্ষে সঙ্ঘের একটি স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। শেষের দিন এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

নিমতা সংহতি সঙ্ঘ (উত্তর ২৪ পরগনা): গত ১, ৭ ও ৮ মে, স্বামী বিবেকানন্দের উপর নানা

প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিমতা সংহতি সঙ্ঘ স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল কুইজ, ছবি আঁকা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রবন্ধ প্রভৃতি। ১২টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন স্বামী চিৎসুখানন্দ এবং স্বামী একব্রতানন্দ, দ্বিতীয়দিন করেছিলেন শচীন্দ্রমোহন সরকার। ৭ এবং ৮ মে সঙ্ঘের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গীতালেখ্য, কাজল সেনগুপ্তের রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন, তপন বিশ্বাসের যোগ ব্যায়াম প্রদর্শন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাণাঘাট বিবেকানন্দ ব্রতচারী আসর: গত ২১ ও ২২ মে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটুট অব কালচারের সহযোগিতায় রাণাঘাট ব্রতচারী আসর স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক যুবসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই সম্মেলনে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের উপর বক্তৃতা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। মোট ৭০ জন প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও হোসেনুর রহমান। সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

মাকড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়, হাওড়া: গত ২৪ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় এক যুবসমাবেশের আয়োজন করেছিল। ঐ সমাবেশে স্কুল-কলেজের প্রায় ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। তাছাড়া বহু স্থানীয় অধিবাসীগণও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সমাবেশে স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, দুর্গাপুর: গত ২৩ ও ২৪ এপ্রিল, পূজা, হোম, প্রভাতফেরী, প্রসাদ বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মসভা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্রের দুদিনের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। সমস্ত অনুষ্ঠানেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের রামহরিপুর ও বাঁকুড়া আশ্রমের অধ্যক্ষদ্বয় স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ও স্বামী ধৃতাত্মানন্দ উপস্থিত ছিলেন। পূজানুষ্ঠান পরিচালিত হয় মঠের সন্ন্যাসীদের দ্বারাই। ধর্মসভায় (২৪ এপ্রিল) ভাষণ দেন স্বামী সত্যদেবানন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ।

সংস্কৃতি রক্ষায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রাহামসটাউন শহরে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত একটি ভারতীয় মন্দিরকে ঐ দেশের বিশেষ আইন বলে ভেঙে ফেলা হয়। ঐ মন্দিরটিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য হিন্দু এবং মুসলমানরা এক সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। শহরের ভারতীয় বাসিন্দারা মন্দিরটিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। বস্তুতঃ ভারতীয়রা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য একটি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাই স্থানীয় পুরসভা এবং হিন্দু-মুসলমানরা এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। জানা গেছে মন্দিরটি স্থানীয় ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সভার পরিচয় বহন করবে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, প্রাক্তন স্বাধীনতা-সংগ্রামী অমূল্য মুখোপাধ্যায় (বুধা) গত ২৩ এপ্রিল '৮৮ তাঁর বোম্বেস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বছর। কিশোর বয়সেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। তিরিশের দশকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে তিনি কারাবরণ করেন। কর্মজীবনে সিনেমা-ফটোগ্রাফার হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। স্বামীজীর একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্র এবং কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির উদ্ঘাটনের তথ্যচিত্রও তিনি তুলেছিলেন।



বিজ্ঞান সংবাদ

গাছের পছন্দ মতো রঙ

গাছেরও রঙ সম্বন্ধে পছন্দ অপছন্দ আছে। রঙীন প্লাস্টিক হতে পছন্দ মতো রঙ যখন গাছের উপর প্রতিফলিত করা হয়, তখন আরও বড় টম্যাটো বা আলু ফলতে পারে। সাউন ক্যারোলিনার ক্লেমসন ইউনিভার্সিটি এবং ইউ. এস. ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার-এর ফ্লোরেন্সস্থিত রিসার্চ সেণ্টারে এইভাবে বিভিন্ন রঙ ফেলে ফল, সব্জি ফলাতে চেষ্টা করেছে। টম্যাটো গাছের উপর লাল রঙ ফেলে কালো প্লাস্টিক হতে রঙ ফেলা টম্যাটোর চেয়ে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২০ শতাংশ বড় টম্যাটো পাওয়া গেছে এবং ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ শতাংশ বড় ফল ফলেছে। আলু ও অন্যান্য মূলজাত গাছ সাদা আলো পছন্দ করে। গাছের মধ্যে যে ফাইটোক্রোম নামক রাসায়নিক দ্রব্য ছড়ানো আছে, তা গাছের রঙ সম্বন্ধে বাছবিচার করে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি বাতাসের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সামান্য পরিবর্তনও ধরতে পারে। কয়েক প্রকার গাছের পছন্দ রঙ নির্ভর করে স্থানীয় আবহাওয়ার উপর। বৈজ্ঞানিকগণ আলো ফেলার প্লাস্টিককে পেটেণ্ট করতে চাইছেন।

'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'

গত ৬ আগস্ট কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এবারও 'হিরোসিমা দিবস' পালন করা হয়। 'হিরোসিমা আর নয়', 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই,' 'পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক', 'মহাকাশে সামরিকীকরণ করা চলবে না' প্রভৃতি শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার সহ একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বিভিন্ন পথ-পরিক্রমা শেষে অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারে একটি জনসভা করে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

সমুদ্রে দূষণ

বারসিলোনোয়ে অনুষ্ঠিত সমুদ্র-সংরক্ষণ বিষয়ক সম্মেলনে বলা হয়, ভূমধ্যসাগরের জল ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। এর ফলে এই সাগরের মৃত্যু ঘটতে পারে বলে এক তথ্যপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। এই জল দূষণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, প্রতি বছর হাজার হাজার টন ক্ষতিকারক পদার্থ ভূমধ্য-সাগরে বর্জিত হচ্ছে। বর্জিত পদার্থগুলির মধ্যে রয়েছে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টন তেল, তেলের সঙ্গে সংপৃক্ত পদার্থ, ষাট হাজার টন ডিটারজেণ্ট ও ক্ষার বস্তু। বারো হাজার টন ফেনল, তিন হাজার আটশ টন সিসা এবং একশ টন পারদ।

উত্তপ্ত বসুধা

সোভিয়েত রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্স-এর ভাইস প্রেসিডেণ্ট আলেকজাণ্ডার ইয়ানশিন জানিয়েছেন অতিরিক্ত শিল্পোন্নয়নের ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণে মাত্রাধিক্য ঘটেছে; ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দারুণভাবে বেড়ে যাচ্ছে। অতীতেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়েছে ঠিকই, তবে সাম্প্রতিক কালে এই তাপমাত্রা বাড়ছে বিপজ্জনকভাবে। এই উত্তাপ বৃদ্ধির ফলস্বরূপ অনিবার্যভাবে হিমবাহগুলি গলতে শুরু করবে এবং সমুদ্রের অস্বাভাবিক জলস্ফীতি ঘটবে।

হিমালয় উঁচু হচ্ছে

বৃটিশ ভূতাত্ত্বিক রবার্ট বাটনার এবং ডেভিড প্রায়র জানিয়েছেন প্রতি বছর হিমালয়ের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে গড়ে প্রায় সাত মিলিমিটার। তাঁরা আরও জানান যে, গত কয়েক বছরে উচ্চতা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ।

সূচীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ আশ্বিন ১৩৯৫

দিব্য বাণী : ☐ রামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গার স্তব ☐ ৫৩৭
কথাপ্রসঙ্গে : ☐ প্রসঙ্গ অকাল-বোধন ☐ ৫৩৮

প্রবন্ধ

'ভক্তিরেব গরীয়সী' ☐ স্বামী গম্ভীরানন্দ ☐ ৫৪১
'হৃদি সর্বস্ব বিষ্ঠিতম্' ☐ স্বামী ভূতেশানন্দ ☐ ৫৪৪
বেদে শক্তিতত্ত্ব ☐ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ☐ ৫৪৬
দেবী-মাতা-কন্যা ☐ স্বামী পরাশরানন্দ ☐ ৫৫৩
ধর্মসমন্বয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দান ☐ রেজাউল করীম ☐ ৫৬৮
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ☐ জ্যোতির্ময় বসুরায় ☐ ৫৭০
শুধু আইন প্রণয়নেই সমস্যার সমাধান হয় না ☐ আশাপূর্ণা দেবী ☐ ৫৮৪
আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে কম্যুনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন ☐ জলি মোহন কল ☐ ৫৮৯
লালন ফকির ও তাঁর গান ☐ তাপস বসু ☐ ৫৯৪
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কি পরে 'রসেছিলেন'? ☐ জলধিকুমার সরকার ☐ ৫৯৯
স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকার শিশুরা ☐ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ☐ ৬০৪
স্বামীজীর সেবামূলক কর্মভাবনা ও তার উৎস ☐ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ☐ ৬১২
গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, পাঞ্জাব এবং স্বামী বিবেকানন্দ ☐ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৬১৯
একটি হরিনামের হাটবাজার ☐ স্বামী প্রভানন্দ ☐ ৬২৭
স্বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনাসমাজীর সাক্ষাৎকার : নতুন তথ্য ☐ শঙ্করীপ্রসাদ বসু ☐ ৬৩৯
কৃপা ☐ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ☐ ৬৪৯
জাতির সামনে যে আলোকস্তম্ভ ☐ স্বামী নির্জরানন্দ ☐ ৬৫২

[পরের পৃষ্ঠায়]



সম্পাদক
স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বার্ষিক মূল্য : ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ছত্রিশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
আজীবন গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়) : ছশো টাকা

স্মৃতিকথা
ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি ☐ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ☐ ৬২৩
ভ্রমণ-কাহিনী
অমরদেবতা অমরনাথ ☐ ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী ☐ ৬৫৭
রম্যরচনা
এক এবং শূন্য ☐ স্বামী গোপেশানন্দ ☐ ৬৬১
অলৌকিক
বিশ্বাস-অবিশ্বাস ☐ আনন্দ বাগচী ☐ ৬৬৩
জ্যোতিষ-নিবন্ধ
জ্যোতিষমতে রুদ্রাক্ষ ধারণের ফল ☐ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী ☐ ৬৭১
বিজ্ঞান-নিবন্ধ
ভাইরাসজনিত শিশুরোগ ☐ সন্দীপকুমার চক্রবর্তী ☐ ৬৭৬
ক্রীড়া-সমীক্ষা
ভারতীয় হকি—কেন এই দৈন্যদশা ? ☐ মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ☐ ৬৮০

কবিতা
রাত্রির তপস্যা ☐ স্বামী অচ্যুতানন্দ ☐ ৫৬১
গৌরীস্তুতি ☐ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ☐ ৫৬২
জাগো ☐ অরুণকুমার দত্ত ☐ ৫৬২
জাগরণ-আহ্বানম্ ☐ স্বামী গর্গানন্দ ☐ ৫৬৩
'তোরা এসেছিস' ☐ সুধাংশুভূষণ নায়ক ☐ ৫৬৩
তবুও ডাকব তোমায় ☐ প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ☐ ৫৬৪
পরের বাগানে ফুল ☐ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ☐ ৫৬৪
তোমার আনন্দসুর ☐ পলাশ মিত্র ☐ ৫৬৪
আমিই কর্ম আমিই অপেক্ষা ☐ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ☐ ৫৬৪
সম্ভবামি যুগে যুগে ☐ জয়ন্তী সেন ☐ ৫৬৫
অপ্রকাশিত ☐ ভূপেন্দ্রনাথ শীল ☐ ৫৬৬
যাকে পেলে ☐ নিভা দে ☐ ৫৬৫
আমি-তুমি ☐ শান্তশীল দাশ ☐ ৫৬৬
জননী ☐ মধুসূদন পাল ☐ ৫৬৬
শ্বেতকেতু ☐ সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৫৬৭
ধ্যানস্তব্ধ ☐ নিমাই মুখোপাধ্যায় ☐ ৫৬৭
যদি অনন্ত জীবন বেয়ে ☐ শান্তিকুমার ঘোষ ☐ ৫৬৭

নিয়মিত বিভাগ
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : আনন্দময়ীর আগমন ☐ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ☐ ৫৫৮
বাতায়ন : শুভ বিবাহ ☐ লিদিয়া লিবেদিনস্কায়া ☐ ৬০৯
আনন্দের সন্তান : রসিকরাজ রাখালরাজ ☐ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ☐ ৬৪৭
মাধুকরী : রুশে, ক্যাম্পারে কোনও ভেদ নেই ☐ সন্তোষকুমার ঘোষ ☐ ৬৫৪
গ্রন্থ পরিচয় : স্বামী বিবেকানন্দ ও মার্কসবাদ ☐ প্রণবেশ চক্রবর্তী ☐ ৬৮২
সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় নূতন সংযোজন ☐ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ☐ ৬৮৩
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ☐ ৬৮৪
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ☐ ৬৮৪
বিবিধ সংবাদ ☐ ৬৮৫
বিজ্ঞান সংবাদ ☐ ৬৮৭



প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥
শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৩৫

শিল্পী ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়



৯০তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা]

আশ্বিন, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

রামচন্দ্র-কর্তৃক দুর্গার স্তব*

নমস্তে সর্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া।
অপর্ণা অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া,
মহেশ্বরী মহামায়া ॥

উগ্রচণ্ডা উমা, আশুতোষ ধুমা,
অপরাজিতা উর্বশী।
রাজ-রাজেশ্বরী রমা রণকারী,
শঙ্করী শিবে ষোড়শী ॥

মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে,
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব-বিশ্বোদরী, শুভে শুভংকরী,
ক্ষিতি-ক্ষেত্রে ক্ষেমংকরী ॥

সহস্র সহস্তে, ভীমে ছিন্নমস্তে,
মাতা মহিষমর্দিনী।
নিস্তারকারিণী, নরকবারিণী,
নিশুম্ভ-শুম্ভ-ঘাতিনী ॥

দৈত্য-নিঘাতিনী শিব-সীমন্তিনী,
শৈলসুতে সুবদনী।
বিরিঞ্চি-বন্দিনী দুষ্ট-নিষ্কন্দিনী,
দিগম্বরের ঘরণী ॥

দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গে অরি,
কালিকে করালকেশী।
শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী ॥

সর্ব-সুশোভিনী, ত্রৈলোক্যমোহিনী,
নমস্তে লোলরসনা।
দিক্-বিবসনা, সর্ব-শবাসনা,
বিশ্ব-বিকটদশনা ॥

সারদা বরদা, শুভদা সুখদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশবাহিনী, মহেশ-ভবানী,
সুরেশ-বন্দিনী বামা ॥

কামাখ্যা রুদ্রাণী, হরা হররানী,
হররমা কাত্যায়নী।
শমনত্রাশিনী, অরিষ্টনাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ॥

* কৃত্তিবাসী রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড থেকে গৃহীত



কথাপ্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ অকাল-বোধন

বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ এবং কিংবদন্তী অনুসারে রামচন্দ্র শরৎকালে বহু-প্রচলিত মাতৃপূজার প্রবর্তক। তবে রাবণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের এই পূজা 'অকাল-বোধন' নামে খ্যাত। কারণ শরৎকাল সূর্যের দক্ষিণায়নের অন্তর্গত। শ্রাবণ হইতে পৌষ এই সময়টি সূর্যের দক্ষিণায়ন কাল এবং মাঘ হইতে আষাঢ় এই সময়টি সূর্যের উত্তরায়ণ কাল। দক্ষিণায়ন হইল দেবতাদের রাত্রি—দেবতারা তখন নিদ্রামগ্ন থাকেন। উত্তরায়ণ হইল দেবতাদের দিবা—দেবতারা তখন জাগিয়া থাকেন। সুতরাং সূর্যের উত্তরায়ণের ছয় মাস হইল দেবতাদের আরাধনার প্রশস্ত কাল। বসন্তকালে 'বাসন্তী পূজা' নামে খ্যাত যে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয় তাহাই হইল কালের পূজা। তাই সেক্ষেত্রে দেবীর বোধন বা জাগরণের কোন ব্যাপার নাই। কৃত্তিবাসের বাঙলা রামায়ণে আমরা রাবণ-বধার্থে রামচন্দ্রের দেবীর অকাল-বোধনের প্রসঙ্গটি পাই। সেখানে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রের অকাল-বোধনের কোন উল্লেখ নাই। তাহা হইলে কৃত্তিবাস এই প্রসঙ্গটি কোথায় পাইলেন? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিভিন্ন পুরাণ,উপপুরাণ ও লোক-প্রচলিত কিংবদন্তীর মধ্যে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কাহিনীটি পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। সেইসমস্ত সূত্র হইতেই যে কৃত্তিবাস কাহিনীটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসের মূল রচনাটি পাওয়া যায় নাই। শ্রীরামপুর মিশন হইতে কেরি সাহেবের উদ্যোগে প্রথম মুদ্রিত (১৮০৩ খ্রীঃ) কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস তাঁহার মূল বাঙলা রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার প্রসঙ্গটি দিয়াছিলেন কিনা তাহা লইয়াও প্রশ্ন উঠিতে পারে।

অনেকের অনুমান, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর দনুজমর্দন গণেশের (রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৪১৫-১৪১৮) সভা অলঙ্কৃত করিতেন। আবার এরকমও শোনা যায় যে, কৃত্তিবাস তাহেরপুরের প্রতাপান্বিত জমিদার রাজা কংসনারায়ণের সভাকবি ছিলেন। কংসনারায়ণ গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের (খ্রীঃ ১৪৯৩—১৫১৯) সমসাময়িক ছিলেন। বর্তমানে যেভাবে দুর্গাপ্রতিমা নির্মিত হয় এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও চালচিত্রে শিব-সহ পরিবার-সমন্বিতা দুর্গার যে পূজা আমরা করিয়া থাকি খুব সম্ভবতঃ দেবী চণ্ডীর ভক্ত শাক্ত নৃপতি গণেশই তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রবর্তন করেন। বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাবকে প্রতিহত করিয়া রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে পরাক্রান্ত নৃপতিগণ দিগ্বিজয়ের পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের স্মারক হিসাবে রাজা গণেশেরও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার বাসনা হইয়া থাকিবে। শোনা যায়, রাজা গণেশকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, কলিকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। তাঁহারা 'কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ' হিসাবে শরৎকালে দুর্গাপূজার বিধান দান করেন এবং রাজা গণেশকে বলেন যে, ঐ অনুষ্ঠানের দ্বারাই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমস্ত ফল লাভ করিবেন। সেই অনুসারে রাজা গণেশ শরৎকালে পরিবার-সমন্বিতা দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া মহাসমারোহে পূজা করেন।

পরিবার-সমন্বিতা মহিষাসুর-মর্দিনীর ধারণা অবশ্য গণেশের বহু পূর্বে পাল যুগে (অষ্টম-নবম শতাব্দী) যে বর্তমান ছিল তাহার প্রমাণ-স্বরূপ একটি প্রস্তর-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। রাজা কংসনারায়ণ আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ষোড়শ

শতাব্দীতে প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূজার সমারোহ এবং উৎসব প্রজা-সাধারণ যাহাতে উপভোগ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজাকে সর্বসাধারণের জন্য একটি জাতীয় আনন্দ-উৎসবে রূপায়ণের কৃতিত্ব রাজা কংসনারায়ণেরই প্রাপ্য। কংসনারায়ণের দুর্গাপূজাকে টেক্কা দিবার জন্য রাজসাহীর ভাদুরিয়ার সমৃদ্ধশালী জমিদার রাজা জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ বছরে বসন্তকালে বাসন্তীপূজা করিয়াছিলেন। মনে হয়, বঙ্গের রাজা, মহারাজা, ভূম্যধিকারী এবং অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে দুর্গাপূজার সমারোহকে কেন্দ্র করিয়া তখন হইতেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

রাজা গণেশ এবং রাজা কংসনারায়ণ এই দুই-জনের সঙ্গে কবি কৃত্তিবাসকে সংযুক্ত করা হইলেও আমাদের ধারণা, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর রাজা গণেশেরই সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহা কৃত্তিবাসের নিজের কথা হইতেও সমর্থিত হয়। তাঁহার রামায়ণের প্রথমে তিনি যে 'আত্ম-বিবরণ' দিয়াছেন সেখানে 'গৌড়েশ্বর রাজা' কর্তৃক তাঁহার সম্মানিত হওয়ার কথা তিনি লিখিয়াছেন এবং ইহাও লিখিয়াছেন যে, 'রাজ-আজ্ঞা'তেই তাঁহার রামায়ণ রচনা। মনে হয়, পৃষ্ঠপোষক নৃপতি গণেশের অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজাকে একটি শাস্ত্রীয় সমর্থন দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার রচিত রামায়ণে রামচন্দ্রের অকাল-বোধনকে তিনি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং সেক্ষেত্রে রাজার নির্দেশ থাকাও বিচিত্র নয়। তবে কৃত্তিবাসের বহু পূর্বেই বঙ্গদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজার যে প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। জীমূতবাহনের (দ্বাদশ শতাব্দী) 'কালবিবেক' ও 'দুর্গোৎসব-নির্ণয়', শূলপাণির (খ্রীঃ ১৩৭৫—১৪৬০) 'দুর্গোৎসব-বিবেক' ও 'দুর্গোৎসব-প্রয়োগ', বাচস্পতি মিশ্রের (খ্রীঃ ১৪২৫—১৪৮০) 'ক্রিয়া-চিন্তামণি' এবং রঘুনন্দনের (খ্রীঃ ১৫০০—১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' এবং 'দুর্গাপূজা-তত্ত্ব' এবং রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ আচার্যের 'দুর্গোৎসব-বিবেক' গ্রন্থে শরৎকালীন মহাপূজার পদ্ধতি পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির (খ্রীঃ ১৩৭৫—১৪৫০) 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে দুর্গার যে পূজাপদ্ধতি বর্ণিত আছে তাহা বাংলাদেশের বহু শাক্ত পরিবারে আজও অনুসরণ করা হয়। বঙ্গদেশের প্রাচীন স্মৃতিকার ভবদেব ভট্ট (একাদশ শতাব্দী) তাঁহার স্মৃতিগ্রন্থে পূর্ববর্তী স্মৃতিকার জীকন ও বালকের দুর্গাপূজা-সম্পর্কিত বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন। জীকন ও বালক সেন-যুগের (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) পূর্বের লোক। সুতরাং বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীর আগেও (পালযুগের ভাস্কর্য নিদর্শনটিকে ধরিলে) প্রচলিত ছিল তাহা এই সকল তথ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। কালিকা-পুরাণের (৬০।১-২১) মতে আশ্বিন মাসেই দুর্গাপূজা বিধেয় এবং দেবী দুর্গা আশ্বিন মাসেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ও মহিষা-সুরকে বধ করিয়াছিলেন। তবে বঙ্গদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজার ব্যাপকভাবে প্রচলনের কৃতিত্ব রাজা গণেশ এবং তাঁহার পরবর্তী কংসনারায়ণকেই দিতে হইবে। এদেশে মুসলমান প্রভাবকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে বহুধাবিভক্ত হিন্দুসমাজকে শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করিয়া তাহাকে সুসংগঠিত করিবার জন্যই তাঁহারা এই পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। অর্থাৎ বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় এই ধর্মীয় উৎসবটির প্রসারের সূচনায় একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল ইহা মনে করিলে বোধহয় ভুল হইবে না। চণ্ডীর মতে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য পুরাকালে মেধা ঋষির পরামর্শ অনুসারে 'মহীময়ী' অর্থাৎ মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। তবে সেটি বৎসরের কোন্ সময় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ চণ্ডীতে নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজা সুরথের রাজধানী ছিল বর্তমান বীরভূম জেলার বোলপুর অঞ্চলে। তাহা সঠিক হইলে বলিতে হইবে, বঙ্গদেশেই দুর্গা-পূজার সূচনা হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন চণ্ডীর রচনাও বাংলাদেশেই হইয়াছিল।

দেবী দুর্গার বোধনের মন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা ॥

পুরাকালে রাবণের বধের জন্য এবং রামকে অনুগ্রহ করার জন্য ব্রহ্মা অকালে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন।

কালিকা-পুরাণে (৬০।২৬) প্রায় অনুরূপ একটি শ্লোক থাকিলেও উপরোক্ত মন্ত্রটির উৎস জানা

যায় না। উহা কি দুষ্প্রাপ্য বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত ছিল? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই পুরাণ-কথিত দুর্গাপূজা-পদ্ধতিই বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হইয়া থাকে। দেবীর এই বোধন-মন্ত্রে বলা হইয়াছে স্বয়ং ব্রহ্মা দেবীর অকাল-বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে ব্রহ্মা রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্রকে অকাল-বোধনের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে দেখি রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের ভয়ংকর যুদ্ধ হইতেছে। রামচন্দ্র যতবার বাণাঘাতে রাবণের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিতে-ছেন ততবারই রাবণের মস্তক পুনর্যোজিত হইতেছে। তবে রামচন্দ্রের বিষম অস্ত্রপ্রহারে জর্জরিত হইয়া অবশেষে রাবণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। রাবণ ছিলেন দেবী দুর্গার ভক্ত। জ্ঞান ফিরিলে রাবণ কাতরভাবে দেবীর স্তব করিতে শুরু করিলেন। রাবণের আর্তিতে দেবী স্বয়ং রাবণের রথে আবি-র্ভূত হইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন। রামচন্দ্র তাহা দেখিয়া বুঝিলেন দেবীর আশ্রিত রাবণকে বধ করা অসম্ভব। দেবরাজ ইন্দ্র তখন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন শরতে দেবী দুর্গার পূজা করিয়া অসুর-বিজয় করিয়াছিলেন এখন রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্রকেও দেবীর সেই 'অকাল-বোধন' করিতে হইবে। (ব্রহ্মার এই কথা হইতে জানা যায় দেবরাজ ইন্দ্রই পূর্বে দেবীর অকাল-বোধন করিয়াছিলেন।) ইন্দ্র তখন ব্রহ্মাকে রামচন্দ্রের নিকট অকাল-বোধনের বিধানটি জানাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা তাহা রামচন্দ্রকে জানাইলে রামচন্দ্র বলিলেনঃ "দেবীপূজার পক্ষে শরৎ অকাল, বসন্ত শুদ্ধ সময়। তাছাড়া দেবীর বোধনের বিহিত তিথি কৃষ্ণা নবমী। সে-তিথিও অতিক্রান্ত। রাজা সুরথের শুক্ল প্রতিপদে কল্পারম্ভের দৃষ্টান্ত আছে। (রাজা সুরথ কি তবে শরৎকালেই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন? পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চণ্ডীতে ইহার উত্তর অনুল্লেখিত)। কিন্তু সে-তিথিও গত হইয়াছে। আজ আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী তিথি।" ব্রহ্মা তখন বলিলেনঃ "কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন"। সেই অনুসারে রামচন্দ্র পর-দিন অর্থাৎ শুক্লা ষষ্ঠীর প্রভাতে কল্পারম্ভ করিয়া দেবীর বোধন করিলেন। দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া নানা উপচার-সহকারে সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপূজা শেষ করিয়া তিনি নবমীর পূজাও করিলেন। কিন্তু দেবী দেখা দিলেন না। বিষণ্ণ রামচন্দ্রকে তখন বিভীষণ একশত আটটি নীলপদ্ম দিয়া দেবীর পূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। লঙ্কা হইতে দশ বৎসরের পথ দেবীদহ হইতে হনুমান সেই পদ্ম আনিয়া রামচন্দ্রকে দিলেন। নবমীর নিশি জাগরণ করিয়া রামচন্দ্র সহর্ষে দেবীর পূজা শুরু করিলেন। অঞ্জলি দিবার সময় দেখা গেল একটি পদ্ম কম রহিয়াছে। রামচন্দ্র ভাবিলেন, হনুমান নিশ্চয়ই একটি পদ্ম কম আনিয়াছে। তাই হনুমানকে দেবীদহ হইতে তিনি আরও একটি পদ্ম আনিতে বলিলেন। হনুমান বলিলেন, তিনি একশত আটটি নীলপদ্ম গণিয়া আনিয়াছেন এবং রামচন্দ্রকে দিবার সময়ও গণিয়া দিয়াছেন। দেবীদহে একশত আটটি পদ্মই ছিল। অতএব রামচন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহা দেবীরই ছলনা। রামচন্দ্র তাহা বুঝিয়া সকাতরে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবীর প্রসন্নতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন রামচন্দ্রের মনে একটি সংকল্পের উদয় হইল। তিনি বলিলেন, লোকে বলে তিনি নীল-কমলাক্ষ। তাই দেবীর প্রসন্নতার জন্য তিনি তাঁহার নীলপদ্ম-সদৃশ চক্ষুদ্বয়ের একটি দেবীকে সমর্পণ করিয়া পূজা সম্পূর্ণ করিবেন। অতঃপর তিনি তূণ হইতে বাণ লইয়া চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলেন। আর ঠিক তখনই দেবী দুর্গা সশরীরে সেখানে উপস্থিত হইয়া রামের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। দেবী বলিলেন, রামচন্দ্রের ভক্তিতে তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন এবং এই মুহূর্ত হইতে রাবণকেও পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং এখন রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিতে পারিবেন। কৃত্তিবাস লিখিতেছেনঃ

নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ
নবমী করিল সমাধান।
দশমীতে পূজা করি, বিসর্জিয়া মহেশ্বরী
সংগ্রামে চলিল রঘুপতি॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণে ষষ্ঠ্যাদিকল্পের ক্রম-অনুসারে দশমী পর্যন্ত রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার যে বর্ণনা আছে তাহাই সাধারণতঃ বঙ্গদেশে অনুসৃত হইয়া থাকে।

'ভক্তিরেব গরীয়সী'

স্বামী গম্ভীরানন্দ

স্বামীজী আলমোড়ায় বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বাইরে ছিল ভক্তি, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন জ্ঞানে পরিপূর্ণ। অপরদিকে স্বামীজী নিজে বাইরে জ্ঞানসাধক হলেও অন্তরে ছিলেন ভক্তিবাদী এবং এই কারণে অনেক সময় তাঁকে নারীর মতো কোমল ও পেলব মনে হতো। এই তুলনামূলক আলোচনায় স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে কি বলতে চেয়েছিলেন জানি না, তবে স্পষ্টতই বোঝা যায় মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সহাবস্থানে কোন অসুবিধা নেই। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনেও এ-অবস্থা দেখেছি। 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ প্রকাশিত রোমাঁ রোলাঁর কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তাঁর (মহাপুরুষজীর) তিনবার নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। অথচ বৃদ্ধ বয়সে ভক্তদের প্রতি কোমলতায় তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ।

শঙ্করাচার্য ছিলেন একই সঙ্গে ভক্ত আবার জ্ঞানী। তাঁর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁর অদ্বৈত দর্শন, সনাতন ধর্মের বৈরীদের উপর তাঁর বিজয় এবং অদ্বৈত-দর্শনরূপ অস্ত্রমুখে তাঁর শাণিত যুক্তি। কিন্তু তিনিই যে আবার সারা ভারতের মন্দির-মঠ পরিদর্শন করেছেন, সেখানে দেবদেবীর প্রতিমা স্থাপন করেছেন, এ-কথাটা লোক ভুলে যায়। দেবদেবীর মহিমামূলক স্তব-স্তোত্রাদিও রচনা করেছেন তিনি।

একই ব্যাপার দেখা যাবে শঙ্করাচার্যের ক্ষেত্রেও। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে ভক্ত আবার জ্ঞানী। তাঁর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁর অদ্বৈত দর্শন, সনাতন ধর্মের বৈরীদের উপর তাঁর বিজয় এবং অদ্বৈত-দর্শনরূপ অস্ত্রমুখে তাঁর শাণিত যুক্তি। কিন্তু তিনিই যে আবার সারা ভারতের মন্দির-মঠ পরিদর্শন করেছেন, সেখানে দেবদেবীর প্রতিমা স্থাপন করেছেন, একথাটা লোক ভুলে যায়। দেবদেবীর মহিমামূলক স্তব-স্তোত্রাদিও রচনা করেছেন তিনি।

৭৮০ থেকে ৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর দু-শতাব্দী পরে এলেন রামানুজ। এই দুশ বছর সমগ্র ভারতে অদ্বৈত-বাদের জয়জয়কার। তারপর কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ঘোষিত 'নেতি নেতি'—'ইহা নয়' 'ইহা নয়' মন্ত্র, ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম বর্তমান' মন্ত্রকে ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ করে তুলল। ভারতের জনসাধারণই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করল, তাদের ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ সিংহাসনচ্যুত হচ্ছে এবং ভক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। অদ্বৈতবাদীরা ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ল মায়াবাদের দিকে—যে মায়াবাদ প্রাকৃতিক জগতের অস্তিত্বের সমর্থক, যদিও বাস্তবিক পক্ষে জগতের কোন অস্তিত্বই নেই। এরকম দর্শন সাধারণ মানুষের মনকে তৃপ্ত করতে পারেনি। সুতরাং রামানুজ এবং তাঁকে অনুসরণকারী ভক্তি-বাদী দার্শনিকরা ক্রমে ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করতে থাকেন। এসব সত্ত্বেও অদ্বৈতবাদীরা তাঁদের নিজস্ব নঞর্থক পথই অনুসরণ করতে থাকেন এবং পঞ্চদশীতে স্পষ্টই ঘোষণা করা হল: গাভীস্বরূপ মায়াবাদের দুটি বৎস—একটি পরমাত্মা, অপরটি জীবাত্মা। এই প্রবণতা পন্ডিতদের আহত করে এবং তাঁরা ঘোষণা করেন: মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ—মায়াবাদ শাস্ত্র হিসাবে মন্দ এবং তা আসলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম।

মায়া সম্বন্ধে বললেও শঙ্করাচার্য মায়াবাদী ছিলেন না—তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদী, যিনি বৌদ্ধদের সামগ্রিক নাস্তিবাদের বিপরীতে স্থাপন করেছিলেন ব্রহ্মকে। তিনি অবশ্য মায়া স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি এবং সম্মাননীয়া। বাহ্যজগতের সমর্থনসূচক একটি সুবিধাজনক মতবাদ বলে মায়াকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'বিষ্ণুষটপদী'তে তাঁর বিখ্যাত শ্লোক:

সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকী-
নস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

হে প্রভু! যখন দ্বৈতবাদ অপগত হয় তখনও আমি তোমারই তুমি আমার নও। কারণ, সমুদ্রেরই ঢেউ, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়।

জ্ঞানের জন্যই যে ভক্তির প্রয়োজন তার সমর্থন উপনিষদও করছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সর্বশেষ মন্ত্রটিতে সুস্পষ্টভাবে সেকথা বলা হয়েছে।

জ্ঞানের জন্যই যে ভক্তির প্রয়োজন তার সমর্থন উপনিষদও করছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সর্বশেষ মন্ত্রটিতে সুস্পষ্টভাবে সেকথা বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলছেন:

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ৬।২৩

যাঁর পরমেশ্বরের প্রতি পরাভক্তি ও পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ভক্তি গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই [উপনিষদুক্ত] এই সকল বিষয় স্বানুভবযোগ্য হয়।

উপনিষদ্ মায়াকে 'দেবাত্মশক্তিঃ' বা ঈশ্বরের নিজস্ব শক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। যেহেতু শক্তি ও শক্তির আধার অভেদ, তাই ঈশ্বরের শক্তি মায়াকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বরং তাকে ঈশ্বরের সমমর্যাদাই প্রদান করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই দৃষ্টি ছিল। তাঁর সংস্পর্শে এসে তোতাপুরীর মতো কঠোর অদ্বৈতবাদীও মা-কালীর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মূর্তির সামনে তাঁর মহিমাত্মক স্তোত্রাদি আবৃত্তি করেছিলেন।

যদিও দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে উপযুক্ত অদ্বৈতবাদ অভিলাষীদের কিছু প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তাঁরা ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, এইরকম দম্ভোক্তিও সহ্য করেছেন, তথাপি শেষ পর্যন্ত তিনি জ্ঞানকে ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাননি। এটা বিশেষভাবে দেখা যায় তাঁর নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে; যিনি প্রথমে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বলেছিলেন, অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতার প্রায় সমতুল্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি সেই অদ্বৈতবাদকেই এত ভালবেসেছেন যে দ্বৈতবাদী সঙ্গীত পরিত্যাগ করে অদ্বৈতবাদী সঙ্গীত ও স্তোত্রাদিই গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে সংশোধন করে দিয়েছেন। বলেছেন, জ্ঞান নীরস বস্তু এবং ভক্তি যেমন মানুষকে সামগ্রিকভাবে উদ্দীপিত করে জ্ঞান তা পারে না। আমরা দেখি, এই মতবাদ পোষণ করতেন মধুসূদন সরস্বতীও।

শ্রীরামকৃষ্ণও জ্ঞানকে ভক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চাননি। এটা বিশেষভাবে দেখা যায় তাঁর নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে: যিনি প্রথমে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বলেছিলেন, অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতার প্রায় সমতুল্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি সেই অদ্বৈতবাদকেই এত ভালবেসেছেন যে দ্বৈতবাদী-সঙ্গীত পরিত্যাগ করে অদ্বৈতবাদী সঙ্গীত ও স্তোত্রাদিই গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে সংশোধন করে দিয়েছেন। বলেছেন, জ্ঞান নীরস বস্তু এবং ভক্তি যেমন মানুষকে সামগ্রিকভাবে উদ্দীপিত করে জ্ঞান তা পারে না। এই মতবাদ পোষণ করতেন মধুসূদন সরস্বতীও।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে তিনি এই শ্লোকটি লিখেছেন:

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ
কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মহো
ধাবতি॥

ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে যোগিগণ যে গুণ-কর্ম-বিবর্জিত দিব্যজ্যোতি দর্শন করেন তা তাঁরা দেখুন। কিন্তু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কালিন্দীতটের বেলাভূমিতে ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ নীল জ্যোতির আশ্চর্যময়তায় চিরকাল পূরিত থাকুক।

ভাগবতপুরাণেও দেখা যায় জ্ঞান ও ভক্তির সহাবস্থানে কোন ব্যত্যয় দেখেননি ভাগবতকার; পরন্তু নিম্নলিখিত শ্লোকে ভাগবত ঘোষণা করেছেন

যে, জ্ঞানের চূড়ান্ত স্তরে উত্তরণ করলে ভক্তি স্বতঃই সেখানে আবির্ভূত হয়ঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥
১।৭।১০

হরি এমনই গুণসম্পন্ন যে, আত্মজ্ঞানে তৃপ্ত ও সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত ঋষিরাও তাঁর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম পোষণ করেন।

ভাগবতপুরাণেও দেখা যায় জ্ঞান ও ভক্তির সহাবস্থানে কোন ব্যত্যয় দেখেননি ভাগবতকার; পরন্তু ভাগবত ঘোষণা করেছে যে, জ্ঞানের চূড়ান্ত স্তরে উত্তরণ করলে ভক্তি স্বতঃই সেখানে আবির্ভূত হয়।

ভক্তি ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই এতই নিবিড় যে দুয়ের মধ্যে যে-কোন একটি অপরটিতে পেঁছে দিতে পারে এবং তারপর উভয়ে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। এই কথা পাচ্ছি ভগবদ্-গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকেঃ

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
১৮।৫৫

ভক্তিদ্বারা সে (সাধক) আমাকে জানে। স্বরূপতঃ আমি কি এবং কে। আমার এই তত্ত্ব জানা মাত্রই যেন আমাতে প্রবেশ করে।

এই শ্লোকটিতে দেখছি, ভক্তি জ্ঞানে পেঁছে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মার প্রতি ভক্তি থাকলে মা তার কাছে জ্ঞানরাজ্যের দ্বারও খুলে দেন। পতঞ্জলিও তাঁর যোগসূত্রে বলেছেন, 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা' (সমাধি-পাদ ২৩) অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির দ্বারা—কেবল অষ্টাঙ্গ যোগই সমাধিলাভের একমাত্র পথ নয়, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও সমাধিতে পেঁছে দেয়।

ভক্তি ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই নিবিড় যে দুয়ের মধ্যে যে-কোন একটি অপরটিতে পেঁাছে দিতে পারে এবং তারপর উভয়ে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। এই কথা পাচ্ছি ভগবদ্গীতায়।

গীতায় আরও একটি শ্লোক আছে যেখানে বক্তব্য হল, জ্ঞান ভক্তিতে পেঁছে দেয়।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৫।১৯

হে ভারত, মায়ামুক্ত যে-সাধক পুরুষোত্তম আমাকে এইভাবে জ্ঞাত হয়, সে সর্বজ্ঞ হয় এবং সর্বতোভাবে মদ্গতচিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে।

গীতা এমনকি এও ঘোষণা করেছে যে, জ্ঞানবান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তঃ

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। ৭।১৭

(আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী) চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।

সুতরাং কলিতে নারদীয় ভক্তির পথই শ্রেষ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বক্তব্য সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।*

* ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭ তারিখে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণ।

ভাষান্তরঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্'

স্বামী ভূতেশানন্দ

আমরা প্রায়শঃ বলে থাকি আমাদের পরিবেশ, পরিস্থিতিতে এমন নানারকম বাধা প্রতিকূলতা ইত্যাদি যে ভগবানকে ডাকতে পারি না। ভুলে যাই আমরাই পরিবেশ সৃষ্টি করি, পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি করে না। একই পরিবেশ, কিন্তু বিভিন্ন মানুষের উপরে তার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়। যদি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ঐকান্তিক ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে পরিবেশের সমস্ত প্রতিকূলতা, বিঘ্নকে অতিক্রম করে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারব। তিনি অনন্ত শক্তিমান। তাঁরই শক্তি মানুষের ভিতর সঞ্চারিত হয়। আমরা নিজের শক্তিতে কিছু করি না, তাঁর শক্তিতেই সব করি। আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র মনে করে সেই শক্তি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছি। তাঁর কৃপা সর্বত্র প্রসারিত, সেই কৃপা গ্রহণ করবার জন্য আমরা অন্তরকে উন্মুক্ত রাখি না। যেমন দিনের বেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে যদি বলি ঘরটা অন্ধকার তেমনি তাঁর প্রভা সর্বত্র বিকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে রাখি আর বলি এখানে আশ্রম নেই, মঠ-মন্দির নেই, ভগবানের কথা শুনবার কোন স্থান নেই। এই নেতিবাচক মনোভাবের ফলে যা-কিছু ভাবব সবই 'নেই' হয়ে যাবে। আর তিনি সর্বত্র আছেন এই আস্তিক্যবুদ্ধি নিয়ে যদি অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে বসে থাক তাহলে অরণ্যও তাঁর প্রভায় আলোকিত হবে। এই ধারণা আমাদের দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে হবে। তাঁকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই দেখতে পাব বাইরেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বব্যাপী, আমরা আমাদের অজ্ঞতার জন্য তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি না। এজন্যই বলছি, পরিবেশ আমাদের প্রতিবন্ধক নয়, পরিবেশের দোহাই দিয়ে আমরা নিজেদের প্রবঞ্চনা করছি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ থেকে সেকথা পরিষ্কারভাবেই আমরা বুঝতে পারি।

দু-চারজন যদি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখে জীবনযাপন করেন, তাঁদের প্রভাবে ক্রমে সমগ্র দেশ প্রভাবিত হবে। বর্ষার মেঘ যেমন মুক্ত হস্তে চারিদিকে বারিবর্ষণ করে, ঠাকুরের করুণাও তেমনি সর্বত্র বর্ষিত হচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই মনে করি আমাদের তিনি কৃপা করছেন না। আমাদের দরকার তাঁর করুণা অনুভব করবার জন্য অন্তরের আগ্রহ, প্রস্তুতি। অন্তরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্যথায় বড় বড় মন্দির, প্রতিষ্ঠান, আশ্রম কোন কাজে আসবে না। ঠাকুরের সেই পদ্মলোচনের মতো—"মন্দিরে তোর নেইকো মাধব,/ পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।" হৃদয়মন্দিরে মাধবকে প্রতিষ্ঠা করলে আর শাঁক ফুঁকতে হয় না, স্বতই তাঁর অধিষ্ঠান অনুভব করা যায়। টাকা থাকলে আমরা মন্দির করতে পারি—পারি মন্দিরে ভগবানের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তাঁকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে হলে হৃদয়ের ঐকান্তিকতা চাই। তাঁকে কাতরভাবে আহ্বান করতে হবে যাতে তিনি আমাদের হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ। তাঁকে প্রতিষ্ঠা করবে কে? আমরা যদি আমাদের অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করে তাঁর পাদপদ্মে নিজেদের উৎসর্গ করি তাহলে দেখব যে, তিনি স্বমহিমায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উজ্জ্বল প্রভায় সবদিক আলোকিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমূর্তি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রতিষ্ঠা চাননি, তাঁকে কেউ উচ্চ মর্যাদা দিলে তিনি সঙ্কুচিত হতেন। বলতেন: আমি কিছু নই। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। তাঁর ভিতরে সদাসর্বদা সেই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরী বিরাজ করতেন, যাঁকে তিনি 'মা' বলতেন। সেই মা তাঁর ভিতরে বিরাজিত হয়ে তাঁর বরাভয়হস্ত চারিদিকে প্রসারিত করছেন, আমাদের সকলকে বর ও অভয় দান করছেন। ঠাকুর সর্বশক্তিমান এই কথায় যদি আমাদের বিশ্বাস আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও আসবে যে তাঁর অপরিমেয় শক্তি আমাদের রক্ষা করছে। তাঁর অনন্ত জ্ঞান, তা আমাদের ভিতর বিকাশের জন্য কেবল সুযোগের অপেক্ষা করছে।

আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝব তিনি বরাভয় মূর্তিতে সর্বত্র বিরাজিত। গীতায় ভগবান বলেছেন : "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—আমার ভক্তের কখনও নাশ হয় না। ঠাকুরও সেইরকম বলেছেন, যদি কখনও দেখিস মনের ভিতর কোন বিকার আসছে, সাধন পথে বাধা আসছে, মনে করিস আমি তাঁর সন্তান। তখন নিজের দীনভাব, দুর্বলতা চলে যাবে।

তাঁর প্রতি একটু শ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হলে তা ক্রমশঃ ভক্তিবারি সিঞ্চনে অঙ্কুরিত হয়ে পত্রপুষ্প শোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে। অপরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাবতে হবে আমি কি করতে পারি। কোথাও কোথাও আমরা বলতে শুনি, এখানে ঠাকুরের ভাবের প্রতি লোকের তেমন কিছু আগ্রহ নেই, এইজন্য চেষ্টা করলেও লোকসমাগম হয় না। প্রসঙ্গতঃ স্মরণে আসে মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নিয়মিত ঠাকুরের বিষয় আলোচনা করতেন, পাঠ করতেন। একদিন গিয়ে দেখেন একটিও লোক নেই। তিনি যথাসময়ে পাঠ করতে আরম্ভ করে দিলেন। কিছু পরে একজন ভক্ত এলেন। দেরি করে আসায় তিনি আর ভিতরে গেলেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে পাঠ সমাপ্ত হলে ভিতরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, এখানে তো একটিও লোক উপস্থিত ছিল না মহারাজ, আপনি কাকে শোনাচ্ছিলেন? রামকৃষ্ণানন্দজী বললেন : "আমি কি তোমাদের শোনাই? আমি ঠাকুরকে শোনাই। তোমরা কেউ নেই ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর তো আছেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছেন। তাঁকে বাদ দিলে সব শূন্য, আর তাঁকে যদি ধরা যায় তো সব পূর্ণ।" এই কথা আমাদের সব সময় স্মরণে রাখতে হয়। ভক্তসংখ্যা দিয়ে বিচারের প্রয়োজন নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ভাব অনুশীলন করা, তা একাকী হোক আর অনেকের সঙ্গে হোক। এতে পরিণামে অবশ্যই কল্যাণ হবে। ঠাকুর বলেছেন, ফুল ফুটলে আপনিই মৌমাছি এসে জোটে, তাদের নিমন্ত্রণ করে আনতে হয় না। তাঁর ভাব নিয়ে যদি একটি জীবন কোন জায়গায় বিকশিত হয় তো তাঁর কাছে চারিদিক থেকে পিপাসু ভক্তেরা এসে সমবেত হয়। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের জানাতে হয় না, তারা আপনিই প্রাণের টানে আসে। সেই টান যদি আমরা ভিতরে জাগাতে পারি তারপর যা হবার আপনিই হবে। কাজেই প্রতিকূলতার কথা ভাবব না, ভাবব আমরা প্রত্যেকে কতখানি ঠাকুরকে আপনার বলে মনে করতে পারি, কতখানি আমাদের প্রাণ তাঁর ভাবে ভাবিত হতে পারে। তিনি তো কৃপা করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁরই কথা : কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে। বাতাস বয়ে যায় কিন্তু পাল না তুললে নৌকা এগোয় না। আমরা যদি পাল তুলে দিই অর্থাৎ তাঁর কৃপা অনুভব করবার জন্য হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করি তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হবে এবং তাঁর ইচ্ছা হলে সেই জীবনের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর ভাবকে চারিদিকে প্রসার করবেন।

তাঁকে কেউ প্রচার করে না, তিনিই অপরকে যন্ত্র করে তাঁর ভাব প্রচার করেন, এ-কথাটুকু মনে রাখতে হবে। আমাদের হৃদয় যাতে তাঁর আলোকে আলোকিত হয় সেজন্য হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। তাঁর ভাবকে গ্রহণ করবার জন্য যদি মনের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলেই যথেষ্ট, আর কিছুর দরকার নেই। তারপরে যা প্রয়োজন তিনি নিজেই তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

পবিত্র এই যুগে আমরা জন্মেছি, স্বামীজী যাকে সত্যযুগ বলেছেন, যে-যুগে ঠাকুরের ভাব জ্বলজ্বল করছে। আমরা একটু সচেতন হলেই বুঝতে পারব তাঁর ভাব সর্বত্র বিস্তারিত, প্রবাহিত। আমাদের কেবল দরকার গ্রহণ করবার জন্য একটু আগ্রহ। তাহলে দেখব সেই অনন্তধামে আমরা অনায়াসে পৌঁছে গিয়েছি।

ঠাকুর এসেছিলেন আমাদের পথ দেখাবার জন্য, আমাদের পথকে তাঁর জীবনালোকে আলোকিত করার জন্য। আমাদের ভিতরে তিনি প্রেরণা দেবেন, বল দেবেন আর দেবেন আমাদের দিব্যদৃষ্টি যে-দৃষ্টিতে আমরা পরিষ্কার ভাবে পথ দেখতে পাব।*

* ৯ অক্টোবর, ১৯৮৫ পূর্ণিমা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

বেদে শক্তিতত্ত্ব

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টির কারণটি ব্যাখ্যা করিবার জন্য যেমন সাংখ্যে প্রকৃতি ও বেদান্তে মায়াতত্ত্বকে স্বীকার করা হইয়াছে, তেমনি তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রে শক্তিতত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রকৃতি ও মায়াতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উভয় তত্ত্বেরই মৌলিক ভাবটি বেদেই নিহিত রহিয়াছে। তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রস্বীকৃত শক্তি-তত্ত্বের উৎসটিও যে বেদেই পরিলক্ষিত হয় বর্তমানে আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব। তান্ত্রিক আচার্যগণ তাঁহাদের রচনার বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের শাস্ত্রকে বেদসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] সুতরাং তাঁহাদের উক্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বলা যায় যে সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়ার ন্যায় তন্ত্রের শক্তিতত্ত্বের মূলটিও বেদেই নিহিত।

বেদান্তের মায়ার ন্যায় শক্তি-শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট না হইলেও সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় বেদে 'শক্তি' শব্দের প্রয়োগ যে একেবারে দেখা যায় না, তাহা নহে। পরন্তু, মোটামুটিভাবে বেশ কয়েকটি স্থানে 'শক্তি' শব্দের প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল স্থানে সাধারণতঃ বল বা সামর্থ্য বুঝাইতেই শক্তি শব্দের প্রয়োগ হইলেও অন্যান্য অর্থও পরি-লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে দেখা যায় যজমান ইন্দ্রের নিকট তাঁহার স্তুতির নিমিত্ত শক্তি বা সামর্থ্যলাভের প্রার্থনা করিতেছে।[২] প্রথম মণ্ডলের আর একটি মন্ত্রেও সামর্থ্য-অর্থে শক্তি শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলা হইয়াছে যে যজমানের উচ্চারিত মন্ত্রের দ্বারা অথবা তাহার শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা অগ্নির নিমিত্ত যে স্তুতি করা হয়, তাহার দ্বারাই অগ্নি বর্ধনশীল হইয়া থাকেন।[৩] বেদের এই সকল স্থানে প্রযুক্ত শক্তি শব্দের অর্থ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে যজমান বা দেবতা—সকলের ক্ষেত্রেই স্ব স্ব কর্মে পারদর্শী হইতে হইলে কর্মের প্রচোদনার বা প্রেরণার কারণরূপ শক্তি বা সামর্থ্যের প্রয়োজন।

সর্ব কর্মের মূলস্বরূপ এই শক্তি ব্যতিরেকে সকলেই ক্রিয়াহীন। 'সৌন্দর্যলহরী'তেও বলা হইয়াছে, পরমশিব শক্তিযুক্ত হইলেই সৃষ্টিক্রিয়ায় সমর্থ হন; অন্যথায় তিনি স্পন্দনেও অসমর্থ।[৪] শক্তি বা সামর্থ্যযুক্ত হইলেই অনুষ্ঠেয় কর্ম সাধিত হইতে পারে—বিশ্বের মূল তত্ত্ব হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব, সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা। শক্তির এই বৈশিষ্ট্যটি ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে পরোক্ষভাবে হইলেও যজমান বা ঋত্বিক্ কিম্বা দেবতা, কেহই আপন আপন শক্তির বা সামর্থ্যের বিকাশ ব্যতিরেকে যে আপন আপন কার্যসাধনে অসমর্থ তাহাই সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব তন্ত্রোক্ত শক্তিতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যটি—যাহা অখিল কার্যজননের কারণস্বরূপ, বেদেই পরিলক্ষিত হয়।

১ তন্ত্রশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে তন্ত্রের বেদাত্মতত্ত্বের কথা উক্ত হইয়াছে। যেমন, কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'তস্মাৎ বেদাত্মকং শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাত্মকং প্রিয়ে' (২।৮৫)। নিরুত্তর তন্ত্রে তন্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে (প্রাণতোষিণী, ৭০)। কুলার্ণবতন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে বেদের অধিক বিদ্যা নাই এবং কৌলাধিক তত্ত্বও নাই—'ন হি বেদাধিকাবিদ্যা ন কৌলসমদর্শনম্'—৩।১১৩। মনুসংহিতার বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলেন, বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে শ্রুতি দ্বিবিধ—'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতি কীর্তিতা'। এই সকল উক্তি হইতে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের ন্যায় তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রেরও বেদাত্মকত্বই প্রতিপাদিত হয়।

২ স ন ইন্দ্র ত্বয়তায়া ইষে ধাস্ত্মনা চ যে মঘবানো জুনন্তি।
বস্বী ষু তে জরিত্রে অস্তু শক্তির্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৭।২০।১০

৩ এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যত্তে চকৃমা বিদা বা॥ ১।৩১।১৮
শক্তী=শক্ত্যা (সুপাং সুলুগিত্যাদিনা তৃতীয়ায়াঃ পূর্বসবর্ণদীর্ঘত্বম্)।

৪ শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥—সৌন্দর্যলহরী, আরম্ভশ্লোক।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে শক্তি শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগের মাধ্যমে বলা হইয়াছে যে সোমের উদ্দেশ্যে স্তুতিকারী মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ শক্তিসমূহের মাধ্যমেই বহুবিধ স্তুতিকর্মে সমর্থ হন।[৫] সায়ণ এখানে 'শক্তিভিঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন যাগাদিকর্মের সহিত।[৬] অর্থাৎ যাগাদিকর্মের নামান্তরই শক্তি; কর্মরূপ শক্তির মাধ্যমেই ঋত্বিক্ দেবতার স্তুতিসাধন করেন, তাঁহার সহিত সাযুজ্য অনুভব করেন। অতএব শক্তি এখানে দেবতা বা পরমতত্ত্বের সহিত উপাসকের সাযুজ্যানুভবের উপায় বা মাধ্যমস্বরূপ। তন্ত্রে পরমশিবের সহিত সাধকের ঐকাত্ম্যানুভবের উপায়রূপে একমাত্র শক্তিতত্ত্বকেই স্বীকার করা হইয়াছে—[৭] পরোক্ষভাবে যাহার সমর্থন আমরা ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রে দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি মন্ত্রে আমরা প্রত্যক্ষভাবে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই, যাহাতে সাধারণভাবে শক্তির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রকাশিত হইয়াছে।[৮]

বেদে প্রত্যক্ষভাবে শক্তিতত্ত্বের স্বরূপ যেভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা পরোক্ষভাবেই শক্তির তন্ত্রসম্মত স্বরূপের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখ্য হইল ঋগ্বেদের বাক্‌সূক্ত বা দেবীসূক্ত। এই সূক্তটিকে শাক্তাগমের মূলরূপে স্বীকার করা হয়—[৯] যাহাতে ঋষি অম্ভৃণকন্যা বাগ্‌দেবী পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যরূপে সমস্ত জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং তিনিই জগদ্রূপেও যে প্রকাশিত হন, এ কথাও বলা হইয়াছে।[১০] জগতের অধিষ্ঠানরূপে এই বাক্‌-রূপা দেবী—যাহাকে শক্তিরূপে তন্ত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে ইহার স্বরূপ অবগত হওয়ার পূর্বে ইহার পশ্চাৎপটরূপে বেদের অপর কয়েকজন দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বেদে মোটামুটিভাবে সকল দেবতাই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিরূপে স্তুত হইয়াছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, সবিতা বা সূর্য ইত্যাদি দেবতাগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিরই এক একটি প্রতীকস্বরূপ। প্রত্যেক দেবতাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বা সমষ্টিগতভাবে জগতের আশ্রয় ও কারণস্বরূপ তত্ত্ব বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছেন, নানাত্বপরিপূর্ণ জগৎকে সেই তত্ত্বেরই বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু যখন কোন চেতন দেবতাকে তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, তখন তাঁহা হইতে কিরূপে নানাত্বরূপ পরিণাম হইতে পারে? চেতন কোন তত্ত্বের কখনই পরিণাম সম্ভবে না। বেদের ঋষিও যে এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন না, এমন নহে। বিভিন্ন দেবতার সহিত অনুস্যূতরূপে তাঁহারা এমন একটি তত্ত্বের কথাও বলিয়াছেন, যাহার পরিণাম হইতে পারে, যাহার মাধ্যমে দেবতা ক্রিয়াশীল হইয়া ওঠেন। যেমন, অগ্নির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি জ্যোতিঃপুঞ্জ,[১১] তিনি সেই বৃহৎ জ্যোতির মাধ্যমে সর্বত্র বিভাসিত হন,[১২] তিনি ধ্রুব বা শাশ্বত সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ।[১৩] অর্থাৎ জ্যোতিঃ অগ্নির স্বরূপ অথবা

৫ তব ত্যে সোম শক্তিভির্নিকামাসো ব্যৃণ্বিরে। গৃৎসস্য ধীরাস্তবসো··· —ঋগ্বেদ, ১০।২৫।৫

৬ শক্তিভিঃ যাগাদিকর্মভিরিতি সায়নঃ।

৭ তুলঃ উপায়ো নাপরঃ কশ্চিৎস্বসত্তাবগমাদৃতে।
তামেবানুসরন্ যোগী স্বস্থো যঃ স সুখী ভবেৎ ॥—তন্ত্রালোকটীকায় উদ্ধৃত, ২।৩৪

৮ ···অসংখত্তো ব্রতে তে ক্ষেতি পুষ্যতি ভদ্রা শক্তির্যজমানায় সুন্বতে ॥—দ্রঃ ঋগ্বেদ, ১।৮৩।৩
(ভদ্রা শক্তিঃ—কল্যাণী উৎকৃষ্টং বলমিতি সায়নঃ); পিপীলে অংশুর্মদ্যো ন সিন্ধুরা ত্বা শামী শশমানস্য শক্তিঃ। ৪।২২।৮ ··· (শক্তিঃ স্তুতিকর্মেতি সায়নঃ); ১০।৮৮।১০, ১৩৪।৬ ইত্যাদি।

৯ তুলঃ 'Devisukta, (১০।১২৫) which is interpreted as in honour of the primal energy of life, is made the basis of Saktaism'—Radhakrishnan : Indian Philosophy (Vol. I, p. 487)

১০ তুলঃ পরমাত্মা দেবতা। তেন হ্যেষা তাদাত্ম্যমনুভবন্তী সর্বজগদ্রূপেণ।
সর্বস্যাধিষ্ঠানত্বেন চাহমেব সর্বংভবামীতি ॥—সায়নঃ, ভাষ্যপ্রারম্ভ, ঋগ্বেদ, ১০।১২৫

১১ 'জ্যোতিরনীকঃ'—ঋগ্বেদ, ৭।৩৫।৪

১২ বি জ্যোতিষা বৃহতা ভাতি—ঐ, ৫।২।৯

১৩ 'ধ্রুবং জ্যোতিঃ'—ঐ, ৬।৯।৫ ; 'জ্যোতিরমৃতম্'—ঐ, ৪

অগ্নি জ্যোতিঃস্বরূপাবিশিষ্ট—জ্যোতিঃ ও অগ্নির মধ্যে রহিয়াছে এক অবিনাভূত সম্বন্ধ। এই জ্যোতিঃ কি? জ্যোতিঃ অগ্নির সেই শুদ্ধ বা পবিত্র তপঃ-শক্তিস্বরূপ,[১৪] যাহার মাধ্যমে অগ্নি দেবতাদের মধ্যে 'শোভিষ্ঠ' ও 'তপিষ্ঠ' বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছেন।[১৫]

এই জ্যোতিঃরূপী শুদ্ধ তপঃশক্তির মাধ্যমেই অগ্নি আপন দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠেন, বীর্যবর্ষী জরাহীন অগ্নি আপন শিখার মাধ্যমে মহান্ হইয়া বিভাত হন।[১৬] অগ্নির এই জ্যোতিঃশক্তির প্রকাশ না হইলে আকাশে সূর্য, নক্ষত্র কিছুই দীপ্ত হয় না এবং ফলস্বরূপ ভূলোকও আলোকিত হয় না।[১৭] এই ধ্রুবজ্যোতিঃর মাধ্যমে অগ্নি সর্বভূতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন।[১৮] অগ্নির এই জ্যোতিঃশক্তি অগ্নির সহিত অবিনাভূত সম্বন্ধে সম্বন্ধ—যাহাকে স্থানে স্থানে বৃষভ-ধেনুর মিথুনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে।[১৯] ঋগ্বেদে অন্য এক দেবতা সূর্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি উত্তম জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সমস্ত জ্যোতির শ্রেষ্ঠ;[২০] তিনি স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা এবং সর্বোপরি অবস্থিত।[২১] এই সূর্য স্বরূপতঃ চেতন বলিয়া তাঁহার পরিণাম সম্ভব হয় না। তাই পরিণামী তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হইয়াছে আর একটি তত্ত্ব—যিনি 'সূর্যা' বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। এই সূর্যা একাধারে সূর্যের পত্নী বা শক্তিস্বরূপ—যাহা হইতে বিসৃষ্টির নিত্য ধারা প্রবহমান,[২২] এবং তিনি সূর্যের দুহিতারূপেও বর্ণিত হইয়াছেন।[২৩] একাধারে এই পত্নী ও দুহিতৃভাব অসঙ্গত নহে—'শক্তি একদিক দিয়ে তাঁহাতে বিসৃষ্টা বলে দুহিতা, আরেকদিক দিয়ে বিসৃষ্টির নিত্যসামর্থ্যরূপে জায়া।'[২৪] তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রে তাই 'গিরীশ'-দুহিতাই 'গিরিশ'-জায়া। সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণেও উক্ত ভাবের সমর্থন পাওয়া যায়।[২৫] যাহাই হউক, সূর্য ও সূর্যার অর্থাৎ অপরিণামী ও পরিণামী তত্ত্বের পারস্পরিক সম্বন্ধেই যে বিসৃষ্টির ধারা চলিতে শুরু করে, সংহিতায়ও প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন দেখা যায়।

তন্ত্রেও শিব ও শক্তির যুগনদ্ধতা হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ স্বীকার করা হয়।[২৬] শিব ও শক্তির এই যুগনদ্ধতা বা সামরস্যের আর একটি স্পষ্ট চিত্র

১৪ তুলঃ 'শোচিঃ। তপঃ জ্বলতো নামধেয়ানি'—নিঘণ্টু, ১।১৭
১৫ তুলঃ শোচা শোচিষ্ঠ দীদিহি বিশে ময়ো রাস্ব স্তোত্রে মহাঁ অসি ॥—ঋগ্বেদ, ৮।৬০।৬
১৬ বৃষা হ্যগ্নে অজরো মহান্ বিভাস্যর্চিষা।
অজস্রেণ শোচিষা শোশুচচ্ছুচে সুদীতিভিঃ সু দীদিহি ॥—ঐ, ৬।৪৮।৩
১৭ অগ্নে নক্ষত্রম্ আ সূর্যং রোহয়ো দিবি দধজ্জ্যোতিজনেভ্যঃ ॥—ঐ, ১০।১৫৬।৪
১৮ ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং... ইত্যাদি ঐ, ৬।৯।৫
১৯ তুলঃ 'অগ্নিহ নঃ প্রথমজা ঋতস্য পূর্ব আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ' ॥—ঐ, ১০।৫।৭
২০ শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ॥—ঐ, ১০।১৭০।৩
২১ শীর্ষ্ণঃ শীর্ষ্ণো জগতস্তস্থুষস্পতিম্ ॥—ঐ, ৭।৬৬।১৫
সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥—ঐ, ১।১১৫।১
প্রত্যেক দেবতার সহিতই জ্যোতিঃর অবিনাভাবসম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে—
অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিরিন্দ্রো জ্যোতির্জ্যোতিরিন্দ্রঃ।
সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ ॥—সামবেদ, মন্ত্র ১৮৩১, যজুর্বেদ, ৩।৯
২২ তুলঃ দিবো দুহিতা ভুবনস্য পত্নী ॥—ঋগ্বেদ, ৭।৭৫।৪
২৩ দুহিতা সূর্যস্য, ঋগ্বেদ, ১।১১৬।১৭, সূরো দুহিতা—ঐ, ৭।৬৯।৪
২৪ দ্রঃ বেদ-মীমাংসা, (২য় খণ্ড), পৃঃ ২৮৪ (টীকা, ১০০)
২৫ দেবতা নিজেরই দুহিতাতে তাঁহার তেজ নিহিত করিলেন এবং তাহা হইতে সংসৃষ্টি—স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ—ঋগ্বেদ, ১।৭১।৫; প্রজাপতির্হ বৈ স্বাং দুহিতরমভিদধ্যৌ, দিবং বা উষসং বা, মিথুনী এনয়া স্যামিতি তাং সংবভূব ॥—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৭।৪।১
২৬ তুলঃ তদুভয়যমসম্ফুরিতভাববিসর্গময়ং ..., তন্ত্রালোক, ৩।৯১

দেখিতে পাওয়া যায় বৈদিক ঋষির অন্বয় চিন্ময় প্রত্যক্ষের মধ্যে—সেখানে 'চোখের সামনে তিনি দেখছেন সবাইকে আবৃত করে এক ব্যোম বা আকাশ, আর সেই আকাশে বিবস্বান্ এক সূর্য।...একটি ছায়া, একটি আতপ; একটি রাতের আঁধার, একটি দিনের আলো; দুটিতে মিলে অবিনাভূত এক ছায়া-তপের বা উষাসানক্তের মিথুন।'[২৭] সংহিতায় এই দুইটির পারিভাষিক সংজ্ঞা যথাক্রমে 'শম্' এবং 'যোঃ'।[২৮] ঋষি চোখের সম্মুখে দেখিতেছেন এক সর্বব্যাপী আকাশের শূন্যতা—যাহাতে সর্বপ্রকার দ্বৈতের প্রশান্তি; যাহা মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ও তন্ত্রের প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, অদ্বৈত শিবস্বরূপ তুরীয় আত্মা;[২৯] এবং সেই আকাশেই আবার দেখিতেছেন জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যের দীপ্তি—যাহা হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া সর্বদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে, যাহা সমস্ত আলোকের যোনিস্বরূপ, উপনিষদের প্রাণ বা তন্ত্রের শক্তির সমান।[৩০] একই আকাশে আলোর উন্মেষ, আবার আলোর নিমেষ—একই আধারে দেবতার এই উভয় বিভাবের প্রত্যক্ষের দ্বারা বৈদিক ঋষি অতি সহজেই অন্বয় চিন্ময় প্রত্যক্ষের অনুভব করিয়াছেন।[৩১] তন্ত্রেও শিব-শক্তির সামরস্যরূপ তত্ত্বকেই পরম অদ্বৈত তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হইয়াছে—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখিতে পাই যে বেদের ঋষি যে অদ্বৈতবাদের প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অপরিণামী ও পরিণামী উভয় তত্ত্বই সমাবিষ্ট রহিয়াছে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে পরিণামের মূলরূপে যে তত্ত্বটিকে স্বীকার করা হইয়াছে তাহার সহিত অপরিণামী তত্ত্বটির এক অবিনাভূত সম্বন্ধও স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রে পরমশিব ও পরাশক্তির অভিন্নতারূপ যে পরমতত্ত্বের কথা প্রচার করা হইয়াছে, বেদেই তাহার মূল নিহিত হইয়া আছে। অবশ্য এতক্ষণ আমরা এবিষয়ে যাহা আলোচনা করিলাম তাহার দ্বারা স্পষ্টরূপে বা প্রত্যক্ষভাবে কোথায়ও তন্ত্রোক্ত সৃষ্টির মূল উপাদান-সত্তাস্বরূপ শক্তির পৃথক্ স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় নাই।

পূর্বে উল্লিখিত দেবীসূক্তে আসিয়াই আমরা শক্তিতত্ত্বের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। এই সূক্তের প্রথমেই দেখিতে পাই বাক্‌রূপা দেবী রুদ্রাদি বিশ্বদেবতার সহিত একাত্মরূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব দেবতার সহিত জগতের প্রত্যেক পদার্থেই বিচরণ করিতেছেন।[৩২] তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক—উভয়েতেই অন্তর্যামিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।[৩৩] তাই তিনি 'রাষ্ট্রী' অর্থাৎ সমস্ত জগতের ঈশ্বরী স্বরূপা।[৩৪] তিনি বায়ুর ন্যায় অন্যের দ্বারা প্রেরিত না হইয়া স্বেচ্ছায়ই কারণরূপে সমস্ত ভূতভৌতিক জগদ্রূপ কার্য শুরু করিয়া

২৭ বেদ-মীমাংসা (২য় খণ্ড), পৃঃ ২৭৪

২৮ ঋগ্বেদ, ১।৯৩।৭; ২।৩৩।১৩; ৩।১৭।৩ ইত্যাদি বহু মন্ত্রে উভয়ের একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৯ ... একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা ॥—মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ৭।

৩০ উপনিষদে আকাশ ও প্রাণ উভয়কেই সর্বলোকের অধিষ্ঠান ও কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—
'অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১।৯।১)।
আবার, 'কতমা সা দেবতেতি। প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা' (ঐ ১।১১।৪,৫)।
উপনিষদের এই ভাবধারাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মসূত্রে পরব্রহ্মকে আকাশ ও প্রাণ উভয়স্বরূপ বলা হইয়াছে—
আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ; অতএব প্রাণঃ ॥—ব্রহ্মসূত্র ১।১।২২,২৩।

৩১ দ্রষ্টব্য, বেদ-মীমাংসা (২য় খণ্ড), পৃঃ ২৭৪।

৩২ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥—ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।১।

৩৩ অহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ।—ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৬। অত্র সায়নঃ—দিবং চ পৃথিবীং চান্তর্যামিতয়া অহমেব প্রবিষ্টবতী।

৩৪ অহং রাষ্ট্রী ॥ ঐ, ৩। অত্র সায়নঃ—অহং রাষ্ট্রী। ঈশ্বরনামৈতৎ। সর্বস্য জগৎ ঈশ্বরী।

থাকেন। তিনি দ্যাবাপৃথিবীরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া উহাদের উপাদানস্বরূপ।[৩৫] ঋগ্বেদে বাগ্দেবীর এই স্বরূপবর্ণনার মাধ্যমে আমরা বুঝিতে পারি, বেদের ঋষি পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরালে এমন এক সূক্ষ্ম শক্তির সত্তা অনুভব করিয়াছেন, যাহা সমস্ত পরিণামের কারণরূপে অবস্থিত। তন্তুতে পটের ন্যায় সমস্ত কার্যাত্মক জগৎই কারণরূপা শক্তির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে[৩৬]—আপন মহিমার দ্বারাই সেই কারণরূপা শক্তি উহাদের বিকাশ বা অভিব্যক্তি সাধন করেন।[৩৭] কিন্তু এই কারণরূপা শক্তি কোন পৃথক্ দ্বৈত-তত্ত্ব নহে, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের হানি হয়। ইহা পরমাত্মা বা পরমতত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে অবস্থিত—তাঁহারই এক অবস্থাবিশেষ। সায়ন বলেন, সমস্ত জগতের উপাদানস্বরূপ বাক্রূপা দেবী সমস্ত বিকারের ঊর্ধ্বস্থিত বলিয়া অসঙ্গ, উদাসীন, কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ।[৩৮]

ঋগ্বেদের অন্য এক স্থানেও উক্ত হইয়াছে, 'সেই অক্ষর পরম ব্যোমে, যেখানে ঋক্সমূহ অবস্থিত, বিশ্বদেবতা সেখানে অধিষ্ঠান করিতেছেন';[৩৯] আবার, 'সেই পরমব্যোমেই রহিয়াছেন সহস্রাক্ষরা গৌরী বাক্'—[৪০] যাঁহা হইতে বিসৃষ্টির ধারা বহির্গত হইতেছে।[৪১] অতএব একই আকাশে অপরিণামী ও পরিণামী উভয় তত্ত্বই সহাবস্থিত—তাঁহাদের মধ্যে কোন দ্বৈধ বা দ্বন্দ্ব নাই, তাঁহারা একই আকাশরূপী পরম শান্ত অদ্বৈত তত্ত্বের দুইটি বিভাব। তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের আচার্যগণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই পরা বাক্কেই সমস্ত ভূতভৌতিক জগতের কারণরূপে পরমশিবের সহিত অভিন্ন, তাঁহার স্বাতন্ত্র্যশক্তির সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং জগৎকে এই শক্তিরই বিকাশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৪২] পরা বাক্রূপী শক্তি ও ঋগ্বেদের বাক্রূপী দেবী স্বরূপতঃ একই, কারণ তন্ত্রের এই শক্তিও অন্যের ইচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই বিশ্বের কারণ হইয়া বিশ্বরূপে বিকশিত হন।[৪৩] সমস্ত জাগতিক পরিণাম বা কার্য এই শক্তিরই বিবিধাকারে স্ফুরণমাত্র—তাই এই শক্তি বিশ্বের জননীস্বরূপা।[৪৪]

বিশ্বের জননীরূপা কারণ শক্তির আর একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বেদের 'অদিতি'র মধ্যে। চৈতন্যরূপা দেবী অদিতি এমন এক সর্বব্যাপী তত্ত্ব-স্বরূপ—যিনি সমস্ত কিছুর উপাদানভূত,[৪৫] যিনি দেবতা ও দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছেন,[৪৬] যিনি সমস্ত ভুবনকে সমস্ত জীবকে ধারণ করিয়া অবস্থিত।[৪৭] অদিতি সেই মহামাতা, যাঁহাকে যজমান সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষণের নিমিত্ত

৩৫ অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥—ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।৮।
আরও—অহং সুবে পিতরম্ (ঐ,৭)। অত্র সায়নঃ—দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ পিতা দ্যৌঃ। পিতরং দিবমহং সুবে।

৩৬ ... কারণভূতে তস্মিন্ হি বিয়দাদিকার্যজাতং সর্বং বর্ততে তন্তুষু পট ইব ॥ সায়নঃ (ঋগ্বেদ, ১০।১২৫।৭)

৩৭ মহিনা সং বভূব ॥—ঋগ্বেদ, ১৮।১২৫।৮।

৩৮ ... এতদুপলক্ষিতাৎসর্বাদ্বিকারজাতাৎ পরস্তাদ্বর্তমানাসঙ্গোদাসীনকূটস্থব্রহ্মচৈতন্যরূপাহং ... (মন্ত্র ৮)।

৩৯ ঋচেহক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ॥—ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৩৯।

৪০ গৌরী ... বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥—ঐ, ৪১ ৪১ দ্রঃ ১।১৬৪।৪২।

৪২ তুলঃ (ক) চিতিঃ প্রত্যবমর্শাত্ম পরা বাক্ স্বরসোদিতা ॥—ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী, ১।২০৩
(খ) অনন্যাপেক্ষিতা যাস্য বিশ্বাত্মত্বং প্রতি প্রভোঃ।
তাং পরাং প্রতিভাং দেবীং সংগিরন্তে হ্যনুত্তরাম্ ॥—তন্ত্রালোক, ২।৭৪

৪৩ তুলঃ চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ ॥—প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়—১

৪৪ তুলঃ বিমলকলাশ্রয়াভিনবসৃষ্টিমহা জননী ॥—তন্ত্রালোক ১। তত্র টীকায়াম্—জনয়তি বিশ্বমিতি 'জননী' পরা পারমেশ্বরী সৃষ্ট্যাদিচক্রাদ্যা ॥ ... পরৈব হি অনাখ্যা ভগবতী সংবিৎ স্বস্বাতন্ত্র্যাৎ স্বাত্মনি সৃষ্ট্যাদি অবভাসয়তি বিলায়য়তি চ ॥

৪৫ উরুব্যচা (ঋগ্বেদ, ৫।৪৬।৬) ৪৬ বিশ্বদেব্যাবতী (শুক্ল যজুর্বেদ, ২।৬১)

৪৭ ধারয়ৎ ক্ষিতিম্ (ঋগ্বেদ, ১।১৩৬।৩)

আবাহন করে ; যিনি সুব্রতদিগের অর্থাৎ শোভন কর্মকারিগণের মহান্ জননী, যিনি ঋতের পত্নী-স্বরূপা, যিনি অফুরন্ত শক্তির উৎসরূপা, যিনি কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হন না, যিনি সর্বব্যাপিনী, সুখাশ্রয়-রূপিণী, শোভনপ্রণয়নকারিণী।[৪৮] মাতা যেমন তাঁহার সন্তানকে আপন বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া রাখেন, অদিতিও সেইরূপ স্তুতিকারীর স্তুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন।[৪৯] মহামাতা অদিতি সমস্ত সম্পদের প্রসবকারিণী, সর্বব্যাপী বিশাল অন্তরীক্ষ তাঁহারই ক্রোড়ে শায়িত—আমরা বাক্যের দ্বারা তাঁহাকেই আহ্বান করি।[৫০]

এইরূপ বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে অদিতির মাতৃ-রূপের পরিচয় পাওয়া যায়—যিনি বিশ্বভুবনের ধারয়িত্রী, পালয়িত্রী ও সংবর্ধয়িত্রী। তন্ত্রের শক্তিও বিশ্বজননী—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহার দ্বারা সংঘটিত হয়। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রে বিশ্বের মূল কারণরূপে মাতৃরূপিণী শক্তির যে উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার মূলটি বৈদিক দেববাদের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল।[৫১] বেদে অপরাপর বহু দেবীর বর্ণনা দেখা যায়—কিন্তু এই সমস্ত দেবীর মধ্যে অদিতিই মুখ্য স্থানে অবস্থিত। ঋষি গোতমের একটি মন্ত্রে অদিতির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে সমস্ত দেবতা, এমনকি সমস্ত সৃষ্টিই অদিতির উপর নির্ভরশীল ; 'দ্যৌঃ অন্তরীক্ষ, মাতা, পিতা, পুত্র—সমস্তই অদিতি ; অদিতিই বিশ্বদেবতা-রূপে ও পঞ্চবিধ মনুষ্যরূপে প্রতিভাত—যাহা কিছু জাত ও যাহা কিছু ভবিতব্য, সেই সমস্তই অদিতি।'[৫২] অদিতির এই বর্ণনার মধ্যে আমরা এমন এক সর্বব্যাপিনী মাতৃতত্ত্বের পরিচয় পাই—যাহাকে সহজেই তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রস্বীকৃত শক্তিতত্ত্ব-রূপে গ্রহণ করা যায়।

তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের শক্তিতত্ত্বের অপর একটি বৈশিষ্ট্যও আমরা বেদে দেখিতে পাই। তন্ত্রে চৈতন্যস্বরূপ পরমশিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া শক্তিকেও চৈতন্যস্বরূপা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এইজন্যই তন্ত্রে শক্তির অপর নাম 'চিতি' অর্থাৎ চৈতন্য বা প্রকাশ। পরমশিবের এই চিদ্রূপিণী ভগবতী পরাশক্তির আলোকেই সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত হয়—এমনকি স্বয়ং শিবও শক্তির মাধ্যমেই জ্ঞাত হন।[৫৩] বেদের সমস্ত দেবতাই সাধারণভাবে চৈতন্য বা প্রকাশস্বরূপ শক্তিবিশেষরূপে পরিকীর্তিত হইয়াছেন এবং জাগতিক বস্তুসমূহও তত্তৎ প্রকাশ বা আলোকের দ্বারাই উদ্ভাসিত। এমনকি, বেদে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে বলা হইয়াছে যে 'চিত্তি' বা চেতনার দ্বারা দেবতারাও প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে এরূপ একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'দেবতারা অগ্নিকে চিত্তিসমূহের দ্বারা ব্যক্ত করিলেন'।[৫৪] 'চিত্তি' অর্থাৎ অব্যক্তের মধ্যে

৪৮ মহীমূ ষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম।
তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরূচীং সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্ ॥ (যজুর্বেদ ২১।৫)

৪৯ প্রতি মে স্তোমমদিতির্জগৃভ্যাৎ সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুশেবম্ ॥ (ঋগ্বেদ, ৫।৪২।২)

৫০ বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহীমদিতিং নাম বচসা করামহে।
যস্যা উপস্থ উর্বন্তরিক্ষং সা নঃ শর্ম ত্রিবরূথং নি যচ্ছাৎ ॥—(অথর্ববেদ, ৭।৬।৪)

৫১ তুলঃ "It is generally believed that Mother-worship owes its origin to the Tantric cults which developed long after the passing of the eras of the Veda and the Upanishad. But this is an error. Mother-worship finds a significant place in the religions of all ancient civilizations—including the Vedic—and this ought to be no surprise"—M. P. Pandit : Aditi and other dieties in the Veda (P. 4).

৫২ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥—ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০

৫৩ তুলঃ যথালোকেন দীপস্য কিরণৈর্ভাস্করস্য বা।
জ্ঞায়তে দিগ্‌বিভাগাদি তদ্বচ্ছক্ত্যা শিবঃ প্রিয়ে ॥—তন্ত্রালোকটীকায় উদ্ধৃত, ১।২০৩।

৫৪ দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ ॥—ঋগ্বেদ, ৩।২।৩।

ব্যক্তের যে জ্ঞান—যাহা বোধ বা চেতনার জাগরণ হইতে উন্মিষিত হয়।[৫৫] অগ্নির এই ব্যক্ততা বা জন্মটি কিরূপ? ঋগ্বেদের নাসদীয়সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে সমস্তই গভীর তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় বর্তমান ছিল।[৫৬] এই অবস্থায় সমস্ত দেবতা, এমনকি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ অগ্নিও অব্যক্ত ছিলেন। সেই অব্যাকৃত বা অব্যক্ত তমসার মধ্যে বিশ্বদেবতা 'চিত্তি' বা অতন্দ্র অভিনিবেশ দ্বারা সর্বপ্রথম অগ্নির প্রকাশ ঘটাইলেন; চেতনার উন্মেষের দ্বারা অগ্নির সংবিৎ বা আলোক প্রকাশিত হইল—অব্যক্ত ব্যক্ত হইল। 'চিত্তি' বা চেতনার আলোকেই অব্যক্ত অগ্নি ব্যক্ত হন এবং অগ্নি তাঁহার আলোকে সমস্ত জগৎকে আলোকিত করেন।[৫৭] অতএব এক্ষেত্রে আমরা চৈতন্যের দুইটি ক্রিয়া দেখিতে পাই; প্রথমতঃ, চৈতন্য যখন অন্তরাবৃত্ত, তখন তাহা 'চিত্তি'—যাহার আলোকে অব্যক্ত যাহা তাহার ব্যক্ততা-রূপ জ্ঞান হয়। চিত্তির এই আলোকের দ্বারা যখন সাধকের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হয়, তখন সে দেবতার সহিত সাযুজ্য বোধ করে—'অগ্নির সহিত নিজেদের ঐকাত্ম্য অনুভব করিয়া সেই নমস্য দেবতাকে প্রণামপূর্বক পত্নীসহ তাঁহারা অগ্নির নিকট নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন'।[৫৮] 'চিত্তি'র দ্বারা দেবতার সহিত সাযুজ্য অনুভব করিলেই সাধক চৈতন্যের বহিরাবৃত্ত জ্যোতিঃস্বরূপের পরিচয় পায়—চিদগ্নির বিশ্বজ্যোতিতে বিস্ফারণের অর্থ বুঝিতে পারে এবং তখনই তাহার সংবিৎ বা পূর্ণতার উদয় হয়।[৫৯] অন্তরের আলোক 'চিত্তি' ও বাহিরের আলোকজ্যোতিঃ—উভয়ই একই চৈতন্যের আলোক; এক চৈতন্যই সমস্ত উদ্ভাসনের মূল। এই চৈতন্যই তন্ত্রের পরা সংবিৎ বা পরা শক্তি।

বেদে শক্তিতত্ত্বের যে পরিচয় আমরা দেখতে পাই তাহার দ্বারা বলা যায় যে, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে শক্তিতত্ত্বের মূল ভাবগুলি কিঞ্চিদধিক বেদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, স্পষ্টরূপে বেদে কোথাও পরমতত্ত্বের সহিত অবিনাভূত-সম্বন্ধযুক্ত তন্ত্রসম্মত শক্তিতত্ত্বের ন্যায় কোন তত্ত্বকে জগতের মূল উপাদান কারণরূপে উল্লেখ করা হয় নাই। শক্তিতত্ত্বের যাহা কিছু পরিচয় বেদে পাওয়া যায়, তাহা কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ধারণারই সমষ্টি এবং এগুলি হইতে অবিচ্ছিন্ন কোন ধারণা করা খুবই কঠিন।

[redacted]

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বেদে শক্তিতত্ত্বের যে পরিচয় আমরা দেখতে পাই তাহার দ্বারা বলা যায় যে, প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে শক্তিতত্ত্বের মূল ভাবগুলি কিঞ্চিদধিক বেদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, স্পষ্টরূপে বেদে কোথাও পরমতত্ত্বের সহিত অবিনাভূত-সম্বন্ধযুক্ত তন্ত্রসম্মত শক্তিতত্ত্বের ন্যায় কোন তত্ত্বকে জগতের মূল উপাদান কারণরূপে উল্লেখ করা হয় নাই। শক্তিতত্ত্বের যাহা কিছু পরিচয় আমরা বেদে দেখিতে পাইলাম, তাহা কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ধারণারই সমষ্টি এবং এগুলি হইতে অবিচ্ছিন্ন কোন ধারণা করা খুবই কঠিন। তবে সম্ভবতঃ ইহাদের উপর নির্ভর করিয়াই পরবর্তী তান্ত্রিক আচার্যগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে শক্তিতত্ত্বকে একটি বিশেষ স্থানে রাখিয়াছেন।

৫৫ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'বেদ-মীমাংসা' (২য় খণ্ড), পৃঃ ৩৩৯ ও টীকা ১৯১

৫৬ তমঃ আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ॥—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।৩

৫৭ তুলঃ অগ্নে নক্ষত্রম্ আ সূর্যং রোহয়ো দিবি দধজ্জ্যোতির্জনেভ্যঃ ॥—ঐ, ১০।১৫৬।৪

৫৮ সংজানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু পত্নীবন্তো নমস্যং নমস্যন্ ॥—ঐ, ১।৭২।৫

৫৯ অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ॥—ঐ, ৮।৪৮।৩।

দেবী-মাতা-কন্যা

স্বামী পরাশরানন্দ

সভ্যতার সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পারল, বিশ্বসংসারে জননীই হচ্ছে তার সব থেকে আপনার। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও জন্ম দিয়েই তাঁর ভূমিকা শেষ হচ্ছে না।—প্রত্যুত সন্তানের লালনপালন ও জীবনের সবরকম অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায় তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করছেন এই কল্যাণী মাতৃমূর্তি। ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মানুষ আবিষ্কার করল বিশ্ব-জননীকে। আবির্ভূতা হলেন আদ্যাশক্তি যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করছেন আবার রূপে-রসে-গন্ধে বিভিন্নভাবে তাকে পালন করছেন।

বুদ্ধির আলোকে এই আদ্যাশক্তির সন্ধান পাওয়ার পর তাঁর উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদিত হতে লাগল বিভিন্ন সৃজনীশক্তির মাধ্যমে। সভ্যতায়, সংস্কৃতি ও ধর্মভাবের প্রাচীনতম কাল থেকে শক্তি-আরাধনা নানারকম পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত বহু মন্ত্র ও স্তব-স্তুতি দেখতে পাচ্ছি। ঋগ্বেদের যুগ, যা আজ থেকে অন্ততঃ ছ'হাজার বছর আগেকার, সেখানে দেবী অদিতি মহাশক্তিরূপে চিত্রিত হয়েছেন। বিভিন্ন সূক্তে অন্ততঃ আশিবার তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। একদা অদিতিই ছিলেন প্রধান দেবতা, সকলের আগে তাঁরই উদ্দেশে যজ্ঞ হতো। এই ঋগ্বেদেই তাঁর সর্বদেবময়ী ঈশ্বরীরূপের পরিচয় পাচ্ছি। ঋগ্বেদের মন্ত্রে বলা হচ্ছে,—অদিতি দ্যৌ অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, পিতা, পুত্র, সমস্ত দেবতা অদিতি, যা জাত তাও অদিতি আবার যা জন্মাবে তাও অদিতি।[১] আবার অন্য একটি মন্ত্রে[২] বলা হয়েছে অদিতি জ্যোতিষ্মতী তিনি জগৎ ধারণ করে আছেন অর্থাৎ জগতের পালয়িত্রী বা স্থিতিকারিণী শক্তি। আবার তিনি স্বর্গেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঋগ্বেদের যুগেই ঋষিরা সেই এক মহাশক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন যিনি চৈতন্যময়ী, অবস্থাবিশেষে যিনি দেশকালের মধ্যে সর্বব্যাপী সত্তা, আবার দেশকালের অতীত দেশে স্বমহিমায় সদা বিরাজমানা। এই দুরূহ তত্ত্ব জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য রূপের কল্পনা করা হল। বলা হল, 'অদিতি রুদ্রদের মাতা, বসুদের দুহিতা, আদিত্যদের ভগিনী।' আসল কথা অদিতি মাতা, মাতৃদেবতা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তটি দেবীসূক্ত বলে খ্যাত। এই দেবীসূক্তটি মহর্ষি অম্ভৃণের বাক্-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কন্যার উক্তি। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর উপলব্ধি করলেন যে বিশ্বচরাচরে যা-কিছু সবই ব্রহ্ম আর সেই ব্রহ্ম ও তিনি এক। তিনি বলে উঠলেন, "আমি একাদশ রুদ্ররূপে, অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি; দ্বাদশ আদিত্যরূপে সকল দেবতারূপে বিচরণ করি।... আমি সর্বজগতের ঈশ্বরী, উপাসকদের সব ধন আমিই দিই। আমি নিজ-আত্মায় ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছি, আমি ব্রহ্ম। আমি যজ্ঞার্হদের মধ্যে প্রথম-স্থানীয়া। বহুভাবে প্রপঞ্চরূপে আমি অবস্থিতা, সর্বভূতে জীবভাবে প্রবিষ্টা। সেজন্য, সর্বদেশে দেবতারা (জ্ঞানী ব্যক্তিরা) আমারই আরাধনা করেন। ...দেবতাদের এবং মানুষদের সেবায় ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে আমি স্বয়ং এই ব্রহ্মতত্ত্ব বলছি। যাকে ইচ্ছা করি তাকে আমি শ্রেষ্ঠ, তাকে ঋষি বা প্রজ্ঞাবান্ করে দিই।... আমিই কারণরূপে বিশ্বভুবনের উৎপত্তিস্থল

১ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা
স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্। ১।৮৯।১০

২ জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং স্বর্বতীমা।
১।১৩৬।৩

এবং আমিই স্বয়ং বিশ্বভুবনরূপে বর্তমান। বায়ুর মতো সহজে আমি বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করি।··· আবার স্বমহিমায় পৃথিবী ও দ্যুলোককেও ছাড়িয়ে রয়েছি।"

এই অসাধারণ সূক্তটিকে শক্তিতত্ত্বের আদি উৎস মনে করা হয়। সূক্তটিতে কয়েকটি মূল তত্ত্ব আমরা পাচ্ছি, আদ্যাশক্তি বিশ্বচরাচরের মূল কারণ, তিনিই বিশ্বচরাচর হয়েছেন, তিনি এর পারেও আছেন (অর্থাৎ পরব্রহ্মও তিনি) আর সেবা-প্রার্থনার দ্বারা তুষ্ট হয়ে তিনি প্রার্থিত জনকে প্রার্থিত বস্তু (এমন কি ঋষিত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানও) দান করেন। শক্তি আরাধনার যত বিবর্তনই ঘটুক না কেন, তার মূলতত্ত্ব যে এই সূক্তটিতে নিহিত আছে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তত্ত্বের দিক দিয়ে আদ্যাশক্তি হলেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্রী, আবার সাধকের দৃষ্টিতে তিনি অভীষ্টফলদায়িনী, জ্ঞানদায়িনী। অর্থাৎ দেখা গেল যে ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন কালেও মহাশক্তি সম্বন্ধে ঋষিদের সমাধিজাত উপলব্ধি ছিল যথার্থ, অভ্রান্ত।

সংহিতার যুগে আমরা এই আদ্যাশক্তিকে সরস্বতীরূপেও পাচ্ছি। ঋগ্বেদে (২৪।১।১৬) বলা হচ্ছে, 'সরস্বতী শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ নদী ও শ্রেষ্ঠ দেবী।' বেদে নদী ও দেবতা উভয় অর্থেই সরস্বতী ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমদিকে সরস্বতী বলতে সরস্বতী নদীকে বোঝালেও পরের দিকে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি জ্যোতির্ময়ী (সরস্ শব্দের অর্থ জ্যোতি) তাঁকেই বোঝাচ্ছে। এর পরে সরস্বতী আবার বাগ্‌দেবী হয়ে উঠলেন,—'তিনি বাকের দ্বারা ইন্দ্রকে শক্তিশালী করে তুললেন।'* পরবর্তী কালে সব মিলেমিশে সরস্বতী বাগ্‌দেবী, বেদমাতা, জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মের শক্তিতে পরিণত হলেন।

সংহিতার পর এল ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগ। কেনোপনিষদে আমরা আদ্যাশক্তির উমা রূপ দেখতে পাচ্ছি। তিনি ইন্দ্রের সম্মুখে সহসা আবির্ভূতা,—তাঁকে 'বহুশোভমানাম্ উমা হৈমবতীম্' বলা হয়েছে। তিনি ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমা বর্ণনা করছেন। শক্তিরূপিণী উমা এখানে বহু অলংকারে ভূষিতা নারীরূপে বিরাজিতা। যেরকম সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এখানে উমা নামটির প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে মনে হয় ঐ যুগে বিশিষ্টা দেবী-রূপে তিনি প্রসিদ্ধা ছিলেন। 'হৈমবতী' শব্দটির প্রয়োগ এখানে উল্লেখযোগ্য; অর্থাৎ উমা এখানে হিমবৎ পর্বত বা হিমালয় পর্বতের কন্যা। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডেও উমা পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়েরই কন্যা পার্বতী। তিনি ব্রত ধারণ করে উগ্র তপস্যা করেন এবং মহাদেবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মহাভারতে (অনুশাসন পর্বের ১৪০ থেকে ১৪৭ অধ্যায়) উমা মহেশ্বর বা হর পার্বতী সংবাদে উমার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। পার্বতী বর্ণাশ্রম ধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, যতিধর্ম ইত্যাদি নানারকম প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর মহাদেব প্রসন্নমুখে সেগুলির উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তী কালে কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যে দেখাচ্ছেন যে দক্ষকন্যা সতী স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে দক্ষের আলয়ে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। পরবর্তী জন্মে হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবের তপস্যার অবসান ঘটিয়ে মহাদেবের পত্নী হন। পরে আবার দেবতাদের প্রয়োজনসাধনের জন্য কার্তিক ইত্যাদির জননী হন। এই উমা বা পার্বতী দেবীই ভারতবর্ষে শক্তিদেবীর প্রধান রূপ—পরবর্তী কালে অন্যান্য দেবী এই দেবীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি সর্বরূপা মহেশ্বরী দেবী সৃষ্টি করেছেন।

পার্বতী উমাই পরবর্তী কালে হলেন দেবী দুর্গা। জনপ্রিয়তা ও পূজার জাঁকজমকে সকল দেবীকেই অতিক্রম করে মায়ের দুর্গারূপই জনমানসে প্রাধান্য লাভ করল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দুর্গা গায়ত্রীতে দুর্গা নাম প্রথম পাচ্ছি; আবার ঐ আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদের মন্ত্রে (২।২) বলা হচ্ছে, 'অগ্নিবর্ণা, তপস্যায় প্রজ্বলিতা বিরোচনের (সূর্য বা অগ্নির) কন্যা, কর্মফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা দুর্গা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করি। হে রক্ষয়িত্রী, রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে প্রণাম করি। এই শ্লোকটি পরে দেবীভাগবতেও উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে দেবীকে সূর্য বা অগ্নির কন্যা প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু শিবের কোনও উল্লেখ নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে আমরা দুর্গা নাম বেশ

* শুক্লযজুর্বেদ: বাজসনেয়ী সংহিতা, ১৯।১২

করেকবার পাচ্ছি। কিন্তু এখানে দুর্গা নামটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে 'দুর্গাসি দুর্গ-ভবসাগর নৌরসঙ্গা' (৪।১১) অর্থাৎ তুমি দুর্গা, দুর্গম ভবসাগরপারের একমাত্র তরণী। আবার একাদশ মাহাত্ম্যে (৪৯-৫০ শ্লোক) বলা হয়েছে যে সেই দেবী দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করবেন বলে দুর্গাদেবী নামে খ্যাত হবেন।

বিভিন্ন পুরাণাদিতে দেবী দুর্গার পরিচয় পাচ্ছি অস্ত্রে সজ্জিতা, যুদ্ধে সুনিপুণা ও শত্রুবধে রতা রূপে। কিন্তু পার্বতী উমা হচ্ছেন হিমালয়কন্যা শিবপত্নী এবং গনেশ-কার্তিকের মাতা; পরে আবার যখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী ও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে মায়ের কন্যারূপে চলে এলেন তখন তিনিই হলেন মায়ের বর্তমান রূপ দুর্গাদেবী—অবশ্যই দ্বিভুজা ও নিরস্ত্রা। শত শত বছর ধরে মায়ের এই কল্যাণময়ী জননীরূপেই পুজা পেয়ে এসেছে। কিন্তু দেবী যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে যুদ্ধরতা ও অসুরনাশিনী, তিনিই হলেন চন্ডী। পরে দুটি মিলেমিশে বর্তমান দুর্গাদেবীর রূপ যা দুর্গাপুজায় দাঁড়িয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চন্ডী (সপ্তশতী) পণ্ডিতদের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই লিখিত। দুর্গাদেবীকে মাতৃরূপে পুজা উপাসনা প্রার্থনার এটি একটি আকর গ্রন্থ। দেবীর স্বরূপ তাঁর অশুভ শক্তি নাশ করার বর্ণনা, প্রার্থিত ব্যক্তির প্রার্থনা অনুযায়ী ফলদান এবং দেবীর স্তবস্তুতিতে ভরা এই চন্ডী শক্তি সাধকের একটি প্রিয় গ্রন্থ আর দুর্গাপুজায় এই চন্ডীর পুজা ও পাঠ অবশ্যকর্তব্য।

বাংলায় শক্তি-সাধনায়-এর সাথে সাথে আরেকটি ধারাকে দেখি—তা হচ্ছে কালিকা বা কালীর ধারা। পুজার জাঁকজমকে বা উৎসবের দিক থেকে দেখলে দুর্গাদেবী প্রধানা হলেও সাধনার দিক থেকে মা কালী প্রথমা। ঠিকভাবে বলতে গেলে চন্ডীতেই প্রথম দেবীর কালীরূপের পরিচয় পাচ্ছি; চন্ডীর দুজায়গায় দুভাবে কালীর উৎপত্তি দেখতে পাচ্ছি। পঞ্চম মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, হিমালয়ে স্থিতা দেবী পার্বতীর কাছে দেবতারা শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য উপস্থিত হলে দেবীর শরীর থেকে অনিন্দ্যসুন্দরী কৌশিকী দেবী বেরিয়ে এলেন আর এর ফলে দেবী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে হিমালয়বাসিনী কালিকা নামে পরিচিতা হলেন। আবার সপ্তম মাহাত্ম্যে চন্ড-মুন্ড বধের জন্য কুপিতা দেবীর ললাট থেকে অসিপাশধারিণী করাল বদনা কালীকে বাহির হতে দেখা যাচ্ছে; চন্ড-মুন্ড বধের পর তাঁর নাম হল চামুন্ডা।

বিভিন্ন পুরাণে ও উপপুরাণে দুটি জিনিস ধীরে ধীরে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে; একটি হচ্ছে কালী ও পার্বতী অভিন্না, আরেকটি হচ্ছে পার্বতী দেবী তাঁর উমা-গৌরী-দুর্গা-চন্ডী প্রভৃতি সর্বরূপেই কালীদেবী থেকে প্রসূতা, জাতা। দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণের মতে সতী দক্ষের আলয়ে দেহত্যাগ করে হিমালয়কন্যা পার্বতী কালী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কালীর সাথেই মহাদেবের বিবাহ হয়; তারপর কঠোর তপস্যা করে কালীর গায়ের রঙ সোনার মতো উজ্জ্বল হয় আর তিনিই গৌরী নামে খ্যাতা হন।

ঋগ্বেদের যুগ থেকে শুরু করে মা-কালীর পুজা শুরু হওয়ার কাল পর্যন্ত আদ্যাশক্তি ছিলেন দেবী ও জননী। বাংলায় দুর্গাপুজার প্রচলন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে এবং কালীপুজার প্রচলন ষোড়শ শতক থেকে হয়েছে। দুর্গাপুজা ও কালী-পুজা বাঙালী জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়ে এই জাতির সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনাকে গড়ে তুলেছে। শত শত বছর ধরে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার অগণিত সাধক দেবীকে জননীভাবে, মাতৃভাবে ডেকে চোখের জলে ভাসিয়েছেন, আবার সেই চিন্ময়ীর দর্শনলাভ করে জীবন সার্থক করেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে চন্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা পেলাম দেবীর সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ,—তিনি শুধুমাত্র দেবী বা জননী নন, তিনি আদরের কন্যা। বাংলার মায়ের কাছে একসময় কৃষ্ণের গোপালভাব খুবই সরস হৃদয়গ্রাহী ও সাধনার পথ হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল; ব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তিও শত শত বছর ধরে 'দেবী' ও 'মা' নাম শোনার পর সব ঐশ্বর্য ছেড়ে আদরের দুলালী হয়ে বাংলাদেশের ঘরের আঙিনায় চলে এলেন। জ্ঞানীর নিকট যিনি অখন্ড সচ্চিদানন্দ, সাধকের কাছে শ্রীভগবান, মা যশোদার কাছে তিনিই আদরের গোপাল বালক কানাই মাত্র। সৃষ্টি-স্থিতি-

লয়কর্ত্রী ঈশ্বরী দেবতারা যাঁকে আদ্যাশক্তি, মহাদেবী-রূপে স্তুতি করছেন, সাধকরা যুগ যুগ ধরে তাঁকে দেবী ও মা বলে পুজো ও উপাসনা করে চতুর্বর্গ ফল লাভ করেছেন, বাংলা শাক্ত-সাহিত্যে ক্রমে তিনিই হলেন স্নেহের কন্যা উমা।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মায়ের এই রূপান্তর শুরু। মায়ের মধুর কন্যারূপ ও দশভুজা যুদ্ধরতা দেবীরূপের মধ্যে বাঙালী মন সহজেই মধুর কন্যারূপ বেছে নিলেন। তাই বাংলার সর্বপ্রধান মাতৃপুজোর উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবকে বিদগ্ধ ও তাত্ত্বিকরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সাথে যুক্ত করে যতই অসুরনাশিনী দেবী পুজো করে তোলার চেষ্টা করুন না কেন, বাংলার মানুষ কিন্তু মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও অন্যান্য তত্ত্ব বোঝার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না। তারা প্রতিমায় দেবীকে অসুরনাশিনী রূপে দেখলেও মনে মনে কিন্তু ঠিক জানে যে দেবী হচ্ছেন আসলে কন্যা উমা। তিনি কৈলাসে স্বামী শিবের ঘর ছেড়ে কন্যারূপে তিনদিন পুত্রকন্যা নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছেন; এই তিনদিন বাপের বাড়িতে থাকায় এত উৎসব আনন্দ। তারপর চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়া। সাধারণের এই বিশ্বাস ও সত্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠল সাধক শাক্ত কবিদের আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত।

বাংলার জনমানস যে মায়ের দশভুজা যুদ্ধরতা মূর্তি থেকে দ্বিভুজা কন্যামূর্তিই ভালবাসেন দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালিতে সেটি অপূর্ব ভাবে তুলে ধরলেন। মা মেনকা কন্যা উমাকে দেখে বলছেন:

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণসঙ্গিনী?
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগামিনী।
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।

মায়ের আর উপায় নাই। তিনি রণরঙ্গিনী মূর্তি ত্যাগ করে জনমানসের আকুতিতে শান্ত দ্বিভুজা মূর্তি ধারণ করলেন:

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।
ধরেন অপূর্ব রূপ পূর্বের তনয়া॥
দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী॥

আরাধ্যা দেবী যদি শুধুমাত্র স্বর্গের দেবীরূপে থাকেন, মাটির মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ না থাকে, তবে তিনি সাধারণ মানুষের আদর্শ বা অনুকরণীয়া হবেন কিভাবে? মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যদি ভয়ের হয়, মাঝে দূরত্ব ও অপরিচয়ের পাঁচিল তোলা থাকে, তবে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণঢালা ভালবাসা মানুষ তাঁকে দেয় কি করে? তাই সাধক কবিরা দেবীকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একেবারে আটপৌরে কন্যা-রূপে চিত্রিত করলেন তাঁর বাপের বাড়ি ও স্বামীর বাড়ির বর্ণনায়। দেবী উমার বাবা গিরিরাজ ও মা মেনকা বেশ গরিব; বর্ণ হিন্দু হয়ে গরিব বাবা মার পক্ষে উমার উপযুক্ত পাত্র জোগাড় করা খুবই কঠিন। অতএব, শরণ নিতে হয় ব্যবসায়ী ঘটকের। বাকপটু ও চতুর ঘটক নারদ আট বছরের গৌরীর সাথে ঘটকালী করে বিয়ে দিয়ে দেন বাউণ্ডুলে, নেশাখোর, কপর্দকহীন বুড়ো শিবের। স্বামীর ঘর করতে এসে গৌরীর চক্ষুস্থির, দুদিনেই তিনি বুঝে নেন অবস্থা; তাঁর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যায়। লোকমুখে খবর পৌঁছায় মেনকা ও গিরিরাজের কাছে, বাবা গিরিরাজ নিশ্চেষ্ট পাষাণের মতো হয়ে যান। কিন্তু মায়ের প্রাণ তো মানে না, পাষাণ-পতিকে তাগাদা দিয়ে দিয়ে পাঠান জামাই ভোলা-নাথের কাছে। শেষ পর্যন্ত কন্যা ঘরে আসে, তিনদিন যেন উৎসব লেগে যায়, চতুর্থদিন আনন্দের হাট ভেঙে দিয়ে আবার পতিগৃহে গমন। সামাজিক পটভূমিকা ও সাধারণ সমাজজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন আরাধ্যা দেবী ও মাতা।

কন্যার প্রতি মাতাপিতার যে সহজ বাৎসল্য ভাব তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় ভাবের সমন্বয়ে গড়ে উঠল শাক্ত-সাধনার নবতম ধারা,—দেবী ও মা আরও আপনজন হয়ে উঠলেন বালিকা কন্যা গৌরীরূপে। কমলাকান্ত দাশরথি রায় প্রমুখ কবিদের লেখনীতে এই ভাব-ধারারই পরিচয় পাই:

গিরি। প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক,
এঘর লাগে অন্ধকার॥

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার।
…বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে ;
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ;
জাগিয়া না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।

*   *   *

এলো গিরিনন্দিনী, লয়ে সুমঙ্গল-ধ্বনি,
ঐ শুন ওগো রানি।
চল বরণ করিগে, মা আনি যেয়ে,
কি কর পাষাণ রমণী গো
…গৌরী কোলে করি, মেনকা সুন্দরী,
ভবনে লইল ভবানী ॥

প্রাণের স্নেহময়ী কন্যার বাপের বাড়িতে তিনদিন বাস হয়ে গেল ; নবমী নিশি এসে গেছে, কালই তো মেয়ে চলে যাবে। বাঙালী মায়ের আকুল বেদনা ঝরে পড়ে কবির কলমে ঃ

ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।

*   *   *

রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।

*   *   *

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী দিনে,
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।

কিন্তু, কৈলাসে পাঠাতে এত আপত্তিই বা কেন ? কারণ, উমা একবার কৈলাসে ফিরে গেলে, রূপ থেকে অরূপে (স্বরূপে) গমন করে শিব-অঙ্গে লীন হয়ে গেলে আর তো তার কোনও খবর পাওয়া যাবে না। তখন মেনকা (সাধক) গিরিরাজকে (বুদ্ধিবৃত্তি) পাঠালেও গিরিরাজ উমার সন্ধান পাবেন না। উমা-মায়ের আসল তত্ত্ব তো যোগি-মুনি-ঋষি সকলের নাগালের বাইরে। কিন্তু প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের আকর্ষণে সেই তত্ত্বই তো আবার হাজির মেনকার কুটিরে—

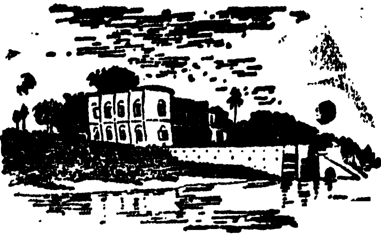
ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার,
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার।

সাধকের প্রেমের ও ভালবাসার দাবি ভগবান কোনও দিনই অস্বীকার করতে পারেননি। যুগ যুগ ধরে তপস্যা করেও যোগীরা যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করতে পারছেন না, মা যশোদার কাছে তিনিই আবার আদরের গোপাল। ক্ষীর-সর-ননী খাওয়া, ননী চুরি করে ধরা পড়া, মায়ের গোপালকে দড়ি দিয়ে বাঁধা ইত্যাদি কাহিনীতে ভরপুর হয়ে আছে ভাগবতের সেই অপূর্ব বাৎসল্য লীলা। যুগের সাথে সাথে গোপালই যেন পরিণত হলেন কন্যা উমায় ; মেয়েকে আদর করা, কোলে নেওয়া, বিয়ে দেওয়া, স্বামিঘরে মেয়ের কষ্টে মায়ের মনোবেদনা, আবার বাপের বাড়িতে এলে আনন্দের উৎসব ইত্যাদি লৌকিক ঘটনায় দেবী ও জগজ্জননীকে কন্যারূপে নিয়ে এসে সাধকের মধুর ব্যবহার মান-অভিমান ইত্যাদি শুরু হল। দেবীকে কন্যারূপে পেয়ে মায়ের গর্বও কম নয়—

জগৎ ভুলে যার মায়ায়,
ভুলেছে সে আমার মায়ায়।
একবার কোলে মা আয়, মা আয়,
মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ।

এককথায় চন্ডীতে বর্ণিত 'সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী' যুগের প্রয়োজনে সব ঐশ্বর্য ছেড়ে বাঙালী মায়ের ছোট্ট আদরের দুলালী কন্যা গৌরীতে পরিণত হলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই শক্তিসাধনার এই নূতন ধারা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। তাই রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধতে জগজ্জননী তাঁর ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে আসেন, বিভিন্ন শক্তিপীঠের আবির্ভাব ইতিহাসে দেখা যায় দেবী ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে এসে শাঁখারির কাছ থেকে শাঁখা পরে আবার জলের মধ্য থেকে শাঁখাপরা ছোট্ট দুটি হাত তুলে দেখাচ্ছেন, আবার দুর্গাদেবীর মূল পূজা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ছোট্ট মেয়ের কুমারী পূজার জনমানসে আকর্ষণ ও আলোড়ন বেশি।

ধর্ম-ইতিহাসের উষাকালে মহাশক্তির শুধুমাত্র স্তব-স্তুতি দিয়ে মানুষ শক্তি-আরাধনার পথে যাত্রা শুরু করেছিল। হাজার হাজার বছর ধরে বহু পথ অতিক্রম করে ও বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে আজ সেই শক্তি-আরাধনাকে দেবীভাব, মাতৃভাব ও কন্যাভাব—উপাসনার এই তিনটি সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে দেখছি। পূজা, উপাসনা ও ব্যাকুল প্রার্থনায় এই তিনভাবেই যুগে যুগে অগণিত ভক্ত সেই মহাশক্তিরই কৃপায় হৃদয়ে চিন্ময়ীর দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মানবজীবন ধন্য করেছেন।



অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দময়ীর আগমন

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

মা আবার আমাদের দেখতে আসছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আসছেন।—স্মরণ করলে আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী। কতই স্নেহময়ী। প্রতি বৎসরেই আমাদিগকে না দেখতে এসে থাকতে পারেন না। বেশি দিন ছেলেকে না দেখে কি থাকতে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হলে কি এ-সকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক করে দিতে পারেন? মায়ের নিকট হতেই এ অবিরত ধারায় স্নেহ পাইয়া তো আমরা অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখতে শিখেছি।

মাকে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—কিছুই আশ্চর্য নয়; মা ছেলেকে কখনই ভুলতে পারেন না। মা নিজে জানেন ছেলে কি বস্তু। ছেলে জানে না, "মা" কি বস্তু, মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মহিমা; যদি জানতুম, আজ আমাদের এরূপ অবস্থা কি হতো? মা নিজে ছেলেকে গর্ভে ধরেছেন, প্রসব করেছেন, কত করে মানুষ করেছেন; ছেলে কি বস্তু, মা খুবই জানেন। না থাকতে পেরে, এত হামেশা ছেলেকে মা দেখতে আসেন। এসে ভালবেসে, কত ভক্তি-বিশ্বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, কি অদ্ভুতরূপে অন্তরে অন্তরে শিখাইয়া যান। আহা! মায়ের সে ভালবাসার সে ক্ষমাশীলতার এক কণাও যদি পাই, মায়ের ছেলে বলে নিজেকে একদিনের তরেও সাধ মিটাইয়া পরিচয় দিই।

আমাদের মাকে ভাল করে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত স্নেহে ভরা, জলে ছল ছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়ালেই যেন শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মা আসবেন,—কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে দেখব,—কত লোকে সমস্ত কাজ-কর্ম ফেলে ঝেলে দেশ দেশান্তর হতে চলে আসছেন। মাকে প্রাণ ভরে পূজা করব—কত লোকে কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ হতে সংগ্রহ করে আনছেন। আজ ঘরে মা আসবেন—কতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত নূতন নূতন বেশ-ভূষা, কতই পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ, কত প্রকারেরই আনন্দ-উল্লাস হতেছে। কত লোকে, ঘরের মলা, বস্ত্রের মলা, শরীরের মলা, মনের মলা সব দূর করে দিতেছেন। মা আসবেন;—দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হতেছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি স্নেহ। ধনীরও কথা যেমন শোনেন, গরিবের কথাও মা তেমনি শোনেন। গরিব, মায়ের কানে কানে বলে দিলেন, "মা, আবার আমার ঘরে এসো।" "আমার গরিব ছেলের আমি ছাড়া আর কেউই নেই"--ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরিব খেতে পায় না; তথাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরিব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন, "আমাদের মা- এত ছোট মা নয়। আমাদের মা সর্বব্যাপী। তাঁর আবার আগমন, আবাহন ও বিসর্জন কি? তাঁর আবার চালকলা দিয়া পূজা কি?"

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সবরকমই হতে পারেন। "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এছাড়া আর কত কি হতে পারেন, তা কে জানে?" তিনি অনন্ত, তাঁহার গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্ত-বৎসল। অপার তাঁর করুণা। যে ছেলে যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তাঁর নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা করে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হলে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের

স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্মল হবে; তখন মা আমাদের নিকট তাঁর অত গম্ভীর ভাব, অত উচ্চ অবাঙ্‌মনসোগোচর ভাব ধারণ করলে, কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু, এখন থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে। বাল্যকালে যাহা করা যায়, শুনা যায়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এদিকে, নানা প্রকারের পার্থিব অনিত্য ভাব সকলের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে লাগল; বড় হয়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জনা এসে জুটেছে—সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজিয়ে দু-দন্ড ধ্যান করতে গেলুম—এক প্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তিতে বালকের মতো—এমন কি সেই নির্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম রহিলাম। আবার বালকের মতো মা বলে যখন কিছু জিনিস চোখে দেখতে, হাতে স্পর্শ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অনেক কষ্টে একটু উন্নতি বোধ করতে লাগলুম। ক্রমশঃ বুঝলুম মায়ের মূর্তি-পূজা দুর্বল মনকে কত সাহায্য করে; অল্পেই কত ফলপ্রদ হয়।

আমাদের মা তো খালি মাটির বা খেলা-ঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিনী, সর্বশক্তিমতী, সর্বশক্তিস্বরূপা। একটি সাধক গাহিয়াছিলেন—"আমার মা যদি কালো হত, তবে কি ডাকিতাম এত; যার কাল তার কাল শ্যামা, আমার সে যে ভাল। যদি কালো, তবে কেন হৃদিপদ্ম করে আলো।" আমার মাকে ডেকে, আমার মাকে পূজে, আমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে—কি করে অস্বীকার করি। মার কাছে যেটা জোর ক'রে অন্তরের সহিত বলি, সেটা যে খেটে যায়—কি করে তা না মানি। "জাননারে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।" মা কি আমার অমনি যে সে; আমি কি অমনি যাকে তাকে মা বলি।—

দেব্যুপনিষৎ বলছেন—

"সর্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবি। সাব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী···।"

অর্থাৎ দেবীর নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাদেবি?" দেবী বলিলেন, "আমি ব্রহ্মস্বরূপা; আমা হইতেই প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন; আমি শূন্য অশূন্য, আনন্দ নিরানন্দ, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান; আমিই ব্রহ্মা অব্রহ্মা; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৈদিক দেবীসূক্তে দেবী বলছেন—

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥···
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম
যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা···॥

অর্থাৎ আমিই জগদীশ্বরী, সকলকে আমিই ধন দিয়া থাকি, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি; যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ; আমি সকল স্থানেই বাস করি—সকলের দেহেই অবস্থান করি; দেবগণ যেখানে যাহাই করুন, আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাৎ সকলের ভিতর আমার শক্তি থাকার দরুনই, সকলে আহারাদি করিতে পারে, দেখিতে শুনিতে পারে, আমারই শক্তির দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। আমাকে যিনি মানেন না তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন। আমিই কারণের কারণ। পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে চৈতন্য এবং মায়ারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি।

বহ্বৃচোপনিষৎ প্রচার করিতেছেন—
"তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ
রুদ্রোঽজীজনৎ সর্বমজীজনৎ সর্বং শাক্তমজীজনৎ।"
অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন।

এই শক্তিই

নিরাকার সর্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের হিতার্থে সাকার রূপ ধারণ করিতেছেন, যথা—সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বলিতেছেন "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বহু শোভমানা স্ত্রীমূর্তি ধারণ পূর্বক 'উমা হৈমবতী' রূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন।

মেধস্ ঋষি

সুরথ রাজাকে বলিতেছেন, "নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততং। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।"—অর্থাৎ সেই জগন্মূর্তিস্বরূপ সর্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই ভক্তদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য মধ্যে মধ্যে আবির্ভূতা হন। যখন এইরূপ আবির্ভূতা হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তাঁহাকে "উৎপন্ন" অথবা "অবতার" বলা যায়।

শিশু গর্ভধারিণীকে "মা" বলে ডাকে, 'মা যে কি বস্তু' তা কি বুঝিয়া ডাকে? "মা" বলে ডাকতে হয়,—ডাকে। জোর মেরে কেটে "মা" বলে ডাকলে, মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে, একরকম শান্তি পায়; তাই "মা" বলে ডাকে। যখন বড় হয় তখন "মা" যে কী বস্তু তা ক্রমশঃ একটু একটু করে বুঝতে পারে। তেমনি আমরাও আগে যখন দশভুজা আনন্দময়ীকে "মা" বলে ডাকতুম তখন তত মাকে বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনলুম 'সেই মা হচ্ছেন—মা দুর্গা, মা হচ্ছেন—ভগবতী ঈশ্বরী,—মাকে নমো করতে হয়, পূজো করতে হয়।'

আরও একটু বড় হলুম, জানলুম—সেই দশভুজা মা আমাদের দুঃখ মোচন করেন, বিপদ হতে উদ্ধার করেন, অন্তরের সহিত ডাকলে কথা শোনেন। এখন একটু জ্ঞান হয়েছে;—সেই দশভুজা দুর্গা সম্বন্ধে বুঝেছি "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী॥ সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী॥ কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥" আরও যখন বুড়ো হব তখন হয় তো এও উপলব্ধি করতে পারব— "যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়,
সকলি মা তুমি ত্রিলোকব্যাপিনী॥"

আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদ্ঘন মূর্তি। মা সর্বব্যাপী;—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইঁট-কাঠের ভিতরে এমন কি সেই ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনই হতে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে; মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি—প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়,—নিশ্চয়ই বলছি—মা আসবেনই আসবেন; এই মাটির প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন। যেমন করে হলে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি করেই তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামিনী, সত্যই ভক্ত-বৎসলা, সত্যই স্নেহময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আসবেনই আসবেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্বশক্তিমতী; আমার ক্ষুদ্র আধারের মতো হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন।

"এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ-পুতলি গো।
হৃদয় আসনে একবার হও মা আসীন
নিরখি তোমায় গো॥
জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে, আমি ধরি
এ জীবন যে যাতনা সয়ে, (তাত জান গো।)
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে 'প্রকাশ'
তাহে আনন্দময়ী গো॥"*

* উদ্বোধন ২ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৮-২৯১

রাত্রির তপস্যা

স্বামী অচ্যুতানন্দ

কুশিক নামেতে ঋষি সৌভ্রভতনয়—
হোমগন্ধ সুরভিত শান্ত স্নিগ্ধ তপোবনে,
ধ্যানমগ্ন গভীর নিশায়।
সহসা ঋষির চিত্ত-পারাবার মাঝে
ভেসে ওঠে অপূর্ব জিজ্ঞাসা—
সর্বজীব-সুপ্তি-স্বরূপিণী তমোময়ী
এ রাত্রির রহস্যের দিশা।
"দিবসের উৎস জানি, বরণীয় ভর্গ সবিতার,
কিন্তু রজনীর—মূল কোথা তাঁর?
জিজ্ঞাসার ঘূর্ণাবর্ত ভেদি ভেসে ওঠে বাণী
ছন্দে গায়ত্রীর,—ঋষি-হৃদি বিমথিত করি।
স্ফুরে তত্ত্ব অভীষ্টদাত্রীর।[১]
অষ্টশ্লোকী বাঙ্ময়রূপিণী
দিব্যমূর্তি বিশ্ব-জননীর।
উচ্চারিত ঋষি কণ্ঠ হতে
বেদস্তুতি মহিমা রাত্রির—
"ব্রহ্মমায়াত্মিকা—ঈশ্বরেরও লয়স্থান যিনি
কালচক্র আবর্তনে ঘুরি বহুপথ
অন্ধকার মহাবিশ্বে নক্ষত্রের দ্বারপথ খুলি
হেরিতেছ সৃষ্টিরে আপন।
কল্যাণী সর্বভূত কর্মফল বিধানকারিণী।
"হেরি কি বিচিত্র খেলা
জ্যোতিঃরূপা মৃত্যুজয়ী অমৃতময়ীর।
অন্তরীক্ষ বিশ্বচরাচর ঢাকিছ মা আপন সত্তায়
উর্ধ্বে অধে তৃণগুল্ম ছেয়ে গেছে তব তমসায়।
পুনরায় খেলাছলে তুলি নিলে তমো আবরণ
গ্রহ তারা চন্দ্র জ্যোতি হয়ে, ছাইলে গগন
জ্যোতির্ময়ী তোমার ছটায়।
মহারাত্রি মোহরাত্রি যিনি—কৃপায় প্রসন্না
হয়ে মহামোহ বিনাশেন তিনি।
"কর্ম অবসানে ভুবনেশী বরণ করেন ধীরে
প্রকাশিকা অনুজা উষাকে—
আবরণী-শক্তি অবিদ্যার।
জ্ঞানালোক হয় উদ্ভাসিত
দূর করি অজ্ঞান আঁধার॥

"অয়ি চিৎশক্তি মহাকালহৃদয়বাসিনী
দিবাশেষে তুমি মাগো ঘোররূপা তিমির রজনী।
আবেশে তোমার সুখে নিদ্রা যায় জীবকুল—
বৃক্ষের কোটরে, সর্বকর্ম অবসানে।
আমাদেরও কর কৃপা তেমনি জননী
ছিন্ন করি জন্মমৃত্যু মায়া পাশ জাল,
আত্মজ্ঞান দানি॥
"আবির্ভাবে তব, গ্রামে জনপদে হে ভুবনেশ্বরী
সুখে নিদ্রা যায় পশুপাখী কামচারী নরনারী।
নাহি তব ভাল মন্দ দৃষ্টির বিচার,
তব কৃপা লাভে সকলের সম অধিকার॥
কৃপাময়ী করুণারূপিণী—
আসে যারা সংগোপনে গ্রাসিতে আমায় রাত্রি অন্ধকারে
ত্বরা করি নাশ মা তাদেরে—
ঈর্ষাদ্বেষ লোভ মোহরূপী সেই বাঘ-বাঘিনীরে।
চিত্ত অপহারী কাম-ক্রোধময় মোর আন্তর বৃত্তিরে।
উপেক্ষিয়া যত দোষ মম, বাঁচাও আমারে—
দান করি ব্রহ্মপদ হে মোর জননী॥
সর্বভূত-হৃদি-জাত ঘোর সে অজ্ঞান
ধরি ঘন কৃষ্ণবর্ণ দাঁড়ায়েছ আবরি নয়ন
তত্ত্ব জ্ঞান লুপ্ত করি মোর।
ঋণ যথা পরিশোধ হলে ঘুচে যায় দুশ্চিন্তার ভার—
তেমনি মা কৃপা করে দূর কর অজ্ঞান আঁধার—
উন্মোচিয়া নয়নের দ্বার—
হেরি মা তোমায়॥
হে সূর্যকন্যে:
দুগ্ধবতী গাভী যথা স্নেহ পরশনে
দান করে সুপেয় প্রচুর।
তেমনি মা স্তুতি জপে হইয়া প্রসন্না আজি
শত্রুজয় পথে মোর বাধা কর দূর।
পরমার্থ লাভ পথে শত্রু আছে যতো
রিপুচয় ঘোর তমিস্রার
দূর করো কৃপা করে
প্রকাশিয়া পূর্বাচলে
নব জীবনের দিব্যপ্রভা ভগিনী উষার॥*

১ রাতি দদাতি (অভীষ্টম্) ইতি রাত্রিঃ, অভীষ্টদানকারিণী।

* ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের দশম অনুবাক্ একশত সাতাশ সূক্তে কথিত বিখ্যাত রাত্রিসূক্তের ভাবানুবাদ।

গৌরীস্তুতি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

(১)

লীলা তো যাঁহার অখিল লোকের উদয় স্থিতি ও লয়ে
যোগিগণ যাঁরে পেতে চান ধ্যানে চিরকাল গুহাশয়ে।
যিনি অসংখ্য অরুণ-তপন পুঞ্জিত দ্যুতিময়ী
কমললোচনা সেই গৌরীর চরণে শরণ চাহি।

(২)

অক্ষরময়ী বর্ণে বর্ণে ধ্বনির বিলাস উঠে
সেই ধ্বনি ধরি বিশ্বমঞ্চে জীবের প্রবাহ ছুটে।
শব্দ-ব্রহ্ম আনন্দময়ী বর্ণ তড়িৎ সম
অম্বুজ-আঁখি ভুবনেশ্বরী গৌরীকে নমো নম।

(৩)

নিত্যশুদ্ধ নিষ্কল শিব জগতের পিতা চুপে—
মায়ের সৃষ্টি-সংহার বিধি দেখেন সাক্ষিরূপে।
জীববন্ধন যাঁহার ক্রীড়ায় মুক্তিদানও তাঁর
শিবের গৃহিণী গৌরীচরণে আনি পূজাসম্ভার।

(৪)

যাঁহার জঠরে বিশ্বজগৎ বীজভাবে রহে লীন
উঠে বার বার সৃজন লীলায় বার বার হয় ক্ষীণ।
পতির সহিত রজত গিরিতে সদাই বিহার যাঁর
পদ্মনয়না মাতা গৌরীর চরণে নমস্কার।

(৫)

বিশ্বভুবন যেন মণিমালা সূত্ররূপিণী মাতা
যাহা কিছু আছে এই চরাচরে তাঁহাতেই আছে গাঁথা।
তত্ত্বজ্ঞানের পথ অনুসরি জাগে তাঁর অনুভূতি
পদ্মপলাশ লোচনা গৌরী চরণে নিবেদি স্তুতি।

(৬)

সারা সংসার ব্যাপিয়া একাকী ক্রীড়ারতা নানাকারা
যেমন ইচ্ছা খেলেন তেমনি বিকাশি শক্তিধারা।
প্রণতজনের কল্পলতিকা সদা বাঞ্ছিত-দায়ী
কমলনেত্রা গৌরীর পায়ে ভক্তিই শুধু চাহি।*

* শঙ্করকৃত 'গৌরীদশকম্' স্তবের ১,৪,৬,৭,৮,৯ শ্লোকের ভাবানুবাদ। ঐ সংখ্যাগুলি কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত হয়নি।

মাগো

অরুণকুমার দত্ত

মাগো,
এত যত্নে যে অর্ঘ্য সাজালাম মালাচন্দনের,
আরতি করলাম পঞ্চপ্রদীপের আলোয়,
তবু কি ছুঁতে পারলাম তোমায়?

জানি
তোমার করুণামাখা প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখ
ধূপের ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাবে ধীরে ধীরে,
তোমার স্নিগ্ধ কোমল অমৃতময় আশিস
ভোরের শিশিরের মতো হারিয়ে যাবে নীরবে।

ভুলে যাব
সমবেত কণ্ঠের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণ—
মঙ্গলকামনায় মুখর একাগ্র আকুল প্রার্থনা:
আমরা কি অভাগা, মা।
আমাদের দৃষ্টি কি চিরকালই নিবদ্ধ থাকবে
কপট উজ্জ্বলতায়,
মন তৃপ্ত হবে
চাটুকার বাক্যে, অগভীর আন্তরিকতায়
অথবা বিসদৃশ চিন্তা ও কাজে?

শুনেছি
শুভাশুভের অন্তহীন সংগ্রামে
অনিবার্য তোমার বজ্রকঠোর উপস্থিতি,
তবু উদ্বেগ ও আতঙ্কে পালিয়ে যাব আমরা?
স্পন্দহীন কোলাহলের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পেরিয়ে
কোনদিনই কি পৌঁছাব না
তোমার পরম আশ্বাসের প্রান্তসীমায়?

জাগরণ-আহ্বানম্*

স্বামী গর্গানন্দ

স্বাধীনদেশস্য সুতো হি ভূত্বা
কিং ভাবয় ত্বং বলহীন ইত্থম্ ।
হীনশ্চ দীনশ্চ কৃপানুপাত্রঃ
ভ্রমাৎ পরং বৈ খলু জাগ্রতোঽসি ॥১
ত্যক্ত্বা হি হিংসাঞ্চ পরানুবাদং
তুচ্ছাতিভাবঞ্চ বৃথৈব বাক্যম্ ।
জাতীয়তত্ত্বঞ্চ পরং গৃহীত্বা
দণ্ডায়মানোঽসি সদা স্বপাদে ॥২
স্বার্থাভিসন্ধিং মনসো বিহায়
শ্রদ্ধাঞ্চ প্রীতিঞ্চ সদাবলম্ব্য ।
দৃষ্ট্বা চ সর্বান্ স্বজনান্ তবৈব
হিতায় তেষাং ভব কর্মযোগী ॥৩
যত্নেন নূনং কুরু পৌরুষং বৈ
স্বকার্যসিদ্ধ্যৈ চ পরাবরায় ।
একাগ্রচিত্তো গুণশীলযুক্তঃ
শক্তঃ পবিত্রো ভব সচ্চরিত্রঃ ॥৪
বিশ্বাস ইত্থং পরমেশ্বরে বৈ
তথৈব কৃত্বা পুনরাত্মশক্তৌ ।
পূর্ণং স্বলক্ষ্যং কুরু জীবনেঽস্মিন্
ততোঽসি ধন্যো মহিমান্বিতোঽপি ॥৫
অতীতমাহাত্ম্য-পদং বিভাব্য
উৎসাহযুক্তশ্চ পরং প্রহৃষ্টঃ ।
বিশ্বাসশক্ত্যা চ ভবিষ্যদ্দৃষ্ট্যা
স্বকর্মভূমৌ হি ভবাবতীর্ণঃ ॥৬
ঐতিহ্যকীর্তৌ নবভারতস্য
কৃষ্টীতিহাসৌ বিধি-শাস্ত্র-ধর্মাঃ ।
নীচোচ্চজাত্যাদিদরিদ্র মূর্খাঃ
শ্রদ্ধাস্পদং তে নিতরাং ভবন্তু ॥৭
আদর্শমূলং হৃদি ধারয়েত্থম্
শৌর্যেন বীর্যেন ভবানুদৃপ্তঃ ।
সংত্যজ্য জাড্যং কুরু কর্ম নিত্যং
পূর্ণঃ প্রবুদ্ধোঽসি মহোদ্যমেন ॥৮
বিধায় চৈক্যং চর সর্বকালে
প্রীত্যা চ বন্ধান্ কুরু দেশবাসীন্ ।
স্মরেতি সাক্ষাদমৃতস্য পুত্রঃ
ত্বমার্যভূমৌ তপসা হি জাতঃ ॥৯
বিরুদ্ধশক্ত্যা চরণং হি পূজা
বীরোঽসি সত্যং নরজীবনেঽস্মিন্ ।
'আচার্য'-বাণীমভয়াং গৃহীত্বা
নির্ঘোষয়োচ্চৈরিহ দিগ্বিদিক্ষু ॥১০
উত্তিষ্ঠ তস্মাদ্ ধর সত্যদণ্ডং
সেবাত্মত্যাগস্য সুকেতনং তৎ ।
প্রতিষ্ঠিতং ত্বং কুরু পূর্বমানং
ভ্রাতর্জয়োঽস্তু তব ভারতস্য ॥১১

* ছন্দ—ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা সংমিশ্রিত

'তোরা এসেছিস'

সুধাংশুভুষণ নায়ক

আমরা তাঁকে দেখতে আসিনি।
কারণ তিনি সেই কবেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন।
দেখতে এসেছিলাম সেই বাড়িটা
যেখানে তিনি অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত ছিলেন
যেখানে বহু মানুষের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁকে দর্শনের,
তাঁর কথা শোনার—তাঁর কৃপালাভের।
প্রশস্ত উদ্যানের সবুজ আস্তরণের
মাঝে লাল কাঁকর বিছানো পথ অতিক্রম
করে বাড়িটার সামনে এলাম।
রুদ্ধশ্বাসে প্রবেশ করেই উপরে উঠেছি।
সেদিনও কি এই বাড়ি, এই সিঁড়ি,
এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছিল?
উপরে উঠে দেখলাম—তাঁর কক্ষে খাটিয়ার ওপর
শয্যায় তাঁর প্রতিকৃতি।
হঠাৎ যেন মনে হল ঐ প্রতিকৃতি কথা বলছে:
'তোরা এসেছিস'।
রুদ্ধদ্বার কক্ষের
সামনে স্বল্প পরিসর বারান্দায় লুটিয়ে
পড়লাম। কানে যেন তখনও ঐ কথা
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: 'তোরা এসেছিস'।

তবুও ডাকব তোমায়

প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কোলাহল হয়তো শোনায় ;
তবু আমি ডাকব তোমায়—
ডাকব বার বার—অনেকভাবে।
মাগো, আমার চেতনায় আবর্তিত হবে
শুধু তুমি।
এই আমার জপমন্ত্র।
আমার ভুল হয়,
তবুও আমি ভীত হইনি কখনো ;
তোমার রক্ষাকবচ যে আমার কণ্ঠে।
কোলাহল শোনায় শোনাক,
বটবৃক্ষের স্নেহচ্ছায়ে তবুও আশ্রয় পায়
পথশ্রান্ত পথিক।
তোমায় আমি ডাকব অনেকভাবে
বার বার—
কোলাহল শোনায় শোনাক।

পরের বাগানে ফুল

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

আনন্দ মনের কাছে অনুভবে কাজে
হৃদয়ে যে উদারতা প্রশস্ত সমাজে
সহজ স্বভাবগুণে প্রার্থিত নিয়ত
অবশ্য নিশ্চিত নয় প্রাপ্তি বা বিরত।

তবু তো চলার পথে পদচারণায়
নির্দেশ ধ্রুবের কিছু থাকাটা মানায়
যদি তা জীবনকর্মে শুভসূচনার
করে থাকে কিছু মাত্র জাগতিক ভাবার।

ভালটা প্রত্যহ থাকে সঞ্চিত সম্পদে
কল্যাণ-প্রদীপ জ্বালা দেব-মসনদে
যা শাশ্বত চৈতন্যের আলো আলো রূপ
চোখ-চাওয়া চোখ-বোজা সবার স্বরূপ।
উপকারী মন নিয়ে হাঁটা-চলা চলে
পরের বাগানে ফুল—প্রশংসায় বলে।

তোমার আনন্দসুর

পলাশ মিত্র

কেবলই আত্মস্বার্থ আত্মসুখ
সুন্দরের স্বাদহীন অসহায় প্রাণ
বুঝেও বুঝি না কেন
শুনেও শুনি না কেন
শুভ্রবস্তু বিশ্বে অমৃতের মধুময়
সেই প্রিয় গান।
হে অনন্ত, হে পরিপূর্ণ।
আকাশে সূর্যে বৃক্ষে তৃণে
তোমার আনন্দসুর বেজে যায় ;
দূর নীহারিকা থেকে ভগ্ন কুটিরে
তোমার গীতের ছন্দ
এ ধূলিকণায়।

আমিই কর্ম আমিই অপেক্ষা

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তোমার তো সেই আঁধার-করা চোখ
তোমার জন্যে বসে আছি এই শীতে
এই শীতে
এই ভুবন কাঁপানো শীতে।
তুমিও তো বসে আছ, বসে নীল জলে
আমি যে তোমার কর্মে কাটাই বেলা।
কে যে বসে আছে
কার অপেক্ষা
কে যে কার কথা ভাবছে ঠিকানা নেই।
আমিই কর্ম
আমিই অপেক্ষা।
অথচ বসেই আছি।

সম্ভবামি যুগে যুগে

জয়ন্তী সেন

কথা ছিল আসবেই— যখনি অতীতে
আর্ত ক্ষুব্ধ শিশু ছিল ক্রন্দনে মুখর,
অসুরদলনীরূপে এসেছিলে। সহস্র বাহুতে
সংখ্যাতীত আয়ুধের
তীক্ষ্ণ তেজ ; ত্রিনয়নে
চির জ্বলন্ত পাবক শিখা ;
চিত্তে কৃপা সমরে নিষ্ঠুর।

কথা ছিল আসবেই—
আমাদের দুঃখী শতাব্দীর
হৃদয়ের আর্তনাদে কতদিন
বিচ্ছেদ ঘটিয়ে
অন্তরালে তৃপ্ত তুমি হতে পার
জননী আমার।

এবার মায়ের স্নিগ্ধ প্রস্ফুটিত
কমলিনী মুখে
সুখ আর ভালবাসা একই সত্তা
প্রদীপ্ত প্রকাশে
যতবার চেয়ে দেখি—অমৃতক্ষরণ
করুণার মধুময় তরঙ্গিত
অপার নির্ঝরে
আয়ত নিবিড় চোখ।
অন্য কোন চিহ্ন রাখ নাই—
ঐশ্বর্যের লেশ মুছে বাহু দুটি
মেলেছ কাতর
সন্তানের পথ চেয়ে—মাতৃরূপে
কান্নার জগতে।

তোমাকে চিনেছি মাগো, চিরশুদ্ধ
লজ্জাপটাবৃতা
শ্রীমুখের অঙ্গীকারে—হৃদয়ের ভাবে
নয়নের বাঁধভাঙা উচ্ছলিত
করুণার স্রোতে।
সব প্রশ্ন ভেসে গেছে—সব দ্বিধা
সব মলিনতা।
নিখিল জগৎসত্তা চিরতৃপ্ত মাতৃসম্বোধনে
অবুঝ শিশুর মতো
পিপাসায়, নির্ভয় উল্লাসে
তোমার নিশ্চিন্ত কোলে অনায়াসে
বেদনা বিস্মৃত।।

যাকে পেলে

নিভা দে

মগ্ন যদি হতে পারি নিজের গভীরে একবার।
যদি একবার ডুবে যেতে পারি একাকী—
নিজস্ব ভিতরের জ্যোৎস্নার অথৈ আনন্দে।

তারই সাধনায় প্রতিদিন পার করি অন্ধকার,
রাশি রাশি দিন দিনের প্রাত্যাহিক যন্ত্রণা
স্বজনের অপমান অবহেলা—
তির্যক্ কথার তীব্র বজ্রপাত···
প্রত্যহের সাবান ফেনায় শুধুই বুদবুদের মতো—
কেটে যায় দিন ভেসে ভেসে অর্থহীনতায়,
একেবারে স্রোতের মুখে কুটোর নিঃস্বতায়—
ভিতরে ভিতরে তবু স্বপ্ন ফোটে প্রতিদিন—
যাব ঠিক একদিন ডুবে—অনন্ত গভীরে।
কালহীন, অব্যক্ত জীবনের সে এক নীরব সহবাস
তার সঙ্গে, যাকে পেলে মনে হবে আর কীইবা
চাব ফের এই অকস্মাৎ ফুটে ওঠা জীবনে।

অপ্রকাশিত

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

আমি চেয়েছি জানতে আমাকে,
করতে চেয়েছি প্রকাশ নিজেকে আমার কাব্যে।
পারিনি। চেষ্টা করেছি বৃথা।
মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে পড়ে না
স্পষ্ট কোন প্রতিবিম্ব।
দ্বিধা-বিভক্ত জীবনে মন আমার পায় না
মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য।

সূর্য যতই সত্য হোক কালো মেঘের আড়ালে
তবু সে থাকে অপ্রকাশিত।
আমার জীবনও সত্য।
তবু তো পাই না তাকে, তার সম্পূর্ণতাকে।

আমি তো দেখেছি জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে,
কাব্যের টুকরো টুকরো অনুভূতি দিয়ে ;
পেয়েছি তাকে দুঃখ সুখের বিচিত্র অভিজ্ঞতায়।
তবুও পাইনি তাকে, তার সম্পূর্ণতাকে।

বাসনার কত ঢেউ নিরন্তর যায়
মিলিয়ে মাঝপথে।
অন্তরের কত অব্যক্ত বেদনা
প্রকাশের লক্ষ্যশীর্ষে পারে না পৌঁছিতে।

যদিও আমার কোন পাঠক
সময়ের গ্রন্থি ধরে সাজায় আমার কবিতা
তবুও পাবে কি সে আমাকে ?
শব্দ দিয়ে আঁটা ফ্রেমে
পারবে কি ধরে নিতে জীবনের সম্পূর্ণতাকে,
শুধু যা হয়েছে নয় তা,
যা পারত হতে। তাও ?

জননী

মধুসূদন পাল

যন্ত্রণায় বিমর্ষ তুমি, শোক-অশ্রু ঝরে অবিরত ;
অনিদ্রায় কাটে রাত, বড়ো হয় জীবনের ক্ষত ঃ
তোমার খনিজ প্রেমে জানি আমি নেই কোন খাদ
যত কাছে আসি আমি, পাই তার নবীন আস্বাদ
ও বুকের শীতলতা, আহা !
পান পাত্রে জুড়োয় শরীর
মৃত্তিকার মতো তুমি দুগ্ধক্ষীরা, আগ্রহে অধীর
পথ চেয়ে বসে থাকো—
সহ্য করো অসহ্য দহন।
আহা, অসহ্য দহন !
লাঞ্ছনায় কাঁদো তুমি
অশ্রুভারে মুখ হয় নত
তোমার মমতা তবু ঘিরে থাকে আমায় সতত
বাংলার মাটি জল বিস্তৃত আকাশ
আমার পিপাসা ইচ্ছা অনুপম শিল্পিত বিশ্বাস।

আমি-তুমি

শান্তশীল দাশ

ভাবি মনে, তোমা'পরে সর্ব সমর্পণ
করে আমি সুখে দুঃখে সকল সময়
থাকব নিশ্চিন্ত হয়ে, হব না বিচল
কোনমতে, কিন্তু কই, পারি না তো আমি।
যখন সুখের দিন, তখন তোমাকে
ভুলে থাকি একেবারে, নিজেকে নিয়েই
মত্ত থাকি ; মনে জাগে কত অহঙ্কার ;
এ সুখ আমার দান, আমারই রচনা।
হায়রে, যখন সেই সুখ সরে যায়,
তখন তোমার পরে কত অভিযোগ,
দিয়েছ এ দুঃখ বলে। কী নির্মম তুমি।
অন্তরে তোমার কোন দয়ামায়া নেই।
আমার এ কাণ্ড দেখে তুমি হাস বুঝি,
আমি ভাসি বেদনায় দু-নয়নজলে।

শ্বেতকেতু

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের এই প্রাচীন পৃথিবী থেকে
শ্বেতকেতু বহুদিন বিদায় নিয়েছে।
হয়তো কিছু অভিমান ছিল,
আরণ্য ভুবন থেকে উচ্চারিত হয়েছিল
কিছু বিনম্র প্রতিবাদ।
শ্রুতি ও অশ্রুতির মাঝে
যা ছিল অস্ফুট।

এখন অন্যতর মূল্যবোধে আচ্ছন্ন পৃথিবী।
যারা যযাতির মতো অভিলাষী
সুখ ও সম্পদভোগী অনন্ত নিয়মাচারী
তারাই এ গ্রহটির সুখী অধিবাসী।
প্রাচীন প্রথা-প্রকরণগুলো তাই
বেছে বেছে তুলে রাখা আছে।
শেলফের শেষ তাকে।
হাজার বছর ধরে জমে ওঠে ধুলো।

ঝড় আসে বৈশাখের দুর্মর প্রবাহে
বর্ষায় আদিগন্ত ধুয়ে মুছে যায়
উড়ে যায় ধুয়ে যায় ধুলো,
তখনই স্মৃতির কুয়াশা ঢেকে
আর এক গভীর প্রমায়।
শ্বেতকেতু আজ আর আসে না।

ধ্যানস্তব্ধ

নিমাই মুখোপাধ্যায়

ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।
এই সেই ভারত—
যে-ভারতকে শৈশব থেকে ভালবেসেছি।
হঠাৎ কানে শুনতে পেলাম—ভাবছ কেন?
এ ভারত পুণ্যভূমি—
এর মাটিতে যাঁরা জন্মেছেন
তাঁরা পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার
চিন্তার সর্বময় রূপ।

মনে হল সেই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে
দিকে দিকে।
বুদ্ধের প্রশান্ত মুখ দেখতে পেলাম।
শুনতে পেলাম 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি
মসজিদের মধ্যে থেকে।
গীর্জার ঘণ্টার মিষ্টি শব্দ ভেসে আসতে লাগল।
হঠাৎ সব একাকার হয়ে গেল।
দেখলাম সব মিলেমিশে একাকার হয়ে
ভেসে উঠেছে একটি রূপ।
সে রূপ—শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানস্তব্ধ রূপ।

জীবন বেয়ে

শান্তিকুমার ঘোষ

যে পর্যন্ত না পৌঁছই পাহাড়-চূড়ায়
পথের সৌন্দর্য বনের সুগন্ধ যেন না ফুরায়
ঝর্নার কলগীতি কুটিরের শান্তি পিছনে না টানে
বিহঙ্গ-কাকলি শিশুর করতালি আলতো ছোঁয় প্রাণে
যা নেই সমতলে পাব কি উচ্চতায় তাহার সমারোহ
ভিতরে ঐশ্বর্য যত ভরবে ফুলে ফলে—ঘনাবে সম্মোহ
শিখরে শিখরে গান শুনব পেতে কান অসীম মন্দিরে
একটি জীবন যদি অনন্ত জীবন বেয়ে তোমায় থাকে ঘিরে।

ধর্মসমন্বয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দান

রেজাউল করীম

উনবিংশ শতাব্দীর যখন আরম্ভ হল তখন ভারতের ইতিহাসে কি দেখলাম ? একদিকে বৃটেন দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষ শাসন করছে, আর অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান ও আরও কয়েকটি ধর্ম পরস্পর ঝগড়া করছে। ধর্মপ্রচারের নামে এক ধর্মের নেতা অপর ধর্মের নেতাকে আক্রমণ করছে। এক ধর্ম অপর ধর্মকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তর্কাতর্কি, অপর ধর্মের নিন্দা, ধর্ম প্রচারের নামে অপর ধর্মকে কুৎসিৎ ভাষায় আক্রমণ করবার প্রচেষ্টা চলছে। তার ফলে ভারতবর্ষে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক কলহ আরম্ভ হল। এইসব কলহ-বিবাদের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই না। তবে এইটুকু বলতে চাই যে, মানুষের জীবন তখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তারা ভাবছিল, ঈশ্বরের রাজ্যে এমন কেউ কি নেই যিনি শান্ত-কণ্ঠে বলবেন : ক্ষান্ত হও, ঝগড়া নয়, বিবাদ নয়, বন্ধুত্বের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মানুষ বাস করবে ? একসময় তারা দেখল, তাদের এই দেশেই আবির্ভূত হয়েছেন এমন একজন মানুষ। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস।

রামকৃষ্ণ পরমহংস এযুগের একজন বিরাট মানুষ। যে-যুগে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব-কলহ প্রবল আকার ধারণ করেছিল, সেই যুগে তিনি এক উদার ধর্মবোধের কথা উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, ধর্ম নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব-বিরোধের কারণ নেই। তাঁর মূল বাণী হল : "যত মত তত পথ।" তর্কশাস্ত্রে একটা কথা আছে 'contradictory thought' অর্থাৎ পরস্পর-বিরোধী চিন্তা। এই মত অনুসারে একটা কথা সত্য হলে তার বিরোধী কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সর্বজনীন হাঁ-সূচক যে কথা—তার বিরোধী সবই হবে সর্বজনীন না-সূচক কথা। 'ঈশ্বর সর্বত্র আছেন'—এই কথার বিরোধী কথা হল 'ঈশ্বর কোথাও নেই'। দুটোই একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। তেমনি ধর্মের ব্যাপারে কেউ যদি দাবি করে তার ধর্ম সত্য এবং তার উত্তরে অপর কেউ যদি বলে, না তোমার ধর্ম মিথ্যা, আমার ধর্ম সত্য, সে ক্ষেত্রে ঠিক কথা কে বলবে ? সেজন্যই জগতে ধর্ম নিয়ে বিরোধ। রামকৃষ্ণ পরমহংস বললেন, 'সকল ধর্মই সত্য। ধর্মের ব্যাপারে তুমি যে-পথই আন্তরিকতার সঙ্গে অবলম্বন কর না কেন সে পথই সত্য'। এমন দৃঢ়ভাবে ধর্মের কথা খুব কম লোকই বলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের এই মহাসাধক পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন করলেন : তোমরা ধর্মের নামে বিবাদ করো না। সব ধর্মই সত্য-পথের নির্দেশ দিয়েছে। নিজ নিজ পথ অনুসারে মানুষ চলুক। কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না, কেউ কারও সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। সবাই এক হয়ে চলুক এক লক্ষ্যের দিকে। পথ যতই বিভিন্ন হোক না কেন সেই লক্ষ্য যে একই ঈশ্বর। কেউ তাঁকে জেহোবা বলে, কেউ বলে ভগবান, কেউ আল্লা বলে, কেউ বলে গড। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

রামকৃষ্ণ পরমহংস যে-কথা বললেন—তা কেবল তাঁর মুখের কথা নয়, তাঁর অন্তরের উপলব্ধির কথা। তিনি তাঁর জীবনে প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্মের মূলনীতি ও আদর্শ নিজের জীবনে পালন করেছেন। আবার হিন্দুধর্মের ধ্যান-ধারণা, পূজা-উপাসনা, যোগসাধন এসব তো তিনি অনুশীলন করেছিলেনই। খ্রীষ্টান ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করেও তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ঐভাবেও একইভাবে ঈশ্বর লাভ হয়। আবার ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করেও সেইভাবে কিছুদিন তিনি চলেছেন। সেই পথে এক চিরন্তন নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা করেছেন, ইসলামের প্রবর্তকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন

এবং সুফিদের মতো কঠোর সংযম পালন করেছেন, এবং বুঝেছেন সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মই ইসলামের আল্লাহ্। শোনা যায়, তিনি একজন খাঁটি মুসলমানের মতো নামাজ প্রভৃতি পালন করেছেন। এইভাবে পরিশেষে তিনি উপলব্ধি করেছেন, যত মত তত পথ। ডাইনে বামে সামনে পিছনে যেখানেই তাকাও না কেন সেই একই ঈশ্বর।

সর্বধর্ম সম্বন্ধে এই যে ধারণা—এ ধারণা ইতিপূর্বে খুব কম মহাপুরুষই পৃথিবীতে দিয়েছেন। আবার শুধু দেওয়া নয়, জীবনে অনুশীলন ও উপলব্ধি। এইখানেই রামকৃষ্ণদেবের জীবনের সার্থকতা। আমরা বুঝতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদর্শ স্বীকার করলে পৃথিবী থেকে ধর্ম-সংকট দূর হয়ে যাবে। একের আদর্শে সকলেই উজ্জীবিত হবে। উড়োজাহাজে মানুষ বহু উপরে যায়—হাজার হাজার ফুট উপরে। সেখান থেকে যখন পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে দেখে সব এক। কোথাও ভেদাভেদ নেই সব এক। গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন। তাঁর মুখ-গহবরে অর্জুন দেখলেন কোটি কোটি নক্ষত্র—কোটি কোটি গ্রহ-তারা বিরাজমান। তখন অর্জুনের ঈশ্বরের উপলব্ধি হল। যেকোন ভাবেই হোক যতদিন বিরাটের উপলব্ধি না হবে ততদিন কোন মানুষেরই ঈশ্বরলাভ হবে না। ঈশ্বরের কল্পনা মানে বিরাটের কল্পনা। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ধ্বংস—এসব ঈশ্বরের মধ্যে নাই। কবির ভাষায় বলব: "যেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ, না থাকে সেথায় কলহ, না থাকে বিবাদ।" সব ধর্মের মধ্যে সেই পরম এককেই আবিষ্কার করা যায়। আজকের যুগে সেই আবিষ্কারের উদার মহৎ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন।

আমরা কথায় কথায় 'বিশ্ব' শব্দটা ব্যবহার করি। বিশ্ব কথাটা যখনই বলব তখনই সব ক্ষুদ্রতা, সব বাধা ব্যবধান, সব বৈসাদৃশ্য মন থেকে দূর করে দেবার কথা ভাবতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্মসম্মেলনে যে অপরূপ ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূলকথা হল—সব মানুষই এক ঈশ্বরের সন্তান। সেখানে তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে ঐক্য কাম্য। তিনি বলেছিলেন: "প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লেখা হোক 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'" ফরাসী জাতি liberty, equality, fraternity-র দাবি ঘোষণা করেছিল—কিন্তু তা তারা স্থাপন করতে পারেনি। নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের বাণী নিয়ে বহু যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তিনি সে-বাণীকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। যুদ্ধের দ্বারা বিশ্বমানবের মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেই মৈত্রীর জন্য প্রেম চাই, সব মানুষকে এক করবার সাধনা চাই।

আজকের যুগে আন্তর্জাতিক প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার কথা প্রচার করা দরকার। আজ বিভিন্ন দেশে অনেক মহান মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছেন যাঁরা ধর্মবিরোধ দূর করে সব মানুষকে এক হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস সেই উদার ধর্মবোধের কথাই বলেছিলেন। তাই দেশের মানুষকে আহ্বান করি তাঁর সেই বিখ্যাত উদার ঘোষণা 'যত মত তত পথ'কে গ্রহণ করে মন্ত্রের মতো তার সাধনা করতে। যদি এই উদার মত গ্রহণ না করে মধ্যযুগের সেই ধর্মযুদ্ধের কথাই ভেবে থাকি তবে মানবজাতির সমূহ ক্ষতি হবে, সব মানুষকে এক করার সাধনা ব্যর্থ হবে। ভবিষ্যতের মানুষ যখন দেখবেন ভারতের একজন সাধক, মানুষকে এক হওয়ার পথ দেখিয়েছেন তখন তাঁরা মুগ্ধ হয়ে সেই সাধককে অভিনন্দন জানাবেন। মুক্তকণ্ঠে তাঁরা বলবেন: "হে মহাসাধক, 'যত মত তত পথ' এই বাণী প্রচার করে তুমি জগতের মহৎ উপকার করেছ—তোমাকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

জ্যোতির্ময় বসুরায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে শাশ্বত ধর্মভাবের যে বিরাট অভ্যুদয় ঘটে এদেশে, যার প্রভাব বিস্তারিত হয় ভারতের বাইরেও, রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষী ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে এক আশ্চর্য ধর্মবিজয় করতে দেখেছেন। দেখেছেন উপেক্ষিত পরাধীন ভারতবর্ষকে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গৌরবময় স্থান করে নিতে—যা সম্ভব হয়েছিল স্বামীজীর প্রচেষ্টায়। আর দেখেছেন দেশব্যাপী সর্বাত্মক নবজাগরণ। যদি কোনও বিশেষ একটি নামের সঙ্গে এই সর্বভারতীয় জাগরণকে চিহ্নিত করতে হয়, তবে সে-নামটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যাঁর প্রধান যন্ত্র বা বাণীস্বরূপ ছিলেন বিবেকানন্দ।

এই ইতিহাস রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে। কবি কীভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে শাশ্বত ধর্মভাবের যে বিরাট অভ্যুদয় ঘটে এদেশে, যার প্রভাব বিস্তারিত হয় ভারতের বাইরেও, রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষী ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষাংশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে এক আশ্চর্য ধর্মবিজয় করতে দেখেছেন। দেখেছেন উপেক্ষিত পরাধীন ভারতবর্ষকে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গৌরবময় স্থান করে নিতে—যা সম্ভব হয়েছিল স্বামীজীর প্রচেষ্টায়। আর দেখেছেন দেশব্যাপী সর্বাত্মক নবজাগরণ। যদি কোনও বিশেষ একটি নামের সঙ্গে এই সর্বভারতীয় জাগরণকে চিহ্নিত করতে হয়, তবে সে নামটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যাঁর প্রধান যন্ত্র বা বাণীস্বরূপ ছিলেন বিবেকানন্দ। এই ইতিহাস রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে। কবি কীভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন? সেকথাই আলোচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয় ভারতের যুবমনে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করিতে সক্ষম হইল। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার বা রামকৃষ্ণের বিরাট ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট বা অভিভূত করে নাই।"[১] প্রভাতকুমারের এই মন্তব্য রবীন্দ্রজীবনী-গ্রন্থে যখন প্রকাশিত হয়, কবি তখন জীবিত। কবির মানসিকতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে নেবার সুযোগ তাঁর ছিল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিচারের পর তিনি এ-ব্যাপারে কবির সঙ্গে আলোচনা করে তবেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন মনে হয়। জীবনীকারের উক্ত অভিমতটি খণ্ডন করা কঠিন। তবে রবীন্দ্রনাথ 'অভিভূত' না হলেও সাধারণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল। সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তরের যোগ কতখানি ছিল, প্রশ্ন সেইখানে। এঁদের সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্যে অল্পই বলেছেন, লিখেছেনও যৎসামান্য।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তাঁর লেখার পরিমাণ স্বল্প—যা আগেই বলেছি—তবু এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীই আমাদের প্রধান নির্ভরস্থল। কারণ তাঁর নিজের লেখা ছাড়া এই প্রসঙ্গের উপর আলোকপাত করতে পারে এমন দলিল বা তথ্য-উপাদান আমাদের হাতে খুবই কম।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আমরা জানি, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্ম। 'যত মত তত পথ' মন্ত্রের উদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মধর্মকে অন্যান্য ধর্মের মতো শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, 'ইদানীং যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী' তাঁদের তিনি যত্নকরে নমস্কার জানাতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের নানা উৎসবে উপস্থিত থেকে উৎসবের আনন্দবর্ধন করতেন। শ্রীমথুরামোহন বিশ্বাসের (মথুরবাবুর) সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে গিয়েছিলেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,

১ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ১ (১৩৪০), পৃঃ ৩৬৮

১।১৩।৫)। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরখানিতে প্রায়ই ব্রাহ্মভক্তদের সমাগম হতো। এঁদের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট নাম: কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শিক্ষিত জনসমাজে সর্বপ্রথম প্রচার করেন তাঁর ব্রাহ্মভক্তরাই। তাঁদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্চর্য ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে জানতে পারেন ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। পূর্বে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া আর যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা মনীষীর (এঁরা ব্রাহ্ম নন) সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকার ঘটে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, স্বামী দয়ানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি।

আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ কি কখনও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন? অথবা তিনি কি কখনও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখেছিলেন?

আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ কি কখনও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন? অথবা তিনি কি কখনও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখেছিলেন? এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদার্পণের ঘটনাটি মনে পড়ে, যার উল্লেখ আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে (কথামৃত, ১।১৩।৫)। ঐ ঘটনা সম্পর্কে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দবাবুকে যে-পত্র দেন সেটি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। কয়েক বছর আগে বিশ্বনাথ রায়ের একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ[২] এই বিষয়ে এতকালের অজ্ঞাত কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত করেছে। ঐ প্রবন্ধে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উক্ত পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, দেবেন্দ্রনাথ-পরমহংসদেব সাক্ষাৎকারের দিন রবীন্দ্রনাথ বাড়িতেই ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎকারের স্থলে উপস্থিত ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেদিন তিনি দেখেছিলেন কিনা সেকথা কবি এখানে স্পষ্ট কথায় জানাননি; তবে চিঠিখানি পড়ে মনে হয়, সে-সুযোগ সেদিন তাঁর হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠিতে উক্ত সাক্ষাৎকারের কালনির্দেশও করেননি। এক্ষেত্রে অনুমান ছাড়া পথ নেই। নানা মতামত ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে বিশ্বনাথবাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৮৬৬ অথবা ১৮৬৯ এই দুই বছরের একটিতে-"তবে ১৮৬৯ অপেক্ষা ১৮৬৬ হওয়াই বেশি সম্ভব।" সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পাঁচ অথবা আট —সম্ভবতঃ পাঁচ।

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে কখনও তাঁকে দর্শন করতে, তাঁর উপদেশ শুনতে যে যাননি, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই রকম ঘটনা ঘটে থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন-না-কোনও জীবনীগ্রন্থে তার উল্লেখ অবশ্যই থাকত। রবীন্দ্রনাথ একবারই সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেছেন—দক্ষিণেশ্বরে নয়, কলকাতায়—নন্দনবাগানে। এই সংবাদের উৎস কথামৃত। প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে দেওয়া হল:

> ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।...
>
> ৺কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ি নন্দনবাগানে। তিনি পূর্বে সদরওয়ালা ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি নিজের বাড়িতেই দ্বিতলায় বৃহৎ প্রকোষ্ঠে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন আর ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া মাঝে মাঝে উৎসব করিতেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ কিছুদিন ঐরূপ উৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঠাকুরকে অতি যত্ন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।
>
> ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নিচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে-ঘরে ব্রাহ্মভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া

২ "মহর্ষি-রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি"—দেশ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। (কথামৃত, ৪।৪।১)।

এই ঘটনার তারিখ ২ মে, ১৮৮৩। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তসঙ্গে যথারীতি কিছু ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যে-ঘরে বসানো হয়েছিল সেখানে রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করেছিলেন কিনা অথবা তাঁর উপদেশ শুনেছিলেন কিনা এ-বিষয়ে কথামৃতকার নীরব। কথামৃতের বিবরণের এক জায়গায় বলা হয়েছে: "ব্রাহ্মভক্তেরা অনেকে নিচের বৃহৎ প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় বেড়াইতেছেন। শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপাসনাগৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিবেন।" মনে হয়, যাঁরা প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় বেড়াচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই দলে। যাই হোক, জানকীনাথ ঘোষাল (তিনি রবীন্দ্রনাথের ভগিনীপতি, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী এবং সরলা দেবীচৌধুরানীর পিতৃদেব) শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে উপস্থিত থেকে তাঁর উপদেশ শুনেছেন; শুধু তা-ই নয়, জানকীনাথ তাঁর একটি সংশয়ের কথাও সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ব্যক্ত করেন।

সেদিনের উৎসবে ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ৫ মে, ১৮৮৩ তারিখের The Statesman পত্রিকায় ঐ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে, সেদিনের সঙ্গীতে মুখ্য কণ্ঠ ছিল রবীন্দ্রনাথের। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি এই রকম: "...In the afternoon Ramkisto Pranakrisna (sic), the sage of Duckhineswar, discoursed on morality and religion. The evening service commenced at 7-30 ··· The choir was led by Baboo Rabindra Nath Tagore."[৩] সঙ্গীত সংক্রান্ত তথ্যটির উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি, সেদিন রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন। কথামৃতের বিবরণে বলা হয়েছে, উৎসবে "সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না।" ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ২২। সেদিনের অভিজ্ঞতার কোনও বিবরণ তিনি আমাদের দিয়ে যাননি। ঘটনাটিরও কোনও উল্লেখ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

* * *

'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামটি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে প্রকাশ্যভাবে প্রথম ফুটল বাংলা ১৩১৫ সনে (ইং ১৯০৯ ?)। ঐ বছরে লেখা 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তিনি নামটি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "দার্শনিক জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-অজ্ঞানী, অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল, তখন চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন।··· তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান-প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন।··· রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।"[৪]

দেখা যাচ্ছে, বরণীয় নামের একটি তালিকায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামটি বসিয়েছেন। তাঁর উদার ধর্ম-সাধনার একটি স্বীকৃতিও উদ্ধৃত অংশের শেষের বাক্যটিতে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী মন্তব্যের জন্য দেখতে হবে তাঁর 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধ যেটি সংকলিত হয়েছে "সঞ্চয়" গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার পূর্বে প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ১৩১৮ সনে (ইং ১৯১২ ?) রচিত এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমা পূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নয়, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে-বৃত্তি শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু

৩ রবীন্দ্রজীবনী—প্রশান্তকুমার পাল, ২য় খণ্ড (১৩৯১), পৃঃ ২২৬
৪ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ (১৩৬৫), পৃঃ ৪৫২

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্তিকে উপাসক কখনও সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি, দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি।··· সরস্বতীর যাঁহারা পূজক···জ্ঞান-স্বরূপ অনন্তের···একটি মাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোন একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা 'সিংহ মায়ের বাহন'। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই যদি শক্তিরূপে দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে-কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোন এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ-কথিত "শক্তি-উপাসক কোন একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা" যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। নামটি স্পষ্ট না লিখেও তিনি 'শক্তি-উপাসকের' পরিচয়টি আমাদের বুঝতে দিয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি রচনায় (তাঁর "Men I have Seen" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলিপুর পশুশালায় সিংহ দেখা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ বা ব্যাকুলতা প্রকাশের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ তাঁর বক্তব্যের উদাহরণ শিবনাথবাবুর নিকট থেকে অথবা শিবনাথবাবুর পরিচিত মহলের কোনও সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। পশুশালায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিজ্ঞতার কোনও বিবরণ কিন্তু শিবনাথবাবুর জানা ছিল না, কারণ তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যায় কথামৃত গ্রন্থে [৪।১১।১]। সেখানে এই বিষয়ে যে-কথোপকথন আছে সেই অংশ পাঠ করলে জানা যায়, পশুশালায় সিংহ দেখা মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনে সিংহবাহিনীর চিন্তা উদ্দীপিত হয়েছিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগন্মাতার ভাবে সমাধিস্থ হন। বাহ্য জগতের জ্ঞানে প্রত্যাবৃত্ত হবার পর পশুশালায় তাঁর আর কিছু দেখবার ইচ্ছা ছিল না—তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। ঘটনাটি সম্যক্ অনুধাবন করলে রবীন্দ্রনাথ রূপ থেকে অরূপে উপনীত হওয়ারই একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখতে পেতেন। দুর্ভাগ্য, বিষয়টি সুস্থিত চিত্তে সম্যক্ না বুঝে, ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ না জেনে তিনি একটি বিভ্রান্তিকর রায় দিয়ে বসেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে নাট্যকার-অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের সমালোচনা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রবাসী পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রীকুমুদবন্ধু সেনকে তিনি বলেছিলেন:

"শুধু রূপকে তো একটা জড় রূপ বলে পূজা করা হয় না, সেই রূপের ভেতর অরূপেরই পূজা হয়। মৃন্ময় প্রস্তর কিংবা ধাতুনির্মিত বিগ্রহকে সেবক চিন্ময়ভাবে গ্রহণ করে। পূজা তো কল্পনা ছাড়া নয়।··· ভাব দিয়ে, কল্পনা দিয়ে পূজা হয়।··· রবিবাবুর মতো ভাবুক কবি যে রূপে অরূপের সন্ধান পান না, ব্যক্তের ভিতর অব্যক্তের আভাস পান না—এটাই আশ্চর্য। আর ঠাকুরের সাধনার উপর, ভাবের উপর, রবিবাবুর এই নিরর্থক কটাক্ষ—একেবারে হাওয়ার উপর তাঁর কবিকল্পনা। যিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থকে সেই ব্রহ্মবস্তু—মহাশক্তির বিকাশ দেখতেন—মহাভাবে সর্বদা সমাধিস্থ থাকতেন—কোন মূর্তি, কোন মন্দির, সৃষ্টির যে-কোন শক্তির, ভাবের বিকাশ দেখলে যিনি তৎক্ষণাৎ অরূপের ভাব-সাগরে ডুবে যেতেন—ব্রাহ্মভক্তেরাও যাঁকে একাধারে শাক্ত বৈষ্ণব বৈদান্তিক যোগী বলে

৫ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮ (১৩৬১), পৃঃ ৩৪১-৪২

নির্দেশ করেন তাঁকে শুধু শক্তির উপাসক ভক্ত বলে উল্লেখ উদারতার পরিচায়ক হয়নি। ··· বিচার করতে হলে প্রথমে তাঁর জীবন আগাগোড়া আলোচনা করতে হয়। তাঁর কিছু জানলাম না—আর মাঝখান থেকে একটা কথা টেনে নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করাকে সত্যানুসন্ধিৎসা বলে না।"[৬]

প্রতিমাপূজাকে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ এখানে যা লিখেছেন সেই অংশে তাঁর অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। মনে হয়, এক ধরনের গোঁড়ামি তাঁর সুষ্ঠু বিচারের পথে অন্তরায় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কথামৃত থেকে লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (মাস্টার মহাশয়) সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে ?

মাস্টার। আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালই। তবে এ বুদ্ধি কোরো না যে—এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটি ধরে থাকবে।

মাস্টার। আজ্ঞা, তিনি সাকার এ বিশ্বাস যেন হল। কিন্তু মাটির প্রতিমা তো তিনি নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটি কেন গো। চিন্ময়ী প্রতিমা।

মাস্টার 'চিন্ময়ী প্রতিমা' বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে পূজা করা উচিত, মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন।··· তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। (কথামৃত, ১।১।৪)।

কথামৃত প্রথম ভাগের আত্মপ্রকাশ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত প্রবন্ধ রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ কি গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ পাননি ? সে যাই হোক, 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে তাঁর যে-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল তাকে বিরূপ হিসাবেই যেন চিহ্নিত করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বর্ণনায় অবশ্য তিনি শ্রদ্ধার অভাব দেখাননি। কিন্তু মূর্তি-উপাসনার সমালোচনার সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদাহরণ যে-ভঙ্গিতে উপস্থাপিত, তাতে একদিকে যেমন তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে, অন্য দিকে তেমনই তাঁর প্রতি কবির এক ধরনের অনুকম্পার ভাবই যেন প্রকাশ পেয়েছে।

অতঃপর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা-দেবীকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ এনেছেন। এনেছেন লঘুভঙ্গিতে। চিঠিখানি তিনি লিখেছেন শান্তিনিকেতন থেকে। এখানে তিনি বলছেন :

"দিনরাত লোকজন, কথাবার্তা, কাজকর্ম, তার উপর এক অভিভাষণ কাঁধের উপর চেপেছে। মনটা ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ করচে। টাকা ছুঁলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের যেরকম সর্বাঙ্গে আক্ষেপ উপস্থিত হত কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেরকম হয়।"[৭]

রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে হালকা চালেই করা হয়েছে, সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত চিঠি, তাই হয়তো তিনি সতর্ক হননি। যেমন কলমের মুখে এসেছে, লিখে দিয়েছেন।

৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদনা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৮৮, পৃঃ ২০৮-২০৯

৭ চিঠিপত্র,৫।২০ (১৩৫২), পৃঃ ৫৮

এই চিঠির প্রায় এক দশক পরে বাংলা ১৩৪০ সনে (ইং ১৯৩৪?) রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন "মালঞ্চ" উপন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এই উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্রের আরাধ্য রূপে দেখা যায়। উপন্যাসের নায়িকা নীরজা রোগজীর্ণ, দুঃখে ভারাক্রান্ত একটি চরিত্র। শয্যাশায়ী, মুমূর্ষু নীরজা দেখছে, তার স্বামী আদিত্য ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। দেখছে, দূর সম্পর্কের বোন সরলার প্রতি আদিত্য এখন আকৃষ্ট। যা নিজের কাছে সে আর ধরে রাখতে পারবে না সেই সম্পদ নীরজা এই মেয়েটির হাতে তুলে দেবার সংকল্প করছে, কিন্তু কাজটি করে উঠতে পারছে না। শরীরে ও মনে একান্ত দুর্বল এই নারীচরিত্রকে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তরূপে উপস্থিত করেছেন। কাহিনীর শুরুতে নীরজার ঘরের একটি বর্ণনা আছে। সেখানে এক জায়গায় (প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে: "দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি"। পরে ৬নং পরিচ্ছেদে বেদনার্ত নীরজা তার দেবর রমেনকে বলছে:

> "বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পার আমায় গুরুর সন্ধান দাও, না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে-সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পর সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার কর, আমাকে উদ্ধার কর।"[৮]

দেবরের পরামর্শে নীরজা সব দেবার, দিয়ে মুক্ত হবার সংকল্প করে। এই সংকল্পের পর আর তার বিলম্ব সইছে না। রমেনকে সে বলছে:

> "সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষুনি ডেকে আনো।" পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু-হাত জোড় করে বললে, "বল দাও, ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পুজো অর্চনা সব গেল আমার।… আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তাহলে, আমি বল পাব, কোনো ভয় থাকবে না।"[৯]

নীরজা কিন্তু তার সংকল্পটিকে ঈপ্সিত রূপ দিতে পারেনি। ব্যথিত নীরজা তখন কাতর কণ্ঠে বলছে:

> "কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন।
> এত মার খেয়েও। কে বিশুদ্ধ করে দেবে।
> ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও না।"[১০]

পরমহংসদেবের কাছে নীরজার ব্যাকুল প্রার্থনা ও সমর্পণের প্রয়াস (যদিও তা সার্থক হয়ে ওঠেনি) চিত্তস্পর্শী। নীরজার এই ভক্তি লেখকের উপর আরোপ করা অবশ্যই অসঙ্গত। "যেমন করে পার আমায় গুরুর সন্ধান দাও"—নীরজার মুখে প্রযুক্ত এই বাক্যটি তো রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মানসিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, আমরা জানি, তিনি নানাস্থলে গুরুবাদের নিন্দা করেছেন। অতএব কেবলমাত্র নীরজার মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন। এই কথা মেনে নেবার পরেও কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকে: রবীন্দ্রনাথ কেন এই কাহিনীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আদৌ নিয়ে এলেন? তিনি তো দুর্গা, কালী, মহাদেব এমন কোনও দেবতাকে অথবা অবতারপুরুষ চৈতন্যদেবকে ঐ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। বিশেষ করে পরমহংসদেবকে কেন তিনি বেছে নিলেন? এই প্রশ্নের বিচারে দুটি সম্ভাব্য কারণের কথা মনে হয়। (এক) রবীন্দ্রনাথ যখন "মালঞ্চ" উপন্যাস লেখেন ততদিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি সমগ্র ভারতবর্ষে না হোক, বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ এখানকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে শোভমান। বিশেষ সময়ের ছাপ দেবার জন্যই হয়তো তিনি নীরজার ঘরে রামকৃষ্ণদেবের ছবি সাজিয়ে দিয়ে থাকবেন। (দুই) পরমহংসদেবের যে-ছবিটি নীরজার আবেগ ও ভক্তিরসের সহযোগে এই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই ছবিকে

৮ রবীন্দ্র রচনাবলী ৯২।৬ (১৩৬৮), পৃঃ ১৮৫

৯ ঐ, পৃঃ ১৮৬

১০ ঐ, পৃঃ ১৯০

উপন্যাসের নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও কি প্রণাম জানাতে ইচ্ছা হয় না ? এমন হতে পারে, স্বসৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে লেখকও তাঁকে একটি প্রণাম জানিয়েছেন। তারই জন্য হয়তো এই কাহিনীতে পরমহংসদেবের চিত্রের অবতারণা। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে তিনি যে-ভুল করেছিলেন, এই সৃষ্টিধর্মী রচনায় তার সংশোধনের আয়োজন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি কবি স্পষ্টতরভাবে প্রণত হয়েছেন আর দুই বছর পরে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে—তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনের বছরে। এই উপলক্ষে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার শ্রীরামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ ঃ পৃঃ ৫৩) রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাজ্ঞাপক যে-বাণী প্রকাশিত হয়েছিল সেটি এই ঃ

To The Paramahansa Ramakrishna Deva

Diverse courses of worship from varied springs of fulfilment have mingled in your meditation. The manifold revelation of the joy of the Infinite has given form to a shrine of unity in your life where from far and near arrive salutations to which I join mine own.

এই ইংরেজী বাণীর যে বাঙলা মর্মানুবাদ তিনি করেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে প্রণতিজ্ঞাপক সেই কবিতাটি বহুপরিচিত, অনেকের কণ্ঠস্থ। সেটিও এখানে উপস্থাপিত করছি ঃ

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি ॥

(উদ্বোধন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ৫৭)

[redacted]

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি ॥

বলা বাহুল্য, এটি 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' জাতীয় কবিতা নয়। কবিতাটি, আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন স্বেচ্ছায় নয়, অনুরোধক্রমে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন সাধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে পারবেন কত কষ্টে ইংরেজী লেখাটুকু এবং তার মর্মানুবাদ ঐ বাঙলা কবিতাটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

[redacted]

বলা বাহুল্য, এটি 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' জাতীয় কবিতা নয়। কবিতাটি, আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন স্বেচ্ছায় নয়, অনুরোধক্রমে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন সাধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে পারবেন কত কষ্টে ইংরেজী লেখাটুকু এবং তার মর্মানুবাদ ঐ বাঙলা কবিতাটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক, এই কবিতায় লেখকের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভঙ্গিটি অনায়াস, যথাযথ এবং সুন্দর। অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার স্বরূপ এবং তাঁর ভাবধারার সার্থকতার কথাটি এখানে সুচারুরূপে উপস্থাপিত। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কবিপ্রতিভার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদ্যটিকে কিন্তু সাধারণ মানেরই বলতে হয়। তার চেয়েও বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই রচনার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন কিনা সে-বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ আছে। কারণ দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এটি তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের কোনও খণ্ডে এটি স্থান পায়নি। কবির মৃত্যুর বেশ কিছু

কাল পরে বাংলা ১৩৬১ সনে (ইং ১৯৫৫) কয়েকজন মহাপুরুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মরণে রচিত রবীন্দ্র-নাথের এই ধরনের একগুচ্ছ কবিতা দেশ পত্রিকায় 'অবিস্মরণীয়' এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত কবিতাটি ঐ গুচ্ছের অন্যতম। পরে ঐ কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে স্থান পায়।

রবীন্দ্রনাথের এই পদ্যটির বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছে বক্তা এবং প্রবন্ধলেখকদের কল্যাণে। পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁরা বক্তৃতায় ও লেখায় পদ্যটির উদ্ধৃতি দিয়ে আসছেন সমানে—অক্লান্তভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে কবির একটি অভিজ্ঞানপত্র হিসাবেই যেন অনেকে এটি ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আমাদের বিষয়-বহির্ভূত, সুতরাং এখানেই যতিচিহ্ন দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের এই পদ্যটির বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছে বক্তা ও প্রবন্ধলেখকদের কল্যাণে। পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁরা বক্তৃতায় ও লেখায় পদ্যটির উদ্ধৃতি দিয়ে আসছেন সমানে—অক্লান্তভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে কবির একটি অভিজ্ঞানপত্র হিসাবেই যেন অনেকে এটি ব্যবহার করে থাকেন।

অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি জীবনচরিতকাব্যের ক্ষুদ্র ভূমিকা বা 'আভাস' লিখে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির নাম "শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী"—লেখক স্বামী শ্যামানন্দ। রবীন্দ্রনাথ এখানে লেখেন: "**আভাস:** স্বামী শ্যামানন্দ পদ্যচ্ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী রচনা করিয়াছেন, ইহার যথার্থ মূল্য সরল ভক্তির। ভক্তেরা ইহা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। ইতি

৪।৯।৩৮　　রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

বোঝা যায়, অনুরোধ এড়াতে পারেননি বলেই কোনরকমে তিনি ঐ কয়েকটি কথা লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, যে-মহাপুরুষের জীবনচরিত এই কাব্যের বস্তু, তাঁর সম্পর্কে একটি শব্দও রবীন্দ্রনাথ এখানে লিখতে পারেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ তাঁর শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে—রামকৃষ্ণ সেণ্টিনারি কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ধর্ম-সম্মেলনে। আটদিনব্যাপী (১—৮ মার্চ) এই সম্মেলনের পঞ্চম দিনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার বলেন :…"১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসবে কবিকে 'ধর্ম-মহাসভা'র সভাপতিরূপে ভাষণ দিতে দেখি। কিন্তু ইহার মধ্যে কতখানি তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল বলা কঠিন।"[১১] সম্মেলনটি এমনিতে অনুষ্ঠিত হয় টাউন হল-এ। তবে কবির অসুস্থতার কথা ভেবে উদ্যোক্তারা পঞ্চম দিনের অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন তাঁর আবাসের অনতিদূরে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বিষয়ে স্বরচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইংরেজীতে লেখা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন তিনি শ্রদ্ধা করেন সে-কথা তিনি তাঁর ঐ লিখিত ভাষণে স্পষ্টভাবে বলেন। ভাষণটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে দেওয়া হল:

"When I was asked to address this distinguished gathering, I was naturally reluctant, for I do not know if I can be called religious in the current sense of the term, not claiming as my possession any particular idea of God, authorized by some time-honoured institution. If, in spite of all this, I have accepted this honour, it is only out of respect to the memory of the great saint with whose Centenary the present parliament is associated. I venerate Paramahamsa Deva, because he, in an arid age of religious nihilism, proved the truth of our religious heritage by realizing it, because the largeness of his spirit could com-

১১ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ (১৩৪০), পৃঃ ৮

prehend seemingly antagonistic modes of **sadhana**, and because the simplicity of his soul shames for all time the pomp and pedantry of pontiffs and pundits···

Great souls, like Ramakrishna Paramahamsa, have a comprehensive vision of Truth, they have the power to grasp the significance of each different form of the Reality that is one in all—but the masses of believers are unable to reconcile the conflict of codes and commands. Their timid and shrunken imagination, instead of being liberated by the vision of the Infinite in religion, is held captive in bigotry and is tortured and exploited by priests and fanatics for uses hardly anticipated by those who originally received it.

Unfortunately, great teachers most often are surrounded by persons whose minds, lacking transparency of atmosphere, obscure and distort the ideas originating from the higher source. They feel a smug satisfaction when the picture of their master which they offer shows features made somewhat in the pattern of their own personality. Consciously and unconsciously they reshape profound messages of wisdom in the mould of their own tortuous understanding, carefully modifying them into conventional platitudes in which they themselves find comfort and which satisfy the habit-ridden mentality of their own community. Lacking the sensitiveness of mind which is necessary for the enjoyment of truth in its unadulterated purity they exaggerate it in an attempt at megalomaniac enlargement according to their own insensate standard, which is as absolutely needless for its real appraisement as it is derogatory to the dignity of its original messengers. The history of great men, because of their very greatness, ever runs the risk of being projected on to a wrong background of memory where it gets mixed up with elements that are crudely customary and therefore inertly accepted by the multitude."[১২]

[যখন এই বিশিষ্ট সভায় ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ পেলাম তখন স্বভাবতই আমার মনে এ-ব্যাপারে সংকোচ ছিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার এমন বিশেষ একটি ধারণা নেই যা কোনও সনাতন প্রতিষ্ঠানসম্মত, তাই আমি জানি না আমাকে প্রচলিত অর্থে ধার্মিক বলা চলবে কিনা। এতৎসত্ত্বেও যদি আমি এই সম্মানজনক দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকি, তবে তা করেছি সেই মহান সাধকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় যাঁর শতবার্ষিক উৎসবের সঙ্গে বর্তমান সম্মেলন সংশ্লিষ্ট। আমি পরমহংসদেবকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি এক ঊষর নাস্তিক্যবাদের যুগে আমাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকারের সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন তাঁর উপলব্ধি দিয়ে; শ্রদ্ধা করি, কারণ তাঁর ভাবের উদারতা সাধনার দৃশ্যতঃ পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন পন্থাকে আপন এবং এক করে নিতে পেরেছে; শ্রদ্ধা করি, কারণ

১২ The Religions of the world, Vol. I, Ramakrishna Mission Institute of Culture (1938), pp. 124 & 131

তাঁর আত্মিক সারল্য পুরোহিত আর পণ্ডিত-দের বাগাড়ম্বর আর বিদ্যার অভিমানকে চিরতরে হাস্যাস্পদ করে দিয়েছে।...

রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহাপুরুষদের সত্যদর্শন অখণ্ড। সবের মধ্যে যে পরম এক, সেই সত্যের প্রত্যেক স্বতন্ত্র প্রকাশের তাৎপর্য উপলব্ধির শক্তি তাঁদের আছে। কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাধারণ মানুষ বিধি আর আদেশের দ্বন্দ্বের সমাধানে অক্ষম। ঈশ্বরতত্ত্বে অনন্তের উপলব্ধি দ্বারা তাদের চিত্ত তো মুক্ত নয়, তাদের ভীরু সংকুচিত চিন্তাশক্তি তাই গোঁড়ামির বন্ধনেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুরোহিত আর উগ্রভাবাপন্ন অন্ধ-ভক্তের দল তাদের ব্যবহার করেন এমন সব কাজে যা ঐ সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের বুঝি ছিল কল্পনাতীত।

দুঃখের বিষয়, প্রায়শঃ মহান আচার্যদের ঘিরে থাকেন এমন সব ব্যক্তি, যাঁদের চিত্তাকাশ অস্বচ্ছ, যাঁরা উচ্চতর উৎস থেকে উৎসারিত জ্ঞানে আবরণ আরোপ করে সেই জ্ঞানবস্তুকে করে তোলেন বিকৃত। তাঁদের গুরুর যে-চিত্র তাঁরা তুলে ধরেন তা কতকটা তাঁদের নিজেদের সত্তার আদলে গড়া; আর এই কাজটি করতে সক্ষম হলে তাঁরা এক ধরনের অকিঞ্চিৎকর আত্মতুষ্টি অনুভব করে থাকেন। জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ তাঁরা বোধির গভীর বাণীকে নিজেদের বিকৃত বোধশক্তির ছাঁচে নতুন করে ঢেলে সাজান, প্রচলিত নিতান্ত মামুলি কথায় সেই বাণীর রূপান্তর ঘটান সযত্নে; এতে তাঁরা নিজেরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন এবং সেই সব মামুলি কথা আবার তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের অভ্যাসজীর্ণ মানসিকতার পক্ষে হয়ে ওঠে তৃপ্তিকর। অমিশ্র শুদ্ধ সত্যের গ্রহণ ও সেই আনন্দ আস্বাদন করবার মতো সূক্ষ্ম মানসিকতা থেকে বঞ্চিত —তাঁরা এই সত্যকে নিজেদের অবোধ বিচার অনুযায়ী ফাঁপিয়ে দেখাতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করেন। সত্যের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য এই অতিরঞ্জন যেমন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তেমনই ঐ সত্যের যাঁরা আদি বার্তাবহ তাঁদের পক্ষেও তা মর্যাদাহানিকর। মহাপুরুষদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি অনিবার্য আশংকা—আশংকা তাঁদের মহাপুরুষত্বেরই জন্য—এই যে, স্মৃতির ভ্রান্ত পশ্চাৎপটে এই ইতিহাস প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব যেখানে তা স্থূল প্রচলিত উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়তে পারে আর সেই কারণেই মানবসাধারণের গরিষ্ঠাংশ তা গ্রহণও করতে পারে নির্বিচারে।]

উদ্ধৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ বা মহান আচার্যদের যাঁরা ঘিরে থাকেন সেই ভক্তমণ্ডলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষ করেছেন। সাধারণভাবে মহাপুরুষদের কাছের মানুষ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা কি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলী সম্পর্কেও প্রযোজ্য তাঁর মতে? তা যদি তিনি না মনে করে থাকেন তবে সেকথা তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেই পারতেন। বরং যেভাবে এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তা পড়ে মনে হয় কবি যেন বলতে চাইছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্যই মহান সাধক এবং পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন—কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাঁকে না বুঝে ভুল প্রচার করছেন, নিজেদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে অকারণে তাঁকে আরও বড় করে দেখাতে চাইছেন ইত্যাদি। অথবা এরকম একটা আশংকার কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ সকলকে সতর্ক করে দিতে চাইছেন—এই লিখিত ভাষণ পড়ে তা-ও মনে হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন অথবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের যে-মূল্যায়ন তিনি করেছেন তার মধ্যে অবশ্য বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। এ-ব্যাপারে আমরা তাঁর যথোচিত জ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয় পাই। আমরা দেখি, জাতির বরেণ্য পুরুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রত্যাশিত কর্তব্য পালন করলেন।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ঐ কথাই বলতে হয়: শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি কর্তব্যই মাত্র পালন করেছেন। তার বেশি কিছু নয়।

*   *   *

দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের শ্রদ্ধা ছিল যা তিনি নিজের কাছেও অস্বীকার করতে পারেননি—যে-কারণে মাঝে মাঝে নিজের লেখাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম তাঁকে করতে হয়েছে, না-করে তিনি পারেননি। আবার একথাও অনস্বীকার্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে কবির মনে একটি প্রতিরোধও ছিল। সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করে নিয়েও তাঁকে তিনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি।

প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন পারেননি? কেন তিনি পরমহংসদেবকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। এই প্রশ্নের আলোচনার শুরুতেই একটি সহজ সত্য উপস্থিত করছি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই গুণীর গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর এই গুণগ্রাহিতায় উদারতার অভাব দেখা যেত না; কিন্তু নানা ব্যাপারে তাঁর ছিল দৃঢ় মতামত এবং তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার বিরোধী মতামত বা চিন্তা সম্পর্কে তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর অসহিষ্ণুতা বিশেষ করেই দেখা গিয়েছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে। জীবনের প্রথম পর্বে তিনি গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন এবং পরিবারের সকলের মধ্যেই আশা করতেন অনুরূপ মনোভাব। তরুণ বয়সে সত্যাসত্য প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি যে একবার বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল কবির গোঁড়ামি এবং একধরনের অসহিষ্ণুতা। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী তাঁর আত্মজীবনীমূলক "জীবনের ঝরাপাতা" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির একটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। সরলা দেবী লিখেছেন:

> "আশু চৌধুরী ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বৈবাহিক সংযোগ স্থাপনের কিছু পরে তাঁর ভগিনী ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুয্যের পত্নীর সঙ্গে আমরা অনেকে ছুটি যাপনে বেনারসে যাই। প্রমথ চৌধুরীর তখন ইন্দিরার সঙ্গে সদ্য বিবাহ হয়েছে। তাঁরাও ছিলেন।··· বৌবাজারের বসু মল্লিক পরিবারের হেম মল্লিকও সেবার সপরিবারে বেনারস গিয়েছিলেন। এক রাত্রি আমাদের বিশ্বেশ্বর মন্দিরের প্রসিদ্ধ আরতি দেখানোর জন্য তিনি বন্দোবস্ত করলেন। আমরা সবাই মন্দিরের সামনে বসলুম। পাণ্ডারা আমাদের চারিদিক ঘিরে রক্ষে করতে লাগল —যাতে ভিড় ভেঙে আমাদের উপর না পড়ে। সে কি আরতি! আর ভক্তের কি ভিড় ও জয়োল্লাস। বিশ্বেশ্বরের সে আরতি দেখে চিত্ত পুলকিত নমিত না হয়ে যায় না। এতদিন শুধু গুরু নানকের পদভাঙা রবীন্দ্রের ব্রহ্মসঙ্গীত বলে গাইতুম—'তাঁর আরতি করে চন্দ্রতপন···/ আসীন সেই বিশ্বশরণ / তাঁর জগৎমন্দিরে।' আজ সেই গানের ভাবেরই সত্যবৎ অনুভূতি লাভ হল। আরতি শেষে শত সহস্র বৎসর ধরে অগণ্য ভক্তের ভক্তিভাবভরিত সেই গগনতলে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরদ্বারে আজকের সহস্র সহস্র ভক্তদের ভক্তিতরঙ্গে ভক্তি মিলিয়ে আমরাও তাঁর উদ্দেশে প্রণত হলুম।
>
> "এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার [রবীন্দ্রনাথের] কানে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন—'তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?'"[১৩]

প্রতিমা পূজা তথা কালী-উপাসনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা আমরা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভায় রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যখন দেখা হয় তখন সেই ভারতপ্রেমী ফরাসী মনীষীর কাছে কবি কালী-উপাসনা সম্পর্কে তাঁর অসহিষ্ণু মন্তব্য কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করেন। রোলাঁকে তিনি বলেন: "কোন কোন অপরিহার্য ক্ষেত্রে সত্যকে অসহিষ্ণু হতেই হবে। কোন কোন ভ্রান্তি ও চিত্ত-কলুষিত-করা কোন কোন মূর্খতা সহ্য করা চলে না।" এই কথা বলার পর রবীন্দ্রনাথ "চলে এলেন হিন্দু বহুদেববাদের এবং বিশেষ করে কালী-উপাসনার বিরুদ্ধে সোজাসুজি আক্রমণে। সে-সম্পর্কে তিনি বলে গেলেন আবেগদীপ্ত ঘৃণার এক তীব্রতা নিয়ে···।···(তিনি) বলছিলেন সেইদিনটির কথা যেদিন কলকাতার

১৩ জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী চৌধুরানী, রূপা (১৯৮২), পৃঃ ৬৯-৭০

বড়ো কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে [তিনি] দেখতে পেয়েছিলেন রক্তের একটা স্রোত চৌকাঠের নিচে উপচে উঠেছে। আর পথ-চলতি একটি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক নিচু হয়ে রক্তে আঙুল ডুবিয়ে নিচ্ছে, তার শিশুর কপালে তিলক দিয়ে দিচ্ছে।... এই ধরনের রক্তমাখা নিম্নস্তর থেকেই চিরকাল মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে খুনীর হিংস্রতা, যুদ্ধ ও হত্যাকারী দেশের উপাসনা, রক্তপানের রুচি। এমনকি অধিবিদ্যা বা প্রতীকের স্তরে নিয়ে গিয়েও এর সঙ্গে কোন আপস তিনি মানেন না। (এটা স্পষ্ট বোঝা গেল, তাঁর চোখের সামনে এই মুহূর্তে আছেন বিবেকানন্দ।*) তিনি এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে, কালীর উপাসনা যারা টিকিয়ে রাখে তারা সুস্থ, সঠিক ও সৎ মানসিকতার লোক হতে পারে না। এই বীভৎস দেবীকে [তিনি] ধ্বংস করতে চাইলেন..., তাঁর দেশের লোকের বিরুদ্ধে, যে-স্তূপীকৃত কুসংস্কার তাদের পিষ্ট করছে তার বিরুদ্ধে জ্বলে উঠলেন।"[১৪]

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁর সঙ্গে কবির ঐ সাক্ষাৎকারের কিছু আগে রোলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনচরিতমূলক বিখ্যাত গ্রন্থদুটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেদিন ঐ অসামান্য গ্রন্থদ্বয়ের জন্য রোলাঁকে অভিনন্দিত করেননি। বই-দুটির স্পষ্ট উল্লেখও

* এই প্রসঙ্গে এখানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি বহু-উদ্ধৃত উক্তির কথা তোলা যেতে পারে—যা তিনি নাকি একদা রোমাঁ রোলাঁর কাছে করেছিলেন। শোনা যায়, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর যখন প্রথম দেখা হয়, কবি তখন ঐ ফরাসী মনীষীকে বলেছিলেন: "If you want to know India, study Vivekananda. In him there is nothing negative, everything positive." দুঃখের বিষয়, রোলাঁর ডায়েরিতে উক্ত সাক্ষাৎকারের যে-বিবরণ আছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তির কোনও উল্লেখ নেই। (দ্রষ্টব্য: ভারতবর্ষ দিনপঞ্জী—রোমাঁ রোলাঁ, অবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত, পৃঃ ১০-১৮]। রোলাঁ অথবা রবীন্দ্রনাথ কারও কোনও প্রকাশিত রচনায় ঐ উক্তিটি পাওয়া যায় না। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ উদ্বোধন পত্রিকার ১৩৯৩ আশ্বিন সংখ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধের পাদটীকায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন [পৃঃ ৫৬৩-৫৬৪]। তিনি জানাচ্ছেন: স্বামী অভয়ানন্দ বলেছেন, রোলাঁ নিজেই এই তথ্য এক সময়ে স্বামী অশোকানন্দকে জানিয়েছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন: রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর উদ্বোধন পত্রিকায় যে বিশেষ সংবাদ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় [ভাদ্র ১৩৪৮] সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরিতের জন্য রোলাঁ যখন উপাদান সংগ্রহ করছিলেন, সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসীকে তাঁর ঐ উক্তির কথা জানিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের নির্ভর করতে হয় শ্রুতি আর স্মৃতির উপর। নির্ভরযোগ্য দলিলের অভাবে তথ্যটির প্রামাণিকতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শ্রুত বচনকে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে দেশ পত্রিকার ১৯৮৬, ২৭ ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের অংশবিশেষ। সংশ্লিষ্ট পত্রটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহর থেকে ক্ষিতিমোহন সেনকে।

সেই পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "...আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন উপলক্ষে একবার পশ্চিম সাগরকূল ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত আছে। সেইজন্যে আর্বানা থেকে বেরিয়ে অবধি এই চেষ্টা করচি কিন্তু এ পর্যন্ত যাঁকেই বলেছি কেউ কর্ণপাত করেননি। তার প্রধান কারণ এই বুঝচি যে বিবেকানন্দের চেলারা এদেশে বেদান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বেদান্ত এবং ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধির উপর এদের শ্রদ্ধা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে।... আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম। তারপরে আমি হার্ভার্ডে চারটে বক্তৃতা পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। তাতে উপনিষদ্ অবলম্বন করে আমার মনের কথা কিছু কিছু ব্যক্ত করেছি। আমার এই বক্তৃতা নিষ্ফল হয়নি।"

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রোলাঁকে যিনি বললেন, ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানতে হবে, তিনিই সেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দেই 'বিবেকানন্দের চেলাদের' সম্পর্কে করলেন এই ঘোর অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য! রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা, স্বামীজীর অনুগামীরা বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে যা বলতেন তা স্বামীজীর ধ্যানধারণার পরিপন্থী? অথবা তিনি কি মনে করতেন, বিবেকানন্দ নিজেও বেদান্ত বুঝতেন না, বিদেশীদের বোঝাতেও পারতেন না? যাই হোক, রোলাঁর নিকট ঐ উক্তি আর ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা চিঠির উক্ত অংশ—এই দুই বস্তুকে মেলাতে গিয়ে বিভ্রান্ত বোধ করতে হয়। কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে কি?

১৪ ভারতবর্ষ (দিনপঞ্জী)—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদ: অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৭৬, পৃঃ ২৭৮-৭৯

করেননি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায়। তবে ঐ দুই গ্রন্থের কোন-কোনও অংশ পড়ে যা তাঁর মনে হয়েছে সেই কথা রোলাঁকে জানানোর সূত্রেই সেদিন তিনি কালী-উপাসনা এবং কালী-উপাসনার সমর্থকদের উপর তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। দিনলিপির সংশ্লিষ্ট অংশের শুরুতেই একথা বলে রেখেছেন রোলাঁ।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই অসহিষ্ণুতা কবিকে বার বার ক্লেশ দিয়েছে, কখনও-বা তা আচ্ছন্ন করেছে তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে। এই অসহিষ্ণুতাই একদিন তাঁকে দিয়ে 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছে। একই মনোভাবের প্রকাশ তাঁর "বিসর্জন" কাব্যনাট্যেও। ("বিসর্জন" কাব্যসুষমায় মণ্ডিত, নাট্যগুণসমৃদ্ধ এবং নিঃসন্দেহে মর্মস্পর্শী। তথাপি সেখানে একদেশদর্শিতার চিহ্নও অস্পষ্ট নয়। তাই পশুবলির উপর নিষেধাজ্ঞা যিনি আরোপ করেছেন সেই রাজা গোবিন্দমাণিক্য শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি, সকল সদ্‌গুণের আকর; আর পশুবলির প্রধান হোতা, রাজার প্রতিপক্ষ, কালীমন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি কুচক্রী, কপট, মিথ্যাচারী। যেন আচারে বিশ্বাসী কালীমন্দিরের পুরোহিতকে সৎ এবং প্রকৃত অর্থে নিষ্ঠাবান হতে নেই। নাট্যের শেষ দৃশ্যে শোকাহত এই পুরোহিতকে দিয়ে দেবীপ্রতিমা গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তখন কবির সহানুভূতির স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রিত।)

তথাকথিত পৌত্তলিকতা এবং বিশেষ করে শক্তিপূজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সংস্কারগত বীতরাগ অথবা বিরোধী মানসিকতা বহুলাংশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁর মনোভাব নিয়ন্ত্রিত করেছে মনে হয়। আবার আমরা দেখছি, রবীন্দ্রনাথ নিজের এই মনোভাব পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের উপর আরোপ করে বসেছেন। এই সূত্রে বিশ্বনাথ রায়ের 'মহর্ষি-রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি' প্রবন্ধের উল্লেখ করতে হয় [দেশ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২]। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, সেখানে মহর্ষি-শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] বলছেন: "তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] পরমহংসদেবকে যথোচিত শ্রদ্ধা করেননি সেটা অসম্ভব নয়।" কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন, মহর্ষি "একেবারেই বিগ্রহ মানতেন না এবং উপনিষদের অনুশাসন অনুসারে তাঁর জীবনের সাধনা ছিল শান্ত সমাহিত আত্মসংযত ভাবের।"—শাক্ত বা বৈষ্ণব "ধর্মমতের সঙ্গে যেসকল মূর্তি ও কাহিনী জড়িত তাকে তিনি নির্মল ও নিরাময় মনে করতেন না।" "বিগ্রহ-পূজার সংস্রবমাত্র যেখানে আছে সেখানে তাঁর মন আঘাত পেয়েছিল।" এই পরিপ্রেক্ষিতে, রবীন্দ্রনাথের অনুমান, তাঁর পিতৃদেব পরমহংসদেবকে যথোচিত শ্রদ্ধা করেননি। রবীন্দ্রনাথের ঐ অনুমান বা ধারণা তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত—এখানে তাঁর নিজস্ব মানসিকতারই প্রতিফলন দেখা যায়। পক্ষান্তরে কথামৃত গ্রন্থে [১।১৩।৫] মহর্ষি-শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাক্ষাৎকারের যে-বিবরণ আছে সেটি পড়ে স্পষ্টতই অনুভব করা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেবেন্দ্রনাথ প্রীতির চোখে দেখেছিলেন যার সঙ্গে যুক্ত ছিল শ্রদ্ধাও। শ্রদ্ধার অভাব থাকলে তিনি কি পরমহংসদেবকে ব্রাহ্মোৎসবে আমন্ত্রণ করতেন? পরে যদি সেই আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাহার করে থাকেন তবে সেই বেদনাদায়ক কর্তব্যটি তাঁকে করতে হয়েছে যাতে উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোনও অসম্মান না হয়। উৎসবে কেউ তাঁকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখলে দেবেন্দ্রনাথ নিজে আহত বোধ করতেন—এই কথাটি কথামৃতের বিবরণে স্পষ্ট। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজের মনোভাবই তাঁর পিতৃদেবের উপর আরোপ করেছেন।

* * *

সব মিলিয়ে পুনরাবৃত্তির সুরে বলা যেতে পারে, ঈশ্বরভাবময় এই মহাত্মাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচারবোধ দিয়ে স্বীকার করেছেন, শ্রদ্ধা করতে চেষ্টা করেছেন—আবার সে-ব্যাপারে স্বভাব এবং সংস্কারগত কারণে ভিতর থেকে যেন অনুভব করেছেন বাধাও। ক্রমে সময় এবং জাতীয় কবি হিসাবে কর্তব্যবোধ সেই বাধার তীব্রতা বহুলাংশে লাঘব করে দিয়েছে। তবুও এক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ চেষ্টা করেও তিনি ঘটাতে পারেননি। হৃদয়ের যোগ তেমন ছিল না বলেই তো তাঁর রচনাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধিকার করে আছেন মাত্র কয়েক ছত্র।

অথচ আমরা অবাক হয়ে যাই যখন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী কী আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে রূপ নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ও কবির গানের ভাবগত সাদৃশ্যের তিনটি উদাহরণ এখানে উপস্থিত করছি।

এক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ঃ "জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে।... এই অহঙ্কার আড়াল আছে ... তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না।... ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। আর কাঁদো। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে।"

(কথামৃত, ১।৪।৬, ১।১২।৬, ১।১২।৯)।

রবীন্দ্রনাথের গান ঃ

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ॥
... ...
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে।"

(গীতবিতান, পূজা, গান নং ৪৯২)।

দুই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ঃ "চিত্তশুদ্ধি না হলে (ঈশ্বরদর্শন) হয় না।... মনে ময়লা পড়ে আছে।... মনের ময়লা ... চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়।... কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না।"

(কথামৃত, ১।৪।৭)।

রবীন্দ্রনাথের গান ঃ

"দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে ॥
... ...
এতদিন তো ছিল না মোর কোন ব্যথা,
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয়
কেঁদে মরে—
দিয়ো না গো দিয়ো না আর ধূলায় শুতে ॥"

(গীতবিতান, পূজা, গান নং ৪৮৮)।

তিন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ : "কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা। তিনি রস, ভক্ত রসিক, সেই রস পান করে। তিনি পদ্ম, ভক্ত অলি। ভক্ত পদ্মের মধু পান করে। ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি। তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা।"

(কথামৃত, ৫।১০।২)।

রবীন্দ্রনাথের গান ঃ

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে ॥
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই তো প্রভু যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে ॥"

(গীতবিতান, পূজা, গান নং ২৯৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবগত সাদৃশ্য উল্লিখিত তিনটি উদাহরণেই স্পষ্ট। তৃতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে সেই সাদৃশ্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করবার মতো। মনে হয়, এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির শেষাংশের একটি অত্যাশ্চর্য রূপান্তর যেন সংশ্লিষ্ট গীতিকবিতাটি। গানে যে 'যুগলসম্মিলন' বলা হয়েছে, ব্যাপারটা যেন তা-ই। অনুসন্ধান করলে এমন দৃষ্টান্ত হয়তো আরও পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কি ভাবরাজ্যে তাঁদের এই যুগলসম্মিলনের কথাটা জানতেন? জানতেন কি, যাঁকে তিনি জ্ঞানতঃ আপন করে নিতে পারেননি, অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসলে তাঁর কত আপন জন?

শুধু আইন প্রণয়নেই সমস্যার সমাধান হয় না

আশাপূর্ণা দেবী

পাশ্চিমী হাওয়া আমাদের সমাজজীবনে বহু পরিবর্তন এনেছে। তার মধ্যে ভাল এবং মন্দ দুইই আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। এই প্রভাব মেয়েদের জীবনকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, আইনগত অধিকারগুলি মেয়েদের জীবনে আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা, দৃঢ়তা ইত্যাদির পরিস্ফুটন ঘটিয়েছে। সেগুলি যেমন মেয়েদের জীবনেও একটি সহজ স্বচ্ছন্দ গতি এনে দিয়েছে, তেমনি পুরুষের জীবনেও 'বোঝা হালকা' হওয়ার খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যও এনে দিয়েছে। অতএব আমাদের সমাজজীবনে পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট হয়েই দেখা দিয়েছে। জীবনযাত্রার পদ্ধতিরও আকাশ-পাতাল বদল ঘটে চলেছে। সে-পদ্ধতিতে পাশ্চিমী ছাঁচ।

এই কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্য। জীবনের গতিবেগ দ্রুত থেকে দ্রুততর। স্বভাবতই এই সবের ফলে মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রখর হয়ে উঠেছে। যার জন্যে ব্যক্তিজীবনে ঘটছে তীব্র সমস্যা আর সংঘর্ষ।

পুরনো সমাজে পুরুষের মধ্যে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, প্রভুত্বপ্রিয়তা, অধিকারবোধ, এগুলি ভালমতোই ছিল, কিন্তু তেমন সমস্যা আর সংঘর্ষ দেখা যেত না মেয়েদের আত্মবিলোপী অভ্যাসে। ভিতরে চেতনা থাকলেও, মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিতে চাইলেও মেয়েরা শান্তির জন্য, সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সংঘর্ষ এড়াতে স্বাতন্ত্র্যবোধকে দমিত করতেই চাইত। বশ্যতা স্বীকার করে চলত।

কিন্তু এখনকার অবস্থা তা নয়। এখন মেয়েদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল তো বটেই উগ্রই হয়ে উঠেছে। বেড়েছে প্রভুত্বপ্রিয়তাও। তাই পারিবারিক জীবনে বা ব্যক্তিজীবনে দ্রুত ভাঙন ধরছে।

পুরনো সমাজে পুরুষের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্য, প্রভুত্বপ্রিয়তা, অধিকারবোধ, এগুলি ভালমতোই ছিল, কিন্তু তেমন সমস্যা আর সংঘর্ষ দেখা যেত না মেয়েদের আত্মবিলোপী অভ্যাসে। ভিতরে চেতনা থাকলেও, মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিতে চাইলেও মেয়েরা শান্তির জন্য, সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সংঘর্ষ এড়াতে স্বাতন্ত্র্যবোধকে দমিত করতেই চাইত। বশ্যতা স্বীকার করে চলত।

কিন্তু এখনকার অবস্থা তা নয়। এখন মেয়েদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল তো বটেই উগ্রই হয়ে উঠেছে। বেড়েছে প্রভুত্বপ্রিয়তাও। তাই পারিবারিক জীবনে বা ব্যক্তিজীবনে দ্রুত ভাঙন ধরছে।

কালের প্রবাহে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশটা বছর কিছুই নয়, তাই অনায়াসেই বলা যায় আমাদের সমাজে 'বিবাহবিচ্ছেদের' অধিকার এসেছে 'এই সেদিন' মাত্র। আইনটা তো স্বাধীনতার পরের ঘটনা। এ আইন অবশ্যই খুব বিতর্কিত ছিল। বহুবিবাহরোধ, বাল্যবিবাহরোধ আইন যেমন দলমত-নির্বিশেষে সমর্থন পেয়েছিল, সমাজ তাদের স্বাগত জানিয়েছিল, 'বিবাহবিচ্ছেদ আইন' ঠিক তেমনটি নয়। বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সমর্থনকারীরা যেমন বলেছিল, 'খুব প্রয়োজন ছিল এর। এর অভাবে চিরকাল লক্ষ লক্ষ কেন কোটি কোটি মেয়ে পড়ে পড়ে মার খেয়ে আসছে। নিরুপায়তার শিকার হয়ে তিল তিল করে মরছে।' এদের জন্যে এ আইনের দরকার ছিল বৈকি।

অপরপক্ষে বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধবাদীদেরও তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল। তাঁদের মতে, এ আইন চালু হলে সমাজজীবন বলে আর কিছু থাকবে না। মানুষের সমাজ জীবজগতের সামিল হয়ে যাবে। কারণ তাঁদের ধারণায় বিবাহবন্ধনটি হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। এ একেবারে অনড় অক্ষয় অব্যয়।

অবশ্য এমন প্রশ্নও তোলা হয়েছে—বন্ধনটা যদি জন্ম-জন্মান্তরের তাহলে বহুবিবাহকারীদের কি

গতি ? অথবা 'কর্মফল' শব্দটারই বা ঠাঁই হয় কোথায় ? দুজনের মধ্যে একজন যদি আপন দুষ্কর্মের ফলে কুকুর-বেড়াল হয়ে জন্মায়, আর অপর জন সুকৃতির ফলে উচ্চতর মানব জীবনে ফিরে আসে, তাহলে ? এর সদুত্তর তাঁরা দিয়ে উঠতে পারতেন না।

কিন্তু বাদ-প্রতিবাদ যাই হোক আইন চালু হয়ে গেল এবং দেখা গেল চালু হওয়া মাত্রই যে বাঁধভাঙা নদীর মতো দম্পতির দল আদালতে কেস ঠুকতে গেল এমন নয়। বরং চিরকালীন মানসিকতায় সেটাকে অসম্ভবই ঠেকতো। তবে পোঁতা তো হয়েছিল চারা গাছটি। সে ক্রমেই শাখা প্রশাখা মেলে নিজেকে রীতিমত দৃশ্যমান করতে চাইছে। এখন আর আমাদের সমাজজীবনে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা দৈবাতের ঘটনা নয়। ডিভোর্সী মেয়ে এখন সমাজ সংসারে প্রায় সেকালের বিধবার মতোই সচরাচরের দৃশ্য হয়ে উঠছে।

প্রকৃতির নিয়মে নাকি কোন স্থান শূন্য থাকে না, ঠিকই পূর্ণ হয়ে ওঠে। এও কি তার নমুনা ?

কিন্তু একদা সমাজে সংসারে বিধবা মেয়ে যেভাবে সহানুভূতি এবং নিরুপায়তার দায় মেনে নিতে পারত এখন এই ডিভোর্সী মেয়েরা কি তা মেনে নিতে পারছে ? ভিতরে ভিতরে একটা অসহিষ্ণুতা আসছে না কি ? ভাগ্যের মার খেয়ে যে বেচারী নিরুপায় হয়ে আবার তার জন্মগৃহেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে তাকে যেমন করুণার চোখে দেখা যায় নিজের জেদ অথবা মানিয়ে নেওয়ার অভাবে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসা মেয়ের উপর তেমন ভাব আসা সহজে সম্ভব নয়। তা সে মেয়ে স্বামীর ঘরে যতই দুঃখ-দুর্দশা আর অত্যাচারের শিকার হোক। আপন সুবিধে অসুবিধে স্বার্থটাই তো মানুষকে বেশি চিন্তিত করে।

তাছাড়া সাংসারিক পরিবেশও তো সব সময় অনুকূল থাকে না। পুরনো গৃহিণীর কর্তৃত্বের হাত শিথিল হয়ে আসে। নতুন কালের গৃহিণী কোনমতে হৃদয়গত ভাবে ডিভোর্সী ননদকে মেনে নিতে পারে না। পুরুষের বেলায় এ সমস্যা নেই। সে (বিচ্ছেদের ব্যাপারে যতই দোষী হোক) নিজের কেন্দ্রে অচল হয়েই বসে থাকে। পুরুষের জীবনে 'বিবাহবন্ধন' জীবনের একটা আংশিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে সেটাই তার 'জীবন'। কারণ মেয়েদের তো নিজের কোন 'ঘর' নেই। তার হয় 'বাপের ঘর' নয় 'স্বামীর ঘর'। মেয়েদের জীবনে 'বংশধারার' গৌরবই কি আছে ? সে কি বড়মুখ করে বলতে পারে 'এ আমার সাতপুরুষের ভিটে' ? অথবা 'আমাদের বংশের এই ধারা' ? মেয়েরা তো 'না ঘাটকা না ঘরকা।' অবশ্য আজকাল মেয়েদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব নেই। অনেকেই উপার্জনশীল, স্বাবলম্বী। পিতৃগৃহের ভারস্বরূপ হয়ে ওঠে না আগের বিধবা মেয়েদের মতো।

কিন্তু 'আশ্রয়' নামক ব্যাপারটার তো একটা বড় প্রশ্ন রয়েছে। টাকাকড়ি থাকলেও মেয়েরা 'একা' কোথাও বাসা বেঁধে থাকতে পারে কি ? বিশেষ করে বয়স যদি খুব কম হয় ? 'লেডিজ হস্টেল' বা ঐ জাতীয় যেসব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটুকু ? তাছাড়া মস্ত একটা সমস্যা তো 'সন্তান।' সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও দু-একটি সন্তান তো থাকতেই পারে ? তাদের নিয়ে বোর্ডিং, হস্টেল বা মেস-এ গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায় না।

তাছাড়া 'ছেলে আর মেয়ে' এই দুইয়ের মধ্যে আবার আইনগত ভাগ বাটোয়ারার ব্যবস্থা আছে। ছেলেকে পায় বাবা। কারণ সে তার বংশের ধারক-বাহক। মেয়ে সন্তান মায়ের। কারণ সে কারো বংশের ধারক-বাহক নয়।

এই সব ক্ষেত্রে ঐ শিশুদের কী মর্মান্তিক মনঃকষ্ট, তা আইনকারক কর্তারা ভাবেন না। দুটো পিঠোপিঠি ভাইবোন যারা নাকি বলতে গেলে জন্মাবধি একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবন্ধ তাদেরকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে মা-বাপের বিবাহবিচ্ছেদ। ফলে যাকে মামার বাড়িতে থাকতে হয়, সে একটা তীব্র হীনম্মন্যতায় ভোগে। তার ব্যবহারে বা আচরণ-বিধিতে অনেক উল্টোপাল্টা দেখা যায়। এক কথায় সে প্রায় একটি 'সমস্যা-শিশু' হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো বা যে ভাই বা দাদা তার প্রাণতুল্য ছিল সে তার নিজের জায়গায় যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে ভেবে ভিতরে ভিতরে একটা ঈর্ষা অনুভব করে। 'দেখা হওয়ার' সুযোগ দিলেও কেউই আর আগের মতো

সহজ হয়ে উঠতে পারে না। আর হবেই বা কি করে? জানে তো এই দেখা হওয়াটা আইনের একটা শর্ত মাফিক। এক্ষুণি দুজনকে দুদিকে চলে যেতে হবে।

আবার যে ছেলেটা বাপের ভাগে পড়েছে সে হীনম্মন্যতায় না ভুগুক মা-বাপের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ আর আক্রোশ তাকে দীন করে। মাতৃহীন না হয়েও তার অবস্থা মাতৃহীনতুল্য। সে ক্রমেই নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে পড়ে। ঠাকুমা-ঠাকুর্দা? কাকা-জ্যাঠা? পিসি-জ্যেঠি? সেসব আর এ-যুগের সংসারের শিশু পাচ্ছে কোথায়? একটা পুরনো ঝি-চাকরও তো দুর্লভ।

'ঝি-চাকর' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য পাঠক পাঠিকাদের কাছে মার্জনা চাইছি। কিন্তু 'পুরনো' শব্দটার সঙ্গে 'কাজের লোক' শব্দটা যেন খাপ খায় না। যেমন মানায় না যদি অতীতের দ্রব্যমূল্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলি 'আমাদের ছেলেবেলায় দুধের কিলো ছিল পঁচিশ পয়সা।' আমাকে 'সের' আর 'চার আনা' কথাটাই ব্যবহার করতে হবে। সে যাক—আসল কথা ঐ নিঃসঙ্গ ছেলেটাকে তার বাপ 'ক্ষতিপূরণ' দিয়ে যতই বাজার উজাড় করা খেলনা আর হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা ঢেলে দিক ছেলের মন পাওয়া কঠিন হয়। সেও অতএব 'সমস্যা-শিশু'।

আর সেই বিবাহবিচ্ছিন্ন পুরুষ আবার বিয়ে করে ভগ্ন সংসার জোড়া দিতে চাইলে চিরন্তন সেই সমস্যাটি এসে দাঁড়াবে। 'সৎমা—সপত্নী-পুত্র'।

মেয়েদের পিতৃসম্পত্তিতে সমান অধিকার। এ একটি শুভ কল্যাণময় আইন। এর বলে ডিভোর্সী বোনকে ভাই অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে পারে না। তাকে তার পিতৃগৃহে ঠাঁই দিতেই হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে—মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরে কটা মেয়ের বাবা নিজস্ব বাড়ি রেখে যেতে পারে? বা রেখে যায়? বেশিরভাগই তো ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা। একাই সংসারের ভার বয়েছে, একাধিক ছেলে-মেয়েকে মানুষ করে তুলেছে, এবং যত্র আয় তত্র ব্যয়ের নীতিতে চলেছে। হয়তো পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার কালে সম্পত্তির মধ্যে রেখে গেল বিধবা স্ত্রী, দু-একটা অপোগণ্ড ছেলে আর দু-একটা আইবুড়ো মেয়ে।

ছবি তো বেশির ভাগই এই।

কাজেই গোত্রান্তরিতা ননদকে ভাজ যদি পরম সমাদরে সহানুভূতিতে তাদের ভাড়াটে বাড়ির ছোট গণ্ডির মধ্যে ঠাঁই দিতে বেজার হয় দোষ দেওয়া যায় কি? 'ভাজ' নামক মেয়েটিও তো এ-যুগেরই মেয়ে। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, প্রভুত্বপ্রিয়, পুরনো কালের কর্তব্য-বোধকে তেমন গ্রাহ্য বা মান্য করতে রাজী নয়। সেকালের বিধবা ননদ তো তবু সংসারের অনেক খাটা-খাটুনির ভার লাঘব করে দিত এবং সংসারের বুড়ি আধবুড়ি বিধবাদের হেঁশেলে ভর্তি হ'য়ে গিয়ে ডাঁটা চচ্চড়ি চিবোত।

ডিভোর্সী মেয়ে সংসারের আর কতটুকু কি সুসার করবে? সে তো নিজের কাজকর্মের ধান্দায় ঘুরবে, আর সে ধান্দা না থাকলে টাইমের ভাত খেয়ে ধোপদস্ত নানা রঙের রঙিন শাড়ি ব্লাউজ পরে বাস ধরতে ছুটবে।

এটা সওয়া বড় শক্ত। তাছাড়া মেয়েরা আর কবে মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীলা? মেয়েরাই তো মেয়েদের একটি বড় শত্রু। ঘরে ঘরে এই বধূ-নির্যাতন আর বধূদাহ, এর সবটাই কি তার দুর্বৃত্ত স্বামীর কারসাজিতে? শাশুড়ী ননদ কি সেই অপরাধে মদত দেন না?

সে যাক। কথা হচ্ছে ডিভোর্সী মেয়েকে স্বাগত জানাবার মতো মনোভঙ্গি অন্ততঃ মধ্যবিত্ত নিম্ন-বিত্তদের মধ্যে থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়।

দেশে নিম্নবর্ণের মধ্যে অবশ্য কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহবন্ধনটি অমন 'আত্মার' মতো অক্ষয় অমর নয়। তারা বিয়ে ভাঙে। আর সেটা ভাঙতে খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয় না। হয়তো আদালতের দরজায় যেতে হয় না। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অনুসারেই সহজে সম্পন্ন হয়।

তবে সে তো মাত্র কোন কোন সম্প্রদায়ের। আর পুরুষদের পক্ষে তো কাঠখড় পোড়াবার প্রশ্নই ওঠে না। এদেশে এই ডিভোর্স আইন প্রণয়নের আগে সমগ্র পুরুষ জাতটির যেমন ছিল। যাকে বলে মুক্ত পুরুষ। তখন তো ঘরে ঘরে বিধবা মেয়ে ছাড়াও আরও একটি গলগ্রহ ছিল। পতিপরিত্যক্তা। চলতি বাঙলায় যার পরিচয় ছিল 'বরে নেয় না'। এই 'বরে নেয় না' মেয়েরাও আশ্রয় নিতে আসত

বাপের বাড়িতেই। সংসারের দাসত্ব করত, অপমানিত পরিচয়ের টিকিট কপালে সে'টেও সি'দুর পরত, শাঁখা পরত, মাছ খেত, এবং স্বামীর কল্যাণের জন্য মঙ্গলচন্ডীর ব্রতও করতে ছাড়ত না। তাদের ছেলে মেয়েরা? তারাও প্রায়শঃ ছিল মাতুলগৃহে বিনা মাইনের ঝি-চাকর।

তবু পরের বাড়ি খেটে খাওয়ার তো তখন ভীষণ অসম্মান ছিল। বিদ্যেসাধ্যিও তো ছিল না। আর দেশে নিরক্ষর মেয়েদের জন্যে এত রকম প্রকল্পও ছিল না।

যাক সেসব তো অতীতের কথা। তবে এখন-কার ছবিটিও এই ঃ

যারা পড়ে মার খেত তারা এখনও পড়ে মারই খায়। সহায় সম্বলহীন পিতৃগৃহের পৃষ্ঠবলহীন বিদ্যার সম্বলহীন মধ্যবিত্ত ঘরের সেই মেয়েরা। অসহ্য হলে তারা গলায় দড়ি দেয়, পুড়ে মরে, চট করে আদালতের দ্বারস্থ হতে যায় না। যেতে জানেই না।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সুবিধাটি পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে অবস্থাপন্ন শিক্ষিত আধুনিক ঘরের দম্পতিরা যারা সহজেই বলে উঠতে পারে,— নাঃ এভাবে চালানো যায় না।

আজকের বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীপুরুষ তাই অধিকাংশই 'হাই সোসাইটি'র। এদের সন্তানদের মধ্যেও তেমন অন্ধকার নেমে আসে না। অর্থানুকূল্যে তাদেরকে বোর্ডিং-এ হস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা 'হোমসিকনেস্'-এ আক্রান্ত হয় না। তারা ক্রমেই এটা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

হীনম্মন্যতায় ভোগবার দুঃখও নেই তাদের তেমন। এখন নাকি শোনা যাচ্ছে—ডিভোর্স একটা 'স্ট্যাটাস সিম্বল'। স্কুলে কলেজে বোর্ডিং-এ হস্টেলে ছেলে-মেয়েরা অনায়াসেই তাদের মা বাবার বিষয় আলোচনা-সমালোচনা করে। লজ্জিত হয় না। এমন কথা প্রত্যক্ষ্যেই শোনা—'দুজনে দুজায়গায় হয়েছে, বাঁচা গেছে বাবা। রাতদিন ঝগড়া আর ঝগড়া। ওঃ। হরিবল!' অথবা—'আমি মনে করি, এটাই ঠিক করেছে মা বাবা। যেখানে কিছুতেই যখন মেলাতে পারছে না তখন অবিরত পেরেক ঠুকে ঠুকে জোড়া দেবার চেষ্টায় লাভ কি? লাভ ঐ পেরেক ঠোকার শব্দটাই।'

অধিকতর মহাজ্ঞানী ছেলেমেয়ের মতে—'ভাল-বেসে বিয়ে করেছিল তো কী? দশ বছর প্রেমসে সংসার করেছিল তো কী? এখন যখন বনছে না ছাড়াছাড়িই ভাল। আমাদের পক্ষে লজ্জা অসম্মান? হোয়াই? দুনিয়ার সমস্ত সভ্যদেশেই এ ঘটনা অহরহ ঘটছে। আমাদের দেশটা অনগ্রসর ছিল বলেই এতে এত আতঙ্ক ছিল।'

তবে এইসব মুক্ত মতবাদ সেইসব ছেলেমেয়েদের মধ্যেই যারা আধুনিক জীবন আর প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে এবং মা-বাপের সম্পর্ক ছেদেও তাদের প্রাচুর্যের কোন হানি হয়নি। যদিও এদের সংখ্যা বর্তমান সমাজে খুব বেশি নয়, কিন্তু এটাও ঠিক এই 'হাই সোসাইটি' দ্রুত বৃদ্ধির পথে। কারণ আজকের মধ্যবিত্তরাও উঠে পড়ে লেগেছে ঐ দিকে ধাবিত হতে। 'স্ট্যাটাস' বাড়াতে।

নীতি-দুর্নীতির তোয়াক্কা না করে কি করে টাকা পয়সা বাড়ানো যায় তার ধান্দায় ঘুরছে আধুনিক নারী-পুরুষ। 'সন্তোষ' শব্দটা জীবন থেকে প্রায় মুছেই গেছে। একমাত্র চিন্তা—ছোট ছোট যারা সামনের সারিতে রয়েছে ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাদের ধরে ফেল। তাদের সামিল হয়ে যাও।

কিন্তু এ থেকে আর অব্যাহতিও নেই আমাদের। এই ছুটন্ত মানুষরা কি একবারও দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে চেষ্টা করবে, 'ছুটছি কেন? তার বদলে কী পাব? যাদের অনুকরণে ছুটছি, তারা কী পেয়েছে?'

তা ভাবছি না।

তারা যখন থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করবে ভারতবর্ষ নামক ভূখন্ডটির মধ্যে আসল ঐশ্বর্য কোথায়, তারা তখন তাদের সভ্যতার অভিশাপে জর্জরিত ভাঙাচোরা সমাজ-সংসারের হতাশা থেকে সরে এসে ভারতের ধ্যান ধারণা মূল্যবোধ আর ত্যাগের আদর্শের কাছে হাত পাততে চাইবে। ভারত হয়তো ততদিনে নিজের ঐশ্বর্যকে ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের ফেলে দেওয়া জীবনকে কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে জড়াবে। দেশে বেড়ে উঠবে 'ক্রেশ', 'বোর্ডিং', হস্টেল এবং 'ওল্ডহোম'।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর হলেও আমাদেরই ঘরের ছেলে, মা সারদা যে একান্তই আমাদের ঘরেরই মেয়ে, শ্রীচৈতন্য রবীন্দ্রনাথ যে আমাদেরই—এ আর কজন ভাবি ?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীর হলেও আমাদেরই ঘরের ছেলে, মা সারদা যে একান্তই আমাদের ঘরেরই মেয়ে, শ্রীচৈতন্য রবীন্দ্রনাথ যে আমাদেরই—এ আর কজন ভাবি ?

তখন মনে হয়েছিল বিবাহবিচ্ছেদ আইনটি হয়তো ভারতবর্ষের কোটি কোটি মেয়ের অসহায় নির্যাতিত জীবনের অবসান ঘটাবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে সমাজজীবনে আইনের সেই চিরাচরিত প্রতিফলন। আইন চিরদিনই বড়লোকের জন্যে। সে কোনদিনই গরিবের মা বাপ হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

একদিকে ক্রমেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক নরনারী সমঝোতার পথে আসবার চেষ্টা না করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দীর্ঘদিনের সাধনায় গড়া সমাজটিকে অবহেলায় ভেঙে ফেলে পতঙ্গের মতো একটা অশুভ আগুনের দিকে ছুটে চলছে আর ভাবছে—'এটাই আধুনিকতা। এটাই উন্নতি।' অপরদিকে কোটি কোটি নরনারী যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারে। আইন তাদের কোনদিক থেকেই বাঁচাতে আসছে না।

পণপ্রথা নিরোধ আইন—আইনের বইতে বলবৎ থাকলেও বধূ-নির্যাতন আর বধূ-হত্যার ইতিহাস অবাধে ঘটে চলেছে। এখানে সমাজ অসহায়, সরকার অসহায়, আইনরক্ষক ও আইনকর্তারা অসহায়। অতএব অসহায় মেয়েগুলো বিবাহ-বিচ্ছেদের অজানা পথে এগিয়ে যাওয়ার থেকে চিরচেনা পথটাই বেছে নেয়। হতাশ জীবনের শেষ কথাই তো—উঃ। গলায় দিতে একগাছা দড়িও জুটবে না আমার ?

মনে হয় দেশে সত্যকার উন্নতি আর সভ্যতার প্রসার ঘটাতে হলে প্রধান প্রয়োজন পুনর্বাসনের। আর সে উদ্যোগ সরকারি বেসরকারি আর মানব কল্যাণকামী আর্তসেবকদের যৌথ চেষ্টায়। এ না হলে কোন কাজই হবে না।

পাগলা গারদের রোগী আর কুষ্ঠ হাসপাতালের রোগী এরা সেরে উঠে ডাক্তারের ছাড়পত্র পেলেও সংসারে প্রবেশপত্র পায় না। দুঃখবহ দাম্পত্য-জীবনে ছাড়পত্র পেলেও সেই একই অবস্থা। এদের জন্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থার দরকার।

স্বেচ্ছায় কেউ ডিভোর্সী মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না (ব্যক্তিগত প্রেম ভালবাসা ব্যতীত), ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতেও চায় না। পিতৃগৃহেও তো নিতে অনিচ্ছুক।

মেয়ে পড়ে মার খাচ্ছে দেখলেও মা বাবা বলেন—'সহ্য করে যাও'। অতএব শেষ গতি মৃত্যু।

এই মেয়েদের জন্যে বোধ হয় এখন ভাবা দরকার হয়েছে। এদের জন্যে একটা পুনর্বাসন প্রকল্পের আয়োজন করার চিন্তা হলে ভাল হয়।

স্বেচ্ছায় কেউ ডিভোর্সী মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না (ব্যক্তিগত প্রেম ভালবাসা ব্যতীত), ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতেও চায় না। পিতৃগৃহেও তো নিতে অনিচ্ছুক।

মেয়ে পড়ে মার খাচ্ছে দেখলেও মা বাবা বলেন—'সহ্য করে যাও'। অতএব শেষ গতি মৃত্যু।

এই মেয়েদের জন্যে বোধ হয় এখন ভাবা দরকার হয়েছে। এদের জন্যে একটা পুনর্বাসন প্রকল্পের আয়োজন করার চিন্তা হলে ভাল হয়।

তা নাহলে বিবাহবিচ্ছেদ আইন অতি আধুনিক ঘরে বিলাসিতার একটি অঙ্গ হয়েই থাকবে। থাকবে হয়তো বা সত্যিই 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হয়ে। হেরে-যাওয়া নরনারীর বিশেষ কোন কাজে লাগবে না।

আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে কম্যুনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন

জলি মোহন কল

লেখক জলি মোহন কল অবিভক্ত ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি'র একজন প্রাক্তন সক্রিয় সদস্য। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি'র কলকাতা জেলা কমিটির তিনি সম্পাদক ছিলেন, এবং দলের সর্বোচ্চ অঙ্গ জাতীয় পরিষদ্ (National Council)-এর সভ্যও ছিলেন বেশ কয়েকবছর। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি দলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন তখনও তিনি জাতীয় পরিষদের সভ্য। কিন্তু আজও তিনি মনেপ্রাণে কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মণিকুন্তলা সেন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টি'র প্রাদেশিক কমিটির সদস্যা ছিলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যাও ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কয়েক বছর রাজ্য বিধানসভার তিনি বিরোধী দলের উপনেত্রী (Deputy leader) ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তখন ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। বর্তমান প্রবন্ধটিতে লেখক মণিকুন্তলা সেনের অন্তরের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, যা কম্যুনিজম্-এ একান্তভাবে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কোনদিন পরিত্যাগ করেনি—তার উৎস ও পরিণতির একটি চিত্র উপস্থাপিত করেছেন।—সংযুক্ত সম্পাদক।

পরবর্তী কালের বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেই অবিভক্ত বাংলাদেশে মহিলা রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তিরিশের দশক থেকেই তিনি কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। বাংলার শহরে-গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতেন। দলে দলে লোকে তাঁর সভায় যোগ দিত। তাঁর মধ্যে বাংলার জনসাধারণ একজন দক্ষ সংগঠক, সুবক্তা ও আত্মত্যাগী নিরলস রাজনৈতিক কর্মী'র সাক্ষাৎ পেয়েছিল।

মণিকুন্তলা শেষের দিনগুলিতে চূড়ান্তভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দিনগুলির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা মণিকুন্তলার এই পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য বোধ করবেন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছে মণিকুন্তলা দীক্ষা নিয়েছিলেন অন্তরের প্রবল ব্যাকুলতায়। কট্টর এই কম্যুনিস্ট নেত্রীর চরিত্রে এই রহস্যের সন্ধান পেতে হলে তাঁর জীবনের নানা কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে যেভাবে বলতেন, সেগুলি জানা দরকার।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে মণিকুন্তলার জন্ম। যে পরিবেশে ও আবহাওয়ায় তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, সে-সম্পর্কে তিনি পরবর্তী কালে বলেছেন: "তিনজন দেবতুল্য মানুষের হাতে গড়া ছিল এই যুগের বরিশালের মানুষ। তাঁদের চরিত্র-মাধুর্য ও দেবস্বভাবের প্রভাব থেকে তখনকার বরিশালের যুবা-বৃদ্ধ কেউই বড় একটা বাইরে ছিলেন না। অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশচন্দ্র আচার্য এবং কালীশচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন সেই তিন মহাপুরুষ। এই ত্রয়ীর মধ্যমণি ছিলেন অবশ্যই অশ্বিনীকুমার দত্ত—দেবকান্তি পুরুষ। তাঁর পাশের বাড়িটাই ছিল আমাদের। অশ্বিনীকুমারের প্রভাব আমাদের পরিবারেও ছিল।"

দ্বিতীয় জন জগদীশ আচার্য। তাঁর সম্পর্কে মণিকুন্তলা বলেছেন: "জগদীশচন্দ্রের চির-ব্রহ্মচারী জীবন ও ধর্মপ্রাণতার জন্য তিনি লোকের কাছে 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' বলে পরিচিত ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা মা ও ছোড়দির সঙ্গে আমি তাঁর আশ্রমে প্রায়ই যেতাম। ছোড়দি ভাল গান জানতেন। জগদীশচন্দ্র অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক গান শুনতে চাইতেন। একটার পর একটা ফরমায়েশ হতো। আর ছোড়দি একটার পর একটা গেয়ে যেতেন। সঙ্গে আমাকে ঠেকা দিতে হতো।··· তারপর উনি গীতা বা ভাগবত বা উপনিষদের অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। এছাড়া তাঁর কাছে ধর্মালোচনা শুনতে কেউ না কেউ আসতেন।··· একবার জন্মাষ্টমীতে তিনি আমায় আদেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণের গীতা-ধর্মের

উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে। তাঁর আদেশে লিখেছিলাম একটি প্রবন্ধ এবং পাঠের আসরে কম্পিত বক্ষে তা পড়েও ছিলাম। পরদিন সকালবেলা দেখি, এক কাণ্ড। জগদীশ আচার্য স্বয়ং একখানি মালা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও দিদি, তোমার শিরোপা। বড় ভাল লেগেছিল তোমার প্রবন্ধটি।'"

তৃতীয় পুরুষ কালীশচন্দ্র। তিনি ছিলেন বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক। তিনি একটি আতুর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে রোগীরা সেবা পেত। পথ থেকে রোগীদের তুলে নিয়ে এসে আশ্রমে তুলতেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের সারিয়ে তুলতেন। অকৃতদার মানুষটি এই নিয়েই থাকতেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বরিশালে 'লিটল্ ব্রাদার্স অব্ দি পুয়োর' নামে একটি সংগঠন করেছিলেন। সেই সংগঠনের আদর্শ ছিল সেবাব্রত। সংগঠনটির দায়িত্ব ছিল কালীশ পণ্ডিতের উপর। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত মানুষের খবর পেলেই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পালা করে রোগীর সেবা করতেন। মণিকুন্তলা লিখেছেন: "রাত দশটা থেকে দুটো এবং দুটো থেকে সকাল পর্যন্ত এঁরা (স্বেচ্ছাসেবকরা) দুজন করে আসতেন। এই ডিউটির কোন নড়চড় হতো না। কোন বাড়িতে এঁরা কিছু খেতেন না। অনেকসময় রোগীর পাশে হয়তো বাড়ির লোকেরা অনুপস্থিত থেকেছে, কিন্তু এঁরা বসে থাকতেন। একবার আমার দাদার টাইফয়েড হয়েছিল। মা সংসারের সব কাজ সামলে দাদার সেবা-শুশ্রূষা একলা পেরে উঠছিলেন না। আশ্রমে খবর দিতেই ওখান থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা এসে গেলেন। ওঁরা সন্ধ্যার পরে দুজন এসেই মার হাত থেকে জলের পাইপ ও পাখাটি নিয়ে নিতেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানো আর জ্বর দেখার কাজ ওঁরাই করতেন—মাকে করতে দিতেন না। মাকে একটু বিশ্রাম করানোর জন্য ছেলেরা কি চেষ্টাই না করতেন। বলা বাহুল্য, অশ্বিনীকুমার তথা কালীশ পণ্ডিতের এই সেবাব্রতের পিছনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল।"

এই তিন মহাপুরুষের প্রভাব মণিকুন্তলার জীবনের আধ্যাত্মিক মানসটি নির্মাণ করেছিল। সে-কথা মণিকুন্তলা বলতেন। এছাড়া তাঁর আধ্যাত্মিক মানস গঠনে তাঁর নিজের বাড়ির পরিবেশেরও অবদান ছিল। মণিকুন্তলা এবিষয়ে বলেছেন: "আমি ছিলাম ঐ ত্রিমূর্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং বরিশালের ঐ আবহাওয়ায় বর্ধিত, তার উপরে আমাদের পরিবারেও একটা ধর্মীয় আবহাওয়া ছিল। আমার এক ভগ্নীপতি ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্প্রদায়-ভুক্ত। আমরা ভাইবোনেরা, বিশেষ করে আমি, তাঁর ধর্মপ্রাণতার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমাদের একটি মন্দির ছিল। আমার দাদু-দিদিমার সমাধি-মন্দির। ঐ মন্দিরে কালী ও কৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত ছিল। মন্দিরে রোজ পুজো ও সন্ধ্যারতি হতো। আমার ভগ্নীপতির পরিকল্পনা ছিল তিনি ভবিষ্যতে একটি আশ্রম করবেন। সেটি হবে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের সাধনক্ষেত্র। আমাকেই উনি বেছেছিলেন ঐ আশ্রমের ভাবী আশ্রমিকা হিসাবে। বই কিনে কিনে একটি আলমারি ভর্তি করে তিনি আমায় দিয়েছিলেন। সবই ধর্মগ্রন্থ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকে বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী, দর্শনশাস্ত্র, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি তাতে ছিল। সেসব আমি খুব পড়তাম। বুঝি না বুঝি তবু আমার পড়তে ভালই লাগত।" আমার মনে হয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব ও আদর্শের সঙ্গে সম্ভবতঃ তখনই তাঁর প্রথম পরিচয় হয়ে থাকবে।

তাঁর সে-সময়ের মনের অবস্থা কি রকম ছিল, তার পরিচয় পাই মণিকুন্তলার একটি কথায়। তিনি বলছেন: "ধর্মগ্রন্থাদি খুব পড়তাম। সন্ন্যাসিনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই আমার ছিল প্রবল। আমার সন্ন্যাসের ধারণা—অতি কঠিন এক কৃচ্ছ্র-সাধনা।"

ধর্মের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আর যে ভাবটি মণিকুন্তলার অল্পবয়সে তাঁর মনকে রঞ্জিত করেছিল তা হল দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেম তাঁর জীবনে এসেছিল ধর্মের প্রভাবের সূত্র ধরেই।

মণিকুন্তলার নিজের কথাতেই বলি : "চারণকবি মুকুন্দ দাস ছিলেন বরিশালের সন্তান। সারা পূর্ববাংলাকে তিনি যে একদিন তাঁর গানে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তার পিছনে ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণা। বরিশালের পশ্চিমপ্রান্তে একটি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুকুন্দ দাস। সেখানেই তিনি থাকতেন। কিন্তু তাঁর আসর ছিল অশ্বিনীকুমারের বাড়িতে। মাঝে মাঝে সেখানে তাঁর গান হতো। দেশাত্মবোধক প্রাণমাতানো গান। আমাদের বাড়ি থেকে স্পষ্ট শোনা যেত। সেইসব গান আমার মনকে উদ্দীপ্ত করত।

"এছাড়া ছিল স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠিত বরিশালের শংকর মঠ। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ব্যক্তিগতভাবে এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ঐ মঠ যুগান্তর পার্টির কেন্দ্র ছিল বলে আমরা জানতাম। আমি ওখানে আমার ছোড়দির সঙ্গে কয়েকবার গেছি। ছোড়দি যেতেন মঠ দেখতে। আমার চোখ দুটো ঘুরত মঠের বড়গোছের লাইব্রেরীটির বইগুলোর উপর। ভাবতাম, ঐসব বই-এর পিছনে নিশ্চয়ই পিস্তল রাখা হয়। আর বিপ্লবীরা এখানে কেউ থাকেন কিনা জানবার জন্যও উৎসুক থাকতাম। হঠাৎ শুনলাম, একদিন পুলিশ ঐ মঠের সমস্ত কিছু, এমনকি মাটি খুঁড়ে তল্লাসী করে। মন্দিরের বেদী খুঁড়ে পর্যন্ত দেখে। অস্ত্রশস্ত্রও নাকি পায়। গ্রেপ্তার হলেন নিশিবাবু, যিনি আমাদের লাইব্রেরী দেখাতেন। এই শংকর মঠের প্রভাব নিঃশব্দে ওখানকার যুবমানসে বিপ্লবের অঙ্কুর রোপণ করত। জানি না, অন্য কোন জেলায় বিপ্লবীরা এই ধরনের মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে ছিলেন কিনা। বরিশালের ধর্মীয় আবহাওয়ার সঙ্গে এই বিপ্লবী আবহাওয়া মিশ্রিত হয়ে তাকে নিঃসন্দেহে নতুন বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। এই ছিল বরিশাল। এখনও মনে হয় ঐ আবহাওয়ায় আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম।"

কিন্তু মণিকুন্তলার জীবনে ধীরে ধীরে অন্য প্রভাবগুলিও এসে পড়তে লাগল। গান্ধীজী বরিশালে এলেন। কংগ্রেসের একটি প্রকাশ্য অধিবেশন হল। সারা ভারতব্যাপী যে আন্দোলনের ঢেউ চলছিল, তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মণিকুন্তলার উপর এসে পড়ল। ক্রমশঃ সেই প্রভাব প্রবলতর হতে লাগল। এদিকে বরিশালে সশস্ত্র বিপ্লবীরাও সক্রিয় ছিল। তাদের সঙ্গেও মণিকুন্তলার যোগাযোগ হয়েছিল। যুগান্তর দলের শান্তিসুধা ঘোষ মণিকুন্তলার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। শান্তিসুধা পরে গ্রেপ্তার হন। তাতে অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে মণিকুন্তলার সম্পর্ক শেষ হল না। বরিশালে এই সময় একদল ছেলে মার্ক্সীয় বইপত্র ও রাজনীতি নিয়ে চর্চা করছিল। তাদের সঙ্গে মণিকুন্তলার যোগাযোগ হয়। তাদের মারফতই কার্ল মার্কস, লেনিন প্রভৃতি কম্যুনিস্ট চিন্তানায়কদের রচনা ও ভাবনার সঙ্গে মণিকুন্তলা পরিচিত হলেন।

তার পরের পর্ব কলকাতা শহরে। মণিকুন্তলাকে কলকাতা আসতে হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার জন্য। দর্শনশাস্ত্রে তিনি ভর্তি হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "কিন্তু আমার মনে আবার সেই ভগবান ও কম্যুনিজমের দ্বন্দ্বটা ঠেলে উঠল। আমাদের একজন মার্কসপন্থী বান্ধবী হস্টেলে এলেন মার্কসীয় পুস্তক আমার সঙ্গে একত্রে পড়তে। উনি প্রস্তাব করলেন— 'নিরীশ্বরবাদ থেকেই শুরু করা হোক।' একটা ধাক্কা খেলাম।" এই প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছেন : "সেদিন সেই বান্ধবীর উপর খুব রাগ হয়েছিল। কেন ভগবানের সঙ্গে কম্যুনিজমের এই ঝগড়া? কম্যুনিজম প্রচারে ঈশ্বর ও ধর্মকে এভাবে আলাদা করলে এখনও আমার রাগ যায় না কেন? কম্যুনিজমের অর্থনীতি, শ্রমিক নেতৃত্বে নতুন ব্যবস্থা এই সব দিয়ে মানুষকে কি কম্যুনিজম বোঝানো যায় না? খুব যায়। আমার কম্যুনিস্টজীবন-ভোর আমি তো তাই করেছি। এবং পরেও কি দেখিনি কালীঘাটের পান্ডারাও পার্টির সদস্যপদ পেয়েছে। পান্ডাগিরি বজায় রেখেই?"

মনে হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবার আদর্শ যা কিনা ধর্মেরই আরেক নাম তা মণিকুন্তলাকে হয়তো তাঁর অজান্তেই গভীরভাবেই প্রভাবিত করেছিল। তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঘটনাটি

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ের। সেসময় কলকাতার ফার্ন রোডে দলের পক্ষ থেকে একটি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। দলের মেয়েরাই সেটি চালাত। এই ঘটনার সম্বন্ধে মণিকুন্তলা বলেছেন: "চালের দাম তখনকার দিনে মণ প্রতি আটাশ টাকায় উঠেছিল। খাবার সংস্থান করা মুশ্কিল হয়ে উঠল। আমাদের এক সহকর্মী মনোরমা গুহর দুটি বাচ্চা মেয়ে আমাদের কাছে থাকত। ক্যান্টিনে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে যেটুকু বাকি থাকত তাই নিয়ে এসে সকলে ভাগ করে আমরা খেতাম। কিন্তু কাজটা ভাল নয় মনে হল সকলেরই। কারণ এ-তো দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের জন্য। তাই প্রত্যেকে এর পর থেকে নিজের পয়সায় যা-হোক একটা কিছু কিনে খেত। একদিন রাত দশটায় নিজের জন্য একটা রুটি কিনে বাড়ি ফিরেছি। দেখি, মনোরমার মেয়ে দুটি জেগে বসে আছে। ওরা জানতে চাইল আমি কোন খাবার এনেছি কিনা। হাতের রুটিটা তাদের হাতে দিয়ে বললাম: "হ্যাঁ এনেছি, দুজনে ভাগ করে খাও।"

তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং কর্মজীবন সম্পর্কে যারাই পরিচিত তাঁরাই জানেন যে, নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করাটাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁর কাছে পার্টির কাজ একটা তপস্যা বা ব্রতর মতো ছিল। সেই কারণেই পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে এবং ষাটের দশকের প্রথম দিকে যখন দেখলেন, সেই মনোভাব বজায় রেখে রাজনীতি করতে গেলে তাঁর তখনকার চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁকে আপস করতে হবে তখন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু কোনদিন তিনি মনে করেননি শোষিত মানুষের এবং মেয়েদের মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম তিনি করেছিলেন তা ভুল হয়েছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনেপ্রাণে ও চিন্তাভাবনায় তিনি ছিলেন একজন সাচ্চা কম্যুনিস্ট। মৃত্যুর মাত্র দু-তিন মাস আগে একটি সাংবাদিক মেয়ে তাঁর কাছে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল। তার এক প্রশ্নের উত্তরে মণিকুন্তলা স্পষ্টই বলেছিলেন: "নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে মার্কসিজম যে সংগ্রাম করার কথা বলে সেটা অবশ্যই প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর নেই।"

জীবনের প্রাথমিক পর্বের যে অধ্যাত্মচেতনা তাঁর মানস-গঠনকে সঞ্জীবিত করেছিল তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রবাহে প্রবাহিত হয়েও আধ্যাত্মিকতার দিকেই এগিয়ে চলেছিল এবং তা পরিণতি পেয়েছিল রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের আশ্রয়ে। মণিকুন্তলার শেষ জীবনে তিনি কিভাবে আস্তে আস্তে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন সে-সম্পর্কে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বলেছেন: "১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে মণিদি স্বামীজীর বাণী ও রচনা আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়তে থাকেন। প্রথমদিকে তাঁর মনে যেন একটা সংশয় ও দ্বিধা ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যরা তো একটু বানিয়ে বলবেই।' তখন আমি বললাম যে রামকৃষ্ণের শিষ্যরা ছাড়াও রামকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাঁরাও যা লিখেছেন তাঁদের লেখা পড়ে দেখবেন। তাঁরাও কিছু কম বলছেন না। তাঁরাও নিজেরা যা দেখেছেন তাই-ই লিখেছেন। তখন তিনি সেসব বইও পড়লেন। পরে লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামীজীর পদপ্রান্তে এবং স্বামী বিরজানন্দের জীবনী 'অতীতের স্মৃতি' একাধিকবার পড়লেন। তারপর তিনি নিজে 'কথামৃত' কিনে পড়লেন এবং আমার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কিত যত বই ছিল সবই নিয়ে পড়লেন। হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, 'তুমি তো স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীকে জান, তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল।'

"একদিন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করাতে মণিদিকে নিয়ে গেলাম। সঙ্গে মণিদির স্বামীও ছিলেন। মহারাজের সঙ্গে আধঘণ্টার মতো আলাদা কথা বলেছিলেন মণিদি। কি কথা হয়েছিল আমি জানি না। কিন্তু সেইদিনই ঠাকুরের ছবি এনে ঘরে বসিয়েছিলেন। তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বর ও সারদামঠে আমার সঙ্গে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় ২০।২৫ মিনিট বসেছিলেন। পরে আমরা সারদামঠে (দক্ষিণেশ্বর) যাই। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি ও একজন মাতাজী তাঁকে অনেক কষ্টে শান্ত করলাম। পরে আমার পরিচিত একজন সন্ন্যাসিনীর কাছে নিয়ে গেলাম।

তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। পরে একদিন বেলুড় মঠেও আমরা গিয়েছিলাম।"

পরে একদিন মণিকুন্তলা কলকাতা অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অনন্যানন্দ মহারাজের সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা করেন, বিশেষ করে মনকে কি করে শান্ত করা যায় সেবিষয়ে। তাঁকে তিনি অনুরোধ করেন দীক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু স্বামী অনন্যানন্দ বলেন, দীক্ষা নিতে হলে প্রেসিডেন্ট মহারাজ বা ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে নিতে হবে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে যদি তিনি খুবই আগ্রহী থাকেন তাহলে তিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, দীক্ষা না নিলে যে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা যায় না তা নয়। আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ নিয়ে সেদিন মণিকুন্তলার সঙ্গে আরও কিছু আলোচনা তাঁর হয়েছিল।

মণিকুন্তলার দীক্ষা নেবার আগ্রহ বাড়তেই থাকল। এদিকে তাঁর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। বাইরে চলাফেরা করার ক্ষমতা কমে আসছিল। তাঁর এক বোনঝি সেসময় সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাঁর কাছে আসে। সে যখন দেখে যে তাঁর মাসীমা দীক্ষা নেবার জন্য খুবই আগ্রহী, তখন সে বললে: "আমি কয়েক বছর আগে যোগোদ্যানে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষা নিয়েছি। মহারাজকে আমি অনুরোধ করতে পারি তোমার দীক্ষার জন্যে।" এই কথা শুনে মণিকুন্তলা খুবই উৎসাহী হলেন এবং মহারাজকে অনুরোধ করতে বললেন। তারপর মণিকুন্তলার বোনঝি মহারাজকে ওঁর দীক্ষার কথা বলে এবং বলে যে, ওঁর শরীর খুব অসুস্থ, যোগোদ্যান মঠে আসার সামর্থ্য নেই; কিন্তু খুব ব্যাকুল হয়েছেন দীক্ষার জন্য। ভূতেশানন্দজী মহারাজ সব শুনলেন কিন্তু দীক্ষা-সম্পর্কে কিছু বললেন না। তবে তাঁকে একবার তিনি দেখতে যাবেন সেকথা বললেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী কারও বাড়িতে সাধারণতঃ যান না। বাড়িতে গিয়ে দীক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা। মহারাজ বাড়িতে তাঁকে দেখতে আসবেন শুনে মণিকুন্তলা অভিভূত হয়ে পড়লেন। দু-একদিন পরে আমি মহারাজের সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করি মহারাজ কোন্ তারিখে আমাদের বাড়ি আসবেন তা জানার জন্য। তিনি তারিখটি জানালেন। আমি বললাম, সেদিন কি মহারাজ দীক্ষা দেবেন? সচিব-স্বামীজী বললেন: "তা আমি বলতে পারব না। মহারাজ যাবেন বলেছেন শুধু এইটুকুই বলছি।" ইতিমধ্যে মণিকুন্তলা তাঁর ছোট বোনকে একটা চিঠি দিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমি একটি নতুন জিনিসের সন্ধান পেয়েছি। তুমি এস।" তিনি তাঁর বোনকেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নানা বই পড়তে দিতেন। তাঁর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে নানা আলোচনা করতেন।

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ আমাদের বাড়িতে এলেন। মণিকুন্তলা মহারাজকে দীক্ষা দেবার জন্য খুবই ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। মহারাজ তখন রাজী হলেন এবং সেখানেই তাঁকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর মণিকুন্তলা তাঁর বোনকে জড়িয়ে ধরে অসম্ভব রকম কাঁদতে লাগলেন। এই ব্যাপারে তাঁর বোন বলেছেন: "আমি প্রথমে কান্না দেখে তাঁর শরীরের কথা চিন্তা করে খুবই ভয় পেয়েছিলাম। নানারকম সান্ত্বনার কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই কান্না আর থামে না। তখন বুঝতে পারলাম এই কান্না তাঁর মনের আবেগের প্রকাশ। এ-কান্না তাঁর গভীর আনন্দের কান্না।"

মণিকুন্তলা এরপর আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একেবারেই শয্যা নিলেন। তখনকার সময়ের কথা বলতে গিয়ে তাঁর ঐ বোন বলেছেন: "আমাকে সব সময়ই কাছে থাকতে বলতেন। আর বলতেন, 'তুই নাম-গান কর, কীর্তন কর। ঠাকুরের বই পড়ে শোনা।' যখনই আমি ওঁর কাছে থাকতাম তখনই সকাল-সন্ধ্যা আমাকে ঠাকুরের নাম-গান করতে হতো। অন্য কোন কথা তিনি শুনতে চাইতেন না। সারাদিনই ঠাকুরের নাম-গান শুনতে ভালবাসতেন।" ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যখন শেষ সময় এল, তখন দেখা গেল তাঁর দৃষ্টি ঠাকুরের ছবির দিকে। শেষের কয়েকদিন অবর্ণনীয় শারীরিক যন্ত্রণায় ও কষ্টে কেটেছিল। কিন্তু অন্তিম মুহূর্ত যখন এল তখন তাঁর মুখে সেই যন্ত্রণা ও কষ্টের লেশমাত্রও ছিল না।

লালন ফকির ও তাঁর গান

তাপস বসু

॥ ১ ॥

বিশ শতকের অন্তিম পর্বে যে সময়টা আপন ক্লান্তি আর আপাতবিষণ্ণতা বহন করে চলেছে সামনের দিকে—সেই সময়ের বুকে মূল যে সংকট-সমস্যা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে তা হল: (১) জাতপাতের সমস্যা, (২) মূল্যবোধহীনতার সমস্যা, (৩) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধজনিত আশংকা—বিশ্বপ্রেমহীনতার সমস্যা, (৪) আত্মোপলব্ধির সমস্যা, (৫) সার্বিক জীবন সচেতনতার অভাবজনিত সমস্যা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পল্লবিত উন্নতি, একশ্রেণীর মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্তন, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, হাজার খানেক ছোট খাটো গৃহযুদ্ধ, সামরিক উত্থান ইত্যাদিতে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে ঘন হয়ে আসা অন্ধকার, লুপ্ত মূল্যবোধ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, জাত-পাতের জিগীর তুলে আধুনিক নরমেধ যজ্ঞের ব্যাপক আয়োজন, মুক্ত মনের গঙ্গাকে রুদ্ধ করে, চেতনার আকাশকে খণ্ডিত করে সম্প্রদায়-গোষ্ঠী সর্বোপরি আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে নির্বাসন, আপন লোভ, অন্ধ কামনা-বাসনার চরিতার্থতায় অপরিমিত মিথ্যা ও ভ্রষ্টাচার—চলতি শতাব্দীটা আর সব কিছুর সঙ্গে এসবই আমাদের জীবনে বহন করে এনেছে। এ কি প্রগতির, শিক্ষার অভিশাপ না কি প্রগতির, শিক্ষার বুকে আমূল ছুরিকাঘাত! এ-প্রশ্নটি যদি লালন ফকির নামে গত শতাব্দীর একজন অশিক্ষিত, তথাকথিত প্রগতির আলোকিত পথের বিপরীতে চলা মানুষ করেন—তবে কি উত্তর দেব আমরা? বিশেষ কার ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আমরা?

লালন ফকিরের জীবন সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় ১১৮১ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক (ইংরেজী ১৭ অক্টোবর, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) লালনের জন্ম হয় যশোহর জেলার ঝিনাইদহে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক (ইংরেজী ১৭ অক্টোবর ১৮৯০)।[১] অবশ্য এটি যে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত সিদ্ধান্ত—তা কখনই বলা যাবে না। এই কালসীমা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে লালন বেঁচে-ছিলেন ১১৬ বছর। এই দীর্ঘ জীবনযাত্রায় আত্মানুভবের মধ্য দিয়ে লালন আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন বিশ্বপ্রেমের শুভ্র ধ্বজা আর সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত উদার ধর্মজীবনের অমোঘ সূত্র:

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান
জাতি-গোত্র নাহি রবে॥
শোনায়ে লোভের বুলি নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বুলি দূরে ঠেলে না দেবে॥
... ...
ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতির তুলবে না গো
কেহ জিগীর।[২]

লালন সারাজীবন ধরে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুক্ত জীবনের অন্বেষণে ব্রতী থাকলেন অথচ আধুনিক কালে এপার-ওপার—দু-বাংলার বিদগ্ধ-জনেরা লালন হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান ছিলেন তা নিয়ে নানা গবেষণা, সমীক্ষা চালিয়েছেন এবং কেউ কেউ এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। এ-সম্পর্কিত দুটি মন্তব্য আমরা অনায়াসে উদ্ধার করতে পারি। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন: "লালন জাতিতে হিন্দু কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল কর, কেহ বলেন দাস।"[৩] ওপার বাংলার অধ্যাপক আনোয়ারুল করিমের মতে, "লালন শাহ্ ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নেই।"[৪]

১ লালন শাহ্: জীবন ও গান—এস্. এম্. লুৎফর রহ্‌মান, ঢাকা ১৩৯০, পৃ: ৮। মতান্তরে লালনের জন্মস্থান কুষ্টিয়া জেলার ভাঁড়ারা গ্রাম।
২ ঐ, পৃ: ১৬
৩ বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮
৪ বাউল কবি লালন শাহ্—আনোয়ারুল করিম, ঢাকা, পৃ: ২০

আমরা যখন আধুনিক শিক্ষিত মানস অভিব্যক্তিতে লালনের জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় বিচার করতে বসি তখন অন্তরাল থেকে সেই বিশ্বজনীন মানুষ লালন সোল্লাসে বোধহয় হেসে ওঠেন। আসলে জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি ঘোচাতেই তো তিনি বহু গান বেঁধে উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন। এই গানগুলির মধ্যে তিনটি গানের[৫] কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি।—

১। সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতির কি রূপ,
দেখলাম না এই নজরে॥
…　　…

ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তরে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি—কি প্রকারে॥

কেউ মালা কেউ তস্‌বীর গলে
তাইতরে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে॥

জগত বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথা-তথা
লালন বলে জাতির ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাধ—বাজারে॥

২। জাতির উৎপত্তি কোথায়—সকলে শুধায়।
বললে কবে লালন ফকির
কড়া কথা কয়॥
…　　…

জ্ঞানী-দিগ্বিজয়ী হল
নানারূপ সব দেখতে পেল
দেখে নানারূপ সব হলো বেকুব।
এরূপে জাতির পরিচয়॥

৩। সবাই শুধায় লালন ফকির
কোন জাতির ছেলে।
কারে বা কি বলব আমি
দিশা না মেলে॥
…

হয় কেমনে জাতির প্রমাণ
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্ট-যবন,
'জাত' বলিতে কি হয় বিধান
শাস্ত্রে খুঁজিলে॥

লালনের এইসব গানে জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে কশাঘাত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালেও এই সমস্যাটি আমাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। এই বাঁধন লালনের গান শুনে ক্রমে ক্রমে আলগা হোক, পরিশেষে টুটে যাক—এটাই যখন কাম্য, তখন লালনের জাত, গোত্র আবিষ্কার করতে যাওয়া নিরর্থক। লালনকে আমরা একজন যথার্থ 'মানুষ' বলেই অভিহিত করব। এই যথার্থ মানুষের সংজ্ঞা একদা শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। তিনি তাঁকেই 'মানুষ' রূপে চিহ্নিত করেছেন যাঁর 'মান' এবং 'হুঁশ' আছে।

লালনের মধ্যে সেই 'মান' এবং 'হুঁশ'-এর সম্মিলন ঘটেছিল। আর তা ঘটেছিল বলেই তাঁর গানে, তাঁর জীবনচর্যায় মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছিল।

লালন বলছেন, জীবনে একজন 'গুরু' চাই। গুরুই জীবনে আলোকিত পথের সন্ধান দেন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁৗছে দেন। গুরুর প্রেরণা মানুষকে 'মান হুঁশ' করে। গুরুকৃপা তাই একান্ত-ভাবেই মনুষ্যজীবনে পরম কাঙ্ক্ষিত। লালনের একাধিক গানে সে-কথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। এপ্রসঙ্গে লালনের একটি গানের[৬] নির্বাচিত একটি অংশ:

৫ লালন শাহ্: জীবন ও গান, পৃঃ ১৪-১৬

৬ লালন-গীতিকা—মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত), কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ১১

গুরু বিনে কি ধন আছে।
কি ধন খুঁজিস খেপা কারো কাছে ॥
বিষয়-ধনের ভরসা নাই
ধন বলতে ধন গুরু গোঁসাই
সে ধনের দিয়ে দোহাই
ভব-তুফান যাবে বেঁচে ॥

তুমি কার আর কে বা তোমার এই সংসারে।
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন কি করো রে ॥
আপনি যখন নও আপনার
কারে বলো আমার আমার
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
জ্ঞান নাই রে ॥[৭]



শিলাইদহে বোটের উপর লালনকে বসিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছবিটি এঁকেছিলেন □ সনৎকুমার মিত্রের সৌজন্যে

সংসার মায়াময়। সংসার মোহময়। এই মায়া-মোহ সম্পর্কে সচেতন হয়েই সংসারজীবন নির্বাহ করতে হয়। লালনের একাধিক গানে মায়া-মোহময় সংসার সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে তীব্র-তীক্ষ্ন সত্য কথা :

লালন বারেবারেই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন। তিনি বারেবারেই উচ্চারণ করেছেন—জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তিনি আরও বলতেন যে, বহু সাধনায়

৭ লালন ফকির কবি ও কাব্য—সনৎকুমার মিত্র, কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃঃ ১৫৬

আমরা মানুষ হয়ে জন্মলাভ করেছি। আর এই মনুষ্যজীবনে ঈশ্বরলাভই একমাত্র অভিপ্রেত। লালন একটি গানে বলছেন সেই কথা :

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে ॥
* * *
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে, পেয়েছ এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী
সুধারায় যেন ভরা না ডোবে ॥
এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠল নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে ॥[৮]

ভারতবর্ষের মাটিতে রয়েছে সকল ধর্মের দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধার বীজ। লালন তাঁর সাধনায়, জীবনচর্যায়, সেই সত্যটি একান্তভাবেই অনুভব করেছিলেন। তাই একাধিক গানে তিনি সব ধর্মের মূলগত সত্যকে তুলে ধরেছেন :

আপনার আপনি ফানা হলে
তারে জানা যাবে
কোন্ নামে ডাকিলে তারে
হৃদাকাশে উদয় হবে ॥

আরবী ভাষায় বলে আল্লা
ফারসীতে হয় খোদাতালা
'গড' বলিছে যীশুর চ্যালা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে ॥

মনের ভাব প্রকাশিতে
ভাষার উদয় এ-জগতে
মনাতীত অধরে চিনতে
ভাষাবাক্য নাহি পাবে ॥

আল্লা-হরি ভজন-পূজন
সকলি মানুষের সৃজন
অনামক অচিনায় কখন
বাগীন্দ্রিয় না সম্ভবে ॥

আপনাতে আপনি ফানা
হলে তারে যাবে জানা।[৯]

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু-মুসলমান,
বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান জাতি-গোত্র নাহি রবে।
ধর্ম-কুল-গোত্র-জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগীর
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে বা দেখায়ে দেবে ॥[১০]

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের অমোঘ সূত্রটি সামনে রেখেই এ যুগে 'এক পৃথিবী' (one world)-এর কথা বলেছিলেন। আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা, বিভিন্ন মানুষের সুচতুর লোভ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার প্রবল বাসনা সারা পৃথিবীকে আজও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নতুন সমাজ, এক বিশ্ব ছিল উদার প্রেমিক, জীবন-অম্বিষ্ট ঐ দুই মহাসাধকের অভিপ্রেত। লালনও সেই সমাজ, এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু তা বাস্তবায়নের পথ খুঁজে না পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছেন : "কেঁদে বলে লালন ফকির কে বা দেখায়ে দেবে ?" লালনের এই কান্না সৎ, বিবেকবান সকল মানুষের বুকে কান পাতলে শোনা যাবে। সেই কান্না বিশ্বশান্তির জন্য, শোষণ-মুক্ত সমাজবেষ্টিত এক নতুন বিশ্বের জন্য।

সত্যকে আঁকড়ে থাকার কথা বারে বারে উল্লেখ করেছেন লালন তাঁর গানে। শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্ত 'সত্যই কলির তপস্যা'—লালন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। লালন বলছেন :

সত্য বল সুপথে চল
ওরে আমার মন
সত্য-সুপথে না চলিলে
পাবে না মানুষ দরশন।[১১]

সত্যেরই আরেক নাম প্রেম। লালন 'প্রেম-রতন' সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গানে প্রেমের শক্তি কতটা তা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে :

৮ লালন শাহ্ : জীবন ও গান, পৃঃ ১০৫

৯ ঐ, পৃঃ ৯৯ ১০ ঐ, পৃঃ ৯৬
১১ ঐ, পৃঃ ১১৫

প্রেমে সহিষ্ণুতা করে
পরহিতে সদাই ফেরে
শত্রু-মিত্রের মঙ্গল করে
সবাই তার সম হন ॥
প্রেম লোভ ক্রোধ হরে
অহংকার বিনাশ করে
দয়ামায়া গুণ ধরে
সুখ-প্রস্রবণ ॥[১২]

সেই প্রেমই মানুষকে পেঁছে দেয় জীবনের চরিতার্থতায়—আত্মসাক্ষাৎকারে। প্রসঙ্গটি লালনের বিখ্যাত তত্ত্বাশ্রয়ী একটি গানে এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে:

খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখি
কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ি
দিতাম তাহার পায় ॥
... ...
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন ফকির কয় ॥[১৩]

লালন এইভাবে নানা অলংকার ও উপমার সাহায্যে সবচেয়ে জটিল ও কঠিন বিষয়গুলি সহজভাবে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন।

লালনের নানা গানে এমনভাবেই আমরা ভারতের শাশ্বত বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। লালন প্রথম জীবনে নবদ্বীপে সাত বছর অতিবাহিত করেছিলেন। তারপর তিনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী ইত্যাদি তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। লালন দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং মধ্য এশিয়ায় অবস্থানকালে ইসলামের অধ্যাত্মবাদ, সুফীবাদী তাসাউফ্ বিশেষতঃ সুফী মতবাদ এবং সাধনপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়েছিলেন।[১৪] স্থির-স্তরের সাধন-ক্রম ধর্মসমন্বয়ের সূত্রটি তাঁর মধ্যে গ্রথিত করেছিল। লালনের জীবৎকালেই লালন-গীতি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশিষ্ট লালন-গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুতালিব সেকালের বিশিষ্ট মানুষদের উপর লালন-গীতির প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন: "উনিশ শতকের বাউল-গীতির অন্যতম প্রধান প্রচারক ও সাধক কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার, সাহিত্য সাধক মীর মোশাররফ হোসেন, ঐতিহাসিক গবেষক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুসাহিত্যিক রায় জলধর সেন, এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই অসাধারণ মরমী কবি-সাধকের (লালনের) বাণী-সমুদ্রে অবগাহন করে ধন্য হয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশের সুধীসমাজ লাভ করেছিল বিহারীলালের 'বাউল বিংশতি', 'সারদা মঙ্গল', 'সাধের আসন'—ইত্যাদি কাব্য ও কবিগুরুর 'বাউল' (১৯০৫), 'আত্মশক্তি', 'Religion of man' (১৯৩০), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩)—ইত্যাদি সাহিত্য ফসল ও ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনমূলক গ্রন্থরাজি। শুধু তাই নয়, কথিত আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গীত আসরে লালনশাহী সঙ্গীতেরও বিশেষ কদর ছিল। এমনকি, নিছক মানবতাবাদী (Humanist) দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকেও লালন-গীতির আসরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত হিসেবেও দেখা গিয়েছে। শুধু কি তাই? রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজেও লালন-গীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল...।"[১৫]

লালন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিহিত থাকলেও ধ্যান ধারণা ও প্রেম-সাধনায় যাঁদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাঁরাই 'আল-ইনসানউল-কামিল' অর্থাৎ পূর্ণমানব। লালনের জীবনে, গানে আছে এই পূর্ণমানবেরই অন্বেষণ।

১২ লালন শাহ্: জীবন ও গান, পৃঃ ৯১
১৩ ঐ, পৃঃ ১২৩
১৪ ঐ, পৃঃ ৪৫
১৫ লালন-চরিতের উপাদান: তথ্য ও সত্য—মহম্মদ আবুতালিব (সম্পাদক: খোন্দকার রিয়াজুল হক), ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪৯-৫০

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কি পরে 'রসেছিলেন'?

জলধিকুমার সরকার

কথামৃত-পাঠকদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চরিত্র একটি প্রহেলিকা। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে: ডাক্তার সরকার কি নাস্তিক, না তাঁর ধর্মবিশ্বাস তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রভাবিত? তাঁর মতো আপাতকর্কশস্বভাব বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণের কারণ কি? তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের 'তুমি রসবে', 'ওর হবে কিছুদিন পরে' প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কি ডাক্তারের জীবনে পরে সত্য হয়েছিল? এই সব প্রশ্নে আসতে গেলে প্রথমে মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী কিছুটা আলোচনা করলে সুবিধা হবে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার (জন্ম: নভেম্বর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দুরূহ এম. ডি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান নিয়ে উত্তীর্ণ হন। পরের কয়েক বছরে তিনি যেসব সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন, সেগুলি হল: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (প্রথমে আর্টস ও পরে মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে), অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, সি. আই. ই. (১৮৬৩), লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য (চারবার—১৮৮৭-১৮৯৩), কলকাতার শেরিফ (১৮৮৭), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ অঙ্গ সিন্ডিকেটের সদস্য (এবং ঐকালে কয়েকবার সাময়িক উপাচার্য), এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. এল. (১৮৯৮)। আগে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু একটি পত্রিকার জন্য 'ফিলসফি অফ হোমিওপ্যাথি' নামক পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্তন হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর মত পরিবর্তনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, এবং সেসময় এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর যথেষ্ট পসার থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐ চিকিৎসা ছেড়ে দেন। চিকিৎসক সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হলেও এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব, প্রবীণ চিকিৎসক সকলেই তাঁকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেও (এমনকি কেউ কেউ তাঁকে 'বিকৃত মস্তিষ্ক' বললেও), তিনি অচল-অটল থাকলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নাল স্থাপন করে তার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রকে তুলে ধরতে লাগলেন। এ-বিষয়ে তাঁর বিশেষ সহায়ক ছিলেন 'কথামৃতে' উল্লিখিত বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর চিকিৎসা-মত পরিবর্তনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হতে থাকায় তিনি ফ্যাকাল্টি থেকে পদত্যাগ করেন। এদিকে, ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর বঙ্গীয় শাখার সেক্রেটারি ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন, অ্যালো-প্যাথি চিকিৎসার দোষ দেখানোর জন্য তাঁকে ঐ অ্যাসোসিয়েশন থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁরই পরামর্শে সরকার বিবাহবিধি প্রণয়নে মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনপক্ষে ১৬ বৎসর করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তিনি সভাপতি হন, সেখানে চা-শ্রমিকদের দুরবস্থার উপর ও তাদের 'কুলি' বলায় আপত্তি করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বৈদ্যনাথে তিনি 'রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম' স্থাপিত করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়া প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তাঁর এক বিরাট কীর্তি 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন, বর্তমানে যার নাম 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' এবং পরবর্তী কালে সেখান থেকে স্যার সি. ভি. রমন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালী-কৃষ্ণ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। বিজ্ঞান দ্বারা দেশ কিরূপে উন্নতি করতে পারে, তা তিনি বিজ্ঞানসভার বাৎসরিক সভায় সকলকে বোঝাতেন। তিনি সেখানে বলতেন যে, বিজ্ঞান আলোচনায় শুধু যে ঐহিক উন্নতি হয়

তাই নয়, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা হয় এবং মানবহৃদয়ের বিকাশ হয়। তাঁর দেহাবসান হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ ফেব্রুয়ারি।

উপরি-উক্ত জীবনী থেকে ডাক্তার সরকারের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে তা হচ্ছে তাঁর অনমনীয়তা। কথামৃতে দেখি তিনি তর্কপ্রিয়, চাঁচাছোলা ভাষণে পটু এবং কর্কশস্বভাব। ষষ্ঠবর্ষের উদ্বোধনে সরসীলাল সরকার বলেছেন : "বাল্যকালের পারিবারিক ক্লেশ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভবিষৎ চরিত্র-গঠনে একদিকে যেমন বিশেষ সহায় হয়েছিল, সেইরূপ অন্যদিকে আবার কয়েকটি কর্কশ রেখাও দৃঢ় অংকিত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।" তবে চারিত্রিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে পরিবেশের উপর এতটা জোর দেওয়ার ব্যাপারে বংশগতিবিশারদরা (genetists) নিশ্চয় একমত হবেন না। জন্মান্তর-বাদীরা আবার চরিত্রকে পূর্বজন্মলব্ধ সামগ্রী বলে ধরবেন। সে যা-হোক, মহেন্দ্রলালের জীবনী পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি নিজে যা ভাল বুঝতেন তা থেকে কারও কথায় বিচ্যুত হতে চাইতেন না। আশেপাশের অন্যদের মত ভিন্ন হলেও এবং তাদের মতে না আনতে পারলেও তিনি নিজের মতকেই ধরে থাকতেন। তাঁর এই মানসিকতাই কখন কখন তর্কপ্রিয়তার রূপ নিত—অনেক সময় অহেতুক তর্ক বা তর্কের জন্যে তর্ক। এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায় কথামৃতে।

> শ্রীরামকৃষ্ণ—অহংকার না গেলে জ্ঞানলাভ করা যায় না। উঁচু ঢিপিতে জল জমে না।
>
> ডাক্তার—কিন্তু খাল জমিতে যে চারিদিকের জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে ··· হেগো জলও আছে। (৪।২৭।৫)
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।
>
> ডাক্তার—অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। (কথামৃত, ১।১৫।২)।

এই যে হার স্বীকার না করার বা জিতবার ইচ্ছা, নিজেকে সবজান্তা বা শ্রেষ্ঠ ভাবা—তা সে জাগতিক ব্যাপারেই হোক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই হোক—এর পিছনে ছিল, মনে হয় ডাক্তারের অহংকার। ডাক্তার সরকারের নাম, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা এবং হয়তো অর্থ (সেসময় তিনি বাংলায় সবচেয়ে বড় হোমিও চিকিৎসক) এত প্রভূত ছিল যে তাঁর মতো কোন লোকের পক্ষে 'অহংকারী' হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণও ডাক্তারের এই দোষের কথা বলেছেন : "দেখ, অহংকার না গেলে জ্ঞান হয় না।" (কথামৃত, ১।১৮।৩), "তুমি লোভী, তুমি কামী, তুমি অহংকারী" (কথামৃত,২।১৫।২)। গিরিশবাবুও বলেছেন : "আপনি একলা তাদের সকলের অহংকার আছে এই দোষ ধরাতে ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে" (কথামৃত, ১।১৮।৬)। পুঁথিকার ডাক্তার সম্বন্ধে বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তারের অহংকারের ইঙ্গিত দিয়েছেন।[১] মহিম চক্রবর্তীও ডাক্তারের অহংকার লক্ষ্য করেছিলেন (কথামৃত, ৪।২৮।১)। ভিতরের অহংকার একজনের ব্যক্তিত্বকে কত বিচিত্রভাবে চালিত করে, সে-সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ্ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার বলেছেন : "চরিত্র হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দিক, তার চারিধারের পরিবেশকে কিভাবে গ্রহণ করে সেই বৈশিষ্ট্য।··· সকলকে জয় করা, সকলের উপর প্রভুত্ব করা ও সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই অধিকাংশ মানুষকে চালিত করে। ·· যখনই পরিচিতি পাবার চেষ্টা প্রাধান্যলাভ করে তখনই তার মনোজগতে অধিকতর উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তার জীবন বিরাট কিছু করার আশায় ভরে থাকে। সে তখন বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারায়। তার সম্বন্ধে অন্যের অভিমতকেই প্রধান করে দেখে। অন্যে কতটা তাকে তারিফ করছে সেই দিকেই তার নজর থাকে। তখন তার জীবনযাত্রায় নিজস্ব স্বাধীনতা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে, এবং তার চারিত্রিক বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায় অহংকার।··· অহংকার প্রায়ই নানারকমের মুখোস পরে আসে, একরকমের বিনয় আছে যা অহংকারেরই ভিন্ন রূপ।··· অহংকারী মনে করে যে সে ঠিক, অন্যেরা ঠিক নয়।··· এদের মধ্যে কারও কারও বদ্ধ ধারণা হয় সে অহংকারী নয়।··· সে রঙ্গমঞ্চের একমাত্র নায়ক হয়ে থাকতে চায়, এবং যতক্ষণ সে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলে থাকতে পায়, ততক্ষণ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি (১৩৬৪), পৃঃ ৫৮৭ ; ৫৯০, ৫১৭

অন্যদের ভাল বলে; সে-রকম না থাকতে পারলেই অন্যেরা মন্দ। এদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজে অন্য কারও সঙ্গে মিশতে চায় না এবং আলাদা থাকতে চেষ্টা করে।"[২] ডাক্তারের চরিত্রে উপরি-উক্ত অনেক ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায়। তিনি সবসময় নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতেন। বলতেন: "বাপ অন্যায় করলে, তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।"[৩] এরূপ মনোভাব থাকলে অন্য কারও কাছে মন খোলা যায় না। ডাক্তার নিজেই বলছেন: "আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্যন্ত আমায় মনে করে স্নেহমমতা-শূন্য, কেননা আমার দোষ এই যে আমি ভাব কারু কাছে প্রকাশ করি না।" (কথামৃত, ১।১৮।৬)

ডাক্তারের মধ্যে যে রসজ্ঞান আছে কথামৃতে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'সরল'ও বলেছেন (কথামৃত, ১।১৫।৩)। এদুটির কোনটিই অহংকারের সঙ্গে পরস্পরবিরোধী নয়, অর্থাৎ অহংকার থাকলেও এদুটি গুণ থাকা অসম্ভব নয়। ডাক্তারের চরিত্রের একটা প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে তাঁর উচ্চ-আদর্শ এবং সেই আদর্শকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা, বাংলার তদনীন্তন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার জন উড্‌বার্ণ ডাক্তারের উচ্চ-আদর্শ লক্ষ্য করে একটি বিজ্ঞানসভায় বলেছিলেন, "বিজ্ঞানসভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত কার্য তুমি করিয়াছ, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট নহ। ইহার কারণ ইহা নহে··· সেগুলি সামান্য কার্য; তাহার কারণ এই যে, তোমার আদর্শ এত উচ্চ যে তুমি অল্পে সন্তুষ্ট নহ। সাধারণের নিকট যাহা অসামান্য, তোমার নিকট তাহা সামান্য মাত্র।"[৪]

মহেন্দ্রলাল যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, কথামৃতে বর্ণিত তাঁর কথাবার্তায় এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে তিনি প্রচলিত ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ রামচন্দ্র দত্ত ডাক্তারের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে বলেছেন: "তিনি যদিও একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী বটেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রাদি ও দেবদেবী আদৌ বিশ্বাস করিতেন না।··· বর্তমান শতাব্দীর যে প্রকার পরিমার্জিত ধর্মভাব অর্থাৎ জীবের হিতসাধন করা, তাহা ডাক্তার সরকারের ধারণা ছিল।··· মানুষ গুরু হতে পারে না; কেহ কাহারও চরণধূলি লইতে পারে না; ভাবসমাধি মস্তিকের বিকার; সাকার রূপাদি বা অবতার কখনও হতে পারে না, এবং ঈশ্বর অসীম, তিনি কদাচ সীমাবিশিষ্ট নহেন।"[৫] কথামৃতের বহুজায়গায় ডাক্তারের এই ধরনের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জ্ঞানবাদের পক্ষ নিয়ে বহু জায়গায় তর্ক করেছেন, তবে তাঁর জ্ঞানমার্গ সম্পর্কে তাঁর ধারণার স্বরূপ কি তা স্পষ্ট জানা যায় না। 'জ্ঞান' বলতে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানকেই বুঝতেন মনে হয়। ভক্তিবাদের একটি ভিত্তি বিশ্বাস। কিন্তু অহংকার সে-বিশ্বাসকে ঠেলে দেয়। ডাক্তারের প্রকৃত আধ্যাত্মিক সত্তাকে যেন অহংকার ঢেকে রেখেছে। তবে মাঝে মাঝে ভিতরের ভাব অহমিকার আবরণকে ঠেলে দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। যেমন, তর্কের মধ্যে হঠাৎ সকলের পায়ের ধূলি নিচ্ছেন (কথামৃত, ১।১৮।৬)। শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন: "তুমি কি বুঝছো না মনের ভাব?" (কথামৃত, ৩।২০।৪), নরেন্দ্রকে বলছেন, "যখন তুমি গাচ্ছিলে 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই জ্ঞান বিচারে', তখন আর থাকতে পারি নাই। দাঁড়াই আর কি। তারপর অনেক কষ্টে ভাব চাপলাম, ভাবলুম যে display করা হবে না।" (কথামৃত, ১।১৫।৫)। অর্থাৎ তিনি যেন একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতেন—ভিতরের ভক্তিবাদী মনের সঙ্গে অহমিকার দ্বন্দ্ব। তাঁর বিজ্ঞানসচেতনতা যে এই ব্যাপারে বড়রকম বাধাস্বরূপ হয়েছিল, তা মনে হয় না। কারণ, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধকার সরসীলাল সরকার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগে সত্য নির্বাচন করতে গিয়ে ডাক্তারের হৃদয় শুষ্ক না হয়ে বরং ভক্তিপ্রবণতা, সরলতা ও ঈশ্বরবিশ্বাস শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২ Understanding Human Nature by Alfred Adler, George Allen & Unwin Ltd., London. pp. 163, 191, 193, 195, 196

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ (১৩৬৮), ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৭২

৪ উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১১, পৃঃ ৫১৬

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, রামচন্দ্র দত্ত (১৩৫৭), পৃঃ ১৫৭-১৫৮

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার সরকার

কথামৃতে ডাক্তার সরকারকে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক হিসাবে। কিন্তু দুজনের সামান্য পরিচয় আগেই হয়েছিল, যখন ডাক্তার মথুরবাবুর পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য যেতেন।[৬] কিন্তু তখন ডাক্তার জানতেন যে, বড় লোকদের যেমন সখের বা খেয়ালের অনেক জিনিস থাকে, মথুরবাবুর 'পরমহংস' সেই ধরনের কিছু।[৭] কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণকে গোড়া হতেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায় (শ্যামপুকুরে প্রথম দিন এসেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন: "তুমি যে এখানে?") সেটা শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে তিনি বয়সে তিন বৎসরের বড় ছিলেন বলে নয়, সে ভাবটি মনে হয় তাঁর আগের 'মথুরবাবুর সখের জিনিস' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শ্যামপুকুরে এসে যখন শুনলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরা তাঁর বাড়িভাড়া ও চিকিৎসার খরচ চালাচ্ছেন তখন অবাক হয়ে বললেন: "ওঁর আবার ভক্ত কি?" তিনি তাঁর প্রাপ্য ষোল টাকা দর্শনী নেননি। (লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে, ডাক্তার প্রথমবার ফি নিয়েছিলেন, পরে নেননি)। ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নামী লোকদের দেখে ডাক্তারের শ্রীরামকৃষ্ণের উপর খানিকটা শ্রদ্ধা হয়েছিল। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ডাক্তারের আকর্ষণের প্রধান কারণ বোধ হয় ডাক্তারের ভাষায়: "কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে, তুমি যেটা সত্য বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে পার না; অন্যস্থানে দেখি তারা বলে এক, করে এক; ঐটে আমি আদৌ সহ্য করিতে পারি না।"[৮] ডাক্তার যে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসতেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আনন্দ পেতেন (তর্কে অনেক সময় পেরে না উঠলেও) তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কথামৃতে। ডাক্তারের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার নন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চোখে একজন অ-সাধারণ, জ্ঞানী, রসিক, আকর্ষণীয়, হৃদয়বান পুরুষ। তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন; তাঁর ক্ষণে ক্ষণে সমাধি হওয়া দেখে অর্থ খুঁজে পেতেন না, আবার ঢংও বলতে পারতেন না। শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে তাঁর অনেক সময় কাটানোর একটা কারণ মনে হয় এই, এখানে মনোমত কথাবার্তার (আড্ডা দেওয়ার?) জায়গা পাওয়া, (যা সকল মানুষেরই কাম্য), যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে আলোচনার মান বেশ উঁচু (যা সকল বুদ্ধিজীবীই পছন্দ করে), যেখানে নির্দোষ হাস্যরসের ছড়াছড়ি, এবং যেখানে তর্কাতর্কি হারজিতকে ঘিরে আছে ভালবাসা (যার প্রধান উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ)। তিনি যে অনেক সময় তর্কের খাতিরে তর্ক করতেন, তার অনেকটা বোধ হয় আসরকে জিইয়ে রাখার জন্য। ডাক্তারের চরিত্র পর্যালোচনা করলে সন্দেহ জাগে, তাঁর মনখোলা গল্পগুজবের আর কোন জায়গা ছিল কি না যেখানে কর্কশ কথার কর্কশ উত্তর আসে না, প্রত্যুত্তর সমুচিত হলেও তা ভালবাসা-মাখানো থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ডাক্তারের নিজের ভাষায়, "As man I have the greatest regard for him. (কথামৃত, ১।১৬।১), "এতদিন পরে আমি হৃদয়-গ্রাহী বন্ধু পেয়েছি।"[৯]

এবার শেষ প্রশ্নে আসা যাক। "ডাক্তার নরম হচ্ছেন" (কথামৃত, ২।১৫।২), "বঁড়শি বেঁধা আছে —মরে ভেসে উঠবে" (কথামৃত, ৪।২৯।১), "তুমি রসবে" (কথামৃত, ৪।৩০।২) প্রভৃতি ডাক্তার সরকার সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি কি সত্য হয়েছিল? শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে কত জ্ঞানী গুণী ও সাধারণ লোক ভক্ত হয়েছিলেন, কারও কারও জীবনের ধারার আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল; ডাক্তারের ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু হয়েছিল কি? যদিও মহেন্দ্র-লাল সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না, তবুও যা পাওয়া যায়, তা থেকে মোটামুটি বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্তন হয়নি। এমন কি ১৬ জানুয়ারি ১৮৮৬ কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়ে, তাঁর ওষুধে শ্রীরামকৃষ্ণের

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৫৭

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৬৬

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩১৯

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৬৯

শরীর গরম হয় শুনে (বোধ হয় বিরক্ত হয়ে) ডাক্তারের মন্তব্য ঃ "এঁর স্বভাবে অনেক বিকৃতি (perversity) লক্ষ্য করা যায়—আমি নৈতিক বিকৃতি বলছি না—যা এঁর মৃত্যুকে এগিয়ে আনছে ; যেমন আমার শ্বশুরমশাইও আমায় দেবতার মতো দেখত,—শুধু ডাক্তারিতে নয়—কিন্তু শেষে বললে জামাইয়ের ওষুধ খাব না। রমানাথ কবিরাজকে ডাকা হল। শেষাশেষি তিনিও যেতেন না। ফলে রোগীর ফিট হয়ে মৃত্যু হল।"[১০] ডাক্তারকে শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে শেষ দেখা যায় যখন ভক্তবৃন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি না মহাসমাধি নির্ণয় করতে পারছিলেন না, তখন মহেন্দ্রলাল সেখানে এসে অভিমত দিলেন যে, আধঘণ্টা আগে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে। ডাক্তার শ্রীরাম-কৃষ্ণের ফটো তুলবার প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন এবং তার জন্যে দশ টাকা দিয়েই (শ্মশানযাত্রী না হয়েই) চলে গেলেন।[১১] এরপরে ডাক্তারের আঠারো বৎসর জীবিতকালে স্বামী বিবেকানন্দ বা অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ডাক্তারের যোগাযোগ ছিল, বা মঠ স্থাপিত হলে সেখানে তাঁর যাওয়া আসা ছিল—এরূপ কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে অন্যদিক হতে, অর্থাৎ ঈশ্বরানুরাগের দিক হতে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল বলে ভাবা যেতে পারে। সরসীলাল সরকারের ভাষায়, "গত দুই বৎসর (অর্থাৎ ডাক্তারের মৃত্যুর আগের দুই বৎসর) বৈকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রায়শঃ তাঁকে গীতাপাঠে নিযুক্ত দেখিয়াছি।" তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে যখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে কষ্ট পেতেন তখন যে গানগুলি রচনা করেছিলেন, সেগুলিতে ভক্তি ও শরণাগতি ফুটে উঠেছে। সেরকম দুটি গান ঃ

॥ ১ ॥

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগন মণ্ডলে।
কি শোভা করেছে সেথা গ্রহতারা দলে॥
(যেন) প্রকৃতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতির্ময়
পুষ্পদলে।
দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণ-কমলে॥
দূরবীন সহায়ে বিজ্ঞানের বলে।
(দেখ) অদ্ভুত রূপ তাদের জ্ঞানচক্ষু মেলে।
দেখিলে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য
চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে॥
ছড়ায়ে ধূলি একমুষ্টি, তিনি করিয়াছেন সৃষ্টি
অগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ধূলো খেলার ছলে॥
শঙ্করও মহাপ্রলয় করিতে নিবারণ,
বন্ধন করেছে তাদের নিয়ম শৃংখলে,
নিয়ম পালনে তারা ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ,
অপার মহিমা তাঁর গাহিতেছে সবে মিলে॥[১২]

জীবন ফুরায়ে এল, তবু ভ্রম ঘুচিল না।
আলো থাকতে দেখতে পেলে না,
আঁধারে কি করবে বল না।
জ্ঞানচর্চা অনেক হলো
আসল জ্ঞান কি জন্মিল ;
পাপেতে নিবৃত্তি, ধর্মে প্রবৃত্তি (ঈশ্বরে ভক্তি)
ভুলেও হলো না ;
মানবজনম বৃথা গেল, একবার ভাবিলে না
এখন আর কি আছে উপায়,
সেই জগৎপিতার কৃপা বিনা।
তিনি যে কৃপাসিন্ধু, দয়াময়, দীনবন্ধু,
ডাক তাঁরে প্রাণভরে, হয়ে তন্মনা,
তরে যাবে অনায়াসে, মুক্তি পাবে অবশেষে
স্থির থাক সেই আশে,
করো না কোন ভাবনা।[১৩]

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যখন তাঁর কথা বলবার শক্তি বিলুপ্ত হয়েছিল তখন কিছু লিখতে ইচ্ছা করছেন, এইভাবে ইঙ্গিতে জানালে তাঁকে একখানি কাগজ ও একটি পেনসিল দেওয়া হয়। কয়েকটি কথা দ্রুত লিখতে লিখতেই তাঁর দেহাবসান হয়। তিনি যে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন, তা এই ঃ

"হে আমার মঙ্গলেচ্ছুগণ, বিদায়। সৃষ্টিকর্তাকে কোন দোষ দিও না। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন, ঠিক যথার্থ সেইরূপই ঘটিবে।"[১৪]

১০ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮০-৮১
১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃঃ ৬০১
১২ উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১১, পৃঃ ৫১৮
১৩ ঐ, ৭০তম বর্ষ, ১৩৭৮, পৃঃ ৫০১
১৪ ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩১১, পৃঃ ৫২৩

স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকার শিশুরা

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

"আমার কাছে বিবেকানন্দ হলেন এক অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি। কারণ, আমি এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দীপ্ত-চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম"—এক নার্সারি শিশুর পরিণত বয়সের জবানবন্দী।

সেদিন স্বামীজী গিয়েছিলেন আমেরিকার একটি সুবিখ্যাত শিশু বিদ্যালয় কাউণ্টি নর্ম্যাল স্কুল পরিদর্শনে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—অধ্যক্ষ ফ্রান্সিস ওয়েল্যাণ্ড পার্কার। জন ডিউই-র নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের আগেই তিনি স্কুলের পাঠ্যরীতিতে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন পদ্ধতি চালু করেন। শিশু হেনরিয়েটা হোমস্ আর্ল তখন সে স্কুলে পড়ে। তার সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা সে জানিয়েছে প্রাপ্ত বয়সে, 'প্রবুদ্ধভারতে, (সেপ্টেম্বর ১৯৬৬) একটি প্রবন্ধ মারফত। সে লিখেছে: "এটা (চোখের দিকে দৃষ্টিপাতের ঘটনা) যখন ঘটেছিল তখন আমি নিতান্ত শিশু—কর্নেল ফ্র্যান্সিস ডাবল্যু পার্কারের স্কুলে পড়ি। আমাদের অনেকগুলি স্কুল তাঁর নামাঙ্কিত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব এতখানি যে, তাঁকে শিক্ষাজগতের প্রফেট শ্রেণীতে স্থাপন করা চলে। বহু দূরদেশেও তাঁর কাজের বিষয় সুবিদিত ছিল এবং অনেক দূর দূর জায়গা থেকে বাচ্চারা তাদের বাবা মা-র সঙ্গে এখানে পড়তে আসত—আর এখানকার শিক্ষাপদ্ধতিতে অধিগত হয়ে ফিরে গিয়ে নিজেদের দেশে সে-রীতি প্রবর্তন করত। বিদেশীদের মধ্যে একটি হিন্দুপরিবারের ছেলেও আমাদের সঙ্গে পড়ত। প্রতিদিন সকালে আমরা প্রার্থনাকক্ষে উপস্থিত হতাম এবং সেখানে কখন কখন কোন বিশিষ্ট পরিদর্শক এসে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন। সেদিন আমাদের ঋজু-অবয়ব কর্নেল পার্মার আর একজন ঋজু মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁদের দেখে আমরা খুব খুশি। আমাদের প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর কর্নেল পার্কার একটি প্রার্থনা পাঠ করলেন। এরপর স্বামী (কর্নেলের বিশিষ্ট সঙ্গী) আমাদের উদ্দেশে কিছু বললেন। কি বললেন সেটা মনে থাকার কথা নয়—শুধু মনে আছে সমস্ত কক্ষের স্তব্ধতা এবং তাঁর সেই চোখের দীপ্তি ও শিহরণজাগানো কণ্ঠস্বর। বলা শেষ হলে তিনি এবং কর্নেল পার্কার মঞ্চ থেকে নেমে আমাদের মাঝখান দিয়ে এগোতে লাগলেন। হিন্দু ছেলেটি আমার পাশে লাইনের মুখে বসেছিল। স্বামী যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে নিচু হয়ে তাঁর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করল। এই ঘটনায় খুব আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'তুমি ও-রকম করলে কেন? উনি কে?' উত্তরে সে বলল: 'উনি স্বামী বিবেকানন্দ—এক মহান ভারতীয় ঋষি।' আমি বললাম: 'এখন আবার ঋষি আছে নাকি!' ছেলেটি বলল:

'তোমাদের দেশে নেই কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এখনও আছে।'

যে-মানুষের চোখে একবার চোখ পড়লে আজীবন সেই স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে তাঁর স্নেহস্পর্শে জীবনের ছন্দ পরিবর্তন ঘটবে এটা অবশ্যই স্বাভাবিক এবং সেই স্বাভাবিক ঘটনাই ঘটেছিল শিকাগোতে। সেসময় স্বামীজী থাকতেন ডিয়ারবোর্ন এভিনিউতে 'হেল' পরিবারের সঙ্গে। 'হেল'দের বাড়ির কয়েকখানা বাড়ি পরেই লিঙ্কন পার্ক। উন্মুক্ত রোদ ও পরিচ্ছন্ন বাতাসের জন্য স্বামীজী মাঝে মাঝে গিয়ে সেখানে বসতেন। পার্কে বসে থাকতে থাকতে প্রায়ই দেখতে পেতেন একটি তরুণী তার বছর ছয়েকের মেয়েকে নিয়ে বাজার করতে চলেছে। একদিন সেই তরুণী হিন্দু সন্ন্যাসীকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে যতক্ষণ না সে বাজার থেকে ফিরছে ততক্ষণের জন্য নিজের মেয়েটিকে তাঁর কাছে রাখার জন্য অনুরোধ জানাল। স্বামীজী সম্মতি দিলেন। সে বাচ্চাটিকে তাঁর কাছে রেখে বাজার করে এসে ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। পরপর কয়েক দিনই এরকম করল। তারপর স্বামীজী একদিন শিকাগো পরিত্যাগ করে চলে

—গেছেন সারা আমেরিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন বক্তৃতা সফরে।

এরপর দশ বছর কেটে গেছে—মেয়েটির বয়স তখন পনের-ষোল। ইতিমধ্যে স্বামীজীর খ্যাতি বিপুলভাবে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন স্বামীজীর একটি ফটো দেখিয়ে সেই মেয়েটিকে তার মা জিজ্ঞাসা করল: "তোমার এই বন্ধুটিকে মনে পড়ে?" মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একবার যে তাঁর স্নেহসান্নিধ্য লাভ করেছে সে কি তাঁকে ভুলতে পারে?

কিন্তু কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। এর অনেক পরবর্তী দৃশ্যে দেখতে পাই, মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে—স্বামীর সঙ্গে সে থাকে ফিলাডেলফিয়ায়। স্বামী অখিলানন্দ তখন আমেরিকার একটি বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। তিনি মাঝে মাঝে ফিলাডেলফিয়া যেতেন ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে—সেখানে বেদান্তের ক্লাস নিতে। সেখানে স্বামী অখিলানন্দের ক্লাসে সেই মেয়েটি এসে ভর্তি হল। আধ্যাত্মিকতার যে শান্ত প্রদীপটি লিঙ্কন পার্কের একটি প্রান্তে তার অন্তরে সকলের অগোচরে স্বামীজী জ্বেলে দিয়েছিলেন দীর্ঘকাল পরেও তা ছিল অনির্বাপিত।

দু-একজনের কথাই মাত্র আমরা জেনেছি কিন্তু এরকম দৃষ্টি বা স্নেহস্পর্শে কত শিশুর জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে তার হিসাব আজ দাখিল করা শক্ত। অথচ কোন্ পরিবেশের মধ্যে, কোন্ শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়ায় তারা বেড়ে উঠেছিল? কি ছিল ভারত সম্পর্কে তাদের বদ্ধমূল ধারণা?

॥ ২ ॥

"নিবিড় জঙ্গল, হিংস্র প্রাণী, বিষাক্ত সরীসৃপ, অর্ধসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসী—এই নিয়ে ভারতবর্ষ। তোমাদের মতো তাদের স্নেহময়ী মিষ্টি মা নেই—তাদের মা পিশাচিনী, নিজের হাতে সন্তানদের কুমীরের মুখে ফেলে দেয়—শিশুদের করুণ চিৎকারে তাদের চোখে এক ফোঁটা জল পড়ে না। সেখানকার বুড়োবুড়িদের কেউ সেবা যত্ন করে না, রোগে অবহেলায় তারা অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। সেখানে মানুষ কুৎসিতদর্শন পুতুল পুজো করে—তাদের নীতিবোধের কোন বালাই নেই। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষদের জন্য একটু দুঃখবোধ কর—করুণার্দ্র হও। তোমাদের জলখাবারের পয়সা থেকে কিছু খয়রাত কর যাতে মিশনারিরা সেখানে গিয়ে খ্রীষ্টের করুণাধারার সামান্য অংশও তাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে।"

বোধোদয়ের পর থেকে আমেরিকান শিশুরা এই কথাই শুনে আসছে। বাল্যাবস্থায় যে নার্সারি-ছড়া শেখানো হয় সেটা তারা মুখস্থ করে—গুরুজনদের সামনে দুলে দুলে আবৃত্তি করে বাহবা পায়। সেই বাল্যাবস্থা থেকেই তারা জেনে যায়—ভারত একটা তিমিরাচ্ছন্ন দেশ।

সেই ছড়ার একটি নমুনা:

পুতুল-পূজিকা মাতা দাঁড়ায়ে হোথায়,
ওদের পবিত্র নদী ওই বয়ে যায়।
মাতৃহস্ত এইবার দূরে ছুঁড়ে দিল
নদী মধ্যে, নিজবক্ষ হতে সন্তানেরে।…

সেইসব ঢালাই-মগজ শিশুদের সামনে যখন রহস্যময় দেশ থেকে বিবেকানন্দ গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন বড়দের মতো তাদের মনেও সংশয়ের দোলা। তারা তাঁর মধ্যে দেখেছে এক পরিপূর্ণ মানুষের ছবি—যে-মানুষ সহৃদয়তার দ্বারা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন—তাদের এতদিনের পাথুরে ধারণায় ফাটল ধরিয়েছেন।

পার্লামেন্ট চলাকালে স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল মিঃ ও মিসেস লাইঅনের বাড়িতে। তাঁদের একটি ছ-বছরের নাতনি ছিল, নাম কর্নেলিয়াস। সেই ছ'বছরের মেয়ের বয়স যখন চুরাশি তখন স্মৃতি রোমন্থন করে কর্নেলিয়াস কংগার বলেছেন: "এ এক স্মৃতি যা আমি কোনদিন ভুলিনি। তাঁর ছিল অসাধারণ চৌম্বক ব্যক্তিত্ব—সে চিত্র আমার মনে এখনও স্পষ্ট (যেন গতকালের ঘটনা)। আমি তাঁর মতো আর দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি।"

সন্দেহ নেই স্বামীজীর 'অসাধারণ চৌম্বক ব্যক্তিত্ব' সকলের কাছেই বড় আকর্ষণ ছিল—পার্লামেন্ট বা তার পরবর্তী কালে তার সাফল্যের অন্যতম কারণ এটা, সকলেই তা স্বীকার করেছেন কিন্তু শিশুদের কাছে তাঁর সমাদরের বড় কারণ অবশ্যই এ হতে পারে না। যে-ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, সনিষ্ঠ উপস্থাপনা কর্মজগতে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিল তা শিশুদের সম্ভ্রম আদায় করতে পারে, কিন্তু তাদের পাওনার সবটুকু

এথেকে মেটে না। যে আন্তরিকতার স্পর্শে তিনি শিশুমন জয় করেছিলেন মিসেস কংগারের স্মৃতি-কথায় তার পরিচয় মেলে : "তিনি আমাকে ভারতের গল্প শোনাতেন, বাঁদর, ময়ূর, টিয়াপাখির ঝাঁক, পুষ্পগুচ্ছ—আর সেই নানারকম ফলে ফুলে ভরা বাজার। আমার মনে হতো আমি যেন পরীর দেশের গল্প শুনছি।··· তিনি যখন আমাদের বাড়ি আসতেন, আমি ছুটে গিয়ে তাঁর কোলে চড়ে বলতাম, 'স্বামী, অন্য একটা গল্প বলুন'।··· ম্যাপে তিনি আমাকে ভারতের অবস্থান দেখিয়ে-ছিলেন। লালরঙা তার পাগড়ি সম্পর্কে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল। আমার কাছে সেটা ছিল একটা মজার টুপি। আমি তাঁকে মাথা ঘিরে সেটি বাঁধবার কৌশল দেখাবার কথা বলতাম বার বার।"

লাইঅনের বাড়ি তিনি ফিরতেন পার্লামেণ্টে সারাদিনের ক্লান্তির পর। সেই ক্লান্তিটুকু যেমন শিশুসান্নিধ্যে মুছে যেত তেমনি নিজের ক্লেশ বিস্মৃত হয়ে শিশুটিকে বাৎসল্য ধারায় অভিষিক্ত করতে পারতেন, তাদের কাছে 'বীভৎস দেশ'কে 'পরীর দেশে' রূপান্তরিত করতে পারতেন বলেই তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন তিনি।

কিন্তু বিবেকানন্দ শিশু সঙ্গেও বিবেকানন্দ—তাঁর অন্তরস্থিত দেশপ্রেম শিশুর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। কংগার বলেছেন : "তিনি আমাকে স্কুলের পাঠ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করতেন, আমার খাতাও তাঁকে দেখাতে হতো।··· আমেরিকার ছেলেমেয়েরা যে-রকম শিক্ষা পায় তাঁর দেশের সাধারণ শিশুরা সে-রকম পায় না বলে তাঁর মনে দুঃখ ছিল বলে মনে হতো।"

কর্নেলিয়াস কিভাবে শিশুর অনুভূতি দিয়ে স্বামীজীর মনটিকে বুঝে নিত তারই একটি চমৎকার উদাহরণ : "বোধহয় বহুদূর প্রবাসে এক অচেনা দেশে শিশুর ভালবাসা ও উৎসাহে তিনি তৃপ্তিলাভ করতেন। সব সময়ে তিনি ছিলেন 'এক আশ্চর্য মানুষ, কিন্তু শিশুদের মন তো অনুভূতিপ্রবণ—(কোন কোন সময়ে) তাঁর ঘরে ছুটে গিয়ে দেখতে পেতাম তিনি ধ্যানমগ্ন। বুঝতাম, তিনি চান না, এসময় তাঁকে কেউ বিরক্ত করুক।" সুতরাং তখন কর্নেলিয়াস তাঁকে বিরক্ত না করেই ফিরে যেত।

॥ ৩ ॥

আমেরিকার শিশুদের উপর "সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী"র প্রভাবের চূড়ান্ত চেহারা প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক রাইটের পরিবারে। রাইট এবং হেল—এই দুটি পরিবারে স্বামীজী তাদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য লাইঅন, ব্যাগলি পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কিছু কম ছিল বলে মনে হয় না; কিন্তু স্বামীজীর নিজের কথা থেকেই জানা যায় হেল-পরিবার তাঁর আত্মীয় গোষ্ঠীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেলদের দুই বোন এবং তাদের মাসতুতো বোন দুই ম্যাক্‌কিণ্ডলি তাঁর সবচেয়ে গভীর স্নেহ লাভ করেছিল। ম্যাক্‌কিণ্ডলিদের আর একটি বিবাহিত বোন মেরীর সাত বছরের একটি মেয়ে ছিল। সে মাঝে মাঝে দিদিমার (মিসেস হেল) কাছে এসে থাকত। সেই সাত বছরের স্মৃতি বৃদ্ধ বয়সেও তার উজ্জ্বল। সে (তখন মিসেস হাবার্ট ই. হাইড) মারি লুইস বার্কের কাছে জানিয়েছে : "স্বামীজীকে আমার খুব মনে আছে। মনে আছে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি, অপূর্ব কণ্ঠস্বর। আঃ কি জমকাল, সুদর্শন চেহারা। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন, 'ওই বাচ্চাটা অগ্নি উপাসক।' সত্যি দেখ, আমি সবসময় আগুন ভালবাসি, উনুনের ধারে বসতে ভালবাসি, আর সূর্যকেও ভালবাসি।"

হেল পরিবারের তরুণী কন্যা মেরী স্বামীজীর ছেলেমানুষির একটি সুন্দর গল্প স্বামী অভেদানন্দের কাছে লিখে পাঠিয়েছিল। একবার হঠাৎ স্বামীজীর খেয়াল হল স্কেটিং শিখবেন—শেখার জন্য জায়গা বেছে নিলেন হেলদের বাড়ির বৈঠকখানা আর তার সংলগ্ন ঘরগুলোকে। দামী কার্পেটে মোড়া বৈঠক-খানা ঘরে পায়ের তলায় চাকা লাগিয়ে পিছলে বেড়াতে লাগলেন। কার্পেটগুলোর দুর্গতি সত্ত্বেও তাঁকে সেখানে নিষেধ করার কেউ নেই—বরং মেয়েরা সকৌতুকে তার ছেলেমানুষি দেখে আনন্দিতই হয়েছিল। ভাগ্য ভাল, ২/৩ দিনের মধ্যেই তাঁর শেখার ইচ্ছায় ভাঁটা পড়ল—কার্পেটগুলোও শোচনীয় দুর্দশা থেকে বেঁচে গেল।

ভারতের সঙ্গে অলৌকিক রহস্যময় ঘটনাবলীর সংযোগ সকল আমেরিকানের কাছেই সত্য বলে

বিবেচিত হতো। স্বামীজীর মতো অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছে সকলেই এরকম রহস্যজনক কার্যাবলী দেখতে চাইতেন। স্বামীজীর এ সম্পর্কে তীব্র অনীহা ছিল—তিনি একাধিকবার বলেছেন ঃ "অলৌকিকতার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই; কিন্তু তাঁকে নিয়ে কিছু কিছু গুজবও রটেছিল। সম্ভবতঃ এই রকম একটি গুজবকে কেন্দ্র করে ব্যাগলির নাতনি (যিনি পরে কমসেস ফ্রান্সিস ব্যাগলি ওয়ালেনা হয়েছিলেন) একটি কাহিনী পরিবেশন করেছিলেন। তার প্রত্যক্ষদর্শী বলে তিনি দাবি করেছেন। তাঁর বয়স তখন ছ'বছর। ঘটনাটা ঘটেছিল তাঁদের বাড়িতে স্বামীজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সূত্রে। তাঁর কথায় ঃ "আমার মনে আছে তাঁকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল বাড়ির একপ্রান্তে ঠাকুরদার পড়ার ঘরে। কিন্তু বাড়ির অন্যপ্রান্তে বৈঠকখানা ঘরে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন অতিথিদের সামনে। তখন যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে পড়ার ঘরে আবদ্ধ করে চাবি পকেটে রেখেছিলেন তাঁরা সেখানে গিয়ে চাবি খুলে দেখেন স্বামী একই স্থানে একই রকম অবস্থায় বসে আছেন।" স্বামীজীর পক্ষে এধরনের ঘটনা অসম্ভব না হলেও তিনি বন্ধুদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য শক্তির পরীক্ষা দেবেন এটা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়, তবে মিসেস ওয়ালেশ এ ঘটনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত। মনে হয় কোন গুজব শিশুমনের কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে কাহিনী আকার ধারণ করেছিল, কারণ বড়দের মধ্যেও তখন এধরনের কিছু কাহিনী প্রচলিত ছিল।

শিশুর ধ্যানধারণা, তার রোমান্টিক জগতকে কিভাবে স্বামীজী প্রভাবিত করেছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে অস্টিন রাইটের উদাহরণ থেকে।

ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠানের আগে যখন স্বামীজী সেই সভায় যোগদানের ব্যাপারে রীতিমত হতাশ হয়ে বোস্টনের পথে যাচ্ছিলেন তখন ট্রেনে 'ব্রিজি মেডোস'-এর স্বত্বাধিকারিণী মিস কেটি স্যানবোর্নের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই পরিচয়ের ফলে মহাসম্মেলনে যোগদানের অন্তরায়গুলি দূর হয়। এই স্যানবোর্নই তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক রাইটের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। অধ্যাপক রাইট তখন ম্যাসাচুসেটস-এর অ্যানিস্কোয়ামে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। অধ্যাপক রাইটের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে স্বামীজী তাঁর গৃহে কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য গহণ করেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। তার ফলে স্বামীজীর ধর্মসম্মেলনে যোগদান সম্ভব হয়।

অধ্যাপক রাইটের তিনটি ছেলেমেয়ে। বড়টি মেয়ে, নাম এলিজাবেথ, বয়স ১৩। তার ভাই অস্টিনের বয়স তখন ১০ বছর এবং সবচেয়ে ছোটটির মাত্র দু'বছর। এই তিনটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাঁর যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার কিছু পরিচয় আছে চিঠিপত্রে। এদের কাছে তিনি ছিলেন খেলার সাথী। মিসেস রাইট তাঁর মায়ের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "আশ্চর্যজনক সরল ও নিষ্কলঙ্ক মানুষ ইনি [স্বামীজী]। নিজের জন্য কোন দাবি নেই—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে খেলা করছেন—একটা লাঠি আঙুলের ফাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মজার খেলা দেখাচ্ছেন, আর বাচ্চারা তাঁর মতো করতে পারছে না বলে খুশিতে ফেটে পড়ছেন।"

রাইটের তিনটি সন্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলেও অস্টিনই ছিল স্বামীজীর সব থেকে প্রিয়। পরে তাকে এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' উপহার দিয়ে তার উপর লিখেছিলেন, "অস্টিন রাইটকে—বিবেকানন্দের ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ।"

১৮৯৪-এ স্বামীজী যখন কেমব্রিজে রাইট পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন অস্টিনের একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা ঘটে। আগের দিন স্বামীজী সেখানে অনেক রাত্রে পৌঁছান এবং নিজেই নিজের শোবার ব্যবস্থা করে নেন বৈঠকখানা ঘরে, আব্রু রক্ষার জন্য তার নিজের পাগড়ির কাপড়গুলোকে পর্দার মতো টাঙিয়ে দিয়ে। পরদিন সকালে অস্টিন দেখল তাদের বৈঠকখানা ঘরখানি নানারঙে রঞ্জিত একটি রহস্যময় দেশের চেহারা নিয়েছে। একটি বালকের কাছে এই দৃশ্য যেন রোমান্টিক জগতের স্বাদ বয়ে এনেছিল। সে-দৃশ্য তার মনে এমনভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে পরিণত বয়সে তার মেয়ের কাছে এই গল্প শুনিয়েছিল।

ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্যে খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের গল্প বলাও ছিল শিশুমনের উপর স্বামীজীর আধিপত্যের কারণ। সেসব গল্পে থাকত ভারতের

ঐতিহ্যময় ইতিহাস—উপনিষদ্ ও পুরাণ থেকে শুরু করে ঝাঁসীর রানীর কাহিনী পর্যন্ত। আর তা থেকেই অস্টিনের মনে গড়েছিল এক রোমান্টিক কল্পজগৎ। রাইট পরিবারে কল্পজগৎ রচনার একটা ধারাবাহিক প্রবণতা ছিল। অধ্যাপক রাইট তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য ও কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এইরকম একটি কাল্পনিক দেশের অধিবাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে সেই দেশের ম্যাপ, চার্ট ও অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর দুই ছেলেই পিতার এই প্রবণতার উত্তরাধিকার পেয়েছিল। ছোট ছেলের কল্পদেশের নাম 'ক্র্যাভে।' অস্টিনের দেশের নাম 'আইল্যাণ্ডিয়া'। সেই দেশ অবলম্বন করে অস্টিন এক সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করেন—'আইল্যাণ্ডিয়া'। তাঁর মৃত্যুর পর তা থেকে কাটছাঁট করে তেইশ-শো পাতার উপন্যাস মুদ্রিত হয়।

কিন্তু অস্টিনের আইল্যাণ্ডিয়াকে পুরোপুরি কাল্পনিক বলা যায় না,কারণ তার কেন্দ্রে ছিল বাল্যে দেখা হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রভাব। সেই প্রভাব কি আকারের তা আমরা নিচের বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারব ঃ

অস্টিনের আইল্যাণ্ডিয়া এক সুপ্রাচীন কৃষি-নির্ভর দেশ। সেখানকার অধিবাসীদের জীবন-প্রণালীর একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে। তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আছে যাদের মস্তক বৃহৎ, কৃষ্ণকেশ, আয়ত চক্ষু ও রুক্ষ চর্ম। আইল্যাণ্ডিয়ার নায়ক এই সম্প্রদায়ভুক্ত। সে মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটে, তার চমৎকার ধনুকের মতো বাঁকানো ভ্রুযুগল, সহাস্য ঈষদুন্মুক্ত অধরোষ্ঠ, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তি এবং স্পষ্ট গভীর কণ্ঠস্বর, যা নিম্নগ্রামেও সমস্ত ঘরে শোনা যায়। সে মাঝে মাঝে বিচিত্র সুরে গান গায়—কখন নিম্নস্বরে কখন সমুদ্রগর্জনের মতো। তাদের প্রাচীন ইতিহাসে এক রানী ছিল যিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে শত্রুর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

আইল্যাণ্ডিয়া উপন্যাসের মুদ্রিত সংস্করণ থেকে সেদেশের ধর্মপ্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয়েছে। অস্টিন রাইটের মেয়ে সিলভিয়া (মিসেস পল জে. মিতার্টি) জানিয়েছেন, পাণ্ডুলিপিতে আছে, সে-দেশের ধর্ম "সম্পূর্ণ গোঁড়ামিহীন। সেখানকার চার্চকে বলা হয় শান্তিনীড়—মানুষ সেখানে বসে নীরবে ধ্যান করে, কখন কখন নিজেদের মধ্যে আলাপ করে অথবা অন্যের কথা শোনে। আইল্যাণ্ডিয়ার ঈশ্বরকে বলা হয় 'ওঁ'—অবশ্য খ্রীষ্টিয় ধারণা অনুযায়ী সে-ঈশ্বর পূজিত হন না।" উপন্যাসে আইল্যাণ্ডিয়া-সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন পাওয়া যাবে সেখানকার প্রার্থনা মন্ত্রে ঃ

ওঁ
দর্শনের অতীত
শ্রবণের অতীত
স্পর্শের অতীত
সকল ইন্দ্রিয়গ্রামের অতীত
মহান ওঁ।
মানুষের ভালমন্দ
মানুষেরই রচনা
মানুষই ন্যায়-অন্যায় রাজ্যের অধিপতি।
সে রাজ্য 'ওঁ'-এর শাসনাধিকার নয়।
ওঁ কখন আদেশ করেন অন্যায়
অথবা কোন সৎকর্মের ?
না। ভালমন্দ সবই সমান ওঁ-এর কাছে।
ক্ষুদ্রস্বার্থে নিও না শরণ তাঁর,
ছায়াচ্ছন্ন ওঁ-মন্দিরে নীরব প্রশান্তিতে
অহং-কে লুপ্ত কর।
অথবা তাঁরই আলোকে
জেনে নাও ওঁ-এর মহান সত্তাকে।

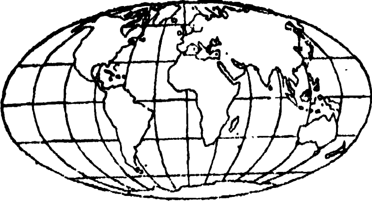
শিশু অস্টিনের কাছে বিবেকানন্দ কোন বিশ্ব-আচার্য নন—তার বন্ধু, সহকর্মী, খেলার সাথী। সেই খেলা এবং গল্পের মধ্য দিয়েই তিনি তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন ভারতের মর্মমূলে।

॥ ৪ ॥

ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৮৯৪। স্ট্যাসবুর্গ হল-এ আমেরিকার শিশুদের মেলা—'বহুরূপী' প্রদর্শনী।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-পুরাণ অবলম্বন করে দু'শটি শিশু বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে সে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। একদিকে একটি শিশু দাঁড়িয়ে—গৈরিক আলখাল্লা, মাথায় কমলারঙের পাগড়ি, হাত দুটি বক্ষে নিবদ্ধ। ভারতের রূপকল্প। আমেরিকার শিশুর চোখে তখন বিবেকানন্দই ভারতবর্ষ।*

* তথ্য উৎস ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ইন দি ওয়েস্ট—নিউ ডিসকভারিজ (হিজ প্রফেটিক মিশন)—১ম খণ্ড, মারি লুইস বার্ক। নার্সারি ছড়াটি শঙ্করীপ্রসাদ বসুকৃত অনুবাদ।



বাতায়ন

শুভ বিবাহ

লিদিয়া লিবেদিনস্কায়া

জাতি ধর্ম বর্ণ দেশ কাল নির্বিশেষে বিবাহ ব্যাপারটি একটি পরম আনন্দের ব্যাপার। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে সকল জাতির মধ্যে, সকল ধর্মের মধ্যে, সকল দেশেই নানা আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। 'লৌহ-যবনিকা'র অপর পারে সোভিয়েত রাশিয়া নামক দেশটিতে এই শুভ আনন্দ-উৎসবটি কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় তা জানার আগ্রহ আমাদের দেশের মানুষের স্বাভাবিক। লিদিয়া লিবেদিনস্কায়ার এই লেখাটি আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবাহ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবে।—সংযুক্ত সম্পাদক

বিবাহ। শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই মনে একই সঙ্গে আলো-ছায়ার মতো খেলে যায় হর্ষ ও শঙ্কা। বিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আনন্দময়, কেননা পরিণয় প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসার বিজয়মুকুট।

বিবাহ শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই মনে একই সঙ্গে আলো-ছায়ার মতো খেলে যায় হর্ষ ও শংকা। বিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আনন্দময়, কেননা পরিণয় প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসার বিজয়মুকুট। কিন্তু 'প্রেমের পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়', এই পুরনো প্রবচনের কথাও তো আমরা জানি। কাজেই এ-প্রশ্ন উঠতেই পারে, আজকের নব-বিবাহিতরা দৈনন্দিন জীবনের বন্ধুর পথ অতিবাহনের সময়েও কি তাদের প্রেম অটুট রাখতে পারবে?

স্মরণাতীত কাল থেকেই সব দেশে বিবাহ এক আনন্দঘন শুভ উৎসব হিসেবে গণ্য। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর বিবাহের নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। কেউ কেউ তা আজও বজায় রেখেছে। কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান কালস্রোতে বিলীন হয়ে গেছে, কিছু এমনভাবে বদলে গেছে যে তাদের আর চেনাই যায় না।

তবে যেগুলো সবচেয়ে-প্রাণবন্ত, মনকে টানে বেশি, সেই অনুষ্ঠানগুলো টিকে আছে এখনও। আমরা, রাশিয়ানরা, সেই পুরনো দিনের মতোই নতুন বর-বধূকে দেখতে যাই রুটি আর নুন উপহার নিয়ে, তাদের পদতলে রাখি রৌপ্য মুদ্রা, ধান ছড়িয়ে দেই তাদের গায়ে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে।

স্মরণাতীত কাল থেকেই সব দেশে বিবাহ এক আনন্দঘন শুভ উৎসব হিসেবে গণ্য। প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর বিবাহের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। কেউ কেউ তা আজও বজায় রেখেছে। কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান কালস্রোতে বিলীন হয়ে গেছে, কিছু এমন-ভাবে বদলে গেছে যে, তাদের আর চেনাই যায় না।

তবে যেগুলো সবচেয়ে প্রাণবন্ত, মনকে টানে বেশি, সেই অনুষ্ঠানগুলো টিকে আছে এখনও। আমরা, রাশিয়ানরা, সেই পুরনো দিনের মতোই নতুন বর-বধূকে দেখতে যাই রুটি আর নুন উপহার নিয়ে, তাদের পদতলে রাখি রৌপ্য মুদ্রা, ধান ছড়িয়ে দেই তাদের গায়ে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে।

পুরনো আমলের মতো আজও রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বিয়ের মিছিল বেরোয় 'ত্রোইকা' করে। প্রতিটি সুসজ্জিত ত্রোইকা টেনে নিয়ে যায় তিনটি ঘোড়া, ঘোড়াগুলোর লাগামেও কারুকার্য করা থাকে।

লিথুয়ানিয়ার বিয়ের এক আবশ্যিক অঙ্গ: 'হাতে হাত ধরি ধরি, নাচ সবে ঘিরি ঘিরি।' শক্ত করে ধরে থাকা হাতের ঘেরাটোপ ভেদ করে নতুন বর-বৌকে ভেতরে ঢুকতে হয়।

জর্জিয়ার 'রাক্ষস' বিবাহ প্রথা (কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা) এখনও টিকে আছে। প্রকাশ্য দিবালোকে বেপরোয়া যুবকরা জনতার মধ্য থেকে নিজের নিজের পছন্দ মতো পাত্রীকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে উধাও হয়ে যেত। এরপর সেই বীরপুঙ্গবটিকে বিয়ে করা ছাড়া মেয়েটির আর কোন উপায় থাকত না।

এখন অপহরণের বদলে, 'ইলোপ' এবং অশ্বের পরিবর্তে অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মোটরগাড়িতে বর-বধূর প্রস্থান।

জুরনা ফুরে তালে তালে নাচ বাদ দিয়ে উজবেক বিয়ের কথা তো ভাবাই যায় না।

জর্জিয়ায় 'রাক্ষস' বিবাহ প্রথা (কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা) এখনও টিকে আছে। প্রকাশ্য দিবালোকে বেপরোয়া যুবকরা জনতার মধ্য থেকে নিজের নিজের পছন্দ মতো পাত্রীকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে উধাও হয়ে যেত। এরপর সেই বীরপুঙ্গবটিকে বিয়ে করা ছাড়া মেয়েটির আর কোন উপায় থাকত না।

এখন অপহরণের বদলে, 'ইলোপ' এবং অশ্বের পরিবর্তে অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মোটরগাড়িতে বর-বধূর প্রস্থান।

অবশ্য এর চেয়ে মোলায়েম একটি প্রথা জর্জিয়ার বিয়েতে এখনও অনুসরণ করা হয়। এই প্রথাটি শতাব্দী-প্রাচীন মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি শোতা রুস্তাভেলি রচিত 'ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত নাইট' মহাকাব্যের একটি কপি বর-বধূকে উপহার দেওয়া হয় যাতে বীরত্বব্যঞ্জক প্রেম ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের আদর্শ তাদের মনে সদা জাগরূক থাকে।

প্রেমিক প্রেমিকা চায়, পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার শুভ দিনটির স্মৃতি যেন চিরজীবন অম্লান থাকে। সেই সুখস্মৃতির অমৃতময় স্পর্শে যেন লাঘব হয় দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় দুঃখকষ্ট। প্রাচীনকালে রাশিয়ায় প্রসূতি মায়ের শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা হতো যাতে বিয়ের প্রথম দিনটির সুখস্মৃতি তার মনে পড়ে, যাতে নির্বিঘ্নে প্রসব হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লবের পরে আমাদের দেশে সিভিল ম্যারেজ চালু হয়। সোভিয়েত আমলের প্রথম দিকে বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল অনাড়ম্বর। আমার নিজের বিয়ের কথা মনে আছে, ছোট জেলার রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। অফিসের মেয়ে করণিক জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নথিভুক্ত করছে। উৎসবের আমেজ নেই কোনো, নেই পবিত্র পরিবেশ। বাড়িতে ছিমছাম টেবিল ঘিরে অবশ্য আমাদের আত্মীয় পরিজনরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে ছিলেন। এইটুকু বাদ দিলে আমাদের বিয়েটা প্রতিদিনকার বৈচিত্র্যহীন কাজের থেকে আলাদা কিছু মনে করা মুশকিল।

আমি যখন তরুণী, কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী হওয়া যেত। আগে থেকে দরখাস্ত না করে যে-কোন দিন রেজিস্ট্রি অফিসে আসা যেত। বিবাহবিচ্ছেদের মতোই অতি সরল ছিল বিবাহ করাটা।

এখন এসব কিছুই একেবারে বদলে গেছে।

বিবাহেচ্ছুদের দু-তিন মাস আগে থাকতে স্থানীয় রেজিস্ট্রি অফিসে দরখাস্ত করতে হয় এখন। এই সময়টাতে পরস্পরকে ভালভাবে জানা-চেনা যায়। বিয়ের দিনক্ষণ আগে থাকতে ঠিক করতে হয়, বাছাই করতে হয় বরের প্রিয়সহচর ও কনের প্রিয়সহচরী।

রেজিস্ট্রি অফিসগুলো আলোয় ঝলমল করে, ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। ফটোগ্রাফারের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ-বাল্‌ব ঝলকে ওঠে ঘন ঘন। স্থানীয় সোভিয়েতের গণপ্রতিনিধিরা এসে নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যান। বিস্মৃতির অতল থেকে আবার ফিরে এসেছে 'বিয়ের আংটি'। আমাদের যৌবনকালে সেকেলে বলে নিন্দিত ঐ আংটি পরলে খুব বকুনি শুনতে হতো।

রেজিস্ট্রি হয়ে যাবার পর আমরা, বর কনে দুজনেই যে যার ওভারকোট গায়ে দিয়েছিলাম। এখনকার নবপরিণীতরা সুন্দর করে সাজে। বর পরে গাঢ় রঙের স্যুট, কনে সাদা পোশাক। কনেদের অনেকে স্বচ্ছ ওড়নায় মুখ ঢেকে আসে। আমার যৌবনকালে এই ওড়নাও সেকেলে বলে নিন্দিত ছিল। এখন ঠাকুরমার ঝুলি খুললে সযত্নে রক্ষিত অন্যান্য স্মারক বস্তুর সঙ্গে এক-আধটা ওড়নার দেখা পাওয়া যেতে পারে।

নতুনত্ব আজকাল অনেক কিছুতেই চোখে পড়ে। বিয়ের পর বর-বৌ গাড়িতে চেপে দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখে। মস্কোতে এইরকম দর্শনীয় স্থান হল রেড স্কোয়ার ও অজ্ঞাত সৈনিকদের স্মৃতিসৌধ। এমন কোন সোভিয়েত পরিবার নেই বললেই চলে যে, পরিবারের একজনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেননি। বংশ পরম্পরায় আমরা সেই বেদনাময় স্মৃতি বহন করে চলেছি। নববিবাহিতরা জোড় বেঁধে আসে। স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেইসব বীর দেশপ্রেমিকদের স্মৃতির উদ্দেশে, যাঁদের উৎসর্গিত প্রাণের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে তাদের আজকের সুখ শান্তিময় জীবনের দীপশিখা। কেউ কেউ যায় পুশকিন স্মৃতিসৌধে। মূর্তির পাদমূলে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাবার সময় তাদের মনে হয়, প্রেম ও মুক্তির চারণকবির আশিস ঝরে পড়ছে তাদের ওপর।

অবশেষে, যাকে বলে বিয়ের ভোজ। এইখানটাতে এসে একটু গন্ডগোলের মধ্যে পড়তে হয়।

কেবল মস্কোয় নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক বিয়ে বাড়িতে আমি গেছি, কখনও নিমন্ত্রিত হয়ে, কখনও কনের প্রিয়সহচরী হয়ে। আমার চার মেয়ে আর এক ছেলের বিয়ের কথা না হয় না-ই তুললাম। এখন আমার নাতি নাতনীদের বিয়ের বয়স হয়ে এল। অতএব আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিটি খুব হাল্কা বলা যাবে না।

যুদ্ধের সময়কার হতদারিদ্র বিয়ের কথা আমি ভুলিনি। কনে পরেছে বিবর্ণ পোশাক, বরের গায়ে সৈনিকের রং-চটা জামা। এই ছিল বিয়ের সাজ। খানাপিনা বলতে, চিনি-গোলা চা আর খয়েরি টোস্ট। বিয়ের পরেই অনেক বর-কে চলে যেতে হতো রণাঙ্গণে, ঘরে অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাত বধূ। এমন ভাগ্যবতীর সংখ্যা খুবই কম ছিল যারা যুদ্ধের পরে আবার ফিরে পেয়েছিল স্বামীকে।

যুদ্ধের সময়কার হতদরিদ্র বিয়ের কথা আমি ভুলিনি। কনে পরেছে বিবর্ণ পোশাক, বরের গায়ে সৈনিকের রং-চটা জামা। এই ছিল বিয়ের সাজ। খানাপিনা বলতে, চিনি-গোলা চা আর খয়েরি টোস্ট। বিয়ের পরেই অনেক বর-কে চলে যেতে হতো রণাঙ্গণে, ঘরে অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাত বধূ। এমন ভাগ্যবতীর সংখ্যা খুবই কম ছিল যারা যুদ্ধের পরে আবার ফিরে পেয়েছিল স্বামীকে।

তারপর যত দিন গেছে, বিবাহ অনুষ্ঠানের আড়ম্বর তত বেড়েছে। খুব ধুমধাম করে যে বিয়ে হয় তাতে ভুরিভোজে আপ্যায়িত হন কয়েক শ অতিথি। উদাহরণ হিসেবে উজবেকিস্তানের গ্রামের বিয়ের আড়ম্বরের কথা বলা যেতে পারে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা এত বেশি হয় যে উঠোনে সকলের বসবার জায়গা হয় না—রাস্তাতেও টেবিল চেয়ার বিছোতে হয়। গ্রামের মহিলারা দল বেঁধে আসেন রান্না করতে। রান্না একদিনে শেষ হয় না। খানাপিনাও চলে কয়েকদিন ধরে। আশেপাশের গ্রাম থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনরা আসেন নিমন্ত্রিত হয়ে।

বাজার করা, রান্না করা, ডিশ ধোওয়া-মোছার ঝামেলা শহরবাসীরা পোহাতে চায় না, বিয়ের খানাপিনা তারা রেস্টুর‍্যান্টেই সারে। যেভাবে ব্যাপারটা ঘটে তাতে কেমন একটা 'অফিস অফিস' গন্ধ থাকে, আন্তরিকতার চেয়ে আনুষ্ঠানিকতা বেশি। নব-দম্পতির বস্-রা ভাষণ দেন, দামী উপহার দেন। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম বিবাহোৎসব আমার মনঃপূত নয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোভিয়েত দেশ, ৩৯তম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৮৮

স্বামীজীর সেবামূলক কর্মভাবনা ও তার উৎস

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

উনিশ শতকে বাঙালীর বিচিত্রমুখী নবজাগরণের একটি প্রধান ধারা হল ধর্মান্দোলন। রাজা রামমোহনে এই আন্দোলনের সূচনা এবং এই শতকের শেষ দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় তার পূর্ণ পরিণতি। ধর্মকে আনুষ্ঠানিক সর্বস্বতা ও কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে মুক্ত করে এবং নানারূপ অপব্যাখ্যার শোচনীয়তা থেকে উদ্ধার করে তার যথার্থরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্ম অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয় হলেও গৃহীর গৃহ-কোণেও যে তার অনুশীলন সম্ভব, গার্হস্থ্য জীবন-যাপনের মধ্য দিয়েও মানুষ যে মনন ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে সেই অতীন্দ্রিয় জগতে পেঁছিতে পারে—শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্য দিয়েই যে যথার্থ ধর্মচর্যা—এই কথা ধর্মসম্পর্কিত চিন্তায় বিভ্রান্ত বাঙালীকে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির আঘাতে চঞ্চল ও দিশেহারা নব্য শিক্ষিত যুবকদের কাছে এই বাণীর সেদিন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ধর্মকে তথা ঈশ্বরকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা—জীবনের মধ্য দিয়েই জীবনাতীতের সন্ধান লাভ ও নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের আরাধনার কথা সেদিন সংশয়গ্রস্ত, ধর্মের ক্ষেত্রে দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবধারা আমাদের চিরপুরাতন বেদান্ত ও গীতার যুগোচিত ভাষ্য। তাঁর সর্ব-প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী কালের স্বামী বিবেকানন্দ) সীমিত ক্ষেত্রে এই অপরূপ বাণী যা কেন্দ্রায়িত ছিল, তাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বেদান্ত ও গীতার আলোকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের মুখে ধর্ম-ব্যাখ্যার পাঠ গ্রহণ করে তিনি বুঝেছিলেন ধর্মের এই ব্যাখ্যাই সর্বোত্তম। ভারতীয় শাস্ত্রের এই যুগোচিত ব্যাখ্যাই ভারতের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনবে এবং সমগ্র বিশ্বের ধর্মকলহ এই উদার সর্বজনীন ধর্মাদর্শের সংস্পর্শে বিদূরিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির তত্ত্ব সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় কতদিন কতভাবে বুঝিয়েছিলেন। একদিনের একটি ঘটনা নরেন্দ্রের দৃষ্টিতে নূতন আলো এনে দেয়। ঘরভর্তি লোকের মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব মতের সার কথাগুলি বলছিলেন: "কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া…" এই পর্যন্ত বলেই তিনি সমাধিস্থ হন। সমাধিভঙ্গে তিনি বলতে থাকেন, "জীবে দয়া, জীবে দয়া! দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া, করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি সেদিন সমবেত আর সকলের মধ্যে নরেন্দ্রেরই হৃদয়ের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। বাইরে নিচে নেমে এসে তিনি সেদিন বলেছিলেন: "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম।…ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বোঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। যাহা হউক, ভগবান যদি দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব।" গুরুর তিরোভাবের পর গুরুর শিক্ষায় নবালোকপ্রাপ্ত স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) তাঁর জীবনের কর্মধারা স্থির করে নিলেন। তাঁর স্বল্প কর্মজীবনের মূল কথাটিই হচ্ছে ঐ সেবা—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

॥ ২ ॥

সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্তী পনের-ষোল বৎসরের যে অতি সংক্ষিপ্ত মর্ত্যজীবন নরেন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন, তা যেমনই কর্মবেগচঞ্চল, তেমনই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ। এ-জীবনকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি মানব-সেবামূলক কর্মময় জীবনযাপন ও সেই জীবনানুগ-ভাবনা এবং আর একটি এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর আত্মসাধনা ও সেই সাধনার মহিমা

ঘোষণা। কিন্তু আমাদের এই বিভাগ তাঁর জীবনে কর্ম ও চিন্তার প্রাধান্যের দিকটি লক্ষ্য রেখেই। নইলে পরম ব্রহ্মের চিন্তা ও ধ্যানের প্রদীপ স্বামীজীর অন্তরে নিরন্তর অনির্বাণ ছিল। তাঁর সকল কর্ম ও কর্মভাবনার মূলেও যে আত্মপ্রতীতি, সাহস ও বিশ্বাস কাজ করেছে তা ঐ বৈদান্তিক আত্ম-ব্রহ্মেরই ধ্যানজাত বিভূতি। কর্মের যজ্ঞ-সম্পাদন কালে কর্মই মুখ্য হয়ে দেখা দিলেও অন্তর্লীন হয়েছিল ঐ সাধনার দিকটি।

পরিব্রাজকরূপে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে তিনি স্বচক্ষে দেশের অসংখ্য মানুষের দুর্গত ও শোচনীয় অবস্থা দেখেছিলেন। দুর্বল মানুষদের অসহনীয় দারিদ্র্য, মূর্খতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা, পারস্পরিক ঈর্ষা-বিদ্বেষ, ধর্মবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সমাজের ধনী ও তথাকথিত মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর তাদের প্রতি ঘৃণা, অস্পৃশ্যতা ও অত্যাচার তাঁর সমস্ত অন্তরকে বেদনায় রক্তাক্ত করে তুলেছিল। সমাজের অভিজাত আরামবিলাসী এই ধনী সম্প্রদায়ের জন্যে নয়, ঐ অগণিত কোটি কোটি মানুষের ব্যথায় কাতর স্বামীজী তাঁদের সেবার কথাই ভেবেছিলেন। এতদিন তারাই সমাজের অন্য শ্রেণীদের সেবা করে এসেছে—কিন্তু আর নয়। এখন তাদেরই সেবার দায়িত্ব তাঁকে ও তাঁর গুরু-ভাইদের প্রথম গ্রহণ করতে হবে এবং সমগ্র দেশে সকল মানুষকে ঐ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। স্বার্থশূন্য এই সেবারই অপর নাম প্রেম। প্রেমের ডোরে পরস্পরকে বন্ধনের এই যে আয়োজন তা স্বামীজীর পরিকল্পনায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপনের মৌল উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত। সারা দেশে মঠ ও মিশন স্থাপন করে একদিকে চলবে মঠের সন্ন্যাসীদের অধ্যয়ন-চিন্তা ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি এবং অন্যদিকে ঐ সব দরিদ্র-মূর্খ অপাঙ্‌ক্তেয়-দের জন্যে সেবামূলক কাজ। এইভাবে তাঁর কাজের পরিকল্পিত আদর্শটি শুধু এ-দেশেই নয় পাশ্চাত্যেও—আমেরিকায় ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে—ছড়িয়ে দিতে পারলে সমগ্র বিশ্বে মানবসেবার অতি উদার আদর্শটি গৃহীত হবে। এই ছিল স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে স্বামীজীর এই সেবামূলক কর্মের অন্তরালে যে-আদর্শটি নিহিত ছিল তা এবং এই ধরনের আদর্শভিত্তিক সেবা-প্রেরণা আমাদের দেশে কোনকালে ছিল কি? থাকলে তা কি অবস্থায় ছিল এবং পরবর্তী কালে তা কিভাবে যুগোচিত রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় ফুটে উঠেছিল এবং স্বামীজীই বা কিভাবে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজীর একে গ্রহণ ও বাস্তব-ক্ষেত্রে রূপায়ণের মধ্যে মৌলিকতা কোন্‌খানে? এই প্রশ্নগুলির জবাব দেবার পূর্বে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্বামীজী যে-সেবার আদর্শ বার বার বলেছেন তা হল ত্যাগীর সেবা—সকল স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে মানুষের হৃদয়ের প্রীতিরস-সিঞ্চিত সেবা। আত্মস্বার্থযুক্ত মানুষ যখন নিজের নাম-যশের জন্যে কিংবা সেব্য ব্যক্তির কাছে কোন কিছু প্রাপ্তির কামনায় সেবা করে তা স্বামীজীর কাছে সেবাই নয়। সেবাকর্মের মধ্যে সেবকের কোন অভিমান বা অহমিকার লেশমাত্র ঠাঁই নেই। প্রাণের উল্লাসে আত্মস্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে ত্যাগব্রতে দীক্ষা না নিলে সেবা হয় না। ত্যাগব্রতীর মনোভাবই আদ্যন্ত সেবাকর্মে প্রচ্ছন্ন থাকে। বাইরে সেবার রূপটি দেখা যায় বটে, কিন্তু তার অন্তরের রূপটি অন্তর্লীন থাকে। সেবার অন্তর্লীন ঐ রূপই তো ত্যাগ। মানুষের করণীয় যা যথার্থ কর্ম তারও মূলে ঐ ত্যাগ। কর্ম সেবারই নামান্তর। স্বামীজী এই কর্ম বা সেবাধর্মকে কিভাবে ত্যাগের সঙ্গে অন্বিত করে দেখতেন দু-একটি পত্র থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমেরিকা থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেনঃ "আমি একমাত্র কর্ম বুঝি—পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। বুঝতে পারছ?……ফলকথা আমি বৈদান্তিক; সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না।… ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম, বাকি কুকর্ম। আর আমি কিছু দেখছি না। অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্মে ফল থাকিতে পারে,

কিন্তু তদবলম্বন কেবল বৃথা জীবনক্ষয়—কারণ কর্মের ফল যে পবিত্রতা তাহা কেবল পরোপকার মাত্রে ঘটে। ··· মূর্খ গৃহস্থ কর্মপর হউক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ত্যাগী!!" এই একই সাথে অপর গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি আর একটি পত্রে লিখেছেন: "গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য জগদ্ধিতায় দিতে হইবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি: 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।" স্বামী অখণ্ডানন্দকে আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন স্বামীজী লিখেছিলেন: "কর্ম কর, কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম even unto death; ··· it is the heart that conquers, not the brain". আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে কি? এই অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের কাছে কিরকম কাজ চাইছিলেন। পরোপকার বা সেবাই যে সর্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম একথা তিনি বহুবার বলেছেন। আর এ সেবা করতে গেলে আত্মত্যাগ করতে হবে।

এখন দেখা যাক, এই স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ভারতে কোন্ কথাটি উচ্চারিত হয়েছে। 'ঈশ উপনিষদ্' এর প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥"

অর্থাৎ এই জগতের সমস্ত কিছু বস্তু ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত মনে করবে। ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে কারও ধনে লোভ করো না। এখানে ত্যাগের সঙ্গে ভোগের অর্থ হল কোন বস্তুর উপর মোহ রাখা চলবে না। অনাসক্তির ভাব নিয়ে জগৎকে ঈশ্বরের প্রকাশ মনে করে ভোগ করতে হবে। ত্যাগের সঙ্গে ভোগের অর্থ বলতে কেউ কেউ বলেছেন ভাগ করে ভোগ। তাহলেই ভোগ্যবস্তুকে অনেকখানি ছাড়তে হবে। আসলে বলা হচ্ছে অনিত্য জগৎ সম্পর্কে মোহ ত্যাগ করে নিত্য ব্রহ্মবস্তুতে মনকে লগ্ন করে রাখার কথা। সেই বোধকে পোষণ করা।

ব্রহ্মবস্তুতে মনকে লগ্ন করলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অনেক বৃহৎ হয়ে যায়। আকারে নয়, প্রকারে। উপনিষদের বক্তব্য: হৃদয়বৃত্তির প্রসারণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার স্বার্থপর স্বভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। মানুষ অপরের স্বার্থ-সাধনে তৎপর হয়ে উঠতে পারে হৃদয়জ স্নেহ-প্রীতি ও ভালবাসার বিকাশ ও বিস্তারে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আত্মস্বার্থ ও পরস্বার্থবোধ আছেই—আত্মস্বার্থ-বোধই প্রবল। কিন্তু সন্তানের জন্য তো মা আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত নন। প্রিয়জনের প্রয়োজনে প্রেমিক সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত। এখন এই আত্মত্যাগের ক্ষেত্রটি যদি নিকট আত্মীয়-জনের বাইরেও প্রসারিত হয় তাহলেই তা যথার্থ ত্যাগে গিয়ে পেঁছবে। কিন্তু পরিবারের নিকট আত্মীয়ের বাইরে কেনই বা মানুষ তার আত্মস্বার্থের সীমাকে ব্যাপ্ত করবে? এর উত্তর উপনিষদেই আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়ার নিকট পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। পুত্রদের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রেরা প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যেই পুত্রগণ প্রিয় হয়। এইরূপ বিত্ত, পশু, ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, লোকসমূহ, দেব, বেদ, ভূত প্রভৃতি সকল কিছুই যে প্রিয় হয় তা ঐ আত্মপ্রীতির জন্যই। 'আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি'।[১] এখানে 'আত্মপ্রীতি' বলতে 'ব্রহ্মপ্রীতি' বুঝতে হবে। কারণ 'সর্বং যদয়মাত্মা'[২]—অর্থাৎ সব কিছুই আত্মা। সর্বভূতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান—এই উক্তির দ্বারা উপনিষদ্ সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়-সম্পর্কের ইঙ্গিত করেছে এবং একের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের মন্ত্রে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

উপনিষদ্ আত্মার আলোচনায় অধিক গুরুত্ব দিলেও কর্মের কথাও বলেছেন। আর কোন্ কর্ম সর্বাপেক্ষা বেশি কল্যাণকর তারও স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আচার্য সমাবর্তনের দিনে শিষ্যকে যে উপদেশ দিচ্ছেন তা থেকে জানা যায় যে, অনবদ্য কর্মই যথার্থ কর্তব্যকর্ম। এই

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৫।৬ ২ ঐ

কর্মই সে করবে অন্য কর্ম নয়—"যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি'।[৩] যে-সব কর্ম অনিন্দিত এবং যা ধর্মবিহিত এমন কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। আত্মরক্ষার জন্যে এবং আত্মোন্নতির জন্যে কর্ম করতে হবে। মাতা, পিতা, আচার্য এবং অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে হবে। সদাচারসমূহের অনুষ্ঠান বিধেয়। মোটকথা উপনিষদ্ কর্ম সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন তাতে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের কল্যাণ। দানের কথাও সেখানে বাদ যায়নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে, অশ্রদ্ধার সঙ্গে নয়। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ীই দান করতে হবে—নম্রতা, সম্ভ্রম ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে দান করতে হবে। "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽ-দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।"[৪]

উপনিষদের এই সমস্ত মন্ত্র থেকে আমরা ত্যাগ, কর্ম ও দান সম্পর্কে কি জানলাম? অনিন্দিত, ধর্মানুমোদিত সদাচারসম্মত কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এতে ব্যক্তির এবং সমষ্টির বা সমাজের কল্যাণ। বিশ্বের সব কিছুতে সেই পরমাত্মা বর্তমান বলে সব কিছুই আমাদের আত্মার আত্মীয়, তাই আত্মস্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করে পরার্থপর হতে হবে। নির্লোভ হয়ে সকলের সঙ্গে ভাগ করে যে ভোগ তারই নাম 'ত্যাগ'। সকল জীবকে আপন জেনে হৃদয়বৃত্তিকে প্রসারিত করে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হতে হবে এবং সেই মানসিকতাই যথার্থ ত্যাগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। দানও মানুষের কর্তব্যকর্মের অন্তর্গত। নিজ সাধ্য অনুযায়ী নম্রতা, সম্ভ্রম ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে দানই সমুচিত। এই দানের মধ্যেই আমরা পরোপকার বা সেবার মনোভাবকে অনেকখানি লক্ষ্য করি।

উপনিষদের পরে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'য় এই কর্ম ও ত্যাগ বা ত্যাগগর্ভ কর্মের পরিচয় আরও স্পষ্ট-ভাবে পাই। এখানে কর্মের সঙ্গে ত্যাগকে অন্বিত করেই কর্মের চিন্তা করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'নিত্যকর্ম' বর্জন করা উচিত নয়; আবার যজ্ঞ, দান তপস্যারূপ কর্মও করণীয়। কিন্তু এই নিত্যকর্ম বা যজ্ঞাদি কর্ম করতে গিয়ে কেউ যদি মোহবশতঃ সেই কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে তামসভাবে সে আচ্ছন্ন। আবার কেউ যদি কর্ম দুঃখদায়ক বলে কায়ক্লেশ ভয়ে সেই কর্ম ত্যাগ করে তাহলে বুঝতে হবে রাজসভাবে সে আচ্ছন্ন। এ-দুটির কোনটিতে ত্যাগের ফললাভ হয় না। কিন্তু যিনি নিত্যকর্মই করেন অথচ সেই কর্ম অনাসক্তভাবে এবং তার ফল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে করেন তাহলেই তিনি সাত্ত্বিক ভাবে প্রাণিত এবং তখনই তা যথার্থ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাত্ত্বিক কর্ম হবে। সেখানে ত্যাগের কথায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে, 'সর্বকর্মফল-ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগঃ বিচক্ষণাঃ'[৫] সমস্ত কর্মের ফলত্যাগই হল প্রকৃত ত্যাগ। এই শ্লোকেই কাম্য-কর্মের ত্যাগকে 'সন্ন্যাস' নামে আখ্যাত করা হয়েছে। ত্যাগ মানুষের এমনই একটি অতি উচ্চস্তরের মহতী বৃত্তি যাতে মানুষের স্বভাব-সুলভ সংকীর্ণ দৃষ্টি ও স্বার্থপরতার লেশমাত্র চিন্তা প্রশ্রয় পায় না। মানুষ সাধারণতঃ কোন একটি কিছুর কামনা পোষণ করে কোন একটি কাজে অগ্রসর হয় এবং সে-কামনা তার স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। কখনো সে মনে করে আমি ছাড়া এ-কাজ আর কে করতে পারত? কখনো মনে করে আমার এই কর্ম আমাকে সকলের চোখে শ্রদ্ধেয় ও বড় করে তুলবে। আবার কখনো মনে করে আমি এই কাজটি করেছি অন্য একটি ফল-লাভের আশায়। এই ধরনের অহমিকা, আত্মাভিমান বা ফলাকাঙ্ক্ষা যুক্ত থাকলে কোন কাজের মূলেই ত্যাগ থাকে না। তাই 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাণি চ'[৬] যে কর্ম তাই আসল কর্ম এবং তার মূলেই আছে ত্যাগ। জগতে সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে সমগ্র জগৎ-কল্যাণের বেদীমূলে নিজেকে নিবেদন করার মনোভাব থেকেই ঐ ত্যাগের উদ্ভব। আর এই নিবেদনেই আছে মানুষের পরমা তৃপ্তি ও শান্তি। দেহধারণকারী মানুষ সাধারণতঃ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু যিনি কর্মফল ত্যাগী তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। ইনি অকুশল কর্মেও বিরক্ত হন না, আবার কুশল কর্মেও আসক্ত হন না।

৩ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ১।১১।২
৪ ঐ, ১।১১।৩
৫ গীতা, ১৮।২
৬ ঐ, ১৮।৬

গীতায় কর্মকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—কর্ম (কর্তব্যকর্ম), অকর্ম এবং বিকর্ম (নিষিদ্ধ কর্ম)। এর মধ্যে কর্তব্যকর্মই অনুষ্ঠেয় এবং তা অনাসক্ত ও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে। শ্রীভগবান এখানে বলেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের নিজ নিজ কর্মসকল তাদের স্বভাবজাত গুণের দ্বারাই বিভক্ত হয়েছে।[৭] সেখানে শমদমতপাদি কর্ম ব্রাহ্মণের, শৌর্য, তেজ, ধৃতি দানাদি ক্ষত্রিয়ের, কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি বৈশ্যের এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবুও প্রত্যেক বর্ণ সামগ্রিকভাবে সকলের কল্যাণসাধন করে চলবে নিজ নিজ কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে—এই মনোভাব নিয়েই সেদিন বর্ণবিভাগ হয়েছিল। গীতার মূল সুরকে নানাজনে নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গীতার মূল সুরকে 'ত্যাগ' বলেই ভক্তদের জানাতেন। 'গীতা' শব্দটি বার বার উচ্চারিত হলে যা মেলে তাঁর মতে তাই গীতার প্রধান তত্ত্বকথা। উপনিষদের মূলকথাও যে ত্যাগ সেকথাও তিনি বলতেন। যাই হোক শ্রীমদ্ভগবদগীতা থেকে আমরা জানলাম যে, কামনা-বিরহিত হয়ে ফললাভ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে নিত্যকর্ম এবং যার যা কর্তব্যকর্ম করতে হবে। প্রকৃত ত্যাগী না হলে কর্তব্যকর্ম বা নিত্য কর্মও ঠিকমতো অনুষ্ঠিত হবে না।

॥ ৩ ॥

মনে রাখতে হবে স্বামীজীর নিকট উপনিষদ্‌ও যেমন গীতাও তেমনি অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। জীবসেবার নির্দেশটি তিনি গুরুর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন এবং গীতা ও উপনিষদের মর্মবাণীও তাঁর মুখেই শুনেছিলেন। তারপর উপনিষদ্‌ ও গীতা নিরন্তর পাঠ করে তাঁর কর্মসাধনার পথটিকে তৈরি করে নিতে আর অসুবিধে হয়নি। সর্বভূতে পরমাত্মার অবস্থানজনিত সকল জীবই আত্মীয় এই অতি উদার উপনিষদোক্ত বা গীতোক্ত ভাবটি তিনি সর্বদা স্মরণে রেখেছিলেন। তাঁর সর্বপ্রকার স্বার্থশূন্য সেবামূলক মানব-কল্যাণ কর্মে ঐ ভাব তাঁকে পরিচালিত করেছে। উপনিষদ্‌ এবং গীতার ত্যাগ-বিষয়ক বক্তব্যটিও তিনি স্মরণে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি উপনিষদ্‌ বা গীতার পথে কর্মের বিভাগ এযুগেও মেনে চলার প্রয়োজন তা মনে করেননি। তিনি উপনিষদের কর্তব্য কর্মকে হুবহু গ্রহণ করলেন না—গীতার নিত্যকর্ম ও কর্তব্যকর্মকে ঘাটে ঘাটে অনুসরণ করতে চাইলেন না। বরং গীতায় শূদ্রদের যে অন্য বর্ণদের পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে—সেটিকেই যেন নবযুগের উপযোগী মনে করে সকল মানুষের বিশেষতঃ শূদ্রদেরই পরিচর্যা বা সেবার কথাটিকে বলতে চেয়ে গীতার উক্তিকে একটু পরিবর্তিত করেছেন। আর তাঁর এই সেবা-মূলক কাজ শুধুমাত্র রুগ্নের বা পীড়িতের সেবার মধ্যেই সীমিত নয়—অজ্ঞান, মূর্খ, আত্মপ্রত্যয়হীন, অশিক্ষিত মানুষকে সব দিক থেকে সুস্থ, জাগ্রত, শিক্ষিত ও আত্মবিশ্বাসী করার ক্ষেত্রে প্রসারিত। এখানে অবশ্য মুণ্ডক উপনিষদের 'নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ' এবং কঠ উপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত'। এই দুটি মন্ত্রের বিশেষ প্রভাব ছিল তাঁর চিন্তায়। মোটকথা তিনি যে বলেছিলেন 'Man-making is my mission' তা তাঁর ঐ মানব-সেবারই অন্তর্গত। তিনি ত্যাগ-সুরভিত সেবাব্রতী মানুষই গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর গুরুভায়েরাও যে এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত একথা তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে একখানি পত্রে একবার জানিয়েও ছিলেন।

সাধারণ মানুষ এই 'ত্যাগ' শব্দের তাৎপর্যটি ঠিক ধরতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন এই ত্যাগ বলতে যখন কিছু বর্জনের কথা বোঝায় তখন আধুনিককালে জীবনসম্পর্কিত এই নঞর্থবোধক শব্দটি অচল। কিন্তু একটু গভীরে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ বর্জন হলেও সেই বর্জন বৃহতের জন্যে ক্ষুদ্রকে বর্জন। আমার 'বড় আমি'কে লাভের জন্য 'ছোট আমি'কে ত্যাগ। জগতের মহৎ কল্যাণের জন্য আত্মস্বার্থের ত্যাগ। শুধুমাত্র অধ্যাত্মজীবনেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বড় কিছু লাভের জন্যে ছোটকে হারাতেই হয়। সুতরাং কর্মজগতে এই ত্যাগের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্বিংশতি খণ্ডে ভূমার যে-সমস্ত লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখি

৭ গীতা, ১৮।৪২-৪৪

'যাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না তাই ভূমা।' আর যাতে অন্য কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায় তাই অল্প। "যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তনমর্ত্যম্"—যা ভূমা তাই অমৃত, যা অল্প তাই মরণশীল। ভূমা বা বৃহতের মহিমা এবং ক্ষুদ্রের সীমা এখানে দেখানো হয়েছে। এই ক্ষুদ্রকে বর্জনের অর্থই তো ত্যাগ। স্বামীজীর ত্যাগ সম্পর্কিত উপনিষদের এই ধারণাটি তাঁর একটি উক্তিতে লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন: "অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র মহান শিক্ষক, কিন্তু ঐ সুখদুঃখগুলিকে কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা বলিয়াই যেন মনে থাকে। এগুলি ধাপে ধাপে আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়া যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় বস্তু তুচ্ছ হইয়া যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবে, সমুদয় জগৎ তখন যেন সম্মুখে এক বিন্দু জলের মতো মনে হইবে এবং উহা আপনিই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।"[৮]

স্বামীজী মানবসেবা বা মানবপ্রেমের আদর্শটি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করলেও এবং বেদান্ত-দর্শন এবং গীতোক্ত বাণীতে তা পুষ্ট হলেও, এর জন্যে তিনি ভগবান বুদ্ধের কাছেও বহুলাংশে ঋণী। তিনি বারংবার তাঁর নানা আলোচনায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। বুদ্ধের সব বক্তব্যই যে তাঁর প্রিয় ছিল তা নয়। তাঁর অনেক কিছুই তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁর অহিংসা ও প্রেম, সকল মানুষকে ভ্রাতৃজ্ঞান, তাঁর অনন্তবিস্তারী হৃদয়ের করুণা, তাঁর চারিত্র্য-শক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মানবসেবার আদর্শে নানাভাবে তিনি বুদ্ধের চিন্তার কাছেও ঋণী।

দার্শনিক কান্টের 'কাজের জন্যে কাজের নীতি' বা মানুষের নিজ স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে সৎ জীবন-যাপনের অসম্ভাব্যতাতত্ত্ব স্বামীজীর প্রিয় ছিল না। হিতবাদীদের মতো তিনি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেও তাঁদের অধিকসংখ্যক লোকের কল্যাণের নীতিও তিনি যুক্তিবলে খণ্ডন করেছেন।

মোটকথা স্বামীজীর পূর্বে আমাদের দেশে ও বিদেশে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ নিয়ে যে অনেক চিন্তা করা হয়েছে বিভিন্ন যুগে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে কোন একটি দর্শনের কাছে বিশেষভাবে ঋণী নন। তিনি তাঁর সমকালে দুর্দশাগ্রস্ত, অধঃপতিত, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মানুষদের জন্য সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপনিষদের নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত অনেক বক্তব্যকে প্রয়োজনমতো গ্রহণ করে তিনি মানবসেবার পরিধিকে ব্যাপকতা দান করেছেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ ও সেবা সম্পর্কিত বক্তব্যই তাঁকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। একথা যেমন ঠিক, তেমনি মানুষ গড়ার কাজে তিনি ব্যাপক অর্থে যেভাবে এই ত্যাগ-মূলক সেবা বা কর্মকে দেখেছেন তাও একান্তভাবে তাঁরই। এই আদর্শের মূলে যে এত শক্তি, এত জোর ছিল তা পূর্বে আমরা জানতাম না। যথার্থ সেবক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে অতি দ্রুত প্রবলতম আত্মবিশ্বাস নিয়ে জনসেবার মধ্য দিয়ে নিজের ব্রহ্মকেও যেমন, তেমনি কোটি কোটি মানুষের ব্রহ্মকে জাগিয়ে তুলতে প্রেরণা পান তাঁর উক্তিতে। এই বিষয়ে তাঁর আরও কয়েকটি উক্তি আমরা উদ্ধৃত করব।

স্বামীজীর সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ তাঁর গুরুভ্রাতারা সারাজীবন যা করে গেছেন তা যে কত বড় ত্যাগ সংযম ও শক্তির কাজ তা আজকের দিনে সহজে বোঝা কঠিন। সারা ভারত পরিব্রাজকরূপে পর্যটন করে এসে স্বামীজী তাঁদের বলেছিলেন, আত্ম-মুক্তির চেষ্টায় সন্ন্যাসী বিব্রত থাকবে না—জগতের কল্যাণের জন্যে তাকে নিষ্কাম কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। গুরুভাইদের কেউ কেউ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার জন্যে সেদিন ছুটে গেছেন, কেউ বা অনাথ বালকদের জন্যে পাঠশালা খোলার কাজে ব্যস্ত, কেউ বা অশিক্ষিতদের শিক্ষা নিয়ে চিন্তিত। স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী লিখেছিলেন: "ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নামধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যম্ অহোভাগ্যম্।... পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'। আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব', মূর্খদেবো ভব'।" বিদেশ থেকে

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৩৫৩

প্রত্যাবর্তনের পর মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়া প্লেগ রোগের মোকাবিলায় তিনি ও তাঁর গুরুভ্রাতারা যে কিরূপ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাও আমরা জানি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি এই জীবসেবার জন্যেই। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ আত্মমুক্তি এবং জগতের কল্যাণসাধন—এই দুই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই এর পরিকল্পনা। এর মাসখানেক পরে ৩০ মে আলমোড়া থেকে প্রমদাদাসকে একটি পত্রে তিনি লেখেন: "আর এক কথা বুঝেছি যে, পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—নিজের মুক্তিইচ্ছাও অন্যায়।" দেখা যাচ্ছে এখানে তিনি ব্যক্তিগত মুক্তিকামনাকেও বড় করে দেখছেন না। চল্লিশ দিন পরে আলমোড়া থেকে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছেন: "কার্য কার্য—জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কি?··· পরোপকারই সর্বজনীন মহাব্রত—··· দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়।"

আর বেশি কথা বলব না। একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করব, সেখানে স্বামীজী যা বলেছিলেন তার মধ্য দিয়ে স্বার্থশূন্য আত্মোৎসর্গী জীবন-যাপনের কিরূপ আগুন ছিল তার উত্তাপ এখনও পাওয়া যাবে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে বেলুড় মঠে কিছু সাঁওতাল শ্রমিক সেখানকার জমি-খনন কার্যে নিযুক্ত হয়। স্বামীজী একদিন এদের পেটপুরে খাওয়ালেন। তাদের খাওয়া শেষ হলে তিনি বলে উঠলেন: তোমরা আমার নারায়ণ। আজ আমি তোমাদের খাইয়ে স্বয়ং প্রভুকেই খাইয়েছি। তারপর মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করে বললেন: দেখ, অশিক্ষিত, দরিদ্র এই লোকগুলি কত সরল! তোমরা কি এদের দুঃখ কতকটা লাঘব করতে পেরেছ? যদি না পেরে থাকো, তাহলে তোমাদের গেরুয়া ধারণ করার অর্থ কি? আপনার মঙ্গলের সব কিছু ত্যাগ কর—আর এইটেই হল যথার্থ সন্ন্যাস। বৃক্ষতলকে যখন আমরা আশ্রয়স্থলরূপে বেছে নিয়েছি, তখন ঘরের আমাদের কি প্রয়োজন? হায়! যখন আমাদের দেশের লোকেদের নিজেদের খাওয়া-পরার যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই, তখন আমরা কেমন হৃদয়বান যে খাবার মুখে তুলি? শিক্ষার এবং শাস্ত্র ও সাধনার সব অহংকার বর্জন করে, ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের কথা না ভেবে চল আমরা দরিদ্রদের সেবার কাজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাই। আমাদের চরিত্র-শক্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং কঠোর কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন নিয়ে চল আমরা ধনীদের বোঝাই জনগণের প্রতি তাদের কর্তব্য কি, দরিদ্র এবং দুর্গতদের জন্যে তাদের অর্থ দান করতে আমরা প্রবুদ্ধ করি। হায়! আমাদের দেশে কেউই এই নিম্নশ্রেণীদের কথা, দরিদ্রদের কথা ও দুর্গতদের কথা ভাবে না। এরাই জাতির মেরুদণ্ড এবং যাদের শ্রমে আমাদের খাদ্য উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে সেই মানুষ কোথায় যাঁরা এদের প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ এবং সুখে-দুঃখে তাদের অংশীদার। এরা জাগ্রত না হলে আমাদের মাতৃভূমিও জাগ্রত হবে না। আমি দিবালোকের মতো দেখতে পাচ্ছি যে ব্রহ্ম ও যে শক্তি আমার মধ্যে বর্তমান তা তাদের মধ্যেও নিহিত। তফাৎ কেবল প্রকাশের মাত্রা নিয়ে। এদের সেবাই এখন তোমাদের প্রধান কাজ। এত তপস্যার পরে আমি বুঝেছি এই সত্য যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ভগবান আছেন। এছাড়া আর অন্য কোন দেবতা নেই। এইসব জীবদের সেবা করাই হল ঈশ্বরসেবা।

স্বামীজীর বিখ্যাত ও সর্বজনপরিচিত উক্তি—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—প্রাচীন ভারতের ত্যাগ ও কর্ম সম্পর্কে স্ফুট ও অস্ফুট আদর্শের, ভগবান বুদ্ধের প্রেমময় বাণীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর নির্গলিত রূপ। স্বামীজী এসকলের সমবায়ে এইভাবে যে-আদর্শটি নবযুগের সামনে উপস্থিত করলেন, তাতে মৃত অতীত প্রাণ পেয়ে কথা কয়ে উঠেছে। কিন্তু সে-কথা কোন বিশেষ যুগের নয়। স্বামীজীর স্পর্শে ও রূপায়ণে তা সর্বযুগের আদরণীয় এক অভিনব আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামীজী সেবার মধ্য দিয়ে মানুষের সর্বপ্রকারে আত্মবোধের যে উদ্বোধনের কথা বলেছিলেন তা যেমন সর্বযুগেই প্রযোজ্য ও অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তেমনি আদর্শ হিসেবেও মৌলিক এবং অতুলনীয়।

গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, পাঞ্জাব এবং স্বামী বিবেকানন্দ

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিবাস পাই স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, একদিন স্বামীজী একটি শিশুকে কোলে নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে একটি পাঞ্জাবী গান গেয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন গানটি গুরু নানকের রচনা। একদিন সন্ধ্যার সময় নানক একটি মন্দিরে গেছেন। মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছে বিগ্রহের। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাঁকে প্রবেশ করতে দিলেন না। তখন নানক সঙ্গে গিয়ে এই গানটি গেয়েছিলেন :

গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে…

আকাশ যেন আরতির রৌপ্যপাত্র, আর সূর্য চন্দ্র যেন প্রদীপ…। গানটির বাংলা রূপান্তর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই গানটি ছিল স্বামীজীরও অত্যন্ত প্রিয়।

গুরু নানককে স্বামীজী কেবল শিখ সম্প্রদায়ের নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নানক সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন তিনি ছিলেন 'যথার্থ অবতার'। স্বামীজীর দৃষ্টিতে নানক ছিলেন ধর্মাচার্য হিসাবে "ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো", নানক ছিলেন প্রকৃত 'সমাজ-সংস্কারক'। নানকের উদার হৃদয়ের দিকটি স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শুধু গুরু নানকই নন, সকল শিখগুরুগণই তাঁর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই গুরু নানক ও অন্যান্য শিখগুরুদের নানা কাহিনী তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের শোনাতেন। নিবেদিতা তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন : স্বামীজী শিখগুরুদের কথা বললেন। গ্রন্থসাহেব থেকে গুরু নানকের একটি কাহিনী শোনালেন। নানক মক্কা গেছেন, সেখানে কাবা মসজিদের দিকে পা করে শুয়ে আছেন। তা দেখে ক্রুদ্ধ মুসলমানেরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে এই মারে তো সেই মারে। কী! আল্লার স্থানের দিকে পা করে শোয়া? নানক শান্তভাবে উঠে শুধু বললেন, 'তাহলে আমাকে তোমরা দেখিয়ে দাও, কোনদিকে ভগবান নেই, আমি সেই দিকেই পা করে শোব।'

স্বামীজী শিখদের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে বীর্যধর্মের সমন্বয় দেখেছিলেন। সেইজন্যে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে বলেছিলেন : "এই যুগের (মুসলমান যুগের) শেষে হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।" অবশ্য স্বামীজী এখানে হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে সনাতন ভারতীয় ধর্মের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের স্মরণমাত্র স্বামীজী প্রবল উম্মাদনা বোধ করতেন। শিখদের সংগ্রামী প্রতিভার মধ্যে তিনি ভারতীয় সনাতনধর্মের, যা হিন্দুধর্ম হিসাবে পরিচিত, তারই বীরত্বের ভাবকে প্রবলরূপে প্রকাশিত দেখেছেন। এবিষয়ে নিবেদিতা বলেছেন : "শিখদিগের বিখ্যাত খালসা শিখদলের মতো সঙ্ঘ অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার (স্বামীজীর) মতে তা হিন্দুধর্মেরই সৃষ্টি এবং তাহারই অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কি আগ্রহের সঙ্গে তিনি আমাদের কাছে বার বার গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্যগণের প্রতি, কে ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে?—এই আহ্বান ও সেই দৃশ্যের জ্বলন্ত বর্ণনা করতেন।" আসলে স্বামীজী মনে করতেন যে হিন্দুধর্মের তিনটি পৃথক স্তর আছে। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে প্রাচীন, শাস্ত্রানুবর্তী ধর্ম। দ্বিতীয়টি মুসলমান রাজত্বকালের ধর্মসংস্কারকগণ প্রবর্তিত সম্প্রদায়সমূহ। তৃতীয় ক্ষেত্রে বর্তমানকালের সংস্কার প্রয়াসী সম্প্রদায়সমূহ। তাই স্বামীজী মনে করতেন, ভারতের সনাতনধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মতবাদ, চিন্তাধারার বিভিন্ন পথের একত্রিত সংহত রূপই আজ হিন্দুধর্মরূপে অভিহিত। হিন্দুধর্ম আসলে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা

প্রকাশ করে না, বিভিন্ন মত ও পথের বক্তব্য ও চিন্তাকে সে ধারণ করে আসছে অনাদি কাল থেকে। এই 'এ্যাসিমিলেশন' বা আত্মীকরণই ভারতীয় সনাতন-ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তাই তার মধ্যে যেমন দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা আছেন, তেমনি আছেন সাকার ও নিরাকারবাদীরা। আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্যরাও যেমন আছেন তেমনি আছেন নিরীশ্বরবাদীরাও। এর কিছুকে ফেলা যায় প্রাচীন, ও শাস্ত্রানুবর্তী ধর্মের মধ্যে, কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় মুসলমান রাজত্বকালে ধর্ম-সংস্কারকগণ প্রবর্তিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে, আর কোন কোন মত ও পথকে আনা যায় বর্তমান কালের সংস্কারপ্রয়াসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে।

গুরু গোবিন্দ সিংহকে হিন্দুধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করে স্বামীজী লাহোরে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ "কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য যখন ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে;…যখন যে-কোন দেশীয়, যে-কোন ভাষাভাষি হিন্দু নামধারী তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে; যখন হিন্দু-নামধারী যে-কোন ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে এবং নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে; …যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে তোমাদের আমি গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি। এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন—কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের ও নিজ আত্মীয়স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাকুক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমনকি দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে অপসৃত হইয়া, দক্ষিণদেশে গিয়া, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। …যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও তোমাদেরও প্রত্যেককে এক একজন গোবিন্দ সিংহ হইতে হইবে। …এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দু নামের যোগ্য। আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।"

গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম দিয়ে ভারতীয় সনাতনধর্মের আদর্শকে সাহসিকতা ও বীর্যবত্তার ক্ষেত্রে সার্থকতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুতরাং আদর্শ হিসাবে গুরু গোবিন্দ সিংহ সর্বদাই আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই স্বামীজী গুরু গোবিন্দ সিংহের আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরে আমাদের সামনে তিনি কর্তব্য হিসাবে বললেন, প্রথমতঃ, আমাদের সামনে এরূপ আদর্শ সবসময় থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ভুলতে হবে। তৃতীয়তঃ, চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করতে হবে। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে তিনি শিখদের শৌর্যবীর্যের প্রতি এবং তাঁদের গুরুদের প্রতি যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিলেন, ঠিক তেমনি প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্যও পালন করেছিলেন শিখদের উত্থানের সঙ্কীর্ণতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসলে তিনি সেদিনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়েই তার প্রাজ্ঞ দৃষ্টিতে তিনি ভারতবর্ষের মানুষের গৌরবটিকেও যেমন ধরতে পেরেছিলেন, তেমনি তাদের সীমাবদ্ধতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

কেবল শিখধর্ম বা শিখ জাতিই নয়, সমগ্র পাঞ্জাবের প্রতিই ছিল স্বামীজীর বিশেষ দুর্বলতা। পাঞ্জাবের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রই তাঁর একটি অপূর্ব শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিত। শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ, সাহসিকতা এবং সংগ্রামের এক অসাধারণ ভিত্তিভূমি পাঞ্জাব ছিল ভারতীয় সভ্যতার বহুবর্ণময় এক পটচিত্র। এই চিত্র দর্শনে তাঁর হৃদয়ে কোন ভাবের সৃষ্টি করত তার অনন্য পরিচয় দান করেছেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি উত্তরভারত ভ্রমণের সময় স্বামীজীর পাঞ্জাব সম্পর্কে যে আবেগ-উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলেন তার অসাধারণ রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "পাঞ্জাবে প্রবেশ করেই আমরা

আচার্যদেবের স্বদেশপ্রেমের গভীরতম পরিচয়ের ঝলক দেখতে পেয়েছিলাম। যে-কেউ তখন তাঁকে দেখলে তিনি বলতেন যেন স্বামীজী এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি পাঞ্জাবের সঙ্গে নিজেকে এতই অভিন্ন করে ফেলেছিলেন যে মনে হতো যেন তিনি ঐ প্রদেশের লোকের সঙ্গে বহু প্রেম ও ভক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যেন তিনি তাঁদের কাছে পেয়েছেন অনেক এবং দিয়েছেনও অনেক। কারণ, তাঁদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন যাঁরা পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলতেন যে, তাঁর মধ্যে তাঁরা গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের—তাঁদের প্রথম এবং শেষ গুরুর—অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন।"

পাঞ্জাব ও শিখগুরুরা স্বামীজীর কাছে কিরূপ শ্রদ্ধেয় ছিলেন তা তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথোপকথনে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন: "স্বামীজী আজ দুইদিন যাবৎ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা—প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামীজী ঐ বাটীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচজন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা, ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরু গোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া যাইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, ওজস্বিনী ভাষায় সেসকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরু গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেন:

সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউঁ॥

অর্থাৎ গুরু গোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষামন্ত্র) শুনিয়া এক ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরু গোবিন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রবণতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল।" উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় স্বামীজীর অন্তরে শিখধর্ম, শিখজাতি ও গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রতি কী অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। গুরু গোবিন্দের যে-বিষয়টি তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণ করত তা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত করে দেওয়ার ক্ষমতা। সেদিন শিষ্য স্বামীজীকে বলেছিলেন: এটি কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করে একই উদ্দেশ্যে চালিত করতে পেরেছিলেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় দেখা যায় না। স্বামীজী তার উত্তরে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর রাষ্ট্র ধর্ম ও সমাজচিন্তার গভীরতাই কেবল ফুটে ওঠেনি, তিনি সেদিন যে অসাধারণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা একথায় অসাধারণ। তিনি বলেছিলেন: "Common interest (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা) না হলে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest বা (স্বার্থ) এক না হয়। গুরু গোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরু গোবিন্দ common interest create করেননি, কেবল সেটা ইতর সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান—সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে প্রদত্ত 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি' বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি পাঞ্জাবের পবিত্র ভূমিকে ও তার মহান ইতিহাসকে বন্দনা করে বলেছিলেন যে, এই ভূমি "পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম" এবং মনু মহারাজের মতে এই ভূমি হচ্ছে 'ব্রহ্মাবর্ত'। এই পবিত্র ভূমিতেই বহু মনীষীর আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়েছে এবং তাঁদের মহান সিন্ধির প্লাবনে সমস্ত ভারত আর সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হয়েছে। বিচিত্র ধর্মের যেমন মহান সম্মেলন ঘটেছে বার বার এই ভূমিতে, তেমনি বিভিন্ন জাতি যখন বার বার ভারত আক্রমণ করেছে তখন সেই ভূমিতেই প্রথম রক্তপাত ঘটেছে এবং এখানকার মানুষেরা বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণকে বার বার প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবকে বিশ্বপ্রেমের মহান ক্ষেত্রভূমি বলে বর্ণনা করে বলেছেন: "এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া, বাহু প্রসারিত করিয়া, সমগ্র জগৎকে, শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদেরও আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজের প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়াছিলেন।..."

বক্তৃতার সূচনায় পাঞ্জাব এবং গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উদ্বেলিত কণ্ঠে উদাত্ত আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন: "হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখানে—আমাদের এই প্রাচীন দেশে—আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই। ...দেশের পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ভ্রাতৃগণের সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নয়—কোথায় আমাদের মিলনভূমি তাহাই অন্বেষণ করিতে। আমি আসিয়াছি ইহাই বুঝিতে কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সেই ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে বাণী অনন্তকাল আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে। তোমাদিগকে কিছু গড়িবার প্রস্তাব দিতেই আমি আসিয়াছি, ভাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়।" আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামীজী পাঞ্জাবের ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলছেন যে তিনি এসেছেন "গড়িবার প্রস্তাব দিতেই—ভাঙ্গিবার পরামর্শ দিতে নয়।" আজ স্বামীজীর এই মিলনের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার ও অন্বেষণের ব্যাপারটি দেশবাসীর সামনে সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরার দরকার। সমন্বয় ও মিলনের এই স্বর্ণসূত্রটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে—যিনি ছিলেন সমন্বয় ও সংহতির মূর্ত প্রতীক। সেদিন স্বামীজী সেই পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত শিখ-সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব ও শৌর্যবীর্যকে উপলক্ষ করে, শিখগুরুদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন: "যথেষ্ট সমালোচনা, যথেষ্ট দোষদর্শন হইয়াছে। আর নয়। এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে এবং সেই সমষ্টি শক্তির সহায়তায় বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। এখন বাড়ি পরিষ্কার হইয়াছে। ইহাতে নূতন ভাবে বাস করিতে হইবে। পথ পরিষ্কার হইয়াছে। আর্য সন্তানগণ, সম্মুখে অগ্রসর হও।"

আজ থেকে নব্বই বছর আগেকার স্বামীজীর এই উদাত্ত আহ্বান-বাণী আজকের ভারতবর্ষের পক্ষে যে কত জরুরী প্রয়োজন বর্তমানে আমরা তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। স্বামীজী ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিপুরুষ। তিনি ভারতবর্ষকে সেদিন আহ্বান করেছিলেন এক নূতন ভারতবর্ষে পদার্পণের।

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারাজের দর্শন লাভে আমি ধন্য হই। সেসময় আমি ছাত্র। একদিন আমি সংবাদপত্রে পড়লাম, মহারাজ মাদ্রাজে এসেছেন। কৃষ্ণমেনন (স্বামী ত্যাগীশানন্দ) এবং আমি তাঁকে প্রণাম করতে যাব স্থির করলাম। আমরা আগেই জানতাম যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। যেহেতু আমরা দূরে থাকতাম, সেজন্য মাদ্রাজের শহরতলী মায়লাপুর যাবার জন্য আমাদের শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। যেদিন তাঁর দর্শন পেলাম তার আগের দিন আমি তাঁকে পলকের জন্য দেখতে পেয়েছিলাম। সমুদ্রতীরে একটি ঘোড়ার গাড়িকে আমি দক্ষিণ দিক অভিমুখে যেতে দেখেছিলাম। গাড়ির আরোহীগণ গেরুয়া পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন। এদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই মহারাজ হবেন এইভেবে আমি গাড়ির পেছনে পেছনে যতদূর সম্ভব দৌড়ে গিয়েছিলাম। পরদিন মহারাজকে ঐ গাড়ির আরোহীদের মধ্যে অন্যতম বলে চিনতে পেরেছিলাম।

আমি ও কৃষ্ণমেনন মহারাজকে দর্শন করবার জন্য মায়লাপুরে গেলাম। আমাদের বলা হল উনি এক্ষুনি বারান্দায় আসবেন। আমরা একঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। এমন সময় একটি গাড়ি এসে সামনে থামল। তখন একজন রাজোচিত আকৃতির সাধু সাঙ্গপাঙ্গ সহ বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তিনি মহারাজ ছাড়া আর কেউ নন ভেবে নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম: "মহারাজ আমরা ছাত্র, আমরা আপনাকে দর্শন করতেই এসেছি।"

পরদিন আমি ও কৃষ্ণমেনন মহারাজকে দর্শন করবার জন্য মায়লাপুর গেলাম। আমাদের বলা হল উনি এক্ষুনি বারান্দায় আসবেন। আমরা একঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। এমন সময় একটি গাড়ি এসে সামনে থামল। তখন একজন রাজোচিত আকৃতির সাধু সাঙ্গপাঙ্গ সহ বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তিনি মহারাজ ছাড়া আর কেউ নন ভেবে নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম: "মহারাজ আমরা ছাত্র, আমরা আপনাকে দর্শন করতেই এসেছি।" তিনি মৃদু-মধুর কণ্ঠে বলেন: "তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে? তাহলে তো তোমাদের আর একদিন আসতে হয়।" আমরা বললাম: "পরের শনিবার আসব কি?" মহারাজ সম্মতি জানালেন।

পরের শনিবার আমি ও কৃষ্ণমেনন আবার মায়লাপুর গেলাম। অন্য অনেক দর্শনার্থী থাকায় আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে আমাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। আমাদের বসবার জন্য ঘরে মাদুর পাতাই ছিল। আমরা মহারাজের মধুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করলাম। কোন বাক্যালাপ না করে আমরা নীরবেই বসে রইলাম। মহারাজ তখন হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন: "তোমরা কি চাও?" আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের পথনির্দেশ চাই। মহারাজ তখন এমন অন্তর্মুখী ও ধ্যান-সমাহিত হয়ে ছিলেন যে আমাদের ভয় হতে লাগল, হয়তো আমরা তাঁকে বিরক্ত করছি। তিনি আমাদের বলেন: "সর্বদা সত্য বলবে এবং ব্রহ্মচর্য পালন করবে।" আমরা তখন বিখ্যাত পালোয়ান রামমূর্তির বক্তৃতায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করতাম। সেজন্য আমি বললাম: "আমরা প্রাণায়াম অভ্যাস করছি। মহারাজ, আমরা কি প্রাণায়াম করব?" মহারাজ বললেন: "না, প্রাণায়াম করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তোমরা ওসব এক্ষুনি ছেড়ে দাও। আমি যখন মুলতানে ছিলাম, একজনকে দেখেছিলাম যে ঐসব করতো, তার ফলে সে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তোমাদের প্রাণায়ামের প্রয়োজন

নেই। ঈশ্বরের নাম জপ করলেই তোমাদের যথেষ্ট হবে। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য হল শ্বাস-সংযম করা। সে-উদ্দেশ্য তোমরা জপ ও ধ্যান করলেই সিদ্ধ হবে। মনঃসংযোগ হলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হতে থাকে। তারপর স্বাভাবিকভাবেই শ্বাস-সংযম হয়।" আমি জানতে চাইলাম: "ভগবানের কি নাম জপ করব।" মহারাজ বললেন: "একদিন ভোরের আগেই এসো, আমি তোমাকে মন্ত্র বলে দেব।" আমি বললাম: "কোন দিন আসব?" মহারাজ একটুখানি চিন্তা করলেন। তারপর 'ঈশ্বর' নামধারী কাউকে ডাকলেন। একজন তরুণ ব্রহ্মচারী এলেন। মহারাজ তাঁকে বাঙলা-ভাষায় যেন কি বললেন। ব্রহ্মচারীটি একটি বই নিয়ে এলেন, দেখে মনে হল যেন পঞ্জিকা। মহারাজ আমাদের আসবার দিন তারিখ স্থির করে দিলেন। আমরা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মন্ত্র নেওয়া যে একটা অনুষ্ঠানিক ব্যাপার তা আমরা বুঝতেই পারিনি। একজন স্বামীজী আমাদের সঙ্গে খুব স্নেহের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমি পরে জানতে পেরেছিলাম তাঁর নাম স্বামী শঙ্করানন্দ। আমরা অপর একজন ব্রহ্মচারীর (পরে স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দের) সাক্ষাৎও পেলাম। তাঁর কাছেই আমরা সর্বপ্রথম 'দীক্ষা' কথাটি শুনলাম। তিনি বললেন মহারাজ আমাদের দীক্ষা দেবেন। মালাবারের লোক আমরা দীক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমরা ব্রাহ্মণও নই আর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধুদের সংস্পর্শে ইতিপূর্বে কখনো আসিওনি। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে মহারাজের স্থান কত উচ্চে সেকথা আমাদের বলা হয়েছিল। ব্রহ্মচারীটি বললেন যে, কিশোর বালকরূপে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখেন যে জগন্মাতা মহারাজকে তাঁর মানসপুত্র রূপে দেখিয়ে দিচ্ছেন। এই সকল কাহিনী আমাদের মনে তাঁর কাছে দীক্ষা লাভের জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি করল। কিন্তু কোন কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠানটি ঘটল না। এজন্য আমরা দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম। একদিকে পরীক্ষা এসে যাচ্ছিল, অপরদিকে মহারাজেরও মাদ্রাজ ত্যাগ করবার সময় এগিয়ে আসছিল। অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন আমি মহারাজের কাছে দীক্ষা লাভ করে কৃতার্থ হলাম। সেই দিনটি থেকে আমি নিয়মিত মঠে যেতাম, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ তখন শেষ হতে চলেছে। ততদিনে আমি অবনী-মহারাজের (স্বামী প্রভবানন্দের) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তিনি মাঝে মাঝে জানতে চাইতেন জীবনে আমার কি করার পরিকল্পনা, আমি তাঁকে বলেছিলাম: "মঠে যোগ দেব।"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমি মহারাজের চিঠি পেলাম যে তিনি শীঘ্রই দক্ষিণদেশে আসছেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্বামী প্রভবানন্দ আমাকে লিখলেন: "কলকাতায় দুজন তোমার বয়সী ছেলে সংসার ত্যাগ করেছে, তারা এখন মঠে রয়েছে। তোমার ব্যাপার কি?" তাতেই কাজ হল, আমি স্থির করলাম—বাড়ি ছাড়ব, এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল মঠে যোগদান করলাম। আমার বাড়ি ছাড়বার প্রধানতম আগ্রহ ছিল—মাদ্রাজে মহারাজের দর্শন পাব। কিন্তু তাঁর দর্শন পাবার জন্য আমাকে এক বছর অপেক্ষা করতে হল। যদি আমার ঠিক মনে থেকে থাকে, তাহলে তিনি পরের বছর মে মাসে মাদ্রাজে এলেন। এই সময় আমি বাংলা বেশ বুঝি এবং বাংলা কথাবার্তা শুনে উপকৃত হবার ক্ষমতা অর্জন করেছি। মহারাজ মাদ্রাজে এসে যে-আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করলেন, তা বর্ণনাতীত। ধর্ম সম্বন্ধে একটিও কথা না বলে তিনি শুধু তাঁর উপস্থিতির দ্বারা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন, তিনি ছিলেন যেন অধ্যাত্মশক্তির বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র। তাঁর স্বভাব ছিল অন্তর্মুখ হয়ে থাকা, অধ্যাত্ম বিষয়েও কথাবার্তা তিনি কম বলতেন। কিন্তু যখন তিনি কথা বলতেন, আধিকারিক পুরুষের ন্যায়ই বলতেন। আমি এরকম একটি ঘটনার সাক্ষী। মহারাজ সেদিন প্রায় দুঘণ্টা একাদিক্রমে কথা বলেছিলেন। তিনি একজন শিষ্যকে সেদিন কর্ম ও সাধনভজন সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং তার দ্বারা তার জীবনে সম্পূর্ণ এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিচ্ছিলেন।

মহারাজের শিক্ষাদান-প্রণালী অনন্যসাধারণ ছিল। অনেক সময় তাঁর শিক্ষাদান খুব কঠোর মনে হতো। অন্যদের চোখে তা হয়তো অকারণ মনে হতো। মহারাজ একবার কয়েকমাস ধরে একজন

নবীন সাধুকে এইভাবেই শিক্ষা দিচ্ছিলেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য মহারাজ এরকম করতেন। শিষ্যের অন্তরের ভাবকে তিনি এইভাবে শুদ্ধ করে দিতেন। শিষ্যটি তাঁর নির্দেশমতোই চলতে চাইছিল। কিন্তু মনে তার নৈরাশ্য আসছিল।

মহারাজের শিক্ষাদান-প্রণালী অনন্য-সাধারণ ছিল। অনেক সময় তাঁর শিক্ষাদান খুব কঠোর মনে হতো। অন্যদের চোখে তা হয়তো অকারণও মনে হতো। মহারাজ এক-বার কয়েকমাস ধরে একজন নবীন সন্ন্যাসীকে এইভাবেই শিক্ষা দিচ্ছিলেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য মহারাজ এরকম করতেন। শিষ্যের অন্তরের ভাবকে তিনি এইভাবে শুদ্ধ করে দিতেন।

পরিশেষে বারম্বার তিরস্কারে হতাশ হয়ে শিষ্যটি মহারাজকে বলল, সে মঠ থেকে চলে যাবে এবং দক্ষিণভারতের কোন তীর্থে গিয়ে তপস্যাদি করবে। মহারাজ তার এই পরিকল্পনায় খুব আগ্রহ দেখালেন, নিজেই কয়েকটি অনুকূল স্থানের নাম প্রস্তাব করলেন। দু-তিন সপ্তাহ পর একটি স্থান নির্বাচিত করা হল এবং মহারাজ তার যাত্রার জন্য একটি শুভ-দিন দেখে দিলেন। তখন প্রায় তিনটা হবে। মহারাজ একটি আরাম কেদারায় বসেছিলেন। যাবার জন্য শিষ্যটি তাঁর বিছানা ও অন্যান্য জিনিসপত্র বেঁধে তৈরি হয়ে মহারাজের নিকট বিদায় নিতে এল। আমার তার সঙ্গে স্টেশনে যাবার কথা। শিষ্যটি যখন তাঁর চরণে প্রণত হল, তখন তিনি বিপুল স্নেহের সঙ্গে বললেন: "তুমি কোথায় যাবে?... যাও শিবানন্দ স্বামীকে এখানে ডেকে আন।" শিবানন্দ স্বামী এলেন এবং মহারাজের খুব কাছে বসলেন। শিষ্যটি দরজার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্যটি ভাসছে—যেন এই গতকালের ঘটনা। স্বামী শিবানন্দকে মহারাজ বললেন: "দাদা দেখ, এই ছেলেটি এখান থেকে চলে গিয়ে তপস্যা করতে চায়। আমাদের ছেলেদের মন এভাবে কাজ করে কেন বুঝতে পারি না। এই মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কি জীবন যাপন করে গিয়েছেন, তিনিই তো পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর দিব্যজীবনের মধ্যে এই মঠ পুণ্যতীর্থ হয়ে রয়েছে। আর ছেলেরা সেই সুযোগ নেবে না? এই মঠের মতো আধ্যাত্মিক পরিবেশ এরা আর কোথায় পাবে? কথা হল এরা নিজের মন নিজেরাই জানে না।" মহারাজ তারপর শিষ্যটিকে বললেন: "তুমি যতক্ষণ মনে করছ ভগবান অন্য কোথাও আছেন, ততক্ষণ তোমার অশান্তি যাবে না। যখন তুমি জানবে তিনি এখানে আছেন (নিজ বক্ষঃস্থল দেখিয়ে), তখনই তুমি শান্তিলাভ করবে। এখানে সেখানে ঘুরে কি হবে? তুমি কি হাজার হাজার ভবঘুরে সাধু দেখনি? তুমি কি তাদের একজনের মতো হতে চাও? স্বামী বিবেকা-নন্দ এক মহান উদ্দেশ্যে এই সঙ্ঘ স্থাপন করে-ছিলেন। সেকথা চিন্তা করে নিজেকে গড়ে তোলবার চেষ্টা কর। তুমি এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কোথায় পাবে? একজনের তপস্যাই একটি মঠকে পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে পারে।

"দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর ছিলেন, তখন সেখান-কার সে কি আধ্যাত্মিক পরিবেশ। আমরা নৌকা করে গিয়ে সেখানে নামামাত্র মনে হতো আমরা যেন স্বর্গধামে এসেছি। আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে কি অসীম ভালবাসাই না ছিল। তোমাদের পরস্পর সে ভালবাসা নেই। সাধুর স্বভাব হবে মাধুর্যে ভরা, সে কখনও রূঢ় কথা বলবে না। আমার মনে পড়ছে বৃন্দাবনে আমি একজন সাধু দেখেছিলাম। তিনি নিয়মিত বিভিন্ন মন্দিরে দর্শন করতে যেতেন। একবার কয়েকদিন তিনি এলেন না। আমি তাঁর অনুপস্থিতি বেশ অনুভব করেছিলাম। কয়েকদিন পর যখন তিনি এলেন, আমি তাঁকে তাঁর অনুপ-স্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "আমার পায়ে একটি ক্ষত আছে, একদিন ভিড়ের মধ্যে সেই ক্ষতে একজনের পদস্পর্শ লাগে। আমি চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ি।" যেভাবে সাধুটি ঘটনাটি বর্ণনা করলেন তা আমার মনকে নিদারুণ-ভাবে স্পর্শ করল। পদদলিত হয়েছেন বলে সাধুটি কোন অভিযোগ করলেন না। তাঁর কাছে প্রত্যেক পা-ই যেন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম এবং তাঁর ভাব যেন ঈশ্বরই তার অঙ্গে পদস্পর্শ দিয়েছেন।

"যদি তোমরা সকলে মধুর স্বভাবের হও এবং অন্তরে তোমাদের প্রেম থাকে, তাহলে প্রত্যেকের সঙ্গে মিল হবে। ঈশ্বরকে তোমার ভালবাসার কেন্দ্র করতে হবে। সব সময় তো তুমি ধ্যান করতে পারবে না। এই মঠে স্বামীজীর কাজ করবার তোমাদের কত সুযোগ রয়েছে। সেই সকল কাজ আনন্দের সঙ্গে করবে। তা না করে তোমরা কেবল ঝগড়া-বিবাদ করে বেড়াচ্ছ। তোমরা যা করছ, কলকাতায় সত্যেন সেই একই কাজ করছে, কিন্তু তার ভাবটি ঠিক আছে। তোমরা তার মতো হবার চেষ্টা কর না কেন? এই তো তোমাদের সাধন করবার সময়।

তোমরা যে-অবস্থায় আছ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সাধনার পথে এগিয়ে যাও। সেই যে চন্দন কাঠ কাটতে গিয়েছিল তার কাহিনীটি তোমাদের কি মনে পড়ে না? থেম না, যতক্ষণ-না হীরের খনিতে পৌঁছাচ্ছো, ততক্ষণ এগিয়ে যাও। তুমি ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছ। তোমার অল্প বয়স, তুমি পবিত্র। তোমার সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনা। কেন তোমরা আমার উপদেশ নিতে পার না এবং ভালবাসতে শেখ না, আমরা যা করতে বলি, তা কেন কর না? স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মঠ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। আমরা ঐ সাধারণ ভবঘুরে সাধুদের থেকে কত আলাদা তা কি তোমরা দেখতে পাও না?

বুড়ো হলে কি আর কিছু করতে পারবে? হৃদয়ে প্রেম আনো, তাহলে সব পাবে। কেন তোমরা সকলে এত শুষ্ক হয়ে গেলে? মঠে যখন তোমরা প্রথম যোগ দিয়েছিলে, তখনকার সে প্রেরণা তোমাদের কোথায় গেল? তোমরা যে-অবস্থায় আছ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সাধনার পথে এগিয়ে যাও। সেই যে চন্দন কাঠ কাটতে গিয়েছিল তার কাহিনীটি তোমাদের কি মনে পড়ে না? থেম না, যতক্ষণ-না হীরের খনিতে পৌঁছাচ্ছো, ততক্ষণ এগিয়ে যাও। তুমি ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছ। তোমার অল্প বয়স, তুমি পবিত্র। তোমার সম্মুখে অনন্ত সম্ভাবনা। কেন তোমরা আমাদের উপদেশ নিতে পার না এবং ভালবাসতে শেখ না, আমরা যা করতে বলি, তা কেন কর না? স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই মঠ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। আমরা ঐ সাধারণ ভবঘুরে সাধুদের থেকে কত আলাদা তা কি তোমরা দেখতে পাও না? এ মঠ যদি ছেড়ে দাও তোমাকে খাওয়া পরার জন্য কত ভাবতে হবে একবার ভেবে দেখো দিকি?"

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ উক্তি উদ্ধৃত করলেন: "মনমুখ এক কর।" শিষ্যটি তখন বলল: "মহারাজ আপনি আমাদের এই সব করতে বলছেন। কিন্তু আপনি কেন আমাদের সাহায্য করছেন না? ঠাকুর তো আপনাদের সব করে দিয়েছিলেন। আমরা যে দুর্বল মানুষ।" মহারাজ তখন আবেগের সঙ্গে বললেন: "তুমি কি মনে কর যে আমরা তোমাদের জন্য কিছু করছি না? আমরা যে-সাহায্য তোমাদের করতে চাচ্ছি তোমরা কি তা নিচ্ছ? দিনের মধ্যে তুমি কবার ধ্যানজপ কর? তুমি কি সবসময় তোমার মনকে ঈশ্বরের স্মরণ-মননে নিযুক্ত রেখেছ? ঠাকুরের কথা মনে রেখ, 'একহাতে ভগবানের চরণ ধরে থাকবে, অন্য হাতে কর্ম করবে'। উপাসনার বুদ্ধিতে কর্ম করলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে।" সেই শিষ্যটিকে সম্বোধন করে যে-কথাগুলি তিনি বলেছিলেন তা তখন উপস্থিত প্রত্যেকের মনেই চিরস্থায়ী রেখাপাত করেছিল। কিন্তু যখন মহারাজ কথা বলছিলেন, তখন যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুমাত্রও ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।*

*মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ: সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

একটি হরিনামের হাটবাজার

স্বামী প্রভানন্দ

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হরিনামের হাটবাজার। কেনাবেচা কোথাও কম, কোথাও বেশি। বড় ব্যবসায়ী বা খদ্দেরের উপস্থিতিতে হাটবাজার কখন কখন বেশি তেজী হয়ে ওঠে। বড় বড় লেনদেন হতে থাকে। বিশেষতঃ শ্রীহরি যখন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে উপস্থিত হন হাটবাজারে। উত্তর চব্বিশ পরগনার পেনেটি বা পানিহাটি এমন একটি হরিনামের হাটবাজার। কয়েকশ বছরের পুরনো হাটবাজার। শ্রীহরি মানুষের বেশ ধারণ করে বারংবার উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। অকাতরে প্রেম বিতরণ করেছেন। হরিনামসুধা দিয়ে জনসাধারণকে মাতিয়েছেন।

প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায় হালিশহর, খড়দহ, পানিহাটি, দক্ষিণেশ্বর, চিৎপুর থেকে আরম্ভ করে কালীঘাট, বোড়াল, বারুইপুর, বহড়ু-ময়দা, জয়নগর, বড়াগী, মাধবপুর, ছত্রভোগ পর্যন্ত ভাগীরথী ও আদিগঙ্গার তীরবর্তী জঙ্গলের মধ্যে ও শ্মশানে ছিল বামাচারী তান্ত্রিক উপাসক, কাপালিক ও নাথপন্থী শৈব যোগীদের শক্তিসাধনার ক্ষেত্র ও আস্তানা।[১] শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এই অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল ব্যাপক পরিবর্তন।

ভাগীরথীর তীরে পাশাপাশি দুটি গ্রাম পানিহাটি আর খড়দহ যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ রাঘবপণ্ডিত ও প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। অবশ্য খড়দহ যখন বনজঙ্গলে ঢাকা, পানিহাটি তখন দেবদেউলে পরিপূর্ণ। রাঘব-পণ্ডিতের বসবাসের বহু পূর্ব থেকেই পেনেটি একটি প্রধান বাণিজ্যস্থানরূপে পরিচিত। সে সময়ে এর নাম ছিল পণ্যহাটি। পণ্ডিতদের মতে পণ্যহট্ট বা পণ্যহট্টের অপভ্রংশ পানিহাটি বা পেনেটি। বহুবিধ দ্রব্যের কেনাবেচা হতো এখানে। অবশ্য পেনেটির গর্বের পণ্য ছিল শিঙের চিরুনী।[২] কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য শুকিয়ে যায়। বাণিজ্যকেন্দ্র অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে বিকাশ লাভ করে একটি ধর্মকেন্দ্র। উদ্ভূত হয় নতুন তীর্থ। গড়ে ওঠে হরিনামের হাটবাজার।

রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষে মহারাজা চন্দ্রকেতু পেনেটিতে একটি বিশাল গড় নির্মাণ করেছিলেন। গড়ের ভিতর ছিল মা ভবানীর মূর্তি। রাজার তৈরি পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন এখনও দেখা যায়।[৩] বেড়াচাপা-দেগঙ্গা থেকে পেনেটি পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তাটি মহারাজের একটি স্মরণীয় কীর্তি। রাজা বল্লাল সেনের সময়ও পেনেটি ছিল একটি জনবহুল গ্রাম। হোসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হয়ে শাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং পেনেটিতে একজন কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ সেসময়ে পেনেটি একটি মহকুমার মর্যাদা লাভ করেছিল।[৪]

কলকাতার ১৫ কিঃ মিঃ উত্তরে পেনেটি। এর দক্ষিণে আগরপাড়া, পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে সুখচর ও পূর্বে সোদপুর। পেনেটির উপর দিয়ে গিয়েছে তিনটি বড় রাস্তা—সর্বাধুনিক ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, মুর্শিদাবাদ রোড বা পুরনো রাস্তা ও রাজা রামচাঁদ ঘাট থেকে বারাসত বেড়াচাপা বসিরহাট টাকি ইত্যাদিতে সম্প্রসারিত রাস্তা। কাপড়ের কল, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা, লোহার কারখানা, রবার ও চীনামাটির কারখানা নিয়ে ইদানীং গড়ে উঠেছে একটি শিল্পনগর। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়েছে স্বতন্ত্র পৌরসভা।

কয়েকশ বছর পূর্বে পেনেটিতে প্রথম বসেছিল

১ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ (১৯৫৭), পৃঃ ৬৩৭

২ পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা—সম্পাদক ঃ অশোক মিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০২ ;
A Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter, Vol. I, p. 34 & p. 170

৩ উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত—কমল চৌধুরী (১৮৯৭), পৃঃ ১০৮

৪ শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত—শিশিরকুমার ঘোষ, ১ম খণ্ড, উপক্রমণিকা

হরিনামের হাটবাজার। সে সময় থেকে নির্দিষ্ট দিনে প্রতিবছরই হাটবাজার বসে। জমায়েত হয় হাজার হাজার মানুষ, প্রত্যেকেই সাধ্যমত সওদা করে। এই হাটবাজারের ইতিহাস বিচিত্র। তার কাহিনী মধুর।

পেনেটিতে শ্রীচৈতন্যের প্রবীণ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের পাটবাড়ি। চৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে 'রাঘব পন্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর'।[৫] শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা[৬] অনুসারে রাঘব বৃন্দাবন-লীলায় ছিলেন ধনিষ্ঠা সখী। বর্তমানে রাঘবের পাটে রাঘব-পূজিত মদনমোহন, রঘুনাথ গোস্বামী বংশের পূজিত রাধারমন এবং মহাপ্রভু চৈতন্য ও প্রভু নিত্যানন্দের নিত্যপূজা হয়। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে মালতীকুঞ্জে ঘেরা রাঘবপণ্ডিতের সমাধি-বেদী। রাঘব-ভগিনী দময়ন্তী শ্রীচৈতন্যের জন্য বারমাসের আচার, মসলা ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতেন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময় রাঘবের ঝালিতে করে সেসব পুরীতে নিয়ে যেতেন ভক্ত মকরধ্বজ কর। সঙ্গে যেতেন রাঘব স্বয়ং। ইদানীং 'রাঘবের ঝালির'[৭] স্মৃতি সংরক্ষিত হয়েছে ঐ প্রাঙ্গণে একটি সংগ্রহশালায়। তাছাড়াও শ্রীচৈতন্যের শিষ্যদের মধ্যে মোহন ঠাকুর, পুরন্দর পণ্ডিত ও কাশী মিশ্রের বাস ছিল পেনেটিতে।

ভাগীরথীর তীরে দাঁড়িয়ে একটি বটগাছ। আনুমানিক সাতশ বছরের পুরনো। এই গাছ আশ্রয় করেই নদীর দিকে বেড়ে উঠেছে একটি অশ্বত্থ-গাছ। মূল গাছটি বেষ্টন করে বাঁধানো বেদী। বাৎসরিক একাধিক মহোৎসবের পাদপীঠ মহোৎসবতলা নামে পরিচিত। সেখান থেকে নদীতে নেমে গেছে পূর্বেকার প্রশস্ত ও বর্তমানের সংস্কৃত সংকীর্ণ গৌরাঙ্গ ঘাট। এ-ঘাটেই অবতরণ করেছিলেন বাংলার দুই চাঁদ, শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) ও শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬)। দক্ষিণে ইদানীং সংস্কৃত প্রশস্ত রাজা রামচাঁদ ঘাট। রামচাঁদের গুরুবংশের বাস ছিল পেনেটিতে। গুরুর আদেশে রামচাঁদ এই ঘাট তৈরি করেছিলেন। আর উত্তরে সেনদের ঘাট। ঘাট দিয়ে উঠেই সেনদের বাড়ি।

অপর একটি বটগাছের নিচে বৃন্দাবনের চৌষট্টি মোহান্তের সমাজের অনুকরণে গড়ে উঠেছে একটি সমাধি মন্দির। মহোৎসবতলার কিছুটা উত্তরে শোভা পাচ্ছে নন্দলাল দাঁ প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দির সেখানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগদ্ধাত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য নৃত্যগোপাল (পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত)-এর জন্মভিটার উপর গড়ে উঠেছে কৈবল্য মঠ। এখানকার রায়চৌধুরী বাড়ির রাসোৎসবের খ্যাতি সুপ্রচারিত। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে পাওয়া যায় ১২৩৭ সনে রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী আয়োজিত রাসোৎসবের বিবরণ।

প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে ভাগীরথীর দুকূল প্লাবিত হয়েছিল গৌরপ্রেমে। হরিনামে মুখরিত হয়েছিল বাঙলার হাটবাট। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পঞ্চম বছরে অর্থাৎ ১৪৩৬ শকাব্দের শারদীয়া বিজয়াদশমীর দিন (২৮ সেপ্টেম্বর ১৫১৪)[৮] কয়েকজন পার্ষদ নিয়ে নীলাচল থেকে যাত্রা করেছিলেন। উদ্দেশ্য 'জননী ও জাহ্নবী' দর্শন। 'অষ্টাদশ দিবসে' পিছলদা থেকে নৌকায় করে সে-দিনই, কার্তিকী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে, পেনেটির ঘাটে অবতরণ করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। কবি কর্ণপুর তাঁর 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়ম্' নাটকে বর্ণনা করেছেন:

যাবদ্দেবো ন সুরসরিতস্তীরসীমানমাপ্ত
স্তাবৎ সর্বং জনময়মভূদ্দিগন্ত কিং তদ্‌ব্রবীমি।[৯]

অর্থাৎ যেই শ্রীচৈতন্য গঙ্গার তটপ্রান্তে পৌঁছলেন অমনি দশদিক অকস্মাৎ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এ আশ্চর্য ব্যাপার কি আর বলব। পরবর্তী ঘটনার

৫ আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ ৬ ঐ, পৃঃ ১১৬

৭ 'রাঘবের ঝালির' বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, 'রাঘবপণ্ডিত' চলিলা ঝালি সাজাইয়া, / দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥'

৮ চৈতন্যদেব—সুখময় মুখোপাধ্যায় (১৯৮৪), পৃঃ ১০

৯ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্—কবিকর্ণপুর গোস্বামী: মণীন্দ্রনাথ গুহ অনূদিত, ১৩৭৮, পৃঃ ৩৫৮



রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে মদনমোহন।



মণি সেনের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ।



রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে মদনমোহনের মন্দির। বাঁদিকে রাঘব পণ্ডিতের সমাধি।



শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণধন্য রামচাঁদ ঘাট (গঙ্গা থেকে দৃশ্য)



শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূত মহোৎসবতলা।



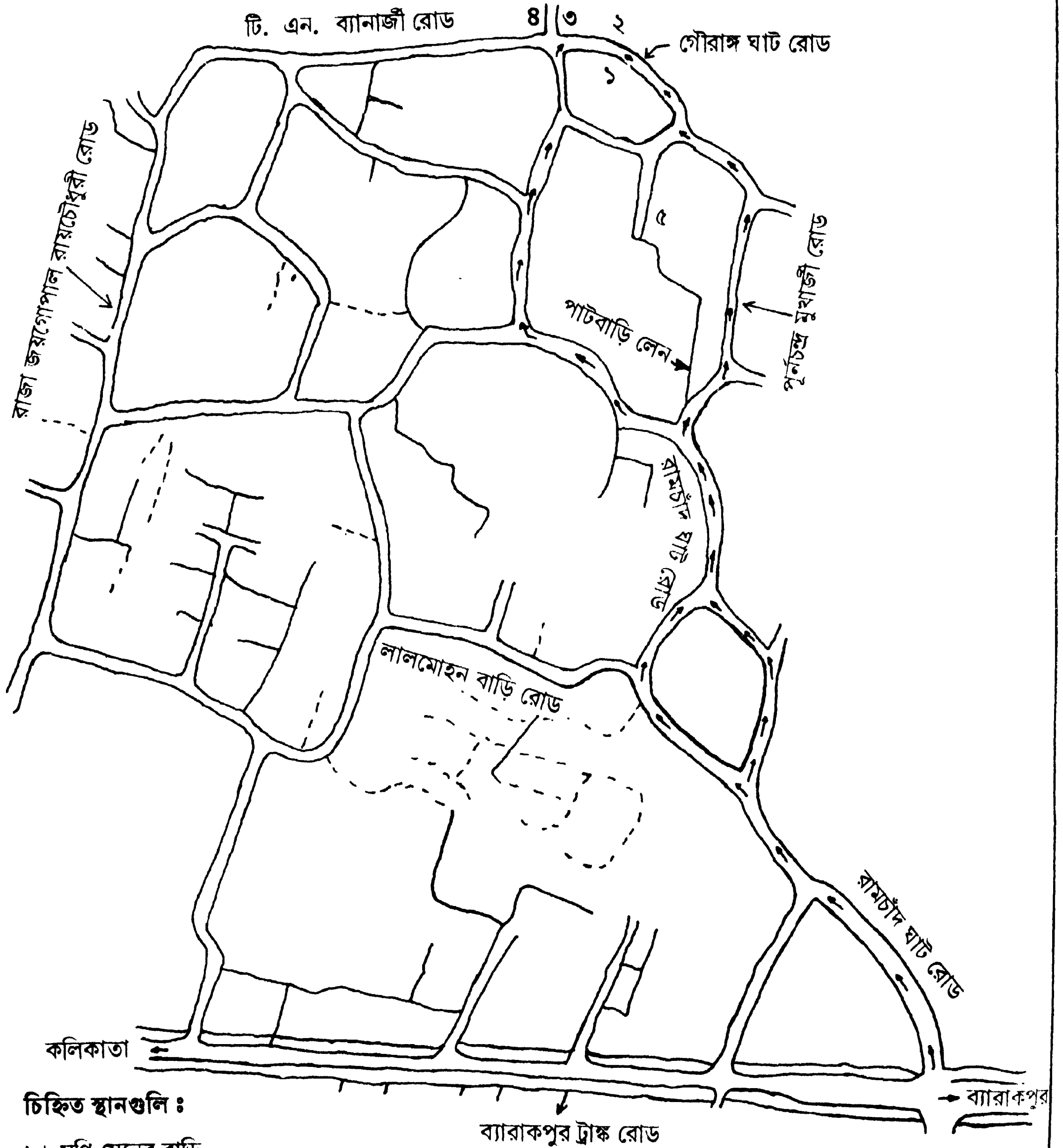
মণি সেনের বাড়ির উঠান যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার সংকীর্তন ও নৃত্য করেছেন। সম্মুখে রাধাকৃষ্ণের

পানিহাটি

স্কেল ১ ঃ ৫০০০

উঃ

হুগলী নদী/গঙ্গা



চিহ্নিত স্থানগুলি ঃ

১। মণি সেনের বাড়ি

২। সেনদের ঘাট

৩। গৌরাঙ্গ ঘাট

৪। রামচাঁদ ঘাট

৫। রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি

বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ থেকে তুলে ধরা যাক ঃ

রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড় কষ্টসৃষ্টে আইলা ॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে[১০] যাইলা যাহা শ্রীনিবাস ॥

শ্রীচৈতন্যের এখানে অনুষ্ঠিত প্রেমোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায় বৈষ্ণবসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে। শ্রীচৈতন্যের পেনেটিতে পদার্পণের দিনটি ছিল রবিবার। প্রাগুক্ত তিথি রবিবার না হলে পরবর্তী রবিবারে উদযাপিত হয় মহাপ্রভুর স্মরণোৎসব। প্রায় সত্তর বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই উৎসব ও একদিনের মেলা।

চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের শেষ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা কিছুটা ভিন্ন। 'চৈতন্যচরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস' কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বগামী। চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল ১৫৭৫-৭৬ খ্রীঃ, চরিতামৃতের ১৬১৫-১৬ খ্রীঃ। বৃন্দাবন-দাসের মতে শ্রীচৈতন্য গৌড়দেশ থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনকালে পেনেটিতে শুভাগমন করেছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আষাঢ় ১৪৩৭ শকাব্দ (জুন ১৫১৫)। কুমারহট্টে শ্রীবাসমন্দিরে কিছুদিন বাস করে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হয়েছিলেন পেনেটিতে। রাঘবপণ্ডিত দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন ঃ

হেনমতে পানীহাটী* গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি ॥

পেনেটিতে রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তীর আতিথ্যে পরিতৃপ্ত শ্রীচৈতন্য মন্তব্য করেছিলেন ঃ

গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব-আলয় ॥

উপরোক্ত দুটি প্রামাণিক আকর-গ্রন্থের ভিত্তিতে কেউ কেউ দাবী করেছেন শ্রীচৈতন্য দু-দুবার পেনেটিতে পদার্পণ করেছিলেন,[১১] অপরেরা বলেছেন, এ-দুটি একই ঘটনার দুপ্রকার বিবৃতি। কিন্তু সকলেই একমত যে, শ্রীচৈতন্য পেনেটিতে যে প্রেম-প্রবাহ এনেছিলেন তাতে তুফান উঠেছিল প্রভু নিত্যানন্দের (১৪৭৩—১৫৪৫)[১২] উপস্থিতিতে। ১৪৩৮ শকাব্দে প্রভু নিত্যানন্দ পেনেটিতে একনাগাড়ে

কেউ কেউ দাবী করেছেন শ্রীচৈতন্য দু-দুবার পেনেটিতে পদার্পণ করেছিলেন, অপরেরা বলেছেন এ-দুটি একই ঘটনার দুপ্রকার বিবৃতি। কিন্তু সকলেই একমত যে, শ্রীচৈতন্য পেনেটিতে যে প্রেমপ্রবাহ এ নেছিলেন তাতে তুফান উঠেছিল প্রভু নিত্যানন্দের উপস্থিতিতে। প্রভু নিত্যানন্দ পেনেটিতে একনাগাড়ে তিনমাস হরিকীর্তনবিলাস করেছিলেন।

তিনমাস হরিকীর্তনবিলাস করেছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতসূত্রে পাওয়া যায় ঃ

এইরূপে পানীহাটী গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহধর্ম তিলার্ধের কারো নাহি স্ফুরে ॥

প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদ রাঘব-আলয়ে বাস করে-ছিলেন তিন মাস। নৃত্য ও নাম-সংকীর্তনে রচিত হয়েছিল দ্বিতীয় নবদ্বীপ। একদিন রাঘবের বিষ্ণু-খট্টায় বসে প্রভু নিত্যানন্দ অভিষেক-লীলা করেছিলেন। সেদিন দেখা গিয়েছিল "জাম্বিরের (টাবা নেবু) বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।" অকস্মাৎ পাওয়া গেল দমনক ফুলের সুগন্ধ। নিত্যানন্দ পার্ষদদের বুঝিয়ে বললেন ঃ

তোমা সবাকার নৃত্য-কীর্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥

এ-কথায় উপস্থিত সকলের প্রাণে শিহরণ জাগে। এভাবে তিন মাস 'জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।/সর্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥' হরিনাম তরঙ্গ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ভক্তির মলয় বইতে থাকে ভাগীরথীর দুই তীরে। সপ্তগ্রামের রাজকুমার

১০ কুমারহট্ট বর্তমানে হালিশহর নামে পরিচিত।

১১ 'শ্রীমৎ রাঘবপণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটি মাহাত্ম্য' অমূল্যধন রায়, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ১৩২২, পৃঃ ২৮০

* বর্তমান বানান 'পানিহাটি', প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে 'পানীহাটী' বানান দেখা যায়।

১২ চৈতন্যদেব—সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬—৫৮

দাস রঘুনাথ (১৪৯৫—১৫৮৫ খ্রীঃ) ছুটে আসেন পেনেটিতে। আত্মসমর্পণ করেন প্রভু নিত্যানন্দের চরণে। সেদিনটি ছিল ১৪৩৮ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের বর্ণনা :

পানীহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্যোদয় করে ॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কত দূরে।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ॥

রঘুনাথের চোর অপবাদের বিবিধ ব্যাখ্যা। গোঁড়া বৈষ্ণবদের মতে শ্রীগৌরসুন্দর নিতাইচাঁদের সম্পত্তি। নিতাইচাঁদ কৃপা করে যাকে সুযোগ দেন সে-ই শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয় পায়, অন্যে নয়। রঘুনাথ নিতাইচাঁদের অজ্ঞাতে দুবার শান্তিপুরে এবং একবার নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের সান্নিধ্যকৃপা লাভ করেছিলেন। এটা রঘুনাথের পক্ষে নিত্যানন্দের ধনচুরির সামিল।[১৩] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, রঘুনাথ সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়েও আসক্তির ভান করেছিলেন। এই মিথ্যাচরণের জন্য নিত্যানন্দ তাঁকে বলেছেন চোর।[১৪] অপরমতে, রঘুনাথ লুকোচুরি করে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের দর্শন-স্পর্শন করছিলেন, সে-কারণে তাঁর 'চোর' আখ্যা।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলার সর্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র সপ্তগ্রাম। গৌড়ের পাঠান বাদশাহ হিরণ্য ও গোবর্ধন এই দুই ভাইকে সপ্তগ্রাম ইজারা দিয়েছিলেন। তাঁরা গৌড়াধিপতিকে বার্ষিক রাজস্ব দিতেন আট লাখ টাকা। রাজস্ব ছাড়াও দু ভাইয়ের বাৎসরিক আয় ছিল ১২ লাখ টাকা। হিরণ্য ছিলেন অপুত্রক। গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ ছিলেন এই বিপুল বৈভবের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি আশৈশব সংসার-বিরাগী। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তিনি বিয়ে করে নিরাসক্তভাবে সংসার করছিলেন। আজ তিনি স্বাভাবিক আকর্ষণেই ছুটে এসেছেন প্রভু নিত্যানন্দের নিকট। নিত্যানন্দ চোরের দণ্ড দিলেন। নিত্যানন্দের কৃপামধুর শাসনে উল্লসিত রঘুনাথ দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন :

দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে ॥
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিগে ধরিলা ॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন ॥

বড় বড় গামলায় চিঁড়া ভেজান হল। কিছু চিঁড়া মাখা হল দই চিনি কলা দিয়ে। বাকি চিঁড়াতে দেওয়া হল ঘন দুধ, চাঁপাকলা, চিনি, ঘি ও কর্পূর। উঁচু বাঁধানো স্থানে বসেন নিত্যানন্দ। তাঁর আশ-পাশে বসেন রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজন ও আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। অন্যান্য লোক মাটিতে 'মণ্ডলী-বন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে।' স্থান অকুলান হওয়াতে কিছু লোক গেল গঙ্গার তীর-ভূমিতে। প্রত্যেককে দেওয়া হল দুটি মালসা—একটিতে দৈ চিঁড়া, অপরটিতে দুধ-চিঁড়া। বিশজন পরিবেশন করতে থাকে। পরিবেশন হতেই নিত্যানন্দ এক দিব্যলীলা করেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন : সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।/ধ্যানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনিল ॥" নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করে সকলের চিঁড়া দেখাতে লাগলেন। নিত্যানন্দ পরিহাসপূর্বক প্রত্যেক মালসা থেকে এক এক গ্রাস মহাপ্রভুর মুখে দিলেন। তিনিও সহাস্যে এক এক গ্রাস নিত্যানন্দের

১৩ রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩য় সং, পৃঃ ২৭৪

১৪ বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২৩। ডঃ সেনের মতে রঘুনাথ একমাত্র শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

মুখে দেন। কোন কোন ভাগ্যবান বৈষ্ণব ভাবচক্ষে দেখেন এই প্রেমলীলা। অতঃপর নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু পাশাপাশি দুই আসনে বসে চিঁড়া খান। তখন নিত্যানন্দের আদেশে 'হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন। / হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন॥' ভক্তদের মনে হল তারা যেন যমুনা-পুলিনে শ্রীহরির সঙ্গে 'পুলিন-ভোজন' করছেন। পেনেটি মনে হল বৃন্দাবন। এদিকে দোকানপাট বসে গিয়েছিল, বেচাকেনা হচ্ছিল। প্রভু নিত্যানন্দের প্রসাদ ধারণ করে রঘুনাথ ধন্য হন।

সেদিন সন্ধ্যায় রাঘব-পণ্ডিতের বাড়িতে বসে হরি-সংকীর্তনের আসর। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন: 'ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়। / শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়।…নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে। / মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥' ভোজনের ব্যবস্থা হয়। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ পাশাপাশি বসে ভোজন করেন। অতঃপর 'ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন। / হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥' পরদিন প্রাতে বটতলায় সপার্ষদ নিত্যানন্দের নিকট রঘুনাথ প্রার্থনা করেন, 'মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়।' তাঁর আকুতি দেখে প্রভু নিত্যানন্দ তাঁর মাথায় চরণ স্থাপন করেন। আশীর্বাদ করেন, 'অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ।' নিত্যানন্দের আজ্ঞা নিয়ে রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে রঘুনাথ সকলকে প্রণামী দেন। প্রভু নিত্যানন্দকে প্রণামী দেন সাত তোলা সোনা ও একশ টাকা, রাঘব পণ্ডিতকে দুই তোলা সোনা ও একশ টাকা। প্রভুর 'ভৃত্যাশ্রিত জন' প্রত্যেকে পান কুড়ি থেকে দু টাকা। রঘুনাথ ফিরে যান সপ্তগ্রামে। এবং অনতিকাল পরেই চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় লাভ করেন।

পূর্বোক্ত মহোৎসবে প্রভু নিত্যানন্দ ভাবাবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন: 'গোপজাতি আমি বহু গোপ-সঙ্গে। / আমি সুখ পাই এ পুলিন ভোজন রঙ্গে॥' ব্রজলীলায় সকল রাখালগণকে নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম একদিন যমুনা-পুলিনে ভোজন করেছিলেন। বলরামের ভাবে আবিষ্ট নিত্যানন্দের ব্রজ-লীলার স্মৃতি জাগরূক হয়েছিল। সে-ব্রজলীলার পুনরাভিনয় স্মরণ করে এবং দাস রঘুনাথের ন্যায় ভগবৎপ্রসন্নতালাভের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তগণ প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে সমবেত হয় মহোৎসবতলায়। রাঘব পণ্ডিত আজীবন এই মহোৎসব আয়োজন করেছিলেন বলে এই মহোৎসবের বিকল্প নাম 'রাঘব পণ্ডিতের চিড়ার মহোৎসব', সংক্ষেপে 'চিঁড়ার মহোৎসব।'

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অবারিত অনাবৃত করুণার ধারায় অভিষিঞ্চিত পেনেটি ভাব-ভক্তির কুণ্ড। কয়েকশ বছর ধরে শতসহস্র ভক্তিপিপাসু এই কুণ্ডের বারি পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছে, শান্তিলাভ করেছে। যুগ যুগ ধরে বৈষ্ণব মহাজনদের সেবায় পেনেটি হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ গেয়েছেন: 'পানীহাটী সম গ্রাম নাহি গঙ্গা-তীরে।/বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে॥' বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি প্রধান পাদপীঠরূপে স্বীকৃত পেনেটির পাট।

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অবারিত অনাবৃত করুণার ধারায় অভিষিঞ্চিত পেনেটি ভাবভক্তির কুণ্ড। কয়েকশ বছর ধরে শতসহস্র ভক্তিপিপাসু এই কুণ্ডের বারি পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছে, শান্তিলাভ করেছে। যুগ যুগ ধরে বৈষ্ণব মহাজনদের সেবায় পেনেটি হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ গেয়েছেন: 'পানীহাটী সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।/ বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে॥' বৈষ্ণবসংস্কৃতির একটি প্রধান পাদপীঠরূপে স্বীকৃত পেনেটির পাট।

শ্রীচৈতন্যোত্তর কয়েকশ' বছরে মহোৎসবতলার ঘাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কত জল, পরিবর্তিত হয়েছে ভৌগোলিক পরিবেশ, পালটেছে রাজনৈতিক পট, ঘটেছে সামাজিক বিবর্তন। জনবসতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লোক-সংখ্যা ছিল চার হাজার, বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৬ হাজার। সবুজে সাজানো প্রকৃতির শান্ত নীড় জনমুখর শহরে পরিণত হয়েছে। ঊনিশ শতকে ইংরেজ-ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার ঢেউ

পেনেটির ঘাটে আছড়ে পড়েছিল। রায়চৌধুরী বাড়ির রাসোৎসবে সাহেববিবির আনাগোনা, সাহেবি খানাপিনা ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে সচকিত করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই, এসকল ঝড়ঝাপটায় এখানকার ভাব-ভক্তির ধারা কতকাংশে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে-ভাবধারায় পুনরায় জোয়ার এসেছিল শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সম্মিলিত রূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। প্রেমপাথার শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবভক্তির সুধা দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ বলেছে 'পানীহাটী গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ।' সে ভাববৈচিত্র্যে সংযোজিত হয়েছিল নতুন একটি মাত্রা। সর্বভাবগ্রাহী শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্প্রদায়িক গন্ডী ভেঙে দিয়ে পেনেটিকে করেছিলেন একটি মহামিলন তীর্থ। নিঃসন্দেহে, পেনেটির উনিশ শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

পেনেটির মহোৎসবে বছরে বছরে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পুণ্যভূমি পেনেটির আবেষ্টনীতে শতধারায় উপচে পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবনির্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণবপুতে ভাব মহাভাবের প্রদর্শন পেনেটির উৎসবভূমিকে মহিমান্বিত করে তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণমাতানো নৃত্য ও সংকীর্তন দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ভাবের আবিলতাসকল ভাসিয়ে দিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সমাগত ব্যক্তিদের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেনঃ "আমরা অনেক সংকীর্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি, অনেক জ্ঞানী সাধকও দেখিয়াছি, অনেক সুপন্ডিত ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গায়ক দেখিয়াছি, অনেক লয়-মান-সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সংকীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা তাঁহার হরিনাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিয়াছেন। হরিভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা সেই সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে পুলকিত হইতেন, এ-কথা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা তমোগুণের আকর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন না, ভক্তিপ্রীতি যাঁহাদের মধ্যে লেশমাত্র ছিল না, যাঁহাদের হৃদয় শূন্য বা লৌহময় বলিলেও বলা যাইত, যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরোধে রাজপথে, সাধারণ স্থানে ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে নৃত্যাদি করা অসভ্যতার লক্ষণ জ্ঞান করিতেন, যাঁহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাঁহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয়া সংকীর্তনে নৃত্য করিয়াছেন।"[১৫]

প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "সংকীর্তনমধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন। চতুর্দিকে হরিধ্বনি সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হরির লুট হইতেছে।"

গণবিমোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বিস্মিত ও পুলকিত হতো সকল শ্রেণীর মানুষ। শ্রীগৌরাঙ্গস্মৃতিপূত উৎসবক্ষেত্রে নবগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে সকলের প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠত। স্বভাবতই নিয়তগামী তীর্থযাত্রীগণ, বিশেষতঃ স্থানীয় মানুষ প্রতিবছর তাঁর উপস্থিতি সাগ্রহে অপেক্ষা করত।

জীবনীকার শশিভূষণ ঘোষের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটির মহোৎসবে সর্বপ্রথম যোগদান করেছিলেন ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে (১৮৬৮ খ্রীঃ), জীবনীকার স্বামী সারদানন্দের মতে ১২৬৫ সালে। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিচার করে আমরা দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য মনে করেছি। সে-বৎসর 'দন্ড-মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৃহস্পতিবার, ১১ আষাঢ় ১২৬৫, ২৪ জুন ১৮৫৮। শ্রীরামকৃষ্ণের পেনেটির মহোৎসবে যাওয়ার ইচ্ছা জানতে পেরে তাঁর রসদ্দার মথুরমোহন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করেছিলেন। খুবই সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকায় চড়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে পেনেটি গেছিলেন। সঙ্গী ছিলেন ভাগ্নে হৃদয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য মথুরমোহন ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লাঠিয়াল, দারোয়ান মোতায়েন করেছিলেন। দন্ড-মহোৎসব জমে উঠেছিল, জনসাধারণ মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে উদ্বেলিত;

১৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত, পৃঃ ৬৮-৬৯

সেসময়ে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় অপর একটি আনন্দোৎব—শ্রীগৌরাঙ্গভাবে ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য ও ভাবসমাধি দেখে জনসাধারণ সহস্রকণ্ঠে হরিধ্বনি দিতে থাকে।

সেদিনই মণি সেনের বাড়িতে ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সিদ্ধসাধক বৈষ্ণবচরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মিলন ঘটে। বৈষ্ণবচরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে "আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ" বলে চিনতে পারেন। বৈষ্ণবচরণ পাঁচ টাকা ব্যয়ে চিঁড়া মুড়কি আম কিনে মালসাভোগ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আনন্দ করেন। জীবনীকার গুরুদাস বর্মনের মতানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়ায় কিছুই খেতে পারেননি। কলকাতায় ফেরার পথে[১৬] বৈষ্ণবচরণ পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নেমেছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও ঠাকুর ফেরেননি জানতে পেরে ক্ষুণ্ণমনে চলে গেছিলেন।

মণি সেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুগৃহীত। ১৬ জুলাই ১৮৭১ তারিখে মথুরমোহনের মৃত্যুর পর এবং শম্ভুচরণ মল্লিকের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মণি সেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগাবার ভার নিয়েছিলেন।[১৭] সেন পরিবারে[১৮] রয়েছে ৺রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা। প্রায় তিন ফুট পৈঠার উপর দোতলা বাড়ি। নিচতলায় বৈঠকখানা। তার দক্ষিণ দিকে সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই একটি প্রাঙ্গণ। সম্মুখে মন্দির। তিন অংশে বিভক্ত। মধ্যভাগে গৌরনিতাই, দক্ষিণে রাধাকৃষ্ণ এবং উত্তরে রেবতী-বলরাম। তাছাড়াও বেদীতে আছেন জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম, নারায়ণশিলা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। ইদানীং বাড়ির শীর্ষে শোভা পাচ্ছে 'ওঁ / অমৃততীর্থ / সর্বধর্মে এক ভগবান।' বলাবাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই সেনবাড়ির এই তিলকধারণ।

সেসময় থেকে প্রতি বছর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটির মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। এঅভিমত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত এবং স্বামী অভেদানন্দের। কথামৃতের মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্ততঃ দুবার পেনেটির মহোৎসবে যোগদান করলেও শুধুমাত্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহোৎসবে যোগদানের বিবরণ উপহার দিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য : "ঠাকুর প্রতি বৎসরই প্রায় আসেন।" অপর শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী সারদানন্দ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগদানের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : "ঠাকুর ইতিপূর্বে পানিহাটির উৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ তিনি প্রতি বছর যোগদান করেননি। তিনি আরও লিখেছেন : "কিন্তু তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা পালন করিতে পারেন নাই।" প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে মনে হয় আলোচ্য কালের মধ্যে তিনি খুবই সম্ভবতঃ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। তাছাড়াও ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পেনেটির মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পেনেটি উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায় কথামৃতকারের লেখনীতে এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দের জবানীতে। উৎসবের দিনটি ছিল সোমবার, ৫ আষাঢ় ১২৯০, শুক্লা ত্রয়োদশী, ১৮ জুন ১৮৮৩। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে রওনা হয়েছিলেন। গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত। গাড়িতে চলেছিলেন রাখাল, মাস্টার, রাম, ভবনাথ ও আরও

১৬ গুরুদাস বর্মন-সূত্রে জানা যায় বৈষ্ণবচরণ স্টীমারে করে পানিহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বরে গেছিলেন।

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৯১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৮ সেন বংশের আদি নিবাস আদিসপ্তগ্রাম। এঁদের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা ছিল। জাতে সুবর্ণবণিক। মণিমোহনের পিতা গুরুচরণ সেন কলকাতার তুলাপট্টিতে বাসস্থান করেছিলেন। যদুলাল মল্লিক সম্পর্কে মণি সেনের ভগ্নিপতি। খড়দহের গোস্বামী এঁদের গুরুবংশ। গুরুচরণ সেন তাঁর গুরুর আদেশে একচক্রা, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পাণ্ডুয়া (দক্ষিণদেশ), পানিহাটি ও আগরপাড়াতে দেবালয় স্থাপন করেছিলেন। পারিবারিক গোলযোগের জন্য মণি সেন শেষ পর্যন্ত পেনেটিতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। এ-সকল তথ্য মণি সেনের প্রপৌত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের নিকট হতে সংগৃহীত।

দু-একটি ভক্ত। লাটুর এবারই প্রথম পেনেটির মহোৎসবে যোগদান। গাড়ি ম্যাগাজিন রোড দিয়ে গিয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পড়ল। আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা-ভক্তদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে লাগলেন। গাড়ি রামচাঁদ ঘাট রোড দিয়ে পেনেটিতে ঢোকে। কিছুক্ষণ পরে পেঁছায় মহোৎসবক্ষেত্রে। ঠাকুরের সঙ্গী ভক্তগণ কিছু বুঝবার আগেই দেখেন, ঠাকুর হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে তীরবেগে ছুটে চলেছেন। নবদ্বীপ গোস্বামী সেন পরিবারের গুরু। নবদ্বীপ গোস্বামী সংকীর্তন করতে করতে রাঘবমন্দিরের দিকে চলছিলেন। ঠাকুর তীরবেগে এসে সংকীর্তন দলের মধ্যে ঢুকে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। প্রেমোন্মত্ত ঠাকুরের নয়নাভিরাম নৃত্য। উপস্থিত জনসাধারণের প্রাণে শিহরণ খেলে যায়। নৃত্য করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। পাছে পড়ে যান আশঙ্কা করে নবদ্বীপ গোস্বামী তাঁকে সযত্নে ধারণ করছেন। চারদিক থেকে হরিধ্বনির কল্লোল ওঠে। ভক্তগণ ঠাকুরের চরণে ফুল ও বাতাসা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে থাকেন। প্রেমহিল্লোল জনসমষ্টিকে মাতিয়ে তোলে। ঠাকুরকে দেখবার জন্য জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি চলতে থাকে। ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করেন। বাহ্যদশায় নেমে এসে নাম-গান ধরেন :

যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ওই তারা তারা
দুভাই এসেছে রে।
যাঁরা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা
দুভাই এসেছে রে। ইত্যাদি।

ঠাকুরের সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে নাচছেন ভক্তগণ। তাদের কারও কারও বোধ হয়, গৌর-নিতাই তাদের সাক্ষাতে নাচছেন। অতঃপর ঠাকুর পরের নাম-গানটি ধরেছেন :

নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। ইত্যাদি।

সংকীর্তন তরঙ্গ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে মনে পড়ছিল পুরীতে স্নানযাত্রা-দর্শনে উপস্থিত শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে কবি কর্ণপুরের বর্ণনা। কবি বলেছেন :

এ কোন কনকমণি আমার নয়নপথে পতিত হয়েছে, যার প্রচণ্ড মার্তণ্ডসদৃশ তেজোরাশিতে জীবমাত্রের চিত্তের বিষয়রস শুকিয়ে যাচ্ছে। এবং যার অসীম রূপমাধুরী দশদিক ভগবদনুরাগামৃত ধারায় প্লাবিত করে দিচ্ছে। বৈরাগ্যমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপমাধুর্যে ও ভাবসঞ্চালন ভক্তগণের মন বিষয়রস বিযুক্ত করে ভগবদ্‌ভাবে অনুরঞ্জিত করেছে। তাদের মনে হচ্ছিল স্বর্গ বুঝি নেমে এসেছে পৃথিবীর মাটিতে। সংকীর্তন তরঙ্গ রাঘবমন্দিরে পেঁছায়। ভক্তগণ মন্দিরাদি পরিক্রমা করেন। নৃত্যসহযোগে সংকীর্তন করেন। রাঘব পূজিত ৺মদনমোহনকে প্রণাম করে ভক্তগণ গঙ্গার ধারে সেনবাড়িতে পূজিত রাধামাধব মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়। সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ।

জনসঙ্ঘের সামান্য অংশই মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারে। অধিকাংশ মানুষ দরজায় ঠেলাঠেলি করতে থাকে। মন্দির-প্রাঙ্গণে ঠাকুর মধুর নৃত্যে প্রমত্ত। শ্রীম লিখেছেন : "(শ্রীরামকৃষ্ণ) কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। হরিনামের রোল আঙিনার ভিতর মুহুর্মুহু হইতেছে। সেই ধ্বনি রাজপথে পেঁছিয়া সহস্রকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ভাগীরথী-বক্ষে যে-সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ অবাক হইয়া এই সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে লাগিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বাড়তি তথ্য পাওয়া গেছে প্রত্যক্ষদর্শী সেবক লাটুর স্মৃতিকথা থেকে। পরবর্তী কালে তিনি বলেছিলেন : "সেবার ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখে আমাদেরও ডর লেগেছিলো। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুখ চোখ বুক সব একদম লাল হয়েছিল, হাতের চেটো পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। ওনার এমন ভাব দেখে সবাই তাঁর পায়ের ধুলার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিলে, বাকী হামাদের বড় মুসাকিল হোলো। ঠাকুরকে সবাই ছুঁতে চায়, হামরা তাদের ছুঁতে বারণ করি; কেহ শুনে না। এই নিয়ে বৃহৎ গণ্ডগোল লেগে গেল। রামবাবু বললেন, ওরে লেটো। ছেড়ে দে, লোকেরা সব ওনাকে ছুঁয়ে ধন্য হোক্।' বাকী রামবাবুর কথা হামি শুনতে পারলুম না। হামি তো দেখেছি যে,

সমাধির সময় তাঁকে কেউ ছুঁলে তাঁর কেমন কণ্ট হোত। রামবাবু হামায় বারে বারে একথা বললেন। হামি, রাখালভাই আর ভবনাথভাই তিনজনে মিলে ঠাকুরকে সেখান হোতে বাহিরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলুম। বাকী লোকেরা কি শোনে? ওনাকে যখন নিয়ে যাচ্ছি, তখনও তাঁর পায়ে হাত দেবার চেন্টা করছে। শেষে রামবাবু করলেন কি জানো? এক-মুঠো ধুলো ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে সকলকে দিতে লাগলেন। তবে তাঁকে বাহিরে আনতে পারি।[১৯]

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঠাকুরকে মণি সেন ও নবদ্বীপ গোস্বামী অন্য এক ঘরে নিয়ে গিয়ে সেবা করালেন। অতঃপর ঠাকুরের সঙ্গী ভক্তগণকে অপর একটি ঘরে বসিয়ে খাওয়ানো হল। ঠাকুর নিজে আনন্দ করতে করতে তাঁদের খাওয়ান। প্রসাদ ধারণের পর ঠাকুর ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গগণ বৈঠক-খানায় এসে বসলেন। নবদ্বীপ গোস্বামীও এসে যোগদান করলেন। গৃহকর্তা মণি সেন গাড়িভাড়া দিতে চাইলে ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করেন। নবদ্বীপ তাঁর পুত্রকে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নবদ্বীপ-পুত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মপ্রসঙ্গ করতে থাকেন। পিতা ও পুত্রকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন: "··· শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়।··· সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বরলাভের জন্য। আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার—দশবার গীতা বললে যা হয়, অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী।" নবদ্বীপ গোস্বামী বলেন: "ত্যাগী ঠিক হয় না, 'তাগী' হয়। তাহলেও সেই মানে। তগ্ ধাতু ঘঞ্ তাগ, তার উত্তর ইন্ প্রত্যয়—তাগী। ত্যাগী মানেও যা, তাগী মানেও তাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: "গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর।"

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়। তিনি সমাধিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। সমস্ত স্থির—চক্ষু পলক-শূন্য। নিঃশ্বাস বইছে কি বইছে না। উপস্থিত সকলে বিস্ফারিত নয়নে সমাধিস্থ পুরুষকে দেখেন। কিছুক্ষণ পরে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপকে উপদেশ করেন একজন খাঁটি ভক্ত হয়ে সংসার করবার জন্য। সে-ই ভক্ত যে তাঁতে থাকে—যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা সব তাঁতে গত হয়েছে।

মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের বিদায় করছেন। কাউকে দেন এক টাকা, কাউকে দুই টাকা। ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে অগ্রসর হন। তাঁর অনেক পীড়াপীড়িতেও ঠাকুর কিছু গ্রহণ করেন না। মণি সেনের লোক আম সন্দেশ কিনবার জন্য রাখালের হাতে টাকা দেন। সঙ্গী-সেবক লাটুর জবানীতে পাই: "রাখাল-ভাই পাঁচ টাকায় এক ঝুড়ি আম আর এক ঝুড়ি সন্দেশ নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেলো। এই না দেখে ঠাকুর রাখালের উপর খুব গোসা করলেন, আউর রাখাল ভাইকে সাবধান করে দিলেন, বললেন—'দ্যাখ! এমন কাজ আর করবিনি। তুই নিলে আমার নেওয়া হোলো। পংখী আউর দরবেশের কিছু সঞ্চয় করতে নেই।'"

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। অধ্যাত্মপ্রেরণা-মধু আহরণ করে ভক্তগণ ফিরে যান নিজ নিজ ঘরে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনীভূত ভাবের উৎসারে পুণ্যভূমি পেনেটি অধিকতর সম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সংস্পর্শে পেনেটিতে যে তীর্থের অভ্যুদয় হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে সে-তীর্থের ভাবসম্পদ অধিকতর পরিপুষ্ট হয়। উপরন্তু মণি সেনের গৃহাঙ্গন[২০] শ্রীরামকৃষ্ণের পুনঃপুনঃ লীলাবিলাসের দ্বারা পেনেটির ভাবৈশ্বর্যের ভাণ্ডারে সংযোজিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটি-তীর্থকে পুনরায় তীর্থীকৃত করেছেন, সেখানে বছরের পর বছর শুভ-পদার্পণ করেছেন, বিশেষতঃ চিঁড়ার মহোৎসবের দিনটিতে[২১],

১৯ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ৩য় সং, পৃঃ ৯৭-৯৮

২০ কথামৃতকার লিখেছেন: "তাঁহারাই (সেন পরিবারই) তখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।" অনুসন্ধানে জানা যায়, সেনবাড়ির রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে দণ্ড-মহোৎসবের দিন যে উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল শুধু সেটিই সেন-পরিবার সংগঠন করতেন। মহোৎসবতলায় অনুষ্ঠিত উৎসব তাঁরা আয়োজন করতেন না। মণি সেনের বংশধরগণ এখনও সে-ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন।

২১ এই বিশেষ দিনটি ছাড়াও তিনি অন্যদিনে পানিহাটিতে গেছেন। যেমন গিরীন্দ্র ও লাটুকে নিয়ে তিনি রথোৎসবের দিন সেখানে গেছিলেন। (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৮৮)

তিনি যোগদান করেছেন। কিন্তু শেষবার অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দিনটিতে পেনেটির মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবৈশ্বর্যের যে-উদ্ভাস দেখা গিয়েছিল, তা বোধ করি ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এবারে তিনি পেনেটির মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি গেছিলেন তাঁর ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণ ভক্তদের নেড়া-নেড়ী, আউল-বাউল প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়সহ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মভাব পেনেটি-প্রমুখ তীর্থস্থানে স্ফুরিত হয় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। তিনি তাঁর তরুণ ভক্তদের বলেছিলেন: "সেখানে ওদিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার বসে—তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল কখনও ঐরূপ দেখিসনি, চল দেখে আসবি।" ঠাকুরের এই আমন্ত্রণে ভক্তদের অনেকের মন ময়ূরের মতো নেচে ওঠে, কিন্তু কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরের দীর্ঘস্থায়ী গলবেদনার কথা ভেবে আশংকা প্রকাশ করেন। এ-গলবেদনাই পরে ক্যান্সাররোগজনিত বলে নির্ণীত হয়েছিল।

১২ আষাঢ় ১২৯২, ২৫ জুন ১৮৮৫, বৃহস্পতিবার শুক্লা ত্রয়োদশী। সকালবেলা মুরুব্বি ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে প্রায় পঁচিশজন ভক্ত দুটি ভাড়া-নৌকায় দক্ষিণেশ্বর উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য একটি পৃথক্ নৌকার ব্যবস্থা হয়। সকাল দশটার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তগণ খাওয়া-দাওয়া সেরে যাত্রা করেন। কয়েকজন মহিলা ভক্তও সহযাত্রী হন।[২২] নৌকাগুলি পেনেটি মহোৎসবতলায় পেঁছায় বেলা বারোটা নাগাদ। নদীর ধারে আশেপাশে সবুজের সারি। আম জাম নিম কদম্ব ছড়িয়ে রয়েছে। আকাশে মেঘ। কখনও ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। পথে কাদা। পুরনো বটগাছ তলায় প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। এখানে সেখানে ভক্তগণ সংকীর্তন করছেন। প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্র (পরে স্বামী সারদানন্দ) মন্তব্য করেছেন: "সর্বত্রই একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল।"

ঘাটে নেমে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে সোজা মণি সেনের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। বাড়ির লোকজন তাঁকে অভ্যর্থনা করে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসান। ইংরেজী কায়দায় সাজানো বৈঠকখানা। দশ-পনের মিনিট বিশ্রাম করে ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করবার জন্য এগিয়ে যান। বৈঠকখানার পাশেই ঠাকুরবাড়ি। মনোহর যুগলমূর্তি দর্শন করে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় প্রণাম করেন। মন্দিরের সামনে চক্‌মিলান প্রশস্ত উঠান। একদল কীর্তনীয়া উঠানে নামগান করছিল। সেখানে দেখা গেল শিখা-সূত্রধারী দীর্ঘ স্থূল বপু প্রৌঢ় বয়স্ক এক বৈষ্ণব। ঝুলিতে মালা, কাঁধে উত্তরীয়, পরণে ধোপ-দুরস্ত ধুতি, ট্যাঁকে একগোছা পয়সা। বৈষ্ণব-বাবাজী ভাবাবিষ্টের মতো অঙ্গভঙ্গি, হুংকার ও নৃত্য করে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ঠাকুর পাশে দাঁড়ানো যুবক-ভক্তদের নিচুস্বরে বলেন, "ঢং দ্যাখ্"। পরক্ষণেই পট পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিজের গলার যন্ত্রণার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এক লাফে কীর্তনদলের মধ্যভাগে উপস্থিত হন। ভাবাবেশে কখনও সিংহবিক্রমে নৃত্য করেন, কখনও বা সংজ্ঞা হারিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভক্তগণ তাঁকে আবেষ্টন করে দাঁড়ায়। বাবাজীর নকল ভাবাবেশের পর ঠাকুরের খাঁটি ভাবৈশ্বর্য উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: "ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখনও অগ্রসর এবং কখনও পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন।... প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—তখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোক-দৃষ্টির অগোচর হইবে।" ঠাকুরের পরিধানে গৈরিক গরদ। নৃত্যরত ভাবোদ্দীপ্ত ঠাকুরকে দেখে মনে হচ্ছিল "অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত"। মনে হচ্ছিল

২২ মহিলা ভক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগীন-মা, গোলাপ-মা; পুরুষ ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কালীপ্রসাদ, লাটু, বলরাম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গৈরিকোজ্জ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরাবির্ভূত। নৃত্যপটু গিরিশচন্দ্র তাঁর 'নৃত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন: "প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহা গৌরাঙ্গদ্বেষী।......কাশীধামে বসিয়া "সোঽহং তত্ত্বে নিবিষ্ট, সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্রের অঙ্গতরঙ্গে শত শত চন্দ্র ঠিক্‌রিয়া চতুর্দিকে ছুটিতেছে;...শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎ-পাঠে রত; পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন; আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন...গৌরচন্দ্রের নৃত্য। গৌরাঙ্গ নাচিতেছেন —গান নাই, কথা নাই, ভাবাবেশে, সন্ন্যাসীবেশে গৌর নাচিতেছেন। সন্ন্যাসী দেখিতেছেন।...অজ্ঞাত-ভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। 'বীর সন্ন্যাসী এইবার অতিচঞ্চল।...সন্ন্যাসী ছুটিলেন, প্রাণপণে ছুটিলেন; গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন।...রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা একথা প্রত্যয় করিতাম না;...'নদে টলমল টলমল করে', মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন।...যে-ভাগ্যবান দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাব-প্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা। কেবল নদে টলমল করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা। যে সে-নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"[২৩]

প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা প্রকৃতিস্থ হন। ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে রাঘবের পাটের দিকে অগ্রসর হন। কীর্তনদল মহা উৎসাহে নামগান করতে করতে ঠাকুরকে অনুসরণ করে। তারা গাইতে থাকে, 'সুরধুনী তীরে হরি বলে কেরে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।' ইত্যাদি। তাদের মনে হয়, উপস্থিত সকলের মনে হয়, প্রেমদাতা নিতাই স্বয়ং প্রেম বিতরণ করছেন। কয়েক পা এগিয়ে ঠাকুর গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়েন। ভাব থেকে অবরোহণ করে দু-চার পা হাঁটেন আবার ভাবস্থ হন। জনসাধারণ চারদিক থেকে ছুটে আসে। অন্যান্য কীর্তনদল এসে জুটে। বিরাট এক জনস্রোত ভাবোন্মত্ত ঠাকুরকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল, পথে কোথাও কোথাও জল জমে উঠেছিল।[২৪]

ভক্তগণ দেখেন ভাবোদ্দীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বপুতে আশ্চর্য পরিবর্তন। প্রত্যক্ষদর্শী সেবক শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) লিখেছেন: "তাঁহার (ঠাকুরের) উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবা-মাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়া-ছিল।" প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্রও এ-ধরনের অলৌকিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিয়েছেন: "তাঁহার (ঠাকুরের) যে কি বর্ণ তাহা এত দেখিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটির পাটে অনেক বর্ণ দেখিয়াছি।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-কার উপহার দিয়েছেন একটি সুন্দর চিত্র। তিনি লিখেছেন:

হেথা রাঘবের পাটে, পথে যেতে ভাব উঠে;
হেন ভাব কখনও না শুনি।
তাকায়ে আকাশপানে, দক্ষিণ-পূরব কোণে,
বাহ্যজ্ঞানহীন গুণমণি॥
কোথায় ধাইব চেঁঠা, স্পন্দহীন অঙ্গগোটা,
জড়বৎ অচল শরীর।

শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে স্থির হয়ে থাকেন প্রায় ঘণ্টাখানেক। ভক্তদের কেউ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে 'বীজ-বাক্য প্রণব' শোনায়। তাতেও ফল না পেয়ে ভক্তগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি নিজেই ভাব-সংবরণ করেন।

ভাব সংক্রামক। হরিনামের হাটবাজারে ঠাকুরের ভাব সহজেই সংক্রামিত হয় অন্যান্যদের মধ্যে। কয়েকজনের ভাব হয়, ছোট নরেনের গভীর ভাব হয়। পরে ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: "সেদিন

২৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক: শংকরীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষ), ১৩৮৯, পৃঃ ১০৮-১০৯

২৪ কয়েকদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "দেখ্‌দিকি, এই উপরে জল, নিচে জল, আকাশে বৃষ্টি—পথে কাদা, আর রাম কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এল।"

তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না—এক ঘণ্টার উপর বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না।”[২৫]

ইতোমধ্যে স্ত্রীভক্তগণ মহোৎসবতলায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের উদ্দেশে কয়েকটি মালসা ফলাহার উৎসর্গ করিয়ে নিয়ে আসেন। পথে হঠাৎ কোথা থেকে এক ভেকধারী বাবাজী এসে এক মালসা প্রসাদ কেড়ে নিয়ে যেন প্রেমে গদগদ হয়ে কিছু প্রসাদ ভাবস্থ ঠাকুরের মুখে গুঁজে দিল। বাবাজী স্পর্শ করতেই ঠাকুরের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, তাঁর ভাবভঙ্গ হল। মুখের খাদ্যদ্রব্য থু থু করে ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলেন। ভণ্ড বাবাজী গোপনে সরে যায়। ঠাকুর কণিকামাত্র প্রসাদ ধারণ করেন। অপরেরা বাকি প্রসাদ গ্রহণ করে।

রাঘবের পাট পর্যন্ত অতিক্রম করতে তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়। সেখানে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর বিগ্রহ দর্শন স্পর্শন করেন। তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। সমবেত জনতা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে। সেসময়ে ভক্তগণ ঠাকুরকে নৌকায় নিয়ে আসেন।

লীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মণি সেনের বাড়িতে প্রসাদ ধারণ করেছিলেন বলে উল্লেখ নেই। প্রতি বছর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরাদি দর্শন এবং সংকীর্তন-নর্তন শেষ করে সেনবাড়িতে রাধাকৃষ্ণের প্রসাদ ধারণ করতেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, আলোচ্য বছরে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেছিল কি? মনে হয় না। মনে হয় তিনি সেনবাড়িতে প্রসাদ ধারণ করেছিলেন। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে[২৬] সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে: “সেবার ঠাকুর সবার সাথে প্রসাদ পেলেন, ঠাকুর প্রসাদ পেয়ে দুহাত তুলে নাচতে লাগলেন।” অনুমান করা যায়, ঠাকুর রাঘবের পাট থেকে ফিরে এসে সেনেদের বাড়িতে প্রসাদ ধারণ করেছিলেন এবং সেখান থেকে গিয়ে নৌকায় উঠেছিলেন।

পরবর্তী দৃশ্য মধুরতর। কোন্নগরের প্রবীণ ভক্ত নবচৈতন্য মিত্র উন্মত্তের মতো ছুটে এসে নৌকার উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে আছড়ে পড়েছেন। ‘কৃপা করুন’ বলে তিনি প্রাণের আবেগে কাঁদতে থাকেন। ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁকে স্পর্শ করতেই নবচৈতন্য অসীম উল্লাসে ফেটে পড়েন। নৌকার উপর নৃত্য করতে থাকেন, স্তবস্তুতি করে ঠাকুরকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন। ঠাকুর তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই আবার তিনি শান্ত হন। নবচৈতন্য বিদায় নিলে শ্রীরামকৃষ্ণের নৌকা যাত্রা করে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে। দেখা গেল সূর্যদেব পাটে নামছেন। মেঘের আস্তরণ লালচে থেকে বেগুনী, বেগুনী ছেড়ে কাল রং ধারণ করে। নেমে আসে রঙ্গমঞ্চের পটাবরণ।

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থলের অনেক কিছু গঙ্গাগর্ভে বিলীন। পেনেটির শ্রীপাটে সবকিছু আজও সুরক্ষিত। বৈষ্ণবভক্তদের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যের “নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে।”[২৭] পেনেটি শ্রীচৈতন্যের সর্ব আদি প্রচারকেন্দ্র। পেনেটি ‘মালসা-ভোগ’ প্রথার উদ্ভবস্থান।[২৮] পেনেটির শ্রীপাট বৈষ্ণবদের কাছে চিন্ময়ভূমি। কয়েকশ বছর ধরে ভক্তগণ পেনেটিতে সমবেত হচ্ছেন, নামকীর্তন করছেন, প্রার্থনা নিবেদন করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যেতে পারে: “তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়।” উনিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ-খোলে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ। দুই দশকের বেশি তিনি প্রতি বছর পেনেটিতে পদার্পণ করে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারাকে উজ্জীবিত করেছেন, পরিপুষ্ট করেছেন। হরিনামের আকর্ষণের প্রদর্শনী সংগঠিত করেছেন। এবং ভাবরাজ্যের বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দশা জনসমক্ষে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপিত করেছেন। ভাবভক্তির প্লাবনে তীর্থস্থলীর পুঞ্জীভূত গ্লানি ভেসে গেছে, হরিনামের হাটবাজার আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশে জমজমাট হয়ে উঠেছে। উপরন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে বৈষ্ণবতীর্থ সকল সম্প্রদায়ের একটি পুণ্য-তীর্থে পরিণত হয়েছে।

পেনেটির রামচাঁদ ঘাট, গৌরাঙ্গ ঘাট, সেনদের ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে ভগবৎ করুণার বিগলিত-রূপ কলুষহারিণী গঙ্গা, আর ঘাটের উপরে হাজার হাজার মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে প্রবাহিত হচ্ছে ভগবৎ-করুণার সূক্ষ্ম স্ফুরণ—ভাবভক্তির মলয়। এবং এসবকিছুর সাক্ষ্য বহন করছে গৌরাঙ্গঘাটের পুরনো অক্ষয় বট। বটবৃক্ষ, তুমি কি সৌভাগ্যবান!

২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫
২৬ ঐ, পৃঃ ৯৮
২৭ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ
২৮ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩২২, পৃঃ ২৫৭

স্বামীজীর সঙ্গে এক প্রার্থনাসমাজীর সাক্ষাৎকার ঃ নতুন তথ্য

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

স্বামীজী, তাঁর গুরুভাইগণ, এবং তাঁর শিষ্যদের নিকট-চিত্রের সন্ধানে আমাদের প্রায়ই উপস্থিত হতে হয়েছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের বইগুলির কাছে। ওঁদের বিষয়ে (এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়েও) তিনি বেশ কিছু স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। এগুলিতে দুটি লক্ষণীয় বস্তু ঃ একদিকে মেলে সচল চিত্রমালা, অন্যদিকে বর্ণিত কাহিনীতে স্বামীজীর বিশেষ-বিশেষ অভিব্যক্তির তাৎপর্য নির্ণয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি, যা মহেন্দ্রনাথের ভাষায় 'অনুধ্যান', যেহেতু ব্যক্তি-অনুভূতি-নির্ভর তাই সকলের কাছে গ্রহণ-যোগ্য না-ও হতে পারে, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রটি, যেখানে 'ঘটনাবলী' বর্ণিত, গ্রাহ্য হওয়া উচিত, যদি তথ্য-বিচ্যুতি না থাকে। 'ঘটনাবলীর' তথ্যবিচ্যুতি সম্বন্ধে কখনো কখনো প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাঝে-মধ্যে তথ্যভ্রান্তি ঘটলেও, যা বেশ-কিছু বছর পরে কথিত স্মৃতিকথায় ঘটতেই পারে—তার পরিমাণ অল্পই। অন্য প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্মৃতিকথায় ভ্রান্তির তুলনায় মহেন্দ্রনাথের স্মৃতি-ভ্রান্তি মোটেই বেশি নয়। স্মর্তব্য মহেন্দ্রনাথ দত্ত-পরিবারের অন্য অনেকের মতোই বিশেষ স্মৃতি-শক্তির অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু মহেন্দ্রনাথের নামে প্রচলিত "কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" বইটির বিষয়ে কী বলা যাবে? বইটি বস্তুতপক্ষে মহেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ স্মৃতিকথা নয়। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মহেন্দ্র-নাথের 'প্রাগ্‌বাণী' (২২ ভাদ্র ১৩৩২) থেকে জানতে পারি, কাশীধামের উক্ত বিবেকানন্দ-স্মৃতি স্বামী সদাশিবানন্দের। "১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে প্রয়াগে অবস্থানকালে ভক্তরাজের (হরিনাথ ওদেদার বা স্বামী সদাশিবানন্দ) সহিত আমার [মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন] স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তরাজ বলিলেন, 'স্বামীজী যখন শেষবার কাশীধামে আসিয়াছিলেন তখন আমি স্বামীজীর নিকটে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলাম।' এই কথা শুনিয়া আমি ১৬নং হিউএট রোডস্থ ব্রহ্মবাদিন-ক্লাবে বসিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে ভক্তরাজকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমার প্রশ্ন শুনিয়া ভক্তরাজের পূর্ব-স্মৃতি অনেক পরিমাণে জাগরিত হইতে লাগিল। ভক্তরাজের মুখ হইতে স্বামীজীর উপাখ্যানগুলি শুনিয়া সকলে বড় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু পাছে সেইগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।" তদনুযায়ী ভক্তরাজের মুখে শুনে মহেন্দ্রনাথ সদ্য-সদ্য ঘটনাগুলিকে নিজের ভাষায় বলে যেতেন এবং সেগুলি লিখে নিতেন উমেশচন্দ্র সেন। ভক্তরাজ লেখক নন, নিজে কলম ধরে নাও লিখতে পারেন, কিন্তু তাঁর কথা হুবহু না টোকার কারণ কী? মহেন্দ্রনাথ মধ্যবর্তিতা করে শ্রুত ঘটনা নিজের মতো করে বলে দিলেন কেন? তার কারণও মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন ঃ "ভক্তরাজ তাঁহার সহজ সরল ভাষায় কিছু বলিতেন, আর বাকিটুকু হস্তাদি সঞ্চালন, মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও ভাববিহ্বল নেত্রদ্বয় দিয়া প্রকাশ করিতেন।··· উপাখ্যানগুলি বলিতে বলিতে তিনি সহসা এরূপ উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেন যে, আর বলিতে পারিতেন না, ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, 'আমি যেন স্বামীজীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই সমস্ত ঘর-দোর আমার চোখের সামনে ভাসছে দেখছি।'" মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—ঘটনাগুলির

তথ্যরূপে ভক্তরাজ যেভাবে বলেছেন সেইভাবেই গৃহীত, কিন্তু ঐসব ঘটনার কোন-কোনটি তাঁর মনে যে ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করত তাকে প্রকাশ করতে অসমর্থ বলে, তাদের অন্তর্গত রূপকে তাঁর ব্যক্ত ও অর্ধব্যক্ত কথা এবং ভাবভঙ্গি থেকে অনুভব করে নিয়ে, মহেন্দ্রনাথ নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। "এই সমস্ত উপাখ্যানগুলি, ভক্তরাজের ভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া, ঘটনাগুলির পারম্পর্য ঠিক রাখিয়া, সেইগুলি আমি ভাষায় বলিয়া যাইতাম আর শ্রীউমেশচন্দ্র সেন লিখিয়া যাইতেন।" এই-প্রকারে পুনর্গঠিত অংশগুলিকে অবিলম্বে ভক্ত-রাজকে শুনিয়ে মহেন্দ্রনাথ অনুমোদন করিয়েও নিয়েছেন। "ভক্তরাজ ও অপর সকলে নিকটে বসিয়া [লিখিত বিবরণ] শুনিতেন এবং তাঁহাদের ভাব যে স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, ইহা তাঁহারা অনুমোদন করিতেন।" অনুমোদনকারীদের মধ্যে মহাপুরুষ-মহারাজ স্বামী শিবানন্দও ছিলেন। স্বামী বিবেকা-নন্দ কাশীধামে থাকাকালে মহাপুরুষজী যে কেবল তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাই নয়, পরে ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে যখন ভক্তরাজের স্মৃতিকথা লিখিত হচ্ছিল তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং—"তিনিও বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে উপাখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।"

এইসব কারণে "কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" সরাসরি ভক্তরাজ স্বামী সদাশিবানন্দের স্মৃতিকথার অনুলিখন না হলেও, এবং তার মধ্যে ব্যাখ্যাত্মক অংশগুলি মহেন্দ্রনাথ দত্তের যোজনা হলেও, তাদের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য, এমনকি অনুভূতি-মূলক বর্ণনাগুলিও মূল্যবান। স্বামীজীর জীবনী বা তাঁর বিষয়ে স্মৃতিকথাগুলি পড়বার সময়ে আমরা বারংবার দেখেছি—তিনি কথাবার্তা বা বক্তৃতার সময়ে শ্রোতাদের মনকে ঊর্ধ্বতর লোকে উন্নীত করে দিতেন। তা যে তিনি করতেন—অধিকাংশক্ষেত্রে শুধু এই সংবাদটুকুই মিলেছে—দু-একটি ক্ষেত্রে কেবল, যেমন নিবেদিতা, ক্রিস্টিন বা দেবমাতার রচনায়, ঐ ঊর্ধ্বতর জগতের ভাবসত্য বর্ণনার চেষ্টা রয়েছে—অনুভূতির সাহিত্য হিসাবে যাদের মূল্য অসাধারণ। এঁদের নামের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথের নামও যোগ করে দিতে পারি। তিনি কয়েক খণ্ডের "শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী" গ্রন্থে, ততোধিক, কয়েকখণ্ডের "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে—স্বামীজী-সৃষ্ট অপূর্ব পরিবেশের, অনির্বচনীয় ভাব-লোকের, কিছুটা বাণীরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের পরিবেশের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও নিবিড় পরিচয় ছিল বলেই তিনি ভক্তরাজের অনুভূতির রূপ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন—আর তা যে পেরেছিলেন তা ভক্তরাজের স্বীকৃতি থেকেই দেখা যায়। সকলেই আধ্যাত্মিক মানুষ হন না, আবার সকল আধ্যাত্মিক মানুষ লেখক হন না। কিন্তু যাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা এবং ঐ আধ্যাত্মিকতার প্রকৃতি অনুভব করে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে, তাঁকেই আমরা অধ্যাত্ম-সাহিত্যিক বলে গণ্য করতে পারি। মহেন্দ্রনাথ এই ক্ষমতার কিছুটা অধিকারী ছিলেন।

॥ ২ ॥

স্বামীজী তাঁর জীবনের শেষ পর্বে—১৯০২ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত (স্বামীজী ৮ মার্চ মঠে ফেরেন)—মাস-খানেক বারাণসীতে ছিলেন। তাঁর বারাণসী অবস্থানের বিষয়ে যে-সকল স্মৃতিকথা মিলেছে তাদের মধ্যে ভক্তরাজ-মহারাজের বিবরণ সবচেয়ে দীর্ঘ এবং গুরুমূল্য। এর একটি অংশই বর্তমানে আলোচ্য।

ভক্তরাজের বিবরণে জনৈক কেলকারের স্বামীজী-দর্শনের ও পরস্পর কথাবার্তার সংবাদ আছে। সে কাহিনী এই :

"খ্যাতনামা কেলকার এইসময়ে কাশীধামে ছিলেন। একদিন সায়ংকালে তিনি স্বামীজীকে দেখিতে আসিলেন। শরীর অসুস্থ, এইজন্য স্বামীজী পর্যঙ্কের উপর শায়িত ছিলেন। কেলকার বিনীতভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থিত আস্তরণে উপবেশন করিলেন, এবং গুরু বা মহাপুরুষের নিকট সসম্ভ্রমে যেমন যাওয়ার প্রথা তদ্রূপ নম্র ও বিনয়পূর্ণভাবে করজোড় করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

"কথাবার্তা ইংরাজীতে হইতে লাগিল। আমরা দূরে বসিয়াছি। প্রত্যেক শব্দ শুনিতে পাইলাম না এবং বয়স অল্পবশতঃ বিদেশীয় ভাষার সকল কথা বোধগম্য হইল না।... স্বামীজী প্রথমে শুইয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ক্রমেই ভাবরাশি ঘনীভূত হইতে লাগিল। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। শরীর দুর্বল থাকিলেও তিনি হঠাৎ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং কথাবার্তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দৃঢ়ভাবে কহিতে লাগিলেন। ক্রমে অধিকতর ভাবরাশি আসিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিল। তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইলেন। চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল।... শব্দ ক্রমে মধুর ও শ্লথ অবস্থা হইতে খরতর ও উচ্চভাব ধারণ করিল।... রুগ্ন ও অসুস্থ ব্যক্তি যিনি শুইয়াছিলেন এবং মৃদুভাবে যিনি ইতিপূর্বে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সেইসকল ভাব একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল এবং তৎস্থানে মহা তেজস্বীভাব, সুস্থ শরীর ও তেজস্বীবাণী আসিয়া প্রকাশ পাইল। স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র উচ্চারণ, স্বতন্ত্র নেত্রের দৃষ্টি। ভাবাবেশে দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে আমরা স্বামীজীকে বহুবার দেখিয়াছি, এইজন্য আমাদের নিকট ইহা তত নূতন ও কৌতূহলের বিষয় বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রথম বা দ্বিতীয়বারের ভাবাবস্থা দেখিয়াছেন তাঁহারা চমকিত ও ত্রস্ত হইয়াছেন। কেলকার মহাশয় স্বামীজীকে এইরূপ সহসা দেহ পরিবর্তন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ধারণ করিতে দেখিয়া বিমোহিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্মনা হইয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মুখভঙ্গিতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।...

"স্বামীজী ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিষয়ে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা হইল। স্বামীজী ক্রমে ব্যথিত, বিমনায়মান, দুঃখিত ও শোকার্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুতে বিষাদ, শোক, দয়া এবং সর্বজীবের প্রতি প্রেম লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কখনো খেদোক্তি করিয়া, কখনো-বা ম্রিয়মানভাবে, কখনো-বা ক্রোধপ্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ভারতবাসীর এরূপ হীন অবস্থায়, এরূপ দৈন্য অবস্থায় আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিবার কী আবশ্যক? পলকে-পলকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অনাহার, লাঞ্ছনা, ক্লেশ, দিবারাত্র অনুভব করিতেছে, কেবল জীবন্মাত্র সংরক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে, প্রজ্বলিত নরকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছে—মৃত্যু ইহার চেয়ে যে ঢের ভাল ছিল।' তিনি এইভাবে শোকার্ত ও সন্তপ্তহৃদয়ে ভারতবাসীদিগের দুঃখের বিষয়ে কহিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার সকরুণ দেশপ্রেমিকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এরূপ অকপট দেশানুরাগ যে হইতে পারে, ইহা আমরা এই প্রথম দেখিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য খেদোক্তি, তাহাদের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট, কিসে সকলের উন্নতি হয়, কিসে তাহারা সুখে থাকিতে পারে ও উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন পায়, কিসে তাহাদের দুঃখ তিরোহিত হয়, সেই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইতে শোক ও প্রেমের উৎস দ্রুতবেগে উঠিতে লাগিল।...

"তাহার পর তিনি কেলকারের সহিত রাজনৈতিক বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। শুষ্ক বৈদেশিক রাজনীতিতে এ-দেশের কোন উপকার হইবে না। এবং অনুকরণেও কোন ফল হইবে না, কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত পূর্বতন প্রথা রাখিয়া চলিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে—এইটি তিনি কেলকারকে বিশেষভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। স্বামীজী কেলকার মহাশয়কে আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইলেন যে, ধর্মের ভিতর দিয়া সমাজসংস্কার ও ধর্মের ভিতর দিয়াই নানারকম উন্নতিই হইতেছে একমাত্র ভারতবর্ষের পন্থা। কিন্তু ধর্মবিচ্যুত রাজনীতি বা অন্য কোনপ্রকার সামাজিক আন্দোলন ভারতবর্ষে কোন কার্যদায়ক হইবে না। এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেলকার মহাশয় সন্তুষ্ট ও হর্ষিত হইয়া বিনীতভাবে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।"

[*এখানে 'ধর্ম' বলতে স্বামীজী যে 'আধ্যাত্মিকতা' বুঝেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।* সর্বজনীন ধর্মের এই প্রবক্তা কোন বিশেষ ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতির প্রকাশ ঘটুক, একথা বলতেই

পারেন না। ধর্ম মানে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই অদ্বৈত চেতনা, যা সর্বাঙ্গীণ প্রেমের উৎস, শক্তির উৎস। লোভ ও হিংসাসর্বস্ব রাজনীতির বিষয়ে স্বামীজীর সতর্কবাণী এখানে লক্ষ্য করতে হবে।]

॥ ৩ ॥

ভক্তরাজ কথিত এই 'খ্যাতনামা কেলকার' কে? স্বতঃই মনে হবে, ইনি পুণার তিলক-মতবাদী ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মরাঠা' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক এন. সি. কেলকার। (নরসিংহ চিন্তামন কেলকার)। মহেন্দ্রনাথের অনুলিখনে কিন্তু ইনি যে এন. সি. কেলকার, একথা বিশেষভাবে বলা নেই। কথাটা পাদটীকায় যোগ করেছেন "কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের সম্পাদক। সেখানে তিনি অধিকন্তু ভুল করে বলেছেন—এন. সি. কেলকার 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক। কেশরী মরাঠি দৈনিক, তার সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং লেখক। সে যাই হোক, সম্পাদক-প্রদত্ত কেলকারের পরিচয় গ্রহণ করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর "যুগনায়ক" গ্রন্থে (৩য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৪৩০)। তা গৃহীত হয়েছে স্বামীজীর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যগণ-লিখিত দি লাইফ অব্ স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (সর্বশেষ সংস্করণ, ১৯৮১, পৃঃ ৬২৬)। আমি নিজেও একই ধারণার পোষকতা করেছি— "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (পৃঃ ৯)। একই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃঃ ৮৫-৮৬) উদ্ধৃত এন. সি. কেলকারের পুণা ফার্গুসন কলেজে ১৯ জুলাই ১৯৩৫ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে দেখা যায়, কেলকার বলেছেন, মহারাষ্ট্রে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের অবস্থানকালে তিনি সাক্ষাতের সুযোগ হারিয়েছিলেন। তবু কেলকার যে একবার অন্ততঃ স্বামীজীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, এই ধারণা রক্ষা করেছি এই "কাশীধামে" গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য-সূত্রেই। এমন মনে করার আরও কারণ, স্বামীজীর দেহান্তের পরে পুণার প্রার্থনাসমাজী 'সুবোধ' পত্রিকার ১০ আগস্ট ১৯০২ তারিখের সংবাদ, যার মধ্যে 'সরস্বতী মন্দির' পত্রিকায় রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেনের উপরে স্বামী বিবেকানন্দকে স্থাপনের বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল, এবং আঁতে ঘা দিয়ে বলা হয়েছিল—যে-বিবেকানন্দকে নিয়ে সাধারণ হিন্দুরা এত হৈচৈ করছে তিনি কিন্তু মোটেই প্রচলিত অর্থে হিন্দু ছিলেন না। "যারা স্বামীজীর সুখ্যাতি করছে (সুবোধ পত্রিকা লিখেছিল) তারা কি তাঁর আসল স্বরূপ জানে? (জিজ্ঞাসা করি), স্বামীজীর হিন্দুধর্মকে (এদেশে) কতজন মানে? বিদেশ-গমনকে স্বামীজী ত্যাজ্য ও অধর্ম মনে করতেন না, তাই তাঁর অনুগামীরাও তা মনে করেন না। বিদেশ থেকে ফিরে উনি গোময় গোমূত্রদ্বারা নিজেকে তো শুদ্ধ করেননি। আজকে তাঁর কতজন সাধারণ ভক্ত তা করতে রাজি? যখন সংবাদ রটেছিল, স্বামীজী আমেরিকায় গোমাংস আহার করেছেন, তখন তিনি কখনই তার প্রতিবাদ করেননি। উল্টোপক্ষে বলতেন, বিদেশে গোমাংস খাওয়ায় আপত্তি নেই। উনি কয়েকমাস আগে অমন বলেছেন। ওঁর এই বক্তব্য মানতে কতজন রাজী আছেন? ধর্মের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক নেই—এ তো ওঁরই কথা।··· কয়েকমাস আগে স্বামীজী যে কেলকারের কাছে বলেছেন—হিন্দুস্থানের নাশ না হলে তার উন্নতি হবে না—তার অর্থ কী, তা-কি বিবেকানন্দ-ভক্তরা ভেবে দেখবেন?" ["সমকালীন", ৩য়, পৃঃ ২১১]।

উদ্ধৃত অংশে কয়েকমাস আগে কেলকারের সঙ্গে স্বামীজীর কথার উল্লেখ আছে—তার থেকে ধরে নিয়েছিলাম—এ-কেলকার, এন. সি. কেলকার ছাড়া কেউ নন, যার সঙ্গে "কাশীধামে" গ্রন্থের পাদটীকা অনুযায়ী স্বামীজীর কথাবার্তা হয়েছিল। কিন্তু 'সুবোধ' পত্রিকার মন্তব্যের আর এক অংশ—বিদেশে স্বামীজীর গোমাংস-ভোজন সমর্থনের উৎস কোথায়, তার সন্ধান পাইনি।

॥ ৪ ॥

নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিদেহাত্মানন্দ ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিয়েছেন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা। এবং তার দ্বারা তিনি স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থগুলির পক্ষে এই বিষয়ের তথ্যসংশোধনও অবশ্যকৃত্য করে তুলেছেন।

তাঁর আবিষ্কৃত সংবাদ থেকে জেনেছি—কাশীতে যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল তিনি এন. সি. কেলকার নন—বিশিষ্ট প্রার্থনাসমাজী সদাশিবরাও কেলকার। বিদেহাত্মানন্দজী অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে, প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র 'সুবোধ' পত্রিকার ৩০ মার্চ ১৯০২ সংখ্যায় সদাশিবরাও-লিখিত যে-সাক্ষাৎকার বিবরণ বেরিয়েছিল, তার বাংলা অনুবাদ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সদাশিবরাও ইন্দোর থেকে ২০ মার্চ ১৯০২ তারিখে 'সুবোধ' পত্রিকার সম্পাদককে উক্ত সাক্ষাৎকার-বিবরণ লিখে পাঠান। বিবরণটি নানা দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক। এর মধ্যে একদিকে যেমন স্বামীজী সম্পর্কে সংস্কারপন্থীদের বদ্ধমূল ধারণার বিষয়ে জানতে পারি, অন্যদিকে তেমনি "কাশীধামে" গ্রন্থে প্রকাশিত বিবরণের তথ্যগত বাস্তবতা এবং ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তিও বুঝতে পারি। শেষোক্ত ভ্রান্তির কারণ আছে।

সে-আলোচনায় যাওয়ার আগে উল্লিখিত সাক্ষাৎকার বিবরণটি উপস্থিত করা যাক :

"তাজা খবরগুলির মধ্যে একটি—স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বল্পকালীন সাক্ষাৎ। কলকাতা থেকে ফেরার পথে কাশীক্ষেত্রে তিন রাত্রি ছিলাম। সেখানে থাকাকালে শ্রীমতী বেশান্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম।...

"স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ-বাসনা পূর্ণ হল, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যা শুনব আশা করে গিয়েছিলাম সেই ব্যাপারে নিরাশ হতে হল। তাঁর খ্যাতিমতো তিনি ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বুনিয়াদী বিচার করবেন, আমার এইরকম প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু নিম্নলিখিত যে-কথাগুলি স্বামীজী বললেন সেগুলি কতখানি বুনিয়াদী তা নির্ণয়ের ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

"আমি স্বামীজীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্রাহ্মসমাজ ও আপনাদের মধ্যে পার্থক্য কি? স্বামীজী বললেন, অনেক পার্থক্য আছে। ব্রাহ্মসমাজ দ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী আর আমরা অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মসমাজ কেবল যুক্তিবাদের আশ্রয় নিয়ে চলে, আর আমরা শাস্ত্রপ্রমাণ নিয়ে চলি। কারণ শুধুমাত্র যুক্তিকে আশ্রয় করলে ধর্মে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। এইজন্য কোন না কোন গ্রন্থকে অবলম্বন করা দরকার।

"মাংসাহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে বললে স্বামীজী বললেন, যদি মাংস ছাড়া প্রাণধারণ অসম্ভব হয় তাহলে ব্রাহ্মণও তা খেতে পারে, নচেৎ তা খাওয়া উচিত নয়। অন্য বর্ণের লোক যথেচ্ছ মাংসাহার করতে পারে। গোমাংস সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, গরু এবং বলদ আমাদের দেশে কৃষির কাজে লাগে, সেজন্য এদের মারা উচিত নয়। ইউরোপে কৃষিকাজে এদের কোন উপযোগিতা নেই, অতএব সেখানে এদের বধে কোন দোষ নেই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, হিন্দু যদি সেদেশে যায় তাহলে তাদের গোমাংস ভক্ষণে আপত্তি আছে কিনা? তার জবাবে স্বামীজী বললেন, গোমাংস ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব হলে তবেই খেতে পারে, নচেৎ নয়। বিশ্বামিত্র চণ্ডালের বাড়িতে কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন, কারণ খাদ্য ছাড়া তাঁর প্রাণ যায়-যায়, আর সেখানে অন্য কোন খাদ্য ছিল না। কিন্তু সেই চণ্ডালের বাড়িতে তিনি জল খাননি, কারণ জল অন্যত্র লভ্য ছিল। আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, মার্কিন মুলুকের ডাঃ বারোজ যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে, স্বয়ং স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালে গোমাংস খেতেন, এটা কী করে হল? আমেরিকায় গোমাংস ছাড়া অন্য খাদ্য পাওয়া যায় না, এমন তো নয়? স্বামীজী তখন বললেন, খ্রীষ্টান লোকদের কথার উপর বিশ্বাস করা উচিত নয়; ওরা অন্য ধর্মের সর্বদাই নিন্দা করে, এবং দরকারমতো মিথ্যা কথা বলে।

ডাঃ বারোজ ইন্দোর শহরে যখন এসেছিলেন তখন আমি নিজে তাঁর মুখ থেকে এই কথা শুনেছি। তিনি এই কথা সার্বজনিক সভায় এবং অন্যত্রও বলেছিলেন। এই কথা যদি সরাসরি মিথ্যা হয়

তবে তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কিন্তু সে-রকম কিছু হয়েছে বলে আমি কখনও শুনতে পাইনি। তাছাড়া ডাঃ বারোজ স্বামীজীর কুৎসা রটিয়েছিলেন, এরকমও আমার মনে হয় না।

"উপরি-উক্ত কথাবার্তা হওয়ার পরে, আমার সঙ্গী এক কাশীবাসী তরুণ বিদ্বান তাঁকে বললেন যে, বুদ্ধের সময় কাশী নগরী বর্তমান শহর থেকে দূরে ছিল। সে-সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন, না, তা ঠিক নয়। বর্তমান জায়গাতেই আদিকাল থেকে কাশী শহর বর্তমান আছে। সে-কথার সমর্থনে তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ দিলেন। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির এখন যেখানে রয়েছে সেখানে ছিল না। এখন পাশে যেখানে মসজিদ রয়েছে সেখানে ছিল। মুসলমানেরা সেটা ভেঙে ফেলার পর এখনকার জায়গায় বানানো হয়। এই তথ্যে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু এই কথাবার্তার ঝোঁকে স্বামীজী পরে যা বললেন তা কিছু বিশেষ অর্থবহ। উপরের কথাপ্রসঙ্গে আমি বললাম যে, এখানকার মন্দির থেকে এগিয়ে মসজিদের দিকে যেতে যে-কুয়ো পড়ে, তার ধারে বসে থাকা পাণ্ডারা বলে যে, মুসলমানেরা যখন মন্দির ভাঙা শুরু করে তখন বিশ্বেশ্বর পালান এবং ঐ কুয়োতে ঝাঁপ দেন। পরে তাঁকে কুয়ো থেকে বের করে নতুন মন্দিরে স্থাপন করা হয়। কিন্তু একথা বলার সময়ে ওরা দেবতার বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। বিশ্বেশ্বরের অর্থ কী? এবং তিনি মুসলমানদের ভয়ে পালান, তার মানে কী—একথা ওদের [পাণ্ডাদের] একেবারেই বোধগম্য নয়। দেবতা বিষয়ে এ-রকম বলার সময়ে তাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। আমার ধারণা ছিল আমার এইসব যুক্তির সঙ্গে স্বামীজী সহমত হবেন। কিন্তু—না। ওঁর সঙ্গে কেউ কথা বললে উনি নিজের প্রভাব বিস্তার করবার জন্য অপর পক্ষের বক্তব্য ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেন, আমার এমন ধারণা হল। আমি ওইসব কথা বলার পর স্বামীজী এমন পণ্ডিতী চাল চাললেন যাতে মনে হল, মুসলমানদের ভয়ে দেবতার পালানো কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাণ্ডারা যা বলে তা সত্য।...

"নেটিভ সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের উপরও স্বামীজীর রাগ দেখা গেল। এরা প্রজাদের কষ্ট দিয়ে নিজেরা বেশ আরামে থাকে।...

"দেশোন্নতির জন্য যে-প্রচেষ্টা চলছিল তার সম্বন্ধেও স্বামীজী নিজের মত এমনভাবে প্রকাশ করলেন যাতে মনে হল—যে-দেশের লোক এত দুঃখে ডুবে আছে সে-দেশ যদি পৃথিবী থেকে একেবারে লোপ পায় তবে দেশের মঙ্গল। দেশের উন্নতির চেষ্টা আমাদের দেশে সফল হবে না। তাকে একেবারে লোপ করাতেই দেবতার দয়া প্রকাশ হবে। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলে তাঁকে অধিক কষ্ট দেওয়া আমাদের ভাল লাগছিল না। এবং স্বামীজীর সঙ্গে আর বেশি কথা বলার ইচ্ছাও তখন ছিল না বলে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।..."

॥ ৫ ॥

সদাশিবরাওয়ের এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, স্বামীজীর কথাবার্তা তাঁর দীর্ঘপোষিত ধারণাগুলিকে কিভাবে আঘাত করেছিল। ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বিচক্ষণ উক্তি করার মেজাজ তখন স্বামীজীর ছিল না। (কোন কালেই তা ছিল কি?) কোন প্রকার আপসের পথে তিনি তখন চলতে গররাজি। যাকে বলা যায়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো সত্য—তাকেই উচ্চারণ করতে বদ্ধপরিকর। অল্প প্রতিরোধের পথে চলা আর নয়—তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন। আর তেমনি এক মেজাজে স্বামীজীকে সদাশিবরাও পেয়েছিলেন—তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছিল তাঁর স্বভাবানুরূপ।

সদাশিবরাওয়ের বিবরণের একাংশে আছে—বারোজ-কথিত আমেরিকায় স্বামীজীর গোমাংস ভোজন। এই বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণভারতে বহু জল ঘোলা হয়েছে। রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী—সকলেই স্বামীজীর জনপ্রিয়তা হ্রাসের জন্য এই বারোজ-কথিত কাহিনীর ব্যবহার করেছেন—খ্রীষ্টান মিশনারিদের কথা বলাই বাহুল্য। ধর্মমহাসভার শেষদিকে এবং তার পরে ডাঃ বারোজের আক্রোশপূর্ণ

পরিবর্তিত চেহারার কথা স্বামীজীর জীবনী-পাঠকদের কিছুকিছু জানা আছে। মিশনারিদের প্ররোচনায় ডঃ বারোজ ভারতে এসে কি ধরনের পর-ধর্মনিন্দা ও বিবেকানন্দ-নিন্দায় মেতেছিলেন, সে-বিষয়ে "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি গোটা অধ্যায় (পৃঃ ৩০৯—৪২) লিখেছি। এখানে কেবল গোমাংসাহার প্রসঙ্গে একই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২১২) যা লিখেছি তার অংশ উদ্ধৃত করছি।

"স্বামীজীর গোমাংসাহারের কথাটা ডাঃ বারোজ, এবং তাঁর কথা অনুযায়ী কিছু মিশনারি ও ব্রাহ্ম-পত্রিকা প্রচার করছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৩৩৯) আমরা ডাঃ বারোজের উক্তি উদ্ধৃত করেছি, যাতে পাই, স্বামীজী নাকি রেস্টুরেন্টে তাঁর সঙ্গে খেতে গিয়ে বীফ্ চেয়েছিলেন। স্বামীজী প্রকাশ্যে এই কথার প্রতিবাদ করেননি—বারোজের নোংরামিকে প্রতিবাদে মূল্যবান করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু কথাটা ডাহা মিথ্যা, তা গুডউইন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত সংগ্রহে তা পাই। ...মিথ্যা ছিল স্বামীজী গোমাংসাহার সমর্থন করতেন—বারোজের এই কথাটাও। অথচ সমাজসংস্কারপন্থীদের এমনই সত্যপ্রীতি যে, ডাঃ বারোজের কথার উপরে নির্ভর করে স্বামীজীর মুখে এমন কথা তাঁরা বসিয়ে দিলেন, যা তাঁর কথাই নয়। এই প্রসঙ্গটির একটু বিস্তারিত আলোচনা করলাম এইজন্য যে, সংস্কারকদের পত্রিকায় একে মূলধন করে বিবেকানন্দ-নিন্দার ব্যবসা করা হয়েছে।"

সদাশিবরাওয়ের বিবরণে লক্ষ্য করার বিষয়—তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে ধর্মবিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা শুনতে বড় বেশি ব্যস্ত ছিলেন। আর স্বামীজী, আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি, সদাশিব-রাওয়ের মতবাদ বুঝে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে ও-সম্পর্কে কোন গুরুতর আলোচনার প্রয়োজন আছে, তা একেবারেই বোধ করেননি। কেবল দুচার কথার ঝাপটায় সে-প্রসঙ্গ সরিয়ে দিয়েছেন। তবে সেগুলি খুবই কড়া ও চড়া ঝাপটা। মূর্তিপূজাবিরোধী একজন প্রার্থনাসমাজীর মধ্যে 'পৌত্তলিক' হিন্দুদের দেবতাদের মর্যাদা নিয়ে যে-কাতরতার রূপ সদাশিব-রাওয়ের বিবরণে দেখি, তাকে খুবই কৌতুকজনক বলে মনে হবে, যদি ভুলে যেতে পারি যে, ওর মধ্যে 'পৌত্তলিক' হিন্দুদের মনকে বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিরূপ করে তোলার কুশলী আয়োজন ছিল। স্বামীজী কোন্ যন্ত্রণা থেকে এদেশের মানুষের অন্ধ দেবতাভক্তিকে আঘাত করেছেন, তা অনুভব করার ক্ষমতা মাপা ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন সদাশিবরাওয়ের ছিল না। পতনযুগের পৌরাণিকতার সঙ্গে অতিরিক্ত দৈবনির্ভরতা জড়িত। অবিরাম মার-খাওয়া মানুষ ফিরে মার দিতে ভুলে গিয়ে, সকল প্রকার অন্যায়কে কর্মফল বলে মেনে নিয়ে, দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী করেছে—আর সেই পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে এমন দেবকাহিনী রচনা করেছে যাতে দেখা যায়, দেবতা কেবল অন্যায়ের পরিপোষক। এইসব পৌরাণিক বা অর্ধ-পৌরাণিক কাহিনীর লক্ষ্য—যে অন্যায় অত্যাচার ঘটুক না কেন দেবতাদের চাই বরাদ্দ ভক্তি। তা সরবরাহ করতে পারলেই নির্ঘাত উদ্ধার। এইসব ভক্তি-কাহিনী সম্বন্ধে স্বামীজীর বিতৃষ্ণা ছিল সুগভীর। মানুষ নিজেদের কাপুরুষতাকে দেব-তাদের অন্যায়কর্মের উপর চাপাবে এবং তার দ্বারা নিজেদের জাড্যকে 'ধর্ম' নাম দেবে—একে সহ্য করা স্বামীজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না—কারণ তিনি মনে করতেন, আত্মশক্তির জাগরণের উপরই ভারতের মুক্তি নির্ভর করছে। আর স্বামীজী নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে, প্রার্থনাসমাজী এক ব্যক্তি, প্রচলিত দেবকাহিনীর বিরোধী হওয়াই যাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, তিনি কিনা ঐসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

সদাশিবরাওয়ের মানসিক অসাড়তার চূড়ান্ত রূপ—স্বামীজীর দেশপ্রেমের প্রকৃতি বুঝবার অসামর্থ্যের মধ্যে প্রকট। দেশপ্রেম বলতে সদাশিব-রাওগণ এতদিন বুঝে এসেছেন—ভারতীয়দের কুসংস্কার-ক্ষত-অঙ্গে কিছু সংস্কার-মলম লেপন এবং সাহেবদের কাছে কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদনপত্র রচনার মুন্সীয়ানা। সেখানে কোন্ নিদারুণ মর্মযাতনা থেকে একজন মানুষ বলতে

পারেন—এদেশ ধ্বংস হয়ে গেলেই ভাল—তা বুঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি কি করে বুঝবেন বিবেকানন্দ কী ছিলেন? কি করে বুঝবেন—মাদ্রাজে সমুদ্রতীরে এক কোমর পচা কাদার মধ্যে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের কাজ করতে দেখে তাঁর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তাক্ত যন্ত্রণার রূপ—যখন স্বামীজী আর্তনাদ করে বলেছিলেন—হে ভগবান, তুমি এদের সৃষ্টি করলে কেন? সদাশিবরাও কি করে বুঝবেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই কথাগুলির গভীরার্থ—"দেশের জন্য ব্যথা কি কখনো শরীরিণী হয়। যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"

এইবার ভক্তরাজের বিবরণ প্রসঙ্গে আসতে পারি। স্পষ্ট দেখা যায়, তিনি সদাশিবরাওয়ের মনের ভিতরকার কথা বুঝতে পারেননি। তাই লিখেছেন, "(স্বামীজীর) এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া কেলকার মহাশয় সন্তুষ্ট ও হর্ষিত হইয়া বিশেষভাবে প্রণামপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।" সদাশিবরাও যে মোটেই 'সন্তুষ্ট বা হর্ষিত' হননি তা তাঁর লেখা থেকেই বোঝা যায়। তাঁর বিদায়-কালীন প্রণাম (অর্থাৎ নমস্কার) অবশ্যই ভদ্রতাবশে। কিন্তু দুটি কারণে ভক্তরাজের ভুল হয়ে থাকতে পারে। এক, এই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন তিনি অল্পবয়সী তরুণ, সবকিছু বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। সেকথা তিনি তাঁর বইয়ে অন্যত্র বলেছেনও। তাছাড়া গোড়ার দিকে স্বামীজী আস্তে-আস্তে কথা বলছিলেন, একটু দূরে বসে থাকার জন্য সব কথা ভালভাবে শুনতেও পাননি। স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে উঁচু গলায় কথা বলার পরেই ভাল করে শুনতে পান। দ্বিতীয়তঃ, অন্য সকল ক্ষেত্রে যা ঘটত এখানেও তাই ঘটেছে—স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের দ্বারা সদাশিবরাও অভিভূত ছিলেন (তিনি লেখার মধ্যে অভিযোগও করেছেন, স্বামীজী প্রাধান্য বিস্তার করতে সচেষ্ট ছিলেন), তাই ভক্তরাজের মনে হয়েছিল, উনি তুষ্ট ও আনন্দিত। বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন ক্ষুদ্রতর মানুষেরা বাহ্যতঃ অভিভূত থাকলেও, পরে তাঁরা যখন সেই প্রভাব পরিমণ্ডলের বাইরে গিয়ে পূর্ব সংস্কার ও ধারণার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। সদাশিবরাওয়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে, কিছুটা বিরোধী মন নিয়ে স্বামীজীর সম্মুখীন হয়েছিলেন তার আভাসও ভক্তরাজের কথায় মেলে। তিনি বলেছেন, স্বামীজীর মধ্যে যতই তেজ ও উন্মাদনার বৃদ্ধি ঘটতে লাগল ততই যেন "কেলকার মহাশয়ের শক্তি ন্যূন হইতে লাগিল।" কিছুটা মতসংঘর্ষের পটভূমিকা না থাকলে একজনের ক্রমিক শক্তিহ্রাস এবং অপরের শক্তি বৃদ্ধির কথা ওঠে না।

এইসঙ্গে ভক্তরাজের স্মৃতিশক্তিও লক্ষণীয়। ঘটনার কুড়ি বৎসর পরেও তিনি স্পষ্টভাবে স্বামীজীর খেদোক্তি স্মরণ করতে পেরেছিলেন, "মৃত্যু ইহার চেয়ে ঢের ভাল ছিল" ইত্যাদি। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, ভক্তরাজ তাঁর তরুণ বয়সেই স্বামীজীর দেশপ্রেমিকতার স্বরূপ ঠিক-ঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—যা একেবারেই পারেননি বয়স্ক ও বিজ্ঞ সদাশিবরাও। ভক্তরাজের অপূর্ব অভিজ্ঞতা ঃ "তাঁহার সকরুণ দেশপ্রেমিকতা দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম। এমন অকপট দেশানুরাগ যে হইতে পারে, ইহা প্রথম দেখিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য—তাহাদের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট" ইত্যাদি। ভক্তরাজের এই বিবরণ না থাকলে আমরা বুঝতেই পারতাম না, সদশিবরাও কর্তৃক উপস্থাপিত স্বামীজীর উক্তির আসল তাৎপর্য কি। ফলে স্বামীজীর মনোভাব সম্বন্ধে, সদাশিবরাওয়ের রচনার পরবর্তী পাঠকদের মনে ভ্রান্তি থেকে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ভক্তরাজের বিবরণ তাকে দূর করেছে।

ভক্তরাজের পক্ষে তরুণ বয়সে ঐপ্রকার অনুভব সম্ভব হয়েছিল তার কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর রক্তে বিবেকানন্দ-সত্য প্রবেশ করে গিয়েছিল। যে-যুবগোষ্ঠী কাশীতে পথিমধ্যে বিষ্ঠামূত্রলিপ্ত মুমূর্ষু রোগীদের কোলে তুলে নিয়ে এসে শুশ্রূষা করতে শুরু করেছিল স্বামীজীর প্রেরণায়—ভক্তরাজ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সত্য তাঁর মর্মগত হয়ে গিয়েছিল—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু" সর্বত্র বিরাজ-মান "সেই একই প্রেমময়।" সে সবার পায়ে "মনপ্রাণশরীর অর্পণই" দেশপ্রেম— বিশ্বপ্রেম—মানবপ্রেম।



আনন্দের সন্তান

রসিকরাজ রাখালরাজ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

'রসো বৈ সঃ'—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে সব কিছুর রস বলা হয়েছে। রস অর্থাৎ সার। আবার সার মানে আনন্দও। তৈত্তিরীয় উপনিষদেই আবার আছে—'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' অর্থাৎ ঋষিরা আনন্দকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে জানলেন। বস্তুতঃ আমরা দেখি যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁরা সবসময় আনন্দময়। শ্রীরামকৃষ্ণ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর ধর্মপ্রসঙ্গ জ্ঞানগম্ভীর কিন্তু সর্বদা রসসিক্ত। কৌতুকময়। প্রত্যেক তত্ত্বের সঙ্গে উদাহরণ, আর ছোট ছোট কাহিনী। গানও। আর সর্বোপরি দিব্য হাসি। সব মিলিয়ে তিনি যেখানে যেতেন সেখানে আনন্দের হাট বসত। এমন হাসাতেন সবাইকে যে মাঝে মাঝে অল্প বয়েসী যেসব শিষ্যেরা তাঁর কাছে আসত তারা হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেত। বলত—'আর হাসতে পারি না, এবার থামুন।'

"বাপ্‌কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।" শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ব্রহ্মানন্দ। প্রাক্‌-সন্ন্যাস নাম রাখাল। রসিকরাজ। দেখতে গম্ভীর, ধ্যানগম্ভীর। যেন হিমালয়। আধ্যাত্মিকতার জমাট রূপ। কিন্তু অন্তর রসে ভরা। বাপের ধারা রেখেছিলেন। স্বভাব বালবৎ। শিশুর মতো কৌতুকপ্রিয়। কত রকমের দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় খেলত। কিন্তু একা একা তো খেলা যায় না। সঙ্গী চাই। কলকাতায় এসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলরাম মন্দিরে উঠতেন। বলরাম-পুত্র তাঁর মন্ত্রশিষ্য। তিনি চাইতেন গুরু তাঁর কাছেই থাকেন, তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দের আকর্ষণ কোথায়? বলরাম মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য। এও একটা আকর্ষণের কারণ। মন্ত্রশিষ্যের আকুতি এও একটা কারণ। কিন্তু শিশুসুলভ স্বামী ব্রহ্মানন্দের বলরাম মন্দিরের প্রতি একটা বড় আকর্ষণ ছিল মনের মতো খেলুড়েদের সান্নিধ্য। ঐ বাড়িতে তখন বহু শিশু। মা-মাসীদের অত্যাচারে তারা জর্জরিত। তাদের একমাত্র জুড়োবার জায়গা—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনি তাদের বন্ধু, অতি আপনার জন, সমব্যথী। তাঁর কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যেত, আবার নতুন করে কি দুষ্টুমি করা যায় তার পরামর্শ পাওয়া যেত। দুনিয়ায় কেউ তাদের বোঝে না, বোঝে একজন—মহারাজ অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তারা মহারাজের ঘাড়ে-পিঠে চাপে। জানে না, বোঝে না যে তিনি সাধু, গুরুজন। লোকে বারণ করলেও শোনে না।

মহারাজ একদিন সব ছেলেমেয়েদের দাঁড় করিয়ে নাচ শেখাতে শুরু করলেন। তাল দিয়ে নাচ শেখাচ্ছেন। সঙ্গে একটা গানের কলি। 'এবার কোমরে হাত দাও, ঘুরপাক খাও, এক হাত তোল, এভাবে তাকাও, এভাবে হাস, এভাবে কোমর দোলাও' ইত্যাদি। মহারাজ কিন্তু আরাম কেদারায় বসে আছেন। বসে বসেই নাচের ভঙ্গি শেখাচ্ছেন। শিশুদের ভয়ানক আনন্দ—নাচ শিখছে। আর শিক্ষক স্বয়ং মহারাজ। বড়দের যেমন গুরুমহারাজ, তাদেরও গুরুমহারাজ। নাচের গুরু, যত দুষ্টুমি আছে তারও গুরু। কিছু দিন সর্বত্র নাচ শেখার ফল হল এই যে, শিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র নাচ অভ্যাস করে। একজন একরকম ভঙ্গি করে তো আর একজন বলে—'ও হল না, এই রকম।' সে দেখিয়ে দেয়। তারপর তর্ক, ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত মহারাজ মীমাংসা করে দেন। ক্রমে গিন্নীদের নজরে পড়ল এই নাচের ব্যাপারটা। কি সর্বনাশ! ধিঙ্গী মেয়েগুলো পর্যন্ত নাচতে শুরু করেছে। ধিঙ্গী মানে তাদের বয়স আট-দশ বছর হবে। কিন্তু কে তাদের শাসন করবে? মহারাজ তাদের আশ্রয়দাতা। মহারাজের কানে সেকথা তারা তুললে মহারাজ বললেন—'দাঁড়া, তোদের আর একটা নাচ শেখাচ্ছি।'

একবার মহারাজ বলরাম মন্দিরে আছেন, গঙ্গাধর মহারাজ অর্থাৎ স্বামী অখণ্ডানন্দও আছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক শিষ্য। স্বামী অখণ্ডানন্দও এক শিশু। তাঁর ধারণা সকালে উঠেই যদি এক-চোখ-কাণা বা এক-চোখ-বন্ধ করা লোক চোখে পড়ে যায়, তাহলে অমঙ্গল। একদিন স্বামী অখণ্ডানন্দ ঘুম থেকে উঠবেন, তখনও চোখ খোলেননি, কিন্তু জেগে আছেন, এই সময়ে এক শিশু তাঁর ঘরে এসে—'এই যে, মহারাজ, সুপ্রভাত।' গঙ্গাধর মহারাজ চোখ খুলেই দেখেন তার এক চোখ বন্ধ। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, বললেন—'কি সর্বনাশ, আমার দিনটা মাটি হল।' কিন্তু সে একা নয়, তার পিছনে এক ব্যাটালিয়ন ছেলেমেয়ে। সবারই এক-চোখ বন্ধ। সবারই মুখে এক কথা—'মহারাজ সুপ্রভাত।' স্বামী অখণ্ডানন্দ বললেন—'বুঝতে পেরেছি, এসব মহারাজের কাণ্ড!'

বলরাম মন্দিরে আছেন মহারাজ। সেখানে তখন বেশ কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়েও আছে। মহারাজ বলে পাঠিয়েছেন সব বাচ্চাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মহারাজ অন্ধকারের মধ্যে একটা ভালুকের চামড়া গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাচ্চারা তাঁর ঘরে এসে তাঁকে দেখেই ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। একটি ছেলে কিন্তু পালাল না। মহারাজ তাকে খুব স্নেহ করতেন। ভয়ে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে—তবু সে দু-হাত বাড়িয়ে মহারাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর বলছে—'আমি জানি, তুমি মহারাজ।' মহারাজ তখন ভালুকের সাজ খুলে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলেন। রঙ্গরসের ব্যাপারে তাঁর মাথা থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব বুদ্ধি বের হতো।

একবার মহারাজের সাথে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী শিবানন্দও বলরাম মন্দিরে আছেন। রোজ তিন গুরুভাই একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে যান, ফিরে এসে জলখাবার খান। তাঁদের জলখাবার পৃথক্ থালায় ঢাকা থাকত। একদিন সকালে মহারাজ তাঁর গুরুভাইদের বললেন—'আজ আর আমি স্নান করতে যাব না, শরীরটা ভাল নেই; আপনারা যান।' তাঁরা স্নান করে ফিরে এলেন। দেখলেন রোজকার মতো তিনজনের খাবার টেবিলে সাজানো আছে। কিন্তু তাঁরা ঢাকা তুলে অবাক! থালা শূন্য, কে তিন জনেরই খাবার খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। তাঁরা মহারাজের ঘরে উঁকি মেরে দেখেন মহারাজ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। অসুখ কিনা! চাদরের নিচে দুষ্টু শিশুটি তখন মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

একবার মহারাজ উড়িষ্যার কোঠারে আছেন। কোঠারে বলরামবাবুর জমিদারি। মহারাজ মাঝে মাঝে এসে থাকেন এখানে। স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখলেন—'ভাই, তোমাকে, অনেক দিন দেখিনি, একবার তুমি এখানে বেড়িয়ে যাও।' স্বামী অখণ্ডানন্দ সারগাছিতে অনাথদের নিয়ে থাকেন, তাদের ছেড়ে বড় একটা কোথাও যেতে চাইতেন না। তাঁর জন্যে গুরুভাইরা সবাই যেমন চিন্তা করেন, তেমন গর্বও বোধ করেন। কয়েকবার লেখার পর স্বামী অখণ্ডানন্দ কোঠারে এলেন। মহারাজের কথা ফেলা বড় শক্ত। গুরুপুত্রকে গুরুর মতোই তাঁরা দেখতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ কয়েকদিন থাকার পর সারগাছিতে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু মহারাজ ছাড়বেন না কিছুতেই। নানা অজুহাত দেখিয়ে আটকে রেখেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ পাঁজি মানেন। পাঁজিতে ভাল দিন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। শেষে একটা ভাল দিন পাওয়া গেল, সেই দিনই রাত্রের ট্রেনে স্বামী অখণ্ডানন্দ কলকাতার দিকে রওনা হলেন। পাল্কিতে করে স্টেশনে যেতে হয়। রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ নিশ্চিন্ত মনে পাল্কিতে চেপে বসলেন। অন্ধকার পথ, তখন কোঠার শহর হয়নি। বোধহয় স্বামী অখণ্ডানন্দও একটু ঝিমিয়েও পড়েছিলেন। তবু বেহারাদের দু-একবার জিজ্ঞাসাও করেছেন—'আর কতদূর?' তারা বলেছে—'আর একটু।' স্বামী অখণ্ডানন্দ দেখছেন, দূরে একটা বাড়ি, বেশ আলো জ্বলছে। ভাবছেন, স্টেশনে এসে গেছেন। পাল্কি থামল। অখণ্ডানন্দ মহারাজ পাল্কি থেকে নামলেন। দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং মহারাজ। তিনি অখণ্ডানন্দ মহারাজকে সহাস্য সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন: 'কি ভাই, ফিরে এলে যে?' অখণ্ডানন্দজী বুঝলেন মহারাজের গোপন নির্দেশে বেহারারা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে তাঁকে কোঠারের বাড়িতেই আবার ফিরিয়ে এনেছে।

মহারাজ মহারাজ। অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ।

কৃপা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রকে যেমন বাঁধতে হয় যেমন তবলা, যেমন সেতার সেই রকম জীবনকেও বাঁধার প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক জগৎ ও জীবনকে বাঁধা বলতে স্কুল ও কলেজী শিক্ষাকে বোঝায়। আমি পাস করলুম, নামের পেছনে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার ল্যাজ জুড়ে দিলুম। মনে করলুম, জীবনের মোক্ষ লাভ হয়ে গেল। জীবন বলতে আমরা বুঝি ভাল একটা জীবিকা, কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি, জীবন বলতে আমরা বুঝি পরিচ্ছন্ন একটি সংসার, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। জীবন বলতে আমরা বুঝি শুধুই সাফল্য। বৈষয়িক জগৎ মানুষ আর রেসের ঘোড়ায় বিশেষ কোন পার্থক্য রাখেনি। এই ঘোড়াটি হল আমাদের কেরিয়ার। আজকাল যুবকদের মুখে একটি কথাই শোনা যায়—কেরিয়ার বাগাও। যারা কেরিয়ারিস্ট তারা স্বভাবতই স্বার্থপর। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আধুনিক সমাজে মানুষের বিচার তার কেরিয়ারের নিরিখে। যে-মানুষটি নিজেকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, যে-মানুষটির কোন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, যে-মানুষটি লোককে তাক লাগিয়ে দেবার মতো একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে পারেনি, যে-মানুষটি তার মেয়ের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করে হাজার খানেক মানুষকে খাওয়াতে পারেনি সেই মানুষটি সাধারণের বিচারে অপদার্থ।

ভারতীয় জীবনদর্শন কিন্তু ভিন্নতর শিক্ষাই দিতে চায়। যে-শিক্ষার মূল কথা হল—আদর্শ মানুষ হও। আদর্শ মানুষ জিনিসটা কি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা? ভাল চাকরি? বিরাট ব্যবসায়ী? বিশাল প্রতিপত্তি? আদর্শ মানুষ হল যে সহজ, সরল, নিরহঙ্কারী, সংবেদনশীল, সপ্রতিভ, বিনয়ী, ভদ্র, নিয়মনিষ্ঠ, সংযত। আদর্শ মানুষ ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত। ঈশ্বরকে আমরা দেখিনি। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের একটা কল্পনা আছে, আমাদের মধ্যে যে যে গুণের অভাব আছে সেই গুণসমূহ বিশাল এক পুরুষে আরোপ করে আমরা তাঁকেই ঈশ্বর বলে থাকি। ঈশ্বরের কাছে আমরা কি চাই? চাই তাঁর করুণা। করুণা জিনিসটা কি? কৃপা। কিসের কৃপা? কৃপা দু-ধরনের। এক, জাগতিক। গাড়ি দাও, বাড়ি দাও, চাকরি দাও, ভোগ দাও, রোগারোগ্য দাও, যতরকমের 'দেহি' আছে সব দাও। হে ঈশ্বর, তোমার কৃপায় আমার জীবন ও সংসার যেন ধনে জনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি। অনন্ত চাওয়া। কৃপাময়ের কাছে চোখ বুজে এই চাওয়াটাকেই আমরা উপাসনা বলে মনে করি। এই চাওয়ার নামে একটি ফুল তাঁর শ্রীচরণে অর্পণকেই আমরা পুজো বলে মনে করি। তিনি সব দেবেন এই বিশ্বাসকেই আমরা মনে করি ঈশ্বর-বিশ্বাস। আস্তিকতা।

আধুনিক সমাজে মানুষের বিচার তার কেরিয়ারের নিরিখে। যে-মানুষটি নিজেকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, যে-মানুষটির কোন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নেই, যে-মানুষটি লোককে তাক লাগিয়ে দেবার মতো একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনতে পারেনি, যে-মানুষটি তার মেয়ের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করে হাজার খানেক মানুষকে খাওয়াতে পারেনি সেই মানুষটি সাধারণের বিচারে অপদার্থ।
ভারতীয় জীবনদর্শন কিন্তু ভিন্নতর শিক্ষাই দিতে চায়। যে-শিক্ষার মূল কথা হল—আদর্শ মানুষ হও।

এর কোনটি না পেলে আমরা তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠি। নির্দ্বিধায় বলে বসি—ঈশ্বর-ফীশ্বর বাজে, বোগাস একটা ব্যাপার। যাঁরা চালাক মানুষ তাঁরা ব্যবহারিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে দেখলেন ক্ষমতাশালী মানুষের শ্রীচরণে তৈল আরোপ করলে কৃপা অনেক সহজেই পাওয়া যায়। সহজেই কেরিয়ার বাগানো যায়। যেমন বাঘের পেছনে ফেউ।

এঁদের দৃষ্টিতে ক্ষমতাশালী মানুষই হলেন কৃপাময় ঈশ্বর। এই ফেউবৃত্তি অনেক বেশি নিশ্চিত ফলদাতা। সুতরাং ঈশ্বরের ভজনা না করে নেতার ভজনা করা অনেক বেশি কাজের। আবার অনেকে দেখলেন ধর্মের প্রতি, ধার্মিকের প্রতি মানুষের একটা সহজাত দুর্বলতা আছে। অতএব ধর্মের ভেকধারণ করলে কিছু মানুষকে চরিয়ে খাওয়া যায়। এঁদের ঈশ্বর-বিশ্বাস হল ঈশ্বরকে মূলধন করে কিছু মানুষের সহজ বিশ্বাসকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানো। অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন এঁদের কেরিয়ার। এযুগে এই ধরনের কেরিয়ারিস্ট অনেক আছেন যাঁরা ঈশ্বরের 'মিডল-ম্যান' হিসেবে কাজ করেন। এঁদের অনেক যোগাযোগ থাকে। সেটাকে কাজে লাগিয়ে কিছু কিছু মানুষের সহজ চাওয়াকে তাঁরা পাইয়ে দেন। তাঁদের মাধ্যমে এক বস্তা সিমেন্ট, কি এক টন লোহা, কি ছেলের চাকরি অথবা একটা পাসপোর্ট পাওয়াকে মনে করা হয় স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপালাভ। এঁরা যত না দেন তার থেকে বেশি নেন। এঁরা ধর্মটাকে এত সরলীকৃত করে ফেলেছেন যে ধর্মের আসল সংজ্ঞাটাই পাল্টে গেছে।

দুই, কৃপা মানে—তুমি কৃপা করে আমার সব চাওয়াটি তুলে নাও। আমার সমস্ত অভাববোধ তুমি হরণ কর। আমি যেন বুক ঠুকে হাসি মুখে বলতে পারি, আমি কিছুই চাই না। যেমন ঠাকুর বলেছিলেন, টাকা মাটি মাটি টাকা, যেমন স্বামীজী বলেছিলেন, প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা, যেমন তুলসীদাস বলেছিলেন, সব ছোড়য়ে তো সব পাওয়ে। কৃপা মানে এমন একটি মন পাওয়া যে মন দুঃখে সুখে অবিচলিত, এমন একটি মন পাওয়া যে মন মৃত্যুভয়ে ভীত নয়, এমন একটি মন পাওয়া যে মন ঈশ্বর ছাড়া আর কারও কাছে নতি স্বীকার করে না, এমন একটি মন পাওয়া যে মন নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। এমন একটি মন চাই যে মন আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় না, সে মন কর্মী কিন্তু কর্মফলের প্রত্যাশী নয়। ফলের জন্য কাজ করে না, কাজের জন্য কাজ।

জীবনকে বাঁধা বলতে বোঝায় এই সুরে বাঁধা। বর্তমান যুগের শিক্ষা মানুষের এই আত্মিক উদ্বোধনের কথা আদৌ চিন্তা করে না। নিরত আমাদের লোভী, আমাদের ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বার্থান্বেষী, একদেশদর্শী, আত্মপর করে তুলছে। জীবনকে বাঁধার কৌশল নিজেদের হাতেই ধরা আছে, সে কৌশল হল বিচার। অন্যকে বিচার নয়, নিজেকে বিচার। গীতাতে একটি কথা আছে—তুমি নিজেই তোমার পরম বন্ধু হতে পার, আবার তোমার পরম শত্রুও হতে পার। অমৃত শব্দের অর্থ হল শান্তিলাভ, স্থিতিলাভ। কোথায় স্থিতি? নিজের মধ্যে নিজের স্থিতি। নিজেকে নিজের হাতে আমলকীর মতো ধরে রাখতে হবে, বিচার করতে হবে কেন আমি এসেছি, কি কারণে এসেছি, কি করতে এসেছি। আহার, নিদ্রা, মৈথুন এই তিন প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছি কিনা। রুমি বলেছিলেন, জীবন হল একটি মোমবাতি। ক্ষইতে ক্ষইতে জ্বলতে থাকে, আলোক বিকিরণ করে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার এই দেহখানি তুলে ধর তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর।" মানুষের দেবালয়ে নিজেকে প্রদীপের মতো প্রোজ্জ্বল না করতে পারার বেদনাই হল দুঃখ, আর মৃত্যু হল জীবিত অবস্থায় নিজের আত্মপুরুষকে অচেতন করে রাখা।

বর্তমান যুগের শিক্ষা মানুষের এই আত্মিক উদ্বোধনের কথা আদৌ চিন্তা করে না। নিয়ত আমাদের লোভী, আমাদের ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বার্থান্বেষী, একদেশদর্শী, আত্মপর করে তুলছে। জীবনকে বাঁধার কৌশল নিজেদের হাতেই ধরা আছে, সে-কৌশল হল বিচার। অন্যকে বিচার নয়, নিজেকে বিচার। গীতাতে একটি কথা আছে—তুমি নিজেই তোমার পরম বন্ধু হতে পার, আবার তোমার পরম শত্রুও হতে পার। অমৃত শব্দের অর্থ হল শান্তিলাভ, স্থিতিলাভ। কোথায় স্থিতি? নিজের মধ্যে নিজের স্থিতি। নিজেকে নিজের হাতে আমলকীর মতো ধরে রাখতে হবে বিচার করতে হবে কেন আমি এসেছি, কি কারণে এসেছি, কি করতে এসেছি। আহার, নিদ্রা, মৈথুন এই তিন প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছি কিনা।

জীবন হল এক মহাসঙ্গীত যা 'হেসে কলকল গেয়ে খলখল্ তালে তালে দিয়ে তালি' উৎস থেকে সাগরের দিকে এগিয়ে চলে। যাবার পথে ফেলে রেখে যায় তার আলোকিত বেঁচে থাকার পলি যার নাম আদর্শ। আদর্শ হল জীবনকে দর্শনীয় করে তোলা। রূপে নয়,বাইরের ঐশ্বর্যে নয়—অন্তরের প্রকাশে। সেই প্রকাশ হল নিজের জ্যোতির্ময় সত্তাকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া। শিলালিপিতে নয়, সৌধে নয়, প্রচার-পত্রিকায় নয়, ইতিহাসের পাতায় নয়।

আস্তিকের ধর্ম বড় সহজ, মনের যোগ না থাকলেও মানুষকে ভাঁওতা দেওয়া যায়। নাস্তিকের ধর্মই হল ধর্ম। নাস্তিকের বিশ্বাসে সাংঘাতিক একটা জোর আছে। সে-জোরের নাম অবিশ্বাস।

আদর্শ হল জীবনকে দর্শনীয় করে তোলা। রূপে নয়, বাইরের ঐশ্বর্যে নয়—অন্তরের প্রকাশে। সেই প্রকাশ হল নিজের জ্যোতির্ময় সত্তাকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া। শিলালিপিতে নয়, সৌধে নয়, প্রচার-পত্রিকায় নয়, ইতিহাসের পাতায় নয়।

মানুষের বিচার-পদ্ধতিতে দুটি ধরন আছে, এক, তুমি অপরাধী, এখন প্রমাণ কর যে তুমি অপরাধী নও। দুই, আমরা মনে করছি তুমি অপরাধী নও, তোমার বিরোধীপক্ষ এখন প্রমাণ করুক যে তুমি অপরাধী। আস্তিক মেনেই নিচ্ছে ঈশ্বর এক কৃপাময় সত্তা। আমি চাইব তিনি আমাকে দেবেন, না দিলে তিনি নেই এবং আমি নাস্তিক। এই নাস্তিকতা মানুষকে এমন এক হতাশা আর বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে যায়, যাকে বলা চলে মৃত্যুরই নামান্তর। ঈশ্বর কোন দিনই অপরাধীর মতো মানুষের আদালতে এসে প্রমাণ করতে চাইবেন না যে আমি নিরপরাধ, করুণাময়। কারণ, তিনি জানেন মানুষ নামক বিচিত্র জীবের অভাবের ও চাওয়ার শেষ নেই। কারণ সে জীবনের ভাবটি ধরতে পারে না, 'ভিখারী' হতে চায় লক্ষপতি, লক্ষপতি হলে সে হতে চায় কোটিপতি, কোটিপতি হলে সে কামনা করে ইন্দ্রত্ব। সেই কারণে তুচ্ছতার সংসারে যারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই ধরনের স্বার্থপর কাঙালদের কাছ থেকে ঈশ্বর দূরে সরে থাকতেই পছন্দ করেন।

নাস্তিক কিন্তু ধরেই নেয় ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আছে সে, আর আছে প্রতিযোগিতার জগৎ। যেটুকু পেতে হবে তা পেতে হবে নিজের ক্ষমতার জোরে। ফলে আস্তিকের চেয়েও তার পুরুষকার অনেক বেশি, আর ঈশ্বর এই পুরুষকারের জাগরণই পছন্দ করেন। কারণ, উপনিষদ্ বলছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' নাস্তিক সেই কারণে তার কৃপাকণিকার কণিকাটুকু পেলেই ঋজুবুদ্ধি দিয়ে ভাবতে বসেন এটা কি হল, কোথা থেকে এল। এ তো আমার প্রাপ্য ছিল না, এ তো আমি চাইনি, তবে কে দিলেন? নাস্তিকের শেষ পরিণতি আস্তিকে। সে তখন অভিভূত হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে, তুমি কে তা জানি না, তুমি কোথায় তাও জানি না, কিন্তু বুঝেছি তুমি আছ। তার বিশ্বাস তখন গেয়ে ওঠে—"যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ অযাচিত তব দান। দিইনি মূল্য বুঝিনি মহিমা তবু দান অফুরান।" আস্তিক কত সামান্য কারণে নাস্তিক হতে পারে তার একটি ঘটনা বলি। একদিন একটি ভিড় বাসে উঠে আমি ঈশ্বরকে বললুম, 'হে ঈশ্বর আমাকে এমন একটা আসনের পাশে দাঁড় করিয়ে দাও যে-আসনের যাত্রী পরের স্টপেজেই নেমে যাবেন আর আমি টুক করে বসে পড়ব। কারণ, হে ঈশ্বর, আজ আমি বড় ক্লান্ত। ঈশ্বর আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন। আমি যেখান থেকে সরে এসে ঈশ্বর-নির্দেশিত বলে যে আসনটির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সেই আসনের যাত্রী বাসের শেষ টার্মিনাস পর্যন্ত গেলেন, আর যেখান থেকে সরে এলাম, তিনি পরের স্টপেজেই নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘোষণা করলাম—ঈশ্বর তুমি নেই।' এই হল তথাকথিত আস্তিকের জীবনের সুর।

জীবনকে এই না চাওয়ার সুরে বাঁধাটাই হল ধর্ম, আর যে না চায় সেই হল পরম শান্তির অধিকারী। আর ঈশ্বরের অপর নাম হল শান্তি সংহতি ও সুর।

জাতির সামনে যে আলোকস্তম্ভ

স্বামী নির্জরানন্দ

দুর্বার কালস্রোতে বর্তমান শতাব্দীর চিন্তাশীল মানবমন থমকে এসে দাঁড়িয়েছে একটি বিরাট আলোকস্তম্ভের সম্মুখে। সেই আলোকস্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ। উন্নতশির সেই আলোকস্তম্ভের উজ্জ্বল আলোকরশ্মিকে এড়িয়ে যাওয়া আজ অসম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর আজ একশ পঁচিশ বৎসর পার হতে চলেছে। আজ এসেছে আমাদের আত্মসমীক্ষার ক্ষণ। যে পুণ্য-ভূমিতে স্বামীজীর আবির্ভাব সে দেশ তাঁকে কতটা অনুসরণ করে চলেছে, আজ তাই জাতির সমীক্ষার বিষয়।

স্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষকে আহ্বান করে বলে-ছিলেন: "ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরব-শিখরে আরূঢ় ছিল তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর উজ্জ্বলতর মহত্তর অধিকতর মহিমামণ্ডিত করিবার চেষ্টা কর।"

ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে আজ থেকে একচল্লিশ বৎসর আগে। স্বাধীনতা-লাভের পরবর্তী ইতিহাস কিন্তু নৈরাশ্যজনক ও অপ্রত্যাশিত। মহান জাতির সার্বিক উন্নয়নের পথে প্রাথমিক বিঘ্ন অপসারণই ছিল মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্য। আজ ভারতগগন পুনরায় মেঘাচ্ছন্ন। তার প্রধান কারণ দেশে যথার্থ মানুষ তৈরি হচ্ছে না। বৈদেশিক শক্তির সুদৃঢ় শৃংখল বিচূর্ণ করে পূর্ণ স্বাধিকার অর্জিত হয়েছে কিন্তু তার সদ্ব্য-বহার হচ্ছে কি? যাঁরা একটু চিন্তাশীল এবং দেশ-প্রেমিক তাঁরাই ভাবছেন, আজ দেশের এ অভাবিত দুরবস্থার জন্যই কি মুক্তি-সংগ্রামীরা ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে প্রাণাহুতি দিয়েছিলেন? দেশ যেন ক্রমেই অবনতির নিম্ন পথে চলেছে।

স্বামীজী প্রথমেই চেয়েছিলেন—যথার্থ মানুষ। তাই তিনি পরাধীন ভারতবর্ষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন: "এস, মানুষ হও।··· মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।" বলেছিলেন: "দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী"। বলেছিলেন: "মানুষ চাই।" বলেছিলেন: "জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান।" দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—'মানুষ তৈরি'র ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণ করাই একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু আসল কাজটিই অন্যান্য উন্নয়ন-প্রকল্প অপেক্ষা গৌণ বিবেচিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর বহু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সব প্রকল্পের লক্ষ্য যে মানুষ সেই মানুষই কার্যতঃ হয়েছে উপেক্ষিত। তাই যথার্থ মানুষের অভাবে সকল প্রকল্পই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিরাট বিরাট আকাশচুম্বী সৌধ যেমন বালির ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হলে একদিন তাসের ঘরের মতো ভূমিসাৎ হয়ে যায়, তেমনি ধূলিসাৎ হয়ে যায় একটি জাতির ইমারত যদি তার ভিত্তিতে সত্যিকারের মানুষের শক্তি না থাকে। একটি জাতিকে ধরে রাখবে কে? চরিত্রবান মানুষই সর্বকালে সকল জাতির একমাত্র আশা। স্বামীজী বলেছেন: "জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র।" চারিত্রিক সুদৃঢ়তাই জাতির সমূহ শক্তিকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। চরিত্র গঠিত না হলে সব দেশেরই কল্যাণ-মূলক সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, কোটি কোটি টাকার প্রকল্প সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। আজ ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থার কারণ খুঁজতে হবে সেখানেই।

মানুষ তৈরির একমাত্র উপায় সৎশিক্ষার প্রবর্তন। প্রত্যেক জাতিরই একটি লক্ষ্য বা আদর্শ আছে। সে-লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় জাতীয় শিক্ষা এবং ঐহিক উন্নয়নকল্পে জাতীয় প্রকল্পের সম্পূর্ণ রূপায়ণ। লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিকের পথভ্রমণ শুধুমাত্র ক্লান্তিরই কারণ হয়, লক্ষ্যে পৌঁছানোর তৃপ্তিলাভ হয় না। বর্তমান ভারত লক্ষ্যহীন, অর্থাৎ জাতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত। এ-কারণে আজ সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বোদয়ের প্রচেষ্টায় প্রভূত অর্থের নিদারুণ অপচয়মাত্র ঘটেছে। কল্যাণের পথে কিঞ্চিৎ

অগ্রসর হয়েও জাতি ক্রমশঃ অবক্ষয়ের পথেই যেন চলেছে।

স্বামীজী বলেছেন: "শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে। প্রত্যেক জাতিই অন্য জাতির ভাবধারা প্রতিনিয়ত নিজের ধাঁচের মধ্যে অর্থাৎ তার জাতীয় স্বভাবের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। কোন জাতির নির্দিষ্ট আদর্শ ধ্বংস করার সময় এখনও হয়নি। শিক্ষা যে-কোন সূত্র থেকেই আসুক না কেন, যে-কোন দেশের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে তার ভাবসামঞ্জস্য আছে; কেবল তাকে গ্রহণ করবার সময়ে জাতীয় ভাবাপন্ন করে নিতে হবে অর্থাৎ সে শিক্ষা যেন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হয়।"

বহু হাজার বৎসর পূর্বেই এই মহান জাতির আদর্শ নির্ধারিত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ—আধ্যাত্মিকতা। প্রাচীন ঋষিগণ বহু সাধনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই জাতির সম্মুখে এই আদর্শ সংস্থাপিত করে গেছেন। ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, ঐহিক উন্নয়ন প্রভৃতি সবকিছুই আধ্যাত্মিকতা লাভেরই সহায়ক এবং তদভিমুখী হওয়া প্রয়োজন এবং তখনই জাতির পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হবে। আজ ভারতের সামনে অভ্যুদয়ের এইটিই একমাত্র পথ।

আজ ভারতবর্ষের বৃহত্তম সংকট—আদর্শগত। আদর্শবিহীনতা বা পরানুকরণের মনোবৃত্তি দ্বারা বৈদেশিক বা বিজাতীয় আদর্শ-গ্রহণের প্রবণতাই আমাদের মূল সংকট। আমাদের বড় ভুল হয়েছে এই স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির আদর্শানুযায়ী শিক্ষা প্রবর্তন করায় যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আজ অনেক আদর্শ আমাদের সামনে। কিন্তু যে-মহান আধ্যাত্মিক আদর্শ হাজার হাজার বছর ধরে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে সে-আদর্শ পরিহার করে অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত, অপরীক্ষিত ও ঐতিহ্যবিরুদ্ধ কোন আদর্শ গ্রহণ করা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হবে কিনা এবং তা প্রজ্ঞার পরিচায়ক হবে কিনা তা আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ একচল্লিশ বৎসরেও ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষাদর্শ রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। অথচ শিক্ষা প্রকল্প রূপায়ণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে চলেছে। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনে যত জাতীয় অর্থ ব্যয় হয়েছে, চরিত্রগঠন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে তেমন বিজ্ঞান-সম্মত প্রকল্পাদি এখনও গ্রহণ করা হয়নি। নিম্ন বিদ্যালয় থেকে উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রমগুলিতে চরিত্রগঠনের উপায় ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতটা শিক্ষণীয় বিষয় থাকে? ভারতীয় আদর্শে চরিত্রগঠন করার শিক্ষা আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক হতেই হবে। 'আধ্যাত্মিকতা' অর্থে কোনও বিশেষ ধর্মমত অনুসরণ করা নয়। আজ জাতির যে মূলমন্ত্র—"সত্যমেব জয়তে", "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"—তা-ই জাতীয় চরিত্রের চরম লক্ষ্য। তারই অপর নাম 'ধর্ম' বা 'আধ্যাত্মিকতা'। জাতির সকল উন্নয়ন-প্রকল্প ও শিক্ষারও লক্ষ্য তা-ই এবং তদনুযায়ী প্রকল্পসমূহও রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পাঠক্রমেও আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে তার গুরুত্ব উপলব্ধি হবে না। সারা ভারতবর্ষে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে হয়তো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সে-সমস্ত ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। একারণে 'মানুষ গড়ার শিক্ষা'কে জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'মানুষ-গড়ার' সেই মহত্তম ব্রত গ্রহণ করলে তবেই ভারতবর্ষ তার লক্ষ্যে পেঁছিতে পারবে। স্বামীজী বলেছিলেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন: "আমাদের প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন।"

স্বামীজীর সেই বাণী বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেরণাদায়ী অমোঘ মন্ত্রস্বরূপ হোক। তাঁর প্রদর্শিত পথেই জাতিকে আজ অবলম্বন করতে হবে।

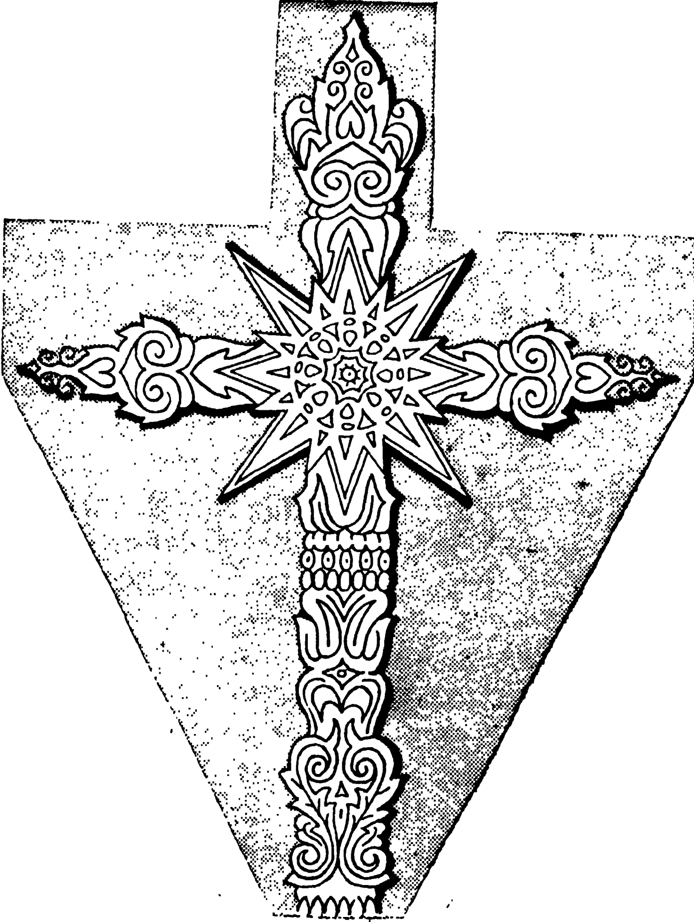


মাধুকরী

ক্রুশে, ক্যান্সারে কোনও ভেদ নেই

সন্তোষকুমার ঘোষ

তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা, এই সাহসও জোগাচ্ছেন তিনি। তাছাড়া নজির তো আছেই: গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী। ক্রিস্টোফার ইশারউডও যেখানে সুনিবিড় শান্তির নীড় পেয়ে যান, সেই নুনের পুঁটুলি ডুবে যাবে, জানি। সমগ্র সমুদ্রকে কে কবে দৃষ্টিপটে আঁকতে পেরেছে? তবু এক আঁজলা জল বোধহয় তুলে আনা অসম্ভব নয়। সেও সাগরই। তার স্পর্শ, তার স্বাদ।



অক্ষয় বটতলে, কী এমন পাপ করেছি যে স্নিগ্ধ এতটুকু ছায়া পাব না? পাপীজন-শরণ প্রভু উৎসাহের উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছেনই, শুধু চাই দেখার শক্তি, আর এগিয়ে যাওয়ার বেপরোয়া স্পর্ধা। যেমন পাহাড়ও। তার শ্যামল শরীরে কত আরণ্যক জীবের আনাগোনা। তাদের নিয়ে খেলায়, সস্নেহ প্রশ্রয়দানে সে বালকোপম। যদি সে অগ্নিগিরি, তবে শিখর ফুঁড়ে কখনও লাভাস্রোত ছুটতেও

পারে, যেন উন্মাদের প্রায়। নতুবা স্থির, নীল, নিমীল ধ্যানমৌন, সমাধিস্থ, আত্মসমাহিত। সব রূপ মিলিয়েই পর্বত, যেমন বিশ্বরূপ মিলিয়েই তিনি।

সাধ্য কি এই আলেখ্য আঁকি। আমাদের সম্বল তো প্রধানতঃ কথামৃত, বস্তুতঃ একমাত্র প্রামাণিক খনি। প্রামাণিক কেন? না, শ্রীশ্রীমা নিঃসংশয় নিঃশর্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে। সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ, বিশেষতঃ স্বামীজী 'শাবাশ' বলেছেন, এই কারণে। নতুবা না শর্টহ্যানড, না টেপরেকর্ডার, তথাপি উত্তরকাল শ্রীম'র অলৌকিক ধী আর স্মৃতির কাছে কৃতজ্ঞতার দায়বন্ধ হয়ে আছে কি সাধে? কী অবতার, কী প্রেরিত পুরুষ, জগৎ জুড়ে ঐ এক ধারা। তাঁদের স্বহস্তের লিপি কদাচিৎ মেলে। কোনও মথি কিংবা লুক পরে প্রচার করবেন, তবে আমরা সুসমাচার পাব। বুদ্ধবাণী প্রভৃতি সম্পর্কেও একই রীতি। এমন কি গীতা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উবাচ হতে পারে, কিন্তু তা লিখিত হয়েছে অন্য হাতে। কথামৃত বিষয়ে একটুখানি খেদ, এটি মোটে শেষ কয়টি বছরের বাণী যে। তাও আবার মুষ্টিমেয় কিছুদিনের। কোথায় গেল তাঁর কামারপুকুরের বাল্যলীলা, কিংবা দক্ষিণেশ্বরের আর্ত সেই সব সন্ধ্যা যখন তিনি ছাদে দাঁড়িয়ে "তোরা কোথায়, আসবি না? আর কবে? আয়, আয়, আয়" বলে অন্তর্ভেদী আকুল আহ্বান জানাতেন? 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর পাত্রে তার অল্পই রক্ষিত-সঞ্চিত মাত্র।

তবু ওঁরা এলেন। একে একে। কেশব সেন প্রমুখ যে কিছু লিখেছিলেন, সেটা ঐতিহাসিক অমোঘতা। তারপর বিস্ময়কর সেই দৃশ্য, সেই সংঘটন, যার বর্ণনায় পরাস্ত হয়ে শব্দের জাদুকর ঈশারউডকেও একটিমাত্র অনচ্ছ কথায় ব্যাপারটা ব্যক্ত করতে হল; ফিনোমেনন। তাঁর দর্শন নিয়ে বাচালতা করব না। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতা-দ্বৈতবাদ ইত্যাদি গুরুপাক বিতর্ক পরিহারই শ্রেয়, হেতু এসব প্রসঙ্গে বাগবিস্তার আমার সাধ্যাতীত। ও কাজ, অধিকারীদের জন্য তোলা থাক। যিনি এই সাকারবাদী, এই নিরাকারে আত্মস্থ, তাঁকে তর্কচূড়ামণিদের আখড়ায় টেনে এনে কাজ কি, বিভোল অঙ্গে যে হায় বসনখানিও থাকবে না। বরং সব পথ এসে মিলে গেছে শেষে যাঁর করুণাকমল নয়নে সেই আত্মভোলা ভুবনমোহন রূপখানি খানিক দেখি। হাততালি দিয়ে যিনি গান গাইছেন, গান শুনছেনও। যিনি সাধক, তিনি সঙ্গীতশিল্পীও। এক অঙ্গে এত?

এ বড় অবাক ব্যাপার, তখনকার কলকাতার চোস্ত ইংরেজীনবিশেরা বেদান্তের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের খিচুড়ি-গাছের খানা পাকিয়েও বিজাতীয় ঢল ঠেকাতে পারছেন না। অথচ এক পূজারী ব্রাহ্মণ (অলৌকিক বিচারে অর্ধশিক্ষিত বললেই হয়, কারণ তাঁর পুঁজিপাটা তো লোককথা, লোকগাথা, কিংবদন্তী আর অল্পস্বল্প শাস্ত্র আর মন্ত্রের শ্রুতি) কিনা অবলীলায় সেই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করেন, বিশাল বাঁধ তৈরি হয়ে যায় তাঁর উত্তর-সাধকদের হাতে। এও একটা কীর্তি। আমাদের বোধের অগম্য। যেমন অবোধ জীবজন্তু যখন জঙ্গল ঠেলে নিজের ওষধির শিকড়টি খুঁজে আনে, আমরা বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা পাই না, বলি 'ইনটুইশন'। মানবেতর প্রাণীরা যেমন, মানবের অধিক মানবেরাও তেমনই স্বকীয় অলৌকিক শক্তিতে অনায়াসে এমন সব কূট প্রশ্ন প্রাঞ্জল করে দেন, যা সাধারণ মাপের বিদ্যাবুদ্ধি বৈদগ্ধের পক্ষে বিস্ময়। পণ্ডিতেরা তলিয়ে যান, অথচ অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে পার হয়ে যান তাঁরা, যাঁরা মহাপ্রাণ। দিব্যজ্ঞানে আমাদের জন্যে নিপুণ নির্ভুল ছন্দে যেন 'সহজ পাঠ' তৈরি করে দেন। এই নিরিখে বিচার করলে কিছুটা যদি বোঝা যায় রামকৃষ্ণদেবকে। আধুনিক বিজ্ঞানও কি এমন ধ্বনির কথা বলে না যা শ্রুতিপার অথবা সেই অতিবেগুনি বা লাল-উজানি আলোর কথা, যা দৃষ্টিপার? দর্শন থাক, বরং তাঁর আর-এক আশ্চর্য দানের কথা বলা যাক। পশ্চিমবঙ্গের বিনষ্টপ্রায় ইডিয়ম তাঁর সমকালীন বা পরকালীন কোনও সাহিত্য রথী-মহারথীর দ্বারা রক্ষিত হল না, যা আছে তা ওই গ্রাম্য সাধকটির কথামৃতেই আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর স্বভাবী উপমা আর সরল কবিত্বশক্তিও স্মরণ করি। শুধু 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নয়, তাঁর জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্র-নাথকেও দেশ-বিদেশের প্রণামের সঙ্গে তাঁর স্বকীয়

প্রণামটিকেও টেনে আনতে হয়। পরমাশ্চর্য আর কাকে বলে? এই প্রণাম, বলা বাহুল্য, ধর্মমতকে নয়, কর্মধারাকে। এই কর্ম অর্থাৎ সেবা শিক্ষা ইত্যাদি তাঁর মহত্তম উত্তরাধিকার। স্বামীজীর নেতৃত্বে শিষ্যবৃন্দ যে দায়ভাগ অঙ্গীকৃত করে নেন। আমার কেমন মাঝে মাঝে মনে হয়, ঠাকুরের জীবদ্দশায় নরেন্দ্র ছিলেন, রাজা নাটকের যেন সুদর্শনা (কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যাকুল সংলাপ স্মরণীয়) আর রাখাল মহারাজ বা শরৎ মহারাজ, এরা কেউ ঠাকুরদা, কেউ বা সুরঙ্গমা। বিনা প্রশ্নে প্রণিপাত, সমর্পণ, গ্রহণ। আর, সব কিছুর মধ্য দিয়ে মাঙ্গলিক সূত্রবন্ধনের মতো শ্রীশ্রীমা। নতুবা এই মিশন এমন মিশন হত না। তিনিই ধাত্রী, তিনিই প্রেরণা। ঠাকুর, মা, নিবেদিতা, ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজী—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু রচনার সাধ এই অক্ষম লেখকের অনেক দিনের। প্রেম-ভালবাসার একটা গলিপথই চিনে এসেছি, অকপটে কবুল করি। ঐ 'পঞ্চকের' সম্পর্ক নিয়ে পরিপ্লুত কিছু লিখতে পারলে ভালবাসা শব্দটাই একটা ব্যাপ্ত আয়তনে, বোধে বোধে ছড়িয়ে যেত। কিন্তু রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি গড়া বুঝি আর হল না। প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আগেই বলেছি আধ্যাত্মিকতা এই নিবন্ধের অঙ্গ না। জানি ভক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আসে পাপবোধ থেকে, ভয় থেকে, লোভ থেকে। আন্তরিক আভ্যন্তর আবেগ থেকেও। সেই জটিল গহন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাদের কাছেই ফিরে যাই না কেন—ঠাকুর, আর শ্রীশ্রীমা। গিয়ে কি করব? জপ, তপ, উপাসনা, প্রার্থনা? ওসব সকলের নয়, সবার আসে না। "রূপং দেহি, জয়ং দেহি", বড় ছোট ভিক্ষা চাওয়া, বিশেষ করে তাঁর কাছে, বিভূতি-টিভূতি প্রদর্শনে যাঁর রুচি ছিল না, নরেন্দ্রকে এক-আধবার দেখিয়ে থাকবেন। তাঁর মহিমা অন্যত্র। অন্ততঃ এইটুকু জানি বলেই কিছুকাল বলতাম "বড় কর, ভাল কর, শান্তি দাও" বিশেষ করে মায়ের কাছে। ইদানীং তাও বলি না। "তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর" এইমাত্র বলে ক্ষান্তি দিই। খারাপ করলেও তিনিই করবেন, ভাল করলেও তিনি। আমাকে এবার নাও বলতেও দ্বিধা বোধ করি, কারণ নিতে হলে তিনিই নেবেন, রাখতে হলে রাখবেন তিনি।

আসলে কথাটা বোধহয় এই, পাড়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আছেনই। দরকার হলে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলবেন বৈকি। এইটুকুর নাম বিশ্বাস। আবার আমাদেরও হাত তুলে হাবুডুবু খেতে খেতে যেতে হবে তাঁর কাছে। ওইটুকু কর্ম, কর্তব্য, ব্যস। তিনি পূর্ণ অবতার কিনা বিচারের প্রয়োজন তো নেই। মানবিক মানদণ্ডে মেপে বড় বিস্ময় লাগে যখন দেখি সামান্যতম অহমিকাও তো তাঁর ছিল না। যিনি প্রকৃতই বড়, তাঁর থাকে না। মানের বালাইটুকু ছিল না, তাই নিজেই যান বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, দেবেন্দ্রনাথের কাছে। কী কটাক্ষ, কী সৌজন্য কিছুই তাঁকে স্পর্শমাত্র করে না। এই পথেই এগোতে এগোতে তাঁর শেষ প্রহরের অসহনীয় শারীর যন্ত্রণারও একটা ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। মহান্ত পুরুষেরা এইভাবেই সাধারণ মানুষের জীবন বহনের দুর্বহতা ভাগ করে নেন। যেমন প্রেমে তেমনই ক্লেশকষ্ট ভোগে এক হয়ে যান। দ্বাপরে কার্য সমাপনের পরে ক্লান্ত আত্মা ডেকে আনে গোপনচারী ব্যাধকে। তার বাণে, ক্রুশে কিংবা ক্যান্সারে কোনও ভেদ থাকে না, কারণ পার্থিব মরণ তখন তুচ্ছ। অপার্থিব লোকে প্রয়াণে, স্মরণে-বরণে তাঁরা চিরায়মান।*

*আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পৃঃ ৪

সংগ্রহ: তাপস বসু

অমরদেবতা অমরনাথ

ব্রহ্মচারিণী হিমানী দেবী

১১ জুলাই ১৯৮৭। গত বছরের আষাঢ়ী পূর্ণিমার এই পুণ্য দিনে আমি অমরনাথ দর্শন করি। পূর্বে দুবার যাত্রার আয়োজন করেও অনিবার্য কারণে তা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। বহুদিনের আকুল আকাঙ্ক্ষা আমার অমরনাথ দর্শনের। কিন্তু তীর্থদেবতার আহ্বান আসেনি। তাই সুযোগ হয়েও হয়নি, টিকিট কেটেও ফেরত দিতে হয়েছে। অকস্মাৎ এবার একদিন অমরগুহা ও তার সিঁড়িগুলি আমার মানস-নেত্রে ভেসে উঠল। তবে কি অমরদেবতা এতদিনে আমার ডাক শুনেছেন? আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ঐ অমোঘ আহ্বান ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

একটি পর্যটক-সংস্থায় আমার কয়েকজন পরিচিত জনের সঙ্গে ৩ জুলাই, ১৯৮৭ শুক্রবার, হাওড়া থেকে হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করে ৫ জুলাই বেলা বারোটায় জম্মু পৌঁছলাম। পরদিন ৬ জুলাই আমরা শ্রীনগর যাত্রার জন্য বাসে উঠলাম। জানালার ধারে বসে দুচোখ ভরে পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলেছি। দুপাশেই পাহাড়। নীলাকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ী ঝাউ, তার সূক্ষ্ম ঝিরঝিরে পাতাগুলি সূর্যালোক ধারণ করেছে। সে বড়ই সুন্দর। নিচে ছোট পাহাড়ী নদী এঁকে-বেঁকে খরস্রোতে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজের উপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আছে, 'Save Trees, Save Nation', অথচ যত্রতত্র বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে তাও দেখলাম। একটার পর একটা গ্রাম ছাড়িয়ে চলেছি, বাড়ি-ঘর, স্কুল, গির্জা রাস্তায় পড়ল। ক্ষেতে আধুনিক প্রথায় চাষবাস হচ্ছে দেখলাম। পাহাড়ের গা ঢালু বলে এখানে ভালভাবে চাষবাস করা সম্ভব হয়েছে। ক্রমে অনেক উঁচুতে উঠছি। ইংরেজী 'U' অক্ষরের আকারে বাঁক দিয়ে পথ উঠেছে। উপর থেকে নিচের এই বাঁকগুলো কি সুন্দর পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উপর থেকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে সবই সুন্দর লাগে—অর্থাৎ মনকে যদি উচ্চগ্রামে তোলা যায়, সে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে সবকিছু আনন্দরূপে প্রতিভাত হয়। এখানে দু-রকম ঝাউ পাশাপাশি রয়েছে। দূরের পাহাড়ে সামান্য বরফের ছোঁয়া। আপেল ও বেদানার বাগানে থোলো থোলা আপেল বেদানা ফলে আছে। আখরোট গাছও দেখলাম। পাহাড়ী নদী, সবুজের পারিপাট্য—চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানকার সফেদাগাছ ভারী চমৎকার দেখতে। সমান্তরাল পপুলারশ্রেণী দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটি ঘন সবুজের আকাশছোঁয়া প্রাচীর। বিকাল পাঁচটা নাগাদ শ্রীনগর পৌঁছে গেলাম। পরের দিন বিকালে ডালহ্রদে ঘুরতে গেলাম শিকারাতে করে। হলদে ও চকোলেট রঙের ভেলভেট তাকিয়া দিয়ে সাজানো সুন্দর শিকারা। হ্রদের একপাশে কাশ্মীরের বিখ্যাত হাউসবোট রয়েছে। সুন্দর সাজানো কাঠের বাড়ি জলের উপর ভাসছে। পরের দিন গেলাম ক্ষীরভবানী। পথের দুপাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। মনে হচ্ছে যেন সবুজ কাশ্মীরী গালিচা বিছানো। তারই গায়ে আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়—তাদের কোন কোন শীর্ষ তুষারধবল। পথের দুপাশে চিনার গাছের সারি। ঘন শাখা-পত্রবিশিষ্ট দীর্ঘ দেহী চিনারের সৌন্দর্য অপূর্ব—মনকে ভরিয়ে দেয়। এই পথ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ পরিক্রমা করেছেন, আরও কত শত ভক্ত মাতৃদর্শনে গেছেন, আবার সৌভাগ্যবশে আমিও এলাম। বিশাল বাগানের মধ্যে মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গণের চার ধারে আকাশ-চুম্বী চিনার, নিচে শীতলতা ও চির শান্তিশ্রী বিরাজ-মান। পান্ডাদের হুটোপাটি নেই। সুউচ্চ চিনারদের দেখে মনে হল এরা নিশ্চয় স্বামীজীকে দর্শন করেছে। তাই বোধহয় এত সগর্বে উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে। একটি দুধপুকুর—তার মধ্যে দ্বীপের উপর একটি সুন্দর মন্দির। তাতে দেবী ভবানী বিরাজমানা, খুব সুন্দর লাগছিল। একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পূত পরিবেশ।

পরদিন ৮ জুলাই। শ্রীনগর থেকে বাসে পহল-গাঁও যাত্রা করলাম। বাসে জানালার ধারে বসে দেখছি দিগন্ত বিস্তৃত চিত্ত-মনোহারী হিমালয়।

তার কোন কোন শীর্ষ চিরতুষারাবৃত। পাহাড়ের কোলে গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রাম। ক্ষেতে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ পাহাড়ীরা চাষের কাজে ব্যস্ত। পাহাড়ী নদী সর্পিল ভঙ্গিতে ছুটে চলেছে। কোথাও আবার মুক্তাঙ্গনে স্কুলও হচ্ছে দেখলাম। কোথাও ছেলেমেয়েরা স্কুলের পোশাক পরে চলেছে। ছেলেমেয়েরা আনন্দে জটলা করছে। কি সুন্দর কাশ্মীরের ছেলেমেয়েরা! গোলাপী রং, খাড়া নাক, লাল ঠোঁট। মহিলাদেরও দেখলাম। কাশ্মীরী মহিলারা কি অপূর্ব রূপসী! তাদের রূপের তুলনা সম্ভবতঃ ভারতে কোথাও নেই। যেমন সুন্দর বরণ, তেমনই দীর্ঘ ঋজু গড়ন। অত্যন্ত সুশ্রী রুচি-সম্মত ভব্য পোশাক তাদের। ঘন বা ফিকা রঙের খুব বড় কামিজের উপর সাদা বা মানানসই কোন রঙের রেশমের কাজ, সালোয়ার আর মাথায় ওড়না। সকলেরই মাথায় ওড়না। তিন-চার রকমে ওড়নাগুলি তারা মাথায় বাঁধে। ভারী সুন্দর লাগে দেখতে। তারা কাজেরও খুব, কোথাও জড়তা নেই, পার্বত্য নদীর মতোই তাদের চলাফেরায় ক্ষিপ্রতা। বিরাট কলসী মাথায় করে দূরবর্তী পাহাড়ী ঝর্না থেকে জল নিয়ে তরতরিয়ে মেয়েরা ঝর্নার মতোই নামছে। রাজস্থানী মেয়েদেরও দেখেছি তিন-চারটি পিতলের চকচকে কলসী মাথার উপর উপর নিয়ে অবলীলাক্রমে চলে। ভাবছিলাম, ঠাকুর বলেছিলেন অভ্যাসের শক্তির কথা। সার্কাসে মেয়েরা যে দড়ির উপর দিয়ে চলে বা নৃত্যের কলাকৌশল দেখায়, সে অভ্যাস তো একদিনে হয়নি, বহুদিনের বহু অভ্যাসের ফলে রপ্ত হয়েছে। ক্রমে পহলগাঁও এসে পড়ল। বেশ বড় শহর, হোটেল ও দোকানে ভরা, পাহাড়ে ওঠার সব-রকম সরঞ্জাম এখানে কিনতে ও ভাড়া পাওয়া যায়। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর প্রতীক্ষালয়ে খাওয়া ও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমাদের অমরনাথ যাত্রার হাঁটাপথ শুরু হল।

শুভ্র সফেন বেগবান লিডর নদী এখন আমাদের সঙ্গী। তীরের দুধারকে শ্যামল সজীব করে যেন একটি শুচিশুভ্র আলপনা রচনা করে সগর্জনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে। অন্যদিকে তুষারমৌলী পর্বতশীর্ষ নভোনীল স্পর্শস্পর্ধায় যেন চেয়ে আছে! ঘোরানো ঘোরানো আঁকাবাঁকা চন্দনবাড়ির পথ। তবে চড়াই বেশি নয়। সুন্দর এক নাম-না-জানা ফুলের সৌরভে পথ আমোদিত হয়ে আছে। সন্ধ্যার পূর্বেই চন্দনবাড়ি পৌঁছে গেলাম। আজ রাত্রে চন্দনবাড়ির তাঁবুতে বাস। চা ইত্যাদি পর্বের পর দেখলাম নীলাকাশের প্রেক্ষাপটে পর্বতচূড়ায় ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠছে। বড় সুন্দর সে দৃশ্য! প্রায় তিরিশ বছর পূর্বে কেদারনাথের পথে চন্দ্রবাড়া চটিতে দেখেছিলাম পাহাড়ের মাথা থেকে চাঁদ উঠছে এমনই সুন্দর। শিবের 'চন্দ্রশেখর' নামটি সার্থক বটে।

পরের দিন (৯ জুলাই) ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি কোনরকমে সেরে সামান্য আহারান্তে চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হাতে লাঠি, কাঁধে ঝোলা-ব্যাগে কিছু কাজু মিছরি টফি. রেনকোট ও প্রয়োজনীয় সামান্য ওষুধ। চলেছি একা দলছাড়া হয়ে। বড় আনন্দের এ-পথচলা। পিছনে দৃষ্টি ফেরানো নেই। সমগ্র মন ও অনুভূতি দিয়ে সৌন্দর্যগ্রহণ এবং কখনও বা দুর্লভ মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। অমরনাথকে স্মরণ করতে করতে চলেছি। —হে দেবাদিদেব, তুমি শুদ্ধস্বরূপ পরম মঙ্গলময়, তুমি পূতসলিলা জাহ্নবীকে শিরে ধারণ করে জগৎ-কল্যাণ-নিমিত্ত মর্তে প্রবাহিত করেছ; তীব্র কালকূট স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করে জগৎকে রক্ষা করেছ। শ্রীরাম-কৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে শিবমহিম্নঃ স্তোত্রপাঠ করতে করতে ভাবস্থ হয়ে বলেছিলেন, "ওগো শিবগো, তোমার কত গুণ। শিবগুণমহিমা মুখে বলে শেষ করা যায় না।"

প্রথম দিকটা একেবারে লিডরের পাশে-পাশেই চলা। ডানদিকে লিডর পাহাড়ের কোলে, বাঁ-দিকেও কত পাহাড় বড় বড় গাছ। অতি মনোরম, প্রায় সমতলপথে স্বচ্ছন্দে কিছুটা চলার পরেই শুরু হল চড়াই। এমনি কঠিন চড়াই পেয়েছি যমুনোত্রীর পথে। কি অসম্ভব চড়াই, বাঁকের পর বাঁক চলেছে ইংরেজী 'U' অক্ষরের আকারে। বড় গাছপালা নেই বললেই চলে। এত ভাঙাচোরা খাড়া কঠিন পথে চলতে কমবয়সী ছেলেমেয়েরাও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। পথ সম্ভবতঃ তিনফুটের অধিক প্রশস্ত হবে না। ঐ অল্প পরিসরের মধ্যে মানুষ ও ঘোড়ার যাতায়াত—এক দুঃসহ সহাবস্থান! এভাবে বাঁকের পর বাঁক অনেকটা উঁচুতে উঠে আসার পর আরও

উপরে কয়েকটা গাছ দেখা গেল। একজন যাত্রী বললেন, ঐ গাছ যেখানে দেখা যাচ্ছে সেখানেই পিশুটপ্। সাংঘাতিক চড়াই পিশুটপ্ যে প্রায় উঠে এসেছি দেখে খুব আনন্দ ও ভরসা হল। মনে হল, কৃপাময় অমরনাথ যাত্রীদের পথসৌন্দর্যে মুগ্ধ করে ঐ ভীষণ চড়াই পেঁৗছে দেন। অনুভব করেছিলাম, তিনি সর্বদাই তাঁর স্নেহহস্ত প্রসারিত করে রেখেছেন। আমরা বুঝেও বুঝি না, ধরেও ধরি না। পিশুটপের উপরে বেশ খানিকটা সমতল প্রান্তরে সবুজের সজ্জা। এতটা চড়াই উঠে ক্লান্তি স্বাভাবিক এবং বিশ্রামও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। গোটা দুয়েক চায়ের স্টল আছে। কিন্তু ওখানে শুধু চা-ই পাওয়া গেল। পাহাড়ী পথে খাওয়ার কষ্ট, পথে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা যখন হাঁটাপথে কেদার-বদরী দর্শনে গিয়েছিলাম, তখন কিন্তু পথে দুধ, দুধ-চা, গরম জিলাপি পাওয়া যেত। সে অবশ্য বহু বছর আগের কথা। এখন কেদার-বদরীর পথেও এমনি অবস্থা কিনা জানি না।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। পথ যেমন সরু তেমনি কঠিন। অনেকগুলি ঝর্না নিচে নামতে নামতে জমে গেছে। সরকারি লোকেরা সেই বরফ কেটে পথ করে দিচ্ছে। অতি সাবধানে বরফের উপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। পা হড়কে গেলেই গভীর খাদে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি হল। চলতে চলতে একটি বিরাট ঝর্নার সামনে এলাম। পথের উপরে তার ফেনিল জলরাশি সহস্রধারায় আছড়ে পড়ছে। পাথরের উপর পা দিয়ে অতি সন্তর্পণে ভারসাম্য রক্ষা করে ঐ ঝর্না পার হলাম। দার্জিলিং-এ পাগলাঝোরা দেখেছিলাম। বাঁধনহারা জলের উৎস ভীমবেগে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে। এও যেন অনেকটা সেরকম। বেশ কিছুক্ষণ নির্নিমেষে সে সৌন্দর্য দেখার পর আবার পথচলা শুরু হল। এবারে যে পথ এল তা যেন প্রায় খাড়া, তার উপর এবড়ো খেবড়ো বড় বড় পাথর। ঐ ভীষণ পথ দেখে শিউরে উঠলাম। কিন্তু এক পা এক পা করে চলে অবশেষে সে পথও শেষ হল। এটিই শেষনাগের 'শেষ কামড়', চারদিকে কেবল স্তরে স্তরে সারি সারি পর্বতরাজি। অপূর্ব মনোহর সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে চলেছি। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছিল : 'অপরূপকে দেখে এলাম দুটি নয়ন ভরে।' অপলক নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে মনের পর্দায় এঁকে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল আশ্চর্য স্রষ্টা ও তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিকে। অবশেষে পাহাড়ে ঘেরা শেষনাগ হ্রদ অশেষ সৌন্দর্য ও বিশালতার ব্যাপ্তি নিয়ে এল। জলরাশি প্রায় স্থির অচঞ্চল। গগনচুম্বী পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি প্রশস্ত ঝর্না নামছে, ঐ ঝর্নাই শেষনাগ হ্রদের উৎস। সেই তুহিনশুভ্র প্রপাতের যথোচিত প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে শেষনাগের স্তব্ধপ্রায় জলে। সে স্বর্গীয় শোভার বর্ণনা কি দেব, তা শুধু দেখার! হ্রদজলের বর্ণও অদ্ভুত, ফিকে সবুজ রঙের সঙ্গে যেন দুধ মেশানো! জলের মধ্যে মাঝে মাঝে সাদা ধবধবে জমাটবাঁধা বরফ নানা আকারে ভাসছে। হ্রদ ছাড়িয়ে সামান্য দূরে আমাদের তাঁবু। পাহাড়ের এতটা উচ্চতায় খাবার রুচি কমে যায়। সেজন্য প্রায় অনাহারে কাটলেও বিশেষ কিছু খেতে পারলাম না। পরের দিন সকালে চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। তীর্থযাত্রীদের পথ পরিক্রমা অনেক পূর্বেই শুরু হয়ে গেছে। আমিও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীঅমরনাথকে স্মরণ করতে করতে যাত্রীদের অনুসরণ করি। সামান্য পথ সুন্দর সোজা চলার পর এল চড়াই। বেশ অনেকটা চড়াই ওঠার পরের দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শুচিশুভ্র তুষারের অনন্ত রাজ্য বিস্তৃত, কোথাও কোন গাছপালা বা বৃক্ষ পাথুরে চিহ্ন নেই। সামনে স্তরীভূত হিমানী সম্প্রপাত। পশ্চাতে দক্ষিণে বামে সর্বত্র অসামান্য নিরুপম স্ফটিকমণিনিভ মহাদ্যুতিসম্পন্ন হিমরাজ্য! দূরে থেকেও এ বিশাল বিস্তৃতি কখনও দেখিনি। এই তুষার সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরই সুবিখ্যাত মহাগুণাস গিরিবর্ত্ম। একে অতিক্রম করে অমরনাথ দর্শন। এই সুদুর্গম তুষারক্ষেত্রে শ্রীভগবানের চিন্তা করতে করতে অগ্রসর হলাম। উপরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীলাকাশে ভাস্বর সূর্য দেদীপ্যমান। তার কনককিরণ স্পর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তুষারে। সে যেন সহস্রদ্যুতি হীরামাণিক্যের রশ্মি বিকিরণ। অপার্থিব সৌন্দর্যে স্নাত হয়ে ধীরে ধীরে পথ পরিক্রমা করে অসীম দেবকৃপায় ১৪,৫০০ ফুট উঁচু মহাগুণাসের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে এসে দাঁড়ালাম। ভীষণ কনকনে

ঠাণ্ডা হাওয়া হুহু করে বইছে। বিশাল বিস্তৃত সীমাহীন তুষার রাজ্যে অপূর্ব আনন্দ ও বিস্ময়ে দেখছি মহাগুণাসের বিরাট বিস্তার ও বিশাল মহিমাকে। পরম দৃপ্তভঙ্গিতে সর্বকালসাক্ষী স্বমহিমায় মূর্ত মহাশ্বেত মহেশ্বর। 'একাকী পুরুষরাজে'। সেই উদার মহিমা দর্শন করে সেদিন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। মনে হল, কত জন্মজন্মান্তর যেন এমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছি। তুষারসম্রাটের চরণে ব্যাকুল প্রণিপাত নিবেদন করলাম: 'হে সর্বশুভ্র, তুমি আমার সকল কলুষ, সকল মালিন্য নাশ কর। আমাকে শুচিশুভ্র কর।' স্বামী অভেদানন্দের মহাগুণাসের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, সেসময় এখানে নানা বর্ণ ও সৌরভে পূর্ণ দিব্যশোভাসম্পন্ন পুষ্পরাজি যেন কাশ্মীরী গালিচার মতো সজ্জিত ছিল। আমরা কিন্তু এ-রাজ্যে পুষ্প-সমারোহ দেখিনি। পরন্তু দিগন্তবিস্তৃত হিমরাজ্য প্রত্যক্ষ করলাম, যা আমাদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

পাহাড় থেকে নামতে নামতে বেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে, অনেকগুলি জলধারা-বিধৌত বিশাল সমতল প্রান্তরে এসে পড়েছি। বুঝলাম এটিই পঞ্চতরণী। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে পর পর পাঁচটি নদীতেই স্নান করেছিলেন। গগনস্পর্শী পর্বতবেষ্টিত সুবিস্তৃত নির্জন প্রান্তরে তখনও বেশ আলো। ধ্যানগম্ভীর স্তব্ধতায় মহাযোগে যোগীরাজ স্তিমিতলোচন। দেবতাত্মা হিমালয়ের দিব্য পরিমণ্ডলে পুঞ্জীভূত পুণ্য ভাবরাজি সদা বিরাজমান।

পঞ্চতরণীর তাঁবুতে মনোরম পরিবেশে ১০ জুলাই রাত্রিবাস হল। পরদিন ১১ জুলাই ভোর সাড়ে চারটেয় চতুর্থ ও শেষদিনের যাত্রা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শুরু হল। হাতড়ে হাতড়ে চলেছি। দর্শনের পরম পুণ্য লগ্নটি নির্ধারিত আজই। পথ অত্যন্ত খাড়া, একেবারে যেন সোজা উঠে গেছে উপরে। নিচে, বহু নিচে অমরগঙ্গা বাঁ দিক দিয়ে বয়ে চলেছেন। কোথাও কোথাও তুষারসেতুর তলা দিয়ে চলেছেন। শ্রীঅমরনাথের চরণস্পর্শ করবেন বলে কতকাল ধরে তিনি এমনিভাবেই বয়ে চলেছেন।

বরফ-ঢাকা পথে যাত্রীরা চলেছেন। ক্লান্ত শ্রান্ত, তবু হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ। অমরদেবতা শ্রীঅমরনাথের দর্শন আসন্নপ্রায়। আবহমান কাল ধরে সৌন্দর্যপূজারী প্রেমিকের সৌন্দর্যাভিসার চলছে। অমরনাথের দর্শনে তার পরিসমাপ্তি।

পথ যতই শেষ হয়ে আসছে দর্শন-আকাঙ্ক্ষা ততই বাড়ছে। অনেকেই অমরগঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহন স্নান করছেন। অবশেষে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। ঐ তো গুহার সিঁড়িগুলিও দেখা যাচ্ছে! আশা-উদ্দীপনা-উৎকণ্ঠায় মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। দুর্গম পথ শেষ। গুহামুখে উপস্থিত হতেই দেখি তিনটি পায়রা উড়ে গেল। তখন একজন পাণ্ডাস্থানীয় লোক বললেন: 'আপ কি যাত্রা সফল হো গিয়া।' অবশেষে গুহাভ্যন্তরে। গুহাশীর্ষ স্পর্শ করে চতুর্দিকে তেজ বিচ্ছুরিত করে অমরদেবতা অমরলিঙ্গ বিরাজমান। কী মসৃণ, সুঠাম সুন্দর। সুসমঞ্জস গঠনসৌন্দর্য। শুভ্র শুচিতার জ্যোতিঃ দেখে মন বিস্ময়ে আনন্দে ভরে গেল। সুকুশল সুনিপুণ হাতের কাজও সম্ভবতঃ এমন অনবদ্য, সুন্দর হয় না।

কত স্তব-স্তুতি স্তোত্র-সঙ্গীত শিখে রেখেছিলাম শ্রীঅমরনাথকে দর্শনের পর শোনাব বলে। কিন্তু সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভক্ষণে অমরনাথজীর কাছে এসে সেসব ভুলে গেলাম। অপলকদৃষ্টিতে শুধু দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছি আর দেখছি। দুই চোখে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে। যাঁকে এতদিন ধরে দেখতে চেয়েছি, তাঁর দর্শনে সব চাওয়া শেষ হয়েছে। পরে মনে হল শঙ্করাচার্যের কথা যিনি 'পরাপূজা'য় বলেছেন: যিনি শুদ্ধস্বচ্ছস্বরূপ, তাঁকে কি পাদ্যঅর্ঘ্য সমর্পণ করতে পারি? সর্বাধার যিনি, তাঁকে কোন আসন দিয়ে আপ্যায়িত করব? নিত্যতৃপ্ত যিনি, কিরূপ নৈবেদ্য যে তাঁর রুচিকর হবে তা তো জানি না। যিনি নিখিল-সৌন্দর্য-শ্রীনিবাস, মাল্যস্রক চন্দনাদি বহিরাভরণ তাঁর বাহুল্যমাত্র। সর্ববস্তু অবভাসক যিনি, ক্ষুদ্র দীপারতির শিখা কি তাঁকে প্রকাশ করতে পারে? বেদাগমে যিনি অগম্য তাঁকে স্তোত্রাদিপাঠ শোনানোর সার্থকতা কোথায়? (শঙ্করাচার্যের পরাপূজার ভাবার্থ)

এবার বিদায়ের পালা। ফিরে আসতে মন চায় না। কিন্তু ফিরতে হয়ই। কিন্তু ফেরার সময় যা নিয়ে এলাম তাতে মন পরিপূর্ণ হয়ে রইল।

এক এবং শূন্য

স্বামী গোপেশানন্দ

সবে খোকা মুখে অন্ন তুলেছে, এমন সময় অতি ক্রুদ্ধ পিতৃদেব অঙ্কে বৃহস্পতি পুত্রকে বাপান্ত করে ব্রহ্মতালুতে চপেটাঘাত করলেন। এই না দেখে সবেগে খোকার মা ডাবু হস্তে উপস্থিত। ত্রাহিস্বরে তিনি মহাবাক্য ছাড়লেন: "আমাদের ঠাকুরও অঙ্ক জানতেন না।" এই না শুনে সেখানে উদীয়মান রিসার্চ স্কলার খোকার দিদি। সে বলে উঠল: "ঠাকুর জানতেন আর অঙ্ক শিখবার দরকার নেই। কারণ ক্যালকুলেটারের যুগ আগত।" তাই না শুনে খোকার জামাইবাবু অ্যাডভাইস দিলেন: "ঠাকুরের বায়োডেটা কম্প্যুটারে দিয়ে দাও—অঙ্ক জানতেন কি জানতেন না—ঠিকঠাক বেরিয়ে আসবে।" কে বায়োডেটা তৈরি করে দেবে—জামাই-বাবু সেটি অবশ্য খোলসা করে বলেননি। শেষ কালে ঠাকুরমা উবাচ: "ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

শ্রীশ্রীঠাকুর অঙ্ক জানতেন কি জানতেন না এটি খোকার মা তাঁর প্রয়োজনমতো ঠিক করে ফেলুন। তবে শ্রীশ্রীঠাকুর উপমায় অঙ্ক ব্যবহার করেছেন। যেমন, শুধু শূন্যে কোন পদার্থ নেই। আমরা জানি, ব্যবহারিক জগতের পটভূমিকায় একের পিঠে শূন্য দশ, দশের পিঠে শূন্য একশ হয়। এবং এই এক এবং শূন্যকে দিয়ে আমরা গণনার কাজ করে থাকি। এককে ধরে রাখলে শূন্যের মূল্য। এমন সহজ সরল উপমার তুলনা নেই। তবুও অবাক লাগে—যখন দেখি যার কিছু মূল্য নেই, শূন্য অর্থাৎ কিছু-না, সেই আবার একের উপস্থিতিতে কোন যাদুতে মূল্যবান হয়। কিছু-না কেমন করে কিছু হয়। এ যে অভাব থেকে ভাব। ওগো শূন্য! তুমি কি কেবলই শূন্য, শুধু পটে লেখা!

উপমার সাহায্যে ঠাকুর এক দিয়ে কোন্ বস্তুকে এবং শূন্য দিয়ে কোন্ অবস্তুকে (০) বোঝাতে চেয়েছেন?

আমাদের অর্থাৎ সাধারণের কাছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিশাল। আদি অন্ত আছে কিনা বোঝা ভার। সূর্য-তারা দলে দলে, গ্রহ-উপগ্রহ ভাগে ভাগে, ঘর-বাড়ি যত্র তত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুকে আলাদা আলাদা করে গণনা করা অসম্ভব। আরও কত কিছু আবিষ্কার হবে, গণনায় আরও কত শূন্যের আবির্ভাব হবে কে-ই বা তা জানে!

আধা প্র্যাকটিক্যাল কবি প্রকৃতিদেবীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পদার্থ দেখেন আর শতকরা ৫০ ভাগ কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন। পুরোটা কল্পনা বলে মানতে তাঁদের হৃদয়গ্রন্থি হয়তো ছিঁড়ে যায়।

জড়বিজ্ঞান বাস্তব নিয়ে কারবার করে বলে প্রচার আছে। আমি বৈজ্ঞানিক নই। জড়বিজ্ঞান জড়জগৎ বিষয়ে কি বলে সেটি আমি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলবার চেষ্টা করব এবং স্থান বিশেষে তাঁর কথা তাঁর ভাষাতেই বলে পার পাবার চেষ্টা করব।

আপাততঃ মনে করুন সত্য সত্যই আপনার সামনে একটি সরষে ফুল কি সুন্দর নাচছে! অর্থাৎ ঐ ফুলটি থেকে কোন কিছুর বিশেষ মাপের ঢেউ কোন এক বিশেষ তালে আপনার মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশকে তালে তালে নাচাচ্ছে। এর জন্য মন কল্পনা করছে আপনার সামনে ঐ ফুলটি নাচছে। লক্ষ্য রাখবেন—মস্তিষ্কের কোন অংশ নাচলেই বা আলোড়িত হলেই চলবে না, মনকেও এর সাথে যুক্ত হতে হবে। দুঃখের বিষয় মস্তিষ্কের কোন অংশের আলোড়নের সাথে ফুলের কলেবর অথবা রঙের কোন মিল নেই। কেন এমন হয় এর উত্তর নেই। তবুও যদি উত্তর চান—তাহলে সহজ সরল উত্তর হচ্ছে—Nature। আমাদের দেশের প্রাচীনরাও এর উত্তর নানা ভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন, যেমন মায়া, ভ্রম, সংস্কার, প্রকৃতি ইত্যাদি।

যাই হোক যে-কথা বলছিলাম। মস্তিষ্কে কয়েকটি বিশেষ ধরনের আঘাতে মন কল্পনা করেছিল বাহিরে একটি সরষে ফুল নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। এমন হতে পারে ফুল নেই, তবুও আমি ফুল দেখছি। আপনা-আপনি মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়ে থাকতে পারে। সরষে ফুল না হোক—সাপ, আমরা এরকম-ভাবে অনেক সময় দেখে চেঁচামেচি করে লোক জমা করে ফেলি। ভুল ভাঙার পরে বলি সাপটা পালিয়ে গেছে। আমি ভুল দেখি এটা কোন্ মুর্খই বা প্রচার করতে চায় আর কোন্ মুর্খই বা মানতে চায়?

দেখার মতো শোনা, স্পর্শ সর্বক্ষেত্রেই স্নায়ুর মধ্য দিয়ে ঢেউয়ের যথাস্থানে আঘাত আর মনের কল্পনা করা আমি দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি। এই সকল কারবারের মূলে আছে মস্তিষ্ক। যাদের মস্তিষ্ক নেই তাদের কাছে বোধ করি জগৎও নেই।

প্রশ্ন হতে পারে আমাদের মস্তিষ্ক আছে তো? এখানেও জড়বিজ্ঞানের সেই ব্রহ্মাস্ত্র ওয়েভ থিয়োরি অথবা কোন নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করুন। স্নায়ুতে কোন বিশেষ ধরনের আঘাত বা আলোড়নের জন্য মন কল্পনা করে আমার মাথা আছে, হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে। কোন ভাগ্যবান যদি কোন সময় নিজের মাথা অথবা হাত-পা খুঁজে না পান বিচলিত হবেন না। আসলে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকুন। হারানো জিনিস সুদে-আসলে পেয়ে যাবেন। সাক্ষী—অনেক মহাত্মা।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন: "স্থূল কথা, এই যে বাহ্য জগৎ—যাহাকে মোটা কথায় জড় জগৎ বলা যায়—তাহা যদি থাকে, তাহাকে আমি স্পর্শ করিতে অক্ষম। স্পর্শ করিতে যখন অক্ষম, তখন জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, বাহ্য জগৎ আছে। বাহ্য জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহার অন্তর্গত আমার জড় দেহে অবস্থিত মস্তিষ্ক নামক বস্তুর কল্পনা করি, এবং কল্পিত বাহ্য জগতের কল্পিত আঘাতে কল্পিত মস্তিষ্কে আন্দোলন কল্পনা করিয়া সেই আন্দোলনকে অনুভূতির কারণ বলিয়া নির্দেশ করি। বাহ্য জগৎকে আমি স্পর্শ করিতে পারি না; আমার কল্পিত মস্তিষ্ক মাত্র কল্পিত স্নায়ুসূত্রযোগে কল্পিত বাহ্য জগৎকে স্পর্শ করে। অথচ বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করি; ব্যাখ্যার আবশ্যকতা, তাই সংকেত থিওরি দিয়া একটা ব্যাখ্যা গড়িয়া লই।... বাহ্য জগৎ একটা বিশাল স্বপ্ন, এবং মানুষ মাত্রই এক-একটা সনাতন আফিমখোর, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। কথাটা শুনিতে ভাল লাগে না; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তি প্রযুক্ত হয় তাহার সারবত্তা ভাল বুঝা যায় না।" (রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯)

স্বামীজীও যেন কোথায় আমাদেরকে ভালবেসে গালি দিয়েছেন—আমরা নাকি সম্মোহিত—হিপনো-টাইজড। রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি কথা বলি: "এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিম্ভূতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাল্পনিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভূত; আমি কিন্তু ঠিক উল্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও সংকুচিত করিয়া উহার অধীনতা পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি, এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র; কিন্তু এ বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ।" (ঐ, পৃঃ ২০৯)

এক কথা থেকে অন্য কথায় আমি চলে যাচ্ছি। আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল এক এবং শূন্য। আশা করি এর মধ্যে এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে—

১=আমি (আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম)

আর

০='আমি' ছাড়া জগতের অবশিষ্ট অংশ।

এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নেই। একমাত্র যুক্তি নিজের ব্রহ্মতালুতে চাঁট্যোষধি।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

আনন্দ বাগচী

আমি একদিন অলৌকিকে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু সেটা ছিল অনেকটাই ভূতে বিশ্বাস না করার মতো। তার মানে, অবিশ্বাস করার মতো মনের বলও নেই আবার বিশ্বাস করতেও মন চায় না। তেমন তেমন অবস্থায় ধুৎ বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার সাহস হয় না। আসলে বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুইয়েরই পিছনে বাস্তব যুক্তিপ্রমাণ থাকা দরকার। দু-পক্ষেরই প্রমাণ করার একটা দায় থেকে যায়।

তবে মুশকিল হয় তাঁদের, যাঁরা বর্ডার লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। যেমন, যাঁরা জাতিস্মর কিংবা প্ল্যানচেটের সাক্ষী। তাঁরা স্বচক্ষে স্বকর্ণে কিঞ্চিৎ দেখা-শোনার ফলে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় ঝুলে থাকেন। বিজ্ঞানবুদ্ধি বিকল হয়ে যায়, অভিজ্ঞতাও এক জায়গা পর্যন্ত এসে থমকে থেমে থাকে।

এই জগতের বাইরে আর কোন জগৎ আছে কিনা, এবং যদিই বা অদৃশ্য অবস্থায় সেই জগৎ থেকেই থাকে, তবে ভিন্ন রূপে ভিন্ন শক্তিতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে থাকা সম্ভব কিনা। মহাশূন্য নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন তারাও রকম ফেরে দীর্ঘকাল ধরে এই জাতীয় একটা ব্যাপারই তো অনুসন্ধান করে চলেছেন। মহাবিশ্বের মহাকাশের ভিন্ন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকলে তারা কোন্ স্তরে কি অবস্থায় আছে, আর সেই প্রাণিসমাজ জ্ঞানে বুদ্ধিতে ও করণ ক্ষমতায় আমাদের থেকে উন্নততর জীব কিনা এটাই তাঁদের গবেষণার জ্ঞাতব্য বিষয়।

আসল ব্যাপারটা এই, এই জগতের বাইরে আর কোন জগৎ আছে কিনা, এবং যদিই বা অদৃশ্য অবস্থায় সেই জগৎ থেকেই থাকে, তবে ভিন্ন রূপে ভিন্ন শক্তিতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে থাকা সম্ভব কিনা। মহাশূন্য নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন তাঁরাও রকম ফেরে দীর্ঘকাল ধরে এই জাতীয় একটা ব্যাপারই তো অনুসন্ধান করে চলেছেন। মহাবিশ্বের মহাকাশের ভিন্ন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকলে তারা কোন্ স্তরে কি অবস্থায় আছে, আর সেই প্রাণিসমাজ জ্ঞানে বুদ্ধিতে ও করণ ক্ষমতায় আমাদের থেকে উন্নততর জীব কিনা এটাই তাঁদের গবেষণার জ্ঞাতব্য বিষয়।

তেমনি এই জড়জগৎ মরজগতের বাইরে কোন মায়াজগৎ ছায়াজগৎ আছে কিনা সেটাই অলৌকিক-পন্থীরা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। আর এই খুঁজে বেড়ানোর চিন্তাটা হঠাৎ কিছু তাঁদের মগজে গজায়নি। কার্যকারণ সূত্র ছাড়াই ভুঁইফোড়ের মতো জন্মায়নি। কিছু কিছু ঘটনা, বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর ঘটনা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যাদের স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আলেয়া বা মরীচিকাও তো একদিন মানুষকে এই-ভাবেই হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। আর ডেকেছিল বলেই শেষ পর্যন্ত মানুষ একটা নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছুতে পেরেছে। আত্মার ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের বুদ্ধির অগোচরই থেকে গেছে। তবে চিরকালই যে থাকবে, এমন কথাও হলফ করে বলা যায় না।

অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী ধরে দেশে-বিদেশে অনেক অলৌকিক কান্ড-কারখানা যে ঘটে গেছে এবং ঘটে চলেছে, তার লিপিবদ্ধ কাহিনীর অভাব নেই। কিন্তু এইসব ঘটনার যারা সাক্ষী তাদের উপর আমরা অনেকেই শেষপর্যন্ত আস্থা রাখতে পারিনি। তাঁরা সত্যি বলেছেন না গল্প বানিয়েছেন, তাঁদের দৃষ্টি-বিভ্রম শ্রুতি-বিভ্রম ঘটেছিল, নাকি তাঁদের জ্ঞানগম্যিতে ঘাটতি ছিল, অথবা অবচেতন মনের ফাঁদে পড়ে তাঁরা কল্পনায় খোয়াব দেখেছেন—এবিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কারণ পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় অভ্যস্ত হলেও, পরের

বিশ্বাস এবং বক্তব্যকে নস্যাৎ করার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে প্রবল পরিমাণেই বিদ্যমান।

তবে নিজের নিজের জীবনে খতিয়ে দেখলে আমরা অনেকেই দেখতে পাব, ছিটেফোঁটা হলেও অলৌকিক কিছু না কিছু ঘটনা প্রত্যেকের জীবনেই ঘটেছে। যদিও সবাই ঘটনাগুলোকে হয়তো সচেতনভাবে লক্ষ্য করিনি। তার কার্যকারণ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমাদের চেষ্টার বাইরে, সাধ্যের বাইরে, নাগালের বাইরে ঘটনাগুলি ঘটে গেলেও এবং এ-ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কোন পূর্বধারণা না থাকলেও বেশিরভাগ মানুষই এগুলোকে নিছক একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা বা দুর্ঘটনাই ভেবে এসেছে। এগুলো যে ঘটানো হয়েছে, এর পিছনে যে তৃতীয় একটি হাত কাজ করেছে এ চিন্তা আমাদের মাথায় উদয় হয়নি। এগুলো কারণহীন, কর্তৃকারকশূন্য ব্যাপার বলেই মনে করেছি। কেউ বা অবধারিত দুর্ঘটনা থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে রক্ষা পেয়েছি, আর তারই মাশুল গুণতে অন্য কারও মাথায় ছপ্পর ফুঁড়ে মৃত্যু নেমে এসেছে হয়তো। অথচ যে-লোকটা মারা গেল তার

টেলিপ্যাথিরও নজির দেখেছি বার বার। কখনো বা কোনও দুষ্প্রাপণীয় দুঃসংবাদ ইথারের চেয়েও কোন দ্রুতবাহী তরঙ্গে ভর করে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। স্বপ্নের মধ্যে কিংবা পুরোপুরি জাগ্রত অবস্থায় এই বাস্তব দৃশ্যাবলীর আগমনের কোন ব্যাখ্যা নেই। তাৎক্ষণিক চমৎকৃতির বেশি মূল্যও বোধকরি ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করিনি আমরা। কিন্তু এগুলিই পাশাপাশি জুড়লে সমবেতভাবে আমাদের এই সব অভিজ্ঞতা কি এক বিশাল জগতের দিকেই আমাদের আকর্ষণ করে না? যে জগৎ অদৃশ্য, যে জগতে আমাদের এই ব্যবহারিক জীবনের নিয়ম-কানুন খাটে না।

আদৌ মরবার কথা ছিল না। টেলিপ্যাথিরও নজির দেখেছি বার বার। কখনো বা কোনও দুষ্প্রাপণীয় দুঃসংবাদ ইথারের চেয়েও কোন দ্রুতবাহী তরঙ্গে ভর করে আমাদের কাছে এসে পেঁৗছেছে। স্বপ্নের মধ্যে কিংবা পুরোপুরি জাগ্রত অবস্থায় এই বাস্তব দৃশ্যাবলীর আগমনের কোন ব্যাখ্যা নেই। তাৎক্ষণিক চমৎকৃতির বেশি মূল্যও বোধকরি ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করিনি আমরা। কিন্তু এগুলিই পাশাপাশি জুড়লে সমবেতভাবে আমাদের এইসব অভিজ্ঞতা কি এক বিশাল জগতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? যে জগৎ অদৃশ্য, যে জগতে আমাদের এই ব্যবহারিক জীবনের নিয়ম-কানুন খাটে না।

শুরু করেছিলাম আমার নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা দিয়ে। কিন্তু এর মধ্যে কি করে যেন সাতকাহন কথা ঢুকে পড়ল। আসলে নিজের কথা তো কেবল নিজেরই কথা নয়, সেটা আর দশজনেরও কথা। আমার জীবনে যে উপলব্ধি সত্যি, তা আর দ্বিতীয় কারও জীবনে সত্যি নয়, এ হতেই পারে না। যাই হোক আবার সেই মূল কথাতেই ফিরে আসা যাক। আমি একদিন অলৌকিকে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন করি। আর আমার এই মন এবং মত বদলের পিছনে অবশ্যই ছাপার হরফে পড়া কিংবা অপরের মুখে শোনা অলৌকিক কাহিনীগুলি কাজ করেনি। করেছে নিজের এবং নিজের কিছু অতি নিকটজনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনাবলী। পরের কথা থাক, নিজের কথাই বলি।

আমার জীবনের ঐ জাতীয় ঘটনাগুলো অবশ্যই তেমন কিছু নয়, নিতান্তই নগণ্য, সামান্য। অলৌকিকের ছিটেফোঁটাই বলা চলে। আর তা বলতে গেলে আমার বাবার মৃত্যুর কথা দিয়েই শুরু করতে হবে। কারণ সেখান থেকেই সব ঘটনার সূত্রপাত।

তারিখটা মনে আছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন, বুধবার। বাঁকুড়ায় রুদ্র গ্রীষ্ম তখনও তুঙ্গে। সারাদিন ঘরবাড়ি ইঁটভাটার মতো জ্বলছে, দরজা জানালা বন্ধ, সিলিংফ্যান অচল। চালালেই শাওয়ার থেকে গরম জলের ধারার মতো আগুনের হলকা নেমে আসে। বিকেলের দিকে লু থেমে গিয়ে ঠাণ্ডামতো হাওয়া দিতে থাকে তাই রক্ষে।

কলেজে সামারের ছুটি চলেছে। শরীরটা ভাল ছিল না, তাই সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে না বেরিয়ে বাইরের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলাম। দোতলার সিঁড়ির গা-ঘেঁষা ঘরখানাই ছিল আমার বসার ঘর,

পড়াশোনার ঘর। ঘরের সামনে বেশ চওড়া একটা টানা বারান্দা সিঁড়ির মুখে এসে 'এল' শেপের কোণ তৈরি করেছে। অর্থাৎ বারান্দার কনুইয়ের কাছটায় সিঁড়ি, একতলা থেকে উঠে পাক খেয়ে ছাদে চলে গেছে।

আমার ঘরের বাইরে দরজার পাশটায় মা চেয়ার পেতে বসে ছিল। বারান্দার আলো নেভানো, তবে অন্ধকার নয়। ঘরের টিউব লাইটের আলো দরজা-জানলা দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে বারান্দার আধখানা জ্যোৎস্নার মতো ফুটফুটে করে রেখেছে। বাকি আধখানায় রেলিং ছুঁয়ে মাথাতোলা পেয়ারা গাছটার ডালপালার ফাঁক দিয়ে স্ট্রীট লাইটের আলোর জাফরি লুটোপুটি খাচ্ছে।

'কে ? কে ওখানে ?' মায়ের গলা কানে আসতেই আমি উৎকর্ণ হলাম। মাকে প্রশ্ন করা হল, সে কোন উত্তর দিল না। উত্তেজিত গলায় মা আমাকে ডাকল সেকেন্ড কয়েক পরেই। বোনেরা ভেতরের ঘরে বোধ হয় খুব নিচু ভল্যুমে রেডিও চালিয়ে বিবিধ-ভারতী শুনছিল। মায়ের ডাক কানে যেতেই আমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বেরিয়ে এল।

পাড়াটা নিরিবিলি, বাড়িটা আরও, কেমন একটা ঘুমিয়ে থাকা ভাব। দোতলাটা পুরোটাই আমাদের দখলে। বাড়িওয়ালার দুখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সে তালাবন্ধই পড়ে থাকে। ওঁরা থাকেন শহর থেকে মাইল তের দূরে পাহাড় শুশুনিয়ার গাঁয়ের বাড়িতে। একতলার ভাড়াটেরাও আজ কদিন বাড়ি নেই। মা বলল, 'দ্যাখতো কে ছাতে উঠে গেল।'

কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল। নিচের সদর বন্ধ। লোক আসবে কি করে? আজ কবছর এখানে আছি চোরটোরের উৎপাত তো ছিল না। শুনলাম, পায়ের শব্দ শুনেই মা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠেই মাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। আলো-আঁধারিতে লোকটার মুখ মা দেখতে পায়নি, তবে সাদা কাপড়ের খুঁট তার গায়ে চাদরের মতো করে জড়ানো স্পষ্ট দেখেছে। মা 'কে ? কে ওখানে ?' বলে চেঁচাতেই লোকটা যেন এক লহমা ইতস্ততঃ করেই পাশ ফিরে ছাদে উঠে গেল।

টর্চ নিয়ে আমি দৌড়ালাম ছাদে, কিন্তু কোথায় কে। মানুষ দূরের কথা একটা বেড়াল পর্যন্ত নেই। ফিরে এসে মাকে বললাম, 'তোমার চোখের ভুল।'

মা জোরের সঙ্গে বলল, 'না হতেই পারে না। একদম স্পষ্ট দেখেছি। তাছাড়া পায়ের শব্দ ? সেটা তো আর চোখের ভুল না।'

কী জানি। রহস্যটা পরিষ্কার হল না আমার কাছে। তবে ভুলে যেতেও বিলম্ব হল না। দেখতে দেখতে দিন চারেক কেটেও গেল। সেদিন রবিবার। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সবাই ভেতরের ঘরে মেঝেতে গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছি। সারাদিন প্রচন্ড গরমের পর যেন সবে ঘাম-না-দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। এমন সময় হঠাৎ টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামটা ঘরের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটালো। যে-মানুষটা মাত্রই কদিন আগে দিব্য সুস্থ শরীরে কলকাতা গিয়েছিলেন তিনি এখন নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে শুয়ে আছেন, এ তো ভাবাই যায় না। আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় বাবার এই মৃত্যু সংবাদটি পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে লিখেছেন। কেন কিভাবে এবং কবে মারা গেছেন কিছুই লেখেননি। আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে টেলিগ্রাম এবং মেয়ের বিয়ের বিজ্ঞাপন অত্যন্ত সঙ্গতকারণেই যথাসম্ভব মিতভাষী হয়।

প্রতি দুমাস অন্তর বাবা কলকাতায় যেতেন পেনসন আনতে। পেনসনটা উপলক্ষ, পুরনো বন্ধু-বান্ধব এবং সহকর্মীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করাই ছিল তাঁর এই কলকাতা যাত্রার আসল টান। সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন এবং মেয়েদের সঙ্গেও একবার করে চোখের দেখা হয়। দিন দুই তিন কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছেন বরাবরই। শুধু এবারই আর ফিরলেন না।

রাতের গাড়িতেই রওনা হয়ে গেলাম সবাই মিলে। ভোরে কলকাতা পেঁাছেই দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। প্রথমে আত্মীয়বাড়ি। সেখান থেকে হাসপাতাল। হাসপাতাল থেকে থানা। থানা থেকে আবার অন্য এক থানায়। অপেক্ষা, অপেক্ষা আর ফর্মালিটিজ। ইতিমধ্যে কাহিনীটা জানা হয়ে গেছে।

কলকাতায় সেবছর জুনের গোড়ায়ই হিট ওয়েভ

চলেছে। উত্তর ভারত থেকে গরমের বন্যা নেমে এসেছে। সেই রকম এক আগুন-ঝরা বেলা এগারটার সময় বাবা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে কুড়িয়ে নিয়ে যায় আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায়, সেখান থেকে নীলরতনে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে নাকি জ্ঞান ফিরেছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজের নামটুকু ছাড়া কিছুই বলে যেতে পারেননি। মৃত্যুর কারণ হার্ট ব্লকেড। ২ তারিখ বিকেল চারটেয় মারা গেছেন। পাঁচ তারিখে আমাদের সেই আত্মীয়টি থানায় ডায়্যারি করতে গিয়ে জানতে পারেন অজ্ঞাত পরিচয় এক বয়স্ক ভদ্রলোককে সেই থানাতেই তুলে আনা হয়েছিল। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মর্গে গিয়ে মৃতদেহ দেখে তিনি শনাক্ত করেন আর আমাকে টেলিগ্রাম পাঠান।

ঠিকানা বিহীন আনক্লেইমড ডেড-বডি এতদিন মর্গে ফেলে রাখা হয় না। হাত-পায়ের ছাপ নেবার পর পুলিশ ফটোগ্রাফার ফটো তুলে নেবার পর সৎকার সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটেছিল অন্যরকম। ফটো তোলা হয়েছিল কিন্তু হাত-পায়ের ছাপ তুলতে এসে মৃতদেহকে খুঁজে না পেয়ে তাঁরা ফিরে যান। ফিরে গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে নোট পাঠান। এই টালবাহানা যখন চলছিল সেই অবসরে আমাদের আত্মীয়টি পেঁছে যান এবং মৃতদেহ শনাক্ত করেন। এরকম ঘটনা কি করে ঘটেছিল জানি না। সম্ভবতঃ অ্যাকসিডেণ্টে মৃত্যু হলে যেখানে বডি রাখা হয়, ন্যাচারাল ডেথের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। কারণটা আমি ঠিক জানি না। আমার তখন এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবকাশও ছিল না। কিন্তু আমি যখন নিজে মর্গে গিয়ে বডি খুঁজছিলাম তখন ডোম এক একটা ড্রয়ার টেনে টেনে মড়া দেখাচ্ছিল। আশপাশের অনেকগুলো ড্রয়ারেই আমি কিন্তু কাটা-ছেঁড়া করা মৃতদেহই দেখেছিলাম। সেই সব বীভৎস মৃতদেহের মূর্তি অনেকদিন চোখের উপর ভেসেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু বলে বাবার ক্ষেত্রে পোস্টমর্টেম হয়নি। ডাক্তার আমাকে বললেন, আপনি ভাগ্যবান, পাঁচদিন পরেও আপনার বাবার দেহ ফিরে পেলেন। কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগছে, এই গরমে পাঁচ দিনেও ওঁর ডেড-বডি কি করে অবিকৃত রয়ে গেছে। এতটুকু পচন ধরেনি, ফুলে ওঠেনি।

সত্যিই বাবার শরীরটা দেখে স্বাভাবিকই মনে হল। এই পাঁচদিনে ফুলে ঢোল হয়ে ওঠার কথা, তা তো হয়ইনি, কোন রকম দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে না টের পেলাম। দাহকর্ম এবং শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে গেলে আবার আমরা বাঁকুড়ায় ফিরে গেলাম। সেদিনই সন্ধ্যে বেলায় সবাই একসঙ্গে বসে বাবার স্মৃতিচারণ করছিলাম এমন সময় ভিতরের বারান্দার দিকের বন্ধ জানলায় কেউ যেন দুবার হাতের থাবড়া দিল। চমকে উঠেই বারান্দায় বেরোলাম কিন্তু টানা বারান্দাটা সুনসান। কোন মানুষের পক্ষে তিনচার সেকেণ্ডের মধ্যে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া দৌড়তে গেলে পায়ের শব্দ হতে বাধ্য। ঐ নির্জন সন্ধ্যায় সামান্যতম শব্দও আমরা কেউ শুনতে পাইনি। যদিও মানুষের হাতের থাপ্পড় মারার শব্দ চিনতে ভুল হয়নি তবু ভাবলাম অনেক সময় টিকটিকি আরশোলা ধরে দেওয়ালে আছাড় মারে, সেরকম কিছু যদি ঘটে থাকে। কিন্তু ধারে কাছে কোন টিকটিকির চিহ্নও নেই। আর ঠিক তখনই কথাটা আমার মনের মধ্যে চমক খেলে গেল। ২ জুন বিকেল চারটেয় বাবা মারা গিয়েছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যেয়ই তো মা সিঁড়ির মুখে সাদা কাপড় জড়ানো মনুষ্যমূর্তি দেখতে পেয়েছিল। তবে কি বাবার আত্মাই সেদিন মাকে দেখা দিয়ে গিয়েছিল। আত্মা কি পারে এভাবে দেখা দিতে? কে জানে। কিন্তু এরকম গল্প তো প্রায়ই শোনা যায়।

অলৌকিক বিষয়ে একটা সন্দেহের বীজ ঢুকে গেল মনের মধ্যে। আসলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই যেন ভাল লাগছিল আমাদের। কিন্তু সন্দেহ থেকেই যে ক্রমশঃ বিশ্বাসের জন্ম হয় সেকথা তখনও জানতাম না।

এর পর ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ন' বছর যাবৎ পনের-ষোল বার ঐ অদৃশ্য হাতের শব্দ শুনেছি বিভিন্ন সময়ে। প্রথমে এই শব্দের কার্যকারণ সূত্রটি আমাদের বোধগম্য হয়নি। অর্থাৎ এই শব্দ যে কোন কিছুর সংকেত বা পূর্বাভাস, এবং কিসের পূর্বাভাস সেটা ধরতে পারিনি। পরে বার তিনেক ঘটনা ঘটে

যাবার পর ব্যাপারটা আমাদের মগজে ঢোকে। আমরা লক্ষ্য করতে থাকি কোন শুভ সংবাদ আসার আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা আগে বন্ধ জানলা বা দরজার উপরে উপর্যুপরি দুবার এরকম করাঘাতের শব্দ শোনা যায়। আর সেই শব্দ কেবল বাড়ির একজন মাত্র মানুষেরই কর্ণগোচর হয় না, বাড়িতে উপস্থিত সকলেই তা শুনতে পায়। আর এই কারণেই এক এক সময় শব্দটা এত জোরে হয় যে মনে হয় কেউ বন্ধ কপাটের উপর আধলা ইঁট ছুঁড়ে মেরেছে। প্রতিবারই আমরা শব্দের উৎস সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কিন্তু শব্দ করার মতো কোন বস্তু বা জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখতে পাইনি।

প্রথম ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে। দিল্লী থেকে আমার বড় ভগ্নীপতির টেলিগ্রাম এসে পেঁছাল রাত আটটা নাগাদ। দীর্ঘ দশ বছর পরে তার ছেলে হবার অকল্পনীয় সংবাদ নিয়ে। আমরা এর বিন্দু বিসর্গও আগে থেকে জানতাম না। টেলিগ্রামের ঠিক ঘণ্টা খানেক আগেই বাঁকুড়ার ভাড়াবাড়িতে আমরা দ্বিতীয়বার সেই আওয়াজ শুনেছিলাম।

এই আকস্মিক শব্দটাকে তখনও আমরা ঠিক এই কার্যকারণসূত্রে গাঁথতে পারিনি। তবে এটা যে কিছু অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু একটা ব্যাপার এবং তা সম্ভবতঃ আমার বাবার আত্মিক উপস্থিতি জানানোর তা একটা গা-ছমছমে অনুভূতি নিয়ে আমাদের মনের ভিতর বসতে শুরু করেছে। পর-লোক সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই, জন্মান্তর ব্যাপারটা আছে কিনা তাও জানি না (আর সেটা কেই বা জানে), তবে কিছু একটা ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে, যা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর —এমন একটা ভাবনা আমাদের সবাইকেই যেন ছুঁয়ে ফেলেছিল। এ-বাড়িতে তৃতীয়বার যে শব্দটা হয়েছিল সেটা আমার মা এবং বোনেরা শুনেছিল, আমি শুনিনি। কারণ আমি তখন বাঁকুড়ায় ছিলাম না। বাবার সঞ্চিত হাজার বারো তের টাকা এক জায়গায় আটকে ছিল। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে সেই টাকা উদ্ধার করে আমি ঠিক সেই মুহূর্তে হাওড়ায় সাউথ-ইস্টার্ন রেলে চেপেছি এবং আমার গাড়ি সবে ছেড়েছে। এই সময়ের অঙ্কটা পরে মিলিয়েছিলাম কার্যকারণ মেলাতে গিয়ে। এই একটা ক্ষেত্রেই শব্দটা শোনা গিয়েছিল একটু অসময়ে আমি টাকা নিয়ে বাড়ি পেঁছানোর সাত আট ঘণ্টা আগে।

দিন চলে যাচ্ছিল। আমাদের সংসারে ছোট বড় অনেক ঘটনাই জীবনের নিয়মে ঘটে যাচ্ছিল একে একে। এবং ঐ রহস্যময় শব্দতরঙ্গও থেমে থাকেনি, ঘটনা পরম্পরায় জড়িয়ে সে আমাদের কাছে এসে পেঁছাচ্ছিল ঠিকঠাক তার নিয়মেই। প্রত্যেকটা ঘটনা আলাদা করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বলি, ইতিমধ্যে আমার ছোট বোনটি স্কুল-কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাস করেছে। বাড়িতে একাধিক বিবাহ, আমার আর একটি বোনের ছেলে হয়েছে, আমরা জমি কিনে বাড়ি তৈরি শুরু করেছি। বাড়িও হয়ে গেছে, আমরা নতুন বাড়িতে উঠে গেছি, কিন্তু শব্দ আমাদের ছাড়েনি, নতুন বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। বয়স্করা কেউ কেউ উপদেশ দিয়েছেন গয়ায় পিণ্ড দিয়ে আসতে। অর্থাৎ তাঁরা ধরেই নিয়েছেন আমার বাবার আত্মা মুক্তি না পেয়ে এই সংসারের আনাচে কানাচে আটকে আছেন। কারণ তাঁর মৃত্যুটা তো খুব স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, অন্তিম মুহূর্তে ছেলের হাতের জলটুকুও পাননি। কিন্তু পিণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে মায়ের অমত। তিনি পুরনো দিনের মানুষ, তাঁর মনের মধ্যে সংস্কার কুসংস্কার দুইই আছে। জন্মান্তরে বিশ্বাস আছে। তাঁর ধারণা, আমার বড়বোনের ছেলে হয়ে বাবাই আবার জন্ম নিয়েছেন। না হলে এতকাল পরে কেন এই ঘটনা ঘটল। আর যদি তাই হয়, তাহলে গয়ায় পিণ্ড দিলে নবজাতকের ক্ষতি হতে পারে। মায়ের অনিচ্ছাবশতঃ ঐ ব্যাপারটিও চাপা পড়ে গেল। তাছাড়া আমারও এইসব পিণ্ডদান ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল না, এখনও নেই।

এরকমই একটা সময়ে আমার এক অধ্যাপক বন্ধু একদিন বললেন, 'চলুন একটা মজার জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব। গাড়িতে যাবেন, কোন কষ্ট হবে না। ঘণ্টা তিন চারের মধ্যেই ফিরে আসব।'

আমার এই সহকর্মী মানুষটি একটু বিচিত্র। তাঁর বিষয় অর্থনীতি। স্কলার টাইপের অত্যন্ত সীরিয়াস ধরনের মানুষ। প্রখর বুদ্ধিজীবী বললে

যেরকম বোঝায় তাই। অথচ প্রকৃতিপ্রেমী, ভেতরে যথেষ্ট রসকষ আছে। সমাজসেবামূলক কাজে অফুরন্ত উৎসাহ। বিবাহ করেননি, কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক প্রবণতা আছে। কিন্তু সেটা প্রচ্ছন্ন থাকে।

কোথায় যাচ্ছি, কে কে যাচ্ছি, কোনই কৌতূহল প্রকাশ না করে রাজি হয়ে গেলাম। নির্দিষ্ট দিনে যে-গাড়িটি আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সেটি আমার চেনা অ্যামব্যাসাডার। কলেজের নতুন প্রিন্সিপ্যালের গাড়ি। দেখলাম তিনিও গাড়ির মধ্যে বসে আছেন। ইনিও আমাদের সহকর্মী অধ্যাপক ছিলেন কিছুদিন আগে। খ্রীষ্টান। কিন্তু কোন গোঁড়ামি নেই, কারণ সক্রিয় রাজনীতি করেন। দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষ, যে-কোন ঝুঁকির প্রতি একটা ঝোঁক আছে।

শুনলাম আমরা দুর্গাপুরের কাছাকাছি প্রতাপপুর গ্রামে যাচ্ছি। সেখানকার কালী মন্দিরে এক সাধক আছেন। নাম মদনঠাকুর। অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে তাঁর কাছে। ভবিষ্যৎ জানতে। বিপদ আপদে প্রতিবিধান খুঁজতে। পুজোয় বসলে তাঁর উপর ভর হয়। তখন তাঁকে প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়।

শুনেই মনটা বিরূপ হয়ে গেল কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করলাম না। এই ভরটর, শেকড়-বাকড় মাদুলির ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই। একধরনের বোকা-ঠকানো ধাপ্পাবাজি মনে হয়। নিস্পৃহ গলায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা আমরা কেন যাচ্ছি?'

অধ্যাপক বললেন, 'বাজিয়ে দেখতে।'

কি ব্যাপারে সেটাও জানালেন। আমাদের কলেজ কম্পাউন্ডে একটা প্রকাণ্ড পুকুর আছে। পুকুর না বলে দীঘি বলাই ভাল। সেটি সাহেব মিশনারিদের আমলে বার কয়েক সংস্কার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু নানারকমের বাধায় তা নাকি সম্ভব হয়নি। বর্তমান প্রিন্সিপ্যালও সম্প্রতি পুকুরের মাটি কাটিয়ে সেটাকে আরও গভীর আর চৌকস করতে গিয়ে আটকে গিয়েছেন। পর পর দুক্ষেপে তাঁর অনেক টাকা এবং মাটি জলে গিয়েছে। দু-বারই প্রবল বর্ষণে পুরো ব্যাপারটা বানচাল হয়ে গিয়েছে। প্রবীণরা কেউ কেউ বলছেন এই পুকুরে অভিশাপ আছে। তাই প্রিন্সিপ্যাল চলেছেন পুকুরের ভাগ্য গণনা করাতে অতীতের মতো কোন দুর্ঘটনা ঘটবে কিনা।

কুসংস্কারের শেকড় এই ধরনের মানুষের মধ্যেও চারিয়ে গেছে দেখে বিস্মিত হলাম।

অধ্যাপক বন্ধু আমার মনের ভাবনা অনুমান করে হালকা গলায় বললেন, 'অবাক হবার কিছু নেই, এই আধারটি একটু বিচিত্র। অষ্টধাতুর না হলেও মিশ্র ধাতুতে তৈরি। গির্জায় যান, মন্দির কি পীরের দরগাও সুযোগ পেলে বাদ দেন না। এক সময় প্ল্যানচেট্ নিয়ে মেতে ছিলেন, জীবন বিপন্ন হবার মুখে ছেড়ে দিয়েছেন। ইনি খাঁটি বাঁকড়ী, কিন্তু পিতৃকুল-মাতৃকুলে অরিজিন্যাল খুঁজতে গেলে সুদূর পাঞ্জাব আর ওপার বাংলার বরিশালে ঢুঁ মারতে হবে।'

আমি প্রিন্সিপ্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে তারিফের চোখে হাসলাম।

বড় রাস্তায় বাস দাঁড়ানো গঞ্জ মতো জায়গায় গাড়ি রেখে পায়ে চলা মেটে পথ ধরে আমরা গাঁয়ে পেঁছিলাম। মন্দিরটি নানান দেবদেবীর মূর্তি, ঘট আর প্রতীকে ভর্তি, কালীমন্দির কিনা বুঝতে পারলাম না। খবর বোধ হয় পৌঁছে গিয়েছিল আগেই, তাই পেঁছিতে না পেঁছিতেই মন্দির সংলগ্ন বাড়িতে ডাক পড়ল আমাদের। উঠোনে যত্ন করে চারপাই পেতে আমাদের বসতে দেওয়া হল।

একটু পরে যিনি এসে আমাদের নমস্কার করে টুল পেতে বসলেন তাঁকে দেখে হতাশ হলাম। এই নাকি মদন ঠাকুর! গৈরিক কিংবা রক্তবর্ণ বস্ত্র আশা করেছিলাম, তার বদলে খাটো বিবর্ণ ধুতি আর পিরান গায়ে মানুষটির মধ্যে সাধুত্ব বা তান্ত্রিকতার কোন চিহ্ন নেই। বলে দেওয়া না থাকলে দুর্বল চাষবাসী মানুষ বলেই মনে হত। রোগা, কালো, মাঝারি হাইট, বিনয়ী। শুধু চোখ দুটোয় সামান্য জ্বলন আছে, সেটা অসুস্থতাবশতঃ হতে পারে। টি. বি. রোগীদের শেষ দশায় এমন তীব্র চাউনি দেখেছি। বছর দেড়েকের মধ্যেই ভদ্রলোক অবশ্য মারা গিয়েছিলেন, এবং টি. বি.-তেই।

আমাদের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হেসে বললেন, 'প্রফেসারবাবু, আপনারা দেরি করে ফেলেছেন, এখন

কি আর বলতে পারব কিছু। পুজো ছেড়ে দিয়েছি, শরীর জুত নেই, ভর সয় না। কি জানতে চান বলেন, ষাট সত্তর ভাগ হয়তো মিলবে।' সাদামাঠা স্পষ্ট কথা।

প্রিন্সিপ্যাল তাঁর কলেজদীঘির সমস্যাটা বলে জানতে চাইলেন কাজটা শেষ করতে পারবেন কিনা।

অবিশ্বাসভরা সতর্ক চোখে আমি লক্ষ্য করছি। লোকটি আধমিনিটটাক মাথা হেঁট করে বসে থাকলেন। মনে হল চোখ বুজে আছেন। ধ্যান না ভান কে জানে।

হঠাৎ মুখ তুলে মৃদু গলায় বললেন, 'অসুবিধে আছে।'

'কিসের অসুবিধে?'

'বাবা শুয়ে আছেন ওখানে। বিরক্ত হচ্ছেন।'

প্রিন্সিপ্যাল কাজের মানুষ, চাঁছাছোলা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বাবা? বিরক্ত হচ্ছেন কেন? ভাল কাজই তো আমরা করছি। পুকুর গভীর হলে জল পরিষ্কার থাকবে। আশপাশের লোকের উপকার হবে। তাছাড়া আমরা মাছের চাষ করব ভাবছি। কলেজ ফান্ডের জন্যে, বলুন বাবাকে। বাগড়া দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?'

মদন ঠাকুর জিভ কাটলেন। তারপর আবার নত মুখ হলেন।

'না বাবু। বাবা ঠাঁইনড়া হতে চাইছেন না। মাটি কাটলে উনি উদ্বাস্তু হবেন। ভৈরবথানের মা-জননী যে রাতের বেলায় ওখানে আসেন।'

'বুঝেছি বাবা মহাদেবের কথা বলছেন। পুকুরের মধ্যেই তাহলে উনি আছেন। কোন্ জায়গায়?'

'পুকুরের অগ্নিকোণে। পুব-দক্ষিণ কোণটায়।'

এর পরে এক শর্তে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। সেসব কথা অবান্তর। কিন্তু পুব-দক্ষিণ কোণ থেকে সত্যি সত্যিই পাওয়া গিয়েছিল একটা প্রকান্ড পাথর। মাটির তলা থেকে। সেটা ঠিক মসৃণ কালো রঙের শিলা নয়, প্রায় কূর্মাকৃতি, জমাট কংক্রিট ধরনের দেখতে। কলেজট্যাঙ্কের পুব-দক্ষিণ কোণে পূর্বশর্ত অনুযায়ী একটা গাছের তলায় সে-খানাকে রাখা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এখনও সেখানেই আছে। শুধু দু-চার জন ছাড়া কেউ ওটাকে শিবশিলা বলে চেনে না। সাধারণ একটা পাথরই ভাবে। গত একাশী খ্রীষ্টাব্দেও আমি বাঁকুড়ায় গিয়ে দেখে এসেছিলাম পাথরটাকে।

যাক আগের কথায় আসি। আমরা যখন উঠব উঠব করছি, মদন ঠাকুর আমাকে বললেন, 'বাগচী বাবু, আপনি তো কিছু শুধালেন না?'

আমি একটি কথাও বলিনি ঠিকই, সঙ্কোচবশতই হয়তো। তাছাড়া তখন ভেতরে কোনরকম আস্থা জন্মাবার কারণ ঘটেনি। আমি আড়ষ্টতা ভেঙে বললাম, 'আমার মায়ের খুব অসুখ। হঠাৎ কিছু কি—'

মদনঠাকুর আবার তাঁর নিজস্ব ধরনে কিছুটা সময় নিলেন। তারপর বললেন, 'রোগ তো আপনার মায়ের পেটে বাসা বেঁধেছে। খুব দুঃখের ঘটনা। আচ্ছা —' একটা চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললেন, 'লাল কাপড় পরা এরকম মহিলা কি আপনাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'কখনো কি কেউ এসে আপনার মাকে কোন লাল রঙের ফুল দিয়ে গিয়েছিল, জানেন?'

আমি হেসে বললাম 'না। এরকম কোন ঘটনা ঘটলে আমি জানতাম।'

'কিন্তু এ তো মানুষ মন্দ করেছে। আপনার কোন শত্রুর কাজ।'

উনি চুপ করে মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে লাগলেন, যেন দুঃখ প্রকাশ করছেন। আমিও চুপ করে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু এমন শত্রু কাউকে মনে মনেও খুঁজে পেলাম না। এখানে বলে রাখি আমার মায়ের পেটে ক্যান্সার হয়েছিল। তখন প্রায় লাস্ট স্টেজ, কিছুই করার ছিল না।

অধ্যাপক-বন্ধুটি জানতেন। আমার হয়ে তিনিই প্রশ্ন করলেন, 'কিছু করা যায় না?'

মদনঠাকুর একথার উত্তর না দিয়ে বললেন, 'সন্ন্যাসী প্রভু আছেন, আপনাদের বাড়িতে। তিনিই আপনার মায়ের ভরসা। এক কাজ করবেন। প্রতি সংক্রান্তির দিন তুলসীতলায় ওঁকে স্মরণ করে নৈবেদ্য দিতে বলবেন।'

ফেরার পথে অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, সন্ন্যাসী প্রভু, সে আবার কে?'

উনি বললেন, 'কোন উন্নত মার্গের আত্মা সম্ভবতঃ।'

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, 'মায়ের এক দাদা ছিলেন সম্পর্কে'। তিনি তারকেশ্বরের মোহন্ত হয়েছিলেন এক সময়। দণ্ডী স্বামী। মা তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছিল শুনেছি। অল্প বয়সে তাঁকে একবার মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখেও এসেছিলাম পুরনো বালিগঞ্জের এক শিষ্যবাড়িতে। এই সন্ন্যাসী প্রভু কি তিনিই? তাঁর তো দেহান্ত হয়েছে।

বাড়ি ফিরে মাকে সেই তান্ত্রিক মহিলার কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু না, কোন রকম মহিলাই তার কাছে কখনো আসেনি, ফুল দেওয়া তো দূরের কথা। আমার ছোটবোন বসে কলেজের পড়া করছিল, চমকে উঠে বলল, 'দাদা! ভদ্রলোক বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। সেটা বোধ হয় বছর খানেক হবে। আমার বন্ধুদের সঙ্গে কলেজের সামনের রাস্তায় পায়চারি করছিলাম। ঐ রকম বিশাল চেহারার এক মহিলা, সন্ন্যাসীদের মতো লালকাপড় পরা, আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ আমার হাতে একটা ফুল গুঁজে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে কোন কথাই বলতে পারিনি। বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল এই নিয়ে। বলেছিল, পরীক্ষায় তুই এবার নির্ঘাত পাস করে যাচ্ছিস, কী ভাগ্যি রে তোর! আমি ফুলটা নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিয়েছিলাম।'

আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি ফুল?'

ও বলেছিল, 'লাল গোলাপ।'

এত দূরের কার্যকারণ সূত্র সে-ব্যাপারটা কাকতালীয় বলেই মনে হয়েছিল। তবু একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারিনি।

সেই রাতেই আবার সেই ঘটনা ঘটল। রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ, আমরা সবে শুয়ে পড়েছি, অমনি বন্ধ জানলার ওপর বেশ জোরালো একজোড়া শব্দ হল। আমরা সবাই আলো জেলে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মফস্বলে সাড়ে এগারটা রাত্তির, তায় আবার শীতের দিনে। নিশুতি রাত দুপুরই বলা যায়। এই অসময়ে আবার কী ঘটতে যাচ্ছে রে বাবা! সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন। আলাপ আলোচনায় মিনিট পনের কুড়ি কেটেছে এমন সময় মনে হল কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। 'আনন্দ! ও আনন্দ!'

সেই রাতেই আবার সেই ঘটনা ঘটল। রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ, আমরা সবে শুয়ে পড়েছি, অমনি বন্ধ জানলার ওপর বেশ জোরালো একজোড়া শব্দ হল। আমরা সবাই আলো জেলে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মফস্বলে সাড়ে এগারোটা রাত্তির, তায় আবার শীতের দিনে। নিশুতি রাত দুপুরই বলা যায়। এই অসময়ে আবার কী ঘটতে যাচ্ছে রে বাবা! সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন।

দরজা খুলে অবাক। ছোটকাকা! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কেন অবিশ্বাস্য বলা প্রয়োজন। এই কাকা যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। তারপরে অনেক বছর পরে ফিরে এসেছিলেন যদিও, কিন্তু আর সংসারে ঢোকেননি। চাকরি বাকরির জালেও জড়াননি। চক্রধরপুরে নির্জন বাস করতেন, আর হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন। হাতযশ ছিল। কিন্তু সামাজিক সূত্রছেঁড়া মানুষ, লৌকিকতার সম্পর্ক বা ধার ধারতেন না। আসা যাওয়া ছিল না। মায়ার বন্ধন ঘটতে পারে আশংকায় সম্ভবতঃ।

বাবার মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছিলাম। কারণ ভাইদের মধ্যে এই কনিষ্ঠটিই ছিলেন বাবার সবচেয়ে প্রিয়। উত্তরে পোস্টকার্ডে কয়েক ছত্রের দার্শনিক উপদেশ পেয়েছিলাম মাত্র। তিনি হঠাৎ খুঁজে পেতে আমাদের দেখতে আসবেন ভাবাই যায়নি।

পাঠকদের আর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। শুধু একটা কথাই বলব, মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সব নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আর কোন ঘটনাই ঘটেনি। প্রায় চৌদ্দ বছর হয়ে গেল মায়ের মৃত্যুর পর, তবু কেমন খালি খালি লাগে। মনে হয় ওপার থেকে কোন চিঠি আসছে না কেন যে। আমরা কি দোষ করলাম?

মানুষের জীবনে বিশ্বাসের জন্ম বোধ হয় এই ভাবেই হয়। হতবুদ্ধির মধ্য দিয়েই হয়।

জ্যোতিষমতে রুদ্রাক্ষ ধারণের ফল

রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

'রুদ্রাক্ষ' শব্দের অর্থ রুদ্রদেবতা তথা বা চোখ। জাবাল-উপনিষদ্, মেরুতন্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ, বৃহৎতন্ত্রসার, সারদাতিলকতন্ত্র, তন্ত্রতত্ত্ব ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে বিভিন্ন স্থানে রুদ্রাক্ষের মঙ্গলদায়ী গুণাবলীর বর্ণনা আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, পৃথিবীকে

পুরাণে বর্ণিত আছে, পৃথিবীকে প্রলয় দ্বারা ধ্বংস করার পর মহাদেব অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। করুণার অশ্রুবিন্দু তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সেই অশ্রুবিন্দুই রুদ্রাক্ষ। আবার কথিত আছে, হিমালয়ের দুর্দান্ত অসুর ত্রিকুর বধের জন্য বহুবছর অপলক দৃষ্টিতে রুদ্রকে (শিবকে) যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যার জন্য তাঁর অবসাদগ্রস্ত চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আদেশে তা থেকে যে বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তার নাম দেওয়া হল রুদ্রাক্ষ।

প্রলয় দ্বারা ধ্বংস করার পর মহাদেব অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। করুণার অশ্রুবিন্দু তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সেই অশ্রুবিন্দুই রুদ্রাক্ষ। আবার কথিত আছে, হিমালয়ের দুর্দান্ত অসুর ত্রিকুর বধের জন্য বহুবছর অপলক দৃষ্টিতে রুদ্রকে (শিবকে) যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যার জন্য তাঁর অবসাদগ্রস্ত চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আদেশে তা থেকে যে বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তার নাম দেওয়া হল রুদ্রাক্ষ। এগুলি পুরাণের কথা। সব কাহিনীর মূল বক্তব্য রুদ্রের উত্তেজনা, অবসাদ ও অশ্রুপাত।

প্রধানতঃ শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, সম্প্রদায়ের লোকেরা অথবা মন্ত্র-জপের সংখ্যা মনে রাখার জন্য, অথবা অঙ্গে ধারণ করার জন্য রুদ্রাক্ষ মালারূপে ব্যবহার করে থাকে। সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের ভাবধারার প্রতীকস্বরূপ সাধারণ সংসারী লোকের মধ্যেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রুদ্রাক্ষ সূর্যের সপ্তরশ্মিকে শোষণের মাধ্যমে মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র এবং সাধারণভাবে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে। রুদ্রাক্ষ রক্তস্রোতকে সচল রাখে এবং স্নায়ুর স্নিগ্ধতা সাধন করে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিভিন্নপ্রকার 'প্রতিকারে'র উল্লেখ আছে। প্রতিকার হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহরত্নের পরিবর্তে রুদ্রাক্ষ ধারণের স্বতন্ত্র প্রভাবও স্বীকৃত হয়েছে। আয়ুর্বেদ-সংহিতায় বৈদ্যক দ্রব্যাভিধানে রুদ্রাক্ষকে উষ্ণগুণসম্পন্ন বাত, কৃমি, শিরোরোগ, ভূত-গ্রহ বিনাশক বলা হয়েছে। তন্ত্রজ্যোতিষমতে গ্রহগণের মন্দভাবকে প্রশমিত করে থাকে এই রুদ্রাক্ষ। প্রকৃত রুদ্রাক্ষ অত্যন্ত মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্যও বটে।

রুদ্রাক্ষ ধারণে মানুষ অপরাজেয় হয়। উচ্চ রক্তচাপ, হিস্টিরিয়া, হৃদ্‌রোগ, বসন্তরোগ, শ্লেষ্মাধিক্য, ক্ষয়রোগ, স্মৃতিশক্তিহীনতা, বদহজম, পিত্ত, বাত, মেয়েদের নানা ব্যাধি প্রভৃতির উপশম হয়ে থাকে। এছাড়া রুদ্রাক্ষ ধারণে অশান্ত মনে শান্তি ফিরে আসে। জীবনের বহুবিধ বাধাবিঘ্নের উপরেও রুদ্রাক্ষের নিয়ন্ত্রণ দৃষ্ট হয়। যেমন ক্ষয়ক্ষতি, অমিতব্যয়ী স্বভাব, হীনম্মন্যতার ক্ষেত্রেও রুদ্রাক্ষ ধারণের সুফল পাওয়া যায়। মারক গ্রহগণের অশুভ প্রভাবকে দূর করে এই রুদ্রাক্ষ। আত্মহত্যার প্রবণতা, অস্থিরতা, প্রবল কামতৃষ্ণা, উদ্দাম ভাবপ্রবণতাকেও সুসংহত করে এই রুদ্রাক্ষ। কালসর্প যোগে যাঁদের জন্ম, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে তাঁরা সবিশেষ উপকৃত হবেন। গ্রহের অশুভ প্রভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রমতে যেসব রোগ উৎপন্ন হয় এবং ডাক্তারি শাস্ত্রে যেসমস্ত রোগ নির্ণয় করাও সহজসাধ্য নয়, রুদ্রাক্ষ ধারণে তার উপশম হওয়া সম্ভব।

রুদ্রাক্ষ এলিওকারপাসি (Elaeocarpaceæ) ফ্যামিলিভুক্ত, সমগ্র পৃথিবীতে এর নব্বইটি প্রজাতি (Species) আছে। তার মধ্যে ভারতবর্ষে ঊনিশটি বর্তমান। গাছটি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের

মাঝারি ধরনের বকুল (Mimusops elengi) গাছের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তার গুচ্ছবদ্ধ ফল আকারে ও বিন্যাসে পিটুলি গাছের (Trewia-nudiflora) মতো। ফলের শাঁস টক। এই শাঁস মৃগী রোগে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এর বীজগুলি সাধারণতঃ পাঁচটি কোষ (কোয়া) একত্রীভূত অবস্থায় থাকে। প্রতি দুটি কোষের মাঝখানে একটি রেখা বর্তমান, এইরকম পাঁচটি রেখাযুক্ত রুদ্রাক্ষকে 'পঞ্চমুখী' বলা হয়। এটিই হচ্ছে স্বাভাবিক। এছাড়া বীজের গঠনের অস্বাভাবিকতার জন্যে এক থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত রেখাযুক্ত রুদ্রাক্ষও পাওয়া যায়। দুর্লভ বলে সেগুলির মূল্য অনেক বেশি। এই রুদ্রাক্ষটি প্রধানতঃ জন্মে নেপাল, অসম ও দক্ষিণ কঙ্কণঘাট অঞ্চলে। অন্যান্য স্থানেও কখন কখন দেখা যায়, তবে রোপণের প্রয়োজন হয়। এটির বোটানিক্যাল নাম এলিওকারপাস গ্যানিট্রাস (Elaeocarpus ganitrus) আর একটি রুদ্রাক্ষ জাভার মোরাবায়া, কাবুমেন, সোলো, সামারণ ও কাডোরীর পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়। এর বীজগুলি ছোট, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানীদের মতে এটির নাম এলিওকারপাস টালসারকুলেটাস (Elaeocarpus tulserculatus)।

বিভিন্ন শাস্ত্রে এক থেকে চোদ্দমুখী পর্যন্ত রুদ্রাক্ষ ব্যবহারের যে নিয়ম, আচার ও অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তা এখন বলা হচ্ছে।

একমুখী রুদ্রাক্ষ : রুদ্রাক্ষের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রেণীকে 'শিব' নামে অভিহিত করা হয়। রুদ্রাক্ষের যেসব গুণাগুণের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সেসমস্তই এই শ্রেণীর রুদ্রাক্ষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। খুবই দুর্লভ শ্রেণীর রুদ্রাক্ষ এবং অত্যন্ত মূল্যবানও বটে। বলা হয় এই রুদ্রাক্ষ ধারণে মানুষ অপরাজেয় হয়। বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতিও ঘটে।

এই মন্ত্রে রুদ্রাক্ষের উজ্জীবন করতে হয় :

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

'ওঁ ওঁ ভূশং নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে দক্ষিণ বাহুতে কিংবা কণ্ঠে এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে লোকপ্রভাবিনী শক্তির স্ফুরণ ঘটে। রাশিচক্রে 'রবিগ্রহ পাপপীড়িত, পাপগ্রহদৃষ্ট, নীচস্থ পাপযুক্ত দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, অষ্টমে ও দ্বাদশে কিংবা যেকোনভাবে পীড়িত হলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধ সংস্কার পূর্বক ওঁ ঐং মন্ত্র ৭০০ বার জপ করে তারপর ওঁ হ্রীং শ্রীং সূর্যায় নমঃ মন্ত্র ৭০০০ বার জপ করে ধারণ করলে রবিগ্রহের সমস্ত কুফল নষ্ট হয়।

দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ : এই জাতীয় রুদ্রাক্ষকে 'হরগৌরী' নামে অভিহিত করা হয়। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে মনের একাগ্রতা ও বিবাহিত জীবনে শান্তি এনে দেয়। অজ্ঞাতসারে গোহত্যাজনিত পাপের স্খালন হয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সম্পর্কে চেতনার সঞ্চার করে। অর্ধনারীশ্বর মন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে এই রুদ্রাক্ষের উজ্জীবন হয় :

নীলপ্রবালরুচিরদ্-বিলসৎ ত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপলকপালত্রিশূলহস্তম্।
অর্ধাম্বিতকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করে দক্ষিণ বাহুতে কিংবা কণ্ঠে এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে ত্রিজন্ম সঞ্চিত পাপরাশি দূরীভূত হয়। রাশিচক্রে কেতুগ্রহ নীচস্থ, পাপপীড়িত বা যেকোন ভাবে অশুভ হলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কার পূর্বক 'ওঁ শ্রীং' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে এবং তৎপরে 'ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে' মন্ত্র, ১২০০০ বার জপ করে ধারণ করলে কেতু গ্রহের সমস্ত কুফল নষ্ট হয়।

ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ : এই জাতীয় রুদ্রাক্ষের নাম 'অগ্নি'। অতীত পাপ বিনষ্ট করে, মানুষের সৃজনীশক্তির বিকাশ সাধন করে, চিরকর্মচঞ্চল জীবনীশক্তিকে উন্নীত করে, ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণ করে। মন্ত্র : ওঁ পিঙ্গশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥
ওঁ ওঁ নমঃ—এই মন্ত্র পাঠ করে দুই বাহুতে ধারণ করলে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার হয়। রাশিচক্রে মঙ্গল নীচস্থ, পাপপীড়িত, পাপদৃষ্ট লগ্নে, দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে ও দ্বাদশে কিংবা যেকোন ভাবে পীড়িত হলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধ সংস্কারপূর্বক 'ওঁ ধ্রুং ধ্রুং' মন্ত্র ২১০০ বার জপ করে, তৎপরে 'ওঁ হুং শ্রীং মঙ্গলায়'

৮০০০ বার জপ করে ধারণ করলে মঙ্গলগ্রহের সমস্ত কুফল নষ্ট হয়।

চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ : জ্যোতিষী নাম 'ব্রহ্মা'। মনের ক্রিয়াকলাপের উপরে এই শ্রেণীর রুদ্রাক্ষের প্রভাব চমৎকার। সেকারণে উন্মত্ততা, অনিদ্রা, বিষাদময়তা ইত্যাদি মানসিক রোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা হয়। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। তুচ্ছ বিষয়ে মানসিক অস্থিরতার উপশম হয়, মানসিক অবসাদ দূর হয়, উদ্বেগ, ভয়, খিটখিটে স্বভাব ও আত্মহনন-চিন্তা ইত্যাদির প্রকোপ হ্রাস করে। বক্তৃতা-ক্ষমতা, কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধি বৃদ্ধির উন্মেষকারক এই রুদ্রাক্ষ। মন্ত্র :

ওঁ ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন।
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে।
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুবঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ।
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্যস্তস্য সুচিন্তনম্॥

এই মন্ত্র পাঠ করে কণ্ঠে ধারণ করতে হয়। রাশিচক্রে চন্দ্রগ্রহ নীচস্থ, পাপযুক্ত ও পাপ-পীড়িত হইয়া দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, অষ্টমে, দ্বাদশে, অবস্থান করিলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কার করে 'ওঁ হ্রাং হ্রূং' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর 'ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়' এই মন্ত্র ১১০০০ বার জপ করে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করলে চন্দ্রগ্রহের সমস্ত কুফলকে নষ্ট করে বিভিন্ন শান্তি ও সুখ আনয়ন করে।

পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ : সর্বাধিক পরিচিত এবং সর্বত্রই এই রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। এই রুদ্রাক্ষ দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে। এর নাম 'কালাগ্নি রুদ্র'। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে নিষিদ্ধ খাদ্যগ্রহণ এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের পাপ অপনোদন হয়, মানসিক প্রশান্তি আসে। মন্ত্র :

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতি
হস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ-
র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

'ওঁ নমঃ শিবায়' শিবের এই পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র সহযোগে সন্ধ্যাকালে দেহের যে-কোন অংশে ধারণ করলে অখাদ্য ভোজন-জনিত পাপ নষ্ট হয়। রাশিচক্রে শনিগ্রহ রবিযুক্ত হলে লগ্নে, দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে, দ্বাদশে অবস্থান করলে কিংবা যেকোন ভাবে শনিগ্রহ পাপপীড়িত, নীচস্থ, ও অশুভ গ্রহযুক্ত হলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কারপূর্বক 'ওঁ হ্রীং' মন্ত্র ৩০৮ বা জপ করলে ও তৎপরে 'ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়' এই বীজমন্ত্র ১০০০০ বার জপ করে ধারণ করলে শনিগ্রহের সমস্ত অশুভ ফল নষ্ট হয়।

ষড়মুখী রুদ্রাক্ষ : এই জাতীয় রুদ্রাক্ষের নাম 'কার্তিকেয়'। ছাত্রদের পক্ষে এবং যাঁরা দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন তাঁদের পক্ষে এই রুদ্রাক্ষ সবিশেষ উপকারী। জ্ঞানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই রুদ্রাক্ষের চমৎকার কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্র :

ওঁ শম্ভোর্নন্দনমগ্নিবর্চ্চঃ সমুদারাদীপ্তপূত্রীসুতং
শান্তং শক্তিধরং ষড়াননমলঙ্কারৈরলংকারিতম্।
ভাসা নির্জ্জিতহেমকুঙ্কুমাগুরুদের্যো রোচনাশৈলজং
ধ্যায়েদ্দৈত্যকুলার্দনং সুরমুদং তং কার্তিকেয়ং মহঃ॥

এই মন্ত্রযোগে রুদ্রাক্ষ উজ্জীবন করা হয়। ভূত-প্রেতাদি কর্তৃক অনিষ্ট সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিকাররূপে ধারণীয়। মানসিক অবসাদ, স্বভাবের উগ্রতা এবং নানা স্ত্রীরোগের উপকারকারী এই রুদ্রাক্ষ। রাশিচক্রে শুক্র কন্যায় নীচস্থ, অশুভ গ্রহযুক্ত দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশে অবস্থান করলে বা অশুভ হলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কারপূর্বক 'ওঁ ঐং হ্রীং' মন্ত্র ৭৫০ বার জপের পর 'ওঁ হ্রীং শুক্রায়' এই মন্ত্র ২১০০০ বার জপ করে ধারণ করলে শুক্রগ্রহের সকল অশুভ ভাব নষ্ট হয়।

সপ্তমুখী রুদ্রাক্ষ : এই শ্রেণীর রুদ্রাক্ষের নাম অনন্ত মাতৃকা। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অর্থ, মান, যশ ও প্রতিপত্তিলাভের পথ সুগম হয়ে থাকে। রাশিচক্রে রাহুগ্রহ রবি ও চন্দ্র যুক্ত হয়ে লগ্নে, দ্বিতীয়ে, চতুর্থে, পঞ্চমে, ষষ্ঠে, সপ্তমে, অষ্টমে, নবমে,

দশমে এবং দ্বাদশে অবস্থান করলে কিংবা কোনও ভাবে অশুভ হলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ নিম্নোক্ত মন্ত্রে উজ্জীবন করতে হয় ঃ

ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাং
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্বন্দেহহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং
কামরূপাম্ ॥

'ওঁ ওঁ হ্রাং' মন্ত্র ১০৮ বার এবং তৎপরে 'ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে' এই মন্ত্র ১২০০০ বার জপ করে উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে ধারণ করলে রাহু গ্রহের সকল কুফল বিনষ্ট হয়।

অষ্টমুখী রুদ্রাক্ষ ঃ এই রুদ্রাক্ষের দুটি নাম বিনায়ক ও বটুকভৈরব। শনিগ্রহ এবং রাহুর অশুভ প্রভাব খর্ব করে, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে হঠাৎ আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, দুষ্কৃতকারীদের হাতে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, রাশিচক্রে শনি ও রাহু অশুভ থাকলে উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি সংস্কারপূর্বক পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে এবং স্ত্রীলোকের বামবাহুতে ধারণীয়। মন্ত্র ঃ

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

এইরূপে বিনায়ক মন্ত্র পাঠ করে অথবা বটুক ভৈরব মন্ত্র যথা 'হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রাং' এই মন্ত্রে বটুক ভৈরবের পূজো করে এবং পরে 'ওঁ রুং রং' মন্ত্র ৩০৭ বার জপ করে ও পরে 'ওঁ ঐং হ্রাং রাহবে' এই বীজমন্ত্র ১২০০০ বার জপ করে উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে সমস্ত অশুভ প্রভাব দূরীভূত হয়।

নবমুখী রুদ্রাক্ষ ঃ এই রুদ্রাক্ষের নাম মহাকাল ভৈরব। ধারণে জীবনে উন্নতির সূচনা যায়, সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জয়লাভ করা হয়। দুর্ঘটনা ও হঠাৎ মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। ধারণের পূর্বে ১০ হাজার বার ভৈরব মন্ত্র উচ্চারণ করে এই রুদ্রাক্ষের উজ্জীবন অথবা প্রাণসঞ্চার করে নিতে হয়।

মন্ত্র ঃ ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দ্রংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।
ব্যাঘ্রচর্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসকম্।
ত্রিনেত্রমূর্ধ্বকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতম্।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রজলন্নিভম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠের পর 'ওঁ হুং ক্ষ্রোং যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকাল ভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। বুদ্ধিবৃত্তিজনিত কাজকর্মের ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রচুর সুফল দান করে এই রুদ্রাক্ষ। রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহ মকরে নীচস্থ, মকরস্থানে অবস্থান করলে, কিংবা মারকস্থ হলে এবং ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করলে কিংবা কোনভাবে অশুভ হলে এই গ্রহের শান্তির নিমিত্ত উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধ সংস্কারপূর্বক ধারণের পর 'ওঁ হ্রাং' মন্ত্র ৫০০ বার জপ করে 'ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং বৃহস্পতয়ে' এই বীজমন্ত্র ১৯০০০ বার জপের পর পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে এবং স্ত্রীলোকের বাম বাহুতে ধারণ করলে সকল অশুভ বিনাশ হয়।

দশমুখী রুদ্রাক্ষ ঃ এই শ্রেণীর রুদ্রাক্ষ দুর্লভ। এর নাম মহাবিষ্ণু। মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, সুনাম, খ্যাতি, সম্মান, পার্থিব সমৃদ্ধি, কর্মদক্ষতা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সহায়ক এই রুদ্রাক্ষ। প্রেতাদি কর্তৃক অনিষ্টকর প্রভাব থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। রাশিচক্রে বুধগ্রহ নীচস্থ শত্রুযুক্ত ও শত্রুক্ষেত্রগত, দ্বিতীয় ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করলে কিংবা কোনভাবে পীড়িত হলে উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সংস্কার করে ধারণ করতে হয়।

মন্ত্র ঃ ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করে 'ওঁ হ্রীং' মন্ত্র ২৭০ বার জপ করে 'ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়' এই মন্ত্র ১৭০০০ বার জপের পর উপরোক্ত রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে ধারণ করলে সমস্ত অশুভ দূরীভূত হয়।

একাদশমুখী রুদ্রাক্ষ ঃ এটি এক বিশেষ জাতের রুদ্রাক্ষ। এর নাম মহামৃত্যুঞ্জয়। মেয়েদের

নানা অসুখের ক্ষেত্রে একান্তভাবেই সুফলপ্রদানকারী, আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটলে, আত্মহনন চিন্তা এসে মনকে এবং মেজাজ খিটখিটে স্বভাবের হয়ে উঠলে এই রুদ্রাক্ষ ধারণে তার উপশম হয়। মন্ত্র ঃ

চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মস্বয়ান্তঃস্থিতং
মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভম্।
কোটীরেন্দু গলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং
কান্তাবিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ।

এই মন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে রুদ্রাক্ষ উজ্জীবিত করে ধারণ করা প্রয়োজন। রাশিচক্রে শুক্র ও মঙ্গল অশুভ থাকলে উপরি-উল্লিখিত মন্ত্রে যথাবিধি সংস্কার-পূর্বক 'ওঁ শ্রীং' মন্ত্র ৫০১ বার জপ করে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করলে শুক্র ও মঙ্গলের সমস্ত অশুভ প্রভাব নাশ হয়।

দ্বাদশমুখী রুদ্রাক্ষ : এর নাম অর্ক বা আদিত্য। এই রুদ্রাক্ষ রবি ও রাহুর অশুভ প্রভাবকে প্রশমিত করে। রবি যখন মকরে অথবা কুম্ভরাশিতে অবস্থিত হয়ে অশুভদশা প্রাপ্ত হয় তখন এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে সকল কুফল নষ্ট হয়। ব্যবসায়িক মন্দা বা অসাফল্য নিবারণ করতে আদিত্যমন্ত্র সহযোগে এই রুদ্রাক্ষকে উজ্জীবন করে ধারণ করতে হয়।

মন্ত্র ঃ ওঁ আদিত্যায় কাশ্যপেয়ায় অদিতিসূনবে।
দিব্যমূর্তয়ে শাক্তাধিষ্ঠিতমাল্যধরায়
অনিমাদ্যষ্টগুণসংযুক্তায়
ধীময়ায় জগচ্চক্ষুষে সর্বলোকপূজিতায়
ইমমর্চনং গৃণান শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করে 'ওঁ হ্রাং হ্রাং' মন্ত্র ১০৮ বার জপের পর রুদ্রাক্ষটি কণ্ঠে ধারণ করলে উল্লিখিত সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়।

ত্রয়োদশমুখী রুদ্রাক্ষ : এর নাম কাম। এর ধারণে সর্বভাবেই কামনীয় বিষয়ের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। এই রুদ্রাক্ষ ধারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ হয়। চিন্তামণি মন্ত্র সহযোগে এই রুদ্রাক্ষ উজ্জীবন করতে হবে। মন্ত্র ঃ

অগ্নিঃ সংবর্তকাদিত্যরানিলো ষষ্ঠবিন্দুমৎ।
চিন্তামণিরিতি খ্যাতং বীজং সর্বসমৃদ্ধিদম্॥

অতঃপর 'ওঁ ক্ষোং স্তোং' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে শুক্রের বীজমন্ত্র 'ওঁ হ্রীং শুক্রায়' ২১০০০ বার জপ এবং চন্দ্রের বীজমন্ত্র 'ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়' ১১০০০ বার জপ করে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করলে সমস্ত পাপ দূর হয় এবং সকল মনোরথ সিদ্ধি হয়। এর ধারণে চন্দ্র ও শুক্রের অশুভ প্রভাব নাশ হয়ে থাকে।

চতুর্দশমুখী রুদ্রাক্ষ : এই রুদ্রাক্ষ শ্রীকণ্ঠ নামে পরিচিত। এই রুদ্রাক্ষ ইন্দ্রিয় সংযমে সাহায্য করে। পঞ্চমুখ হনুমানমন্ত্র সহযোগে একে উজ্জীবিত করতে হয়। মন্ত্র ঃ

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোর-রাবং সমুৎসৃজন্॥
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্।
জলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্যকোটিসমপ্রভম্॥
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্॥

মন্ত্র পাঠ করে শুক্রের বীজমন্ত্র 'ওঁ হ্রাং শুক্রায়' মন্ত্র ২১০০০ বার জপ করে ধারণ করলে শুক্রগ্রহের সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হয়। 'ওঁ ঙং মাং' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে ধারণ করলে বৃহস্পতি ও রবির সমস্ত অশুভ প্রভাব নষ্ট হয়ে থাকে।

জ্যোতিষমতে রুদ্রাক্ষ ধারণের বিধি ও ফলাফল বর্ণনা করা হল। শুদ্ধচিত্তে সঠিক মন্ত্রো-চ্চারণাদি পূর্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে অবশ্যই ফললাভ হবে। যেহেতু নকল রুদ্রাক্ষ দ্বারা প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে, তাই বিশেষজ্ঞদ্বারা পরীক্ষা করিয়ে অনুষ্ঠানাদির জন্য যোগ্য পুরোহিতের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়। সংক্রান্তি, অষ্টমী তিথি, চতুর্দশী তিথি, গ্রহণ, পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যা ইত্যাদি পুণ্য তিথিতেই রুদ্রাক্ষ ধারণ বিধেয়। তিথির সঙ্গে শুভ নক্ষত্র যোগ দেখে নিতে হবে। এবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ মেনে চলা উচিত। বাহুতে কিংবা কণ্ঠে স্বর্ণসূত্রে, রৌপ্য-সূত্রে অথবা কার্পাসসূত্রে গ্রথিত করে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতদ্বারা মহাস্নান করিয়ে উল্লেখিত মন্ত্র-সহযোগে রুদ্রাক্ষকে উজ্জীবিত করে ভক্তিসহকারে ধারণের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

ভাইরাসজনিত শিশুরোগ

সন্দীপকুমার চক্রবর্তী

অতি-আণুবীক্ষণিক (ultra-microscopic) ক্ষুদ্রতম জীবাণু যা ভাইরাস (virus) নামে অভিহিত, তা যেকোন বয়সের লোককেই আক্রান্ত করতে পারে। তবে এমন কতকগুলি ভাইরাসজনিত রোগ দেখা যায়, যা প্রধানতঃ শিশু ও কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়। জন্মগ্রহণের পর বেশ কিছু বয়স পর্যন্ত শিশুর দেহে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি ব্যবস্থার (immunity) পূর্ণ বিকাশ ঘটে না যার ফলে এই বয়সে বিভিন্ন জীবাণুঘটিত রোগের আধিক্য দেখা যায়। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাইরাসজনিত শিশুরোগের আলোচনা ও তার সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

শ্বাসপ্রশ্বাস মাধ্যমে যে-কয়েকটি ভাইরাস রোগ সচরাচর শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে প্রথমেই হাম (measles) রোগের নাম করা যেতে পারে। সাধারণতঃ শীতের শেষে এই রোগের আধিক্য ঘটে ও সময়ে সময়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই রোগের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার ৯ থেকে ১২ দিনের মধ্যে জ্বর ও ঠাণ্ডা লাগার উপসর্গ নিয়ে (যেমন চোখ লাল, নাক দিয়ে জল পড়া, মুখে সামান্য ফোলাভাব) শুরু হয়। এর পরই শিশুর দেহে ছোট ছোট গোলাকার লালচে বা গোলাপী গুটি (rash) দেখা যায়। এই গুটিগুলি চামড়ার একই সমতলে (level) থাকে। কয়েকদিন পর এই গুটিগুলি ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। সময়ে সময়ে হামরোগ মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করে। যেমন ব্রঙ্কাইটিস, (Bronchitis) ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া (Broncho-pneumonia), মধ্যকানের প্রদাহ (Otitis media) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে হাম ভাইরাসজনিত মস্তিষ্ক-প্রদাহ (Encephalitis) মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। অপুষ্টি-জনিত ও জন্মগত প্রতিরোধশক্তি ব্যাহত (immuno-compromised) শিশুদের মধ্যেই এই রোগ প্রায় মারাত্মক হয়। কখনো কখনো হামরোগের ভাইরাস মস্তিষ্ক কোষের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যায় এবং শিশু আরোগ্য লাভ করার কয়েক বছর পরে ঐ কোষস্থিত ভাইরাসগুলি কোন অজ্ঞাত কারণে সক্রিয় হয়ে এক বিশেষ ধরনের স্নায়বিক রোগ সৃষ্টি করতে পারে যার নাম সেক্লরোজিং সাবএকিউট প্যান এনকেফ্যালাইটিস্ (Sclerosing Subacute Pan-Encephalitis SSPE)। এতে স্নায়বিক বৈকল্য, পক্ষাঘাত, স্মরণশক্তির বিলোপ, হাত ও পায়ের কাঁপুনি (tremor) এবং শেষে মস্তিষ্কের প্রদাহ হয়ে রোগী মারা যায়। সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে একটি হচ্ছে হামরোগে আক্রান্ত শিশুদের সুস্থ শিশু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রেখে চিকিৎসা করা। তবে গায়ে হাম বের হবার আগেই রোগী, হাঁচি কাশির মাধ্যমে রোগ ছড়ায় বলে, রোগীকে আলাদা রাখলেও রোগ বিস্তার একেবারে বন্ধ হয় না। নিয়ম মতো ৯ থেকে ১২ মাস বয়সে প্রতিটি সুস্থ শিশুকে এই রোগের টিকা দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) শিশুদের ছয়টি রোগের বিরুদ্ধে টিকা চালু করেছে, হাম তার মধ্যে অন্যতম।

মাম্পস্ (Mumps) আর একটি শৈশবকালীন রোগ যা হামের মতোই লালা, হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। সংক্রামিত হবার ১৬ থেকে ২০ দিনের মধ্যে এই রোগের উপসর্গ দেখা যায়। দু-একদিন জ্বর বা জ্বরভাবের পরই ধীরে ধীরে লালাগ্রন্থিগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে ও গলা ফুলে যন্ত্রণা বোধ হয় যার ফলে মুখ খুলে কিছু খেতে খুবই কষ্ট বোধ হয়। এই অবস্থা কয়েকদিন থাকার পর ধীরে ধীরে রোগী আরোগ্য লাভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের ভাইরাস দেহের বিশেষ কয়েকটি অঙ্গকে আক্রান্ত করতে পারে তার মধ্যে অগ্ন্যাশয় (pancreas), থাইরয়েড গ্রন্থি ও পুরুষ অথবা স্ত্রী ডিম্বকগ্রন্থির প্রদাহ (Orchitis বা Oophoritis) ও কদাচিৎ মস্তিষ্কের প্রদাহ (Encephalitis) সৃষ্টি করে থাকে। এই রোগের সঠিক (specific) ওষুধ না থাকলেও রোগীকে আলাদা রেখে বিশ্রাম,

পুষ্টিকর ও তরলজাতীয় খাদ্য খাওয়ানো উচিত প্রতিষেধক ওষুধ মিশিয়ে কুলি করাও প্রয়োজন। এই রোগের প্রতিষেধক টিকা এখন পাওয়া যায়

এরপর আসে রুবেলা (Rubella) রোগের কথা। রোগটি এমনিতে অতি সাধারণ ধরনের। সামান্য জ্বর ও তার সঙ্গে সারা গায়ে ছোট ছোট গোলাকার লালচে বা গোলাপী রঙের গুটিকা দেখা যায়। এর সঙ্গে সামান্য সর্দিভাব ও ঘাড়ে দু-একটা লিম্ফ গ্রন্থির (lymph gland) সাময়িক স্ফীতি দেখা যেতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে রোগী সেরে ওঠে। তবে এই রোগে যা উদ্বেগের কারণ তা এই যে, যদি কোন নারী অন্তঃসত্বার প্রথম তিনমাসের মধ্যে রুবেলা রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে শতকরা কুড়ি ভাগ ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ (congenital defects) শিশুর জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। যে-সকল অঙ্গে বিকৃতি দেখা যায় সেগুলির মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্র, চোখ, কান ও মস্তিষ্ক (ছোট গঠন ও মানসিক বৈকল্য)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টিহীনতা, বধিরতা ও উপযুক্ত মানসিক বিকাশের অভাবে এই সকল শিশু সমাজের বোঝা হয়ে যায়। আশার কথা এখন রুবেলা ভাইরাসের টিকা এককভাবে বা এম. এম. আর. (MMR—Measles, Mumps, Rubella) টিকা রূপে পাওয়া যায়।

পানি বসন্ত বা জল বসন্ত (Chicken Pox) আর একটি রোগ যা শিশু ও অল্প বয়সের বালক-বালিকাদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়। এই রোগের ভাইরাসও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে একজন থেকে অপর জনে সংক্রামিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ শীতের শেষে ও বসন্তকালে এই রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। আক্রান্ত হবার ১২ থেকে ২০ দিনের মধ্যে এই রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায়। দু-একদিন জ্বরভাব ও গায়ে ব্যথা হবার পর জ্বর দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট নিটোল গোল মুক্তোর দানার মতো জলে ভরা গুটি (vesicle) প্রথমে দু-একটি বুকে, পিঠে বা পেটে দেখা যায়, তারপর অধিক সংখ্যায় ঐ ধরনের গুটি সারা দেহের চামড়ায় বেরোতে থাকে। দু-একদিনের মধ্যে দানাগুলি সাদামতো (pustule) দেখতে হয়। ধীরে ধীরে গুটিগুলো শুকিয়ে বাদামী রঙ ধারণ করে ও কয়েকদিনের মধ্যে একের পর এক শুকিয়ে গিয়ে মামড়ি (scab)-তে পরিণত হয়ে দেহ থেকে পড়তে থাকে। অসুখের বেশ কিছুদিন পর্যন্ত দেহে দাগ দেখা যায় ও পরে আস্তে আস্তে দাগগুলি মিলিয়ে যায়। জানা দরকার যে দেহে গুটি বার হবার আগেই হাঁচি কাশির মাধ্যমে এই রোগের ভাইরাস অপরজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইদানীং জাপানে জল বসন্তের টিকা চালু হয়েছে। আমেরিকাতেও চালু হবার মুখে। তবে টিকা নেবার পর কতদিন এই রোগ-প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেহে থাকে তা এখন পরীক্ষাধীন।

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে ভাইরাসজনিত কয়েকটি রোগের নাম যা দূষিত জল ও পানীয়ের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমেই আসে পোলিও (Poliomyelitis) রোগের কথা। এই রোগে যে পক্ষাঘাতজনিত বিকলাঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা আজ কারও অজানা নয়। তবে শরীরে ভাইরাস ঢুকলেই সকলের পক্ষাঘাত হয় না। শিশুরাই এই রোগের প্রধান শিকার। রোগের ভাইরাস পানীয় বা খাবারের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করার ৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণতঃ এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্বর, সর্দির ভাব, গলায় ব্যথা, বমিভাব ও মাথার যন্ত্রণা দিয়ে এই রোগ শুরু হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকদিন রোগ ভোগের পর শিশু সুস্থ হয়ে রোগ প্রতিরোধশক্তি অর্জন করে। সেইসব ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় হয় না, 'সর্দি জ্বর' বলে চলে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পোলিও ভাইরাস মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করে মেনিনজাইটিস সৃষ্টি করে থাকে। ভাইরাস আক্রান্তদের শতকরা মাত্র একজনের পক্ষাঘাত হয়। উপরে উল্লিখিত উপসর্গের সঙ্গে রোগী প্রধানতঃ দেহের নিম্নাঙ্গ চলাচল করার ক্ষমতা হারায়। বেশির ভাগ নিম্নাঙ্গের একদিক এবং কখনও দুদিকে পক্ষাঘাত দেখা যায়। কদাচিৎ হাতেও পক্ষাঘাত দেখা যেতে পারে। রোগী সুস্থ হলে আক্রান্ত অঙ্গটিকে সচল রাখতে পারে না বলে ধীরে ধীরে ঐ অঙ্গটি অপর অঙ্গ অপেক্ষা কৃশ হয়ে যায়।

আজকাল পোলিও হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন অস্ত্র-চিকিৎসা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

(physiotherapy) দ্বারা এই সকল শিশুদের যথাসম্ভব কর্মক্ষম করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ভয়াবহ রোগ হতে উদ্ধার পাওয়া যায় নিয়মিত টিকা প্রয়োগের দ্বারা। এই টিকা ইনজেকশন মাধ্যমে (Salk vaccine) বা মুখে (oral) প্রয়োগের মাধ্যমে (Sabin vaccine) দেওয়া হয় এবং উভয় টিকাই কার্যকরী। শিশুর ৩—৬ মাস বয়সে প্রতি মাসে একবার করে তিন মাত্রা ও পরে এক থেকে ২ বছর অন্তর আরও দুবার ঐ টিকার ওষুধ খাওয়ালে শিশুর দেহে পোলিও রোগ প্রতিরোধশক্তি ভালভাবে অর্জিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিমের অধিকাংশ উন্নত দেশগুলিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করে ও পরিকল্পিতভাবে সমস্ত শিশুকে টিকা প্রয়োগ করে এই পোলিও রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

দূষিত পানীয়ের মাধ্যমে আর একটি রোগ যা যকৃৎ-গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে তার নাম ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস (Infective Hepatitis) যা ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়। দূষিত পানীয় ও খাদ্যের মধ্য দিয়ে এই রোগের ভাইরাস দেহে প্রবেশ করার ১৫ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ উপসর্গ প্রকাশ পাবার কয়েকদিন আগে থেকেই ক্ষুধামান্দ্য, উপর-পেট ভার ও ব্যথাভাব, বমির প্রবণতা ও অহেতুক দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এরপর জ্বর ও তার সঙ্গে ন্যাবা বা Jaundice-এর চিহ্ন দেখা দেয়। চোখের সাদা অংশ (sclera) ও প্রস্রাবের রঙ হলুদ বর্ণের হয়, মলের স্বাভাবিক রঙ থাকে না, পরিবর্তে সাদাটে রঙ দেখায়। এইভাবে দশদিন থেকে তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে ধীরে ধীরে রোগের উপশম ঘটে। অসুস্থ অবস্থায় রোগীর মলের সঙ্গে প্রচুর ভাইরাস বের হয়, ও কোন কারণে পানীয় জল ঐ মল দ্বারা দূষিত হলে (যেমন পুষ্করিণী, খাল ইত্যাদি) এই রোগ ব্যাপক আকারে বা মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে। এই রোগের নির্দিষ্ট কোন ওষুধ বা টিকা নেই ; রোগীকে অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তি থেকে আলাদা রেখে চিকিৎসা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র গরম জলে বা ০'৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (0'5% Sodium hypochlorite Solution) জলে ধুয়ে নিয়ে বীজাণুমুক্ত করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি—বিশেষ করে শিশুরা যদি ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস রোগীর নিকট-সংস্পর্শে এসে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ সকল শিশুকে ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস ভাইরাসের ইমিউন সিরাম গ্লোবিউলিন (immune serum globulin) ইনজেকশন দিলে ঐ রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যদিও ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস রোগে মৃত্যুহার খুবই কম, তবু এই রোগে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তা পুনরুদ্ধার করা বেশ সময়সাপেক্ষ।

জলবাহিত ভাইরাসরোগগুলির মধ্যে একধরনের আন্ত্রিক রোগ যা শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে সময়ে সময়ে ব্যাপকভাবে, এমন কি কখন কখন মহামারীরূপে দেখা যায়। কক্স্যাকি (Coxsackie) ও ইকো (ECHO) ভাইরাস কখন কখন আন্ত্রিক রোগের কারণ হলেও প্রধানতঃ রোটা (Rota) নামে এক ধরনের ভাইরাস আন্ত্রিক রোগের প্রধান কারণ। ৬ থেকে ২৪ মাসের শিশুরাই প্রধানতঃ এই রোগের কবলে পড়ে। পূর্বগোলার্ধের বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি এবং তজ্জনিত মৃত্যুহার খুব বেশি। রোগের ভাইরাস দূষিত পানীয়ের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করার ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। এই শিশুরোগের প্রধান উপসর্গগুলি হচ্ছে বার বার বমি ও পাতলা পায়খানা, যা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। অতিরিক্ত জল ও লবণ দেহ থেকে নির্গত হওয়ার জন্য রক্তচাপ ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে রক্ত পরিবহন ব্যবস্থা ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। শুরু হতে উপযুক্ত পরিমাণে লবণ-জল শরীরকে না দিলে শিশু মৃত্যুর কবলে পড়ে। মনে রাখা দরকার যে, এই ধরনের আন্ত্রিক রোগে ওষুধের চেয়ে লবণ-চিনি মিশ্রিত পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি।

ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever) সব বয়সেই হয়। তবে ডেঙ্গু ভাইরাসজনিত এক ধরনের বিশেষ রোগ যা শিশুদের মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যায় তার নাম রক্ত-ক্ষরণ সহ ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Haemorrhagic Fever or DHF)। ইডিজ ইজিপ্টাই (Aedes

œgypti) নামে এক ধরনের মশা এই ডেঙ্গু জ্বরের বাহক। এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তি ঐ মশার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এই রোগের কবলে পড়ে। এই রোগ ভারত সমেত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে কয়েক দশক আগে থেকে দেখা গিয়েছে। ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ প্রকাশ হবার কয়েকদিনের মধ্যে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে যেমন নাক, মুখ, প্রস্রাব ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে রোগী সংকটজনক অবস্থায় পড়ে। শিশুরাই এই রোগের প্রধান শিকার। সময় মতো রক্ত সঞ্চালন (Blood transfusion) এবং অন্যান্য জীবনদায়ী ব্যবস্থা না নিলে বহু রোগী মৃত্যুমুখে পড়ে। উল্লেখযোগ্য এই রক্তক্ষরণজনিত ডেঙ্গু জ্বর ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই তিন বছর কলকাতায় দেখা গিয়েছিল যাতে শিশুরা আক্রান্ত হয়েছিল ব্যাপক হারে এবং তাদের মধ্যে মৃত্যুহারও ছিল সর্বাধিক। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল ও মেডিসিনের তৎকালীন গবেষণা সারা বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছিল।

পরিশেষে এমন কয়েকটি ভাইরাস রোগের উল্লেখ করা যায় যা বিভিন্ন সময়ে শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে। মাতৃজঠরে থাকার সময় থেকে, জন্মগ্রহণ করার মুহূর্তে এবং জন্মের ঠিক পরেই শিশু এই সমস্ত ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। মাতৃজঠরে থাকার সময়ে প্রধানতঃ রুবেলা ও সাইটো-মেগালো (Cytomagulo) রোগের ভাইরাস মায়ের দেহ থেকে শিশুর দেহে গিয়ে শিশুর বিশেষ কয়েকটি অঙ্গের পরিপূর্ণ বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে; ফলে ভবিষ্যতে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। মাতৃজঠরস্থিত শিশু সাইটোমেগালো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে জন্মের পর যে-সকল বৈকল্য দেখা যায় সেগুলি হল কম ওজন এবং তার সঙ্গে বৃহদাকার যকৃৎ ও প্লীহা উল্লেখযোগ্য। জন্ডিসের লক্ষণ প্রায়ই থাকে। দেহ অপেক্ষা মাথার গঠন ছোট (Microcephaly) ও ক্ষুদ্রকায় মস্তিষ্কের জন্য ভবিষ্যতে স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের অভাব দেখা যায়। চোখের ভিতরের পর্দা (রেটিনা) ও কানের অভ্যন্তরস্থিত অংশগুলির গঠনগত ত্রুটির জন্য দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিও ব্যাহত হয়। এই রোগের কোন ওষুধ এখনও জানা নেই তবে টিকা প্রস্তুতির গবেষণা চলছে। এই ভাইরাস মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমেও শিশু পেতে পারে। এ ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের মারফতও এই ভাইরাস নবজাত শিশুর দেহে প্রবেশ করে নিউমোনিয়া ও যকৃৎপ্রদাহ (হেপাটাইটিস্) সৃষ্টি করে শিশুর স্বাস্থ্য মারাত্মক ভাবে ব্যাহত করে থাকে। জন্মের সময়ে শিশুর মাতৃ যোনিদ্বার থেকে আর একটি ভাইরাস—হারপিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন রোগের শিকার হয়ে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যে হারপিস ভাইরাসের গুটি দেহের চামড়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ও তার সঙ্গে প্রবল জ্বর শিশুকে মারাত্মকভাবে অসুস্থ করে ফেলে এবং এর ফলে মৃত্যুহার শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। এই ভাইরাস মস্তিষ্কে গিয়ে এনকেফালাইটিস (Encephalitis) রোগও সৃষ্টি করতে পারে যার ফল সময়ে সময়ে মারাত্মক হয়ে থাকে। জন্মের পর আর একটি ভাইরাস যা মায়ের থেকে শিশুতে সংক্রামিত হয়ে থাকে তার নাম 'হেপাটাইটিস্ বি' (Hepatitis B)। এই রোগ মায়ের শরীরে থাকলে জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিশু আক্রান্ত হতে পারে। একবার আক্রান্ত হলে ঐ শিশু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আজীবন ঐ ভাইরাসের বাহক (lifelong carrier) হয়ে থাকে এবং পরবর্তী কালে যকৃতের সিরোসিস (Cirrhosis) রোগ অথবা ক্যানসারের কারণ হয়। 'হেপাটাইটিস্ বি' রোগের প্রতিষেধক টিকা এখন পাওয়া যায় ও মায়ের ঐ রোগ থাকলে জন্মের ঠিক পরেই শিশুকে 'হেপাটাই-টিস্ বি' টিকা দিলে ও মায়ের নিকট থেকে দূরে রাখলে ঐ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

শৈশব অবস্থায় যে-সকল ভাইরাস-রোগ দেখা যায় বর্তমান আলোচনায় তার মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হল যা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে। শিশুদের বহু ভাইরাসজনিত রোগ থেকে রক্ষা করা সম্ভব যদি নিয়মিত বিধিসম্মত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, সময়মতো অনুমোদিত টিকাগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা ও সাধ্যমতো পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো হয়।

ভারতীয় হকি—কেন এই দৈন্যদশা ?

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

সমস্ত ক্রীড়ায় ব্যর্থ হলেও ভারতের একসময় একমাত্র সান্ত্বনা ছিল হকি। ঐ একটি খেলাতে বিশ্বশ্রেষ্ঠত্ব ভারতের করায়ত্ত ছিল। ভারত গর্ব করতে পারত ঐ একটি খেলাকে নিয়ে। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসে সাফল্য ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের নিশ্চিত ছিল। কিন্তু ষাটের দশক থেকে ভারতের সে-সাফল্য, সে-বিশ্বশ্রেষ্ঠত্বও চলে গেল। প্রথমে কিছুদিন প্রতিবেশী পাকিস্তানের কাছে পরাজয়ের ফলে দ্বিতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো; কিন্তু তারপর সে দ্বিতীয় স্থানও চলে গেল। এখন ভারত হকিতে বিশ্বের প্রথম আটটি দেশের মধ্যেও স্থান পায় না। শুধুমাত্র ভারতেরই এ করুণ দশা নয়। যে পাকিস্তান ভারতের গৌরবময় দিনের অবসানের পর বেশ কিছুদিন বিশ্বসেরার আসন অধিকার করেছিল তারাও বর্তমানে বিশ্বপর্যায়ে অনেক নিচে নেমে গেছে। এককথায় বলতে গেলে 'হকিতে সাফল্য' এই শব্দটির সঙ্গে এখন ভারতীয় উপ-মহাদেশের কোন সম্পর্কই নেই।

কিন্তু কেন ভারতের এই ব্যর্থতা? সে-প্রশ্ন আজ সবার মনে। যে-ভারত একদা বিশ্বশ্রেষ্ঠ ছিল, যে-ভারত একসময়ে অলিম্পিক ফাইনালে বিপক্ষকে ২৪-১ গোলে চূর্ণ করত, সেই ভারতের আজকের এই দৈন্যদশা সকলকে বিস্মিত করবেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই ব্যর্থতা তাই আজকে আমাদের বিস্মিত করে, ব্যথিত করে। আমরা বোধ হয় ভুলেই গেছি ভারত শেষ কবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে।

ভারতের এই ব্যর্থতার পিছনে বিভিন্ন কারণ-গুলি প্রধানতঃ দুভাবে কাজ করছে। একদিকে যেমন আছে ভারতীয়দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ, তেমনি আছে বিদেশীদের উন্নতি এবং খেলার পদ্ধতি ও কৌশলের বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রশ্নও।

ভারতে প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতিতে হকি খেলা প্রচলিত। একটি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশীয় রীতি ও অপরটি হচ্ছে পাঞ্জাবী রীতি। উত্তরপ্রদেশীয় রীতির বৈশিষ্ট্য হল, স্টিকের সাহায্যে বল নিয়ন্ত্রণ, খেলো-য়াড়দের দ্রুত স্থান পরিবর্তন। লম্বা দ্রুত পাসের ব্যবহার এবং উইং-এর খেলোয়াড়ের সাহায্যে খেলাকে ছড়িয়ে দেওয়া। অপরদিকে পাঞ্জাবী রীতি হচ্ছে সেণ্টার ফরোয়ার্ড ও ইনসাইডের খেলোয়াড়দের মধ্যে ছোট ছোট পাসের দ্বারা ত্রিভুজাকৃতি আক্রমণ রচনা ও সাধারণভাবে খেলাকে সীমাবদ্ধ করে তোলা। এই রীতিতে কিক্ অ্যাণ্ড রান ব্যাপারটার উপরেও জোর দেওয়া হয়।

ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগে ভারতীয় হকি খেলো-য়াড়েরা উত্তরপ্রদেশীয় রীতিতে খেলেই সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু যখন থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা পাঞ্জাবী রীতিতে খেলতে শুরু করেছে, তখন থেকেই আমাদের সাফল্য হয়েছে যেন সুদূরপরাহত। পাঞ্জাবী রীতিতে খেলার বহু আধুনিকীকরণ ঘটেছে, কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয়নি। এই রীতিতে খেলার প্রধান অসুবিধে এই যে, এই রীতিতে খেলতে গেলে সবচেয়ে বেশি দরকার শারীরিক সক্ষমতা যার অভাব ভারতীয় খেলোয়াড়দের রয়েছে। তাই ইউরোপের খেলোয়াড়রা তাদের স্বাস্থ্যের জোরে আমাদের ভিতরে সীমাবদ্ধ ত্রিভুজাকৃতি আক্রমণ-গুলিকে অনায়াসে প্রতিহত করছে ও দ্রুত প্রতি-আক্রমণে আমাদের রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। আবার শারীরিক তৎপরতায় আমাদের চেয়ে যারা অনেক বেশি শক্তিশালী, তাদের কখনও আমরা শারীরিক সক্ষমতা দিয়েও পর্যুদস্ত করতে পারব না। আমাদের পুরনো কৌশল, সূক্ষ্ম চাতুর্য দিয়ে আমাদের তাদের পরাস্ত করতে হবে। এ-কথাটা ভারতের ক্রীড়াপণ্ডিতরা উপলব্ধি করতে চাইছেন

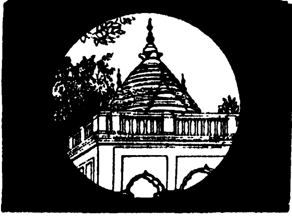
না। তাই বারবার চর্বিত-চর্বণ চালিয়ে যাচ্ছেন। যে-পদ্ধতিতে গত দু-দশকে বিদেশীরা প্রভূত উন্নতি করে ফেলেছে, সে-পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে যে আমাদের চলবে না, এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তার থেকেও উন্নততর পদ্ধতির কথা আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে।

এছাড়াও আমাদের খেলোয়াড়দের শারীরিক সামর্থ্যেরও অবনতি ঘটেছে। যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খেলোয়াড়রা এককালে ভারতীয় হকির সম্পদস্বরূপ ছিল, যারা এককালে শারীরিক শক্তিতে ও ক্রীড়া-নৈপুণ্যে ভারতীয় হকির উজ্জ্বল-তারকারূপে পরি-গণিত হয়েছিল তাদের বিদায়ও এ ব্যাপারে উল্লেখ-যোগ্য। অর্থনৈতিক কারণে এদের পিছু হটে যাওয়া অথবা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারটিও উল্লেখ-যোগ্য। এই সমস্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খেলোয়াড়েরাও বিদেশে গিয়ে বিদেশের অনেক দলকে পুষ্ট করেছে। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে সাম্প্রতিককালে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্য ও তাদের প্রাক্তন অধিনায়ক রিক চার্লস-ওয়ার্থের (যিনি এককালে ভারতনিবাসী ছিলেন) কথা স্মরণীয়।

বিদেশী খেলোয়াড়দেরও গত কয়েক দশকে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। দ্রুত পাস দেওয়া-নেওয়া করে দ্রুত গতিতে আক্রমণ করা, 'কিক অ্যান্ড রান' প্রথায় খেলা, শারীরিক শক্তির চূড়ান্ত ব্যবহার, এসব দ্বারা তারা নিজেদের হকির মানকে অনেক উঁচুতে তুলে নিয়ে গেছে। ফলে তাদের উন্নতির তুলনায় ভারতীয়দের অগ্রগতি অনেক কম বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক বহুবিধ উপকরণের সহায়তায় বিদেশের গোলকীপারদের গোলরক্ষায় দক্ষতা অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে ভারতীয় হকির স্বর্ণযুগে ধ্যানচাঁদ প্রমুখ গোল-কীপারদের বোকা বানাতেন হাতের কৌশলে। যেমন ফ্লিক্ করে। গোলকীপারের নাগালের বাইরে চকিতে স্টিকের খোঁচা দিয়ে। কিন্তু এখন ভারতীয়রা সে-রীতি থেকে সরে এসে সজোরে হিট করে গোল করতে চাইছে। তাতে গোলকীপারদের সুবিধা আরো বাড়ছে এবং ভারতীয়দের গোল-দক্ষতা কমছে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরে পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল করতে ভারতীয়দের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা ভারতীয়দের সাফল্যের পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে হকির বহু আধুনিকীকরণ ঘটেছে। আইনকানুনেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কৃত্রিম মাঠের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘ অনুশীলন, নিষ্ঠা, নিজেদের দক্ষতার পূর্ণব্যবহার ভারতীয় হকিকে আবার হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে পারে। বর্তমান খেলোয়াড়রাও ধ্যানচাঁদ, কার্ল ট্যাপসেন, জে. গেলাবডি, রূপ সিং, কিষণলাল, বলবীর সিং, কে. বি. সিং, লেসলি ক্লডিয়াস প্রমুখের মতো সাফল্য পেতে পারে।

এবার '৮৮-র সিওল অলিম্পিকে ভারতের সামনে সুবর্ণ সুযোগ হকিতে নিজেদের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের। এবারে ভারতকে সোমাইয়ার নেতৃত্বে তাই লড়াই করতে হবে স্বর্ণপদকের জন্য। যদিও ভারতের সামনে বড় বাধা, পশ্চিম জার্মানি বা অস্ট্রেলিয়া। এমনকি সেদিনকার 'দুর্বল' ব্রিটেনও বর্তমানে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারতের সামনে বাধা উপস্থিত করতে পারে। ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, স্পেন বা রাশিয়া, এইসব মধ্যমমানের দেশগুলির কথা বাদ দিলেও, আয়োজক দেশ দক্ষিণ কোরিয়াও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ-করে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, দক্ষিণ কোরিয়া বিগত এশিয়াডে রৌপ্যপদক লাভ করেছিল। ছোটখাট দেশগুলির মধ্যে মালয়েশিয়া বিপজ্জনক না হলেও প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। একঝাঁক প্রতিশ্রুতিময় তরুণ খেলোয়াড়-সমন্বিত পাকিস্তান সবসময়ই 'ডার্ক হর্স'। তবুও ভারতের শক্তিও কম নয়। শাহিদ দলে ফিরে আসায় ভারতের শক্তি আরও বেড়েছে। তাই আমাদের আশা, সিওল অলিম্পিকে ভারত সফল হবে।



গ্রন্থ পরিচয়

স্বামী বিবেকানন্দ ও মার্কসবাদ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

বিবেকানন্দ কী মার্কসবাদী ও আজকের দুনিয়া : হিমাংশু রায়। চলন্তিকা প্রকাশক, ৪ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। পঁচিশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটির শিরোনামের মধ্যেই উচ্চারিত হয়েছে সমকালের বহু-চর্চিত একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং সেইসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে তার পটভূমিকাটিও। সেটা হচ্ছে : "আজকের দুনিয়া"। পৃথিবী যখন একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত এবং আগামী শতাব্দীর সম্ভাবনাময় ক্রান্তিলগ্নে যখন বিশ্ব-মননে দেখা দিয়েছে এতাবৎকালের চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তনের ঢেউ, এমনকি কমিউনিস্ট দুনিয়াতেও মার্কসীয় চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ সম্পর্কে দেখা দিয়েছে গভীর ও সক্রিয় আগ্রহ, তখন এমন একটা প্রশ্ন অনেককেই বিব্রত করে তুলেছে : "বিবেকানন্দ কী মার্কসবাদী ছিলেন" ? লেখক হিমাংশু রায় বিষয়টিকে অনুশীলন করেছেন, পর্যালোচনা করেছেন এবং তারই নিরিখে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে এসেছেন : "না। স্বামীজী কমিউনিজমে বিশ্বাসী নন। মার্কসের কোন লেখা সম্বন্ধে তাঁর কোন প্রকার আগ্রহ ছিল, এরকম কোন তথ্যও নেই। অতএব তাঁর কমিউনিজমে বিশ্বাসী হবার কোন প্রশ্নই আসে না" (পৃঃ ৬৪)।

এমন একটি সিদ্ধান্তে আসার পর স্বভাবতই বইটির শিরোনাম নিয়েই সংশয় দেখা দেয় : তাহলে "বিবেকানন্দ কী মার্কসবাদী ছিলেন" এই প্রশ্নটি কি নিছকই অবান্তর নয় ? বিবেকানন্দ বিবেকানন্দই ছিলেন এবং ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববাহী। এক্ষেত্রে মার্কসবাদী হওয়ার প্রশ্নটি আসে কীভাবে ? তবে স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনে সমাজতন্ত্রী ভাবধারার আংশিক সমর্থক ছিলেন, সেটিও ঐতিহাসিক সত্য। আর সেই সমাজতন্ত্র মার্কসের আগেও ছিল, পরেও আছে এবং একজনকে সমাজতন্ত্রী হতে হলেই মার্কসবাদী হতে হবে কেন ? স্বামীজী যদি 'মার্কসবাদী'ই হতেন, তাহলে আর তার মৌলিকতা থাকত কোথায় ? সেটাতো বিস্তর 'মার্কসবাদীদেরই' তালিকা বাড়াত মাত্র।

আসলে বৈদান্তিক বিবেকানন্দ মার্কসবাদের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন এবং তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রবক্তাও নন। তিনি মানুষের মুক্তি বলতে শুধুমাত্র ক্ষুধা থেকে মুক্তির কথা বলেননি, বলেছেন আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা, যাবতীয় শোষণ থেকে মুক্তির কথা। সেজন্যই তিনি অনন্য এবং দেশকালের বহু উর্ধ্বে।

সুখের কথা, আলোচ্য গ্রন্থটির লেখক যুক্তি ও তথ্যের নিরিখে সেই সত্যে উপনীত হয়েছেন। মোট ১৭৫ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত বইটি মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) মার্কসবাদ, (২) স্বামী বিবেকানন্দ কী মার্কসবাদী এবং (৩) আজকের দুনিয়া। এছাড়া যুক্ত হয়েছে নির্ঘণ্ট। মার্কসবাদ অধ্যায়ে তিনি কার্ল মার্কসের পরিচিতি থেকে শুরু করে মার্কসের তাত্ত্বিক রণকৌশল, হেগেলের খোঁজে মার্কস, মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, নতুন পৃথিবী—কমিউনিজম, প্রশ্নোত্তরে কমিউনিজম, ইত্যাদি প্রসঙ্গ সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ফলে যে-কোন আগ্রহী পাঠকই মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অতি সহজেই এখানে পাবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঠিক একইভাবে লেখক পাঠকদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। স্বামীজীর কর্মজীবন এবং ভাবাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পরই লেখক প্রশ্ন তুলেছেন : মার্কসবাদী কে ? প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি 'খাঁটি মার্কসবাদী'র পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথাও বলেছেন। তারপরই সেই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের

পটভূমিকা তিনি পরপর তুলে দেখিয়েছেন, স্বামীজী এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই মার্কসবাদী নন।

অবশ্য স্বামীজীকে অনেকেই সমাজতন্ত্রী বলে উল্লেখ করলেও 'মার্কসবাদী' বলে কেউ সম্ভবতঃ উল্লেখ করেননি। কাজেই এই প্রশ্নটির মীমাংসা করার খুব একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল কি? জড়বাদী, নির্দিষ্টবাদী, শ্রেণী সংগ্রামী, জাতিহীন যা কমিউনিজমে বিশ্বাসী—ইত্যাদি কোন বৈশিষ্ট্যই কি কেউ স্বামীজীর উপর আরোপ করেছেন? ইতিপূর্বে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ প্রমুখ লেখক যেমন এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তেমনি গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন থেকে "চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ" নামে একটি বড় বইও প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কার্ল মার্কসের তুলনা করেছেন একাধিক লেখক। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে মার্কসের অনুগামী বলে কি কেউ কল্পনাও করতে পেরেছেন? স্বামী বিবেকানন্দ মার্কসের বই পড়েছেন, তেমন তথ্যও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই, বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি নিয়েই থেকে যায় সংশয়।

তবে এই বইটির তৃতীয় অধ্যায় (আজকের দুনিয়া) নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ সংযোজন। লেখক অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে এই অধ্যায়ে সোভিয়েত পরিক্রমা, লেনিন, স্তালিন, চীন পরিক্রমা, মাও, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন, ইউরো-কমিউনিজম ইত্যাদি প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। সেইসঙ্গে আধুনিক পৃথিবীতে কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের চেহারা ও চরিত্রটিকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমেই সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে সিদ্ধান্তে এসেছেন: "মার্কসবাদ বলে কমিউনিস্টরা যা প্রচার করে চলেছে, তার সঙ্গে মার্কসের ভাবাদর্শের সত্যিকারের সম্পর্ক কতটা, তা গভীর বিতর্কের বিষয়।···পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদ উভয়েই জড়বাদী, অর্থাৎ জড়ের উপাসক। ··· পুঁজিবাদের চেতনা, ব্যক্তিগত মুনাফা, পরিবেশ, জড়, গতিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা; মার্কসবাদের চেতনা সামাজিক মুনাফা, পরিবেশ, জড়, গতিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা।··· উভয়ের চলন ও লক্ষ্যের স্খলন ও রূপান্তর আজ বাস্তব সত্য।"

স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" লেখক হিমাংশু রায়ও স্বামীজীর সেই অভ্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন: "চীন বিপ্লব সমাপ্ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে যতই এশীয় বলে পরিচয় দিয়ে এশিয়ায় অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করুক না কেন, রুশ বিপ্লবের পরে তার আর নতুন করে দুনিয়াকে দেওয়ার কিছু নেই। সুতরাং এশিয়া মানে ভারতভূমি। পবিত্র ভারতভূমিই পরবর্তী বিশ্ববিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু।"

লেখক শুধু যে-কথাটা বলেননি তা হল এই যে, সেই বিশ্ববিপ্লবের মূল হাতিয়ার হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা। আগামী পৃথিবী তারই জন্য অপেক্ষমান।

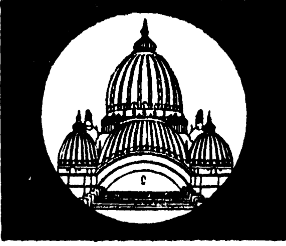
সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় নূতন সংযোজন

অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি: সঞ্জীব বন্ধু। বিজয়তোরণ প্রকাশনী, ৬৩, আর. বি. ঘোষ রোড, বর্ধমান। পনের টাকা।

আলোচ্য উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতিবৃত্ত। বিভিন্ন প্রমাণাদি দাখিল করে লেখক দেখিয়েছেন যে, যাদের 'আগ্রহারিক' বা 'আগ্রহরী' বা 'আগরী' বা 'আগুরী' বলা হয় (প্রধানতঃ বর্ধমান জেলানিবাসী), তারাই উগ্রক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দেরই একটি অংশ। পরিশিষ্ট বাদে মোট ষোলটি অধ্যায় গ্রন্থটিতে আছে। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বৈদিক ও পৌরাণিক প্রমাণাদি আলোচিত হয়েছে। পরের কয়েকটি অধ্যায়ে ঐতিহাসিক তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে। শেষের তিনটি অধ্যায়ে রয়েছে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ, সমিতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা।

বাংলার উগ্রক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা এই পুস্তক পাঠে আত্মশ্লাঘা অনুভব করবেন। লেখকের গবেষক মনোভাবের পরিচয় গ্রন্থটিতে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর লিখনভঙ্গিটিও সাবলীল। বঙ্গীয় সমাজতত্ত্বের গ্রন্থপঞ্জীতে এই পুস্তক একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে চিহ্নিত হবে।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী : স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন গত ১৭ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত বারবাটী স্টেডিয়ামে এক জাতীয় সংহতি শিবির সংগঠিত করে। ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের পরিচালনায় এটি ছিল চতুর্থ শিবির। উড়িষ্যার বিভিন্ন অংশ থেকে মোট ২০০ জন যুব প্রতিনিধি এ-শিবিরে যোগদান করেছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক, মন্ত্রী ও সরকারী পদস্থ কর্মীরা এতে যোগদান করেন।

বহির্ভারত

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি গত জানুয়ারি মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বিভিন্ন বক্তৃতার আয়োজন করেছিল। 'স্বামী বিবেকানন্দ ৪ঠা জুলাই উৎসব'-এর ২৭ তম বার্ষিকী বিশেষ যন্ত্রসঙ্গীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী বেদান্ত সোসাইটিতে 'বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন।

বস্টন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি গত ১০ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঐ অনুষ্ঠানে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং পাশ্চাত্য' বিষয়ে ভাষণ দান করেন।

ত্রাণ

রাজস্থান খরাত্রাণ : গত জুন মাসে বিকানীর তহশিলের শিববাড়ি পশুশিবিরে ২১০টি গরুর জন্য ২৪,০০০ কিলোঃ শুকনো খাদ্য, ৩৮৪০ কিলোঃ খৈইল, ২,৪০৪ কিলোঃ অন্যান্য পশুখাদ্য ৬৮০ কিলোঃ গমের ভূষি সরবরাহ করা হয়েছে।

উড়িষ্যা খরাত্রাণ : খাদ্য বিতরণ শিবির বন্ধ করার পর গঞ্জাম জেলার ২০টি গ্রামের ২৫৬৭ জন খরাপীড়িত মানুষকে ৫০০টি পুরনো বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গত ৪ জুলাই থেকে ঐ ত্রাণশিবির বন্ধ করা হয়েছে।

গুজরাট বন্যাত্রাণ : হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে রাজকোট শহরের বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে স্থানান্তরিত বস্তিবাসীদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১০ ও ২৭ আগস্ট যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এবং শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী, এবং গত ৩ সেপ্টেম্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাআনন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।



ব্যবর সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানধন্য শ্যামপুকুর বাটীর যৌথভাবে ক্রয়কার্য সম্পাদন

শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানধন্য শ্যামপুকুর বাটী (৫৫এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৪) সম্প্রতি শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ, কলিকাতা এবং রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া যৌথভাবে ক্রয়কার্য সম্পাদন করেছে। আগামী কয়েক বছরের জন্য 'শ্যামপুকুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ' এই পুণ্য-তীর্থ 'শ্যামপুকুর বাটী'র সংরক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে বলে যৌথভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: গত ৮ ফেব্রুয়ারি '৮৮ এই আশ্রমের একাদশ বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। দুপুরে প্রায় দুহাজার লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। এ-উপলক্ষে অপরাহ্নে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছেন স্বামী বিকাশানন্দ।

গত ২৬ জুন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 'সাধনচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠানে 'সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ।

চিকিৎসা শিবির

রামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগণা) গত ৪ সেপ্টেম্বর ছয়জন বিশিষ্ট চিকিৎসকের সহায়তায় এক চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করেছিল। শল্য, মেডিসিন, কর্ণ-নাসিকা-গলা (E. N. T.), চক্ষু, স্ত্রীরোগ ও চর্মরোগ, এই কয়টি ক্ষেত্রে সন্নিহিত ও দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের ৩৫০ জন রোগী বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞের মতামত ও ব্যবস্থাপত্র সহ চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে সেবার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। স্বামী প্রমেয়ানন্দ ও স্বামী শশাঙ্কানন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই আশ্রমে প্রতি সোম, বৃহস্পতি ও শনিবার হোমিওপ্যাথি ঔষধ এবং রবিবার এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের মাধ্যমে গড়ে ২০ জন রোগীকে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়।

পরলোকে

বিজয়গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক **গৌরাঙ্গচন্দ্র বণিক চৌধুরী** গত ২০ জুলাই (১৯৮৮) ভোর ৫-১০ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছেষট্টি বছর। পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে ছিল তাঁর আদিনিবাস। চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্সের তিনি দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি রামকৃষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেলুড় মঠের দীক্ষিত ভক্ত গৌরাঙ্গবাবু চাঁদপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং গৌরাঙ্গ মন্দিরের দীর্ঘকাল সম্পাদক ছিলেন। পূর্ববঙ্গের স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষজয়ন্তী কমিটির তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসেও তিনি মঠ ও মিশনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। অহংকারশূন্যতা, সরলতা, এবং রামকৃষ্ণপ্রাণতা ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজী সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং স্কটিশচার্চ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ **সুশীলকুমার**

মুখোপাধ্যায় গত ৭ জুলাই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর বছর। ১৯৩৭—১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। তাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা করেছেন। নাট্যকার, অভিনেতা এবং নাট্য-পরিচালক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাঙলায় ১৬টি নাটক এবং ইংরেজী ও বাঙলায় অনেক নাটিকাও রচনা করেছেন তিনি। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা থিয়েটারের কাহিনী: ১৭৫৩—১৯৫৩' বিষয়ে ইংরেজী গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। গত বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'বিশিষ্ট শিক্ষক' পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। উদ্বোধন পত্রিকাতেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। উদ্বোধন কার্যালয় আয়োজিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণও তিনি দিয়েছেন একাধিকবার। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন কর্তৃক আয়োজিত যুব সম্মেলনের যাবতীয় ইংরেজী প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতাও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

কথামৃতের ইংরেজীসংস্করণ 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর বর্ণানুক্রমিক সূচীগ্রন্থ

অনেকে জানেন যে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে স্বামী নিখিলানন্দ 'গসপেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম দিয়ে কথামৃতের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন যা অগণিত বিদেশী ও অবাঙালী ভারতীয়দের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী নির্ভেজালভাবে পৌঁছে দিয়ে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা যতই প্রসারলাভ করছে 'গসপেলের' পাঠকসংখ্যাও ততই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এই বইটির কোন বর্ণানুক্রমিক সূচী না থাকায় পাঠকবর্গের যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছিল। সম্প্রতি সই অভাব পূরণ হয়েছে ক্যাথারিন হুইটমার্স-এর সম্পাদনায় হলিউডস্থ বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া দ্বারা 'কনকর্ডেন্স' (Concordance) বা বর্ণানুক্রমিক সূচীগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা।

ভূমিকায় ক্যাথারিন হুইটমার্স জানিয়েছেন যে, এই সূচীগ্রন্থ প্রণয়নে তিনি কোন প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেননি। তাঁর বরাবরের অভ্যাস যে, তিনি যে-কোন পুস্তক গভীরভাবে পড়েন, সুবিধার জন্য তিনি তার সূচী তৈরি করেন, এবং সূচীকরণের ধারারও উন্নতি করতে থাকেন। এইভাবে সূচী তৈরির একটি নিজস্ব ধারা তার গঠিত হয়েছে, যা তিনি কাজে লাগিয়েছেন এই কনকর্ডেন্স তৈরি করার কাজে। গসপেল পড়ার সময় তিনি সূচী তৈরি শুরু করেন নিজের সুবিধার জন্য, নানা ঘটনার যোগসূত্রকে নিজের মনে গ্রথিত রাখতে। কিন্তু টীকা-টিপ্পনীসহ সূচীপত্র পরে যখন বিশাল আকার ধারণ করল, তখন সকলের সুবিধার জন্য এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশনের কথা চিন্তা করলেন, এবং অন্যের সাহায্য ও পরামর্শ নিতে আরম্ভ করলেন। প্রায় অযাচিতভাবে অনেককে পেয়েও গেলেন এই কাজে। ২৭ সেঃ মিঃ × ২০ সেঃ মিঃ আয়তনের ৬৩৯ পৃষ্ঠাব্যাপী কনকর্ডেন্স-এ বিষয়গুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত কথাগুলির সূচীপত্র হওয়া ছাড়া এটি গসপেলের উপর গবেষণাকারীদের কাজেও বহুলভাবে সাহায্য করবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভূমিকার শেষে শ্রীমতী হুইটমার্স লিখেছেন যে তাঁদের এই দীর্ঘকাল ব্যাপী কাজে "আমাদের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার উপস্থিতি অমূল্য সম্পদ হয়েছিল"। যদিও কথামৃতের উপর ছোট গ্রন্থাকারে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী আছে (শ্রীকুমারকৃষ্ণ নন্দী সংকলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা কল্পতরু।) এবং উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত কথামৃতের শেষে প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দ-পরিচয়, বর্ণানুক্রমিক সূচী ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও কনকর্ডেন্স ধরনের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচীগ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কলকাতার গোলপার্কস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার কর্তৃপক্ষ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনার' উপর একখানি কনকর্ডেন্স তৈরির প্রকল্প নিয়েছেন।



বিজ্ঞান সংবাদ

অথ তিমিমাংস কথা

জাপানী বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়েছে ১৭ জানুয়ারি (১৯৮৮) 'ডাই সান নিশিন মারু' নামক একটি গবেষণা সংক্রান্ত জাহাজ অ্যান্টার্কটিক সমুদ্রে এসেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল, দুটি তিমিশিকারের জাহাজের সাহায্যে দুমাসে তারা ৩০০ মিংকে (minke) তিমি ধরে মারবে। এই অভিযানের খরচ মেটাবার জন্য তারা তিমিমাংস বিক্রি করবে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, 'ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং কমিশন' (আই. ডবলু. সি) যে তিমিশিকার বন্ধের আদেশ জারি করেছে, এটি তাকে বানচাল করার এবং টোকিওর 'কুজিরায়া' (তিমিমাংসের রেস্তোরা) গুলিতে মাল যোগানোর এটি একটি কৌশল। এক প্লেট কাঁচা ভাল তিমিমাংসের দাম প্রায় ২৩ ডলার।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন উপরোক্ত তিমিশিকার বন্ধের আদেশ জারি হয়, জাপান, রাশিয়া ও নরওয়ে তাদের অমত জানিয়ে দিয়েছিল। জাপান এখন আমেরিকার চাপে নত হয়েছে। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীরা বাণিজ্য হিসাবে শেষ তিমিশিকার করেছে। যদি তারা তিমিশিকার চালিয়ে যেত, তাহলে তারা বছরে যে ১০ লক্ষ টন মাছ আমেরিকার সীমান্তবর্তী উপকূলে ধরে তা বন্ধ করে দেওয়া হত। জাপানের অভিমত, বিজ্ঞানের কাজে তিমিশিকার আই. ডবলু. সি-র নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তারা আরও বলে, যেখানে অ্যান্টার্কটিকায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ তিমি আছে, সেখানে ৩০০ মিংকে তিমি ধরলে তিমির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে না। কিন্তু তিমির প্রকৃত সংখ্যা যে কত তা কেউ জানে না। অনুমান করা হয় যে তিমির সংখ্যা-বৃদ্ধির হার বৎসরে এক হতে চার শতাংশ। গত ডিসেম্বরে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজে যে আই. ডবলু. সির বিজ্ঞান-কমিটির মিটিং হয়েছিল, তাতে তারা জাপানীদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেছিল যে ৩০০ মিংকে তিমি ধরলে তিমি প্রজাতির বিলুপ্তি হবে না। কিন্তু তিমিভক্ত ব্রিটিশ, তা সত্ত্বেও আই. ডবলু. সির উপরোক্ত কমিটির ৪১ জন বিশেষজ্ঞকে জাপানীদের দোষারোপ করার জন্য পোস্টাল ব্যালটে অনুরোধ জানিয়েছে।

জাপানীরা যদিও সত্যি সত্যিই গবেষণা করছে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে আই. ডবলু. সি-র তিমিনাশ বন্ধের আইনের কার্যকাল শেষ হবে, তখন সেই আইনকে উল্টে দেওয়া। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান নীল তিমি ধরা বন্ধ করেছিল ; এর পরে ফিন (fin) তিমি ও সাই (sei) তিমি ধরাও ছেড়ে দিয়েছিল ; কিন্তু তাদের দাবি—যে সব তিমি বহুল সংখ্যায় আছে তাদের ধরা বন্ধ করার কোন কারণ নেই। জাপানের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য বিভাগ মনে করে যে আই. ডবলু. সি-র কর্মধারা নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জাপানের তিমি সমিতির একজন প্রবক্তা বলেছেন যে অ্যাঙ্গলো-সাক্সন জাতির এই ধরনের মনোভাবের কারণ হচ্ছে তাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা যে তিমি প্রায় মানবজাতির সমগোত্রীয়।

কি হারে তিমি মারলে তিমি প্রজাতির পক্ষে নিরাপদ হবে গবেষণাকারীরা নির্ণয় করবে কিভাবে ? সেক্ষেত্রে তাদের জানতে হবে বর্তমান তিমিগোষ্ঠীর বয়স অনুযায়ী সংখ্যা নির্ণয়, তাদের আয়ুষ্কাল, স্ত্রী-তিমির কত বয়সে এবং কি হারে বাচ্চা হয়, তা

জানা। তিমির বয়স নির্ণয় সোজা কথা নয়। তিমিরা এত দূরে দূরে যায় এবং জলের নিচে এতক্ষণ থাকে যে তাদের কে কখন জন্মেছে, তা ঠিক করা মুশকিল। জাপানীরা মনে করে যে তিমির বয়স নির্ণয় হতে পারে কেবলমাত্র তাদের কানের ভিতরটা কেটে পরীক্ষা করে। সেখানে এক রকম মোমের মতো জিনিস থাকে যা গাছের বল্কলের মতো স্তরে স্তরে থাকে। বৎসরে দুটি করে স্তর জমে। সেজন্য স্তর গণনা করে তাদের বয়স বলে দেওয়া যায়। তিমির সংখ্যা সম্বন্ধে যা-কিছু জানা যায় তা তিমি শিকারীদের কাছ থেকেই। এটাকে বৈজ্ঞানিক প্রথা বলা চলে না, কারণ তাদের তথ্য এলোমেলোভাবে (at random) গৃহীত নয়। তাদের বাচ্চা তিমি ধরতে দেওয়া হয় না। তাদের ধরা তিমিরা খুব বড় এবং মেদবহুল। জাপানীদের সংগ্রহকে অনেকটা র‍্যানডম বলা যেতে পারে ; ওদের চারজন বৈজ্ঞানিক ২৪০ হাজার বর্গমাইল জায়গাতে তিমি সংগ্রহ করছে। কিভাবে তিমি ধরলে তিমি প্রজাতির বিশেষ ক্ষতি হবে না, সেই তথ্য তারা আই. ডবলু. সি-র পরবর্তী মিটিং-এ পেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

তিমি সংরক্ষণের সমর্থক আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এত বেশি যে জাপানীরা তাদের মতের স্বপক্ষে যদি অকাট্য যুক্তি দেয় তাহলেও আই. ডবলু. সি তার মত বদলাবে বলে মনে হয় না। আমেরিকা তার আদি তিমিশিকারী অর্থাৎ এস্কিমোদের স্বার্থ রক্ষা করতে খুবই আগ্রহী। জাপানীরা আমেরিকার এই মনোভাবকে অত্যন্ত বেআইনী বলে মনে করে। জাপানীরা মনে করে যে, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা তিমি মাংস যে কত সুস্বাদু, তা জানে না বলেই এই সব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

(The Economist 6-12, Feb., 1988 pp. 83-84)

এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে নেওয়া পোষ্যসন্তানদের স্বাস্থ্য-সমস্যা

ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকার লোকেরা প্রতি বৎসর এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আট হাজারের বেশি শিশুকে পোষ্যসন্তান হিসাবে গ্রহণ করে। ইউনাইটেড স্টেট্স-এর যেসব ডাক্তার এইসব শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন, তাঁদের অধিকাংশেরই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অসুখবিসুখ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই। এইসব শিশুদের সাধারণ স্বাস্থ্য-সমস্যাগুলি সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের ৩৭ শতাংশ প্রতিরোধক টিকা পূর্ণভাবে নেয় নি, পেটে ক্রিমি আছে ২৯ শতাংশের, মানসিক আবেগের সমস্যা আছে ২২ শতাংশের, ১৬ শতাংশের আছে চর্মরোগ, ভুল বয়স দেখানো আছে ১২ শতাংশের, চুলকানি বা উকুন আছে ১০ শতাংশের, এবং জন্মগত অঙ্গহানি আছে ১০ শতাংশের। স্টেট্স-এ আসার এক মাসের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিশুর কানপাকা, রুবিওলা বা জার্মান বসন্ত, পান বসন্ত কিংবা হাম দেখা দেয়। ১৯ শতাংশের উপর শিশুদের অস্ত্রোপচার করতে হয়, এবং ৫ শতাংশকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

[American Journal of Diseases of Children (1987), 148, 298]

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানে ভারতের কৃতিত্ব

ভারতের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ধরনের রেডার উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই রেডারের বৈশিষ্ট্য হল কোন বিমান খুব নিচু দিয়ে উড়ে গেলেও এই রেডারে তার অস্তিত্ব ধরা পড়বে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ইন্দ্র-২'। এই রেডার এখন তৈরি হচ্ছে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেসন) পরীক্ষাগারে।

সূচীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ কার্তিক ১৩৯৫

দিব্য বাণী : ☐ ৬৮৯

কথাপ্রসঙ্গে : ☐ শুভ বিজয়া ☐ ৬৯০ ☐ মায়ের পূজা—অতঃ কিম্ ? ☐ ৬৯০

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনা ☐ স্বামী কেদারানন্দ ☐ ৬৯৩

কবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ ☐ অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ☐ ৬৯৬

সন্ন্যাসী-সাংবাদিক ☐ শিশির কর ☐ ৭০০

রিলিজিয়ন, ধর্ম ও বিপ্লব ☐ তরুণ সান্যাল ☐ ৭০৪

কৃষ্ণচিন্তায় নব-জাগরণ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য ☐ দিলীপকুমার দত্ত ☐ ৭১০

শশিভূষণ সান্যাল ☐ স্বামী বিমলাত্মানন্দ ☐ ৭২৮

ভ্রমণ-কাহিনী

নীলকণ্ঠেশ্বরের পথে ☐ স্বামী সহদেবানন্দ ☐ ৭১৯

স্মৃতিকথা

অমৃত-স্মৃতিকণা ☐ প্রীতিময়ী কর ☐ ৭২৩

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও গঠন ☐ দেবিদাস বসু ☐ ৭৩৬

কবিতা

তোমার লাগি জাগেন ভগবান ☐ কমলা সেন ☐ ৭১৭

কে পারে জানতে তাঁকে ? ☐ সন্তোষকুমার অধিকারী ☐ ৭১৭

ভালবাসা ☐ তাপস বসু ☐ ৭১৮

যার জন্য ☐ ব্রত চক্রবর্তী ☐ ৭১৮

উত্তরাধিকারী ☐ গৌতম মুখোপাধ্যায় ☐ ৭১৮

প্রতিবিম্ব ☐ দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায় ☐ ৭১৮

নিয়মিত বিভাগ

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : বিজয়া ☐ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ☐ ৭০৮

মাধুকরী : স্বামী বিবেকানন্দ ☐ অনুরূপা দেবী ☐ ৭৩২

আনন্দের সন্তান : স্বামী অদ্ভুতানন্দ : অদ্ভুত আনন্দময় এক পুরুষ ☐ ৭৪১

বাতায়ন : রোটারি ক্লাবের ইতিকথা ☐ ৭৪৩

গ্রন্থ পরিচয় : পরমানন্দ সরস্বতী ☐ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ☐ ৭৪৪

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাস্থ্য ও ব্যাধি ☐ জলধিকুমার সরকার ☐ ৭৪৪

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ☐ ৭৪৫

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ☐ ৭৪৫

বিবিধ সংবাদ ☐ ৭৪৬

বিজ্ঞান সংবাদ ☐ ৭৪৮

সম্পাদক

স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বার্ষিক মূল্য : ত্রিশ টাকা ☐ সডাক ছত্রিশ টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়) : ছশো টাকা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ

মাঘ ১৩৯৫—পৌষ ১৩৯৬

(জানুয়ারি ১৯৮৯—ডিসেম্বর ১৯৮৯)

☐ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে আপনার নাম ও গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য (সাধারণ গ্রাহকমূল্য : তিরিশ টাকা, সডাক ছত্রিশ টাকা) জমা দিন।

☐ মাঘ-সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ/ডাকে পাঠানো সুনিশ্চিত করার জন্য আপনি গ্রাহকমূল্য পাঠিয়েছেন/জমা দিচ্ছেন, এই সংবাদটি একখানি পোস্টকার্ডে জানিয়ে দিতে পারেন।

☐ ভি. পি. পোস্টে পত্রিকা পাঠাতে অনুরোধ করবেন না।

☐ অনুগ্রহ করে "Udbodhan Office" এই নামে মনিঅর্ডার/ব্যাংকড্রাফট্ / পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠাবেন। চেক্ পাঠাবেন না।

☐ বার্ষিক সডাক চাঁদার হার :

ভারতের সর্বত্র—৩০.০০ টাকা, সডাক ৩৬.০০ টাকা ; নেপাল, বাংলাদেশ—৬০.০০ টাকা

বিদেশের অন্যত্র— { ১৫০.০০ টাকা [সমুদ্র-ডাক]
৩০০.০০ টাকা [বিমান-ডাক] }

☐ এককালীন ৬০০.০০ (ছশো) টাকা, অথবা কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা প্রথম কিস্তিতে দিয়ে পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক (অনূর্ধ্ব বারোটি) কিস্তিতে বাকী টাকা জমা দিয়ে আজীবন গ্রাহক [৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ সাপেক্ষ] হতে পারা যায়। ভারতের বাইরে (নেপাল, বাংলাদেশ ছাড়া) থেকে কেউ আজীবন গ্রাহক হলে সমুদ্র-ডাক ও বিমান-ডাক সহ আজীবন গ্রাহকমূল্য যথাক্রমে ৩০০ ও ৫৫০ ডলার (আমেরিকান)।

☐ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে বার্ষিক চাঁদা উদ্বোধন কার্যালয়ে না পৌঁছালে আগামী মাঘ মাসের পত্রিকা ডাকে পাঠানো যাবে না।

☐ নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া চলে।

☐ অনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভবপর না হলে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে অনুগ্রহ করে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেবেন।

☐ কার্যালয়ে চাঁদা দেবার সময় : সকাল ৯-৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০

শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০ [রবিবার বন্ধ]

ঠিকানা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

টেলিফোন : ৫৫-২৪৪৭

১ কার্তিক ১৩৯৫
১৮ অক্টোবর ১৯৮৮

বিনীত
কার্যাধ্যক্ষ



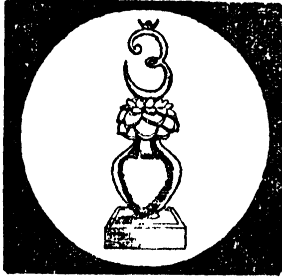
৯০তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] কার্তিক, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥
ততঃ সম্প্রেষিতা দেবী দশম্যাং শর্বরোৎসবৈঃ ॥
ইতি বৃত্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
প্রাদুর্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ ॥
নৃণাং ত্রেতাযুগস্যাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া।
পুরা কল্পে যথা বৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা ॥
প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ।
প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ ॥
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ ॥
এবং রামসহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ।
ভবিতব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে ॥*

রাবণ নিহত হলে, নবমীতে পিতামহ ব্রহ্মা সকল দেবগণের সঙ্গে দেবীর বিশেষ পূজা করলেন। তারপর দশমীতে সেই দেবী ভগবতী শর্বরোৎসবসহ বিসর্জিত হলেন। পূর্বকল্পে স্বয়ম্ভু মনুর সময়ে দেবী ভগবতী দেবগণের কল্যাণের জন্য দশভুজারূপে প্রাদুর্ভূতা হয়েছিলেন—এরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই আবির্ভাব ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের জন্য ঘটেছিল। প্রতিকল্পেই দৈত্যদিগের বিনাশের জন্য দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাক্ষস রাবণ এবং রামও প্রতিকল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের পূর্বের মতো যুদ্ধ হয় এবং দেবতাদের সঙ্গে রামের মিলন হয়। এরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ভবিষ্যতেও করবেন। দেবীও সেইভাবে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন।

* কালিকাপুরাণ, ৬০।৩১-৩২, ৩৯-৪০



কথাপ্রসঙ্গে

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, **শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতা আমাদের সকলের হৃদয়ে সতত শুভবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগ্রত রাখুন এবং তাঁহার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।**

মায়ের পূজা—অতঃ কিম্ ?

মথুরবাবুর জানবাজারের বাড়িতে দুর্গোৎসব। মহাসমারোহ। সেবার সেই সমারোহে বিশেষ মাত্রা সংযুক্ত হইয়াছে। কারণ, পূজা উপলক্ষে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত। পূজা তো সে-বাড়িতে প্রতিবারই হয়, সমারোহও এবছরের তুলনায় কম হয় না। কিন্তু এবার যেন সকলেই অনুভব করিতেছেন পূজা ও পূজাকে কেন্দ্র করিয়া যেন একটি অপার্থিব বাতাবরণ রচিত হইয়াছে। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন: "প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন। আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীরমনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি এক অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও অনুভূতি হইতেছে। দালান জম্ জম্ করিতেছে—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর বাটীর সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।"

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন মায়ের পূজায় পরম আনন্দে কাটিয়া গেল। বিজয়া দশমীর প্রাতঃকাল সমাগত। দশমীর বিহিত পূজাও হইয়া গেল। পুরোহিত দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য মথুরবাবুর নিকট খবর পাঠাইলেন। কারণ এবার মায়ের বিসর্জন হইবে। দর্পণ-বিসর্জন। এটিই আসল বিসর্জন। সন্ধ্যার পর প্রতিমা-বিসর্জন। মথুরবাবুর অন্তরে পূজার আনন্দের রেশ বহিতেছিল। তাঁহার গুরু এবং ইষ্ট 'বাবা'র সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে সেই আনন্দের রেশ যেন কাটিতেই চাহিতেছিল না। আনন্দের মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিবার ফলে তাঁহার খেয়ালই ছিল না যে, আনন্দময়ীর পূজার দিবসত্রয় অতিক্রান্ত হইয়া বিসর্জনের মুহূর্ত আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি যেন একটি ঘোরের মধ্যে ছিলেন। অকস্মাৎ পুরোহিতের সেই বার্তা তাঁহার সেই মগ্নতাকে আঘাত করিল। প্রথমে তিনি যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। পরে ঘোর কাটিলে তাঁহার মনে পড়িল—আজ বিজয়া দশমী। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করিলেন। প্রথা অনুসারে মাকে তো আজ বিসর্জন দিতে হইবে। আনন্দের হাট ভাঙিয়া যাইবে। মথুরবাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন: "না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙতে পারব না।" অর্থাৎ মায়ের বিসর্জন করিতে তিনি দিবেন না।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পুরোহিত বার বার লোক পাঠাইয়া বলিতেছেন—বাবু একবার আসিয়া দাঁড়ান, মা-র বিসর্জন হইবে। অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া মথুরবাবু ভৃত্যের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠাইলেন: "আমি মাকে বিসর্জন দিতে দেব না। মায়ের পূজা যেমন হচ্ছিল তেমনই হবে। সাবধান। যদি কেউ মাকে বিসর্জন দেয় তো তার

আর ঘাড়ে মাথা থাকবে না। রক্তারক্তি করে আমি ছাড়ব।"

পুরোহিত সেকথা শুনিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বিসর্জনের জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। দালানে তখন বহু লোক। পরিবারের লোকজনেরা তো আছেনই। সকলের কানে মথুরবাবুর নির্দেশ পৌঁছিল। সবাই প্রমাদ গনিলেন। কারণ ক্রুদ্ধ হইলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার মথুরবাবুর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সেকথা সকলেরই জানা।

সকলে তখন পরামর্শ করিয়া পরিবারের মধ্যে মথুরবাবু যাঁহাদের সম্মান করিতেন তাঁহাদের মথুরবাবুর কাছে পাঠাইলেন। তাঁহারা যদি মথুরবাবুকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। কাহারও কথায় মথুরবাবু কর্ণপাত করিলেন না। অথচ আর দেরি করাও চলে না। বিধি অনুসারে দেবীর বিসর্জন দিতেই হইবে। সুতরাং কি উপায়ে মথুরবাবুর ক্রোধ উপশম করাইয়া সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করানো যায় তাহা লইয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন।

অন্তঃপুরে মথুরবাবুর স্ত্রী রানী রাসমণির কন্যা জগদম্বার নিকট সংবাদ গেল। হঠকারী মথুরবাবুর স্বভাব তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার কাছে গিয়া অনুরোধ করিয়া যে কোন ফল হইবে না তাহা তিনি জানিতেন। এদিকে বিসর্জন না হইলে পুজার অঙ্গহানি ঘটিবে। দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি এই মহা অনর্থ হইতে পরিত্রাণের উপায় ভাবিতে লাগিলেন। চকিতে তাঁহার মনে হইল তাঁহাদের 'বাবা' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। তিনি ভিন্ন এই বিপদ হইতে আর কে তাঁহাদের রক্ষা করিবেন। একমাত্র তিনিই পারেন মথুরবাবুকে বুঝাইতে এবং তাঁহার ক্রোধ শান্ত করিতে। তাই ব্যাকুল হইয়া তিনি 'বাবা'র কাছে উপস্থিত হইয়া সব কথা জানাইলেন এবং বলিলেন তাঁহার কথা ভিন্ন অপর কাহারও কথা মথুরবাবু শুনিবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনিয়া মথুরবাবুর কাছে চলিলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, মথুরবাবুর মুখ গম্ভীর। চোখ-মুখ উত্তেজনায় রক্তিম। ঘরের মধ্যে একাকী অস্থিরভাবে তিনি পায়চারি করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই মথুরবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন: "বাবা, যে যাই বলুক, আমি কিন্তু প্রাণ থাকতে মাকে বিসর্জন দিতে পারব না। আমি সেকথা বলে দিয়েছি। আমি মায়ের নিত্যপুজা করব। মাকে ছেড়ে কেমন করে আমি থাকব ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন: "ওঃ—এই তোমার ভয় ? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে ? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায় ? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে ? মা এ তিনদিন বাইরের দালানে বসে তোমার পুজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে, তোমার পুজা নেবেন।"

যে-ব্যাপারটি লইয়া এতক্ষণ সকলেই ভীষণ উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে কাটাইতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথায় তাহার এক মুহূর্তে সমাধান হইয়া গেল। উত্তেজিত উদ্যতফণা বিষধর সাপের সম্মুখে বেদে শিকড় ধরিলে যেমন সে নিস্তেজ হইয়া আত্মসমর্পণ করে, শ্রীরামকৃষ্ণের সামান্য একটি কথায় ক্রুদ্ধ মথুরবাবুরও অবস্থা তেমনি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শান্ত হইয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় মথুরবাবু বুঝিলেন মায়ের আসল পুজা বাইরে নয়, আসল পুজা অন্তরে। বাইরের মন্দিরে আমরা মায়ের যে পুজা করি তাহা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়মন্দিরে মায়ের পুজারই প্রতীক। বাইরের দালানে মায়ের পুজার যে আয়োজন তাহা তো মাত্র তিন দিনের, কিন্তু অন্তরের দালানে মায়ের উপস্থিতি তো নিত্যদিনের, নিত্যক্ষণের। বাইরের দালানের বাদ্য, বাইরের দালানের সমারোহ একসময় থামিয়া যায়, যাইতেই হয়। কিন্তু মায়ের কৃপায় যদি অন্তরের দালানে একবার বাদ্য বাজে, একবার সমারোহ জমিয়া উঠে, তাহার রেশ যে অক্ষয়, কখনই তাহা থামিবে না।

বস্তুতঃ হৃদয়ই হইতেছে মায়ের স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, হৃদয় তাঁহার 'ডঙ্কামারা' ভূমি। তাই তো হৃদয়কে বলা হয় হৃদয়মন্দির। আমরা যে মায়ের মূর্তি গড়ি, মূর্তিকে মন্দিরে স্থাপন করিয়া পুজা করি, সে মূর্তি কিন্তু আমাদের হৃদয়েই

আছেন ; বাইরের মন্দিরে মায়ের পূজো আসলে হৃদয়মন্দিরে মায়ের পূজার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিজয়া-দশমীর দিন যে প্রথমে দর্পণ-বিসর্জন করা হয় তাহার মধ্যেও এই তত্ত্বটি নিহিত। যে-দর্পণের মধ্যে মায়ের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইতেছিল, সেই দর্পণটি হইল হৃদয়ের প্রতীক। মা সেখান হইতেই আসিয়াছিলেন। জলপূর্ণ আধারে দর্পণ-বিসর্জনের দ্বারা মা যেন আবার সেই হৃদয়েই প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৃহ-ন্নন্দিকেশ্বর, দেবী এবং কালিকা পুরাণে যে দুর্গা-পূজার পদ্ধতি রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতে বিজয়াদশমীর পূজার দর্পণ-বিসর্জন মন্ত্রে বলা হইতেছে: "গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবী চণ্ডিকে"—হে দেবী চণ্ডিকে তুমি তোমার পরম আবাসস্থলে, তোমার স্বস্থানে গমন কর। সুতরাং দর্পণ-বিসর্জনের দ্বারা বোঝানো হইল মা যেখান হইতে আসিয়াছিলেন সেখানেই ফিরিয়া যাইলেন। দর্পণ-বিসর্জনের পর সন্ধ্যায় নদী বা জলাশয়ে প্রতিমা-বিসর্জন ঐ এক তত্ত্বেরই অধিকতর স্থূল রূপ।

ইহার পরেও কথা থাকিয়া যায়। মা যদি আমার হৃদয়ে সতত অধিষ্ঠান করেন তাহা হইলে আমি কি এমন কিছু করিতে পারি যাহা অন্যায়, যাহা অশুভ, যাহা অকল্যাণপ্রদ? না, তাহা তো পারি না। মা সর্বশক্তির মূল, তিনি স্বয়ং শক্তিস্বরূপিণী। আমার অন্তরেই যখন সেই মায়ের নিত্য উপস্থিতি তখন আমি কি করিয়া শক্তিহীন হইতে পারি, কি করিয়া দুর্বল হইতে পারি? না, তাহা পারি না। যাহা আমাকে অন্যায়ের পথে লইয়া যায়, অশুভের পথে লইয়া যায়, অকল্যাণের পথে লইয়া যায় সেই বৃত্তির সহিত আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে এবং তাহাকে সমূলে নাশ করিতে হইবে। এই সংগ্রামের শক্তি এবং পরিশেষে বিজয়ের শক্তি আমরা আমাদের ভিতর হইতেই পাইব। আমাদের অন্তরনিবাসিনী মায়ের নিকট হইতেই আমরা সেই শক্তি পাইব।

মায়ের পূজো আসলে আমাদের সেই অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের প্রতীকী প্রক্রিয়া। আমাদের অন্তরে যিনি চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত করেন, তাঁহারই আর-এক নাম মা। শাস্ত্রের পরিভাষায় তিনি হইলেন আদ্যাশক্তি। শুধু নাম-ভেদ, বস্তু একই। বেদান্ত যে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের জাগরণের কথা বলেন তাহা *এই আদ্যাশক্তিরও জাগরণ।* কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো এই শক্তিকে সঙ্গে লইয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করি। তাই তাহাকে আহরণ বা অর্জন করিবার কোন ব্যাপার নাই। যাহা আছে তাহা শুধু বিকাশের ব্যাপার, অভিব্যক্তির ব্যাপার।

'বিজয়া' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে বি পূর্বক 'জি' ধাতু হইতে। 'জি' ধাতুর অর্থ জয় করা। 'বি' অর্থাৎ বিশেষভাবে জয় করা। এই 'বিশেষভাবে' জয়ের অর্থ হইতেছে আমাদের মালিন্যের উপর জয়, আমাদের সংকীর্ণতার উপর জয়, আমাদের ক্ষুদ্রতার উপর জয়, আমাদের দুর্বলতার উপর জয়, আমাদের কাপুরু-ষতার উপর জয়। যদি সেই 'বিশেষ জয়' আমরা লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে কিসের পূজো, কিসের মাতৃভক্তি? মানুষের ইতিহাস হইতেছে মানুষের বিকাশের ইতিহাস, আবার মানুষের সংকোচনেরও ইতিহাস। কিন্তু কালের নিরিখে সেই মানুষই মানুষ যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া সেই আত্মশক্তিকে জীবনে প্রকাশমান করিয়াছে, স্বয়ং সেই শক্তিস্বরূপ হইয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। যখন জগৎ এরূপ মানুষের সাক্ষাৎলাভ করে তখনই জগতে নতুন সভ্যতার সূচনা হয়। বুদ্ধ সেরূপ একজন মানুষ, খ্রীষ্ট সেরূপ একজন মানুষ, মহম্মদ সেরূপ একজন মানুষ, চৈতন্য সেরূপ একজন মানুষ, রামকৃষ্ণ সে-রূপ একজন মানুষ। তাই তাঁহারা এক-একটি যুগে এক-একটি সভ্যতার জনক। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য আকারে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য প্রকারে। আকারে তো মানুষ আমরা সকলেই, কিন্তু প্রকারে মানুষ আমরা কয়জন?

বিজয়ার অর্থ বিজয়োৎসবও। আজ আমরা আমাদের অন্তরস্থিত শক্তিকে জাগরণের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে আমরা আমাদের সকল দুর্বলতাকে জয় করিয়া 'প্রকারে' মানুষ হইতে পারি। যখন প্রকারে আমরা সবাই মানুষ হইব তখনই সৃষ্টি হইবে এক নতুন সভ্যতা। তখনই হইবে সত্যিকারের বিজয়া—বিজয়োৎসব। শক্তি-স্বরূপিণী মায়ের সন্তান আমরা। আসুন আমাদের সকল দুর্বলতার জঞ্জালস্তূপে আগুন ধরাইয়া দিয়া সেই বিজয়োৎসবের আজই সূচনা করিয়া দিই।

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনা

স্বামী কেদারানন্দ

আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শক্তি-উপাসনার তাৎপর্য নির্ণয়। এই তাৎপর্য নির্ণয়ের পূর্বে আমাদের জানা দরকার শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে শক্তি-তত্ত্বটি কি। শক্তি-উপাসনার দার্শনিক চিন্তা বা সিদ্ধান্ত আমরা পাই প্রধানতঃ তন্ত্রশাস্ত্র থেকে। বেদের উপনিষদ্-ভাগেও এর উল্লেখ পাই। কেন উপনিষদে শক্তিতত্ত্বটির আলোচনা উমা হৈমবতী আখ্যায়িকার মধ্যে পাওয়া যায়, যেখানে উমারূপা তত্ত্ববিদ্যাকে ঈশ্বরেরই শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আখ্যায়িকাংশের শাঙ্কর-ভাষ্যে বলা হয়েছে, 'হৈমবতী নিত্যমেব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ততে'—অর্থাৎ সেই হৈমবতী বা উমা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্তা ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মশক্তি। ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তেও এই ব্রহ্মশক্তির স্বরূপ এবং সৃষ্ট্যাদি ক্ষমতার উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শক্তি-উপাসনার ধারাটি বিশদভাবে বেদে বা উপনিষদে পাওয়া না গেলেও এর বিস্তারিত দার্শনিক ব্যাখ্যা বা পর্যালোচনা এবং তার সাধনার বিভিন্ন দিকের পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা পাই তন্ত্রশাস্ত্রে। সাধারণভাবে তন্ত্রশাস্ত্র বলতে বোঝায় বেদান্ত ও যোগের সঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয়। তাই তন্ত্রশাস্ত্রেই আমরা পাই শক্তিতত্ত্বের বা শাক্ত সিদ্ধান্তের মূল কথা।

তন্ত্র-সিদ্ধান্ত

তন্ত্রশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তটি এই ঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূলে রয়েছে এক অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ সত্তা যাকে পরমশিব বলা হয়েছে। এই পরমশিব অনাদি সিদ্ধ অর্থাৎ যাঁর আদি নেই বা আরম্ভ নেই এবং অন্ত বা শেষ নেই। সেই অনাদি সিদ্ধ পরম-শিব সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অতীত এবং তিনি নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল। সেই পরমশিবই যখন সক্রিয় এবং সচল তখন তিনি আদ্যাশক্তি, সেই শক্তিই স্পন্দনরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। এই আদ্যাশক্তিই সাধকের কাছে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে প্রকটিত হন। তাই দেখি কখনও তিনি কালী, কখনও দুর্গা, কখনও তারা। তন্ত্র-সিদ্ধান্ত অনুসারে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল পরমশিব যা সৃষ্টি প্রভৃতি জগৎ ব্যাপারের অতীত এবং সক্রিয় সচল শক্তি যা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ রূপে অভিব্যক্ত তা এক, অদ্বিতীয় ও অভিন্ন। এই শক্তি ব্রহ্মধর্মরূপা এবং ব্রহ্ম থেকে অভিন্না বলে সচ্চিদানন্দময়ী অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সৎরূপা যা চিরকাল আছে বা যা চিরকাল অপরিবর্তনশীল, চিৎরূপা অর্থাৎ স্পন্দনরূপা চৈতন্যময়ী যা জড়ধর্মা নয় এবং আনন্দ-রূপা অর্থাৎ যিনি সদাসর্বদা আনন্দরূপে প্রকাশিতা। এই সচ্চিদানন্দময়ী জগচ্চৈতন্যরূপা জননীকে তান্ত্রিক সাধকগণ মহামায়ারূপে আরাধনা করেন এবং উপলব্ধি করার প্রয়াস পান।

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনা

এ-পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করলাম তা তন্ত্রশাস্ত্রের অদ্বিতীয় সনাতন সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বা তার পক্ষে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন ও জটিল। আশার কথা, বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে এই তন্ত্রোক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তটির সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আমরা পাই যা সাধারণের পক্ষে সহজগম্য। তিনি তাঁর সুদীর্ঘকাল শক্তিসাধনার দ্বারা এই শক্তি-তত্ত্বটিকে উপলব্ধি করে সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শৈশবকাল থেকে মহাসমাধি পর্যন্ত তাঁর পূত জীবন ছিল বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনার মূর্ত গবেষণা-ক্ষেত্রস্বরূপ এবং এই ক্ষেত্র হিন্দুধর্ম তথা ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সারতত্ত্বগুলির দ্বারা উদ্ভাসিত। তাঁর বিভিন্ন সাধনার অন্যতম প্রধান সাধনা ছিল শক্তি-সাধনা যার উপলব্ধি এবং ভাব তাঁর শৈশবকাল থেকেই প্রকটিত হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার একটা বিশেষ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। শৈশবে কামারপুকুরের একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বালক গদাধরের বয়স তখন আট বৎসর। কামারপুকুরের অনতিদূরে (এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে) আনুড় গ্রামে জাগ্রতা দেবী

বিশালাক্ষীর মন্দির। একদিন বালক গদাধর গ্রামের ধনবান ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী প্রমুখ গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে দেবীদর্শনে যাচ্ছিলেন। পথে যেতে যেতে বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্তন করার সময় বালক গদাধর হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল জলধারা পড়তে লাগল ঃ এতে সমবেত স্ত্রীলোকগণ ভীত হয়ে পড়লেন, কিন্তু ধর্মভাবাপন্না প্রসন্নময়ীর মনে হল বালকের উপর দেবীর ভর হয়েছে। প্রসন্ন তখন অন্যান্য রমণীদের বালক গদাইকে নাম ধরে না ডেকে বিশালাক্ষী দেবীর নাম করতে অনুরোধ করলেন। এতে আশ্চর্য ফল হল—দেবীর নাম কয়েকবার করার পরেই বালক গদাইয়ের ধীরে ধীরে বাহ্যিক চেতনা ফিরে এল। তখন সকলে আশ্বস্ত হয়ে বালক-শরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হয়েছে জেনে বালক গদাইকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্বোধনে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এটা কোন শারীরিক রোগ অথবা অবসাদ বা দুর্বলতা কিছুই ছিল না। কারণ বালক গদাধর এই অবস্থার পূর্বে ও পরে যথেষ্ট সুস্থ ও সবল ছিলেন। শৈশব অবস্থার পর গদাধর দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং প্রথমে রাধাগোবিন্দজীর এবং পরে ভবতারিণী মা কালীর মন্দিরে পূজারী হন। প্রথমদিকে আনুষ্ঠানিক ভাবোদ্দীপক বাহ্য পূজার মধ্য দিয়ে তাঁর শক্তিসাধনা শুরু হয়। কিন্তু সরলতার প্রতীক গদাধরের মনে ক্রমে ক্রমে এই প্রশ্ন জাগল ঃ 'সত্যিই কি মা আছেন এবং যদি থাকেন তিনি কি সাধককে দেখা দেন, তাহলে আমাকে কেন দেখা দেবেন না?' এই প্রশ্ন ক্রমশঃ তাঁর মনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগল এবং তিনি আদ্যাশক্তিরূপা জগজ্জননীর দর্শন লাভ করার জন্য অন্তঃকরণে একটা তীব্র ব্যাকুলতা এবং আকুতি অনুভব করতে লাগলেন। এই অবস্থায় এমন একটা সময় এল যখন তিনি আর বাহ্য আনুষ্ঠানিক পূজার মধ্যে থাকতে পারলেন না। তিনি বাহ্যপূজা ছেড়ে আন্তরিকতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নির্জনে গভীর ও কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। জগন্মাতার দর্শনলাভের জন্য ঐ সময় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রান্তরে তখনকার জঙ্গলাকীর্ণ পঞ্চবটীর নিচে বসে তিনি রাত্রিকালে গভীর ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হতেন। নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ধ্যান-ধারণা প্রার্থনা ও ক্রন্দনেও যখন জগন্মাতার দর্শন পেলেন না তখন হৃদয়ে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন এবং এই রকম অবস্থায় একদিন ঠিক করলেন 'জগন্মাতার দর্শন যখন পেলাম না, তখন আর এই জীবনের প্রয়োজন কি?' এইরূপ চিন্তা করে ঠিক করলেন যে ভবতারিণীর মন্দিরে পশুবলির জন্য নির্দিষ্ট খড়্গ দ্বারা নিজের জীবন অবসান করবেন। এইরূপ চিন্তা করে যখন ঐ খড়্গ ধরতে গেলেন সেই সময় সহসা জগন্মাতার দর্শন লাভ করলেন ও সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ঐ সময় তিনি অন্তরে একটা অভূতপূর্ব জমাটবাঁধা বিমল আনন্দের স্রোত উপলব্ধি করতে লাগলেন। সেইসঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ প্রকাশও উপলব্ধি করলেন। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থার কথা স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে এইরূপে বিবৃত করেছেন ঃ "ঘর দ্বার মন্দির কোথায় সব যেন লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই। আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র। যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে উজ্জ্বল ঊর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল।" উক্ত দর্শনের বিরাম হলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠেছিল। তাঁর ঐরূপ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি! দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।"

ঐ সময়ের কিছুকাল পর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আগত ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে উচ্চতর তান্ত্রিক সাধনার জন্য গুরুপদে বরণ করে তাঁর নির্দেশে বাংলাদেশের প্রচলিত প্রধান চৌষট্টিটি তন্ত্রনির্দিষ্ট সাধনসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করেছিলেন। এছাড়া পূর্বের নিজ জীবনের অনুভূতিসকলকে গুরুবাক্য ও

তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ জীবনে মিলিয়ে দেখার জন্যও এই সকল সাধনার প্রয়োজন ছিল।

সাধকের সংযম ও সর্বভূতে ঈশ্বর ধারণার তারতম্য বিচার করেই তন্ত্রশাস্ত্র পশু, বীর ও দিব্য ভাবের সাধনার অবতারণা করেছেন। কঠোর সংযমকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করলে তন্ত্রোক্ত সাধন-সমূহের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। এই বিষয়টিও ঠাকুরের তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকটিত হয়। এছাড়া, তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠানের দ্বারা অসাধারণ অনুভবসমূহ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ না করলে পরবর্তী কালে তাঁর নিকট আগত বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে সেই ভক্তগণকে সাধনপথে সহজে অগ্রসর করে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। সেকারণে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁকে ঐ সকল শক্তি-সাধনার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত করিয়েছিলেন এবং সেকারণেই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দ্বারা সক্রিয় ভাবে তন্ত্রসাধনায় উপদিষ্ট হয়ে এবং সমগ্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার পর ঠাকুর সমগ্র নারীজাতিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতারই সাক্ষাৎ রূপ বলে দর্শন করেন। শুধু তাই নয়, নিজের বিবাহিতা স্ত্রী সারদাদেবীকেও তিনি সেই জগন্মাতার সাক্ষাৎ মূর্তি—এই দৃষ্টিতে পূজা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও যোড়শীপূজার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করতে করতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?" ঠাকুর তার উত্তরে বলেছিলেনঃ "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন এবং তিনিই আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" সে-কারণেই ঠাকুর তাঁর শক্তিসাধনার তথা সমগ্র সাধনার পরিসমাপ্তি করেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে ষোড়শী পূজা করে। ঘটনাটি বহুল পরিজ্ঞাত। ১২৮০ সাল। সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে আছেন। তখন তাঁর বয়স আনুমানিক আঠারো বছর। ঐ বছর শ্রীশ্রীঠাকুর ফলহারিণীকালীপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমাকে ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরী-জ্ঞানে যথাবিধি অর্চনা করে পূজা করলেন এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হলেন, শ্রীশ্রীমাও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সমাধিস্থা হলেন। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বারো বৎসরের সাধনার সমস্ত ফল, জপের মালা প্রভৃতি সারদাদেবীর চরণে সমর্পণ করে তাঁর সাধক-জীবনের পরিসমাপ্তি করেছিলেন।

যে-শক্তিতত্ত্বটি শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভব-তারিণীর মন্দিরে পাষাণময়ী মূর্তিতে বাহ্যপূজার মাধ্যমে শুরু করে ধীরে ধীরে নিজের আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে চিন্ময়ী আদ্যাশক্তির পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধ সত্য-তত্ত্বটিকেই সকল রমণীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতা-রূপে দর্শন করে সারদাদেবীকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী-জ্ঞানে পূজা করে তাঁর শক্তিসাধনার পরিসমাপ্তি করেছিলেন। এছাড়া এই উপলব্ধি দ্বারা তিনি এই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, একক এবং অদ্বিতীয়। তাই কথা-প্রসঙ্গে যেখানেই ব্রহ্ম ও শক্তির কথা এসেছে সেখানেই তিনি সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা এই তত্ত্বটিকে বোঝাতে চেয়েছেন। বলেছেনঃ "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতি বললেই মণি বোঝায়। মণি না থাকলে মণির জ্যোতি ভাবতে পারা যায় না—মণির জ্যোতি না থাকলে মণি ভাবতে পারা যায় না। এক সচ্চিদানন্দ শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানারূপ। যেখানে কার্য (সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়) সেখানেই শক্তি। জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুরভুরি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন।"

তন্ত্রোক্ত সাধনার সিদ্ধান্ত এই চৈতন্যময়ী ব্রহ্ম-শক্তিকে উপলব্ধি করা—যে-শক্তি জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী অর্থাৎ যিনি অনন্তজ্ঞানসম্পন্না, যিনি অনন্তইচ্ছাশক্তি-সম্পন্না—যাঁর ইচ্ছামাত্রেই অনাদিকাল ধরে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্ছে, এবং যিনি অনন্তক্রিয়াশক্তিসম্পন্না—যিনি ক্রিয়াময়ী বা লীলাময়ী হয়ে অবিরাম সৃষ্টি আদি লীলা করছেন। আবার যখন তিনি এসব কিছু করছেন না তখন তিনি নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল পরমশিব—এটাই তন্ত্রোক্ত শিবশক্তিতত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে কঠোর সাধনার দ্বারা এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করে সকল মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

কবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ত-সাধক কবীর। কবীরের জীবনকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে কবীরের জন্ম হয়েছিল চতুর্দশ শতকের শেষে। কেউ কেউ বলেন তিনি একশ বছর বেঁচে ছিলেন, কেউ বলেন তারও বেশি। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে কবীর জীবিত ছিলেন। কবীরের যুগের সামাজিক ছবি ও উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ছবির মধ্যে বহু অমিল থাকলেও বেশ কিছু মিলও আছে। তখনও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল সমাজদেহের প্রকট ব্যাধিগুলির অন্যতম। আজও তা দূর হয়নি। ভারতের প্রাণপাখি হল ধর্ম, আর সেই ধর্মকে নিয়েই যুগে যুগে চলে এসেছে ঝগড়া, মারামারি, অশান্তি। ধর্মের মধ্যে গ্লানি জন্মেছে প্রায়ই। সেকারণে অধর্মকে রুখতে ও ধর্মকে রক্ষা করার জন্য অবতার পুরুষদের আসতেও হয়েছে বারবার। ভারতের মাটি পবিত্র হলেও এ-দেশেই ঈশ্বরকে বারবার আসতে হয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মহৎপ্রাণ ঈশ্বরপ্রেমী কবীরের চিন্তা ও উপদেশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরচিন্তা ও উপদেশ যেন একই সুরে বাঁধা। বিরোধের কারণ ও সমন্বয়ের রূপরেখা দুই মহাপুরুষই জানিয়ে গেছেন সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। সে-বাণী উর্বর মস্তিষ্কের লোকমনোরঞ্জনকারী অসার ভাষণ নয়। হৃদয়ানুভূতির স্বতঃপ্রকাশ। পশ্চিমী বস্তুবাদী সভ্যতায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল অধিক সুখ অর্থাৎ 'কাম-কাঞ্চন' লাভ। কিন্তু কাম-কাঞ্চন ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যেও যে সুখ থাকতে পারে. জীবনের লক্ষ্য যে অন্য কিছু হতে পারে তা বার বার শুনিয়েছেন ভারতের দুই সন্ত-সাধক। যুগের তফাতে থাকার কারণে তাঁদের ভাব প্রকাশের ভাষা ভিন্ন হলেও মূল ভাবনা ও চিন্তা অভিন্ন।

কবীর অবতার-পুরুষ ছিলেন অথবা ছিলেন না, এ প্রশ্ন আমাদের নয়। আমরা একটা জিনিসই লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছি, এই মহৎপ্রাণ ঈশ্বর-প্রেমীর চিন্তা ও উপদেশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরচিন্তা ও উপদেশ যেন একই সুরে বাঁধা। বিরোধের কারণ ও সমন্বয়ের রূপরেখা দুই মহাপুরুষই জানিয়ে গেছেন সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। সে-বাণী উর্বর মস্তিষ্কের লোকমনোরঞ্জনকারী অসার ভাষণ নয়।'হৃদয়ানুভূতির স্বতঃপ্রকাশ। পশ্চিমী বস্তুবাদী সভ্যতায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল অধিক সুখ অর্থাৎ 'কাম-কাঞ্চন' লাভ। কিন্তু কাম-কাঞ্চন ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যেও যে সুখ থাকতে পারে, জীবনের লক্ষ্য যে অন্য কিছু হতে পারে তা বারবার শুনিয়েছেন ভারতের এই দুই সন্ত-সাধক। যুগের তফাতে থাকার কারণে তাঁদের ভাব প্রকাশের ভাষা ভিন্ন হলেও মূল ভাবনা ও চিন্তা অভিন্ন।

গত শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেলেন, মানবজীবনের লক্ষ্য হল ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরদর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে কবীরও বলে গেছেন রামরঘুনাথকে পাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মা-ই সব। তাঁকে পেলে সুখ, না পেলেই দুঃখ। কবীরের কাছে রাম-ই সব। রামই তাঁর প্রভু, স্বামী। তাঁকে না পেলে দুঃখ, পেলেই সুখ :

"সাঁই বিন দরদ করেজে হোয়
কহত কবীর সুনো ভাই প্যারে
সাঁই মিলে সুখ হোয়।"*

একবার তাঁর সন্ধান পেলে আর এই পুতুল খেলা ভাল লাগে না। তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত

* কবীরের পদগুলি উপেন্দ্রকুমার দাসের 'ভক্ত কবীর' গ্রন্থ (শঙ্খ প্রকাশনী কলকাতা) থেকে গৃহীত।

চলে পুতুল খেলা। ঠাকুর বলছেন: "কচি-মেয়েরা পুতুল খেলা কতদিন করে? যতদিন না বিবাহ হয়। বিবাহ হলে পুতুলগুলি পেটরায় তুলে ফেলে।" স্বামীকে পেলে পুতুলের প্রয়োজন নেই। ভক্ত কবীরও বলেছেন, পুতুল ফেলে দেও:

"গুড়িয়া গুড়বা সুপ-সুপলিয়া
তজি দে রুধি লরিকৈয়া খেলনকী।"

কিন্তু তাঁকে চাইলেই কি পাওয়া যায়? একবার দেখার জন্য কত সাধনা, কত পরিশ্রম। এক জন্মে নয়, বহু জন্মের সাধনা চাই। কবীর বলছেন: "সাঈ সে লগন কঠিন হৈ ভাঈ।"

কঠিন হলেও হতাশার কারণ নেই। তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য চাই তাঁর প্রতি ভালবাসার টান। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চাই না, অন্য কিছুতেই তৃপ্তি নেই, এমন অনুভূতি প্রয়োজন। এই টান, একাগ্রতা কেমন হওয়া চাই তা বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "তার কিছু লক্ষণ আছে। ঈশ্বরীয় কথা বই আর কিছু শুনতে ভাল লাগে না।... যেমন সাত সমুদ্র, গঙ্গা, যমুনা নদী সব তাতে জল রয়েছে, কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে, তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু অন্য জল খাবে না।" কবীরও বললেন, চাতক যেমন বারিবিন্দুর পিয়াসী তেমন পিয়াসী হয়ে প্রিয় প্রিয় বলে ডাকতে হবে। রাতদিন পিপাসায় ছটফট করছে তবু অন্য জল চাতকের চলবে না:

"জৈসে পপীহা প্যাসে বুঁদকা পিয়া রট লাঈ।
প্যাসে প্রাণ তড়ফৈ তড়ফৈ দিনরাত ঔর না ভাঈ।"

ঈশ্বরের প্রতি টান এমনই হতে হবে যাতে সকল বাধা বিপদকে তুচ্ছ মনে হবে। তীব্র টান চাই। ঠাকুর টানের তীব্রতা বোঝাবার জন্য বললেন তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন। বিষয়ীর বিষয়ের উপর। মায়ের সন্তানের উপর আর সতীর পতির উপর টান। কবীরও টানের তীব্রতা বোঝাতে অনুরূপ উপমার ব্যবহার করেছেন। তিনি বললেন: শব্দ ভালবেসে মৃগ যেমন শব্দ শুনতে গিয়ে ব্যাধের হাতে প্রাণ দেয়, সতী যেমন স্বামীকে ভালবেসে স্বামীর অনুগামী হয়ে চিতায় আরোহণ করে সেই রকম টান চাই:

"জৈসে মিরগা শব্দ সনেহী শব্দ সুননকো জাঈ।
শব্দ সুনৈ ঔর প্রাণদান দে তনিকো নাহিঁ ডরাই।
জৈসে সতী চঢ়ী সত উপর নিয়াকী রাহ্ মন ভাঈ।"

ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরলাভের জন্য বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা চাই। "যার তীব্র বৈরাগ্য তার প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল। যার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না।" কবীরও প্রেম-বৈরাগ্যের কথা বললেন। প্রেম-বৈরাগ্য ছাড়া পরম সুখসাগরের সন্ধান পাওয়া যায় না। "সুঝত নাহিঁ পরম সুখ সাগর বিনা প্রেম বৈরাগ রে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "সাধনের শেষ কথা তুমি মা আমি তোমার ছেলে।" ভক্ত কবীরও তাঁর উপাস্য শ্রীরামকে উদ্দেশ করে বলছেন: হরি তুমি আমার জননী, আমি তোমার বালক। "হরি জননী মৈঁ বালক তেরা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: সকল প্রকার সংশয়, অহংকার, অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে বলতে হবে আমি তোমার দাস, আমি কিছুই নই, যা করাও, যেমন করাও তাই করি। তুমিই সব। নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ।

ভক্ত কবীরও বলেছেন: আমার মনের সংশয় দূর হয়েছে তখন যখন আমি তাঁর দাসী হলাম। যখন হলাম ধূলির সমান তখন প্রভু অন্তরে এলেন। "মেরৈ মন কা সংসৈ ভাগা জব দাসী ভঈ থাক বরাবরি সাহিব অন্তর খোলা।" কবীর আরও বললেন, যে মন থেকে অহংভাব দূর করতে পেরেছে সেই ব্যক্তিই ভবনদী পার হতে পারে। "সাধো সোজন উতরে পারা জিন মন তৈঁ আপা ভারা।" অভিমান দূর করতে পারলে শুধু ভগবানকে পাওয়া নয়, ভক্তই ভগবানের সমান হয়ে ওঠে। "কহে কবীর জিনি গয়া অভিমানা। সো ভগতা ভগবন্ত সমানা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি হনুমানের মতো দাস্যভাব চাই। কবীরের পদেও ঐ একই কথা পাই। কবীর বলেছেন: আমি রামের কুকুর। আমার গলায় রামের দড়ি। তিনি যেদিকে টানেন

সেদিকেই যাই। হরি যেমন রাখেন তেমনি থাকি আর যা দেন তাই খাই ঃ

"কবীর কুতা রামকা—
গলে রামকা জেবড়ী
জিত খেঁচে তিত জাউঁ।
জুঁহরি রাখৈ তুঁ্য রহেঁা
জো দেবৈ সো খাউঁ।"

ঠাকুর বলছেন ঃ ধন-যৌবন কিছুরই গর্ব করা ঠিক নয়। সবই অসার অনিত্য। কবীরও বলেছেন ঃ

"ধন জোবন কো গরব না কীজৈ।"

ঈশ্বরকে পাবার জন্য চাই একাগ্রতা, ব্যাকুলতা। মনে হবে তিনি ছাড়া জীবনই বৃথা। ঠাকুরের ভাষায়—"আমার সব আছে, কোন অভাব নেই, কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে।...রাগভক্তি প্রেমাভক্তি ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে কোন বিধিনিয়ম থাকে না।" কবীরের পদে সেই একই সুরের সন্ধান পাই। কবীর বলছেন, আমি তোমার দাসী। তুমি আমার কর্তা। দিনের বেলা আমি যেতে পারি না। রাতে আমার ঘুম হয় না। ঘর-দোর আমার ভাল লাগে না। শয্যা আমার শত্রু হয়েছে। প্রিয়তম হয় তুমি এসে আমায় আপন করে নাও নয় আমি এই প্রাণ ত্যাগ করি ঃ

"দিবস ন ভুখ রৈন নহি" নিদ্রা ঘর অজনা ন সুহায়
সেজরিয়া বৈরন ভঈ হমকো জাগত রৈন বিহায়।
হম তো তুমারী দাসী সজনা তুম হমরে ভরতার
কৈ হম প্রাণ তজাতি হৈ প্যারে কৈ অপানি কর লেব।"

আমরা জানি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও সরল শিশুর মতো 'দেখা দে মা, দেখা দে মা' বলে ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছেন, শেষে দেখা না পাওয়ার দুঃখে আত্মহত্যা করার চেষ্টাও করেছেন। দুর্দম তাঁর সেই ব্যাকুলতা। তিনি বলতেন, ব্যাকুলতা শুধু মুখের হলে চলবে না, অন্তরের ব্যাকুলতা চাই। শুধু মুখের কথায় যদি হতো তবে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সবাই মুক্তি পেত। টিয়াপাখি দিনরাত হরে কেষ্ট বলে, বিল্লিতে ধরলে হরির নাম তার মুখে আসে না, ক্যাঁ ক্যাঁ করে। ঠাকুর আরও বললেন, "সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আনন্দ হয়। খেলে না, কিছুই করলে না, বসে বসে বলছ, সিদ্ধি সিদ্ধি। তাহলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয়?"

ঠাকুরের উপমায় কবীরের পদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলছেন—পণ্ডিত মিছে কথা বলে। রাম রাম বললেই যদি দুনিয়ার লোক উদ্ধার পায় তা হলে চিনি চিনি বললেও তো মুখ মিষ্টি হবে। টিয়াপাখি যতক্ষণ মানুষের সঙ্গে ততক্ষণ 'হরি হরি' বলে কিন্তু জঙ্গলে উড়ে গেলে নামের কথা মনে পড়ে না। যার অন্তরে প্রেম জন্মায়নি তাকে বেঁধে যমপুরীতে নিয়ে যাবে ঃ

"পণ্ডিত বাদ বদন্তে ঝুঠা
রাম কহ্যা দুনিয়াঁ গতি পাবৈ।
খাঁড কহ্যা মুখ মীঠা নরকৈ সাথি সুবা হরি বোলে
হরি পরিতাপ ন জাবৈ জো করহঁ উড়ি জাই জঙ্গলমে"
বহুরি ন সুরতৈঁ আনৈ।
কহৈ কবীর প্রেম নহি" উপজ্যো
বাধ্যো জমপুরী জাসী।"

কলিযুগে ঈশ্বরের নাম-গানই জীবের মুক্তির উপায়। ঠাকুর সেকথা বহুবার বলেছেন। কলিতে অন্নগত প্রাণ। সে-যুগের মুনি ঋষিদের মতো যজ্ঞ তপস্যাদি করা এ যুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর তাই বলেছেন ঃ "হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে, হরিবোল বলে।" ঠাকুর অজামিলের গল্প শুনিয়ে বলেছেন পাপী অজামিল মরার সময় কেবল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করার জন্যই মুক্তি পেয়ে গেল। ভক্ত কবীর সেই নাম মাহাত্ম্য স্মরণ করে বলেছেন রাম নাম স্মরণ কর। কেবল শ্রীরামের নাম উচ্চারণ করে অজামিল, গজ ও গণিকা পার হয়ে গেল ঃ

"মনরে রাঁম সুমিরি, রাঁম সুমিরি, রাঁম সুমিরি ভাঈ।
রাঁম নাঁম সুমিরণ বিনা বাড়ত হৈ অধিকাঈ।
অজামেল গজ গণিকা পতিত করম কীনহাঁ।
তেউ উতরি পারি গয়ে রাঁম নাঁম লীনহাঁ।"

যে তাঁর নামের অমল রস একবার চেখেছে সে গণিকাই হোক আর সদন কসাই-ই হোক সে তরে গেছে ঃ

"পিয়ত পিয়ালা ভয়ে মতবালা
পায়ো নাম মিটী দুচিতাই
জো জন নাম অমল রস চাখা,
তর গঈ গণিকা সদন কসাই।"

পূজা, আহ্নিক; ব্রত উপবাস গৌণ ব্যাপার। আসল হল তাঁতে অনুরাগ। ঠাকুর বলছেন: "যখন হরিনামে কালী নামে রাম নামে চক্ষে জল আসে তখন সন্ধ্যা কবচাদির কিছুই প্রয়োজন নাই। ঠিক একই কথা শুনিয়েছেন কবীর। মনে হয় কবীরের কথাই যেন চারশ বছর পর প্রতিধ্বনিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে।

কবীর বলছেন, মনের মধ্যে খোঁজ। সব কিছুই আছে তোমারই মধ্যে: "জো কুছ খোজো সো তুমহঁী মহিঁ কাহে কো ভরমেঁ বাহরি।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: ঈশ্বরকে মন্দির, মসজিদে খোঁজার প্রয়োজন নেই। তিনি সকল জীবের মধ্যেই বর্তমান। ঘটে ঘটে যিনি বিরাজ করছেন। কবীরও বলছেন সেই কথা:

"কহৈ কবীর রমতা সেঁা রমনী দেহী বাদি ন খোই।
মোকোঁ কহাঁ ঢ়ুঢ়ে বন্দে মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ,
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ না কাবে কৈলাস মেঁ।
কহৈঁ কবীর সুনো সাধো সব শ্বাসোকী শ্বাস মেঁ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যেই বিরাজ করছেন। তীর্থে তাঁর কি এমন বেশি প্রকাশ? তিনি তাই শিবজ্ঞানে জীব সেবার কথা বলেছেন। কারণ ঘটে ঘটে যে নারায়ণ বিরাজ করছেন।

কবীর বলছেন তীর্থ মূর্তি সব রামের মধ্যেই রয়েছে। বাইরে কেন তাঁকে খুঁজে মরবে? যত নরনারী সব তাঁরই রূপ:

"তীরথ মূরত রাম নিবাসী বাহর করে কো হেরা
দিলমেঁ খোজ দিলহিমেঁ খোজো ইহেঁ করীমা রামা।
জেতে ঔরত মরদ উপানী সো সব রূপ তুমহারা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: এক রাম তাঁর হাজার নাম। যাকে হিন্দুরা ভগবান বলে, তাকেই মুসলমানরা বলে 'আল্লা', খ্রীষ্টানরা বলে 'গড'। কবীরও বলছেন তাই। বলছেন, দুই জগদীশ্বর কোথা থেকে এলেন? আল্লা, রাম, করীম, কৃষ্ণ এসব তো হজরতেরই নাম। নামাজ আর পূজা, একই। মহাদেব মহম্মদ, ব্রহ্মা আদম সব তাঁকেই

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: এক রাম তাঁর হাজার নাম। যাকে হিন্দুরা ভগবান বলে, তাকেই মুসলমানরা বলে 'আল্লা' খ্রীষ্টানরা বলে 'গড'। কবীরও বলছেন তাই। বলছেন, দুই জগদীশ্বর কোথা থেকে এলেন? আল্লা, রাম, করীম, কৃষ্ণ, এসব তো হজরতেরই নাম। নমাজ আর পূজা, একই। মহাদেব, মহম্মদ, ব্রহ্মা আদম সব তাকেই বলে। একই জমির উপর বাস করছে অথচ কাউকে বলা হচ্ছে হিন্দু কাউকে তুরক। একই মাটির ভাঁড় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তার নাম।

বলে। একই জমির উপর বাস করছে অথচ কাউকে বলা হচ্ছে হিন্দু কাউকে তুরক। একই মাটির ভাঁড় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তার নাম:

"ভাইরে দুই জগদীস কহাঁতে আয়া অল্লহ রাম
করীমা কে সো (হী) হজরত নাম ধরায়া
ইক নিমাজ ইক পূজা
বহী মহদেব বহী মহম্মদ ব্রহ্মা আদম কহিয়ে
কো হিন্দু কো তুরক কহাবৈ এক জমীঁপর রহিয়ে
বেগরি বেগরি নাম ধরায়ে এক মাটিয়াকে ভাঁড়ে।"

আজ জাতীয় সংহতির অভাবে আমাদের দেশ গভীর সংকটের সম্মুখীন। এই ক্রান্তি মুহূর্তে ভারতের এই দুই মহাসাধকের চিন্তা ও পরামর্শকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেই যে আমাদের কল্যাণ তা আজ বুঝতে হবে।

সন্ন্যাসী-সাংবাদিক

শিশির কর

স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার অন্ত নেই। আধুনিককালে যা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারবাহন, সেখানেও আমরা স্বামীজীকে অগ্রণী-পুরুষ হিসাবে দেখতে পাই। সে-ক্ষেত্রটি হচ্ছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্র। এ-কথা ঠিক বাঙলা সাংবাদিকতা বহু বছর আগেই শুরু হয়েছিল। ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও পত্রিকা বের হচ্ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পক্ষে পত্রিকা স্বামীজীই প্রথম বের করলেন। আর তার অনুসৃতি দেখা গেল পরবর্তী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলির নানা পত্র-পত্রিকায়। অন্ততঃ বাঙলা ভাষার প্রথম সন্ন্যাসী-সাংবাদিক স্বামী বিবেকানন্দই। শুধু তাই নয়, তাঁর

স্বামী বিবেকানন্দের ভুমিকার অন্ত নেই। আধুনিককালে যা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারবাহন সেখানেও আমরা স্বামীজীকে অগ্রণী পুরুষ হিসাবে দেখতে পাই। সে-ক্ষেত্রটি হচ্ছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্র। এ-কথা ঠিক বাঙলা সাংবাদিকতা বহু বছর আগেই শুরু হয়েছিল। ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও পত্রিকা বের হচ্ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পক্ষে পত্রিকা স্বামীজীই প্রথম বের করলেন। আর তার অনুস্মৃতি দেখা গেল পরবর্তী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলির নানা পত্র-পত্রিকায়। অন্ততঃ বাঙলা ভাষার প্রথম সন্ন্যাসী-সাংবাদিক স্বামী বিবেকানন্দই। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি এদেশে সন্ন্যাসী-সাংবাদিকদের একটি ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। এই সব সন্ন্যাসী-সাংবাদিক এখনও দেশ-বিদেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন। প্রচার করেছেন ভারতের বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা।

প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি এদেশে সন্ন্যাসী-সাংবাদিকদের একটি ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। এইসব সন্ন্যাসী-সাংবাদিক এখনও দেশ-বিদেশে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন। প্রচার করছেন ভারতের বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে এসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। নিয়মিত প্রকাশিত সবচেয়ে পুরাতন বাঙলা পত্রিকাটির প্রবর্তক তো স্বামীজীই। তিনি জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের জন্য যে 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রবর্তন করেছিলেন প্রায় এক শতাব্দী আগে, সেটিই এখন আমাদের দেশের ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় সেরা পত্রিকা। ইংরেজী মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর প্রবর্তকও স্বামীজী। পাক্ষিক 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার সূচনাও তিনিই করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বাইরেও অসংখ্য পত্র-পত্রিকা বিশ্বজুড়ে আছে, যে-সবের পিছনে আছে অসংখ্য সন্ন্যাসী-সাংবাদিক। শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী ও অনুগামীরাও নানা ভাষায় ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক অসংখ্য পত্র-পত্রিকা বের করেন। দেশেবিদেশে ভারতের অন্যান্য ধর্মসংঘের সন্ন্যাসী-সাংবাদিকরাও অনেক পত্র-পত্রিকা বের করে আসছেন। নানা মত ও পথের সন্ন্যাসী-সাংবাদিকদের প্রচেষ্টায় ও সম্পাদনায় এদেশে এবং বিশ্বের অন্যত্র কত পত্র-পত্রিকা যে প্রতিদিন বের হচ্ছে তার হিসাব নেই। কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্মরণীয় যে, এদের মূল প্রেরণা কিন্তু স্বামীজীই।

বিবেকানন্দ নিজে যে পত্রিকাগুলি বের করেছেন, তার কথায় আসা যাক। প্রথমটি হচ্ছে পাক্ষিক 'ব্রহ্মবাদিন' (১৮৯৫)। পরে মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' (১৮৯৬/১৮৯৮) তারপর বাঙলা মাসিক 'উদ্বোধন'। ('উদ্বোধন' পত্রিকা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রথমে অবশ্য কয়েক বছর এটি পাক্ষিক পত্রিকা ছিল।) 'প্রবুদ্ধ ভারত' এখনও নিয়মিত বের হচ্ছে। তবে 'ব্রহ্মবাদিন' পরে বন্ধ হয়ে যায়। এটি বের হতো মাদ্রাজ থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল, যিনি ছিলেন স্বামীজীর বিদেশ গমনের প্রধান উদ্যোক্তা। বিদেশে

ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য এবং মিশনারিদের মিথ্যা প্রচারের উত্তর দেবার জন্য স্বামীজীর আরও পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। সে-খবর তাঁর একটি চিঠিতে পাই। ১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লেখেন ঃ

"আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার করব, মনে করছি। সুতরাং কাগজের জন্য যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর কর, তাহলে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস দেখবার আছে।"

আলাসিঙ্গা প্রমুখকে লেখা বহু চিঠিতেই স্বামীজী 'ব্রহ্মবাদিন' সম্পর্কে লিখেছেন। এথেকে সাংবাদিকতা, বিশেষ করে পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে, স্বামীজী কত সজাগ ও স্বচ্ছদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন, তা বোঝা যায়। ২৪ অক্টোবর (১৮৯৫) তিনি লেখেন ঃ "ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেলাম —বেশ হয়েছে। এইরূপ করে চল। কাগজের কভারটা আরও একটু ভাল করার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হাল্কা, অথচ ভাবগুলি আর একটু উজ্জ্বল করার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও।" ১৮ নভেম্বর তিনি ফের লিখলেন, "ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ লেখার ধাঁচটা ভারী কটমটে হচ্ছে। একটু যাতে স্বচ্ছ, সরল ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর।"

ব্রহ্মবাদিনের রচনারীতির কাঠিন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করেও স্বামীজী লিখেছেন (২৩ মার্চ, ১৮৯৬): "ব্রহ্মবাদিনে লম্বা লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ওটা চলার সম্ভাবনা বড়ই অল্প।... তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত করে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পার, তবেই ব্রহ্মবাদিন জনপ্রিয় হবে নতুবা নয়।"

এই সব চিঠি থেকে আমরা সাংবাদিক-স্বামীজীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। পত্রিকার আর্থিক ও প্রচারের দিকটিতেও ছিল স্বামীজীর বিশেষ লক্ষ্য।

মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক বি. আর. রাজম আয়ারের অকাল মৃত্যুতে পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটে প্রকাশিত হবার দুবছর পরেই (জুন, ১৮৯৮)। এর পর শুরু হয় প্রবুদ্ধ ভারত বা The Awakened India-র দ্বিতীয় পর্যায় (আগস্ট ১৮৯৮)। এবার নতুন কর্মকেন্দ্র—আলমোড়া। কয়েক মাস পর প্রবুদ্ধ ভারতের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হল আলমোড়া থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে মায়াবতীতে, সম্পাদক —স্বামী স্বরূপানন্দ। তিনি এই পত্রিকাটিকে উচ্চমানে তুলেছিলেন। স্বামীজীও খুব খুশি হয়েছিলেন তাঁর সম্পাদনার কৃতিত্বে। কিন্তু তাঁরও অকাল মৃত্যু হয় মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর ভগিনী নিবেদিতাও প্রবুদ্ধ ভারতে সম্পাদকীয় লিখেছেন। পরে স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী অশোকানন্দ প্রমুখের লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি আজও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা স্বামীজীর দীর্ঘদিনের। শেষপর্যন্ত বহু বাধা, অসুবিধা কাটিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' বের হল ১৪ জানুয়ারি, ১৮৯৯।

উচ্চমান অক্ষুণ্ণ রেখে প্রায় শতাব্দীকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' বাঙলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। কেউ কেউ মনে করেন ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে উদ্বোধন অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং ঐ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ। বাঙলা সাহিত্যের বিকাশেও উদ্বোধনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধন শুধু স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা রচনার প্রকাশক্ষেত্র নয়, এর লেখকদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখও। তবে নিঃসন্দেহে উদ্বোধনের বিশেষ গৌরব স্বামী বিবেকানন্দের রচনা বহন। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন ঃ "উদ্বোধন বিবেকানন্দকে বাঙলা লেখক করেছিল, এ গৌরব তার চিরদিনের। পত্রিকাটির প্রতি স্বামীজীর অসীম মমত্ব ছিল, সদ্য-প্রবর্তিত সঙ্ঘ-মুখপত্রের প্রতি দায়িত্বও ছিল অশেষ।

অন্তরের তাগিদে যদি নাও হয়, পত্রিকার প্রয়োজনে তাঁকে লিখতে হয়েছে। না, অন্তরের তাগিদ অল্প ছিল না। পরম প্রিয় বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যে যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনঃস্থাপনের ইচ্ছাও তাঁর মনে জেগেছিল। স্বামীজীর প্রায় সকল মৌলিক বাঙলা লেখাই উদ্বোধনে বেরিয়েছে, উদ্বোধনের পক্ষে তা সম্পদ, সাধন-চিন্তার ক্ষেত্রেও সে রচনাগুলির গুরুত্ব এমনই ছিল যে, ইংরেজীতে অনুবাদ করে অন্যান্য পত্রিকা তা প্রকাশ করত। স্বামীজী কেবল চিন্তাবস্তুতে উদ্বোধনকে গরীয়ান করেননি, রীতির ক্ষেত্রেও বাঙলা গদ্যে নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন।"[১]

এমন চলিত বাঙলায় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের যে প্রসার ঘটেছে, তার পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দই এবং মাধ্যম এই 'উদ্বোধন'। কুমুদবন্ধু সেন উদ্বোধন-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৫৪) লেখেন: "আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে,—তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামীজীর বাঙলা রচনা। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়বার জন্য সেধেছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়েছেন তা পড়ে দেখুন বলে বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়তে চাননি—আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হল?' দীনেশচন্দ্র বলিলেন: 'আমি এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি বইটি পড়িনি শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাঙলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি, আর পূর্ব-পশ্চিমের আদর্শ। দেখে অবাক হতে হয়। এছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।'

পরবর্তী কালে 'উদ্বোধন' সম্পর্কে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছি গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে। স্বামীজী ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় দিনগুলি তুলে ধরার জন্য উদ্বোধনে লিখতেন। তাঁর সেইসব লেখার প্রতিও যে গোয়েন্দাদের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল কে জানত? গোয়েন্দা রিপোর্টে (যদিও স্বামীজীর মৃত্যুর পর লেখা) সেসব তথ্য পাই। জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের জন্য এই যে 'উদ্বোধন' পত্রিকা, তার একাধিক নিবন্ধ নিয়ে বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগে বহু ফাইল চালাচালি হয়। সেই সব রিপোর্টে আছে বিরূপ মন্তব্যও। গোয়েন্দাদের, আমলাদেরও। গোপন সরকারি ফাইল থেকে জানা যায়, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর নিবন্ধও রাজরোষে পড়েছিল তাঁর অন্য লেখার সঙ্গে (পত্রাবলী, ভাববার কথা প্রভৃতি)। গোপন ফাইল থেকে গোয়েন্দার নোটটি হুবহু তুলে দিচ্ছি:

"During his lifetime Swamiji published a fortnightly journal from Belur headquarters of Ramkrishna Mission called 'Udbodhan.' In one of its issues, which was subsequently considered highly objectionable as it appeared from a report D/December, 1907, Swamiji wrote, 'You have all been hypnotised, your ruler tell you that you are low, subjugated and weak, and what you believe to be true. I am made of earth of this country but I have not learnt to think of myself like that. So those people who used to look down upon us, by God's

১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, ১৯৮১, পৃ: ৪১

will, are respecting me like God. What is wanted is keen-edged sword and war to death." [Bengal Govt. Home (Pol.) Conf-Fl. Sl. 100, 1912]

(জীবৎকালেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বেলুড় থেকে 'উদ্বোধন' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকা-টির একটি সংখ্যায়—যা পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের একটি রিপোর্টে খুবই আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হয়েছে—স্বামীজী লিখেছিলেন : তোমরা সকলে মোহাবিষ্ট হয়ে আছ। তোমাদের শাসকরা তোমাদের বলে, তোমরা হীন, পরাধীন, শক্তিহীন এবং তোমরাও তাই সত্যি বলে ভাব। আমার দেহটাও এই দেশের মাটিতেই তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমি নিজেকে ঐরকম ভাবতে শিখিনি। তাই যারা আমাদের অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, তারাই আজ আমাকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করছে। এখন চাই শাণিত কৃপাণ আর মরণপণ সংগ্রাম।)

জীবিতকালেও স্বামীজীর প্রতি শ্যেন দৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের। বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা হতো তাঁর গতিবিধির উপর। নিয়মিত খোলা হতো তাঁর চিঠিপত্রও। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর লেখা নিয়ে গোয়েন্দারা কত চিন্তিত ছিলেন, গোপন সরকারি ফাইলে তার কিছু কিছু তথ্য আছে। পরবর্তী কালে যখন বিপ্লবীরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে ওঠে আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেস বা গোপন সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার। স্বাধীন মত প্রকাশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সেন্সরের লালফিতার বাঁধন যতই কঠিন হয়েছে, জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন গোপন পত্র-পত্রিকা। এককালে এইসব গোপন পত্র-পত্রিকা প্রেরণা পেয়েছে স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতা থেকে। গোপন সরকারি ফাইলে আমলা, গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্তাদের নোটে, রিপোর্টে সে-তথ্য পাই।

শিকাগোর বিশ্বজয়ের পর স্বামীজী দেশে ফিরলে কলকাতায় তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ খ্রীঃ) জানানো হয়, তার উত্তরে কলকাতাবাসী যুবকদের উদ্দেশে তিনি এগিয়ে চলার যে উদাত্ত আহ্বান জানান, তা পরে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে গোপন পত্র-পত্রিকার উদ্যোক্তাদের। জবরদস্ত পুলিশ কর্তা টেগার্টের রিপোর্টে তা আছে। তিনি লিখেছেন :

"In reply to an address of welcome presented to him at his arrival in Calcutta ··· Swami Vivekananda urged hearers to wake up. 'Awake' he cried, 'arise and stop not till the desired end is reached.'"

(কলকাতায় আসার পর তাঁকে যে স্বাগত অভিভাষণ জানানো হয় তার উত্তরে স্বামী বিবেকা-নন্দ তাঁর শ্রোতাদের জাগ্রত হবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'ওঠ জাগ, এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থেম না।')

স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল স্বামীজীর ঐ ভাষণে। বিপ্লবীদের গোপন পত্র-পত্রিকার শীর্ষে থাকত স্বামীজীর ঐ ভাষণের উদ্ধৃতি। এ-সম্পর্কে টেগার্টের মন্তব্য :

"It might be noted that the highly revolutionary 'Liberty' leaflets which have been circulated, broadcast over the greater part of India during the last year, commence with the watch-word of Vivekananda—'Arise, awake and stop not till the goal is reached'; (Tegart Report. 22. 4. 1914)

(প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষের বৃহত্তর অঞ্চলে গত বছর বহুল প্রচারিত বিপ্লবী প্রচার-পুস্তিকা 'লিবার্টি'র শুরুতে থাকত বিবেকানন্দের মন্ত্রবাণী : "ওঠ, জাগ এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থেম না।")

ভারতের সেই প্রথম সন্ন্যাসী-সাংবাদিক স্বামী বিবেকানন্দ আজও আমাদের প্রেরণা দিচ্ছেন। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজও দেশে-বিদেশে বের হচ্ছে কত পত্র-পত্রিকা।

রিলিজিয়ন, ধর্ম ও বিপ্লব

তরুণ সান্যাল

প্রচলিত অর্থে ইংরেজী 'রিলিজিয়ন'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ 'ধর্ম'। আমরা ইউরোপীয় রিলিজিয়ন বিষয়ে পঠন-পাঠনজাত অভিজ্ঞতা ও বহু পণ্ডিতের মূল্যায়ন 'ধর্মের' ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে থাকি। বলা-বাহুল্য, সে-মূল্যায়নের মধ্যে অনেকখানিই ফাঁক রয়েছে। আমাদের বিচারে রিলিজিয়ন ও ধর্ম কখনও এক নয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও 'রিলিজিয়ন শব্দটি এসেছে religare ক্রিয়া থেকে, এবং তার আদি অর্থ বন্ধন।' ধর্ম শব্দটির শিকড়ে আছে ধৃ-ধাতু (ধারণ যেখান থেকে উদ্ভূত)। 'বন্ধন' ও 'ধারণের' মধ্যে অর্থ ও ব্যঞ্জনাগত ব্যবধান অবশ্যই লক্ষণীয়।

রিলিজিয়নে অন্ততঃ পাঁচটি স্তর পরম্পরা থাকে। যেমন বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বা কসমোলজি, পুরাণ বা মিথলজি, ধর্মতত্ত্ব বা থিয়লজি, উপাসনা বা প্রেয়ার এবং আচার-অনুষ্ঠান বা রিচুয়্যালস। বৌদ্ধ রিলিজিয়ন বাদ দিলে, অন্যান্য সব রিলিজিয়নের কেন্দ্রে ঈশ্বর বিরাজ করেন এবং থাকে স্বর্গ। মার্কসের 'হেগেলের আইনের দর্শনের পর্যালোচনায় প্রদত্ত রচনা'-র মূল্যায়ন প্রসঙ্গতঃ গ্রাহ্য হবার কথা। বাস্তব জীবনে নানা নিপীড়নের আক্রমণে পর্যুদস্ত মানুষ স্বর্গে সব নিপীড়ন মুক্ত সুখের কল্পনা করে। বাস্তব জীবনের বিপ্রতীপে এক ওল্টানো জীবন সে পরলোকে সন্ধান করে। মার্কসের ভাষায়ঃ "যে মানুষ হয় নিজেকে এখনও খুঁজে পায়নি কিংবা নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই, রিলিজিয়ন হল তার আত্মচেতনা এবং আত্মসম্মান। কিন্তু মানুষ তো জগতের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে-থাকা কোন বিমূর্ত সত্তা নয়। মানুষ হল মানুষের জগৎ, রাষ্ট্র, সমাজ। এই রাষ্ট্র, এই সমাজই সৃষ্টি করে রিলিজিয়ন, একটা ওল্টানো জগৎ-চেতনা, কেননা সেগুলি হল একটা ওল্টানো জগৎ। রিলিজিয়ন হল সেই জগতের সাধারণ তত্ত্ব, এর সর্বব্যাপী সংক্ষিপ্তসার। জনবোধ্যরূপে এর যৌক্তিকতা, এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা, এর উদ্দীপনা, এর নৈতিক প্রেরণা, এর আনুষ্ঠানিক পূরক, এর সান্ত্বনা আর ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সর্বব্যাপী উৎস। এটা হল মানব সারমর্মের উদ্ভট বাস্তবায়ন। তাই রিলি-জিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল রিলিজিয়ন যে-জগতের আধ্যাত্মিক সৌরভ সেটার বিরুদ্ধে পরোক্ষে লড়াই। … রিলিজিয়ন ক্লেশ হল একই বাস্তব ক্লেশের অভি-ব্যক্তি এবং বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। রিলিজয়ন হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়-হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হল আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা। রিলিজিয়ন হল জনগণের জন্য আফিং।"

আমাদের নিত্য আলোচনায় মার্কসের ঐ 'আফিং' শব্দটি এত ঘন ঘন উচ্চারিত হয় যে, মার্কস কি অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, আমরা তা ভুলতে বসি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দোর্দণ্ড প্রতা-পান্বিত শাসক-শোষক শক্তি যে উৎপাদন-সম্পর্ক, শোষণ-ব্যবস্থা এবং সমাজ-শাসন চালু রাখে, সেই বাস্তব পৃথিবীতে যেখানে সুখ নেই, শান্তি নেই, তারই বিপ্রতীপে কল্পিত স্বর্গের সাধনা ঐ রিলিজিয়নের অন্তর্গত। তাই মার্কসের রিলিজিয়ন বিরোধিতা বা "রিলিজিয়ন-সমালোচনা হল রিলি-জিয়ন যার জ্যোতির্মণ্ডল সেই অশ্রুউপত্যকার (এই পার্থিব জীবনের) সমালোচনার সূত্রপাত।"

কিন্তু ধর্ম বলতে কি রিলিজিয়ন বুঝব? যে কোনও বস্তুর অন্তর্গত স্বভাবই তো তার ধর্ম। জলের ধর্ম যেমন তার তারল্য, উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত হওয়া, ইত্যাদি মানুষেরও তেমনি ধর্ম আছে। যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় 'মানুষের ধর্ম'। সে-ধর্ম জড়ের ধর্ম, মনুষ্যেতর জীবের ধর্ম প্রভৃতি থেকে আলাদা। যে-কোন মানুষেরই প্রবৃত্তিগত জীবধর্ম রয়েছে, অশন-বসন-পোষণের, আশ্রয়ের এবং প্রজননের। এসব জড়িয়ে মানুষের যে বিষয়বুদ্ধি, তা সার্থকতা খোঁজে ব্যক্তিগত বৈষয়িকতায়। ঐ ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার যোগফল মিলেই গড়ে ওঠে মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্কগুলি, যা মানুষের সমাজজীবনের অর্থ-

নৈতিক ভিত্তি। ঐ অর্থনৈতিক ভিত্তি জন্ম দেয় তার সমাজসত্তা, 'সোশ্যাল বীইং'-এর। সেই সোশ্যাল বীইং-কে মেনে নিয়েও, "স্বার্থ আমাদের যেসব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে, যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঐ মানুষের ধর্মও সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়। "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।" উপনিষদের শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন তিন বিযুক্তি মানুষের। প্রকৃতির অন্ধ শক্তির কাছে, বিষম সমাজের পীড়নের কাছে, এমনকি অন্তর্গত অনাবিষ্কৃত হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট মানবের কাছে। "ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া।" ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি থেকে না হয় বলা যাবে, মানুষকে যা ধরে থাকে তা-ই তার ধর্ম। ধর্ম সে-অর্থে একেবারেই রিলিজিয়ন নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' নিয়ে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতার নাম দিয়েছিলেন রিলিজিয়ন অব ম্যান। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও বহুক্ষেত্রে ইংরেজী রচনায় ধর্মের প্রতিশব্দ রিলিজিয়নই ব্যবহার করেছেন। তবু দুজনেই রিলিজিয়ন ও ধর্মকে আলাদাই দেখেছেন।

আসলে পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত তিনটি রিলিজিয়ন—ইহুদি, খ্রীষ্টান ও ইসলামকেই পশ্চিমী পণ্ডিতেরা দীর্ঘদিন ধরে জানতেন। এবং এই তিনটি রিলিজিয়নেরই বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব অতি কাছাকাছি, এমনকি তাদের মিথলজির ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশও—ঐ তিন রিলিজিয়নের উত্তরাধিকারী। ভারতেও একাধিক রিলিজিয়ন ছিল (এবং আছে)। যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য। সম্ভবতঃ একই ধারায় শিখ, জৈন প্রভৃতিও। সিস্টার নিবেদিতার মতে এমনকি বৌদ্ধধর্মও। এরা সকলেই ঈশ্বরবাদীও। তবে, এগুলি ছাড়া কট্টর বৈদান্তিকদের রিলিজিয়নে বিশ্বাসী বলা যাবে কিনা, জানি না। তবে বেদান্তবাদীদের মধ্যে অনেকে লোকপ্রয়োজনে রিলিজিয়নের সদর্থক ভূমিকা অস্বীকার করেন না, নিজেরা সর্বশেষ বিচারে কোন আনুষ্ঠানিক রিলিজিয়নে বিশ্বাসী না হয়েও। স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা তাঁর বিপ্লবী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কি সত্যিই কোন আনুষ্ঠানিক রিলিজিয়নে বিশ্বাসী ছিলেন? বরং তাঁরা লোকসাধারণের জন্য 'যত মত তত পথে'র কথা বলেছিলেন। আমাদের দেশে ধর্ম ও রিলিজিয়ন—যে প্রায় লোক-লবজে বদলাবদলি করে ব্যবহার করা হয়, সেই তাৎপর্যে আমরা বহু ক্ষেত্রেই 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করি রিলিজিয়নকে মনে রেখে। কিন্তু আমাদের দেশে ধ্রুপদী সঙ্গীত, নৃত্য, কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য—রিলিজিয়নকে ছাড়িয়ে ধর্মকেই আশ্রয় করেছে। এই ধর্মের কথা মনে পড়লেই, সর্বজীবে পরমব্রহ্মের প্রকাশ আমাদের মনে পড়বে। রিলিজিয়নের অভিধায় বলতে গেলে তা হয়ে যাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'যত্র জীব তত্র শিব'। বলা বাহুল্য, রিলিজিয়নে যেহেতু পুরোহিতপ্রথা আছে, পুরোহিতপ্রথায় সামাজিক উদ্বৃত্তভোগী অনুৎপাদক সম্প্রদায়ও দেখা যায়। ফলে শাসককুল পুরোহিততন্ত্রকে অবশ্যই নিজ শ্রেণীস্বার্থে কাজে লাগাতেই পারে। প্রতিটি ভারতীয় রিলিজিয়নে বৈকুণ্ঠ বা শিবধামে (যা প্যারাডাইস বা বেহেস্তের ভারতীয় সংস্করণ) বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা-দুঃখহীন পরমশান্তির সম্ভাবনার কথা বলা হয়। ইহ-জীবনের দুঃখযন্ত্রণার নিরাকরণ আছে যেন রিলিজিয়স পুণ্যাত্মাদের ঐসব স্বর্গলোকে। স্বামী বিবেকানন্দ কি এমন কোন পরজন্মের সুখের কথা বলেছিলেন? যে নন্দনলোক দুঃখদীর্ণ বাস্তব পৃথিবীর উল্টো প্রতিচ্ছবি? নাকি তিনি এই ইহলোকেই সুস্থ ও নন্দিত জীবন কামনা করেছিলেন? নিজেকে যে জন্য 'সমাজতন্ত্রী' বলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

ভারতে ধর্মের পাশাপাশি যেমন একাধিক রিলিজিয়ন রয়েছে, যাদের সমষ্টি করে চলতি কথায় 'হিন্দু' ধর্ম বলা হয়—এদের মধ্যে রিলিজিয়নগুলি বর্তমানে বেশ মেশামেশি হয়ে পড়েছে বটে, তবে ধর্মের ভাবও একেবারে বর্জিত নয়। তবে প্রায়শই দেখা যায়, রিলিজিয়নের অংশটুকু ব্যবহার করে

একদল মানুষ অন্য অংশকে, ধর্মের অংশকে দুর্বল করে রাখে। তারা তাদের প্রচারের মাধ্যমে শোষককুলকে সেবা করাই জীবনের সারাৎসার বলে মানুষকে বোঝায়। এভাবে অন্ধ আনুগত্যের অন্ধতাভিত্তিক মৌলবাদের তারা উদ্ভব ঘটায়। এমনকি রাষ্ট্রকেও বশ্য করে নেয় সেই মৌলবাদের কেষ্ট-বিষ্টুরা। আমাদের দেশেও 'হিন্দু' অভিধাভিত্তিক একদল রিলিজিয়নপন্থী ঐসব কিতাবীদের মতো মৌলবাদের প্রশ্রয় দেয়। এদেশেও যেমন ধার্মিকদের সঙ্গে মৌলবাদী রিলিজিয়স সংকীর্ণতাবাদীদের বিরোধ আছে, আছে পশ্চিমী দেশগুলিতেও, আরব-পারস্য-লাতিন আমেরিকা-আফ্রিকাতেও। লাতিন আমেরিকায় বহু বিপ্লবী ধর্মগুরু খ্রীষ্টীয় রিলিজিয়নের ধর্মভিত্তিক মানবিক অংশকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তাঁদের ধর্মতত্ত্ব বা থিয়লজিকে কেউ কেউ নাম দিয়েছেন লিবারেশন থিয়লজি। বলতে দ্বিধা নেই, ভারতে লিবারেশন থিয়লজির তাত্ত্বিক রামকৃষ্ণদেব এবং প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ।

মার্কস এঙ্গেলস বা লেনিন 'ধর্ম' নিয়ে কোন কথা তোলেননি। তুলেছিলেন 'রিলিজিয়ন' নিয়ে। নিপীড়িত জনগণের উপরে শাসকশ্রেণীর দুর্মর পীড়নের উপাদান এবং ভাবলোককে নিশ্চেষ্ট রাখার উপকরণ রিলিজিয়নকে নিয়েই মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠার প্রথমাবধিই তীব্র সমালোচনা। আমরা একটু খতিয়ে দেখলে বুঝব যে ভারতের ভক্তি আন্দোলনের যুগও ছিল তৎকালীন চলতি রিলিজিয়নগুলির সমালোচনা, কিন্তু সে-ভক্তি আন্দোলন আবার পতনের পর্বে রিলিজিয়নকেই ফিরিয়ে এনেছিল। আমাদের দেশে গত শতকের বহুবিধ সমাজকল্যাণমূলক আন্দোলন এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামও (ওয়াহাবি-ফরাইজী-সাঁওতাল) রিলিজিয়নকে হাতিয়ার করে ধর্মে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে। ব্রাহ্মরা কিন্তু রিলিজিয়নেই ফিরেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জাতিকে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন ধর্মে। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই পুরনো উদ্ভিদপ্রতিম গ্রামসমাজভিত্তিক রিলিজিয়নের বিপ্রতীপে মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ের মধ্যেই ছিল মার্কস-কথিত ঐ 'রিলিজিয়নের সমালোচনা।' অবশ্য ভারতে রিলিজিয়ন ছিল বিস্তৃত মধ্যযুগ জুড়ে কেবল প্রথারই অনুসরণ। মানবমুখীন সৌভ্রাতৃত্ব এবং নিপীড়িত মানুষের ঐক্য ধরা পড়েছিল ভক্তি আন্দোলনের মানব অন্বেষণে, 'মনের মানুষ' খোঁজার মধ্যে। সে ছিল 'ধর্ম' বোধে উজ্জীবনের দিক।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আদি অধ্যায়ের ব্রাহ্মণ-শাসন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: রাজশক্তি পর্যন্ত এই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিল। কেন? তার উত্তর—নিসর্গ-প্রকৃতি আদিম মানবের পক্ষে ভয় ও রহস্যের বস্তু—সেই নৈসর্গিক জগতের তত্ত্ব ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি বলে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন! সে-কারণে তাঁরা অন্য সকলের সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র, তারকা, মেঘ-বৃষ্টি, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে বিভিন্ন দেবতার নাম দিয়ে ব্রাহ্মণেরা অপর সকলকে বলেছিলেন—ঐ দেবতারা ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞের আহুতি গ্রহণে উৎসুক। অর্থহীন আচার ও সংস্কারের প্রবর্তন ও সংরক্ষণের চেষ্টা তাঁরা করেছেন, অবিরত অপরের নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন, যে-কোন নতুনভাবের বিরোধিতা করেছেন। পরবর্তী ক্ষত্রিয়-শাসনে ক্ষত্রিয়রা প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত ভক্ষ্য মনে করতেন। তাঁরা অনেক সময়েই স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, শোষণকারী ও বিলাসী। আর বৈশ্য-শাসন সবকিছুই টাকায় কিনে নেয়। ব্রাহ্মণের তপ-জপ-বিদ্যা-বুদ্ধি, এবং ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র-শস্ত্র-তেজ-বীর্য সবই বৈশ্য অর্থের বলে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আসলে এই সব শোষণ শাসনের অন্যতম বাহন, প্রতিটি যুগের শাসক শক্তির হাতের অস্ত্র ঐ রিলিজিয়ন। কিন্তু ধর্ম এ থেকে আলাদা। স্বামী বিবেকানন্দের মতে: ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছে—কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা। যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্ব যত বেশি পরিমাণে কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত, তিনি তত মহৎ। শেষে সকলকেই ঐ তত্ত্বের পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে

হবে। ধর্ম এছাড়া আর কিছুই নয়। এই একত্ব অনুভব বা প্রেমই এর সাধন। সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পুরাতন ধারণাগুলি কুসংস্কারমাত্র। বর্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কেন? পাশেই যখন জীবন ও সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে তখন আর তৃষ্ণার্তদের নর্দমার জল খাওয়ানো কেন? ···জড়বাদীরাও বলেন, একটি বই বস্তু নেই। তারা সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে জড় নামে অভিহিত করেন। আমি তাকেই ঈশ্বর বলি। এই উক্তিটির নির্গলিতার্থ নিলে ঐ "নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পুরাতন ধারণাগুলি" যা কুসংস্কার মাত্র, যে "অর্থহীন আচার সংস্কার" ইত্যাদি যা নূতনকে বিরোধিতা করে, যে-দৃষ্টিভঙ্গি প্রজাদের 'ন্যায়সঙ্গত ভক্ষ্য' মনে করে, ঐ বৈশ্য তার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে—এসব নিয়েই রিলিজিয়ন। তবে সে-রিলিজিয়ন জনগণের কাছে 'আফিং' বইতো কিছু নয়। আর ঐ রিলিজিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই মানেইতো শোষণভিত্তিক শ্রেণী-সম্পর্কগুলির অবসানের জন্যই সংগ্রাম। অর্থাৎ সমাজবিপ্লবের কাজ। স্বামীজী তো সেকথাই বলেছেন। তাই তিনি বলেছেন, ভারতে রিলিজিয়নে অবিশ্বাসী, নাস্তিকও ধার্মিক হতে পারেন। আবার রিলিজিয়নে প্রবল বিশ্বাসী পরম আস্তিকও জীবনে আচরণীয় ত্যাগ, প্রেম ও মানব হিতৈষণার অভাবে ধর্মহীন পাষন্ড বলেও পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে বা ঈশ্বর ব্যতিরেকেও ধর্মের অস্তিত্ব থাকে। ধর্মের কিছু অংশ প্রথায় পরিবর্তন ঘটিয়ে রিলিজিয়নের অঙ্গ করা যায়। আবার রিলিজিয়নের মধ্যে মানবমুখীন যে অংশটুকু রয়েছে, নিপীড়িতের দীর্ঘশ্বাসকে উত্তীর্ণ করে বাস্তব বিশ্ব মানবমুক্তিতে যা কার্যকর করা যায়, তা ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করে। যখন ধর্মের গ্লানির উদ্ভব ঘটে, অধর্মের উত্থান ঘটে, পীড়নের জগৎ বিস্তৃত হয়, তখনই সমাজে সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় 'ধর্ম-সংস্থাপনার'। এবং এজন্য যুগে যুগে যুগাবতারদের উত্থান ঘটে। আর তথাকথিত ধর্মের অর্থাৎ রিলিজিয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুগাবতারগণ পরম বিপ্লবী ছাড়া কিছুই নন।

আজকের বিশ্ব-প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের রিলিজিয়নে বিশ্বাসী মানুষেরা, ধর্মের অংশটুকু উর্ধ্বে তুলেই শোষণ ও ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ছেন। তা সে মার্টিন লুথার কিং-এর অনুসরণেই হোক বা আফ্রিকার 'কালো খ্রীষ্ট' আন্দোলনের মধ্য দিয়েই হোক। নিছক রিলিজিয়ন যে মানুষকে ভ্রাতৃ-ভাবাপন্ন করে না, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ 'খ্রীষ্টান' শাসন থেকেই তা বোঝা যাবে। বোঝা যাবে, প্যালেস্টাইনে আরববিরোধী ইহুদী-রিলিজিয়ন অনুসারী রাষ্ট্রবাদীদের ভূমিকা থেকে। আবার খ্রীষ্টীয় রিলিজিয়নের মানববাদী ধর্মের অংশটুকু তুলে ধরে লাতিন আমেরিকার ক্যাথলিক যাযকেরাও সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে এমনকি সশস্ত্র লড়াইতেও পিছিয়ে থাকছেন না। তারা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার দাবির আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন 'ধর্ম'-বিশ্বাসীরা। আস্তিক ও নাস্তিক 'ধর্ম' অনুসারীরা স্বভাবতই মিলতে পারেন। মিলেছেনও দেশে দেশে। এদেশে পাছে মিল হয় এজন্য একদল অন্ধ কুসংস্কারবাদী তথাকথিত রিলিজিয়নে বিশ্বাসী ধর্ম ও রিলিজিয়নকে এক অর্থে নিষ্পন্ন করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিপ্লবীদের বিরোধিতা করে। কেননা ঐ বিপ্লবীরা 'ধর্মকে আফিং' ঘোষণা করেছে, সুতরাং তাদের সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য। আমাদের দেশেও একদল মার্কসবাদে স্বঘোষিত বিশ্বাসী আছেন, যাঁরা একই ভাবে ধর্ম ও রিলিজিয়নকে একার্থ করে যে-কোন ভাবে ধর্ম নামটারও বিরোধিতা করেন। তাঁরা ভারতীয় ইতিহাসের ধারাটিকেই বোঝেননি। ভারতেও শ্রেণীদ্বন্দ্ব রিলিজিয়ন বনাম ধর্মের দ্বন্দ্ব রূপ নিয়েছে যুগে যুগে আচরণে ও ভাবাদর্শের জগতে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ইতিহাসকে বুঝেছিলেন। তার ব্যাখ্যাও করেছিলেন। আধুনিক ভারতের প্রধান ধর্মপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের নিজেকে 'সোশ্যালিস্ট' ঘোষণার তাৎপর্য আমাদের দেশের জাতপাতবাদী ও মৌলবাদীদের, নানা রিলিজিয়নের অনুসারীদের বুঝতে ভুল হয়নি। তাই তাঁর ব্যাখ্যাকে তাঁরাও সামনে আনতে চান না নিজ স্বার্থেই। আবার মার্কসপন্থী বিপ্লবীরাও একপেশে ধারণার ফলে, ভারতে ধর্মের ভূমিকাকে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করতে পারছেন না।



অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বিজয়া

২৮শে আশ্বিন, ১৩০৬ সাল

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

মায়ের পূজা শেষ হইল; মা স্বস্থানে যাত্রা করিবেন।—"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ" ॥ মা। মহাদেব যেখানে আছেন এমন শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করুন। আমাকে কৃপা করিতে কিন্তু ভুলিবেন না; শীঘ্রই আবার আসিবেন।

মা বাড়ি আলো করে ছিলেন। কত গমগমে ছিল, কত জাঁক জমক ছিল, কতই আনন্দোৎসব হতেছিল। আজ ঘর আঁধার করে, মন আঁধার করে চলে গেলেন। মাকে পাঠাইয়া, মাকে পেঁছিয়া দিয়া আসিয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি—চারিদিক ফাঁকা; সকলেই বিমর্ষ; কেহ কেহ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন; কেহ কেহ বসে কাঁদিতে-ছেন। শোকে সকলেই কাতর; কেবল বাটীর লোক নয়,—আত্মীয়-বন্ধুগণ, পাড়াপড়শীগণ, অতিথি-অভ্যাগতগণ, অপরাপর লোকজন—সকলেই শোক-তপ্ত। মা। আবার কবে আসবে? মা, অন্তরের সহিত ভক্তিভরে যেন তোমায় ডাকতে পারি।

ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সেই ছেলেবেলাকার 'মা' বলাও ভুলে গেছি।—মা। "কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখন নয়"; ছেলেবেলায় যেমন গর্ভধারিণীর বেশে আমায় কোলে নিতে, সেইরূপ আবার একবার কোলে নাও মা। আবার একবার সেইরূপ স্নেহভরে ছেলের পানে চাও মা। 'মা' বলে ডাকতে যে একেবারে ভুলে গেছি ॥ সেইরূপ স্নেহময়ী মা'র বেশে সম্মুখে দাঁড়াও—আবার 'মা' বলতে শিখাও মা। মা, তুমি না দয়া করলে, কে করবে? তুমি না শিখালে কে শিখাবে মা? আহা। 'মা' কি মধুমাখা নাম। এ নাম সাধ মিটিয়ে নিতে পারলুম না। ছেলেবেলায় যেমন গর্ভ-ধারিণীকে অন্তরের সহিত 'মা' বলে ডাকতে পারতুম তেমনি প্রাণের সহিত যেন তোমায় ডাকতে পারি।

মা। তোমায় যেমন ভক্তি করব মনে করছি তেমনি করে যেন সকলকেই ভক্তি করতে পারি। তেমনি নির্মল চোখে যেন সকলকেই দেখতে পারি। মনের মালিন্য হতে যেন রক্ষা পাই।

মা আসতে গেছেন; আর ভেবে কি হবে বলুন? মা মঙ্গল করবেন; সকলে একত্রিত হউন; শান্তিজল গ্রহণ করুন,—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।"

"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সংকর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চা-নিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভ-গবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনা-ধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা। কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।… এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ-সিদ্ধয়ে।"—

ইন্দ্রাদি দেবগণ মঙ্গল করুন। বৃহস্পতি প্রভৃতি শুভ হউন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যম, বরুণ, পবন ধনরাজ কুবের প্রভৃতি সকলে এই মন্ত্রপূত বারি প্রক্ষেপ করিতেছেন। কীর্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, মেধা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বুদ্ধি. লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি প্রভৃতি মাতৃকাগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁরাও আমাদিগের ধর্মাদিচতুর্বর্গ-সিদ্ধির জন্য শিরোপরি শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। সর্বতোভাবে মঙ্গল হউক। ওঁ স্বস্তু, ওঁ স্বস্তু, ওঁ স্বস্তু।

মা ব্রহ্মময়ী এসেছিলেন,—বাটী পবিত্র করে গেছেন, দেশ পবিত্র করে গেছেন, আমাদিগের সকলকেই পবিত্র করে গেছেন। তাঁহার স্পৃষ্ট বারি আমাদিগের গাত্রে পড়িয়াছে। সকলে ধন্য হইয়া গিয়াছি। আমাদিগের আত্মীয়-বন্ধুবর্গ, পাঠক ও গ্রাহকবর্গ, দেশের যাবতীয় লোক, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, সকলকারই মঙ্গল হউক; শ্রীবৃদ্ধি হউক; বুদ্ধিবৃত্তি

সৎ হউক ; সকলে সর্বতোভাবে শান্তিলাভ করুন ; ধরা স্বর্গধাম হউক ; বলিতে যেন পারি—আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান।

মা এসেছিলেন।—মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করে সকলকার মন পবিত্র হয়ে গেছে। হৃদয়ে স্নেহময়ীর ছায়া পড়ে আজ আমাদের কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়েছে। মা আবার আসতে গেছেন ; তাই আজ বিজয়া। বি—বিশেষ, জি ধাতু জয় করা। হৃদয় দিয়া জয় কর। আজ আমাদের বিজয়োৎসব। মন দিয়া মন হরণ কর ; প্রাণ দিয়া প্রাণ ক্রয় কর। দাও ; উপযাচক হইয়া দাও।—যাও লোকের বাড়ি বাড়ি ; ঘরে ঘরে ফেরো ; বন্ধু বলে, ভাই বলে—সহোদর ভাই বলে —আলিঙ্গন কর। আমাদের মা এসেছিলেন,— জেনেছি সকলকারই সেই একই মা ; আমরা সেই একই মার সন্তান। যে-সে মা নয়,—ব্রহ্মময়ী। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান। খোলো—চোখ খুলে দেখ ; স্পষ্ট করে দেখ ;—অন্তরে কে সজল নয়নে বসে আছেন।—আমাদের আনন্দময়ী মা—স্নেহময়ী জননী। দৃষ্টি বিস্তার কর ; আর একটু বিস্তার কর ; দেখ—সেই মা'ই সকলকারই ভিতর বিরাজ করছেন। মার কাছে ছোট বড় নাই ; ভাল মন্দ নাই ; কাওরা হাড়ি নাই ; হিন্দু-মুসলমান নাই। মা যে আমাদের ব্রহ্মময়ী—মার কাছে সব ছেলেই সমান। ছাড়ো—লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ; ছাড়ো দ্বেষ-বুদ্ধি ; আত্মাভিমান—বৃথা অহংকার ; "ছাড়ো মোহ মায়া"—নির্মল চোখে দেখ ; "নয়ন মিলিয়ে দেখ"— হাড়ি ডোম চন্ডাল, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, ছোট বড়, সকলকারই ভিতরে সেই একই মা। বাহিরে দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন পিষ্টক—"ভিতরে সেই একই পুর।" যাও "উদ্বোধন,"—গ্রাহক পাঠক, আত্মীয় অনাত্মীয় ; পরিচিত, অপরিচিত, ছোট বড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, হিন্দু মুসলমান— সকলকার নিকট নতমস্তকে যাও ; নির্মল অন্তঃকরণে যাও। যাও, সকলে যাও।—পূজনীয় ব্যক্তির পূজা কর ; স্নেহের যিনি—স্নেহ কর ; ভালবাসার— ভালবাস। বন্ধন ছিন্ন কর ; অর্গল খুলিয়া দাও ; হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন কর। তোমার হৃদয়ের প্রেম, লোকের চরণে দাও ; লোকের হস্তে দাও, লোকের হৃদয়ে দাও। দাও,—দাও ও গ্রহণ কর ; আজ আমাদের আনন্দোৎসব—হৃদয়ের উৎসব।—হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাও ; প্রাণ ভরে মিলাও ; নির্মল অন্তঃকরণে মিলাও ; সহৃদয়তার পরম শান্তি উপভোগ কর।

সকলকার সঙ্গে, ডেকে, অন্তরের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ কর। আমরা সবে সেই ব্রহ্মময়ীর সন্তান ; সকলকার সহিত মিষ্টিমুখ কর ; অমৃত পান কর ; আমাদের মা ব্রহ্মময়ী নিজ বক্ষঃস্থল হতে যে অমৃত নিঃসরণ করছেন, সেই অমৃত পান কর। অন্তরে আর কোনরকম মলিন ভাব পোষণ করো না। মা'র ছায়া আর তা হলে হৃদয়ে পড়বে না—মাকে আর দেখতে পাবে না। অমর হতে পারবে না ; ব্রহ্মময়ীর অমৃত ধনে আর অধিকারী হতে পারবে না। আসুন সকলে ; দিগ্‌দিগন্তর হতে আসুন ; আজ আমাদের বিজয়া ; আজ ভারতে সম্মিলনের দিন ভারতবাসী যে যেখানে থাকুন, আজ সকলে এক হৃদয় এক আত্মা হউন ; এমন সুযোগ আর হবে না। শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর, নীচ উচ্চ, ভেদাভেদ, যেন আজ কাহারও ভিতর না থাকে ; কোন প্রকার রাগ দ্বেষ যেন কেহ পোষণ না করেন ; হৃদয় নির্মল হউক ; আজ ভারতবাসী সকলে, হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরে অন্তরে, এক হউন ; এমন সুদিন আর পাব না।

আজ বিজয়া। এই দিনে ভারতের রাজগণ যুদ্ধ-যাত্রা করে থাকেন। আসুন ভারতবাসিগণ। সকলে মিলে আজ আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। আমাদিগের চতুর্দিকে রিপু। ঘরে বাহিরে শত্রু। অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়—সকলেই বিপক্ষ। সমগ্র ভারত দুর্গা-নাম জপ করে এই মহৎযুদ্ধে কৃতসংকল্প হউন। আজ বিজয়ার দিন, দুর্গানাম লইয়া রণযাত্রা করুন ; আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধ-মনোরথ হইব। বালক যুবা বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ সন্ন্যাসী, জ্ঞানী বা কর্মী, সকলেই নিজ নিজ শত্রু-দমনে তৎপর হউন।

মহাশক্তির উপাসনা করিয়াছি। অনন্তশক্তিমতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ; নিশ্চয়ই আমরা রিপুজয়ী হইব। প্রাণ ভরে শক্তির পূজা যদি করে থাকি, নিশ্চয়ই আমরা শক্তিমান হইব, সংসারক্ষেত্রে জয়ী হইব। মাকে যদি সত্য হৃদয়ের সহিত আরাধনা করে থাকি, চতুবর্গ অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ 'পরমার্থ', তাহাও লাভ করিব সন্দেহ নাই।*

উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭৮-৫৮১

কৃষ্ণচিন্তায় নব-জাগরণ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য

দিলীপকুমার দত্ত

[পূর্বানুবৃত্তি : ভাদ্র, ১৩৯৫ সংখ্যার পর]

॥ ৪ ॥

জাতির নবজাগরণের যুগে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এই নবোজ্জীবিত চিন্তাভাবনা বঙ্কিমের সমকালেই স্বতন্ত্রভাবে মহৎ আবেগে-অনুপ্রেরণায় কবি নবীন চন্দ্রকে প্রবৃত্ত করেছিল পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণজীবন-ভিত্তিক 'ত্রয়ী' (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) মহাকাব্যের রচনায় এবং তাঁকে অতিক্রম করে সে ভাবনা 'যত্র জীব তত্র শিব'—মন্ত্রোদ্গাতা শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা-স্বরূপ শিষ্য নবজাগরণের অবিসংবাদী অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা, রচনাধারা ও কর্মোদ্যমের সম্মিলিত ক্ষেত্রে খুঁজে পেয়েছিল আপনার যথাযথ বিকাশ ও পূর্ণতা। নবীনচন্দ্রের মানসিকতায় অজস্র ভাবচিন্তার বিমিশ্র আলোড়নে তাঁর কৃষ্ণচিন্তায় বিশেষ কোন সংহতি বোধ গড়ে না উঠলেও তাঁর কৃষ্ণ পরিকল্পনার মূলে কিন্তু রয়েছে অনৈক্য বিনাশী, পতিত মানবজাতির উদ্ধারব্রতী, অসহায় জাতির নেতৃত্ব পদাধিকারী মহাভারতীয় কৃষ্ণেরই মহিমা। রাজকর্মোপলক্ষে মহাভারতের স্মৃতিবাহী রাজগৃহে অবস্থানকালে আদ্যোপান্ত মহাভারত পাঠে উপলব্ধি করেছিলেন, যার মনোরম বর্ণনা পাই 'রৈবতক' কাব্যের মুখবন্ধস্বরূপ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্রটিতে (১লা ভাদ্র, ১২৯৩ সন) : "দেখিলাম, ·· ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর—পতিত মানবজাতির—উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।"

কৃষ্ণচিন্তা কবির মানসজগতে প্রথম গভীর আন্দোড়ন তুলেছিল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে রথযাত্রার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত থাকাকালে। জগন্নাথ-দর্শনে অগণিত নরনারীর গভীর ব্যগ্রতা, আনন্দের অধীরতা, আবেগের উন্মত্ততা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি তিনটি কাব্য—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। ব্যাস-কথিত মানবের অদৃষ্টবাদকে তিনি মানতে চাননি, সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন পুরুষকারের আদর্শ। দেখেছেন —শুধু হস্তিনা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই "আর্য-ধর্মনীতি / —প্রীতিময়, প্রেমময়, শান্তিসুধাময়, / হইয়াছে পৈশাচিক যজ্ঞে পরিণত। / রাজ্যভেদ, গৃহভেদ, জাতিভেদ"। ভারতের দুর্দশায় কৃষ্ণের যে আশঙ্কা—"বলবান কোন জাতি পশ্চিম হইতে / আসিলে ঝটিকাবেগে, নিবে উড়াইয়া / ভেদপূর্ণ আর্যজাতি তৃণরাশি মতো"[৩৩] —তা পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটকেই উজ্জ্বল করেছে। ইংরাজশাসিত ভারতেও এই ঐক্যহীন বিভেদ চেতনা ছিল একান্ত ঐতিহাসিক সত্য।

মহর্ষি ব্যাসের কাছে কৃষ্ণের এই বাসনার প্রকাশে সমকালীন জাতীয় বাসনাই যেন উচ্চারিত—"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত / এই শৈল-প্রাচীরের মধ্যে পুণ্যভূমে / এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না স্থাপিত,—/ এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"[৩৪] ব্যাসের জ্ঞানশক্তি, অর্জুনের বাহুশক্তির আশ্রয়ে সেই মহাব্রত সাধনে কৃষ্ণোপলব্ধ প্রথম সমস্যাটিই ছিল সমাজ অভ্যন্তরের অসাম্য—"একই মানব সব; একই শরীর; / একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল; / জন্ম-মৃত্যু একরূপ; তবে কি কারণ / নীচ গোপজাতি আর সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?"[৩৫] মানবের পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা-প্রতিষ্ঠায় এই সাম্যবোধের সম্প্রসারণ ছিল উনিশ শতকীয় নবজাগরণেরই মূলমন্ত্র। কৃষ্ণ এই

৩৩ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, বসুকল্যাণ্ড, ২য় সং. (১৯৬৬), পৃঃ ১৬ ৩৪ ঐ, পৃঃ ১৭
৩৫ ঐ, পৃঃ ৪৪

আভ্যন্তরীণ সমস্যার মোচন ঘটিয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন স্বধর্মসাধনে ও গীতানুপ্রাণিত নিরন্তর নিষ্কাম কর্ম-প্রেরণায়।

রৈবতকের কৃষ্ণ গোপীপ্রেমের আবেষ্টনী থেকে মুক্ত এবং গীতা-মহাভারতের শক্তিমন্ত্রে উজ্জ্বল। কবি তাঁকে স্থাপন করেছেন উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের নেতৃপদে, যিনি সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধাচরণে, মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের জাগরণে, অনৈক্যে পরিপূরিত ভারতবর্ষের ভেদ-দূরীকরণ প্রয়াসে সংহতির মন্ত্রোচ্চারণে, দেশ ও বিশ্বব্যাপী সাম্য-মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জীবনে যুগপৎ মননশীল ও কর্মব্রতী অর্জুনকে 'খণ্ড দেহ, খণ্ড দেশ ভারতের শোকাবহ চিত্র' দর্শন করিয়ে তার অখণ্ডতা-সম্পাদনে গীতারই অনুসরণে অর্জুনকে উত্তেজিত করতে চেয়েছেন শ্রেষ্ঠতর পুণ্যস্বরূপ যুদ্ধ-বাসনায়, আর সে-যুদ্ধও গীতার নিষ্কাম তত্ত্বে পরি-মার্জিত—"সমর সর্বত্র পাপ নহে ধনঞ্জয়। / রক্ষিতে দশের ধর্ম, / নহে পার্থ। পাপ কর্ম / একের বিনাশ। পার্থ। নিষ্কাম-সমর, / নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর।"[৩৬] কবি-সুলভ উপমায় গীতার (২৷৩) "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" উপদেশকে দেশবাসীর মর্মগভীরে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ: "ফুটিলে কণ্টক দেহে, / নির্গত করিতে কি হে / সে কণ্টক, আমাদের নাহি অধিকার?…শরীর-কণ্টক যাতে জান, ধনঞ্জয়। / মানব-শরীরে ব্যথা; / সমাজ শরীরে তথা / অশান্তি ও অবনতি;—জ্বলন্ত যেমন / দেখিছ সর্বত্র পার্থ। ভারতে এখন।"[৩৭] অবশ্য সেই সঙ্গে বঙ্কিমের কৃষ্ণের মতোই তাঁরও মূল লক্ষ্য যুদ্ধ নয়, শান্তি—"বাসনা আমার / চিরশান্তি; নহে সুখে। সমর দুর্বার।"[৩৮] সে শান্তির লক্ষ্য—"এক ধর্ম এক জাতি / এক রাজ্য, এক নীতি;/সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূত-হিত;/ …ধর্মরাজ্য মহাভারত…।"[৩৯]

'সর্বভূত হিত'—চিন্তাপ্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের কবি-মানসিকতায় বেন্থাম-মিল-কোমৎ প্রভৃতি মানব-কল্যাণবাদী পাশ্চাত্য সমাজ-দার্শনিকগণের অস্তিত্ব-বাদ (Positivism), উপযোগবাদ (utilitaria-nism) প্রভৃতির গভীর প্রভাবসূত্র অবশ্যই চোখে পড়বে যা কবির কৃষ্ণচিন্তায় সঞ্চারিত হয়ে কৃষ্ণের মানসিকতায়ও কিছুটা পাশ্চাত্য সমাজ-দর্শনাদর্শের সমাবেশ ঘটিয়েছে। রুসো প্রভৃতির সাম্য মৈত্রীর বাণী, হিতবাদিগণের 'সর্বাধিক মানবের সর্বাধিক মঙ্গলসাধন' চিন্তা ('greatest good of the grea-test number') প্রভৃতি অনায়াসেই মিশে গেছে। 'ত্রয়ী'র নায়কের সর্বভূত-হিত-চিন্তায়, আরও বিশেষ করে তাঁর এ-উক্তির মধ্যে—"জগতের সুখ যাহা, / আমাদের সুখ তাহা,—/ সকলে জগৎসুখে সমর্পিলে প্রাণ, / হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ-অধিষ্ঠান।/অন্যথা সকলে, পার্থ।/ সাধে যদি নিজ স্বার্থ, / কি পশুত্বে পরিণত হইবে মানব; / আজি এ ভারত তার দৃষ্টান্ত, পাণ্ডব।"[৪০] পাশ্চাত্য সমাজদর্শন-চিন্তা বঙ্কিমমানসেও প্রথমদিকে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু তাঁর উত্তর-মানসে তার সম্পূর্ণতার অভাব উপলব্ধিতে একান্ত বস্তু চেতনাবদ্ধ সে-আদর্শ পরিহার করে ভারতীয় চিন্তা-চেতনার মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন মানবমুখিতার সম্পূর্ণতার আদর্শ। কিন্তু আবেগ-তাড়িত কবি নবীন চন্দ্র দেশ-বিদেশের যেখানে যা-কিছু পেয়েছেন, সংহতি-সামঞ্জস্যের কোন চিন্তা না করেই নির্বিচারে সমস্ত কিছু গ্রহণ করেছেন, যে-কারণে তাঁর কৃষ্ণ চরিত্রের মূল পরি-কল্পনায় জীবনমুখী মহত্তর আদর্শের কোন অভাব না ঘটলেও সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরে প্রকাশিত (১৮৮৭-১৮৯৬) ও বিশ বৎসরব্যাপী পরিকল্পিত (১৮৭৭-১৮৯৬) তিনটি কাব্যের অর্ধশত সর্গে বিকশিত মহাকাব্যে অজস্র ভাবচিন্তার বিমিশ্রণে কোন কেন্দ্রীয় ঐক্য বা সামঞ্জস্যই গড়ে ওঠেনি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, মস্তিষ্কের সহিত তাঁহার কাব্যের কচিৎ যোগ ছিল।"[৪১] শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "নবীনচন্দ্র তাঁহার কল্পনার মত্ত

৩৬ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, পৃঃ ১০৭
৩৭ ঐ, ৩৮ ঐ, পৃঃ ১০৮
৩৯ ঐ, পৃঃ ১১০

৪০ ঐ, পৃঃ ১০৯
৪১ সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (১৩৫১), ৪১ খণ্ড, পৃঃ ২৬

গজকে একেবারে নিরঙ্কুশভাবে বিচরণ করিতে দিয়াছেন।”[৪২] কবি সম্পর্কে এ-ধরনের মন্তব্য মোটেই অযৌক্তিক নয়। এর ফলে 'ত্রয়ী' মহাকাব্য ও তার কৃষ্ণ কোনটিই প্রচারধর্মী আদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর জীবনবোধের সুসংহত রূপায়ণে শিল্প বা সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। সবথেকে বড় কথা —শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপ্ত ও গভীর চিন্তাধারা-প্রসূত আদর্শ মহাভারতের পরিকল্পনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতাধর্মী সংলাপেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, কৃষ্ণের জীবন-সাধনায় সেসকল পরিকল্পনা ঘটনাময় ও বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি চিন্তা ও সৃষ্টির যুগপৎ প্রকাশ সৌন্দর্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে। কবির কৃষ্ণ পরিকল্পনায় ভাব-সংহতির বিনাশে এর সঙ্গে সহায়তা দান করেছে অজস্র শাখা-কাহিনী, চরিত্রের সংখ্যাধিক্য, অজস্র ঈর্ষা-প্রেম-ষড়যন্ত্র, খণ্ডিত ও অপ্রাসঙ্গিক নানা প্রাকৃতিক-সাংসারিক-সামাজিক চিত্র-দৃশ্য-ক্রিয়াকলাপাদির সুদীর্ঘ অবাধ লিরিক-উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা, যা পরিকল্পনানুযায়ী মূল ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি পদে পদে রুদ্ধ করে খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিরিকধর্মী কাব্য-উপন্যাস-নাটক সবকিছুর বিমিশ্রতায় কোন সংহত ফলশ্রুতি দান না করে অনেকটা তথ্যবহুল প্রবন্ধধর্মী এক বিচিত্র 'হ-য-ব-র-ল' মহাকাব্যে পরিণতি দিয়েছে 'ত্রয়ী'-কে। ফলে তা আকারগত বিশাল ব্যাপ্তিলাভ করলেও কোন গভীরতা পায়নি।

কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ কৃষ্ণজীবনের মধ্য-পর্বেরও আদ্যন্ত জুড়ে 'মহাভারত' স্থাপনের পরিকল্পনা কৃষ্ণের সংলাপবন্ধই থেকেছে। এ অংশের যা মুখ্য ঘটনা, সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কাব্যে নেপথ্যেই সংঘটিত। শুধু তাই নয়, অধর্মের প্লাবন-রোধে কৃষ্ণের অসহায়তা—“কোথায় করিব ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন, / কোথায় এ অধর্মের বিপ্লব ভীষণ। / ...একাদশ দিন এই হত্যা, হাহাকার, / সহিতেছি হায়। আমি অম্লান বদনে,— / আমি যেন অবিদীর্ণ আগ্নেয় ভূধর,—। সৌম্য মূর্তি, বহে হৃদে কি গৈরিক ঝড়।”[৪৩]—কৃষ্ণ-পরিকল্পনার সুদৃঢ় ভিত্তিমূলকেই যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। কৃষ্ণের এই অসহায় আত্মসমীক্ষা থেকেই কেন্দ্রীয় ভাব-বিচ্যুতিতে কাব্যপ্রবাহের সুরে পালাবদলের সূচনা যা ক্রমে ক্রমে উপসংহারের বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের অধ্যাত্ম-পরিমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। কৃষ্ণের ভারতসুখ-পরিকল্পনার আদর্শ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে তাকে যেন অনেকটা কৃষ্ণের পরিপূরক করে তুলেছে, তবে তা গার্হস্থ্য ধর্মের আভ্যন্তরীণ সুখতত্ত্বের প্রকাশে, নারীর নিষ্কাম সেবাব্রতের আদর্শ-সম্প্রসারণে। অথচ অর্জুনের যে বীরধর্ম কুরু-ক্ষেত্রের আভ্যন্তরিক গৌরব বৃদ্ধির বড় সহায়ক হতে পারত, তা একেবারেই অনুচ্চারিত এবং অর্জুনও যেন প্রায় নেপথ্যবাসী। রৈবতকের কৃষ্ণ-সত্যভামার বঙ্গপল্লীসমাজোচিত একান্ত তরল গার্হস্থ্য-প্রণয়রস-রসিকতা 'কুরুক্ষেত্রে' উত্তরা-অভিমন্যুর প্রণয়-চাপল্যেও সঞ্চারিত হয়ে কুরুক্ষেত্রীয় রস-গাম্ভীর্যকে একেবারেই বিনষ্ট করেছে। সুভদ্রা-শৈলজা-উত্তরা-জরৎকারুর পেলব-কোমল নারীধর্ম সেবা প্রেম অন্তর্বেদনা, বাঙালী ঘরের স্নেহ প্রেম ত্যাগ ভক্তি মাতৃত্ব বাৎসল্য অশ্রুর প্রবাহ কৃষ্ণের প্রাধান্য ও তার পরিকল্পনাকে একেবারেই খর্ব করে বাঙালী-গৃহাঙ্গনের অসংখ্য বিচিত্র ভাবাবেগপূর্ণ রোমান্টিক গাথারই যেন জন্ম দিয়েছে। জনৈক সমালোচকের এ-মন্তব্যকে অতি যথার্থই বলা চলে: “কাব্য-ত্রয়ীর প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি কাব্যের মূল সূত্রটি ধরাইয়া দিয়া নেপথ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কাব্য-তরণী একবার এদিকে একবার ওদিকে ধাক্কা খাইতে খাইতে কোনক্রমে যে-লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে-লক্ষ্য কবির পরিকল্পিত নয়।”[৪৪] কুরুক্ষেত্র থেকেই বাঙালী গার্হস্থ্য জীবন-পরিবেশের অতি-চিত্রণের মধ্য দিয়ে কবির মহাকাব্য ক্রমশঃ গীতা-মহাভারতীয় নয়, ভাগবতীয় কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মহাসমুদ্রের দিকেই তার সমস্ত চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপের স্রোতোধারা সমেত ক্রমাগ্রসর হয়ে গেছে, মহাভারতের গঠন একান্ত অবহেলায় সরে দাঁড়িয়েছে।

কুরুক্ষেত্র থেকে ভাগবতীয় সুর ও রসের লক্ষ্যে 'ত্রয়ী' মহাতরণী যখন শেষ তীর্থ প্রভাস-এ উপনীত,

৪২ বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, (১৩৭২), পৃঃ ১৮১ ৪৩ ঐ, পৃঃ ১৯৭

৪৪ আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, ১ম পর্ব (১৩৭৪), পৃঃ ২৪৬

মহাভারতের সকল সচেতনতা তখন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে ভক্তিরসের এক মহা ধূলোট উৎসবের বাহ্যজ্ঞানহীনতায়। কৃষ্ণের যে মানবমহিমা কৃষ্ণ-পরিকল্পনায় কবির অভিপ্রেত ছিল, তা সর্বাংশেই ক্ষুণ্ণ হয়ে ঐশী দেবমহিমায় কৃষ্ণের অনড় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে প্রভাসে।

বহু বৎসর পূর্বে তাঁর কৃষ্ণ পরিকল্পনার প্রাথমিক স্বরূপ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে কবি আপনার বৈষ্ণবীয় প্রেম-ভক্তি-রসধ্যানকেই সর্বস্ব করে কাব্যের উপসংহার টেনেছেন প্রৌঢ় বয়সের ভক্তিরসাত্মক হৃদয়ের অনাবৃত আমূল উন্মারে—"এরূপে বসিয়া ধ্যানে, / দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে। / পাইয়াছি শোকে শান্তি ; পাইয়াছি দুঃখে সুখ। / প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র ; প্রেমে ভরিয়াছে বুক।/…গীত শেষ অপরাহ্নে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে।/ বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে। / সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী। / এই তীরে সন্ধ্যা ; উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।"[৪৫] প্রভাসের প্রায় সমগ্র অংশই কবির পরিণত বয়সের এরূপ ভক্তি আবেগময়তার ফসল, যার মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধের বৈষ্ণবীয় ভক্তি-আন্দোলনের স্পর্শ যা গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির পৌরাণিক নাটকাবলীর প্রাণ-স্বরূপ ছিল, তার গভীর প্রভাবও অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যাবে।

নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' পরিকল্পনার সমগ্র খসড়া-পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার জাজপুর থেকে লেখা এক পত্রে (২০. ১. ১৮৮৩) নবীনচন্দ্রের কবি-মানসিকতার যাথার্থ্য ও কাব্যের সমাদর সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে কবিকে সাবধান করে জানিয়েছিলেন যে, কবির পরিকল্পনা কাব্য-রচনায় যথাযথ কার্যকর হলে সে-কাব্যকে অনেকেই সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত কিংবা মহাভারতের প্যারডি হিসাবে জ্ঞান করবে : "I warn you, however, not to be too confident of success. Of popularity I cannot promise you much. If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the Nineteenth century—while others will take it to be a parody of the Mahabharat…"[৪৬] সে সাবধান-বাণী কবি যে পরিমাণে অস্বীকার করেছেন, তাঁর কৃষ্ণ-পরিকল্পনা সেই পরিমাণেই অবিন্যস্ত শৃঙ্খলায়, ভাব-বিচ্যুতিতে বঙ্কিমের সংশয়কে একান্ত সত্য করে তুলেছে। 'ত্রয়ী'র সামগ্রিক কৃষ্ণকে সুকুমার সেনের ভাষায় এক কথায় বলা চলে—"মানুষও নহেন দেবতাও নহেন—যেন একজন আধুনিক স্বপ্নবিলাসী দার্শনিক জননায়ক।"[৪৭] কৃষ্ণকে কবি নবজাগরণের মানবমুখী আদর্শে উজ্জ্বল করেই গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সংহতি ও সামঞ্জস্য বোধের অভাবে, আবেগাতুর অস্থিরচিত্ততায় ও অন্যান্য বহু কারণেই সেই ঔজ্জ্বল্যে তিনি যথাযথ প্রতিষ্ঠা দিতে পারেননি কৃষ্ণকে। তিনি রূপান্তরিত হয়ে গেছেন ভক্ত-সাধকের আরাধ্য জীবন-দেবতায়। তথাপি কৃষ্ণচিন্তায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে নবচেতনার জাগরণ ও উজ্জীবনকেও নানা পরস্পরবিরোধী ভাবচিন্তার সমন্বয় ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিরস-পরিণতি সত্ত্বেও 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের নানা অংশ থেকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

॥ ৫ ॥

শতাব্দীর শেষপাদে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম-সাধনক্ষেত্রে যদিও কৃষ্ণের গোপীবল্লভ—বৃন্দাবনের রাখালরাজ সত্তাকেই উচ্চতর আদর্শ ও গোপীপ্রেম-শিক্ষাদানকে কৃষ্ণাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান করে সেই অপূর্ব নিষ্কাম প্রেমোন্মত্ততাকে দর্শনশাস্ত্র শিরোমণি গীতারও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার কর্মময় জীবন-সাধনক্ষেত্রে বঙ্কিমের মতোই গীতা ও মহাভারতীয় আদর্শনিষ্ঠ দেশকল্যাণ ও কর্মব্রতী পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন বেশি। বরং আপনার গীতানুব্রতী নিষ্কাম কর্ম ও মানব-প্রেমাত্মক বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমে গীতা-মহাভারতীয় কৃষ্ণের সমুন্নত জীবনাদর্শকে

৪৫ আধুনিক বাংলা কাব্য, পৃঃ ৩০৪

৪৬ Bankim Rachanavali (English Works), Sahitya Samsad, 1969, p. 183

৪৭ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৫ম সং (১৩৭০), পৃঃ ৪০৭

আরও একান্ত করে উপলব্ধি করে নিতে পেরেছিলেন যা হয়তো বঙ্কিমও পারেননি। বিবেকানন্দের গদ্য-সাহিত্যে, অনুপম গদ্যসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত তাঁর বক্তৃতা বা ভাষণে, চিঠিপত্র ও আলাপচারিতায় ইতস্ততঃ অজস্র ক্ষেত্রে তাঁর সেই কৃষ্ণ-মানসিকতার উজ্জ্বল পরিচয় সঞ্চিত হয়ে আছে। বলা চলে, আপনার স্বল্পায়ু জীবনসাধন ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন বিবেকানন্দের মুখ্য প্রেরণা, অবশ্য বুদ্ধ যীশু প্রভৃতির মানব-কেন্দ্রিক সাধনাদর্শও তাঁর জীবন-সাধনায় ছিল অনেকখানিই পাথেয়। আর ভীরু দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসে-শক্তিমন্ত্রে-বলিষ্ঠতায়-সাহসিকতায় উজ্জীবিত করতে, বেশি করে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন-শক্তিমূর্তি পার্থসারথির আরাধনায়। শক্তির উদ্বোধনে মৃত্যুকে জয়ের জন্য, জীবন-সংগ্রামে অমেয় বীর্যের অধিকার অর্জনের জন্য দেশে এবং বিদেশে কৃষ্ণের যে মূর্তি তিনি প্রধানতঃ তুলে ধরেছিলেন তা ব্রজলীলার রাসরসবিলাসী কৃষ্ণ নয়, শক্তি-বীর্য পৌরুষ-মানব-ব্যক্তিত্বের আধার, গীতা-মহাভারতের পার্থসারথি কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে এই শ্রেষ্ঠত্বের বেদীতে স্থাপনের পশ্চাতে রয়েছে সন্ন্যাসীর ত্যাগাদর্শের সঙ্গে গৃহ-জীবনের পরম আদর্শের সমন্বয়। তিনি বলেছিলেন: "তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন। তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল।"[৪৮] কৃষ্ণের এই সমন্বয়ী মহিমার কথা বঙ্কিমচন্দ্রও বার বার উচ্চারণ করেছেন তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে। কৃষ্ণজীবনের পূর্ণাঙ্গ সত্যকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের চিন্তা ও উপলব্ধির সাদৃশ্য বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে, কিন্তু বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে সে-সাদৃশ্য পূর্বসূরি বঙ্কিম-অনুসরণের ফল নয়; ঈশ্বরের মতোই সত্যের মূর্তি দেশকাল-নিরপেক্ষ একই ধ্রুবসত্তায় প্রতিষ্ঠিত, ঈশ্বর-সাধনার মতোই সাধন-মার্গের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সত্যের সাধকও সেই এক লক্ষ্যবিন্দুতেই গিয়ে পৌঁছান। স্বামীজীর কৃষ্ণচিন্তার সিদ্ধিও সেই একই সত্যে উপনয়ন। নবজাগরণের উজ্জীবনকালে বিবেকানন্দ তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সকল মালিন্যমুক্ত এই স্বচ্ছ সুন্দর সত্যের সাধনায় দেশবাসী ও সমগ্র বিশ্বমানবের চিত্তোদ্বোধনে।

স্বামী বিবেকানন্দকে প্রধানতঃ বেদান্তবাদী অধ্যাত্মধর্মের আচার্যরূপেই দেখা হয়; কিন্তু তাঁর সে-অধ্যাত্মধর্মেরও মূলে রয়েছে জগৎহিতব্রতী মানবধর্মই। পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত—"ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু...ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধু" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্) মানুষ ও এই পৃথিবী সম্পর্কিত বেদান্তের ভাবনাদর্শকে স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন। তাই পৃথিবীর বাইরের কোন মহৎ আদর্শের কল্পনাকে তিনি স্বীকার করেননি। পরিণত প্রজ্ঞায় প্রকৃত ধর্ম বলে তিনি যা বুঝেছিলেন, তার মূল কথা মানুষ ও পৃথিবীর মহত্ত্ব। তাঁর সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার চিন্তা-উপলব্ধিতে সেই সত্য আদর্শেই উপনতি ঘটেছে; "যতই বয়স বাড়ছে, ততই 'মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী' হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পারছি। মুসলমানরাও তাই বলেন। আল্লা দেবদূতদের বলেছিলেন আদমকে প্রণাম করতে।... এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ—ইহাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়।"[৪৯] কৃষ্ণের কর্মধারাতেই বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন বেদান্তের জগৎ-পূজার আদর্শ। তাই দেবতা বা ঈশ্বর বলে নয়, মানবহিতৈষী জগৎ-পূজার বৈদান্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণেই কৃষ্ণ তাঁর কাছে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য: "আমি যত মানুষের কথা জানি, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল।...পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে।"[৫০] "কুরুক্ষেত্রের......অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ যেমন স্থির, গম্ভীর, শান্ত! ...এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না। যেদিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect

৪৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ১৫০

৪৯ ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ১৪৯

৫০ ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ৪২৮

(সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ)। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ— তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ। ...এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা।"[৫১] "হিন্দুধর্মের সুউচ্চ ভাবগুলি জনতার কাছে পৌঁছিয়া দিবার চেষ্টা...ভারতবর্ষে একজনই মাত্র এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, এবং সম্ভবতঃ তিনি মানব-ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"[৫২] তাই আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা এক পত্রে (২০. ৮. ১৮৯৩) স্বামী বিবেকানন্দ দরিদ্র, অজ্ঞ ও পীড়িত মানুষের প্রতি দরদ ও তাদের মহত্তর কল্যাণে সংগ্রামের দায়িত্ব যুবকদের উপর অর্পণ করে আদর্শ ও প্রেরণা হিসাবে তাদের সেই কৃষ্ণ বা পার্থসারথিরই শরণ নিতে বলেছিলেন যিনি দরিদ্র রাখালদের বন্ধু, চণ্ডালের প্রতি আলিঙ্গন দানে অসংকুচিত, মানুষকেই সর্বাধিক ভালবেসে তাদের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হন।[৫৩] মানুষকে ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষার আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন কৃষ্ণেরই কাছে এবং 'কর্মযোগ'-এ সে-শিক্ষাও দেশবাসীকে অর্পণ করতে চেয়েছেন গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে-বাণী দিয়েছিলেন জগৎকে ভালবেসে তাকে রক্ষার জন্য নিরন্তর নিঃস্বার্থ কর্মে নিযুক্ত থাকতে সে-বাণী উদ্ধৃত করে।[৫৪] স্বামীজী বলেছেন: "গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পারে না। কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন।"[৫৫]

কৃষ্ণ-জীবনানুপ্রাণিত সেই নিঃস্বার্থ কর্ম-নিযুক্তির প্রকৃত ধর্মকেই বিবেকানন্দ সঞ্চার করে দিতে চেয়েছিলেন দেশবাসীর মর্মচেতনায়। যে-ধর্ম ব্যক্তিগত মোক্ষচিন্তায় মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে, জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করতে শেখায়, কর্তব্যে-প্রেমে-মানবচিন্তায় উদ্বুদ্ধ না করে স্বার্থ-চিন্তার জন্ম দেয়, যার মধ্যে নেই কোন গঠনমূলকতার স্থান, তাকে তিনি শুধু বর্জনই নয়, সুতীব্র ঘৃণাও করেছেন। এ বিচারে এ-যুগের প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন মুখ্যতঃ দুজনের কাছ থেকে, এক কৃষ্ণ, আর দ্বিতীয়জন রামকৃষ্ণ! স্বামীজীর মতে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা হিন্দুধর্মের সার। কিন্তু সে-শিক্ষা তাঁর নিজস্ব ছিল না। কারণ এই শিক্ষা কৃষ্ণ তো আগেই দিয়ে এসেছেন। স্বামীজী বলছেন, প্রেমের জন্য প্রেম, কর্মের জন্য কর্ম, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য। এই আদর্শগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত হয়ে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঝরে পড়েছিল ভারতবর্ষের ভূমিতে। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় অনেকেই হয়তো পাশ্চাত্যের ধ্রুববাদ আস্তিক্যবাদ উপযোগবাদ প্রভৃতির ছায়াসম্পাত দেখতে পান যেগুলির মূলকথা মানুষকেই সর্বাপেক্ষা বড় স্থান দেওয়া, বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তম কল্যাণসাধন করা। কিন্তু নৈতিক ভাবনাহীন, মহত্তর সত্য-ভাবনাহীন, অন্নবস্ত্রের চিন্তা-সর্বস্ব উপযোগবাদ প্রভৃতিকে স্বামীজী সমর্থন জানাতে পারেননি। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাধর্ম্য দেখা গেলেও তাঁর চিন্তাধারা আরও দূর অগ্রসর হয়ে অংশের নয়, সমগ্রের মঙ্গলভাবনাকেই বড় করে তুলেছিল। মানুষকে শুধু সর্বাপেক্ষা বড় স্থান নয়, গুরুর আদর্শে তাকে শিবে, নারায়ণে রূপান্তরিত করে সেই মানব-উপাসনাকেই আপনার জীবনসাধনায় তিনি করে তুলেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। যে মানব-হিতবাদকে তিনি তাঁর সাধনায় প্রাধান্য দিয়েছিলেন সে-মানব কেবল দেহ ও সংকীর্ণ বস্তুধর্মী নয়, সে-মানব মর্ত্য অমর্ত্য ভাব-সুষমায় গড়া। তিনি বলেছিলেন, পাশ্চাত্যের জ্ঞাতব্য হল জীবনের প্রকাশ। আর ভারতের জ্ঞাতব্য হল সমগ্র জীবনটাই। তিনি জীবনের চরম অর্থ ও উদ্দেশ্য জ্ঞান করেছিলেন আদর্শের অনুসন্ধান ও পূর্ণতার দিকে যাত্রাকে। আর সে-পূর্ণতা গীতার অনাসক্তি ও নানা ভাবধারার সমন্বয়ে অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধের জাগরণে, যে-আদর্শের স্ফুরণ সর্বধর্মের মাহাত্ম্যের উপলব্ধিতে স্বামীজী সর্বাপেক্ষা বেশি খুঁজে পেয়েছিলেন কুরু-রণাঙ্গনে গীতামূর্তি কৃষ্ণপ্রদত্ত বাণীতে এবং সে-আদর্শই তিনি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরসত্তা কিংবা লীলারস-বিলাসী সত্তাকে বিবেকানন্দ অস্বীকার করেননি, কিন্তু সে-

৫১ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ১৬,
৫২ ঐ, ১০ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ২৯৩
৫৩ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ৩৬৭
৫৪ ঐ, ১ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯) পৃঃ ৮০
৫৫ ঐ, ৫ম, খণ্ড পৃঃ ১৫০

ক্ষেত্রে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় প্রচলিত ধারণার তুলনায়ও তাঁকে অনেক শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্বামীজী বলছেন: "ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা অপেক্ষা —অধিকাংশস্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য—মহত্তর জীবন্ত ঈশ্বরসকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর অপেক্ষা, আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু অপেক্ষা অর্থাৎ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর পূজ্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে তুমি আমি যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড়।"[৫৬] আমরা পৃথিবীকে স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে শুনেছি তাঁর কণ্ঠে। নবজাগরণের পথিকৃৎদের কারও কণ্ঠেই দৈবী বা ঐশী মহিমার ঊর্ধ্বে মানব-মহিমাকে স্থান দেবার প্রয়াস স্পষ্টতঃ বা প্রত্যক্ষতঃ নেই। আর, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন: "তাঁহার জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই প্রেমের অপূর্ব বিকাশ…বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপক-বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমমদিরা পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। কে সেই গোপীদের প্রেমজনিত বিরহ-যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ, যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শস্বরূপ, যে-প্রেম আর কিছু চাহে না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না। …ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম। আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, প্রলোভনের ধর্ম চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল; নরকের ভীতি ও স্বর্গসুখের প্রলোভন সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শের অভ্যুদয় হইল।"[৫৭] স্বামীজীর এই কথা বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী, শক্তি-বীর্য-পৌরুষ কাঠিন্য ও স্নেহ-প্রেম-করুণা-লাবণ্যের সমন্বয়ী মধুময় পৃথিবী আশ্রিত ভূমাসৌন্দর্যবাহী মানবতার সাধন লক্ষ্য—অন্তর্গভীর পরিপূর্ণ জীবন-সত্যের ইঙ্গিতও বহন করে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষপাদে জাতির জীবন যেখানে পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত, মানবতার অপমানে আহত, তাদের স্বাধীন চিন্তা-চেতনা যেখানে শাসকের কশাঘাতে নিত্য প্রতিহত, সর্বোপরি ভীরুতা কাপুরুষতা মনুষ্যত্বহীনতা যেখানে জাতীয় চরিত্রের প্রধান মানদণ্ড, 'সম্পূর্ণ পবিত্রতা' যেখানে সুদূর পরাহত, সেখানে রসগভীর গোপী-প্রেমের চর্চা অবাঞ্ছিতই শুধু নয়, বরং গভীরতর আলস্য ও জড়তার প্রশ্রয়বাহীও।[৫৮] তাই দেশ জাতির সেই বেদনা-লাঞ্ছনা বিক্ষুব্ধ অসহায় জীবনে স্বামীজীও উপলব্ধি করেছিলেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণাপেক্ষা কুরু রণাঙ্গনের কূটকৌশলী অশিববিনাশী বলবীর্যের উদ্বোধক কৃষ্ণের, গীতার ক্লৈব্যবিনাশী শক্তিসঞ্চারী সিংহনাদী কৃষ্ণের প্রয়োজনই সর্বাধিক। যিনি যুদ্ধ এড়াতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হল পিছু না হটে ভীমবিক্রমে শত্রুনাশে ঝাঁপিয়ে পড়াই যাঁর ব্রত,—কৃষ্ণের সে-আদর্শের কথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন কৃষ্ণ যেমন প্রেমের পরাকাষ্ঠা ছিলেন, তেমনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতিগঠনকারীও।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচিন্তায় যে নব-জাগরণের সূচনা করেছিলেন, শতাব্দীর শেষ পাদে এসে স্বামী বিবেকানন্দের নিরন্তর চিন্তা রচনা কর্ম গঠনধারা প্রত্যক্ষ মানবসংস্পর্শ জীবসেবা বিশ্বপর্যটন প্রভৃতির আশ্রয়ে তা অজস্র ধারায় মহত্তর বিবর্তন লাভ করে জাতির চিত্তক্ষেত্রে গড়ে তুলেছিল এক সুদৃঢ় বীর্য-কঠিন ভিত্তিভূমি, জাতিকে দিয়েছিল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা যার প্রমাণ পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর কালের নিরন্তর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে, মানবতার পূর্ণাঙ্গ মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণে, 'মৃত্যুহীন প্রাণ' বিসর্জনে, নিত্যসহচর রূপে অমিত-বীর্যের আকর গীতা-বরণে, দেশবাসীর বৃহত্তর অংশের চিত্তের জঙ্গমশক্তির পূর্ণাঙ্গ উদ্বোধনে। বঙ্কিমে যার সূচনা, অবশ্যই বলা চলে স্বামী বিবেকানন্দে তার পরিপূর্ণতা। কৃষ্ণের সেই পূর্ণ আদর্শ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান এই বিংশ-একবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণেও শেষ হয়ে যায়নি।

৫৬ বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-১৪৪
৫৭ ঐ, পৃঃ ১৫০-১৫১
৫৮ ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬, ১৪৫

তোমার লাগি জাগেন ভগবান

কমলা সেন

[বলরাম মন্দিরে রথযাত্রা দর্শনে]

আমির আড়াল ভেঙে
বিশ্বচৈতন্য জাগাতে এসেছিলেন
লীলাময় জগন্নাথ স্বয়ং
শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে।

শতবর্ষ অতিক্রান্ত।
তবু তাঁর পরশপূত রথের রশি
টানতে আজও এসেছে অসংখ্য মানুষ।
বাজে মৃদঙ্গ, বাজে করতাল,
শঙ্খ ঘণ্টা রবে ধ্বনিত আকাশ-বাতাস
ধ্বনিত পূরিত চতুর্দিক
'জয় জগন্নাথ' 'জয়-রামকৃষ্ণ' রবে।
রথোপরি জগন্নাথ হাসেন
আলোর আলো হয়ে আকর্ষণ করেন ভক্তকে—
আবার ভক্ত হয়ে আপনি টানেন রথ।
অরূপ প্রভু হন রূপময়,
মধুময় তাই মনে হয় বিশ্বজগৎ।

ওই দেখ শ্রীধাম বলরাম-মন্দির
আনন্দে হয়ে উঠেছে উচ্ছল ;
ভাবতরঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠেছে
সহস্র মানুষের হৃদয়সাগর—
সেই হৃদয়সাগর তীরে উত্থিত বিশ্বমন্দির,
চূড়া তার ছুঁয়েছে আকাশ
আকাশের নীল ঝরছে অমৃতবিন্দু হয়ে,
অমৃতস্নাত তাই নিখিল ভুবন।
ভক্ত নইলে ভগবান যে অপূর্ণ
তাই চলেছে প্রেমের খেলা।
চলেছে জগন্নাথের রথ।

কে পারে জানতে তাঁকে ?

সন্তোষকুমার অধিকারী

কে পারে জানতে তাঁকে ?
সে যে অসীম, অন্তহীন,
দেখেছি অবাক, সারা দেহে জ্বলে
লক্ষহীরার জ্যোতি ;
জ্বলে সূর্যের তেজ, উজ্জ্বল,
প্রাণময় হয় দিন।
চঞ্চল চির চলার ছন্দে,
উদ্দাম যার গতি,
নিশীথ স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় থাকে লীন।
অথচ জানি না হাজার সূর্য পায়ে তার দেয় নতি,
কোটি তারকার আলোক দীপ্তি
সজাগ অনির্বাণ ;
কে পারে জানতে তাঁকে
কোথায় বাজে অসীমের বীণ ?

মহাকাল—পায়ে উদ্বেল দিনরাত্রির পারাবার
আলো আঁধারের সঙ্গমে ছায়াপথে
প্রসারিত নীল রুদ্রের জটাভার।
মৃত্যুসাগরে আলোড়িত নবসৃষ্টির বেদনায়—
অকূল স্রোতের তরঙ্গ ভাঙে
বুদবুদ ভেসে যায়,
প্রাণের দীপিকা জ্বলে নেভে বার বার।

মনে হয় জানি, তবু সব জানা অনন্তে পায় লয়।
মহাকাশ, তার সীমা আছে কোন্ কালে ?
অমর অজয় অমৃত অক্ষয়।
আত্মবোধের নোঙর বাঁধব কোন্ কূলে ?
দেখি ছিন্নমস্তা রূপ চিরকালিনীর
রুদ্রের মুখে অচেতন হাসি জাগে,—
অরূপ আলোকে নিশা শুধু ক্ষয় হয়।

ভালবাসা

তাপস বসু

(নিবেদিতাকে নিবেদিত)

ভালবাসা দেশ হতে দেশান্তরী করে
ভালবাসা এক, দুই, তিন হতে অযুত মানুষে
ছড়িয়ে পড়ে
ভালবাসা পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার উন্মীলনে
ভালবাসা অবিচারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত উচ্চারণে
ভালবাসা অচেতন থেকে সচেতনায় উত্তরণে
ভালবাসা ভোগ হতে ত্যাগে, অনুরাগে, সেবায়
ভালবাসা জীবনে জীবন সংযুক্তির অমেয়
অনুভবে
ভালবাসা অশিক্ষা থেকে শিক্ষার আলোকিত
উদ্ভাসনে
ভালবাসা আত্মবিশ্লেষণে, আত্মনিবেদনে
ভালবাসা মুমূর্ষু মানুষের কণ্ঠে জল দানে ;

আসলে ভূমি তো একটাই ; আকাশও তাই ;
জন্ম থেকে কর্মে আপন চরণচিহ্নে
ভালবাসায় ভালবাসায়
এ ভুবন স্নিগ্ধ করেছ তুমি
এ আকাশ পূর্ণ করেছ তুমি
এ বাতাস শুদ্ধ করেছ তুমি ।

যার জন্য

ব্রত চক্রবর্তী

যার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছি,
সে এখনও ঘরে । রয়ে গেছে ।

চাঁদ নয়, অল্প জোছনার আলো
ছুঁড়ে চাখতে দিয়েছে ।
যার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছি,
সে এখনও ঘরে । রয়ে গেছে ।

ছোট দর্পণের কাচে দেখা যতটুকু দেয়,
ততটা দর্শন ।
দুঃখ বা সুখের জলে যতটা শরীর আনে,
ততটাই আলিঙ্গন ।
খুব দ্রুত জন্ম থেকে মৃত্যু, ফের
মৃত্যু থেকে জন্মের ওপরে যেতে ব্যস্ত প্রজাপতি
পরাগের শব্দে শব্দে যতটুকু বলে,
আমার সম্বল ঠিক ততটা অক্ষর ।

অসহ অদ্ভুত মায়া, সে আমাকে
বাইরে এনেছে । একা, দগ্ধ হয়ে আছি ।
রোদ্দুরে দারুণ দাহ, আগুনে জ্বলন, হিমে গলে জল ;
তবু ফুল পাখি লতা পদচিহ্ন এঁকে এঁকে যাই,
যদি সে আমার খোঁজে কোনদিন আসে ।

উত্তরাধিকারী

গৌতম মুখোপাধ্যায়

প্রসন্ন দৃষ্টির স্রোত আলোয় নিয়ত
স্রোতের সুর ধরে বুদ্ধ, বুদ্ধ-সন্তান,
আর তাঁর রাঙা হয়ে ওঠা ।
বৃক্ষ হয়ে মানুষ দৃষ্টি মেলে সবুজ হলে,
আরও যদি গৈরিক, অখণ্ড গৈরিক
না ফলকে
না পথের শেষে
তাঁর রাঙা হয়ে ওঠা
প্রবাহী হতে হতে হতে হতে…

প্রতিবিম্ব

দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

সমস্ত আকাশ দিয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন,
গেরুয়া উত্তরীয় গায়ে—পরিব্রাজক ।
পৃথিবীতে ম্লান ছায়ায়
একটি গাছ
তানপুরা হয়ে গিয়ে
সুর টেনে নিচ্ছিল ।
আর মানুষের বাগানগুলিতে
ছায়ালোকে দিব্যশ্রী দিচ্ছিল ছিটিয়ে ।
তখন বেলফুলের ছয়লাপ ।

নীলকণ্ঠেশ্বরের পথে

স্বামী সহদেবানন্দ

হৃষিকেশে তখন একান্তবাস করছি। জনৈক সন্ন্যাসী এসে বললেন : "নীলকণ্ঠেশ্বর যাবে?"

নীলকণ্ঠেশ্বর। নাম শুনে স্মৃতিপটে জাগে কত কথা। চলছে সমুদ্র মন্থন। দেবতা অসুরে মিলে। কত জিনিস সমুদ্র থেকে উঠছে। ভাল ভাল জিনিস দেবতারা বুদ্ধি কৌশলে সমস্ত হস্তগত করছে। অমৃত—তাও। অসুরদের বঞ্চনার জ্বালা বড় লাগছে। চলছে মন্থন। এদিকে বাসুকি নাগের অবস্থা সঙ্গীন। আর পারছে না। মুখ দিয়ে উঠছে বিষ। সেই বিষ পড়ছে সমুদ্রে—পড়ছে পৃথিবীতে। বিষক্রিয়ায় সৃষ্টি বুঝি লয় পায়! দেবতারা দিশেহারা। এ অবস্থায় রক্ষার মালিক শিব—আদিদেব মহাদেব। যখনই দেবতারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন—অসহায় বোধ করেছেন, তখনই তাঁরা শিবের স্বারস্থ হয়েছেন। এবারও তাই হল। দেবতাদের রক্ষা করতে দেবাদিদেব এলেন। মহা-হলাহল তিনি নির্দিধায় পান করলেন। তীব্র বিষের জ্বালায় তাঁর কণ্ঠ হল নীল। নাম তাই নীলকণ্ঠ। জগৎ রক্ষা পেল।

নামের সঙ্গে মিশে রয়েছে যাদু। তাই আবহমান কাল ধরে অগণন যাত্রী ছুটে চলেছে ঐ পথে। নিজেদের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বিষের বোঝা হাল্কা করতে—বলি কি শূন্য করতে। আর সদাশিব আশুতোষ তাঁর সৃষ্টির সমস্ত বিষ—তাঁর ভক্তের সমস্ত অশান্তি-জ্বালা-যন্ত্রণার তীব্র বিষ আজও পান করে চলেছেন। ভক্ত ফিরছেন শান্ত, শুদ্ধ, নিরুদ্বেগ হয়ে।

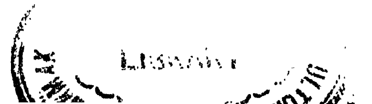
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) তখন পরিব্রাজক অবস্থায় ঘুরছেন। এসেছেন দুর্গমতীর্থ নীলকণ্ঠ পাহাড়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তবু আস্তানার সন্ধান মেলেনি। বাঘের রাজত্ব। মৃত্যু শিয়রে। দুজনেই মনস্থ করলেন দুদিকে যাবেন। এভাবে একসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দেবেন না। হরি মহারাজ কিছুটা ঘোরার পর আশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু সেই ঘোর জঙ্গলে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে গুরুভাইকে খোঁজ করা সম্ভব হয়নি। পরদিন অতি প্রত্যূষে বেরিয়েছেন খোঁজে। দেখেন—জীবন্ত গীতাভাষ্য শরৎ মহারাজ বসে রয়েছেন এক উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর—ধ্যানস্থ। গুরুভাইয়ের ডাকে ধ্যান ভাঙল। "আশ্রয়ের খোঁজ না করে এভাবে বিপদসংকুল জায়গায় বসে রয়েছেন কেন?" গুরুভাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ বললেন: "মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত সেখানে ত্রস্ত না হয়ে ভগবানের নাম করতে করতে মরাই উচিত।"

নিত্য নতুন কত ঘটনা ঘটে চলেছে তীর্থের পথে পথে। কে খোঁজ রাখে! খোঁজ রেখে লাভই বা কি! শুধু দেখতে হবে, আমার মধ্যে জেগেছে কি তাঁর প্রতি ভালবাসা—প্রেম? ধরেছে কি অনুরাগের রঙ? তা হলেই তো সব হল। তখনই সার্থক হবে আমাদের তীর্থযাত্রা যখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের মতো আমরাও বলতে পারব :

"পূজা-উপাসনা সকলই গো ফাঁকি।
শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি॥"

॥ ২ ॥

সমুদ্র মন্থনের পৌরাণিক কাহিনীটি রূপক। সত্যদ্রষ্টা বৈদিক হিন্দু ঋষিদের প্রতিটি রূপকের অন্তরালে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। সাধারণের নিকট উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে পরিবেশনের জন্য তাঁরা এগুলির আশ্রয় নিতেন এবং এগুলিকে এমনভাবে সাজাতেন যে, সাধকের মনের পবিত্রতা-শুদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের উচ্চ উচ্চতর হতো।



সমুদ্র অর্থাৎ শরীর। যোগীদের কাছে শরীরই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র প্রতীক। তাঁদের ভাষায় "যদ্ ইহ অস্তি, তদ্ অন্যত্র ; যদ্ ন ইহ অস্তি, ন তৎ ক্বচিৎ।"—যা এই দেহে আছে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেও তা-ই আছে, যা এই দেহে নেই, সৃষ্টির কোথাও তা নেই। 'যা নেই ভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে।' তাই 'সমুদ্র মন্থন' ব্যাপারটি এক দৃষ্টিতে আমাদের দেহের ব্যাপার। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যে এই ব্যাপারটি অহরহ ঘটে চলেছে।

মন্দর পর্বত স্থির, নিশ্চল, অপরিবর্তনীয়—জীবাত্মার প্রতীক। সর্প—শক্তির প্রতীক—প্রাণেরও প্রতীক। দেবতা ও অসুর মনের প্রতীক। মনের দুই প্রকৃতি—সৎ ও অসৎ ; দেবতা ও অসুর। সৃষ্টির প্রতীক হিসাবে সমুদ্রকে ধরা হয়, অতএব সমুদ্র স্থূলদেহেরও প্রতীক। তাহলে দাঁড়াচ্ছে—আমাদের এই স্থূলদেহের মধ্যে রয়েছে জীবাত্মা। তাকে বেষ্টন করে রয়েছে প্রাণ। প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরে রেখেছে মন। মনই মন্থনের অর্থাৎ সমস্ত কর্মের কর্তা। মনই জীবাত্মাকে স্বর্গ-মর্ত-পাতালে চক্কর লাগাচ্ছে। প্রভুর কথা—"মন নিয়ে কথা। মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত।"

মন্থনের কারণ দেবতা ও অসুরদের কামনা-বাসনা। তারা সমুদ্রকে মন্থন করে তার থেকে উত্থিত বস্তু ভোগ করতে চেয়েছিল। তার মূলে মন—মনের তন্হা—তৃষ্ণা-কামনা-বাসনা। মন তার এই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্থূল শরীরের আশ্রয় অবলম্বন করে। শাস্ত্রে এই স্থূল শরীরকে 'ভোগায়তন শরীর' বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র এই স্থূল-শরীরেই ভোগ সম্ভব—কামনা-বাসনা পূরণ করা সম্ভব। শুদ্ধ চৈতন্য তথা জীবাত্মা মন্দর পর্বতের মতো নির্বিকার। কিন্তু এই আত্মার সংস্পর্শেই মন প্রাণ ক্রিয়াশীল। আত্মা ছাড়া মন প্রাণের কোন প্রকাশ নেই। আগুনের সংস্পর্শ ছাড়া যেমন আলু বেগুন লাফাতে পারে না।

সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন নিজের শুভ অশুভ বাসনা চরিতার্থের জন্য নিজেই সৎ অসৎ এই দুই প্রবৃত্তিতে ভাগ হয়ে প্রাণের সাহায্যে শরীরকে মন্থন করছে অর্থাৎ ভোগ করছে কামনা-বাসনা পূরণ করছে এবং জীবাত্মাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে অর্থাৎ শুভ অশুভ কর্মফল ভোগের জন্য জীবাত্মাকে বার বার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হচ্ছে। এর ফলে বার বার প্রাণের খুবই কষ্ট হচ্ছে। শুভ অশুভ চিন্তনের ফলে—কর্মের ফলে মানুষ তার জীবনে যেমন মান-যশ, সুখ-শান্তি, প্রেম-ভালবাসা, ভাব-মহাভাবের আনন্দ ভোগ করে তেমনি দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-অশান্তি, রোগ-শোকের জ্বালা-যন্ত্রণাও ভোগ করে। এগুলি হল সমুদ্রমন্থনজাত দ্রব্য। অত্যধিক মন্থনের ফলে স্থূলদেহ প্রভাবিত হয়—নানারকমের রোগ (বিষ) হয়, তার ফলে মন প্রাণ কষ্ট পায়।

এর পরের কাহিনী—দেবতা ও অসুররা যখন বিষক্রিয়ায় জর্জরিত তখন তাঁরা দেবতাদের যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁরই আরাধনা করছেন—তাঁর কাছে নিজেদের প্রার্থনা জানাচ্ছেন কষ্টের লাঘবের জন্য। মনের কষ্ট যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন তার থেকে শান্তিলাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, সৎ জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হয়, মন কামনা-বাসনা শূন্য করে পবিত্র করার চেষ্টা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় সৎজীবন-ধর্মজীবন যাপনে তৎপর হয়। মন শুদ্ধ ও পবিত্র করাই তার লক্ষ্য। কামনা-বাসনা শূন্য হলে মন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। 'শুদ্ধং কাম-বিবর্জিতম্...।' এই শুদ্ধ মনই শিব অর্থাৎ মন শুদ্ধ হলে মানুষ (সাধক) শিবস্বরূপ হয়।

দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের আবির্ভাব হল। তিনি বিষ পান করে কণ্ঠে ধারণ করলেন। এই বিষ কি? তিনি তো অমর। তাঁর আবার বিষকে কণ্ঠে রাখার কারণ কি?

সাধকের মন শুদ্ধ হয়েছে। শিবরূপী শুদ্ধ মন সাধকের জীবনে কি করে? অর্থাৎ মন শুদ্ধ হলে সাধক কি করেন? মুক্তিকাঙ্ক্ষী সাধক আর সংসারচক্রে আবর্তিত হতে চান না। ভক্ত সাধক শুদ্ধাভক্তিলাভ করে বার বার পরমানন্দ আস্বাদন করতে চান। যাই হোক, প্রত্যেক সাধক তখন তাঁর জন্মজন্মান্তরের 'সঞ্চিত কর্মফল' (শাস্ত্রের ভাষায় 'প্রারব্ধ') ভোগ করে (পান করে) ক্ষয় করেন। এই 'প্রারব্ধ'ই 'বিষ'।

এই প্রারব্ধ ভোগ সকল মহাপুরুষকেই করতে

হয়। এমন কি স্বয়ং ভগবানও দেহধারণ করে এলে এর থেকে রেহাই পান না। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'।

যিনি শিব (জীবন্মুক্ত পুরুষ) হয়ে গিয়ে কেবল প্রারব্ধ ভোগের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করেন, তাঁর মন তখন অনেক সময় কেবল কণ্ঠেই অবস্থান করে। কারণ প্রারব্ধের আধার মন। সহস্রারে মন রাখলে সমাধি, তখন প্রারব্ধ ভোগ হয় না। মন নাভিতে রাখলে (বিষ পেটে গেলে) সংসারে আসক্তি এসে গিয়ে বন্ধন অর্থাৎ আবার মন্থন। তাই প্রারব্ধরাশিরূপ বিষ কণ্ঠে ধারণ।

জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী রূপকটির একটি সুন্দর আধিভৌতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে— 'সৃষ্টি'টি সমুদ্র। গীতায় বর্ণিত দৈবী ও আসুরী সম্পদশালী জীব—দেবতা ও অসুর। তারা 'ভোগদ' রূপ মন্দর পর্বতকে 'আসক্তি' রূপ বাসুকি দ্বারা বেষ্টন করে সৃষ্টিকে মন্থন করছে। তার ফলে শুভ অশুভ ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে ভোগের সহজাত বিষও উঠছে। 'ভোগ ও রোগ' একই টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। ভর্তৃহরি বলেছেন, "ভোগে রোগ ভয়ং" ইত্যাদি। বিষের পরিমাণ অধিক হয়ে সৃষ্টি নষ্ট করার উপক্রম হলে শ্রীভগবানই গুরু-শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে সেই বিষ পান করে সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। বিষ পেটে গেলে মৃত্যু ঘটায় তাই কণ্ঠে ধারণ। যেন জীবকে বলে দিলেন— বাইরের এই বিষকে বাইরেই রেখে দাও, অন্তর্জীবনে গ্রহণ করো না। তা হলে জীবনের কোনও ক্ষতি হবে না। অন্তর্জীবনে গ্রহণ করলে জীবন নাশ হবে। অন্তর্জীবনে গ্রহণ করা মানে তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাওয়া।

এবার 'গুরুশক্তি' শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এসে ভোগবাদের 'প্রাবল্য-রূপ-বিষকে' পান করলেন।"

॥ ৩ ॥

আমাদের সকলকেই ঐ নীলকণ্ঠেশ্বরে যেতে হবে —শব থেকে শক্তির ই-কার যোগে নীলকণ্ঠ শিব হয়ে উঠতে হবে, পূর্ণতালাভ করতে হবে। পথ দুর্গম। জ্ঞানীরা বলেছেন 'ক্ষুরস্য ধারা…।'

হৃষিকেশ থেকে প্রায় ১২ কি.মি. দূরে। সঙ্গী পাওয়া দুষ্কর। কে যেতে চায় ঈশ্বরের কাছে? বন্ধুকে বলেছিলাম, সে রাজি হয়নি। এ পথে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে'।

প্রভুর কাছে—একান্ত আপনজনের কাছে যেতে হলে কিছু নিয়ে যেতে হয়, শুধু হাতে যেতে নেই। 'তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ।' শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য অতি প্রত্যূষে আনন্দে দু-চারটে ফুল তুলেছি কি বাগানরক্ষক এল তেড়ে! যাত্রার প্রারম্ভেই বিষাদযোগ! গীতার প্রথমেই বিষাদযোগের কথা। ধর্মজগতে প্রবেশের প্রথম প্রকৃষ্টদ্বার দুঃখ। মন বলে, প্রভু তো অপরের তৈরি পার্থিব জগতের কিছু চান না। তিনি চান শুদ্ধ মন, আর অহিংসা, দয়া, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অনহংকার, অরাগ, অমোহ, অমাৎসর্য প্রভৃতি পঞ্চদশবিধ পুষ্প। মন, এই সকল পুষ্প আহরণ করেছ কি? তা যদি না করে থাক তাহলে চোখের জল তো রয়েছে, তাই দিয়ে অঞ্জলি কর এই যেন প্রভুর নির্দেশ, বিষাদযোগের গোপন কথা।

স্বর্গাশ্রমের গঙ্গায় স্নান করে পথ ধরলাম। মন, চল পরম প্রেমময়ের কাছে—পরম আপনজনের কাছে। পথের প্রথমে খানিকটা রাজপথ। প্রথম প্রথম যাত্রীরা বেশ সহজেই খানিকটা পথ এগিয়ে যায়। ভাবে বেশ সোজা। কথামৃতের পাঠক প্রথম প্রথম যেমন ভাবে ভগবান লাভ খুবই সোজা।

পথের দুধারে প্রকৃতির শোভা চোখ ভরে দেখছি। পাহাড়ী বনে বসন্তের রঙ। কিশলয়ে কিশলয়ে তার অপরূপ সাজ। ছায়া সুশীতল। মলয় পবন। পাখির কাকলি। ময়ূরের কেকা। ভ্রমরের গুঞ্জন। সর্বোপরি নির্জনতা। সব মিলিয়ে মনে হয় এ তপোভূমি—দেবভূমি—স্বর্গভূমি। বেলগাছের আধিক্যই প্রমাণ করে এ মহাদেবের আলয়। মহাদেব নিজেই যেন নিজের পুজার উপকরণ সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন।

কিছুদূরে যাওয়ার পর শুরু হয় উপলখণ্ডে ভর্তি চড়াইয়ের কঠিন পথ।… 'দুর্গম পথস্তৎ

করয়ো বর্দাস্ত'। তবে ভয়ের কারণ নেই। কোথা থেকে একটি কুকুর এসে সঙ্গী হল। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যেন কুকুররূপী ধর্মই এ পথের সঙ্গী। তাছাড়া পথের দুধারে গাছের গায়ে আঁটা সাইনবোর্ডে রয়েছে—'ওঁ নমো নীলকণ্ঠায়', 'হর হর মহাদেব' 'জয় শিব শংকর' ইত্যাদি। সদা-সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁর নাম। মহাত্মারা যাঁরা তাঁর কাছ থেকে ফিরছেন দেখা হলেই প্রেম ভরে প্রভুর নামই শুনিয়ে দিচ্ছেন—'জয় শংকর', 'জয় ভোলে বাবা' ইত্যাদি। এ পথের দুর্গমতা প্রায়ই যাত্রীকে হতোদ্যম করে দেয়। তাই মহাজনেরা যাত্রীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেন বলেন, কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই, তাঁর নাম যেন ভুলো না, তাঁর নামেই আসবে সেই মহাশক্তি যার ফলে তুমি এই গহন পথ অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারবে।

এ পথে বানর হনুমানের দেখা প্রায়ই মেলে। হনুমান রাস্তা অতিক্রম করে গেল আর সাথী—মহাদেবের পাঠানো সৈনিক অমনি ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল। যেন ভাব এই—এত তোর আস্পর্ধা, অতিথিকে অসম্মান করছিস্। দাঁড়া, তোকে শিক্ষা দেব।

পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে কথনও কথনও চলেছি। পাকদণ্ডীর পথ—সোজা ও তাড়াতাড়ি পৌঁছবার পথ, কিন্তু দুর্গম। মুহূর্তের অসাবধানতায় পতন অনিবার্য। চাই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস—সদা সতর্কতা।

কত ভক্ত, কত সাধু এ পথে চলেছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য ও গন্তব্যস্থল এক। 'আমরা যথা হইতে আসি তথায় ফিরিয়া যাই।' ভগবানই সকলের লক্ষ্য। 'ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে'। ব্রহ্মই সকলের গতি। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন—"আউর কিতনী দূর হ্যায়?" এ যেন সকল কষ্টের অবসান হতে আর কত বাকি। জীবনভোর শুধু দুঃখ-কষ্ট-শোক জ্বালা-যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার কবে হবে অবসান? আর যে পারি না সহ্য করতে। যারা ফিরছে তাদের 'শান্ত শুদ্ধ, নিরুদ্বেগ' মুখে মিষ্টি কথা—'আউর থোড়ী দূর হ্যায়, জলদি চলে যায়েঙ্গে'। এ যেথা সদ্‌গুরুর সেই আশ্বাসবাক্য। সদ্‌গুরু শিষ্যের মনে উদ্যম-উৎসাহ-অধ্যবসায় বাড়িয়ে দেন—পুরুষকারের আগুন জ্বালান।

অবশেষে শেষ হল চড়াইয়ের পথ। রাস্তায় সরবৎ বিক্রি করছে এক পাহাড়ী যুবক। বসে গেলাম সরবৎ খেতে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "পাহাড়ে এই জলবিহীন স্থানে বাস না করে শহরে গিয়ে তো বাস করতে পার।" তার উত্তর—"স্বামীজী, আমরা শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আনন্দে আছি।" অল্পে সন্তুষ্ট। নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত পাহাড়ী জীবন। তবে অত্যাধুনিকের ছোঁয়াচ এদের খুব তাড়াতাড়ি গ্রাস করে ফেলছে। কিছু দিন পরে হয়তো এদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিছুটা চলার পর পেঁছিলাম এমন এক জায়গায় যেখানে তিনদিকে অনন্ত আকাশ। চক্ষুর অবারিত দ্বার। দক্ষিণের হুহু করা প্রাণ জুড়ানো মুক্ত বাতাস। শান্তির প্রাণ। 'ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম'। কি অপূর্ব! কি সুন্দর! হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ সমস্তটাই দৃষ্টির গোচরে। কে এমন শান্তির নিলয় ছেড়ে যেতে চায়? সীমাহীন দিগন্তের পানে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে চায় অনন্তকে। আশ মিটে কই? পথ ফুরিয়ে এসেছে। প্রভুর মন্দির দৃষ্টির গোচরে। আনন্দের বন্যায় আমি আত্মহারা। মন্দির প্রাঙ্গণ। দ্রষ্টা আর দৃশ্যের মাঝে শুধু একটা দরজার বাধা। জীবাত্মা আর পরমাত্মার মাঝে আনন্দময় কোষের আস্তরণ। এই বাধা-আবরণ-আস্তরণ ভেদ করলেই "অবাঙ্-মনসোগোচরম্'—বোঝে প্রাণ বোঝে যার।"

কিন্তু ভক্ত বলেন, 'চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।'

অমৃত-স্মৃতিকণা

প্রীতিময়ী কর

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে যেদিন প্রথম দর্শন করতে বেলুড় মঠে যাই সেদিনের কথা মনে পড়ছে। আমার স্বামী, এক নিকট আত্মীয় ও আমি—এই তিনজনে সেদিন মঠে গিয়েছিলাম। আনন্দ আর উদ্বেগ—দুই-ই ছিল মনে। ঐ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলাম মঠবাড়ির দোতলায়, তাঁর ঘরে। দেখলাম ঘরের একধারে যেন হিমাচলেরই একাংশের মতো স্থির প্রশান্ত গম্ভীর এক মূর্তি।

প্রণাম করতে তিনি বললেন, 'বসুন'। নীরবে তাঁর আদেশ পালন করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথা থেকে আসছেন?" আমরা জানালাম, বালিগঞ্জ থেকে। আমাদের মনের ইচ্ছার কথা তিনি হয়তো আগেই শুনেছিলেন, অথবা বুঝতে পেরেছিলেন—হঠাৎ বলে উঠলেন: "শুধু মন্তোর নিলেই হবে না, সেই রকম কাজও করতে হবে। পবিত্র হতে হবে।" আশা আর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর শুনলাম, তিনি তাঁর সেবককে বলছেন: "এঁরা কবে আসবেন, একটা দিন বলে দাও।" তারিখ শুনে নিয়ে মহারাজজীকে প্রণাম করে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে শুনলাম তাঁর সস্নেহ কণ্ঠস্বর: "সাবধান হয়ে আসবেন, অত দূর থেকে আসতে হবে।" তখন বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া বাস চলাচল সবে শুরু হয়েছে। সেবক-মহারাজ তাই বললেন: "আজকাল তো যাতায়াতের অসুবিধা নেই, সোজা বাস হয়েছে।" একথা শুনেও তিনি নিশ্চিন্ত হলেন না, বললেন: "বাস হলেই তো হয় না, অতদূর থেকে আসা—একবার ওঠা, একবার নামা।"

অভিভূত মনে আমরা বিদায় নিলাম। নিতান্ত অপরিচিত জনের জন্য তাঁর এই উদ্বেগ, এই ভালবাসা—এ আমাদের এক নতুন অভিজ্ঞতা। উদয়াস্ত নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত, আমরা এই অহেতুকী ভালবাসা কল্পনা করব কেমন করে? ক্রমে বুঝলাম, ঐ হিমাচলসদৃশ আপাত-কঠোর মূর্তির অন্তরে জীবপ্রেমের মন্দাকিনী বয়ে চলেছে।

নির্দিষ্ট দিনটিতে বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম আমরা। আশ্বিনের সেই পুণ্য প্রভাতে মঠে যা দেখেছি তার ছবি আমার স্মৃতিপটে আজও আঁকা আছে। একদিকে চলছে পুষ্পচয়ন, মন্দির মার্জনা, আর একদিকে গৈরিকরূপধারিণী গঙ্গা প্রবহমানা—তরঙ্গে-তরঙ্গে নবোদিত সূর্যের অরুণ আভার প্রতিবিম্ব। একটি মন্দিরে এক সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন। এই অপূর্ব পরিবেশে আমরা গঙ্গায় অবগাহন করে পুরাতন ঠাকুরঘরের দালানে গিয়ে বসলাম। (শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন মন্দির তখন নির্মীয়মাণ।) যথাসময়ে ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মহারাজজীর কৃপালাভ করলাম। আমাদের নবজন্ম হল। এ-ছাড়া এই পুণ্য অভিজ্ঞতার আর কোনও কথা প্রকাশ করবার নয়।

কয়েক মাস পরে গুরুদেবকে কাছে পাওয়ার এক পরম সৌভাগ্য হল। শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে তিনি তখন বেলুড় মঠে। এই সময়ে একদিন তিনি আমার দিদির বেলেঘাটার বাড়িতে আসতে সম্মত হন। সংবাদ পেয়ে আমি আগের দিন রাত্রে বেলেঘাটায় উপস্থিত হলাম। সারা রাত্রি আমাদের ঘুম হল না। কিভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করব, কেমন করে তাঁর পাদবন্দনা করব—এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হল।

উপরে ওঠার সিঁড়িতে আমাদের গায়ের শালগুলি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু সে-

গদির উপর চরণ স্থাপন করলেন না, উঠিয়ে নিতে বললেন। উপরে এসে চেয়ারে বসলেন প্রশান্ত মুখে, আর আমরা তাঁকে ঘিরে বসলাম মেঝেতে। মহারাজজীর সঙ্গে একজন সন্ন্যাসী ও দুইজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। বাড়ির সকলের পরিচয় দেওয়া হল একে একে। প্রত্যেককে তিনি 'ভাল থাক' বলে আশীর্বাদ করলেন। সেদিন সহজেই তাঁর পদসেবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। চরণে হাত রেখে এক সময়ে বললাম: "আমাকে আশীর্বাদ করুন।" তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন: "আমি তো আশীর্বাদ করছি। সুখে থাক, ভাল থাক, ভগবানে ভক্তি হোক।" সাহস করে বললাম: "সংসারের সুখের কথা বলছি না, কী করলে ভগবানের কাছে এগুতে পারব তা-ই একটু বলে দিন।" এক মুহূর্ত নীরবতার পর সহাস্যে তিনি বললেন: "সত্যকে আঁট করে ধরতে হয়। একেবারে ঠিক-ঠিক চলা। মন আর মুখ এক। যা মুখে বলা তা-ই কাজে করা।"

আমরা দুইবোন পাশাপাশি ছিলাম। প্রায় একসঙ্গে দুজনে বললাম: "যাতে ভগবানকে পাবার উপযুক্ত হতে পারি, আপনি কৃপা করে তা-ই করে দিন।" অতি কোমল মিষ্ট স্বরে তিনি বললেন: "নিজেও একটু চেষ্টা করতে হয়।"

চেষ্টা তো অবশ্যই করতে হয়। কিন্তু শরীর-মনের ক্ষমতার অনেকখানি যে সংসারের কর্মে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট যা আছে তার কতটুকুই বা এই সৎকাজে লাগাতে পারব। অনুশোচনায় চোখে জল এল। মহারাজজীর চরণে মাথা ছুঁইয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললাম: "এ জীবনটা বৃথা চলে গেছে।" কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিলাম, তাই মহারাজজী প্রথমে কথাটা বুঝতে পারেননি। আরও দুইবার নিবেদন করবার পর শুনলাম তিনি গম্ভীরস্বরে বলছেন: "বৃথা কিছুই যায় না"।

মাত্র কয়েকটি শব্দ। তার অর্থ আর তাৎপর্য কত গভীর। কিন্তু সেটুকু উপলব্ধি করবার শক্তি আমাদের আছে কি? আমরা যে সামান্য সংসারী মানুষ, অল্প নিয়ে থাকি, পদে পদে আবার তা-ই হারাবার ভয়। তবু ঐ কয়েকটি শব্দ প্রাণে পরম সান্ত্বনার প্রলেপ দিল। বললাম: "শেষ সময়ে যেন ভগবৎ-আনন্দ পাই।" তিনি বললেন: "শেষ সময়ে কেন? ভগবৎ-আনন্দ এখন থেকেই পাবে।" কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি বলেন: "মাকে ডাকবে। ঠাকুর বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক-ঠিক না হলে হয় না। মা বড় ভাল।" আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কাটল। তারপর তিনি মৃদুস্বরে বললেন: "ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'একে ভাববি।' (বলতে-বলতে ঠাকুর কিভাবে তাঁর নিজের বুক দেখিয়ে বলেছিলেন, সেই ভাবে তিনি দেখিয়ে দিলেন।) তাতেই সব হয়ে গেল।"

আমাদের ভিতর থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা, প্রকৃত সাধুর দর্শন এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে?" তিনি জানালেন: "হিমালয়ে। সেখানে কত সাধু কত দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন। কেউ ঊর্ধ্ব-বাহু, কেউ বা আরও কত রকম করে বছরের পর বছর তপস্যা করছেন।" "ঐ রকম করলে কী হয়?" জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন: "তাঁদের যা অভীষ্ট তা-ই সিদ্ধ হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলতে তাঁকে অনুরোধ করা হল। মহারাজজী হাসতে হাসতে বললেন: "এক ভদ্রলোক একদিন ঠাকুরের কাছে আসছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে সেখানে যেতে দিতে চাননি, তাই তাঁর কাপড় ধরে টেনেছিলেন। ভদ্রলোকটি দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর তাঁকে বলেন: 'কিরে, বউ বুঝি আসতে দিতে চায়নি? কাপড় ধরে বুঝি টেনেছিল?' মানুষকে দেখা মাত্র ঠাকুর এই রকম তার ভিতরের কথা বলে দিতে পারতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনি ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিলেন?" হেসে বললেন: "হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?" বললাম: "বইতে পড়েছি। আপনি ইংরেজীতে রামায়ণ লিখছেন? কতদূর

হয়েছে ?" মহারাজজী উত্তরে বললেন : "হ্যাঁ, অনুবাদ করছি। অরণ্য কাণ্ড পর্যন্ত হয়েছে। (একটু থেমে) লঙ্কাকাণ্ড করে যাব।"

"যাব" শব্দটির উপর তিনি জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন। শুনে বুকটা ধক্ করে উঠল। বললাম : "ওকথা বলবেন না। আমাদের তবে কী হবে ?" মহারাজজী একথার কোনও জবাব দিলেন না। শুধু দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। বললেন : "ভাল থাক। কল্যাণ হোক। আমি প্রাণ থেকে আশীর্বাদ করছি।"

মহারাজজী অল্প সময়ের জন্য দিদির-বাড়িতে এসেছিলেন। সুখের বিষয়, ধার্য সময়ের চেয়ে বেশিক্ষণ তিনি এখানে ছিলেন। তাঁর তখন বয়স হয়েছে, চলাফেরা করতে কষ্ট হত, তাই যেখানে বসেছিলেন সেখানেই টেবিলের উপর আহারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। শ্বেতপাথরের কয়েকটি থালার উপর ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলের মধ্যে ছিল অকালের পাকা কাঁঠাল। তিনি সর্বাগ্রে সেই কাঁঠালের দুটি কোয়া মুখে দিলেন।

খেতে বসে তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি-তামাশা আরম্ভ করলেন। অধিকাংশ মিষ্টি তুলে দিলেন তাদের হাতে। নিজে খেলেন সামান্য। বালিগঞ্জের দই আর দিদির ঘরে তৈরি চুষিপিঠে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলেন। মনে আছে, দই দুবার পরিবেশন করেছিলাম। চুষিপিঠে খেতে-খেতে বললেন : "খেতে তো বেশ সুন্দর হয়েছে, ভয় হয় পেটে সইবে না।" আমরা জানালাম, জিনিসটি ময়দা দিয়ে তৈরি, চালের গুঁড়ি নয়—এতে পেটের গণ্ডগোল হবে না। এক সময়ে বালকের মতো আনন্দ করে বলে উঠলেন : "এই সাদা পাথরের থালাগুলো বেশ সুন্দর।" ঐগুলি কেনা হয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিক জয়ন্তী মেলায়। মনে হল, জিনিসগুলি কেনা সার্থক হয়েছে। ফলমিষ্টি-সহ জলযোগের পর ভাত-তরকারি আর খেতে চাইলেন না, বললেন : "এসব এখন খাব না, সঙ্গে দিয়ে দাও।"

এমনিতে ভক্তদের বাড়িতে তিনি কমই যেতেন। আর গেলেও অন্নগ্রহণের ব্যাপারে নাকি প্রায়ই এই রকম হতো। দেখলাম, তাঁর সঙ্গে যে-সাধুমহারাজরা এসেছেন তাঁরা একটি বড় মাপের টিফিন-ক্যারিয়র সঙ্গে এনেছেন। সেটিতে তাঁর আহার্য গুছিয়ে দেওয়া হল।

ইতিপূর্বে অন্য মহারাজদের আর একটি ঘরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁরা সেখানে খাচ্ছিলেন। জলযোগের পর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন : "ওদের খাওয়া হয়েছে ?" ওঁদের খাওয়া সম্পূর্ণ হতে একটু বিলম্ব ছিল। সেকথা তাঁকে জানানো হলে তিনি একটু হেসে রহস্য করে বললেন : "সেই তখন থেকে খাচ্ছে, এখনও হয়নি ? ··· আচ্ছা, আচ্ছা, খেয়ে নিক আমি অপেক্ষা করছি।"

মহারাজজী যখন বিশ্রাম করছেন তখন ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ঘিরে ধরে বলল, "আমাদের কিছু বললেন না, আমাদেরও কিছু বলুন।" তিনি বিরক্ত না হয়ে ওদেরও কিছু উপদেশ শোনালেন। যাত্রার সময়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন : "দেখ, আবার যদি কখনও আসি, তবে তখন এই চেয়ারখানা আর দিয়ো না।" মহারাজজীকে বসবার জন্য একটি আরাম-কেদারা দেওয়া হয়েছিল। কোমরে ব্যথার জন্য তিনি সোজা হয়ে ছাড়া বসতে পারতেন না, কষ্ট হত। আমাদের একথা জানা ছিল না। না-জেনে আমরা তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য আর কষ্টের কারণ হয়েছি বুঝতে পেরে খুবই দুঃখিত হলাম। তিনি তো এ বাড়িতে আর কখনও এলেন না, আমাদের দুঃখ থেকেই গেল।

আমরা সকলে একে একে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন : "ভাল থাক।" যখন মোটরে উঠছেন, তখনও হাতখানি তুলে রেখেছেন, বলছেন : "ভাল থাক।"

আমার মনে নানা প্রশ্ন উঠত। বিগত দিনের জানা-অজানা ভুলত্রুটির কথা চিন্তা করে চিত্ত অশান্ত হতো। ভাবতাম, গুরুদেবের কাছে সব কথা নিবেদন করে উপদেশ প্রার্থনা করব। কিন্তু বেলুড় মঠে তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দর্শন করে আর কিছুই বলতে পারতাম না। তাছাড়া দর্শনার্থীদের ভিড়ে কিছু বলার সুযোগও ঠিক পাওয়া যেত না। এইসব ভাবতে-ভাবতে একদিন মঠে গিয়েছি। সেদিন, আশ্চর্য, তাঁর ঘর দেখলাম ফাঁকা; স্মিতমুখে তিনি বসে আছেন। প্রণাম করতেই বললেনঃ "কি, উপদেশ? ···সহ্য করবে। প্রথম ভাগে দেখেছ না, তিনটে 'স' আছে—শ, ষ, স। সহ্য করবে। যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" হঠাৎ বলে ফেললামঃ "শুধুই সহ্য করব, কোনও সার্থকতা আসবে না?" তিনি গম্ভীরস্বরে উত্তরে বললেনঃ "সার্থকতা আসে ভগবানলাভ হলে।"

আর-একদিন মঠে গিয়ে কিভাবে পূজা করতে হয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেনঃ "যখন যেভাবে ইচ্ছা হয়।" কালী দুর্গা শিব কৃষ্ণ, সব দেবতার পূজা করব কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেনঃ "হ্যাঁ, তা করবে বইকি।"

পূজা-আরাধনার জ্ঞান তো ছিল না। মনে হতো, শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই যদি সব দেবতার অধিষ্ঠান, তবে আর তাঁদের আলাদা নামে ডাকা কেন? ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়। মহারাজজীকে তাই জিজ্ঞাসা করেছিঃ "অন্য দেবতাদের কি ঠাকুরের নামেই ডাকব, না তাঁদের আলাদা-আলাদা নামে ডাকব?" তিনি সহজ উত্তরে মীমাংসা করে দিলেনঃ "যাঁর যে নাম তাঁকে সেই নামে ডাকাই তো ভাল। যার নাম রাম তাকে শ্যাম বলে ডাকলে সে সাড়া দেবে কেন?" কিসে ধর্মলাভ হয় এই প্রশ্নের উত্তরে আর-একদিন তিনি বলেছিলেনঃ "সত্যকে আঁট করে ধরবে। ঠাকুর সত্যস্বরূপ।" কিসে আনন্দলাভ করব জানতে চাওয়ায় তিনি বলেনঃ "আনন্দ তো রয়েছেই, দেখে নিতে পারলেই হয়।"

একবার দুর্গাপূজোর সময়ে বেলুড় মঠে গিয়েছি। মহারাজজী তখন মঠে ছিলেন। একটু বেলায় তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন প্রসাদ পেয়েছি কিনা। বললাম, মহাষ্টমীর উপবাস, তাই অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিনি। তিনি শুনলেন না, বললেনঃ "যাও, যাও, শিগগির গিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ খাও।" গুরুদেবের নির্দেশে যথাস্থানে গিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করলাম। সেই থেকে মহাষ্টমীর দিন অন্ন গ্রহণ না করবার নিয়ম ত্যাগ করেছি।

আর-একদিন মঠে গিয়ে দেখলাম, মহারাজজী প্রসন্নমুখে তাঁর ঘরে বসে আছেন। ঘরের এক পাশে প্রায় স্তূপাকারে সাজানো মিষ্টি। আমাদের দেখে সেবক-মহারাজকে বললেনঃ "এগুলি এঁদের দিয়ে দাও।" আমার ছোট ছেলেকে তিনি নিজের হাতেই মিষ্টি দিলেন। মহারাজজীর এলাহাবাদ ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছিল। এই কথা জেনে তাঁকে পত্র দেবার ইচ্ছা জানালাম। শুনে হেসে তিনি বললেনঃ "আমি কিন্তু জবাব দেব না।" জিজ্ঞাসা করলাম, "যদি কিছু দরকার হয়?" তিনি আবার হেসে বললেনঃ "দরকার হলে দেব।"

তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে জেনে বুঝেছিলাম, তিনি সকল বিষয়ে কঠোর এবং সংযমী ছিলেন; সকলের কল্যাণকামনায় ছিলেন উদার, শ্রাবণের ধারার মতোই তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হতো সকলের প্রতি; কিন্তু বোধহয় অকারণে পত্রাদি দিতে চাইতেন না। যাইহোক, আমাদের একবার তাঁর চিঠি পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবের সময়ে একবার বেলুড় মঠে গিয়েছি। সন্ধ্যার সময়ে মহারাজজীর দর্শনলাভের সুযোগ হল। ঘরের মধ্যে মৃদুশক্তির একটি আলো জ্বলছে। আধো-অন্ধকারে দক্ষিণ দিকের জানালাটি ধরে তিনি উৎসবে জনতার দৃশ্য দেখছেন। উন্নত দেহে জানালার প্রায় সবটুকুই

ঢেকে গিয়েছে। বইয়ে পড়েছি, দক্ষিণের জানালা ধরে স্বামীজী একদিন একইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দৃশ্য দেখেছিলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের কুশল প্রশ্ন করে একটু পরে ক্লান্ত স্বরে বললেন: "সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন এসো।"

পরের বারের দর্শন বিষাদের। গুরুদেবের তখন শরীর খারাপ। খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শুয়ে ছিলেন, আমরা ঘরে ঢুকতে তিনি উঠে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার শরীর অসুস্থ?" তিনি সংক্ষেপে বললেন, "হ্যাঁ।" এর পর আর তাঁকে কথা বলানো অনুচিত ভেবে আমরা ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময়েও মহারাজজীর শরীর যথেষ্ট সুস্থ ছিল না। সেই উৎসবের কথা আজও মনে পড়ে। সেদিন সূর্যোদয়ের আভা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে মহারাজজী পুরাতন ঠাকুরঘর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত দেহাস্থির পাত্র হাতে নিয়ে মোটরে এসেছিলেন নতুন মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে কৌটাটি স্থাপন করলেন মন্দিরের বেদীর উপর। মন্দিরের সদর ফটকের উপর তখন সানাই বাজছে। অবিরত শঙ্খ-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবের একদিন মহারাজজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। ঘরে দেখলাম খুব ভিড়। মহারাজজীর শরীর তখন দুর্বল, অসুস্থ। সেবক-মহারাজ গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করতে বারণ করছিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ে মোজা পরিয়ে দেওয়া হল। আমি একবার তাঁর চরণ ছুঁতে গিয়েছিলাম, সেবক-মহারাজ বারণ করাতে হাত সরিয়ে নিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করলাম, গুরুদেবের কৃপাঘন দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ।

সেই শেষ দর্শন। এলাহাবাদে তাঁর দেহরক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। পূজনীয় অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) সেদিন বলেন: "ওঁরা কি কখনও ছেড়ে যান? দেহত্যাগের পর ওঁদের সত্তার অবস্থান আরও ব্যাপক, ওঁদের তখন আরও নিকটে পাওয়া যায়। ওঁদের জন্য শোক বা দুঃখ করার কারণ নেই।" এই কথাটি ধরে রেখেছি। আর ধরে রেখেছি মহারাজজীর পুণ্য স্মৃতি—তাঁর আশীর্বাদ আর কৃপাদৃষ্টির স্মৃতি।*

* ১৯৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই স্মৃতি-সন্দর্ভটি রচিত। এটি রচনার কয়েক বছর পরে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে লেখিকা প্রয়াত হয়েছেন। শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর ছিলেন কিছুদিন আগে লোকান্তরিত পশ্চিমবঙ্গের একদা-শিক্ষা-অধিকর্তা নিশীথরঞ্জন করের জননী।

শশিভূষণ সান্যাল

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

"আমার ব্যক্তিগত জীবনে বাবাজীর প্রভাব যে কতটা পড়িয়াছিল আজ তাহা ঠিক ঠিক নির্দেশ করা সহজ নহে, তবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।···তাঁহার আদর্শ জীবন, পবিত্র হৃদয়, অমায়িক স্বভাব এবং কর্মে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমার প্রথম যৌবনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বুদ্ধির অতীত অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নতশিরে স্বীকার করিতে বাধ্য। ··· তাঁহার সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হেমকান্ত শরীর, প্রজ্ঞা ও করুণা মিশ্রিত অপূর্ব স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আজানুলম্বিত বাহু, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালার শোভা, আসনবদ্ধ নয়নযুগল, আজিও তাঁহার ভক্তগণের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ধ্যেয়-রূপে জাগিয়া উঠে।"[1]—এই প্রশস্তি মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের। যাঁর সম্পর্কে এই প্রশস্তি উচ্চারিত তিনি স্বামী যোগত্রয়ানন্দ। সংসারাশ্রমের নাম শশিভূষণ সান্যাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রথমভাগের উপক্রমণিকায় শেষের দিকে উল্লেখ আছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তদের মিলনের সময়কাল। ওখানে আছে "বালির শশী (ব্রহ্মচারী)।" বালির শশীই হলেন স্বামী যোগত্রয়ানন্দ। "মহাপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও আচারী ভক্ত। ইঁহার নিষ্ঠাচারে প্রীত হইয়া ঠাকুর কহেন, আচারীর আচার ভগবান রক্ষা করেন"—পরিচয় দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।[2] শশিভূষণ কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শনে আপ্লুত করেছিলেন নিজের জীবন। এখানে প্রয়াস করছি শশিভূষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার।

শশিভূষণের জন্ম ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার বালিতে। বর্তমান ঠিকানা ৪৫ নম্বর মহেন্দ্র বাগচী রোড। এখনও শশিভূষণের পৈত্রিক বাড়ির একটি অংশ আছে। পিতা রামজীবন ছিলেন সরল ও সৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবী ধর্মপ্রাণা উদারস্বভাবা। তাঁদের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শশিভূষণ। কনিষ্ঠ ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আর শশিভূষণ গৃহী সন্ন্যাসী। ধার্মিক জ্যেষ্ঠতাত কাশীনাথের চেষ্টাতেই মাত্র দশ বৎসর বয়সে শশিভূষণ দীক্ষাপ্রাপ্ত হন যোগিরাজ শিবরাম স্বামীর নিকট। কুলদেবতা নারায়ণের পূজা-অর্চনায় দিন কাটাতেন তিনি। সেই সঙ্গে চলছিল সাধন-ভজন। অসাধারণ শ্রুতিধর ও মেধাবী শশিভূষণ আয়ত্ত করেছিলেন শাস্ত্রের দুরূহ জটিল তত্ত্ব। তাঁর আধ্যাত্মিক স্পৃহায় শংকিত হলেন জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী। মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়তে হল শশিভূষণকে। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি বিয়ে করলেন নয় বছরের হরিদাসীকে। অথচ তাঁর আবাল্য স্বপ্ন ছিল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিজীবন যাপনের।

গুরু শিবরামজীর দেহত্যাগ প্রাক্কালে শশিভূষণের প্রতি নির্দেশ দিয়ে গেলেন অপর এক শিষ্য চিদ্‌ঘনানন্দের কাছে সাধন-রহস্য অবগত হতে। গুরুভাই-এর শিক্ষাধীনে যুবক শশী নিজেকে সাধন-ভজনের পথে ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকল। কারণ, পিতার আয় ছিল অতি সামান্য। সংসারে স্বচ্ছলতা আনবার জন্য শশী কবিরাজি বিদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলেন। এছাড়া, ছোটবেলায় তাঁর এক অসুখের সময় এক কবিরাজের নির্দয় ব্যবহার তাঁকে কবিরাজিতে সিদ্ধ হতে প্ররোচিত করেছিল। অচিরে অথর্ববেদের রোগ নাশক মন্ত্র ও দ্রব্যগুণ আয়ত্ত করলেন শশী। আর সেই সঙ্গে ছিল সর্বসাধারণের কল্যাণ করবার তাঁর প্রবল ইচ্ছা। তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। কবিরাজির সঙ্গে তিনি

১ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ—মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, ৩য় খণ্ড (১৩৭০) পৃঃ ৮৭-৮৮

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, নবপত্র প্রকাশ, (১৩৯৩), পৃঃ ১৮১

রাত্রিতে চালিয়ে যাচ্ছিলেন ধ্যান-ধারণাও। কবিরাজ হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করলেও সংসারের দৈন্য-দশা কিন্তু ঘুচল না।

দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলাবামুন' শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনেছেন শশী। সেখানে তাঁর পুণ্য দর্শনে যেতেন তিনি। নিঃশব্দে পান করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-কথা। পরিচয়ও হল। শ্রীরামকৃষ্ণ শশীকে ডাকতেন 'পণ্ডিত' বলে। সাধনভজনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন শশী। কিন্তু ঈশ্বর-উপলব্ধি অননুভূত রয়ে গেল মরুতৃষার মতো। তাই একদিন ঠিক করলেন প্রাণের আকূতি নিবেদন করবেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মা ভবতারিণীর মন্দিরে। অপেক্ষমাণ শশীকে দেখতে পেয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন: "কে, গো, আমাদের পণ্ডিত না?" অঞ্জলিবদ্ধ শশীর বিনীত উত্তর: "আজ্ঞে হাঁ, আমিই বটে। আপনার কাছে নিভৃতে আমার কিছু বলার আছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মতি জানালে শশী জানালেন তাঁর প্রাণের আর্তি: "দেখুন, প্রাণের জ্বালা কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আপনার কৃপাস্পর্শ চাই। পবিত্র চরণখানি আমার বুকে একবার রাখুন, তাহলে শান্তি পাই।" করুণা-পাথার শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন: "পণ্ডিত, জ্বালায় জ্বলছো, এতো ভাল কথা। এর পরেই তো আসে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, আসে পরম শান্তি, পরম অমৃত।" শান্ত হল শশীর মন। তাঁকে তিনি বললেন বালির বিখ্যাত কল্যাণেশ্বরের শিবদর্শনে সঙ্গী হতে। সানন্দে রাজী হলেন শশী।[৩]

কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরে কয়েকঘণ্টা কাটালেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা। তাঁর ভাগবতী কথায় সকলেই মুগ্ধ ও আনন্দে বিভোর। কীর্তনে সকলে মাতোয়ারা। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করলেন শশীর বাড়িতে যাবার জন্য। শুনেই শশী নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করলেন। সদলে পদব্রজে রওনা হলেন শশীর বাড়ির উদ্দেশে। সে-সময়কার মধুর স্মৃতি অঙ্কন করেছেন সঙ্গী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল: "…অল্প পথ চলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ এত ক্লান্তি বোধ করেন যে, মহামায়া-প্রদত্ত প্রিয় সন্তান, শ্রীমান রাখালরাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে শ্রীমতীর ভাবে ভাবিত হইয়া গান করিতে থাকেন—'আর চলিতে নারি চরণ বেদন যে হল, সখি। সে মথুরা কত দূরে। তখন পথিমধ্যে দু-চারজন অপরিচিত লোকদর্শনে গানে ক্ষান্ত দিয়া কহেন যে, 'রামপ্রসাদ এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া বলিয়াছিল, মা আবার যদি আসতে হয়, যেন হাড়ি-শুঁড়ির ঘরে জন্মে, বেপরোয়া হয়ে তোর গুণগান করে পথে চলে যেতে পারি।'"[৪]

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হল শশীর বাড়িতে।[৫] এখনও শশীর বাড়ি আছে। এখানে তাঁর বংশধরেরা বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-ঘরটিতে সদলে বসেছিলেন, সে-ঘরটি এখনও বর্তমান। প্রধান প্রবেশ পথের ডানদিকে ছোট একতলা ঘর। শশী নিজের হাতে কিছু ফল খেতে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। সামান্য ফল খেয়ে বাকি অংশ তিনি বিতরণ করে দিলেন ভক্তদের মধ্যে। এক্‌গ্লাস জলও খেয়েছিলেন তিনি।[৬]

বিদায়কালে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "পণ্ডিত, তুমি ব্রাহ্মণ, সদ্বংশীয়। চিকিৎসা বৃত্তি থেকে টাকা রোজগার করছ, ও টাকা ভাল নয়। এ বৃত্তি ছেড়ে দাও।" একটু পরেই তিনি আবার মন্তব্য করে উঠলেন: "তাই তো এত বড় সংসারের দায়িত্ব রয়েছে। চিকিৎসার আয় না থাকলে চলবেই বা কেমন করে? আচ্ছা, তুমি চিকিৎসা করে টাকা নেবে, কিন্তু সংসার চালানোর জন্য ঠিক যতটুকু দরকার তাই নেবে।"[৭]

৩ ভারতের সাধক—শংকরনাথ রায়, ৯ম খণ্ড (১৩৮৮), পৃঃ ২৪৭—২৪৮

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৫৫

৫ সঠিক কোন তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ শশীর বাড়িতে এসেছিলেন তা জানা যায় না। কথামৃতে (১ম ভাগ, উপক্রমণিকা পৃঃ ৫) উল্লেখ আছে শশী, শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে উপস্থিত হন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য চলে আসেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ (১৩৮০), দিব্যভাব, পৃঃ ৩০১] সুতরাং ঐ বৎসরে সেপ্টেম্বরের আগে কোন এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন শশীর বালির বাড়িতে।

৬ শশীর জ্যাঠতুতো ভাই আশুতোষ সান্যালের নাতি বসন্ত সান্যালের (৭২) সঙ্গে প্রবন্ধকারের সাক্ষাৎকার। তারিখ ১৮।১০।১৯৮৫

৭ ভারতের সাধক, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮—২৪৯

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আদেশ শশী আজীবন রক্ষা করেছিলেন। দরিদ্র রোগীদের কাছে কখন তিনি টাকা নিতেন না। বরং তাদের জন্য পথ্যের ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিতেন। এমনও হয়েছে, বাড়িতে চাল-টাল কিছুই নেই, কিন্তু তবুও মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। রোগী দেখেই যাচ্ছেন, কোন অর্থ চাইতেন না। যে যেমন পারে, সেভাবে দিতেন। এমনকি সপরিবারে তিনদিন উপবাস করেছেন, তবুও শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করেননি।

শশীর বাড়ি যাবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শশীকে নিমন্ত্রণ করলেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সঙ্গে যেতে বাগবাজারের রসগোল্লা খাবার জন্য। বললেন, দুজন দু-হাঁড়ির রসগোল্লা নিয়ে এসেছে—একজন অশুদ্ধভাবে ও অপরজন শুদ্ধভাবে। 'পণ্ডিত'কে কথা দিলেন শুদ্ধভাবে আনীত রসগোল্লা খাওয়াবেন। সদলে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন দক্ষিণেশ্বরে নৌকা করে। দেখলেন দু-হাঁড়িরসগোল্লা এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথা রাখলেন।[৮]

গুরু শিবরামানন্দজীর পূত সান্নিধ্য লাভ করতে পারেননি শশী। তবে গুরুর নির্দেশানুসারে প্রবীণ গুরুভাই স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজীর কাছে সাধনরহস্য লাভ করেছিলেন তিনি। আর গুরুভাইও শশীকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন সাধনমার্গের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। শশী নিজেকে উন্নীত করেছিলেন আত্মজ্ঞানে, ত্যাগে, অনাসক্তিতে ও বৈরাগ্যে।

শশীর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল অগাধ। বেদ, উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, স্মৃতি, আগম, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। এছাড়া, তিনি পারঙ্গম ছিলেন পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়েও। একবার তাঁর অভিলাষ হয়েছিল পতঞ্জলি কৃত পাণিনির মহাভাষ্য অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করার। এই উদ্দেশ্যে স্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের। কিন্তু সময়াভাবে অনুরোধ-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন শাস্ত্রী মহাশয়। বহু প্রার্থনায়ও শশী পণ্ডিতজীকে রাজী করাতে পারলেন না। গভীর দুঃখে তিনি বাড়িতে অন্নজল ত্যাগ করলেন। কথিত আছে রাত্রিতে স্বয়ং পতঞ্জলির দর্শন পান শশী। তাঁরই কৃপাতে তিনি পাণিনি মহাভাষ্যের সূক্ষ্ম রহস্য অবগত হন। এরূপে ন্যায়দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন মহর্ষি গৌতমের নিকট।[৯]

শশী বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রচনা 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ।' তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল: (১) শিবরাত্রি ও শিবপূজা (১ম ও ২য় খণ্ড); (২) দুর্গা, দুর্গার্চন ও নবরাত্র তত্ত্ব (১ম খণ্ড); (৩) শিবরামের অভেদ তত্ত্ব ও শ্রীরামাবতার কথা (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)। শেষোক্ত বইটি হিন্দিতে অনূদিত হয়েছিল। এছাড়া, হিন্দিতে আর একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন শশী। বইটির নাম 'শিব তথা শিবার্চন তত্ত্ব (১ম খণ্ড)। (শশিভূষণের নাতি দাশরথি সান্যালের বাড়িতে তাঁর পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী সান্যালের কাছে প্রবন্ধকার উল্লিখিত পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ দেখেছেন গত ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে। বাড়ির ঠিকানা: ১০৭, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, ঝুলনতলা, বরাহনগর, কলিকাতা। 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ' বইটি কলকাতার প্রাচী পাবলিকেশন চারখণ্ডে আবার প্রকাশিত করেছেন। প্রথম সংস্করণের বইটির প্রচ্ছদ ও শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা নেই। প্রাচী পাবলিকেশন বইটি প্রকাশ করেছেন ১৩৯১ সালে।)

'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ' পণ্ডিতমহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমেরিকাতে বইটি শশীর শিষ্য কালীকৃষ্ণঠাকুরের জামাতা বিমলা পাঠিয়েছিলেন। স্বামীজীর বইটি সম্পর্কে মন্তব্যও পাওয়া যায়: "বেদের পরমতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব যদি এমন হয়, তবে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছে যে এই মহাপবিত্র গ্রন্থের কাছে মাথা নিচু করিবে না।" বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন: "এমন একটি বহুমুখী তত্ত্ব সম্বলিত মহাগ্রন্থ যে-মানুষ রচনা করিতে পারেন, তাঁহার মেধা ও প্রতিভার পরিমাণ আমি করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ

৮ ভগবৎ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (১৩৬০), পৃঃ ১৯১—১৯২। বসন্তবাবুও এই কাহিনী বলেছেন। তিনি এটি পেয়েছেন পারিবারিক সূত্রে।

৯ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৬৬—৬৮

ইংরেজীতে রচিত হইলে সমগ্র পৃথিবীতে ইহার প্রচার হইত, সত্যিকারের আদর হইত।" ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ পুস্তকটিকে হার্বার্ট স্পেনসারের 'সিন্থেটিক ফিলসফি'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায় 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রাচীন এবং নবীন দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয়' গ্রন্থ।[10] স্বামী অভেদানন্দ ও প্রেমানন্দ ভারতী[11] সময়ে সময়ে শাস্ত্রীর সঙ্গে শাস্ত্রবিষয়ে বিভিন্ন আলোচনাদি করতেন।[12]

শশীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পরিচয় ছিল। শশীর শিষ্য বিমলার চিঠিতে শশীর সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা জেনে তিনি আমেরিকা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "শশীর যদি কিছু উপকার করিতে পার চেষ্টা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান ...।"[13]

শশী বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মৃত্যু-পথযাত্রী মা বিশ্বেশ্বরীর একান্ত অনুরোধে। তাঁর মাতা শশীর কাছে কথা আদায় করেছিলেন ঃ "বাবা, তুই যে অবস্থায় আছিস তাতে সংসারে থাকা কণ্টকর তা আমি বুঝি। কিন্তু এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলে পরিবারের এতগুলো লোক যে অনাহারে মরবে। তুই আমায় কথা দে—গৃহস্থ থেকেই তুই সাধন ভজন করবি, সন্ন্যাসী কখনও হবিনে।"[14] শশী মায়ের এ-আদেশ শিরোধার্য করে আজীবন গৃহী-সন্ন্যাসিরূপে জীবন যাপন করেছেন।

শশী বাস করতেন কখনও কাশীধামে, কখনও বরাহনগর বা উত্তরপাড়ায় শিষ্যদের বাড়িতে। কাশীতেই সাধকরূপে, সার্থক কবিরাজরূপে সাধক পণ্ডিত ও জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেন শশী। এই সূত্রে কাশীধামে ত্রৈলঙ্গস্বামী, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির সঙ্গে শশীর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি তাঁদের পূত সঙ্গ লাভও করতেন। 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,'উৎসব' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক রামদয়াল মজুমদার, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ শশীর সঙ্গে শাস্ত্রাদি আলোচনা করতেন। শশীর অনুরাগীদের মধ্যে ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, বালির জমিদার রাজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ব্যক্তিরা। তিনি বহু দুরারোগ্য ও মরণাপন্ন রোগীকে সুস্থ করে তুলেছিলেন তাঁর কবিরাজি চিকিৎসার সাহায্যে। তদানীন্তনকালের ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী, ডাঃ আর. এন. দত্ত প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকরা শশীর চিকিৎসার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

গৃহী-সন্ন্যাসী শশীর জীবনে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের। সংসারী হয়েও তিনি ছিলেন অসংসারী—একেবারে অনাসক্ত ও নির্বিকার। তিনি বহু তাপদগ্ধ মানুষকে দীক্ষাদান করে ঈশ্বরাভিমুখী করেছেন। তিনি যেখানেই থাকতেন, সেখানেই অধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিদের ভিড় লেগে থাকত। তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীরাই তাঁকে নাম দিয়েছিলেন 'যোগত্রয়ানন্দ'। আর এই নামেই তিনি সাধকমহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

শশীর ছিল তিন পুত্র—বিভূতিভূষণ, ইন্দুভূষণ ও ফণীভূষণ। ফণীভূষণ অল্পবয়সে মারা যান। ইন্দুভূষণ ছিলেন ডাক্তার। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে ইন্দুর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইন্দুর দুই পুত্র—দাশরথি ও রামরেণু। দাশরথি মৃত। তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদেবী (৫৪) এখনও জীবিত। রামরেণু ডাক্তার—কাশীপুরে ১৭/১, জয় ব্যানার্জী লেনে বাস করেন।

শশী বেশি সময় কাটিয়েছেন কাশীধামে। কাশীধামে বাসের পালা চুকিয়ে শশী কলকাতায় এলেন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে উত্তরপাড়ায়, পরে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে তিনি একটি বাগান-বাড়িতে বাস করতে থাকেন। এখানেই তিনি আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সব আহার ত্যাগ করে শেষের দিকে শুধুমাত্র গঙ্গাজল ছিল তাঁর পেয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর শশিভূষণ তথা স্বামী যোগত্রয়ানন্দ গঙ্গাতীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১০ 'আর্যশাস্ত্র প্রদীপ'—প্রাচী পাবলিকেশন, (১৩৯১), পৃঃ ৬

১১ প্রেমানন্দ ভারতী ছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর, শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীর শিষ্য। আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সেখানে 'নাইট অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ইংরেজীতে রচিত তাঁর গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ'।

১২ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৫২

১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ৭৭

১৪ ভারতের সাধক, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮



মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ

অনুরূপা দেবী

…শ্রীরামকৃষ্ণকে না জানেন, এমন ভারতবাসী খুব কমই আছেন। নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। …মহাপুরুষদের মহান চরিত্রের সম্যক্‌রূপে পর্যালোচনার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি নিজের পক্ষে নিজেই যথেষ্ট সন্দিহান; কালিদাসের ভাষায় যদি বলা যাইত, তাহা হইলে তাঁহার রঘুবংশের প্রথমদিকের এই শ্লোকটি এক্ষেত্রে বেশ সহজেই প্রযুক্ত হইতে পারিত।—

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ"
ইত্যাদি।

যে পুরুষসিংহের সিংহ-গর্জনের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে [শ্রীরামকৃষ্ণকে] কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি সেই বিশ্ববরেণ্য স্বনামধন্য স্বামী বিবেকানন্দই সেই মহাপুরুষের চরিত্র, শক্তি, ত্যাগ ও আদেশবাণীর প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—"উহা এত উন্নত ছিল যে, আমি অথবা তাঁহার অপর কোন শিষ্য যদি শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করি, তথাপি তিনি যথার্থ যাহা ছিলেন, তাহার কোটি ভাগের এক ভাগেরও তুল্য হইতে পারি না।" …ভগবান রামকৃষ্ণদেব সাংসারিক বা সামাজিক জীব ছিলেন না, তাঁহার জাগতিক প্রতিষ্ঠা ধনে জনে সম্পদে সমারোহে নহে, তাঁহার আসন রত্নসিংহাসন নয়,—তাহা ভক্তজনের হৃদয়শতদল, তাঁহার পূজা-নৈবেদ্য পুষ্প-উপচার ভক্তহৃদয়ের সভক্তিক বন্দনার। অ-ভক্তের কাছে—নির্লিপ্তের কাছে ইহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু শ্রদ্ধাবানের কাছে ইহার প্রকাশ বাক্য-মনের অগোচরে। এ অবস্থায় বলা চলে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যেখানে মনের সহিত বাক্য কিছুই না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেইখানেই তাঁর সুপ্রকাশ।—শুধু বাঙ্‌মনের দ্বারা মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করা সম্ভব হয় না। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"শিবো ভূত্বা শিবমর্চয়েৎ"—শিবং মঙ্গলং কল্যাণং বিদ্যতে অস্য শিবঃ—মঙ্গলময়কে অর্চনা করিতে হইলে কল্যাণের অধিকারী হইতে হইবে। তন্মনা না হইলে তাঁহাকে পূজা করিবার অধিকার জন্মায় না। সম্যক্‌ সাধন ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানে সম্পন্ন মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আলোচনার অধিকারী আমরা হইতে পারি না। "ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি"—অতএব তাহা আলোচনার বাহিরে। যাহা সম্ভব নহে, তাহার আশা ত্যাগ করিয়া আসুন, আমরা আমাদের অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য বিবেকানন্দ-রথীর সারথির উদ্দেশে প্রদান করিয়া রথীর দিকে দৃষ্টিপাত করি।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমরা আমাদের পূর্বজ মহাপুরুষদের পূজা করি কেন, কিসের জন্য করি? আপনারা এ জিজ্ঞাস্যের কে কি উত্তর দিবেন, জানি না। আমি নিজে যে-উত্তরটি স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে জানাইতেছি। তাহা এই—

যাঁহারা ত্যাগ, সংযম, লোকহিতৈষণা, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশীগুণসম্পন্ন, যাঁহারা উন্নত চরিত্র-গুণে সংসারের, সমাজের, জগতের আদর্শস্বরূপ, তাঁহাদের সেইসকল ঐশ্বরিক গুণের পর্যালোচনা ও স্বভাবতঃ দুর্বলচিত্ত মানবসমাজে সুপ্রচারের জন্যই সেইসকল পুণ্য-চরিত্রের পূজা যুগযুগান্তরাবধি আবহমানকাল ধরিয়াই সর্বদেশে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে শ্রীরামনবমী, জন্মাষ্টমী, সীতানবমী প্রভৃতি ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। মহাপুরুষ বা যুগাবতার প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনরূপ নিদিধ্যাসন ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। গীতায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

এ প্রথার ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। আদর্শ-পুরুষ যাহা আচরণ করিয়া গিয়াছেন, শুধু তাহার উল্লেখ নয়, তদনুরূপ আচরণ দ্বারা তাঁহার কার্যের যথাযথ সমর্থনই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভগবান রামকৃষ্ণ পার্থসারথির মতোই যে মহারথের কর্মরথ পরিচালনা করিয়া ভারতবর্ষের বিস্মৃত ধর্মগরিমাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন, আমাদের কাছে তাঁহার সেই পার্থ-সারথিরূপেরই প্রাধান্য। তাঁহার হাতের শাণিত অস্ত্র তাঁহার স্বদেশবাসীর মোহনিদ্রা দূর করিবার জীমূতমন্দ্রনিনাদকারী বৈতালিক বিবেকানন্দ। সেই মহামানবের সেই জলদমন্দ্র, ভৈরব-রবে আজও ভারতের দিকে বিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!

তাঁহাকে পূজা করিতে বসিয়া আমাদের সেকথা ভুলিলে চলিবে না। বিবেকানন্দের এই মহাবাণী কানঢাকা টুপি দিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশের বাধা দিলে এ পূজা, এ আয়োজন—এ আড়ম্বর সবই মিথ্যা হইবে, সব ছলনামাত্র সার হইয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে তাঁহাদের বাণী—"উত্তিষ্ঠত…", "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"। বৎসর বৎসর এই উৎসব, যেন আমাদের এই বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়—যেন ভুলিয়া যাইতে অবসর না দেয়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এই "ক্ষুরস্য ধারা" দুর্গম পথ দিয়া সাবধাননাস্তপদে যেন তাঁহাদের পরিকল্পিত, তাঁহাদের পরিচালিত সংঘ, তাঁহাদের দেশবাসী নরনারী সকলেই বরপ্রাপ্তির আশায় সমাহিত চিত্ত মন প্রাণ লইয়া যাত্রা করিতে পারে। গড্ডালিকা প্রবাহের মতো গতানুগতিকভাবে চলিতে শুরু করিলেই বরপ্রাপ্তি ঘটিবে না। সেকথা যেন স্মরণে থাকে। সেকথা আজিকার দিনে স্মরণ কর, হে বিবেকানন্দের পথের অনুযাত্রিগণ!

যে উন্নততম আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সাধনালব্ধ ফল পর্যন্ত ত্যাগ করিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—"জীবের কল্যাণের জন্য যদি শত শতবার নরকে যেতে হয় তাও যাব। তবু শুধু নিজের মুক্তি আমি চাই না"—স্বামীজীর সেই সংকল্পিত কল্যাণকাম্যের চরিতার্থতার জন্য তাঁহার প্রবর্তিত পথে যাঁহারা সেই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই সেটি কার্যে পরিণত করিতে যথোচিত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় ব্যয় করিয়াছেন করিতেছেন, যদিও ইহা খুবই কঠিন কার্য। স্বামীজী সংকল্পিত সেই কল্যাণটি কি, তাহার সম্বন্ধে বোধ করি কাহারও মনে দ্বিধা থাকিতে পারে না। সে-কল্যাণ একমাত্র ধর্মহীন মনুষ্যজীবনে ধর্মধন প্রদান করার প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা। ধর্মই একমাত্র জীবের কল্যাণ।—"ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। স্বামীজীর বাণীতেও আমরা এই ভাবই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাঁহার কল্পিত কর্মীদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"যদি তোমরা ধর্মকে কেন্দ্র না করিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের জীবনীশক্তি না করিয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা অপর কিছুকে উহার স্থলে বসাও, তবে তাহার ফল এই হইবে যে—তোমরা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য তোমাদিগকে তোমাদের জীবনীশক্তিস্বরূপ ধর্মের মধ্য দিয়া সকল কার্য করিতে হইবে।" বিশেষ করিয়া ভারতের জন্য যে এই ধর্মজীবনই একমাত্র কল্যাণকর, সেকথা স্বামীজী আরও একস্থানে প্রবলভাবে ঘোষণা করিয়া কর্মীদিগকে শুনাইয়াছেন: "ভারতে যে-কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্মপ্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে গেলে প্রথমে এ-দেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে হইবে। প্রথমেই এইটি করা আবশ্যক। প্রথমতঃ আমাদের এই কার্যে মনোযোগী হইতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যেসকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ঐসকল গ্রন্থ হইতে সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে। যেন ঐসকল শাস্ত্রনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই

এই শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে। প্রথমে লোক শাস্ত্রবাক্যসকল শুনুক। আর যে-ব্যক্তি শাস্ত্রের মহান সত্যসকল লোককে শুনাইতে সাহায্য করে, সে-ব্যক্তি আজ এমন কার্য করিতেছে, অন্য কোন কর্মই যাহার সদৃশ হইতে পারে না।" কিন্তু বর্তমানের অধিকাংশ অন্যান্য জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত কর্মিগণের নিকট হইতে স্বামীজীর সংকল্পিত প্রকৃত জীবকল্যাণজনক ধর্মতত্ত্ব প্রচারের প্রচেষ্টা বিশেষরূপে হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যদিও ইঁহাদের নিকট হইতে সমাজহিতকর দরিদ্রনারায়ণের সেবাজনক বহুবিধ কর্মসহায়তা লাভ করা যায়, তথাপি সে পাওয়া আর এ পাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আধিব্যাধিপ্রপীড়িত নরনারীর দৈহিক ঔষধ-পথ্য যেমন প্রয়োজনীয়, ত্রিতাপতপ্ত দুঃখত্রয়াভিহত মানবজীবনের পক্ষে তেমনই আরও একটা জিনিসের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা প্রাণের ক্ষুৎপিপাসা বিদূরিত করিয়া অবসাদগ্রস্তকে শান্তি দেওয়া। বাহিরের এই দয়া-দাক্ষিণ্য সবই তুচ্ছ হইয়া পড়ে, যদি কর্মিগণ তাঁর উদ্দিষ্ট সেই প্রকৃত কল্যাণটুকু দিতে না পারেন। যে-কল্যাণ সকলের পক্ষেই সমপ্রয়োজনীয়, যে-বস্তু দিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সাধনার ফলও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রিলিফ ফান্ড, হাসপাতাল, নৈশ-বিদ্যালয় প্রভৃতির এদেশে, এই বন্যা-দুর্ভিক্ষ মহামারী-প্রপীড়িত বিত্তহীন দেশে যথেষ্টরূপে, একান্তরূপেই প্রয়োজনীয়তা আছে। 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়' ভগবানের এই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বিবেকানন্দের বিবেক দরিদ্রনারায়ণের সেবায়োজন করিয়াছিল। কিন্তু এইসকল অভাবগ্রস্ত দেহের ক্ষুধা মিটানোর সঙ্গে এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন জনসাধারণের আত্মার ক্ষুধা বিদূরিত করিবার বিষয়ে যদি শৈথিল্য বা কার্পণ্য ঘটে, তাহা হইলে শুধু সাধারণ দাতব্যের ভাবেই দান নিঃশেষ হইলে, দানের মর্যাদা যেন অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে। স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াও বিচার করিলে দেখা যায়—তাঁহার উদ্দেশ্যও সকল জীবের দেহ প্রাণ ও আত্মার প্রকৃত ক্ষুধা মিটানোর, যথার্থ দারিদ্র্য-মোচনেরই দিকে প্রযুক্ত ছিল। অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী-সন্ন্যাসীদিগের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি, শুচিশুদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা এবং সেই তপঃস্বাধ্যায়লব্ধ জ্ঞানরাশি, ঔষধ-পথ্য সেবার সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ করার চেষ্টা করেন, অন্যান্য সেবাব্রতীদের সঙ্গে এখানেই তাঁহাদের পার্থক্য। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: "দানের মধ্যে ধর্মদান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। দ্বিতীয়, বিদ্যাদান। তৃতীয়, প্রাণদান। চতুর্থ, অর্থাৎ নিকৃষ্ট দান অন্নবস্ত্র প্রভৃতি।" সুতরাং সন্ন্যাসমার্গাবলম্বী কর্মিগণের নিকট শুধু ঐ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দান পাওয়াটা সামাজিক হিসাবে অতি প্রয়োজনীয় হইলেও আধ্যাত্মিক হিসাবে নগণ্য। সমাজে ধনী দাতার দাতব্য-ভাণ্ডার এবং গভর্নমেন্টের সহায়তায় এসব বিষয়ে তবু অল্প-বিস্তর আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দানের ব্যবস্থাও মোটামুটি পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার উদ্দিষ্ট ঐ প্রথম শ্রেণীর দানের ব্যবস্থা এযুগে আর কই? যে সনাতন ধর্মবৃক্ষকে তিনি সযত্নে রক্ষা করিতে বলিয়াছেন—সহস্র হস্ত তাহারই অঙ্গে কুঠার-চালনায় ব্যাপৃত। কেহ কেহ মূলোৎপাটনেরও পক্ষপাতী। ভারত একদিন ছিল, যেদিন অরণ্যবাসী ঋষির হস্তেই রাজধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ভারতবর্ষ ধর্মজীবনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ অতীত ভারতকে সূক্ষ্মতররূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎকে সেই গরিমাময় অতীতের ভিত্তির উপরেই পুনর্গঠন করিবার ইচ্ছাতেই পূর্ব ঋষিসঙ্ঘেরই অনুরূপ এই নূতন কর্মযোগী সম্প্রদায় সংগঠনের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। এযুগে অরণ্যবাস সম্ভব নহে। তাই এই আশ্রমবাসের সৃষ্টি। অতএব যেমন মূর্খ-পুরোহিতের, তেমনই সন্ন্যাসভ্রষ্ট বিদ্যাবিহীন সন্ন্যাসিকর্মী উভয়েরই সংস্কার সমপ্রয়োজনীয়। বুদ্ধিমান এবং সাত্ত্বিক কর্মী দ্বারা গীতা উপনিষদের প্রচার, আর সেই অগ্নিমন্ত্রের অনুরণন, সেই মহাবাণীর চিরপ্রতিধ্বনি ভারতাকাশকে পুনর্মুখরিত করিতে থাকুক—'উত্তিষ্ঠত—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।

ভগবান বুদ্ধ রাজপুত্র ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে প্রচুর পরিমাণে অন্ন-বস্ত্রদানের সুব্যবস্থা

করিয়া জীবের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে জীবের প্রকৃত দৈন্য নিবারিত হইবে না—এই সত্যকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াই রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, একমাত্র সন্ন্যাসের ভিতর দিয়া সর্বত্যাগী, আত্মত্যাগী হইতে পারিলে তারই উচ্চ সাধনার দ্বারা যে লাভ হইবে, তাহার কিছুমাত্র অংশ যদি ত্রিতাপদগ্ধ দুঃখতাপক্লিষ্ট জীবকুলকে দান করিতে পারা যায়, তবেই তাহাদের অসীম দুঃখসমুদ্রের মাঝখান হইতে কূলের দিকে কতকটা দূর আগাইয়া দিতে পারা যাইবে। এই তত্ত্বটির মধ্যেই এখনীয় মহাপুরুষদিগের যথাযথ মনোভাব নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। মহিমময় সন্ন্যাসধর্মের প্রকৃত রূপ ও প্রকৃত সার্থকতা ইহারই মধ্যে নিহিত। প্রকৃত সন্ন্যাসী ভিন্ন প্রকৃত কর্মী হওয়া সম্ভব নহে। যাহাদের নিজের শিক্ষা, ধর্ম, জ্ঞান, ত্যাগ সম্পূর্ণ হয় নাই, সে অন্যকে কি দিবে? "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" উপনিষদের নিকট হইতেই ইহার উচ্চ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দুঃখাভিহত জীব সন্ন্যাসীকে বড় বেশি মহত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখে, তাহাদের কাছে বড় বেশি আশা করে।...

স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত উদ্দেশ ও এই ছিল যে, ধর্ম এবং কর্মের সমন্বয় দ্বারা তিনি যে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ সৃষ্টি করিবেন, তাঁরা ধর্মাচার্যরূপে এক-একজন দ্বিতীয় তৃতীয় কুমারিল ভট্ট হইয়া দাঁড়াইবেন। তাঁহারা মানুষকে বাহিরে দিবেন দেহের খোরাক, ভিতরে ঢালিবেন জ্ঞানের অমৃতধারা—যাহা আস্বাদ করিয়া তারা শুধু নীরোগ নহে, পরন্তু অমর হইতে পারিবে। ইহা যদি তাঁহার উদ্দেশ্য না হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র সাধারণ দান বিতরণের জন্য তিনি সন্ন্যাসী কর্মীদলের অভাব অনুভব করিয়া তাহাদের সৃষ্টি করিতেন কিনা সন্দেহ। কারণ, শুধু ইহারই জন্য তো কঠোর ব্রহ্মচর্যপালনকারী, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীকস্বরূপ গৈরিকধারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

আমার এই বক্তব্য শেষ করিয়া আজ বিবেকানন্দ রথী এবং পার্থসারথিস্বরূপ তাঁহার পরিচালক সারথিকে স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা, সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রত্যেক কর্মীকে ধর্মে কর্মে সেবায় ত্যাগের মহিমায় দীপ্ততর ও আদর্শতর হইয়া ভারতবর্ষের পূর্বমহিমাকে পূর্ণতর ও প্রদীপ্ততম করিয়া তুলুন।*

*মাসিক বসুমতী, ১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৮, পৃঃ ৯৪৭—৪৯

সংগ্রহ: প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও গঠন

দেবিদাস বসু

॥ ১ ॥

প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। সে-সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করি। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মূলতঃ দুটি মৌলিক উপাদানে গঠিত—একটি পদার্থ (matter) ও অপরটি শক্তি (energy)। স্থিতাবস্থায় কোন বস্তুর শুধু পদার্থ থাকে যাকে স্থিতপদার্থ বলা যায়; কিন্তু গতিশীল অবস্থায় কোন বস্তুতে পদার্থ ও শক্তি উভয়েই বর্তমান। সূর্য, নক্ষত্র কিংবা আলোক উৎসের কোন তপ্ত বস্তু থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় সেই আলোয় কোন পদার্থ থাকে না, থাকে কেবলমাত্র শক্তি, যাকে বিশুদ্ধ শক্তি বলা যেতে পারে। সুতরাং বস্তুর সঙ্গে যুক্ত না হয়েও শক্তির পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব। আলোক, তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের আন্দোলনের (electromagnetic wave) ফলে উদ্ভূত হয়ে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার-এর মতো অকল্পনীয় এবং অপরিবর্তনীয় গতিবেগে ধাবিত হয়।

আলোর সাহায্যে আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখি তাহা শূন্যে বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রপুঞ্জ (galaxy)। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি উহা মাধ্যাকর্ষণ-বলের (gravitational force) প্রভাবে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান নবগ্রহের অন্যতম। ঐ একই বলের প্রভাবে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য উপগ্রহেরাও গ্রহগুলিকে ঘিরে আবর্তন করে চলেছে। আমরা খালি চোখে যা দেখতে পাই না, জ্যোতির্বিদগণ তাদের শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশে সেরকম আরও অনেক বিচরণশীল বস্তু নিরীক্ষণ করেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে অনেক নক্ষত্র একসঙ্গে মিলে নক্ষত্রপুঞ্জ তৈরি করে এবং এগুলি একে অপরের থেকে ক্রমশঃ অপসৃয়মাণ। প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র এবং সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কয়েকশ লক্ষ নক্ষত্রপুঞ্জ বর্তমান। আমাদের গ্রহপুঞ্জ (planetary system) যে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত তার নাম ছায়াপথ (milky way) এবং এর বিস্তৃতি প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষের (light year) সমান (১ আলোকবর্ষ =১০০০০০,০০০০,০০০ কি. মি.)। নিরীক্ষণের যে-কোন বিন্দু থেকে—যেমন ধরা যাক আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকেই বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব বিভিন্ন এবং তা দশলক্ষ থেকে কয়েকশ কোটি আলোকবর্ষের সমান। প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্নিহিত ঔজ্জ্বল্য একই ধরনের কোন নক্ষত্রপুঞ্জের ঔজ্জ্বল্য বা নিষ্প্রভতা তার দূরত্বের পরিমাপ নির্দেশ করে। আমাদের থেকে যে নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব যত বেশি ততই তা আমাদের কাছে নিষ্প্রভ মনে হবে। কোন বর্ণালীরেখ যন্ত্রে (Spectrograph) যখন এরূপ উৎস থেকে আগত রশ্মিকে পরীক্ষা করা হয়, তখন লাল থেকে বেগুনী রঙের পর পর রেখা-সজ্জা দেখা যায়। পৃথিবীতে কোন উৎস থেকে আগত আলোকরশ্মির বিস্তৃত বর্ণালীতে (Spectrum) প্রতিটি লাইনের অবস্থান দেখে উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। মহাশূন্যের কোন বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মির বর্ণালীতে যদি কোন রঙের লাইন লালের দিকে সরতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই বস্তু আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং এই সরে যাওয়ার পরিমাণ নির্দেশ করে, তা কি গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক হাবল একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে বলেন যে, যে-নক্ষত্রপুঞ্জ যত বেশি নিষ্প্রভ তার আলোর বর্ণালীতে লাইনগুলি লালের দিকে সরে তত বেশি। অর্থাৎ কোন নক্ষত্রপুঞ্জ যা আমাদের থেকে যত বেশি দূরে অবস্থিত তা তত বেশি গতিতে আমাদের থেকে দূরে সরে যাছে। একে হাবলের সূত্র (law) বলে। এই সূত্রানুযায়ী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্থির নয়, নক্ষত্রপুঞ্জগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমে তা সম্প্রসারণশীল।

হাবলের মতামত থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রসার লাভ করছে। এখন

আমরা যদি এই প্রসারণকে সময়গত দিক থেকে বিপরীতমুখী করতে পারি তাহলে দেখব যে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ ছোট হতে হতে একটি বিন্দুতে পর্যবসিত হবে এবং সেই বিন্দুতে সমস্ত বস্তু সংকুচিত হয়ে অসীম ঘনত্ব ও তাপমাত্রার কণায় রূপান্তরিত হবে। প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর আগে এই অমিত ঘনত্ব ও তাপমাত্রা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড তার জীবনের যাত্রা শুরু করে এবং যার অব্যবহিত পরেই 'বিপুল নির্ঘোষ' (Big-Bang) নামে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। ব্রহ্মাণ্ডের বয়স যখন $১০^{-৪৩}$* সেকেণ্ড তখন এর আকার ছিল একটি টেবলটেনিস্ বলের চেয়েও ছোট, তাপমাত্রা ছিল $১০^{৩২}$ ডিগ্রি কেলভিন; (২৭৩ কেলভিন $=০^{0}$ সেণ্টিগ্রেড) ; শক্তি তুল্যাংকে যা $১০^{১৯}$ Gev.; পরীক্ষাগারে সম্ভাব্য শক্তি উৎপাদন মাত্র ৫×১০^{২} Gev.। এই অসীম শক্তি-পর্যায়ে চার রকমের বল মিলে, 'অতি একত্রীকরণ সূত্র' (Super Unified Theory) অনুযায়ী একটি বলে পর্যবসিত হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সময়ান্তরে যখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স $১০^{-৩৫}$ সেকেণ্ড এবং শক্তি $১০^{১৫}$ Gev. তখন মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথক্ হয়ে পড়ে এবং বাকি তিনটি বল "সার্বিক একত্রিত সূত্র" (Grand Unified Theory) অনুযায়ী একত্রিত থাকে। আবার যখন বয়স $১০^{-৩২}$ সেকেণ্ডে পৌঁছায় তখন প্রবল নিউক্লিয় বল পৃথক্ হয়ে আসে এবং তড়িৎ ও দুর্বল-নিউক্লিয় বল একসঙ্গে থেকে "তড়িৎ-দুর্বল সংযুক্তি সূত্র" (electro-weakcombination theory) জন্মলাভ করে যা ওয়েনবাগ ও সালাম নামকরণ করেন। আবার ব্রহ্মাণ্ডের বয়স যখন $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড ঐ দুটি বলও তখন পৃথক্ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কোয়ার্ক থেকে প্রোটন ও নিউট্রন তৈরি হয়; তিনটি কোয়ার্ক মিলে একটি প্রোটন বা নিউট্রন তৈরি হয়। আরও পরে যখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স মাত্র ২০০ সেকেণ্ড এবং তাপমাত্রা $১০^{৯}$ কেলভিন তখন হাইড্রোজেন থেকে সংশ্লেষণ (fusion) প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম গঠন শুরু হয় এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তাহাই সূর্য ও নক্ষত্রদের আলোক বিকিরণের ক্ষমতা দান করে। কার্বন, অক্সিজেন, লৌহ এবং অন্যান্য আরও জটিল কেন্দ্রক (nucleus)-গুলি নক্ষত্রের মধ্যে গঠিত হয়। জ্বালানি হিসাবে হাইড্রোজেন যখন নিঃশেষিত হয় তখন হয়তো নক্ষত্র বিস্ফোরিত হয়ে যে ভস্মাবশেষ সৃষ্টি হয় তার মধ্যেই সমস্ত উচ্চতর উপাদানগুলি ধূলিকণা হিসাবে শূন্যে ভাসতে থাকে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে এই কণাগুলি একসঙ্গে সংযুক্ত হলে আমাদের সৌর-জগতের সৃষ্টি হয় এবং একারণে হাইড্রোজেন থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত সমস্ত উপাদান আমরা আমাদের পৃথিবীতে পাই। আমাদের সৌরজগৎ ৫০০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়। যখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ১ লক্ষ বছর এর তাপমাত্রা ছিল ৩০০০ ডিগ্রি কেলভিন এই তাপমাত্রা নিস্তড়িৎ পরমাণু তৈরি হওয়ার উপযুক্ত ছিল। যখন এর বয়স ১০০ কোটি বছর তখন সাধারণ তারকাপুঞ্জ সৃষ্টি হয় এবং বয়স যখন ১০০০ কোটি বৎসর তখন বর্তমান গঠনের ব্রহ্মাণ্ড আকৃতি গ্রহণ করে। কৃষ্ণবস্তু (Black body) বিকিরণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এক ধরনের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তরঙ্গ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছে, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যানজিয়াস্ ও উইলসন্ এটি আবিষ্কার করেন। কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের জন্য যে ৩^{0} কেলভিন তাপমাত্রার প্রয়োজন সেই তাপমাত্রাই ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপৃত তাপমাত্রা। যখন ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ১ লক্ষ বছর এবং ইহা যথেষ্ট উত্তপ্ত তাপমাত্রা ১০০০^{0} কেলভিন তখন নিস্তড়িৎ পরমাণুগুলি গঠিত হতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাপবিকিরণের ফলে শেষপর্যন্ত ৩^{0} কেলভিনে পৌঁছায় এবং ইহাই দেড়হাজার কোটি বছর আগেকার অবস্থা মনে করিয়ে দেয়। এই আবিষ্কার এভাবেই 'বিপুল নির্ঘোষ' (Big-Bang) সূত্রকে সমর্থন করে।

এখন দুটি প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে উদয় হয়: প্রথম, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কোথা থেকে এল? দ্বিতীয়তঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ কী? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো ডিরাক্-নির্দেশিত শূন্যতা থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। প্রারম্ভে সমস্ত শক্তিই বিকিরণ-রূপে বিরাজমান ছিল যা থেকে অসীম ঘনত্ব ও তাপ-মাত্রার বস্তু ও প্রতি বস্তু উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত 'বিপুল-নির্ঘোষ' (Big-Bang) নামক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। বস্তু ও প্রতিবস্তুর অংশগুলি ছিটকে পড়া স্ফুলিঙ্গের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

* $১০^{৪৩}$—একককে $১০^{৪৩}$ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভগ্নাংশ পাব।

কালের প্রবাহের সঙ্গে বস্তু ও প্রতিবস্তুর স্তূপগুলি বহু দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পরস্পরকে আর বিলোপসাধন করতে পারে না। একটি বিশেষ পর্যায়ে প্রতিবস্তু অপেক্ষা বস্তুর সংখ্যাধিক্য দেখা দেয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিবর্তন ঘটতে থাকে। যদি 'বিপুল নির্ঘোষ' (Big-Bang) নামক বিস্ফোরণ এত তীব্র হয়ে থাকত যার ফলে স্ফুলিঙ্গ বা বস্তুপুঞ্জ চিরদিন বাইরের দিকে ছুটতে থাকত এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ চলতে চলতে সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকত। অপরপক্ষে যদি ব্রহ্মাণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণে বস্তু থাকে যা ঐ অপসরমাণ বস্তুপুঞ্জকে পিছন থেকে আকর্ষণ করে থামিয়ে দিয়ে আবার বিপরীত মুখে গতিশীল করতে পারে তবে ব্রহ্মাণ্ড আবার সংকুচিত হতে থাকবে। তাহলে হাজার কোটি বছর পরে ব্রহ্মাণ্ডের সংকোচন শুরু হবে এবং তা চলতে থাকবে যতক্ষণ না আবার 'বিপুল-নির্ঘোষ' (Big-Bang) পর্যায়ে পৌঁছায়। তখন আবার বিস্ফোরণ এবং প্রসারণ ঘটবে। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত 'বিপুল-নির্ঘোষ' বা 'Big-Bang' একটি শাশ্বত প্রারম্ভ নয়, এটি কেবল এই যুগের সূচনা মাত্র। বিপরীতগতি ঘটবার জন্য যে পরিমাণ বস্তুর অস্তিত্ব দেখা যায় তার দ্বিগুণ বস্তু প্রয়োজন হবে। সন্দেহ নেই অদৃশ্য বস্তুর পরিমাণ বিপুল এবং তাদের অস্তিত্ব তাদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের দ্বারা অনুভূত হয়। বিপুলসংখ্যক নিউট্রিনোর (Neutrino, নিউট্রিনো নিস্তড়িৎ এবং প্রায় ভরহীন)। অস্তিত্ব অদৃশ্য বস্তুর আংশিক হিসাব তুলে ধরে, তার পরেও কিছু বাকি থেকে যায়। এই কল্পসূত্র 'বিপুল-নির্ঘোষ' (Big Bang) এর আগে কি ছিল সেই প্রশ্নের উত্তর জোগানোর অসুবিধাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

॥ ২ ॥

বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় মোট বিরানব্বইটি বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছেন। প্রথমটির নাম হাইড্রোজেন এবং সর্বশেষটির নাম ইউরেনিয়াম। এই বিরানব্বইটি বিভিন্ন ধরনের পদার্থকে মৌল উপাদান (element) বলা হয়। আমাদের সামনের যাবতীয় বস্তু সকল তার ঐ বিরানব্বই মৌল উপাদান দিয়ে গঠিত। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে একটি ধনাত্মক আধানযুক্ত (positively charged) নিউক্লিয়াস এবং চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক (negatively charged) আধানযুক্ত ইলেকট্রনগুলি রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে একটি পরমাণু হচ্ছে তড়িৎ-নিরপেক্ষ এবং এতে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যা দ্বারা এর গুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়। হাইড্রোজেনের একটি, হিলিয়ামের দুটি এই ভাবে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ক্ষেত্রে বাড়তে বাড়তে ইউরেনিয়ামে আছে ৯২টি ইলেকট্রন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন এবং তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন-কণাসমূহ, সেগুলির প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় ২০০০ গুণ ভারি। প্রোটন ও নিউট্রন কণাগুলি একসঙ্গে যুক্ত থেকে একটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন হল মৌলিক কণা, যেগুলি দিয়ে ৯২টি বিভিন্ন এলিমেন্ট বা পরমাণু তৈরি। অণু (molecule) হচ্ছে একাধিক পরমাণুর সংযুক্তি যেমন একটি জলের অণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর যোগ। একটি প্রোটিনের অণু প্রধানতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের পরমাণু নিয়ে গঠিত। এরূপ একটি অণুতে পরমাণুর সংখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে এক হাজারেরও বেশি হতে পারে। বিভিন্ন অণুর মোট সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু সেগুলো সবই ঐ ৯২ টি পরমাণু দিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন রকমের পরমাণু বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান। ঐ সব পরমাণুর কয়েকটি মাত্র তেজস্ক্রিয় (redioactive) এবং তাদের মধ্যে বিখ্যাত হ'ল 'রেডিয়াম'। ইলেকট্রন ও অন্যান্য উপাদান নিঃসরণের দ্বারা ক্ষরিত হয়ে একটি তেজস্ক্রিয় পরমাণু স্বাভাবিক ভাবে অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমরা চার রকমের শক্তি ক্রিয়াশীল দেখতে পাই যারা বিভিন্ন বস্তুর গতি ও স্থায়িত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিউটন কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যাকর্ষণ-বলের (gravitational force) প্রভাবে সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহগুলির গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। কুলম্ব (Coulomb) বর্ণিত তড়িৎবলের প্রভাবে পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ইলেকট্রনের

আবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঐ একই বলের জন্য পরমাণুগুলি অণুর মধ্যে যুক্ত থাকে। প্রবল (strong) নিউক্লিয় বলের প্রভাবে প্রোটন ও নিউট্রন একসঙ্গে যুক্ত থাকে এবং দুর্বল (weak) নিউক্লিয় বলের জন্য ক্ষয়ের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় রূপান্তর সংগঠিত হয়। প্রোটন ও ইলেকট্রনের মতো ক্ষুদ্র ভরের (mass) ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ বল নগণ্য কিন্তু সূর্য বা গ্রহের মতো বৃহৎ বস্তুর ক্ষেত্রে তারই প্রাধান্য।

নিউটনের পদার্থ সংক্রান্ত সূত্রগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখিত হল সেগুলি গ্রহনক্ষত্র এবং পৃথিবী বা পৃথিবীর বাইরে সমস্ত বস্তুর গতি সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আলোককে এক ঝাঁক কণিকার সমাবেশ বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। পর্দার উপর দুটি সংসক্ত (coherent) উৎস থেকে আলোক রশ্মি একে অপরের উপর আপতিত হওয়ার ফলে পর্যায়ক্রমে যে উজ্জ্বল ও অন্ধকার রেখাগুচ্ছের ঝালর সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হাইগেন আলো সম্বন্ধে নিউটনের ধারণাকে উল্টে দিয়ে বললেন যে আলোক হচ্ছে তরঙ্গগুচ্ছের সমাবেশ। আলোর তরঙ্গ গতি একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। একটি উৎসের তরঙ্গের উত্তল বিন্দু (crest) যখন অন্য উৎসের তরঙ্গের অবতল বিন্দুর (trough) সঙ্গে মিলিত হলে, লব্ধ (resultant) তরঙ্গশূন্য হওয়ার ফলে অন্ধকার এবং উত্তল বিন্দুর সঙ্গে উত্তল বিন্দু অথবা অবতল বিন্দুর সঙ্গে অবতল বিন্দুর মিলনের ফলে উজ্জ্বল আলোকম্পের সৃষ্টি হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন বলেন কোন ধাতুর আলোকপাত হলে যে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয় তার সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় যদি আলোককে কণিকাগুচ্ছ হিসাবে কল্পনা করা হয়। এই কণিকাকে বলে ফোটন (photon)। সেই কণিকাই আলোর মৌল উপাদান না আলোকম্প সঞ্চারি তরঙ্গ গঠন আলোকের আসল রূপ তা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ডেভিসন ও গার্মার পরীক্ষার সাহায্যে দেখালেন যে, যে ইলেকট্রনকে আমরা এত দিন কণিকা হিসাবে ভেবে এসেছি সেটি তরঙ্গের মতো ব্যবহার করে এবং এই মত আগেকার চিন্তাবিদগুলির চিন্তাধারাকে সমর্থন করে। সুতরাং বস্তু (particle)ও আলো উভয়েই কণা ও তরঙ্গ এই দ্বৈত সত্তার দ্যোতক। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্রোডিংগার তরঙ্গ বলবিদ্যা (wave mechanics) প্রকাশ করেন যাতে কণিকাগুলিকে তরঙ্গ হিসাবে ভাবা হয়। তিনি সমস্ত ঘটনার পিছনে নিউটনের নিশ্চিত নীতিকে (determinism) বাতিল করে সম্ভাব্য নীতির (probability) ধারণা প্রবর্তন করেন। আমরা বলতে পারি না "কোন ঘটনা নিশ্চিত ঘটবে।" যেটা আমরা বলতে পারি তা হ'ল "এটা খুব সম্ভব ঘটবে"। পুরাতন পদার্থবিদ্যার শাশ্বত শুদ্ধতা ও সূক্ষ্মতা তখন ভ্রান্তি মাত্র। কণিকাগুলির ভবিষ্যৎ আচরণকে এখন একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্ভাব্যতা বলে প্রকাশ করা হয়। এটি পুরনো পদার্থবিদ্যার কঠোর নিশ্চয়তাবাদ থেকে মৌলিক নিষ্ক্রমণ। আইনস্টাইন বললেন—তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে ভগবান পাশা খেলছেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরাক স্রোডিংগারের সূত্রের আপেক্ষিক তত্ত্ব (Relativistic wave mechanics) প্রকাশ করলেন এবং বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে এলেন যে, একটি কণার সব সময়ই একটি প্রতিকণার(antiparticle) আছে; যেমন একটি ইলেকট্রনের প্রতিকণা হচ্ছে পজিট্রন যাহা পরবর্তী কালে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এ্যান্ডারসন আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে ঋণাত্মক শক্তিসম্পন্ন অসীম বিস্তৃত অসংখ্য কণিকার দ্বারা পূর্ণ সেগুলি কোন ভাবেই দৃশ্যমান নয়। কেবল মাত্র যখন একটি 'ফোটন' ঋণাত্মক শক্তিপর্যায়ের একটি কণাকে সাধারণ কণা হিসাবে দৃশ্যমান ধনাত্মক শক্তি পর্যায়ে তুলে দেয় তখনই শূন্য অবস্থার ঋণাত্মক শক্তি পর্যায়ের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে একটি গর্ত হিসাবে প্রতিভাত হয় এবং একটি প্রতিকণা হিসেবে আচরণ করে। সুতরাং একটি ফোটনের দ্বারা একই সঙ্গে একটি কণা ও প্রতিকণার সৃষ্টি হয়। ধনাত্মক শক্তি পর্যায়ের একটি কণা যখন উপরোক্ত গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে সেটিকে পূর্ণ করে দেয়, তখন কণা ও প্রতিকণাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে 'ফোটন' নির্গত হয়। নিউটনের মতে শূন্যস্থান হল কোন কিছু না থাকার শূন্যতা। কিন্তু ডিরাকের মতে শূন্যস্থান হচ্ছে ঋণাত্মক শক্তি পর্যায়ের বিস্তৃতির মধ্যে অসংখ্য কণা-সমুদ্র; কেবলমাত্র ঐ বিস্তৃতির মধ্যে একটি কণার অনুপস্থিতি দৃশ্যমান ক্ষেত্রে একটি প্রতিকণা

হিসাবে প্রতিভাত হবে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ (special) আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। এই তত্ত্বানুসারে রেল প্ল্যাটফর্ম বা চলন্ত ট্রেন যেখান থেকেই পরীক্ষা করি না কেন সমস্ত পার্থিব নিয়ম এক হতে হবে। স্থির বা চলন্ত কাঠামো যেখান থেকেই মাপি না কেন আলোর গতিবেগ একই হতে হবে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল—ভর ও শক্তির অভিন্নতা এবং স্থান ও কালের সংযুক্তির দ্বারা অবিভাজ্য। 'স্থান-কাল' নামক নির্দেশতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন। দুটি ঘটনা যেগুলি একই নির্দেশ তান্ত্রিক কাঠামোতে সমকালীন ঘটনা বলে মনে হয় গতিশীল কাঠামোতে সেগুলি তা নাও হতে পারে। শক্তির মান ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুই হতে পারে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইনের সাধারণ (general) আপেক্ষিক সূত্র প্রকাশিত হল। এই সূত্রে মাধ্যাকর্ষণ বলের ধারণাকে 'স্থান-কাল' নামক নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতির জ্যামিতিক কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। বস্তুর উপস্থিতি 'স্থান-কাল' ক্ষেত্রকে বক্রতা প্রদান করে; অধিক বস্তুর উপস্থিতি মানেই অধিক বক্রতার সৃষ্টি। সেই মতবাদের ফলস্বরূপ ক্রমবর্ধমান বিশ্বের (expanding universe) ধারণা আসে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে প্ল্যাংক (Planck) সাধারণ প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্নতা ও খণ্ডতার ধারণার সূত্রপাত করেন; যেমন কোন তপ্ত বস্তু নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়, বস্তুতঃ বিচ্ছিন্নভাবে পর্যায়ক্রমে আলোক প্রদান করে। পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নির্দিষ্ট পথে ঘোরে, এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে লাফিয়ে পড়ায় আলোর 'ফোটন' নির্গত হয়, অনুরূপ প্রতিটি লম্ফের দরুণ এক একটি করে 'ফোটন' নির্গত হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কোন নিরবচ্ছিন্ন মূর্তি গ্রহণ করে না পরন্তু দূরদর্শনের ছবির মতো খণ্ড বা অমসৃণ হতে পারে। হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা-সূত্র একই সঙ্গে অবস্থিতি এবং গতিবেগ নির্ণয়ের সঠিকতার মাত্রার উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।

সুতরাং ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়গুলিকে সন্নিবিষ্ট করলে দাঁড়ায়ঃ

(১) সম্ভাব্যতার ধারণা কর্তৃক নিউটনের নিশ্চিতবাদ নীতির স্থান গ্রহণ।

(২) কণা ও আলোক উভয়েরই একই সঙ্গে কণিকার ন্যায় ও তরঙ্গের ন্যায় দ্বৈত আচরণের প্রকাশ।

(৩) শূন্যস্থান সম্পর্কে ধারণা বর্তমানে নিউটন কথিত "কিছু না থাকার শূন্যতার" পরিবর্তে প্রভূত অদৃশ্য কণার সমাবেশ।

(৪) প্রতিটি কণার জন্য একটি প্রতিকণার অস্তিত্ব বর্তমান, ফলে বস্তুরও প্রতিবস্তু বিদ্যমান।

(৫) ভর ও শক্তির অভিন্নতা। শক্তির মান ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দুই হতে পারে।

(৬) স্থান-কাল কাঠামোয় স্থান হইতে কালের অবিচ্ছিন্নতা।

(৭) স্থান-কাল বিস্তৃতির জ্যামিতিক কাঠামোতে মাধ্যাকর্ষণ-বলের প্রতিস্থাপন।

(৮) পার্থিব প্রক্রিয়াগুলি কোয়ান্টাম লম্ফ নীতিতে ঘটে।

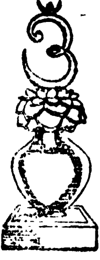
(৯) চারপ্রকার বলের অস্তিত্ব বর্তমান।

(১০) বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারণশীল অবস্থায় বর্তমান।

(১১) প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন এই তিন প্রকারের মৌলিক কণার দ্বারা পরমাণু গঠিত এবং একাধিক পরমাণু দিয়ে অণু গঠিত হয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জানা আজও শেষ হয়নি। বিশ্বজুড়ে এখনও চলছে নানান ধরনের গবেষণা। বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাগুলি হতে এখন আসে দু-একটি করে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের তথ্য। আমরা তাই কখনই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা গঠন সম্পর্কে শেষ কথা বলার অধিকারী হতে পারি না।*

*এই প্রবন্ধ রচনার ব্যাপারে ধনঞ্জয় দাস এবং বৈদ্যনাথ গুপ্ত লেখককে বিশেষ সহায়তা করেছেন।



আনন্দের সন্তান

স্বামী অদ্ভুতানন্দ ঃ অদ্ভুত আনন্দময় এক পুরুষ

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণ পরিচয় করাচ্ছেন তাঁর শিষ্য 'লেটো'কে। যেমন গুরু তেমনি চেলা। ব্যঞ্জনবর্ণে এসে হোঁচট খেতে হল গুরুমশাইকে। শিষ্যের হিন্দুস্থানী সংস্কার। 'ক'কে বলছেন 'কা', 'খ'-কে বলছেন 'খা'। গুরুমশাই সস্নেহে শিষ্যকে শুধরে দেবার চেষ্টা করেন ঃ "ওরে ওটা 'ক', 'কা' নয়।" শিষ্য চেষ্টা করলেন তাঁর উচ্চারণ ঠিক করতে। কিন্তু উচ্চারণ যখন করলেন তখন আবার বললেন 'কা'। গুরু আবার শুধরে দেন, কিন্তু শিষ্যের সেই 'কা'। গুরু তখন বললেন ঃ "আরে 'ক'-কে যদি 'কা' বলবি তবে 'ক'-এ আকারকে কি বলবি?" তবু শিষ্যের সেই এক বুলি—কা। ভদ্রলোকের এক কথা কিনা। বিফলমনোরথ গুরু তখন বললেন 'যাঃ আর তোর পড়ে দরকার নেই।' গুরু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ততোধিক হাঁফ ছাড়লেন শিষ্য। লেটোর বিদ্যাভ্যাসে সেখানেই ইতি। ইতি যে টানতেই হবে, কারণ নিরক্ষর লেটোকে নিরক্ষর গুরুর যে উত্তরাধিকার বহন করতে হবে। নিরক্ষরের মুখ দিয়ে কিভাবে বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব উৎসারিত হয়, প্রজ্ঞার আলোক 'অজ্ঞে'র হৃদয়ে কিভাবে স্বতই উদ্ভাসিত হয় তা জগৎকে দেখিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অধ্যাত্ম ইতিহাসেই এই 'মিরাকল'। বরং বলা চলে অধ্যাত্ম-ইতিহাসেই শুধু এই ব্যাপার ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মিরাকল' লেটো—পরবর্তী কালের স্বামী অদ্ভুতানন্দ। সেটি আবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। যেমন বাপ তেমনি বেটা—বাপকা ব্যাটা।

বিদ্যাভ্যাস শেষ হল; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অল্প বয়সেই শিষ্যকে নেশায় আসক্ত করে দিলেন। "যে-সে নেশা নয়, একদম রাজা নেশা!" ঈশ্বরের নেশা'য় আসক্ত করে দিলেন। সে নেশা যখন কারও হয় সেই বোঝে সে নেশা কি সাংঘাতিক। সাধারণ মাদক দ্রব্যের নেশা মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, নেশাই তাকে খায়। আর এই নেশা যাকে ধরে তাকে জীবনের আস্বাদ দেয়—অনন্ত জীবন। এই নেশা যাকে ধরে তাকে খায়ই না, তার সর্বস্ব আত্মসাৎ করে। আবার এই নেশা সংক্রামকও। শ্রীরামকৃষ্ণ এই নেশায় বুঁদ করে দিচ্ছিলেন তাঁর এই অক্ষর জ্ঞানহীন অজ্ঞাত কুলশীল হিন্দুস্থানী গ্রাম্য বালক শিষ্যকে। একদিন লাটু শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বল দিকিনি, তোর রামজী এখন কি করছেন?" লাটু ঠিক বুঝতে পারলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন। তাই চুপ করে রইলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বললেন ঃ "ওরে, তোর রামজী এখন সুচের ভিতর হাতি চালাচ্ছেন।" পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করে লাটু মহারাজ বলতেন ঃ "আমার এতটুকু আধার—আমার ভিতরে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন।"

সেই 'সাধন ঢালার' ফলশ্রুতি লেটো থেকে লাটু মহারাজ—স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

অদ্ভুতানন্দের সবই অদ্ভুত। মঠ তখন বরানগরে। রাতের বেলায় লাটু ঘুমান না। সবাই যেমন খাওয়া-দাওয়ার পরে শোন, তিনিও তাই করেন। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাক ডাকতে শুরু করে। ওটি কিন্তু ভান। আসলে নাক ডাকার ভান করে তিনি সকলকে বোঝাতে চান যে, তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি উঠে মালা জপ করতে বসেন। একদিন রাত্রে মালার খরখর শব্দ শুনে জনৈক গুরুভাই ভাবলেন, ঘরে ইঁদুর ঢুকেছে। তিনি ইঁদুর তাড়াবার জন্য মুখে শব্দ করে তাড়া লাগালেন। শব্দ বন্ধ হল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর আবার সেই খরখর শব্দ। গুরুভাইটি আবার তাড়া দিলেন আবার শব্দ বন্ধ।

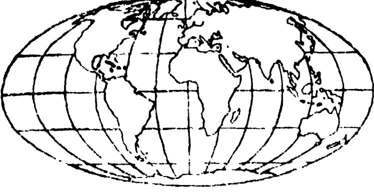
সেই রাত্রি এভাবেই চলল। পরের রাত্রিতে সেই গুরু-ভাই পাশে একটি লণ্ঠন রেখে শুলেন। যেই খরখর শব্দ হওয়া অমনি তিনি লণ্ঠন জ্বালালেন। দেখেন লাটু মহারাজ বসে জপ করছেন। খরখর শব্দটি তাঁর জপের মালার।

স্বামীজীর সঙ্গে লাটু মহারাজ কাশ্মীর ভ্রমণ করছেন। একদিন স্বামীজী কাশ্মীরের এক প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে বললেন: "মন্দিরটি দু-তিন হাজার বছরের পুরনো। অমনি স্পষ্টবক্তা লাটু মহারাজ প্রশ্ন করলেন: 'তুমি কি করে বুঝলে? আমাকে বুঝাও। ওখানে কি সেকথা লিখা আছে?' স্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন: 'তোকে সেকথা বোঝাতে পারব না। যদি তুই লেখাপড়া শিখতিস তাহলে হয়তো তোকে তা বোঝাতে চেষ্টা করতাম।' লাটু মহারাজের ঝটিতি প্রত্যুত্তর: 'ও, বুঝেছি। তুমি এমন বিশ্বান যে, আমার মতো গণ্ড মুর্খকেও বোঝাতে পার না।' লাটু মহারাজের এই উত্তরে উপস্থিত সকলের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। সেই হাসিতে যোগ দিলেন স্বামীজীও।

একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দ (সুধীর মহারাজ)-এর সঙ্গে লাটু মহারাজ সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির উপনিষদ্ ব্যাখ্যা শুনতে গিয়েছিলেন। পণ্ডিত কঠ-উপনিষদের একটি বিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা করছিলেন, ব্যাখ্যা লাটু মহারাজের খুব মনঃপুত হয়েছিল। কারণ ব্যাখ্যায় পণ্ডিত যে অনুভূতির কথা বলেছিলেন সেই অনুভূতির সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভূতির সাদৃশ্য। তাই সোৎসাহে তাঁর পাশে বসা স্বামী শুদ্ধানন্দের গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠলেন: "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" ওদিকে পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে চলেছেন। শ্রোতারাও নিবিষ্টমনে ব্যাখ্যা শুনছেন। লাটু মহারাজের সেদিকে খেয়াল নেই। তাঁর মাথায় পণ্ডিতের পূর্বকথিত ব্যাখ্যাটিই ঘুরছে। আনন্দের আতিশয্যে তিনি আবার স্বামী শুদ্ধানন্দকে ঠেলা দিয়ে বললেন: "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" এইরকম কয়েকবার হওয়ায় শুদ্ধানন্দ মহারাজ বুঝলেন যে এই বয়স্ক শিশুটি আর অধিকক্ষণ সভাগৃহে থাকলে একটি মহা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে। সুতরাং লাটু মহারাজকে নিয়ে তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। আবাসস্থলে ফেরার পরেও অদ্ভুতানন্দের আনন্দ হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অন্তরের আনন্দ উদ্বেলিত তরঙ্গের মতো বাইরের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়তে লাগল। আর সেই তরঙ্গের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছিল সুধীর মহারাজকে—'এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।' লাটু মহারাজ এবং সুধীর মহারাজ একই ঘরে থাকতেন। রাত্রে খাবার পর দুজনেই শুয়েছেন। কিছুক্ষণ পর সুধীর মহারাজ ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কারণ ভাবে বিভোর লাটু মহারাজ পার্শ্ববর্তী সুধীর মহারাজের গায়ে ঠেলা দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়েছেন। সুধীর মহারাজ ধড়মড় করে উঠে বসেছেন। লাটু মহারাজ বললেন: 'এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।' বলা-বাহুল্য সুধীর মহারাজের সে রাত্রে আর ঘুম হল না। ঘুম হওয়াও সম্ভব ছিল না।

বলরাম মন্দিরে আছেন লাটু মহারাজ। একদিন সেখানে এক মাতাল এসে ঢুকেছে। সেখানে লাটু মহারাজকে দেখে মাতালটি তাঁকে খুব গালাগালি করতে শুরু করলেন। কিন্তু লাটু মহারাজ নির্বিকার। তিনি মিটি মিটি হাসছেন। তাতে মাতাল গেছে আরও ক্ষেপে। ফলে গালাগালের বহরও উঠল চরমে। তাতে উপস্থিত ভক্তেরা খুব স্বভাবতই উত্তেজিত। সবাই মিলে মাতালটিকে শুধু বকাবকিই করলেন না, তাকে প্রহার করতেও উদ্যত হলেন। তা দেখে ব্যস্ত হয়ে লাটু মহারাজ তাঁদের তা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা তা শুনছেন না। মহারাজের অপমানে তাঁরা তখন ভীষণ উত্তেজিত। মাতালকে তাঁরা মারবেনই। তখন লাটু মহারাজ বললেন: "দেখ, ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছে আর তোমরা যে মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছ! ওকে মারতে যাচ্ছ! কার শাস্তি হওয়া উচিত বল তো? ওকে তোমরা কি মারবে? মদই যে ওকে মেরে রেখেছে।" এই কথার পর সবাই শান্ত হলেন। কি অসাধারণ কথা! এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বামীজীর একটি কথা। যদিও স্বামীজী রহস্য করেই সেটি বলেছিলেন—"লেটো দেখছি প্লেটোর মতো কথা বলে!"

উপস্থাপন: **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**



বাতায়ন

রোটারি ক্লাবের ইতিকথা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের ৩৭ বৎসর বয়স্ক পল. পি. হ্যারিস। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী। তাঁর তিনজন বন্ধুকে নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করেছিলেন। তাঁরা ঘুরে ঘুরে (by rotation) পরস্পরের বাড়িতে জমায়েত হতেন। এই ব্যাপারটি মনে রেখে হ্যারিস ক্লাবের নামকরণ করেছিলেন 'রোটারি' (Rotary)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকার মতে "এটিই প্রথম অসামরিক সেবামূলক ক্লাব।"

রোটারি আন্দোলন সামান্যভাবে আরম্ভ হলেও তার প্রতিষ্ঠাতা হ্যারিসের কিন্তু বড়রকমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল। রোটারির মোটামুটি উদ্দেশ্য ছিল এবং এখনও আছে—ব্যবসায়ের মূলে থাকবে সেবার মনোভাব, সভ্যদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং আন্তর্জাতিক শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। হ্যারিসের ভাষায়, "রোটারিতে অন্যদের জন্য চিন্তা হচ্ছে সেবার মূল কথা এবং অন্যকে সাহায্য করাতে এটি মূর্ত হবে। এ-দুটির মিলনে হবে রোটারি-সেবার আদর্শ।" রোটারি দুটি আদর্শ বাণী গ্রহণ করেছে—"সেবা স্বার্থের উপরে", এবং "যে সেবা করে সে লাভবান হয়।"

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিসের মৃত্যুর সময় সারা পৃথিবীতে ৬২৩৪টি রোটারি ক্লাবে ৩০০৫২৯ জন সভ্য ছিলেন। আজ ১৬১টি দেশের ৪২৫টি জেলায় ২৩০০০ ক্লাবে ১০ লক্ষেরও বেশি সভ্য আছেন। (সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীমকোর্টের মহিলাদের সভ্য করার অনুকূলে রায় দেওয়ার আগে পর্যন্ত ক্লাবে পুরুষদেরই নেওয়া হতো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সব দেশে মেয়েদের জন্য রোটারির স্বার উন্মুক্ত হয়নি)।

রোটারির আয়ের উৎস হচ্ছেঃ সভ্যদের চাঁদা, উইল করে দান, জনগণের অনুদান, ন্যাসাধীন সম্পত্তি (Trust) এবং প্রচারকার্যের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ। যত দিন যাচ্ছে, রোটারি শিক্ষাখাতে ব্যয় বাড়াচ্ছে। এখন বছরে ১০০০ যুবক-যুবতীকে বিদেশে শিক্ষার বা পেশাদারী শিক্ষার জন্য খরচ দিয়ে রোটারি ক্লাব বিদেশে পাঠায়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সংস্থা ১৫৬টি দেশে ২০,০০০ শিক্ষার্থীকে ১১৫০ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়েছে।

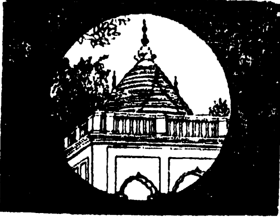
বিশ্বস্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যাপারে শিশুদের অসুখের উপর রোটারি বেশি জোর দেয়। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রোটারি ছয়টি অসুখের উপর সংগ্রাম শুরু করেছে, যে অসুখগুলি উন্নতিশীল দেশে বৎসরে ৩৫ লক্ষ শিশুর প্রাণহানির কারণ—পোলিও, হাম, ডিপথিরিয়া, যক্ষ্মা, ধনুষ্টঙ্কার ও হুপিং কাশি। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, রোটারি তার জন্মশতবার্ষিকীতে অর্থাৎ ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে সারা পৃথিবীকে পোলিওমুক্ত করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে। জাতিসংঘ যে ছয়টি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়, রোটারি তাদের অন্যতম।

ভারতের রোটারি সংস্থা :

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রোটারির জন্মের চৌদ্দ বছর পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার একজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী আর. জে. কুমবুস্ ১৪ জন ইংরেজকে নিয়ে প্রথম রোটারি ক্লাব স্থাপন করেন। এটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি। কলকাতার নিতীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রথম এশিয়াবাসী যিনি ১৯৬২-৬৩ তে আন্তর্জাতিক রোটারির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। বর্তমানে ১১০০ ক্লাব ও তাদের ৫০৩০০ সভ্য নিয়ে বিশ্বে ভারতের স্থান (ক্লাবের সংখ্যা অনুযায়ী) চতুর্থ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম—৬৩৩০টি ক্লাব, জাপান দ্বিতীয়—১৬২৪টি ক্লাব, ইংলন্ড তৃতীয়—১৬১৮টি ক্লাব)। রোটারির পোলিও দূরীকরণ একটি দুঃসাহসিক অভিযান, তবে এ ছাড়াও নানা ক্ষুদ্র অথচ প্রয়োজনীয় প্রকল্পে রোটারির স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী রোটারির প্রতিষ্ঠাতা হ্যারিসের 'সেবা স্বার্থের উপরে' নীতিটিকে রূপায়িত করে চলেছেন।

[SPAN—Sept., 1988, p. 33]

অনুবাদ ও উপস্থাপন : জলধিকুমার সরকার



গ্রন্থ পরিচয়

পরমানন্দ সরস্বতী

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

কবিমনীষী পরমানন্দ সরস্বতী—শংকরাচার্য। ১০১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭। পঁচিশ টাকা।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ শংকরাচার্য বর্তমান গ্রন্থে পরমানন্দ সরস্বতীর একটি চিত্তাকর্ষক আলেখ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। জ্যোতিষ, কাব্য ও দর্শন —এই তিন দিক থেকে শংকরাচার্য পরমানন্দকে দেখেছেন। এই দেখা শুধু চোখের আলোয় চোখের বাইরে দেখা নয়। লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি আলোকাতীত অন্ধকারে প্রবেশ করতে পেরেছে—যে আঁধার আলোর অধিক।

গ্রন্থের তিনটি সুলিখিত অধ্যায় আছে—জ্যোতিষ-পরিক্রমা, কাব্য-পরিক্রমা, জীবন-দর্শন। জ্যোতিষের প্রণালী অনুসারে পরমানন্দের রাশিচক্র সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের স্বরূপও নিপুণভাবে আলোচিত। তাঁর জীবন-দর্শনও সুললিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ মৌলিক ও সুখপাঠ্য এবং সুমুদ্রিত গ্রন্থটি আধুনিক বাঙলা ধর্মসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বাস্থ্য ও ব্যাধি

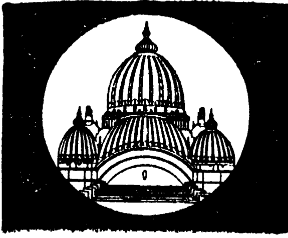
জলধিকুমার সরকার

A Profile of Health and Diseases of West Bengal: কে. সি. বসুমল্লিক। শ্রীকান্ত বসুমল্লিক, পি. ১৮৫, সি. আই. টি. স্কিম ৬, এম. কলিকাতা-৭০০০৫৪।

বইটিতে পশ্চিমবাংলার জনগণের স্বাস্থ্য ও অসুখবিসুখ সম্বন্ধে নানা তথ্য দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এ ধরনের বই আগে চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। অন্য রাজ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। লেখক বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক ও ডাইরেক্টর ছিলেন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেক্টর অব হেল্থ সার্ভিসরূপে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখে জনগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সেই হিসাবে তাঁর দেওয়া তথ্য ও মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। বহু পরিশ্রমে নানা রিপোর্ট হতে, অথবা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করে তিনি তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এইসব তথ্যের জন্য আর নানা জায়গায় ঘুরতে হবে না। লেখক নিজে গবেষক ছিলেন বলে তথ্যগুলির মোটামুটি তথ্যপঞ্জী দিয়েছেন। বইয়ের শুরুতে 'পশ্চিমবঙ্গ—তার জমি ও জনগণ' পরিচ্ছেদে, স্বাস্থ্য ছাড়াও অনেক আনুষঙ্গিক বিষয়ে যেমন জলহাওয়া, জনসংখ্যা প্রভৃতি নানা খবর থাকায়, পাঠকদের অনেক সুবিধা হবে।

বইয়ে কিছু কিছু ছাপার ভুল আছে এবং হয়তো ছাপার ভুলের জন্যই দু-এক জায়গায় অর্থ বেশ স্পষ্ট নয়। লেখকের মতে, ম্যালেরিয়া দূরীকরণে মনোমত ফল না পাওয়ার অন্যতম কারণ কর্মীদের নিয়মানুবর্তিতার অভাব, পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে অর্থাভাব। এটি বেশ বোঝা যায় যে ইচ্ছা থাকলেও লেখক অনেক বিষয়ে আরও বেশি তথ্য দিতে পারেননি; কারণ, ভালভাবে তথ্য না রাখা আমাদের সকল স্তরের মজ্জাগত দোষ। বইয়ের মূল্য দেওয়া না থাকায় মনে হয়, লেখক মূলতঃ অর্থলাভের জন্য বইটি লেখেননি।

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, শিক্ষিত জনসাধারণের জন্য বইটি লেখার কথা ভাবা হয়েছিল। অর্থাৎ কেবল চিকিৎসকদের জন্য বইটি নয়। সেক্ষেত্রে, সকলের সুবিধার জন্য বইয়ের শেষে 'Splenic Index', 'R-1 type of resistance', 'Residual spray', 'Consolidation phase' প্রভৃতি কথাগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলে অ-চিকিৎসক পাঠকদের সুবিধা হতো। বইটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী : গত ২৪ জুলাই সালেম রামকৃষ্ণ মিশন ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি কিশোর সম্মেলনের আয়োজন করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় তিনশ জন ছাত্রছাত্রী এই সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনে প্রায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন

গত ৭ আগস্ট বম্বে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি।

পরিদর্শন

গত ২০ জুলাই কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিরিধর গোমাঙ্গো ও মেঘালয়ের বিধান-সভার অধ্যক্ষ পিটার মারবানিয়াং চেরাপুঞ্জী আশ্রম পরিদর্শন করেন।

ত্রাণ

বিহার ভূমিকম্পত্রাণ : বিহারে মধুবনী, মুঙ্গের ও দ্বারভাঙ্গা জেলায় গত ভূমিকম্পে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের বাড়ি তৈরির জন্য 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গুজরাট বন্যাত্রাণ : রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে রাজকোট, জামনগর এবং জুনাগড় জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে, খাদ্য, বাসনপত্র, কম্বল ও পশু-খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

গত আগস্ট মাসে মৈমনসিং (বাংলাদেশ) আশ্রম এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। ঐ শিবিরে তেত্রিশ বোতল রক্ত সংগৃহীত হয়েছে।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া) : গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি রবিবারে ও বুধবারে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন। ৪ সেপ্টেম্বর 'শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত বাণী' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং ১১ সেপ্টেম্বর 'ভক্তি' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী স্বাহানন্দ। গত ৩ সেপ্টেম্বর পূজা, ভক্তিগীতি পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে এই আশ্রমে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন করা হয়েছে, ঐদিন বিখ্যাত হিন্দি ধর্মমূলক চলচ্চিত্র মীরাবাঈ ইংরেজী ধারাবিবরণী সহ প্রদর্শিত হয়েছে।

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটি : গত সেপ্টেম্বর মাসে রবিবাসরীয় ক্লাসগুলিতে ধর্মালোচনা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী স্বাহানন্দ এবং স্বামী প্রমথানন্দ। গত ৩ সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি জন্মাষ্টমী পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১০ ও ২৭ আগস্ট, এবং ৯ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণা-নন্দজী শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী এবং শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী, এবং গত ৩ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ মাসের অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্র, পুরুলিয়া, বর্ধমান : স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই পাঠচক্র গত ১২ জানুয়ারি (১৯৮৮) স্বামীজীর জন্মদিনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। তাতে প্রায় ৭০০ জন গ্রামের ছেলেমেয়ে যোগদান করে। দুপুরে সঙ্গীত ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং পাঠচক্রের সভাপতি ব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ও সম্পাদক গোবিন্দ রায় স্বামীজীর উপর বক্তব্য রাখেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গতবছর মার্চ ও এপ্রিল মাসে পাঠচক্র স্বামীজীর জীবনের উপর দুটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল যা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ, কল্যাণী, নদীয়া : গত ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর সেবাসংঘের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী এক যুব-সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ যুবসম্মেলনের উদ্বোধন করেন। দু-দিনের বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন স্বামী সত্যরূপানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, অধ্যাপক পার্থ ঘোষ ও অধ্যাপক তাপস বসু। বিকালের প্রশ্নোত্তরের অধিবেশনটি পরিচালনা করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। গত আগস্ট মাসে সেবাসংঘের পরিচালনায় যেসব প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়েছিল তার পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানও এই সম্মেলনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানান্তে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সহযোগিতায় 'ভগিনী নিবেদিতা' ছায়াছবি দেখানো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম, রাজারহাট বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা : গত ২৭ আগস্ট আশ্রমে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের ১২৬তম জন্মতিথি বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, লীলাগীতি, কালী-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ-উপলক্ষে অপরাহ্নে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ ও স্বামী মন্ত্রাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর জীবন-চরিত আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ, রামপাড়া হুগলী : গত ৩ সেপ্টেম্বর এই সংঘের চতুর্থ-বার্ষিকী উৎসব পূজা, প্রসাদ বিতরণ, কথামৃত পাঠ, রামনাম-সংকীর্তন, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

যীশু যা জানতেন

'নিউ ব্ল্যাকফায়ার্স' নামে 'ডোমিনিয়ন অর্ডার অব ইংলণ্ড'-এর যে মাসিক পত্রিকা আছে তাতে যীশুর দেবত্ব সম্বন্ধে বিরাট বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দুজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অক্সফোর্ডের লজিকের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মাইকেল ডামেট, এবং কেম্ব্রিজের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিকোলাস ল্যাস উভয়ে এ-বিষয়ে পরস্পর খড়্গহস্ত হয়েছেন। তাঁদের এই তর্কযুদ্ধ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, মূল ধর্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে কেবল পুরোহিতরাই বিবদমান নন।

মিঃ ডামেট উপরোক্ত পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় আমেরিকার উদারমতাবলম্বী ধর্মতাত্ত্বিকগণের দ্বারা 'খ্রীষ্টধর্মীয় গোঁড়ামি'কে লঘুভাবে দেখার সমালোচনা করেছেন। তিনি আমেরিকায় ক্যাথলিকধর্মের শিক্ষাবিদ্‌গণের কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঐকমত্য তুলে ধরেছেন : যীশু, খ্রীষ্ট বা ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, এটি না জেনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তিনি খ্রীষ্টধর্মের 'ট্রিনিটি' সম্বন্ধে কিছুই জানতেন

না ; তিনি তাঁর মায়ের কাছে জেনেছিলেন কে তাঁর জন্মদাতা পিতা ; তিনি বলেছিলেন যে, 'মানুষের পুত্র' নামে একজন ত্রাণকর্তা আসবেন, কিন্তু যীশু যে সেই ত্রাণকর্তা, একথা কোনদিন তিনি বলেননি ; ডারহামের বিশপ একবছর আগে চার্চ অফ ইংলণ্ডকে অবাক ও আতঙ্কিত করে যা বলেছিলেন অর্থাৎ যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ কবরে ছিল ও পচেছিল।

আমেরিকার একজন শিক্ষাবিদ্ যিনি এখন চিকাগোর লায়োলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক টমাস সিহান, যিনি বর্তমানে ধর্ম-বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদী, এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মত্যাগ করেছেন। মিঃ ডামেট তাঁর কথাও বলেছেন। ঐ পত্রিকায় মিঃ ডামেট লিখেছেন যে, অতীতে ধর্মে বিশ্বাস নষ্ট হলে, লোকেরা গির্জার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতেন ; এখন তাঁরা সম্প্রদায়ে থেকে এমন পরিবর্তন আনছেন যাতে এটি শঠতাপূর্ণ হয়। তাঁরা বলতে চাইছেন যে, শুরু থেকে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বলে আসছে যে, এই সম্প্রদায় ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ঐশ্বরিক সত্যকে রক্ষা করবার দায়িত্ব পেয়েছে ; সম্প্রদায় এইভাবে মিথ্যা প্রচার করছে এবং সেই মিথ্যা সকলকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে। মিঃ ডামেট বলছেন যে এই সব এখন আর সহ্য করা যায় না, যদি অবশ্য ধর্মকে হাস্যাস্পদ না হতে হয়।

ভূতপূর্ব পুরোহিত মিঃ ল্যাস রাগতভাবে এর উত্তর দিয়েছেন। মিঃ ডামেটের বক্তব্যকে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য না করে তাঁকে 'ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ', 'ধর্মীয় আলোচনায় আংশিকভাবে সক্ষম' ইত্যাদি বলেছেন। মিঃ ল্যাস আরও বলেছেন যে, বর্তমান সময় ধর্ম-সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তির অনুকূল নয়, কারণ এতে ধর্মীয় একীকরণ প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে।

কিন্তু মিঃ ডামেট এতে দমেননি। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় আধুনিকীকরণের সংঘাত থেকে রক্ষার জন্য যেমন ধর্মযাজকদের শপথ নিতে হতো, সেরূপ আবার হবে—মিঃ ল্যাসের এরূপ আশঙ্কার তিনি কোন কারণ দেখেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক্যাথলিক ধর্মে 'আধুনিকতা'র অর্থ হচ্ছে—'ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদের সমষ্টি' যীশুখ্রীষ্ট দেবতা নন এবং তিনি ধর্মসম্প্রদায় করেননি বা ধর্মীয় আদেশ জারি করেননি—এই ধরনের মতবাদ। মিঃ ডামেট যা বলতে চাচ্ছেন তা হল যে, জনগণ ধর্মীয় মতবাদের কতটা পুনর্ব্যাখ্যা করতে পারে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার একটা গ্রহণীয় অনুমোদন।

[সূত্র : The Economist, January 1988, p. 90]

ভারতীয় অধ্যাপক আমেরিকায় 'মহান শিক্ষক' পুরস্কারে ভূষিত

আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়ার কাছে টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ভারতীয় অধ্যাপক অরবিন্দ ফাটক ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের 'গ্রেট টীচার' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শিক্ষাদানে উৎকর্ষের জন্য এটি হল যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান। অধ্যাপক ফাটক টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেণ্ট শাখার প্রধান। তাঁর এই পুরস্কারের সম্মানমূল্য ১০,০০০ ডলার। অধ্যাপক ফাটক ১৯৬৬ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। অধ্যাপক ফাটক বলেন যে, অধ্যাপনায় সার্থকতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ হল ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা। তিনি বলেছেন, "শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সক্রেটিসের পন্থায় আমি বিশ্বাসী।"

পরলোকে

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বিধুরঞ্জন দাস** গত ২৫ আগস্ট '৮৮ বেলা ২-৩০ মিঃ দমদম পার্কস্থ নিজ বাটীতে ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুরস্থ মুলচর গ্রামে তাঁর জন্মস্থান। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতি-ষ্ঠানের প্রধান হিসাবে কাজ করার সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় ছাত্রদের আদর্শ-জীবন গঠনে তিনি নিরন্তর প্রয়াসী ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর কলকাতায় তিনি কয়েক বছর সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানা কাজের সঙ্গেও তিনি নিজেকে যুক্ত রাখার চেষ্টা করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর সময় স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলী প্রকাশের বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

বেলুড় মঠের দীক্ষিত **প্রীতিরঞ্জন দাস** গত ৪ জুন '৮৮ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি উদ্বোধন-এর গ্রাহক ছিলেন।



বিজ্ঞান সংবাদ

কুষ্ঠের অভিশাপ দূর করার উদ্যোগ

সারা পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষের উপর। তার প্রায় এক তৃতীয়াংশই ভারতে। কুষ্ঠরোগীরা কেবল রোগেই ভোগে না, নিদারুণ মর্মযন্ত্রণায়ও কষ্ট পায়। সমাজে তাদের স্থান নেই, তারা মানুষ বলে গণ্য হয় না।

কুষ্ঠরোগ পৌরাণিক কাহিনী মতে উৎকট পাপের ফলশ্রুতি। ফলে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে অনেক ভ্রান্ত ধারণা। কুষ্ঠরোগ আর কুষ্ঠরোগী তাই অশুভ বলে লোকে মনে করে। কুষ্ঠরোগীরা সেই কারণে স্বজন-পরিত্যক্ত, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। দারুণ মনঃকষ্টে কখনও কখনও তারা আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

কুষ্ঠরোগের সামাজিক দিকগুলি নিয়ে বর্তমানে ভারত-মার্কিন এক যৌথ সমীক্ষা চালাচ্ছে, তাতে এই সমস্যাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রচণ্ড উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও রোগ নিরাময়ের হার যে অনেক কম, গবেষকরা তাতে ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কোন্ কোন্ ব্যাপারের উপর রোগ-নিরাময় নির্ভর করে, চিকিৎসকদের সে-বিষয়ে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় ও মার্কিন গবেষকদের একটি দল এখন কুষ্ঠরোগীদের মানসিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। এই প্রথম কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় মনশ্চিকিৎসা যুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

ভাটনগর পুরস্কার পেলেন ৯ জন বিজ্ঞানী

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের 'শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার' পেলেন ৯জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। এবার ভাটনগর পুরস্কার যাঁরা পেলেন তাঁদের মধ্যে আছেন দুজন বাঙালী বিজ্ঞানী। এঁরা হলেন টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর অধ্যাপক প্রবীর রায় এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর দেবাশিস মুখার্জি।

পরিবেশ ও এ্যাকিউট এ্যাপেণ্ডিসাইটিস

এ্যাপেণ্ডিক্স অন্ত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং সকলেরই আছে। এতে প্রদাহ সৃষ্টি হলে বলা হয় এ্যাপেণ্ডিসাইটিস, এবং প্রদাহ হঠাৎ ও সাংঘাতিক ধরনের হলে বলা হয় এ্যাকিউট এ্যাপেণ্ডিসাইটিস এ্যাকিউট এ্যাপেণ্ডিসাইটিস হলে সাধারণতঃ এ্যাপেণ্ডিক্স কেটে বাদ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে শিশুদের এ্যাপেণ্ডিসাইটিস হওয়ার সঙ্গে বাড়ির স্বাস্থ্য পরিবেশের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, এবিষয়ে একটি পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ শিশুদের অস্ত্রোপচার করে এ্যাপেণ্ডিক্স বাদ দেওয়ার সঙ্গে তাদের বাড়িতে থাকার সুখ সুবিধা, এক বাড়িতে কত লোকের বাস এবং তাদের সামাজিক স্তরের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা দেখা হয়েছে। অস্ত্রোপচারে বিপদের ঝুঁকি সম্বন্ধে তাদের বাড়িতে সুখ সুবিধা—প্রধানতঃ স্নানঘর ইত্যাদির সুযোগ আছে কিনা তা দেখা হয়েছে। এতে এ্যাকিউট এ্যাপেণ্ডিসাইটিস-এর সঙ্গে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে।

একেবারে অনুন্নত দেশে, যেখানে শিশুরা জন্ম হতেই পরিবেশ হতে আগত নানা জীবাণুর শিকার হয়, সেখানে শিশুদের শরীরে স্বাভাবিকভাবে জীবাণুর বিরুদ্ধে খানিকটা প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে উঠে। উন্নতিশীল দেশে যেখানে স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিম্নস্তরের, সেখানে ঘরবাড়ির অবস্থা ভাল হলেই এ্যাকিউট এ্যাপেণ্ডিসাইটিস-এর সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে যাঁরা কার্যকারণরূপে ধরেন তাঁদের মতে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি হলে শিশুরা পরিবেশ হতে স্বাভাবিকভাবে জীবাণুদ্বারা সংক্রামিত হবার সুযোগ পায় না এবং বড় হলে যখন পারিপার্শ্বিক অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হতে জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাদের এ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়।

[British Medical Journal, 1988, 296, 958]

1983

সূচীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫

দিব্য বাণী : ☐ ৭৪৯

কথাপ্রসঙ্গে : ☐ 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি' ☐ ৭৫০

প্রবন্ধ

যেমন ভাব তেমন লাভ ☐ স্বামী ভূতেশানন্দ ☐ ৭৫৩

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ : তাঁর পূর্বাশ্রম-জীবনের একটি ঘটনা ☐ জ্যোতির্ময় বসুরায় ☐ ৭৫৯

'আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন' ☐ স্বামী অলোকানন্দ ☐ ৭৭৪

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন ☐ নীহার মজুমদার ☐ ৭৭৬

সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র ☐ অমিয়কুমার মজুমদার ☐ ৭৭৯

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অন্তরালবাসী এক কর্মযোগী ☐ পলাশ মিত্র ☐ ৭৮৬

ধারাবাহিক-নিবন্ধ

কবি সারদা ☐ কবিতা সিংহ ☐ ৭৬৫

ভ্রমণ-কাহিনী

নর্মদা অমরকণ্টক ☐ অজিতকুমার মাইতি ☐ ৭৯৩

বিজ্ঞান-নিবন্ধ

দেহপিঞ্জরের পাম্পঘর ☐ সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ ☐ ৭৯৬

কবিতা

কোন পথে তার যাত্রা ☐ দেবী রায় ☐ ৭৬৯

হে অনির্বাণ ☐ দেবাশিস নাথ ☐ ৭৬৯

উদ্বোধন ☐ দিলীপ মিত্র ☐ ৭৬৯

আর এক ভুবন ☐ শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ☐ ৭৬৯

মিলন ☐ প্রবীর মিত্র ☐ ৭৭০

প্রতীক্ষা ☐ দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৭৭০

ভুলে গেছি সেই স্নান ☐ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৭৭০

নিয়মিত বিভাগ

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : বড় বউ ☐ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ☐ ৭৭১

আনন্দের সন্তান : স্বামী বিবেকানন্দ ও নামরহস্য ☐ শংকরীপ্রসাদ বসু ☐ ৭৯১

মাধুকরী : স্বামী বিবেকানন্দ ☐ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ☐ ৭৯৯

বাতায়ন : আজকের জাপান ☐ ৮০১

গ্রন্থ পরিচয় : রুমী এবং তাঁর সুফীতত্ত্ব ☐ মৃণাল ব্রহ্মচারী ☐ ৮০৩

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ☐ ৮০৪

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ☐ ৮০৬

বিবিধ সংবাদ ☐ ৮০৭

বিজ্ঞান সংবাদ ☐ ৮০৮

সম্পাদক
স্বামী নির্জরানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য : তিরিশ টাকা ☐ সডাক ছত্রিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়) : ছশো টাকা

প্রতি সংখ্যা : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ

মাঘ ১৩৯৫—পৌষ ১৩৯৬

(জানুয়ারি ১৯৮৯—ডিসেম্বর ১৯৮৯)

☐ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে আপনার নাম ও গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য (সাধারণ গ্রাহকমূল্য : তিরিশ টাকা, সডাক ছত্রিশ টাকা) জমা দিন।

☐ মাঘ-সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ/ডাকে পাঠানো সুনিশ্চিত করার জন্য আপনি গ্রাহকমূল্য পাঠিয়েছেন/জমা দিচ্ছেন, এই সংবাদটি একখানি পোস্টকার্ডে জানিয়ে দিতে পারেন।

☐ ভি. পি. পোস্টে পত্রিকা পাঠাতে অনুরোধ করবেন না।

☐ অনুগ্রহ করে "Udbodhan Office" এই নামে মনিঅর্ডার/ব্যাংকড্রাফট্ / পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠাবেন। চেক্ পাঠাবেন না।

☐ বার্ষিক চাঁদার হার : ব্যক্তিগতভাবে কার্যালয়ে এসে পত্রিকা সংগ্রহ করলে—তিরিশ টাকা ;
ডাকযোগে পত্রিকা নিলে—ছত্রিশ টাকা ; বাংলাদেশ—ষাট টাকা

বিদেশের জন্য — { একশো পঞ্চাশ টাকা [সমুদ্র-ডাক]
তিনশো টাকা [বিমান-ডাক] }

☐ এককালীন ৬০০'০০ (ছশো) টাকা অথবা কমপক্ষে ৫০'০০ টাকা প্রথম কিস্তিতে দিয়ে পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী এ...ধিক (অনূর্ধ্ব বারোটি) কিস্তিতে বাকি টাকা জমা দিয়ে আজীবন গ্রাহক [৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ সাপেক্ষ] হতে পারা যায়। ভারতবর্ষের বাইরে (বাংলাদেশ ছাড়া) থেকে কেউ আজীবন গ্রাহক হলে সমুদ্র-ডাক ও বিমান-ডাক সহ আজীবন গ্রাহকমূল্য যথাক্রমে ৩০০ ও ৫৫০ ডলার (আমেরিকান)।

☐ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে বার্ষিক চাঁদা উদ্বোধন কার্যালয়ে না পৌঁছালে আগামী মাঘ মাসের পত্রিকা ডাকে পাঠানো যাবে না।

☐ নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা জমা দেওয়া চলে।

☐ অনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভবপর না হলে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করে অনুগ্রহ করে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেবেন।

☐ কার্যালয়ে চাঁদা দেবার সময় : সকাল ৯-৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০
শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০ [রবিবার বন্ধ]

ঠিকানা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

টেলিফোন : ৫৫-২৪৪৭

১ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ — বিনীত
১৭ নভেম্বর ১৯৮৮ — কার্যাধ্যক্ষ



৯০তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা]

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

ব্রাহ্মণ উবাচ

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু ॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ ॥

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥

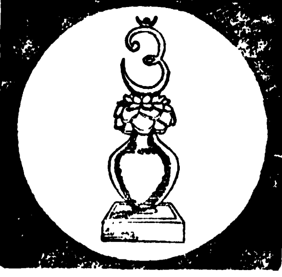
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥*

[মহারাজ যদুকে] ব্রাহ্মণ বললেন : হে রাজন্, বুদ্ধির দ্বারা আশ্রিত আমার অনেক গুরু আছেন—যে গুরুগণের নিকট শিক্ষা লাভ করে যাবতীয় দুঃখতাপ থেকে মুক্ত হয়ে আমি এই সংসারে পরিভ্রমণ করছি। আমার সেই গুরুগণের নাম শুনুন।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি, ভ্রমর, হরিণ, মাছ, বারবনিতা পিঙ্গলা, চিল, বালক, কুমারী, শরনির্মাতা, সাপ, মাকড়সা এবং কাঁচপোকা।

হে রাজন্, আমি এই চব্বিশজন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এই জগতে এঁদের কর্ম ও আচরণের দ্বারা (বহু) বিষয় আমি শিখেছি।

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৭।৩২—৩৫



কথাপ্রসঙ্গে

'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'

'মহাশয়, আপনার জ্ঞানের কোন সীমা নাই।' কথিত আছে জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত বিশ্বখ্যাত নিউটনকে কেউ একজন ঐ কথা বলিলে উত্তরে সবিনয়ে নিউটন বলিয়াছিলেন: 'জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমি তো এতকাল নুড়ি কুড়াইয়াছি মাত্র।' যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি বিনয়ী হন, ইহা আমরা জানি। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই এই প্রবাদবাক্য প্রচলিত যে, বিদ্যা বিনয় দান করে। নিউটন মহাজ্ঞানী ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তেমনই তিনি যে মহাবিনয়ীও ছিলেন সে সম্পর্কেও কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া নিউটনের ঐ বহুপ্রসিদ্ধ উক্তিটি নিছকই নিউটনের বিদ্যাজনিত বিনয়প্রসূত ভাবিলে তাহা যথার্থ হইবে না। কারণ, নিউটন যাহা করিয়াছিলেন তাহা একটি সত্য তত্ত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ। সেই সত্য তত্ত্বটি হইল: জ্ঞানের কোন সীমা নাই। জ্ঞান হইতেছে পরিধিহীন একটি বৃত্ত। কেহ বলিতে পারেন না—তিনি যতবড় জ্ঞানীই হউন না কেন—তিনি জ্ঞানের সমস্তটুকুই আয়ত্ত করিয়াছেন, জ্ঞান-রূপ বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করিয়াছেন।

জ্ঞান যদি একটি বাহিরের ব্যাপার হইত তাহা হইলে তাহার শেষ দেখা সম্ভব হইত। বাহ্য প্রকৃতিতে বিদ্যমান যে-কোন বস্তু বা বিষয়ের—তাহা যত বিরাটই হউক না কেন—শেষ আছে, সীমা আছে। আজ না হউক, শতাব্দী বা সহস্র বৎসর পরে হউক মানুষের বিদ্যা, মানুষের বুদ্ধি এবং মানুষের শক্তি সেই বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে শেষ কথা বলিয়া দিবেই। বাহ্য প্রকৃতিকে আজ মানুষ তো প্রায় সম্পূর্ণই জয় করিয়া ফেলিয়াছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়ে আজ মানুষ শুধু এই পৃথিবীরই নয়, গ্রহান্তরের বুকেও পদচিহ্ন স্থাপন করিয়াছে। বস্তুতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত বস্তু, বিষয় অথবা স্থান রহিয়াছে তাহার রহস্য সন্ধান করিতে সে অগ্রসর। অনাগতকালে হয়তো বস্তুজগতে মানুষের বুদ্ধির অগোচর এবং মানুষের শক্তির অনতিক্রমণীয় আর কিছু থাকিবে না। মানুষের বুদ্ধি, মানুষের শক্তি জগতের সমস্ত কিছুকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি অসম্পূর্ণতাও মানুষের সঙ্গে লগ্ন হইয়া রহিবে। যতদিন মানুষ রহিবে মানুষের সেই অসম্পূর্ণতাও তাহার সঙ্গে থাকিবে। তাহা হইল মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বাহ্য-প্রকৃতি সম্পর্কে যতই মানুষ জ্ঞান সংগ্রহ করুক না কেন, কালের নিরিখে সে-জ্ঞান অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতে বাধ্য। কোন বিশেষ বস্তু বা বিষয়ে যে-জ্ঞান চূড়ান্ত মনে করা হইয়াছিল, মনে করা হইয়াছিল যে, ঐ সম্পর্কে শেষ কথাটি উচ্চারিত হইয়া গিয়াছে, কিছুকাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতে নূতন-তর গবেষণার আলোকে পূর্বতন জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্তটি হয় সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়, অথবা তাহাতে ন্যূনাধিক সংযুক্তি, বিযুক্তি, পরিমার্জন আবশ্যক হয়। আর্যভট্ট হইতে আইনস্টাইন, কোপারনিকাস হইতে গ্যালিলিও, ডারউইন হইতে হাক্সলি, সর্বত্রই ঐ এক ধারা। শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য তাহা নহে, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—মানব-জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই ইহা সমভাবেই সত্য। মানুষের জ্ঞান যেহেতু কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সেইহেতু মানুষের শিক্ষাও কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জ্ঞানের যেহেতু শেষ নাই, শিক্ষারও তাই শেষ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। শিক্ষা হইতেছে অন্ত-বিহীন নিরন্তর গতিমান একটি প্রক্রিয়া। তাই যে-পণ্ডিত মনে করেন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তিনি সব শিখিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি জগতের অগণিত মূর্খের সংখ্যাটি আরও বৃদ্ধি করিলেন মাত্র।

সভ্যতার উষালগ্নের সূচনা পৃথিবীতে কখন

হইয়াছিল কাহারও জানা নাই। কিন্তু একটি জিনিস সকলেরই জানা যে, সভ্যতার সূচনা হইয়াছিল মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। জ্ঞানই হইতেছে সভ্যতার কেন্দ্রীয় শক্তি। জ্ঞান সভ্যতার চালিকা শক্তি, আবার পালিকা শক্তিও। সেই সভ্যতার তত বেশি উৎকর্ষ, যে সভ্যতার মধ্যে জ্ঞানের যত বেশি বিকাশ, জ্ঞানের যত বেশি বিস্তার। সভ্যতা যত অগ্রসর হইয়াছে, পৃথিবীর যত বয়স বাড়িয়াছে মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্বে কোন বিষয়ে আমাদের যে-পরিমাণ জ্ঞান ছিল, আজ সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক বেশি গভীর হইতেছে। কয়েক বৎসর পরে আবার দেখিব আমাদের জ্ঞান আরও গভীরতা লাভ করিয়াছে। স্বভাবতই আমাদের শিক্ষার পরিধিও বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান যেমন শেষ হইতেছে না, শিক্ষাও তেমনই শেষ হইতেছে না।

ইহা একটি মহা রহস্য। কিন্তু ইহা বাস্তব সত্যও। জ্ঞানের কোন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট নাই, কোন কাল, বস্তু বা পাত্রও নির্দিষ্ট নাই। যে-কোন ক্ষেত্র হইতে, যে-কোন সময়, যে-কোন বিষয় বা ব্যক্তি হইতে আমরা জ্ঞান আহরণ করিতে পারি। শিক্ষার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কখন কোথা হইতে কোন আলোক লাভ করিব কে তাহা বলিতে পারে? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের সঙ্গে একটি সামান্য আপেল পড়ার ঘটনা, আর্কিমিডিসের 'আপেক্ষিক গুরুত্ব তত্ত্ব' আবিষ্কারের সঙ্গে চৌবাচ্চায় স্নান করার ঘটনা কিভাবে যুক্ত হইয়া আছে তাহা সর্বজনবিদিত। অথচ গাছ হইতে আপেল পড়া প্রত্যক্ষ করা অথবা চৌবাচ্চায় স্নান করা নিউটন এবং আর্কিমিডিসের জীবনে সেই বারই যে প্রথম ঘটিয়াছিল তাহা নহে। তাই কখন কোন ঘটনা অথবা কোন বিষয় বা কোন ব্যক্তি হইতে নূতন আলোক আসিয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিবে তাহা কেহ জানে না। এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে মহর্ষি বাল্মীকির কথা। অরণ্যের গভীরে তপস্যার ভূমিতে বসিয়াছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখিলেন, জনৈক ব্যাধ শরাঘাতে এক ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ সঙ্গীটিকে ভূপাতিত করিয়াছে। মৃতপ্রায় সঙ্গীকে ঘিরিয়া স্ত্রী-ক্রৌঞ্চটির করুণ আর্তি মহর্ষির হৃদয়কে দুঃখে বিগলিত করিয়া তুলিল। সেই দুঃখ হইতে মহর্ষির কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইল অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ বাণী। তাহাই নাকি রামায়ণের সূচনা। অর্থাৎ রামায়ণের জন্মলগ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে অতি সাধারণ একটি ঘটনা। অরণ্যবাসী তপস্বীর জীবনে ব্যাধের মৃগয়া নামক ব্যাপারটি যে কোন অ-সাধারণ ঘটনা নহে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সাধারণ ও সামান্য ঘটনা যাহা নিত্যদিন নানাভাবে আমাদের নয়ন-সম্মুখে ঘটিয়া যাইতেছে তাহার কোন-কোনটিই আবার কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে আদিকবির জীবনের এই ঘটনাটি সেবিষয়ে অঙ্গুলি সংকেত করে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে অবধূত ও তাঁহার চব্বিশ গুরুর কথা আছে। কিভাবে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, আগুন, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর, প্রভৃতি হইতে অবধূত নানা শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারকে পুষ্ট করিয়াছিলেন খুব সুন্দরভাবে সেকথা আমরা ঐ প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারি যে, কোন বস্তুই উপেক্ষণীয় নহে, জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই নিরর্থক নহে। কবি বলিয়াছেন, 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।/ ধূলায় তাদের হোক যত অবহেলা।' কথাটি খুবই সত্য। বাস্তবিক এই জগৎটি যেন একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। আর মানুষমাত্রই সারা জীবন ধরিয়া এই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী। এই জগতের সর্বত্র থরে থরে সাজানো রহিয়াছে জ্ঞান ও শিক্ষার খনি। পৃথিবীতে নানা প্রাকৃতিক সম্পদেরও অসংখ্য খনি আছে। কিন্তু সেই অসংখ্য খনির সংখ্যা একদিন শেষ হইয়া যাইবেই। কিন্তু জ্ঞান-সম্পদের যে খনি জগৎ জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা কখনই নিঃশেষ হইবে না। ফলে মানুষের বিদ্যার্থী-জীবনও কোনদিন সমাপ্ত হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিতেন, 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। স্বামী বিবেকানন্দও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেন: 'বিস্তারই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু'। 'বিস্তার' মানে চিন্তার বিস্তার, অভিজ্ঞতার বিস্তার, আগ্রহের বিস্তার, জিজ্ঞাসার বিস্তার। 'সংকোচন' মানে চিন্তার সংকোচন, অভিজ্ঞতার

সংকোচন, আগ্রহের সংকোচন, জিজ্ঞাসার সংকোচন। 'বিস্তার' মানে গতি। যাহার চলা থামিয়া গিয়াছে, যাহার জিজ্ঞাসা শেষ হইয়া গিয়াছে সে তো জীবস্মৃত। জীবিত হইয়াও মৃত। জীবন মানেই হইল গতি, চলা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, চলার মধ্যেই প্রকৃত শক্তি। শুইয়া থাকিলে কলি, বসিলে দ্বাপর, দাঁড়াইলে ত্রেতা আর চলিতে শুরু করিলে সত্য। অতএব 'চরৈবেতি'। চল, চল, চল। ইহার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য হইতেছে, আমাদের মনটিকে সব সময় সজীব রাখিতে হইবে, সমুৎসুক রাখিতে হইবে যাহাতে নূতন চিন্তা নূতন ভাব, নূতন আদর্শকে আমরা মুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিতে পারি। কতখানি লইব, কতখানি বর্জন করিব তাহা পরের ব্যাপার। প্রথম প্রয়োজন ঐ মনটি, যে-মন অনন্ত কৌতূহল লইয়া সতত অপেক্ষা করিবে। যাহার মনের চরিত্রটি অন্যরূপ, অর্থাৎ যাহার মন নিষ্ক্রিয়, সে আর যাহাই হউক মানুষ পদবাচ্য নহে। মননশীল বলিয়াই তো মানুষ মানুষ। মননশীল না হইলে সে কিসের মানুষ? তবে সাধারণতঃ মনের স্বভাবের মধ্যেই থাকে একটি অতৃপ্তির ভাব। আমরা এখানে অবশ্য বিষয়ভোগ-সম্পর্কিত অতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আত্মিক অতৃপ্তির কথা বলিতেছি। এই অতৃপ্তি যাহার মনে যত বেশি তাহার মনটি ততই সজীব। খ্রীষ্টীয় পরিভাষায় এই অতৃপ্তিকে 'স্বর্গীয়' বা 'দিব্য' বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে 'ডিভাইন ডিসকনটেন্ট'। 'ডিভাইন'—স্বর্গীয়, দিব্য—কেন? কারণ এই অতৃপ্তি মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না। তাহাকে ছুটাইয়া লইয়া যায়। মানুষকে বুঝায়—তুমি অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পার না, অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া তোমার শোভা পায় না। কারণ বিরাটের স্ফুলিঙ্গ তোমার মধ্যে রহিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৭৷২৩৷১) আমাদের সেই কথাই শিখাইয়াছে: 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।'—যাহা ভূমা তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমা মানে বিরাট। বিরাটের তো কোন সীমা নাই। বিরাটের আর এক নাম অনন্ত। স্বরূপতঃ মানুষমাত্রই অনন্ত, বিরাট, অসীম। তাই মানুষের মধ্যে সেই অনন্ত জিজ্ঞাসার বীজ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যে তাহার অন্তর্নিহিত জিজ্ঞাসার বৃত্তিটিকে উজ্জ্বলতর করিতে প্রয়াস পায় সে নূতনতর আলোক পাইয়া ক্রমেই জ্যোতির রাজ্যে অগ্রসর হয়।

বস্তুতঃ মানুষের প্রকৃত বার্ধক্য বয়সের উপর নির্ভরশীল নয়; তাহা মনের উপর নির্ভরশীল। যাহার মনে কোন প্রশ্ন নাই, জানিবার আগ্রহ নাই সে বয়সে নবীন হইলেও বুঝিতে হইবে মনে তাহার বার্ধক্য আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। অপর পক্ষে যাহার মনে নিরন্তর জিজ্ঞাসার প্রদীপ জ্বলিতেছে সে বয়সে প্রবীণ হইলেও বার্ধক্য তাহার কাছে পরাভূত। ইহারই নাম জীবনরসিকতা। এই জীবনরসিকতা যাহাকে যত বেশি আপ্লুত করিয়া রাখে ততই তাহার জীবন অর্থপূর্ণ হইয়া ওঠে। জীবনের অর্থ পার্থিব ঐশ্বর্যে নহে, জীবনের অর্থ মনের সজীবতায়, মনের উজ্জ্বলতায়। বর্তমান কালে আমাদের সম্মুখে এই জীবনরসিকতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। প্রজ্ঞার আলোকে তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন দীপ্যমান, কিন্তু জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা জিজ্ঞাসার দীপশিখাটিকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন অনির্বাণ। জীবনকে তাঁহারা পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিলেন। তাই জীবনের কোন কিছুই তাঁহাদের কাছে উপেক্ষণীয় ছিল না, অপাঙক্তেয় ছিল না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহারা শিখিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর সঙ্গে পরিচিত সকলেই তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা জানেন। কী উদগ্র অনুসন্ধিৎসা লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একটির পর একটি ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একের পর এক ধর্মজিজ্ঞাসুর কাছে ছুটিয়াছেন। শুধু কি ধর্মের ক্ষেত্রে? যখন তিনি চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম অথবা রঙ্গালয়ে যাইতেছেন তখনও তাঁহার সেই একই দুর্দম কৌতূহল। স্বামীজীও সেইরূপ। দেশের পর দেশ ঘুরিতেছেন, দেখিতেছেন বিভিন্ন দেশের মানুষ, মগ্ন হইয়া যাইতেছেন সেই দেশ ও সভ্যতার ইতিহাসের মর্মমূলে। মানুষের জিজ্ঞাসা কত গভীর ও ব্যাপক হইতে পারে তাঁহারা জগৎকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'—ইহা শুধু তাঁহাদের কথার কথা ছিল না, তাঁহারা স্বয়ং ছিলেন তাহার মূর্ত রূপ।

যেমন ভাব তেমন লাভ

স্বামী ভূতেশানন্দ

আমরা নিজেদের শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বলে মনে করি। যদি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তি থাকে তাহলে আমাদের জীবন তাঁর ভাবে রূপায়িত হবে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তি যথার্থ কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণ এত বহুবিধ ভাবের সমন্বয়মূর্তি যে তাঁর রূপকে পূর্ণ-রূপে প্রতিফলিত করা কোন মানুষের সাধ্যাতীত। তবু তাঁর বহুপ্রকার ভাবের ভিতরে যেকোন একটিকে আশ্রয় করে সেইভাবে জীবনকে যদি ভাবিত করতে পারা যায় তাহলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব জগতে বহুকাল পরে পরে হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এরকম শক্তির প্রকাশ জগৎ আর কখনও দেখেনি। এটা তাঁর কোন একদেশী দৃষ্টি দিয়ে দেখা নয়। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে সংকোচ বোধ করতেন। তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু বলেছেন তাতে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভার সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা অনুসরণ করব কি করে? তার উত্তর হচ্ছে এই, যে যে-ভাবের ভাবুক সে সেই ভাব দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করবে। তিনি বহুভাবের সমন্বয়মূর্তি কিন্তু আমাদের আধার এমন বড় নয় যে তাঁর সামগ্রিক রূপকে আমরা ধারণা করতে পারি। সেইজন্য তাঁর যতটুকু আমরা নিতে পারি ততটুকুর দ্বারাই আমাদের জীবন সার্থক হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর। অর্থাৎ তিনি যে সাধনা করেছেন তা কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় তা তিনি জানতেন। তাই তিনি বলেছেন, সবটা তোদের করতে হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের সম্বন্ধে খুব বিস্তার করে কিছু বলেননি। বরং তিনি সবসময় সাধারণ ভক্তদের কাছে এই কথাই বলছেন, নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু—আমি নই, তুমি, তুমি। বলছেন, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। জগন্মাতা, যিনি জগৎ পরিচালনা করছেন তিনি তাঁর দেহ মন রূপ যন্ত্রটিকে নিয়ে ব্যবহার করছেন। তিনি বলছেন, যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি। নিজের পৃথক সত্তা তিনি প্রকাশ করছেন না। বলছেন, এই যে খোলটা এর ভিতর সেই মা ছাড়া আর কিছু নেই। মা মানে জগন্মাতা। তাঁকে আমরা অনেক সময় বলি কালী। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন, সমস্ত জগতের নিয়ন্ত্রণ যাঁর দ্বারা হচ্ছে তাঁকে তিনি কালী বলছেন। কালীও যা কৃষ্ণও তাই, অন্য দেবদেবীও তাই। সব রূপই সেই এক পরমেশ্বরেরই রূপ। সেখানে কোন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নেই। তাই তিনি শাক্তের কাছে শাক্ত, বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব, বৈদান্তিকের কাছে বেদান্তী, খ্রীষ্টানের কাছে খ্রীষ্টান, মুসলমানের কাছে মুসলমান। সর্বভাবের সেখানে অপূর্ব সমন্বয় যা জগৎ আর কখনও দেখেনি। সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে অতি অল্প এবং আংশিক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর কথা আছে, আমার যদি এক গ্লাস মদেই ভরপুর নেশা হয়ে যায় তাহলে শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে তার হিসাবে দরকার কি? আমি ভগবানের সমস্তটা বুঝে নেব সেরকম ভাবনা চূড়ান্ত ধৃষ্টতা। তাই বলেছেন, তোমার যতটুকু দরকার তুমি ভরে নাও। সমুদ্রের অগাধ জলরাশি তোমার পাত্রটুকুতে কখনও ধরবে না, আর পৃথিবীতে যত লোক আছে সবাই যদি তাদের পাত্রকে ভরে নিতে চায় তাহলেও সমুদ্রের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হবে না। সমুদ্র যেমন অসীম অনন্ত তেমনই থাকবে। এইজন্য আমরা ভগবানকে কখনও সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে পারি না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তাঁর কখনও ইতি করো না। অর্থাৎ তিনি এই পর্যন্ত হতে পারেন আর কিছু হতে পারেন না এরকম ধারণা মনে কখনও করো না। অথবা আমি যা বুঝেছি তাই ঠিক আর

সকলে যা বুঝেছে সব ভুল এরকম চিন্তাকে ঠাকুর মতুয়ার বুদ্ধি বলতেন। এইরকম গোঁড়ামির তিনি ভীষণ বিরোধী ছিলেন। কেন না, তিনি সেই বহুরূপীকে বহুরূপে দেখেছেন। তাঁর গল্পে আছে একজন এসে বলছে, দেখে এলাম গাছের তলায় একটি সুন্দর প্রাণী তার হলদে রঙ। আর একজন বললে, আমিও তো দেখলাম একটু আগে, দেখলাম তার রঙ লাল। আর একজন বললে, না তার রঙ নীল। এই নিয়ে পরস্পরের কলহ। তখন একজন লোক বললে যে, আমি ঐ গাছতলায় থাকি, সর্বদা প্রাণীটিকে দেখি। সে বহুরূপী। সে কখনও লাল, কখনও নীল কখনও হলদে, কখনও সবুজ, আবার কখনও দেখি তার কোন রঙই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সেই বহুরূপী। কখনও তিনি বৈদান্তিক, কখনও শাক্ত, কখনও বা বৈষ্ণব। আবার কখনও তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মতো। আর সেইজন্য তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁকে তাঁদেরই একজন বলে মনে করতেন। তাঁকে আপনার মনে করার কারণ তাঁর ভিতরে তাঁরা নিজেদের ধারণার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে বৈশিষ্ট্য, এ বৈশিষ্ট্য ধর্মের ইতিহাসে কোথাও আছে বলে জানি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বহুরূপী। কখনও তিনি বৈদান্তিক, কখনও শাক্ত, কখনও বা বৈষ্ণব। আবার কখনও তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মতো। আর সেইজন্য তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁকে তাঁদেরই একজন বলে মনে করতেন। তাঁকে আপনার মনে করার কারণ তাঁর ভিতরে তাঁরা নিজেদের ধারণার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে বৈশিষ্ট্য, এ বৈশিষ্ট্য ধর্মের ইতিহাসে কোথাও আছে বলে জানি না।

ভাগবতে আছে যে, বৃন্দাবনবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ যার যেমন ভাব তিনি সেইভাবে দেখতেন। কেউ তাঁকে সন্তানরূপে দেখতেন, কেউ পতিরূপে, কেউ দেখতেন সখারূপে, কেউ ভ্রাতৃরূপে কেউ-বা গুরুরূপে দেখতেন। বহুরূপে তাঁর প্রকাশ তাঁরা দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নানা ভাবে নিজে সাধনা করেছেন, করে সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতরে দেখিয়েছেন। এরকম করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে তত্ত্বকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কেউ দেখেছেন বলে শোনা যায় না। পুরাণে যেখানে অবতারের কথা আছে সেখানে অবতার গোড়া থেকেই অবতার, তাঁর ভিতরে মানবভাবের প্রকাশ একেবারেই নেই বললে হয়। আর কোথাও যদি তার একটু আধটু প্রকাশ দেখা যায় ভক্তদের দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে এমনভাবে সকলের সমক্ষে প্রকটিত করেছেন যে, প্রত্যেকেই তাঁকে সাধকরূপে, সিদ্ধরূপে এবং সিদ্ধের সিদ্ধরূপে, সর্বরূপে তাঁকে দেখছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তাঁর সাধনার কথা বলেছেন। চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধনা করেছেন। চৌষট্টিখানা তন্ত্রই আমরা জানি না, তার সাধনা তো দূরের কথা। তারপরে তিনি বৈষ্ণবভাবে, শাক্তভাবে, বেদান্তীভাবে সাধনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সব সাধনার ভিতর দিয়ে এক তত্ত্বে পেঁৗছানো যায়।

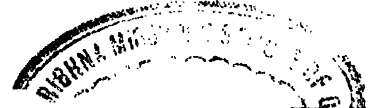
স্বামীজী বলেছেন, বেদে যে বহুবিধ কথা আছে তার সম্বন্ধে দার্শনিকরা একটা সিদ্ধান্তে পেঁৗছবার চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে তাকে বলে এক-বাক্যতা। অর্থাৎ সমস্ত বেদ মিলে একটি কথাই বলছে। সেই একটি কথা কি এই নিয়ে দারুণ মতভেদ, পরস্পরের বিবাদ। বেদের রহস্য কি, তত্ত্ব কি, চরম সিদ্ধান্ত কি হবে এই নিয়ে আলোচনার আজও শেষ হয়নি। তাই মীমাংসাও হয়নি। অদ্বৈতবাদী একরকম বলেন, দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অন্য রকম বলেন। আবার দ্বৈত-অদ্বৈতবাদীদের ভিতরেও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কত মতভেদ। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। একটি কথা কারও মনে হয়নি যে, যিনি এক তিনি বহুরূপেও দেখা দিতে পারেন। তাঁর একরূপ যেমন সত্য বহুরূপও তেমনি সত্য। এই কথা কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই পাওয়া যায়।

বেদান্তী বলছেন, তিনি এক বা অদ্বিতীয়, আর দ্বৈত সব মিথ্যা। দ্বৈতবাদী বলছেন, এক কথাটি মিথ্যা, দ্বৈতই সত্য। এইরকম মতানৈক্য আছে। কিন্তু এর যে এত সহজ মীমাংসা হতে পারে তা

শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কারও মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়নি। তিনি বলছেন যে, তিনি একও হতে পারেন, বহুও হতে পারেন। বলছেন, জল তরল, আবার বরফ হলে তা আকারবিশিষ্ট। তিনি সাকার আবার নিরাকারও। বিজ্ঞানীরা বলেন, যে-বিষয়ে বেশি মতভেদ সেই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোন তত্ত্বে পেঁছানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের ভিতরে এত মতভেদ নেই। একজনের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে অন্য বিজ্ঞানী মেনে নেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে সকলকে একমত হতে দেখা যায় না। উপনিষদ্ বলছেন: 'যৎ মনসা ন মনুতে'—যাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। তাহলে তো সেই বস্তুটি সম্বন্ধে বিচার করা নিষ্ফল। কারণ মন কখনও তাঁকে ধরতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এরকম হতাশাব্যঞ্জক কথা বলেননি। তিনি বলেননি যে, সেই বস্তুকে কেউ বুঝতে পারবে না, ধরতে পারবে না। বরং বলেছেন যে, 'তিনি মনের অগোচর' যখন বলা হয়েছে তখন বোঝানো হয়েছে যে, 'তিনি অশুদ্ধ মনের অগোচর'। তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। তারপর শুদ্ধ মন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা এক। এই কথাটি বেদান্তীরা এভাবে কখনও বলেননি। বলেননি এইজন্যে যে তাঁরা বিচারের দৃষ্টি দিয়ে দেখে কথা বলেছেন। বিচার নির্ভর করে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর। আমরা দেখি যে সাদাটা কালো নয়, কালোটা সাদা নয়। সুতরাং এটা সাদাও হতে পারে, কালোও হতে পারে এরকম সিদ্ধান্ত বাতুলের সিদ্ধান্ত। কাজেই সেই অনুসারে তাঁরা বললেন, ভগবান সাকারও হতে পারেন আবার নিরাকারও হতে পারেন, এই কথাটা কোনরকমেই স্বীকার করা যাবে না। যাঁরা তর্কের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বলেছেন তাঁরাও সেই তর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবান সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করে বসছেন। তাঁদের মনে থাকছে না যে, এই সিদ্ধান্তটা তর্কের সাহায্যে করছি আবার বলছি তর্কের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। এটা তো পরস্পরবিরোধী কথা। সুতরাং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের কোনদিনই সর্ববাদি-সম্মত একটা মত গ্রহণ করা হয়নি। কেউই করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের আগে পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব চলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বললেন? তিনি বললেন, ঈশ্বর সাকারও হতে পারেন, নিরাকারও হতে পারেন, সগুণও হতে পারেন, নির্গুণও হতে পারেন। সাকার নিরাকার দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম। এর উত্তরে তিনি বলছেন, বিরুদ্ধ তোমার কাছে। ভগবান যিনি, তাঁকে তোমার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে তুমি সেখানে বিরোধ দেখছ। কিন্তু যদি তোমার দৃষ্টিসীমার গণ্ডি অতিক্রম করে তাকে শুদ্ধ করতে পার তখন দেখবে তিনিই সব।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি বললেন? তিনি বললেন, ঈশ্বর সাকারও হতে পারেন, নিরাকারও হতে পারেন, সগুণও হতে পারেন, নির্গুণও হতে পারেন। সাকার নিরাকার দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম। এর উত্তরে তিনি বলছেন, বিরুদ্ধ তোমার কাছে। ভগবান যিনি, তাঁকে তোমার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে তুমি সেখানে বিরোধ দেখছ। কিন্তু যদি তোমার দৃষ্টিসীমার গণ্ডি অতিক্রম করে তাকে শুদ্ধ করতে পার তখন দেখবে তিনিই সব। একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দিচ্ছেন যা সকলের মনে ধরে। বলছেন, একজন ভগবানের কাছে বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন। অপর একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৈকুণ্ঠে ভগবান কি করছেন? তিনি বললেন, ভগবান ছুঁচের ভিতর দিয়ে হাতি প্রবেশ করাচ্ছেন। অপর জন হেসে বললেন, তুমি কোনদিন সেখানে যাওনি। কারণ এ তো অসম্ভব কথা, কি করে হবে? তিনি বললেন, ভাই, ভগবানের পক্ষে অসাধ্য কি আছে? তিনি তাও করতে পারেন। আমাদের দৃষ্টি আমাদের প্রত্যক্ষের ভিতরে সীমিত, কাজেই আমরা যা বুঝতে পারি না ভাবি, তা হতে পারি না। যেমন তিনি অন্ধের হস্তিদর্শনের কথা বলেছেন। অন্ধেরা কেউ হাতির শুঁড় ধরেছে, কেউ হাতির পেটে হাত বুলিয়ে দেখছে, কেউ তার লেজটা ছুঁয়েছে। তাদের ধারণায় হাতি কিরকম? যে শুঁড় ধরেছে, সে বললে হাতিটা যেন মোটা দড়ার মতো। যে লেজ ধরেছে, সে বললে হাতি একটা



সাপের মতো। যে পেটটা ছুঁয়েছে, সে বললে হাতিটা একটা জালার মতো। একজন ছুঁয়েছে কান, সে বললে হাতি একটা কুলোর মতো। কথাগুলি সবই সত্য কিন্তু আংশিক সত্য। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে যা প্রতিভাত হয়, বুদ্ধিতে যা প্রকাশিত হয় তা মিথ্যা নয় কিন্তু আংশিক সত্য। আংশিক বলে আমরা বলি তিনি একমাত্র এই হতে পারেন। যে স্বরূপে তাঁকে দেখেছে, সামগ্রিক দৃষ্টি যার আছে, সে বলবে ভগবান কি না হতে পারেন! এই 'কী না হতে পারেন' কথাটি আমরা কোথাও কোথাও পাই। কিন্তু তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে জোর করে এ কথা বলা হয় না। শিবমহিম্নস্তোত্রে আছে: "ন বিদ্মস্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি"। —তুমি যে কী নও তা আমি বলতে পারি না। আমার বুদ্ধি তোমাকে সীমিত করতে পারবে না। কথাটা ঠিক। কিন্তু এ কথা কি আমরা স্বীকার করে নিয়েছি? একে আমরা বুদ্ধিমানের কথা, দার্শনিকের কথা বলে বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু নিজে পরখ করে না দেখে কিছু বলেননি। তিনি যখন বললেন, সব ধর্মই সত্য তখন তা একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করে দেওয়া নয়। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তিনি ধরতে পারতেন বিচারে কোথায় ত্রুটি আছে। মাস্টারমশায় বোঝাচ্ছেন, তর্কশাস্ত্রে বলে একটা কাক কালো, দুটো কাক কালো, তিনটে কাক কালো, যতকাক দেখছি সব কালো। অতএব কাক মাত্রই কালো। ঠাকুর বলছেন, যদি কোথাও সাদা কাক বেরিয়ে পড়ে তাহলে সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যাবে। এই দৃষ্টি নিয়ে ঠাকুর দেখছেন, দেখে বলছেন, তিনি সব হতে পারেন। এটা সামান্যীকরণ নয়, যাকে generalisation বলে তা নয়। এটা হচ্ছে অভিজ্ঞতার ফল। প্রত্যেকটি পন্থায় নিজে সাধনা করে তারপরে বলছেন, সব পথই গিয়ে সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছোয়। কথাটি আমরা উপনিষদেও শুনেছি "সর্বাষাম্ অপাং সমুদ্র একায়নম্"—সকল জলের পরমা গতি সেই সমুদ্র। শিবমহিম্নস্তোত্রেও আছে: "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"।—রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ ঋজু কুটিল বিভিন্ন পথ দিয়ে গিয়ে মানুষ যেখানে পৌঁছায় তিনিই সকলের একমাত্র গম্য। কথাটি তো বলা হল, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেউ কোথাও দিয়েছেন কি? না, তা কেউ দেননি। এটা একটা শোনা কথা মাত্র। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই আমরা দেখলাম, এটা শোনা কথা নয়, পরীক্ষিত সত্য। এইজন্য এই অপূর্ব সিদ্ধান্ত এত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলতে পারলেন যাতে মানুষের দীর্ঘকাল সঞ্চিত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রত্যক্ষ করে, স্বয়ং দেখে তারপর কথা বলেছেন। এইদিক দিয়ে অদ্ভুত সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল তাঁর। তিনি বেদান্তশাস্ত্র পড়েননি, কিছু কিছু অবশ্য শুনেছিলেন। কিন্তু এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি—কোথায় কোন জায়গায় কার ত্রুটি আছে ঠিক ধরা পড়েছে। এরকম অদ্ভুত মনস্বিতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি আর কখনও দেখা গিয়েছে কিনা জানি না। বড় বড়

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রত্যক্ষ করে, স্বয়ং দেখে তারপর কথা বলেছেন। এইদিক দিয়ে অদ্ভুত সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল তাঁর। তিনি বেদান্তশাস্ত্র পড়েননি, কিছু কিছু অবশ্য শুনেছিলেন। কিন্তু এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি—কোথায় কোন জায়গায় কার ত্রুটি আছে ঠিক ধরা পড়েছে। এরকম অদ্ভুত মনস্বিতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি আর কখনও দেখা গিয়েছে কিনা জানি না।

দার্শনিকের জটিল বিচার মানুষকে শুধু অন্ধকারেই ঠেলে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম বললেন, সব ব্রহ্ম, স্বামীজী তাঁকে উপহাস করে বললেন—হ্যাঁ মশাই, ঘটি ব্রহ্ম, বাটি ব্রহ্ম। অর্থাৎ সব ব্রহ্ম এটা অসম্ভব কথা। ঠাকুর তাতে কিন্তু বিরক্ত হলেন না। হেসে বললেন, যখন দেখবি তখন বুঝবি। তার আগে বুঝতে পারবি না। তারপর স্বামীজীর যখন নিজের অনুভূতি হল তখন তিনি স্বীকার করলেন যে, সত্যিই সব ব্রহ্ম। খেতে বসেছেন, খাচ্ছেন না বসে আছেন। তাঁর মা বলছেন কি রে, খাচ্ছিস না কেন? ভাবছেন খাব কি? দেখছি যে অন্ন ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, সব ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আমি যা বলব তা আমি বলছি বলে মেনে নিও না, তাকে যাচিয়ে বাজিয়ে নেবে।

সত্যকে পরীক্ষা করে নিতে হয়। কেউ বলেছে বলেই তা সত্য হবে না। পাঁচজনের পাঁচ রকম মত—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'—এমন মুনি নেই যাঁর একটা ভিন্ন মত নেই। এই ভাবে শব্দের অরণ্যে, মতের অরণ্যে আমরা ঘুরে মরি। ফলে সত্য কি তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি জানেন সত্যের বহুরূপ থাকতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা পুরুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার ফলে এই তত্ত্ব দেখেছেন যে, ভগবান একও হতে পারেন বহুও হতে পারেন। আমরা অনেক সময় এবিষয়ে দার্শনিক বিচার করে কুল পাই না। বিচারের দিক দিয়ে দেখলে যে এক সে একই হবে, যে বহু সে বহুই হবে। একও হতে পারে, বহুও হতে পারে, এরকম কল্পনা মানুষের বুদ্ধিকে প্রতিহত করে। দ্বৈতবাদীরা বলেন, অদ্বৈতবাদী যে এক বলছেন সে তাঁর দৃষ্টির বিভ্রম। তিনি বৈচিত্র্যকে দেখতে পাচ্ছেন না। আর অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীকে বলছেন, অজ্ঞতাবশতঃ তুমি বৈচিত্র্যকে দেখছ, এটা ভ্রম। কেউ যেমন দুটি চাঁদ দেখতে পায় সেইরকম তোমার দৃষ্টি মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তাই তুমি বহু দেখছ। শাস্ত্রে এসব বিভিন্ন মতেরই সমর্থন আছে। শাস্ত্র বলছেন ঃ "সর্ব কাম সর্ব রসঃ সর্ব গন্ধ"—তাঁর ভিতরে সমস্ত বৈচিত্র্য আছে। সর্ব রস ও গন্ধ আছে। রূপ রসে পরিপূর্ণ তিনি। আবার শাস্ত্রে এও আছে যে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এখানে একও বলছেন না, বলছেন অদ্বিতীয়ম্। তাহলে সংখ্যা দিয়ে তাঁকে ভূষিত করা হল। এই জন্যে অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলছেন। এত সাবধানে বলছেন।

এই যে বিভিন্ন মতবাদকে একযোগে স্বীকার করা, আপাতদৃষ্টিতে এটা অতার্কিকের কথা, অজ্ঞের কথা। আর এক দৃষ্টিতে ঠাকুর বলছেন, বিজ্ঞানীর কথা। বিজ্ঞানী বিশেষভাবে ভগবানের একত্বও অনুভব করেছেন, বৈচিত্র্যও অনুভব করেছেন এবং তিনি বলেন না যে, বৈচিত্র্য মিথ্যা বা একত্ব মিথ্যা। তিনি উভয়রূপেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন। ঠাকুর বলছেন, তুমি সমস্যায় আকুল হয়ে যে জন্মমৃত্যুর প্রবাহের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদা চঞ্চল, ম্রিয়মাণ হয়ে আছ এর হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় হল একটা সিদ্ধান্তকে জোর করে ধর এবং সেটাকেই, লক্ষ্যরূপে ধরে এগিয়ে চল। দেখবে তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। এইরকম করে এত বাস্তব দৃষ্টান্ত, পরস্পরে বিরোধ না করে একটা তত্ত্বে নিয়ে যাওয়া—এ আর কোথাও এমনভাবে দেখা যায় না। তাঁর কথা, আমরা সকলে সেই জায়গায় যাচ্ছি যাকে আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। প্রকাশ করলে তাঁর স্বরূপকে কুণ্ঠিত করতে হয়। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, এক পুকুরের জল, একঘাট থেকে খ্রীষ্টান জল নিচ্ছে বলছে ওয়াটার, আর একঘাট থেকে মুসলমান নিচ্ছে, বলছে পানি, আর এক ঘাট থেকে হিন্দু নিচ্ছে, বলছে জল। এতে বস্তু কি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ? যে যে নামই দিক সবই তো পিপাসা নিবারণে সমর্থ। সুতরাং ভগবানকে যেভাবেই ভাব না কেন তিনি অন্তরের সমস্ত বাসনাকে পূর্ণ করবেন, সমস্ত পিপাসাকে নিবৃত্ত করবেন, জন্ম মৃত্যুর পারে নিয়ে যাবেন।

আমাদের জীবনের সমস্যা সমাধানে এই তো আমরা চাই। তর্ক করে কেবল কোলাহল সৃষ্টি হয়। তার ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ, দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্ব কখন কখন রক্তপাতে পরিণত হয়। আজকের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সংক্ষুব্ধ পটভূমিতে এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সমক্ষে আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁর দৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান অতি সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে কোন বিভেদ নেই। এইটি বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ বিভেদ আমাদের কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। চারিদিকে সন্ত্রাস, একজন আর একজনকে বিশ্বাস করে না, সর্বত্র হানাহানি মারামারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর ভিতরে শান্তির স্থান হল এই বোধে—সমস্তের ভিতরে একই সত্য রয়েছেন যাঁকে বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সামনে সেই সত্যকে প্রকাশ করেছেন। অতএব আমরা তাঁর যে রূপটিকে পারি সেই রূপটিকে অবলম্বন করে চলতে পারি। সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত। তিনি ভক্তিকেই সার বলেছেন। বার বার বলছেন, কলিতে নারদীয়া ভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তিতে ভগবানের

কাছে কাম্য কিছু নেই। তাঁকে অহেতুক ভালবাসা দিতে হবে।

আবার নরেন্দ্রকে বলছেন সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব। স্বামীজীও এটি বুঝলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীকে প্রচার করবার জন্য বলেছেন, সত্যের বহুরূপ আছে। বহুরূপ তিনি দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে বসে। না হলে তাঁর মতো প্রখর যুক্তিবাদীর পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হতো না।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে যেভাবেই দেখি, ভক্ত অথবা জ্ঞানী, শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব বা অন্য কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে দেখি তাহলেও দেখব তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করছেন এবং তারপরেও তাঁর ইতি হচ্ছে না, আরও বহুরূপ তাঁর ভিতরে রয়েছে। এটি দেখে আমাদের জীবন ধন্য হবে এবং আমাদের সকল সমস্যার সমাধানের সন্ধান পাব। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের একটি বিশেষ প্রয়োজন এইভাবেই সিদ্ধ হয়েছে। আমরা কতকগুলো আচার নিয়ম নিষ্ঠাকেই ধর্ম বলে স্থির করে বসেছি। স্বামীজী একে উপহাস করে বলেছেন, জল বাঁ হাতে খাব না ডান হাতে খাব, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যের রান্না-করা ভাত খেলে জাত যাবে এই বিচার আমরা হাজার বছর ধরে করছি। এই যদি ধর্ম হয় তাহলে সে কি ধর্ম? শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ধর্ম মানে সেই পরমতত্ত্বের অনুভূতি যা অনুভব করলে সমস্ত বিশ্বসত্তাকে অনুভব করা যায় এবং তার পরিণামে এই হয় যে, কোথাও কারও সঙ্গে বিরোধ থাকে না, দ্বেষ থাকে না। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সর্বত্র সেই পরমেশ্বর অবস্থান করছেন, এই দৃষ্টিতে দেখলে শত্রু মিত্র প্রভেদ আর থাকে না।

এর মানে কি সকলের প্রতি উদাসীন থাকা? তা নয়। সকলকে আত্মস্বরূপ দেখা। এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার সাহায্যে অনুভব করে তাঁর প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে এই ভাবে ভাবিত করে গড়ে তুলেছিলেন। সেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর পতাকা বহন করে সর্বত্র গিয়েছেন। তাঁর বাগ্মিতায় সকলকে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর বিদ্যাবত্তা লোককে চমৎকৃত করেছে। কিন্তু তিনি বলতেন, আমি যা কিছু বলছি তা আমার গুরুর চরণতলে বসে শিখেছি। আমার কথার মধ্যে এমন যদি কিছু থাকে যা কারও অনিষ্ট করে সেজন্যে আমিই দায়ী, আর আমার কথার মধ্যে এমন কিছু যদি থাকে যাতে লোকের কল্যাণ করে, তা আমার গুরুর।

বড় বড় পন্ডিতদের বক্তৃতা বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন বাণীকে আশ্রয় করে তাঁরা কথাটি বলছেন। প্রত্যেকটি কথার মূল সূত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে। এই প্রায় নিরক্ষর তথাকথিত অশিক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে এমন অপূর্ব ঐশ্বর্য যার পরিচয় পেয়ে দেশ বিদেশের পন্ডিতেরা মুগ্ধ হয়েছেন। স্বামীজী জগতের মনীষীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু করেছেন খুব সসংকোচে। বলেছেন, কি জানি ভয় হয়। বলতে গিয়ে যদি তাঁর উদারতাকে খর্ব করে ফেলি। সেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা যখন ভাবব তখন তাঁকে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে ভুল হবে। তাঁর কোন ভাব যদি আমাদের আকর্ষণ করে সেই ভাবটিকে নিয়ে জীবনে যদি আমরা অনুশীলন করতে পারি, আমাদের জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এইরকম জগতের প্রত্যেকের সমস্যার সমাধান এই যুগাবতারের শিক্ষার ভিতর থেকে হবে, এই বিশ্বাস আমরা করি। স্বামীজী এই কথা বারবার বলেছেন। আজ সেকথা জগতের মনীষীরাও একটু একটু করে বুঝতে সমর্থ হচ্ছেন।

এখনও তাঁর ভাব জ্বল জ্বল করছে। মাত্র একশ বছর আগে তিনি স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেছেন। যা তিনি দিয়ে গিয়েছেন তা আমাদের জীবনে পরিণত করতে কত যুগ লাগবে আমরা জানি না। স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুরের ভাব অন্ততঃ হাজার বছর চলবে অব্যাহতভাবে। অবশ্য কতদিন চলবে এই বিচার করে লাভ নেই, আমাদের একটি ভাব এখন নিতে হবে এবং নিজেদের জীবন যাতে সেই ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় তার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।*

* ৬ অক্টোবর ১৯৮৫ তারিখে মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ তাঁর পূর্বাশ্রম-জীবনের একটি ঘটনা

জ্যোতির্ময় বসুরায়

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনচরিতে দেখি, তিনি কয়েক বছর সসম্মানে উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের (তখনকার N. W. P.) পূর্ত বিভাগে কাজ করার পর চাকরিতে ইস্তফা দেন, অতঃপর যোগ দেন আলমবাজার মঠে। তখন তিনি পরিচিত তাঁর পূর্বাশ্রমের হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নামে। তাঁর ঐ পদত্যাগ-প্রসঙ্গ বর্তমান নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সরকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে হরিপ্রসন্ন কতকাল কাজ করেছিলেন? ঠিক কতকাল বলা কঠিন। কারণ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পূর্বাশ্রম-জীবনের অনেক ঘটনা যেমন অজ্ঞাত, তেমনই অজ্ঞাত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নির্ভুল সন-তারিখও। দুঃখের বিষয়, যথাসময়ে এসব লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। সে যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুধাবন করে বলা যেতে পারে, সরকারি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁর কর্মকাল আনুমানিক সাত-আট বছর (১৮৮৯—১৮৯৬-৯৭)। গাজীপুর হরিপ্রসন্নের প্রথম কর্মস্থল। গাজীপুরে যখন তিনি সরকারি ইঞ্জিনিয়ার সেইসময়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এটি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। স্বামী অভেদানন্দজী-সূত্রে আমরা এই তথ্য পাই।[1] হরিপ্রসন্নের জীবন-চরিতে তাঁর কয়েকটি কর্মস্থলের নাম দেওয়া হয়েছে—যথা, গাজীপুর, মীরাট, বুলন্দ শহর, এটা (মতান্তরে এটাওয়া)। এছাড়া দেখা যাচ্ছে, তিনি ভারত সরকারের অধীনে মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলেরও কয়েকটি স্থানে কর্মরত ছিলেন। কর্মত্যাগের সময়ে হরিপ্রসন্ন ছিলেন এটা জেলার ভারপ্রাপ্ত এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধের (অথবা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকের) কোনও সময়কে এই পদত্যাগ-ঘটনার কাল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন তারিখে ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা একটি পত্রে স্বামী বিবেকানন্দজী এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী লিখেছেন ঃ "যেসব ছেলেরা [আলমবাজার মঠে] শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত Executive Engineer ছিল। ভারতে উহা একটি উচ্চ পদ। সে খড়কুটোর মতো তা পরিত্যাগ করেছে।"[2] 'তাদের একজন' বলতে স্বামীজী অবশ্যই তাঁর স্নেহের গুরুভ্রাতা 'পেসন' তথা হরিপ্রসন্নর কথাই বলেছেন। স্বামীজীর পত্রে উক্ত ঘটনার উল্লেখ এই প্রথম। মনে হয়, যে-সময়ে তিনি ঐ চিঠি লিখেছেন তার খুব বেশি আগে ঘটনাটি ঘটেনি।

হরিপ্রসন্ন এটা শহরে উক্ত সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্বামী প্রেমানন্দজী বৃন্দাবন থেকে পীড়িত কালীকৃষ্ণ মহারাজকে [পরে স্বামী বিরজানন্দ] তাঁর কাছে পাঠান। কিছুদিন পরে স্বামী প্রেমানন্দজী নিজেও গুরুভ্রাতার কাছে উপস্থিত হন। উভয়ে হরিপ্রসন্নের গৃহে ছিলেন প্রায় এক মাস। হরিপ্রসন্নের সেবাযত্নে কালীকৃষ্ণ মহারাজের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। স্বামী প্রেমানন্দজী ও কালীকৃষ্ণ মহারাজ এটা থেকে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার অল্পকাল পরে হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করেন।

তাঁর এই কর্মত্যাগ সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের জন্য —ঈশ্বরসাধনায় জীবন সম্পূর্ণ নিবেদনের জন্য। তিনি চাকরি করেছেন কিছু দায়িত্ব পালনের তাগিদে —শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় মাতৃঋণাদি কয়েকটি ঋণ-

১ আমার জীবনকথা, ১ম সং (১৯৬৪), পৃঃ ১৫০

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৬৯), পৃঃ ৩৫৫

শোধের জন্য। জননী নকুলেশ্বরী দেবীর ভরণ-পোষণ এবং ছোট ভাই হরিকমলের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁর কিছু অর্থ উপার্জন করা দরকার ছিল—এছাড়া জ্যাঠামশায়ের সংসারের প্রতিও তাঁর কর্তব্য ছিল, কারণ বাল্যকাল থেকে পিতৃহীন হরিপ্রসন্ন বড় হয়েছিলেন জ্যাঠামশায়ের অভিভাবকত্বে।

হরিপ্রসন্ন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিহ্নিত ত্যাগী ভক্তদের অন্যতম। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন হরিপ্রসন্নকে (তখন তিনি কলেজের ছাত্র) বিশেষ কৃপা করে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনপীঠ পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে পাঠিয়েছিলেন। ধ্যানান্তে হরিপ্রসন্নকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে এনে তাঁকে সাধন-ভজন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে-ছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি সম্পর্কেও। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেনঃ "দ্যাখ্, মেয়েমানুষের দিক মাড়াসনি। খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটিও যেন গায়ে না লাগে। সোনার মেয়েমানুষ—আর ভক্তিতে গড়াগড়ি দিলেও সেদিকে ফিরেও তাকাবিনি। তোকে একথা কেন বলছি জানিস? তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। ...তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি।"[৩] তিনি ঠাকুরের উপদেশ-নির্দেশ সর্বদা অক্ষরে অক্ষরে নিঃসংশয়ে মেনে চলতেন—একথা আমরা জানি। রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ পদে বৃত হবার কয়েক বছর আগে পর্যন্তও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করার সুযোগও ভক্ত-স্ত্রীলোকেরা পেতেন না। তাঁর এলাহাবাদ মঠে দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্ত্রীলোকের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি তাঁর নিকটতম আত্মীয়ার পক্ষেও এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। প্রশ্ন হতে পারে, হরিপ্রসন্নর চাকরি করা কি শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল? আলাদা করে এ-বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কোনও কথা হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব বা কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়া ঠাকুর একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি বারবার মাতৃঋণ শোধ করবার কথা বলেছেন। অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালনের কথাও। হরিপ্রসন্নের প্রতি ঠাকুরের উপদেশের মূল কথাটি হলঃ "সংসারের আঁচ যেন গায়ে না লাগে।" সে-বিষয়ে হরিপ্রসন্ন খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি যে "মায়ের লোক" সেকথা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। আমরা অনুমান করতে পারি, চাকরি করতে করতেও তিনি চাকরিতে ডুবে থাকেননি, বরং সংসার ত্যাগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সরকারি কর্মটি ছাড়তে পারছিলেন না চাকরির একান্ত প্রয়োজন দূর হয়নি বলে—এবং কবে সেই প্রয়োজন মিটে যাবে, কবে সেই প্রার্থিত দিনটি আসবে তার দিকে নিশ্চয় তিনি সাগ্রহে তাকিয়ে থেকেছেন।

তাই স্বামী প্রেমানন্দজী এবং কালীকৃষ্ণ মহারাজ এটা থেকে বিদায় নেবার অল্পকাল পরে হরি-প্রসন্নর পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত নয়। তবুও ঘটনাটা যেন ঈষৎ আকস্মিক মনে হয়। প্রশ্ন ওঠা সঙ্গতঃ সাত-আট বছরের মধ্যেই কি তিনি তাঁর মা, ভাই এবং জ্যাঠামশায়ের সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? সেকালে কোনও জেলার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের বেতন ৩০০-৪০০ টাকার বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না—বিশেষতঃ যদি তিনি ভারতীয় হতেন। তাছাড়া তাঁর কর্মজীবনের প্রথমেই নিশ্চয় তিনি কোনও জেলার ভারপ্রাপ্ত Executive Engineer ছিলেন না, তাঁকে সম্ভবতঃ শুরু করতে হয় Assistant Engineer হিসাবে এবং সেই পদের বেতনও অনেক কম হওয়ার কথা। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, বেতনের টাকা থেকে প্রতি মাসে তিনি আলমবাজার মঠে ৬০ টাকা পাঠিয়ে দিতেন। এই সংবাদ তাঁর প্রকাশিত জীবন-বৃত্তান্তে দেওয়া হয়েছে। নিজের খরচের ব্যবস্থা রেখে কিছু টাকা তিনি প্রতি মাসে অবশ্যই মাকে ও জ্যাঠামশায়কে পাঠাতেন। সেক্ষেত্রে সাত-আট বছরে মা ও ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ-প্রয়োজন মেটানোর জন্য কত টাকাই বা তিনি জমিয়ে থাকতে পারেন? স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনে দেখা যায়, তাঁর মনের কোনও ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে সেটি কার্যে পরিণত করবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠতেন, তখন বিলম্ব সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু

৩ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, এলাহাবাদ, (১৩৭২), পৃঃ ৪

সাধারণতঃ তিনি পূর্বাপর বিবেচনা করে শৃংখলার সঙ্গে কার্যে অগ্রসর হতেন। এটায় স্বামী প্রেমানন্দজী এবং কালীকৃষ্ণ মহারাজ তাঁর গৃহে অতিথি হবার আগে হরিপ্রসন্নের চিত্তে আশু কর্মত্যাগের পরিকল্পনা দানা বেঁধেছে এমন কোনও ইঙ্গিত আমরা কোথাও পাই না। তবে তাঁরা বিদায় নেবার অনতিকাল পরে তিনি পদত্যাগ করলেন কেন যা আগেই বলা হয়েছে, কতকটা আকস্মিক মনে হয়? ইতিমধ্যে এমন কিছু কি ঘটেছিল যা তাঁর চিত্তে সংসার সম্পর্কে বৈরাগ্য অত্যন্ত তীব্র করে তোলে? এ-বিষয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রকাশিত জীবনচরিতের অন্তর্ভুক্ত দুটি তথ্য অনুধাবনের যোগ্য।

(১) স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে স্বামী অপূর্বানন্দ বলেছেন : "এটাওয়াতে [এটায় ?] বাবুরাম মহারাজের সঙ্গ পেয়ে হরিপ্রসন্ন ঠাকুরের ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুভাইদের নানা প্রসঙ্গ হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত কি যেন নেশার ঘোরে। হরিপ্রসন্ন প্রাণে প্রাণে ঠাকুরের ডাক শুনতে পেলেন।...তিনি ক্রমে অস্থির-প্রাণ হয়ে পড়লেন। চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।"[৪]

(২) স্বামী জগদীশ্বরানন্দের লেখা বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনী-গ্রন্থে বলা হয়েছে : "তিনি [হরিপ্রসন্ন] যখন কর্মত্যাগ করেন তখন উপরিস্থ কর্মচারী তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে ...প্রমোশন দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তখন তাঁহার জ্যাঠামশায় বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। সেইজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া কর্মে ইস্তফা দিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।"[৫]

এই দুটি সংবাদ মিলিয়ে দেখলে হরিপ্রসন্নের কর্মত্যাগের তাৎক্ষণিক হেতু কতকটা উপলব্ধি করা যায়। কর্মত্যাগ তিনি অবশ্যই করতেন—তবে যখন চাকরি ছাড়লেন, এমনিতে হয়তো তার দুই এক বছর পরেও ছাড়তে পারতেন। দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্তটি ত্বরান্বিত হয়েছে—প্রথমতঃ, প্রেমানন্দজীর মাসব্যাপী সঙ্গের প্রভাবে; এবং দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবকদের দিক থেকে তাঁকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করার বিরক্তিতে।

বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি সম্বন্ধে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ যা বলেছেন সেই প্রসঙ্গে বর্তমান নিবন্ধকার একটি অতিরিক্ত তথ্য লাভ করেছেন ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে। সেটি জানা গিয়েছে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিকমল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে। বারুইপুর শহরের নিকটবর্তী দক্ষিণ গোবিন্দপুরে তাঁর সাংবাদিক-পুত্র জ্ঞানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে তখন প্রায়-অশীতিবর্ষীয়া ঐ মহিলা, শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেদিন যা বলেছিলেন সেই কাহিনী বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় যে-ঘটনা বর্ণনা করেন সেটি তিনি শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুমা অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দজীর জননী নকুলেশ্বরী দেবীর নিকট। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়-বর্ণিত কাহিনীর মর্মকথা এই :

সরকারি কর্মে নিযুক্ত হবার কিছুদিন পর থেকেই হরিপ্রসন্নের অভিভাবকদের দিক থেকে তাঁর বিবাহের চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু বিবাহে হরিপ্রসন্নর ঘোর আপত্তি। এ-ব্যাপারে তিনি কোনমতেই রাজি নন। কিছুকাল পরে তাঁর জ্যাঠামশায় একটি কৌশল করেন। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী, নকুলেশ্বরী দেবী অর্থাৎ মাতৃদেবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হয় হরিপ্রসন্নর কর্মস্থলে [এটায়]। ইতিপূর্বে পাত্রী মনোনীত করে রাখা হয়েছিল। তারবার্তায় হরিপ্রসন্নকে অবিলম্বে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল বেলঘরিয়ায় তাঁদের গৃহে। যেদিন বেলঘরিয়ায় তাঁর এসে পৌঁছানোর কথা, পাত্রীকে সেদিন পূর্বাহ্নে ঐ

৪ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ৪

৫ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, এলাহাবাদ, (১৩৫৪), পৃঃ ১২

বাড়িতে আনিয়ে একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। হরিপ্রসন্ন গৃহে পদার্পণ করে প্রথমেই মা কেমন আছেন জানতে চাইলেন। দেখলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা কি তিনি তখনও অনুমান করতে পারেননি। বিস্মিত, বিভ্রান্ত পুত্রের হাত ধরে নকুলেশ্বরী দেবী তাঁকে বিশেষ ঘরটির সামনে নিয়ে এলেন। অতঃপর ঘরের ভেজানো দরজা খুলে সুসজ্জিতা, সালংকারা কন্যাটিকে দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটিকে বধূরূপে তাঁর পছন্দ হয় কিনা। হরিপ্রসন্ন কন্যাটির পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁকে মাতৃসম্বোধন করেন এবং ঘরের বাইরে থেকেই তাঁকে প্রণাম করেন ভূমিষ্ঠ হয়ে। পরক্ষণেই তিনি নিজের মায়ের দিকে ফিরে তাঁকে প্রণাম করলেন। অতঃপর কালবিলম্ব না করে জননীকে বলে ওঠেন : "মা, আমি চললাম।" কিন্তু সামান্য অগ্রসর হয়ে তিনি দেখলেন, ইতিমধ্যে সদর দরজা কুলুপ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি বাগানে এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে গৃহত্যাগ করেন। যাবার আগে আবার তিনি গুরুজনদের উদ্দেশে প্রণাম জানান।[৬] এইভাবে তিনি একবস্ত্রে ফিরে যান কর্মস্থল এটায়। এই ঘটনার পরেই তিনি চাকরি ছেড়ে মঠে যোগ দেন।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনীতে তাঁর পূর্বাশ্রমের জীবনবৃত্তান্তে যে-ফাঁক বা শূন্য স্থান ছিল, শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়-বর্ণিত উক্ত কাহিনী সেটি ভরিয়ে তুলেছে মনে হয়। বাল্যকাল থেকেই হরিপ্রসন্নর চরিত্রে ছিল একটি লক্ষণীয় দৃঢ়তা। কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল অবিচল আদর্শনিষ্ঠা। "প্রাণে প্রাণে ঠাকুরের ডাক" শুনতে পেয়েও যে তিনি কর্মত্যাগ করতে পারছিলেন না, তার মূলে ছিল কর্তব্যবোধ। কিন্তু টেলিগ্রাম-ঘটিত ব্যাপারে তিনি যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তারপর সংসারের প্রতি তাঁর আর কী দায়িত্ব, কী কর্তব্য থাকতে পারত? শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্যই তাঁর উপদেশে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।" (কথামৃত, ৪।২৩।৮)। বলেছেন : ..."সংসারে বাপ-মা পরম গুরু; যতদিন বেঁচে থাকেন, যথাশক্তি তাঁদের সেবা করতে হয়...।" (লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ১৩৫)। সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি বলেছেন : "... কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ-মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায়, তাতে দোষ হয় না।" (ঐ)। বস্তুতঃ, ধর্মজীবনের পক্ষে যা বাধা সেই প্রতিবন্ধককে মেনে নিতে তিনি কখনও উপদেশ দেননি, বরং তা অতিক্রম করতেই বলেছেন। হরিপ্রসন্নের ধর্মজীবনের পথে যে ভয়ংকর বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটি শাপে বর হয়ে ওঠে তাঁর ক্ষেত্রে। ঘোর বিপদে তিনি ঠাকুরের উপদেশ ক্ষণমাত্রের জন্যও বিস্মৃত হননি। অভিভাবকদের মনোনীত কন্যাকে তিনি মাতৃজ্ঞান করেছেন, প্রণাম করেছেন তাঁকে। তারপর অবিলম্বে কর্মস্থলে ফিরে নিজের করণীয় স্থির করে ফেলেছেন। সংসারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রশ্ন তখন ঘটনার প্রবাহে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, সংসারকে (মাতৃদেবীর ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্যে) যা তিনি দিতে পেরেছেন, তা-ও নিতান্ত সামান্য নয়। তাঁর মূল্যবান জীবনের কয়েকটি বছরই তো সংসারের সেবায় অতিবাহিত। সে যাই হোক, আর চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) তাঁকে খুব উৎসাহিত করেন। তা ছাড়া

৬ শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়-বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী অংশটুকু এখানে যোগ করা যেতে পারে। যে-কন্যাকে বেলঘরিয়ায় তাঁদের বাড়িতে আনা হয়েছিল, হরিপ্রসন্ন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পর তাঁকে নিয়ে সংকট উপস্থিত হয়। কন্যাপক্ষকে শান্ত করবার জন্য তখন হরিপ্রসন্নের অনুজ হরিকমলের সঙ্গে সেই পাত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা হয়। যথাসময়ে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয়নি। বিবাহের পর কন্যাকে তাঁর পিতা নিজগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তিনি পিতৃগৃহে ব্রহ্মচারিণীর মতো অবশিষ্ট জীবন কাটান। শুধু সামাজিক দিক দিয়ে কন্যাপক্ষের মুখরক্ষার জন্যই যেন পূর্বোক্ত বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। যাই হোক, হরিকমলের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হয়। হরিকমল চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তান শ্রীমতী প্রমীলা দেবী।

এই সময়ে হরিপ্রসন্ন অতীন্দ্রিয় অনুভবে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশও লাভ করেন কর্মত্যাগের পক্ষে। অতঃপর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারেননি তিনি। কর্তৃপক্ষকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন একটি তারবার্তার মাধ্যমে।[৭] অতএব পদোন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে তখনকার দিনের বিশেষ সম্মানজনক পদটি তিনি স্বামীজীর ভাষায় 'খড়কুটোর মতো' ত্যাগ করে চলে এসেছেন আলমবাজার মঠে।

উপরের আলোচনায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জননী নকুলেশ্বরী দেবী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। এই সূত্রে নকুলেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর এই সন্ন্যাসী-পুত্রের সম্পর্কটিও সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

নকুলেশ্বরী দেবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল; পুত্রও ঠিক তেমনই ছিলেন দৃঢ়চেতা—তদুপরি ধর্মনিষ্ঠ, আদর্শনিষ্ঠ। হরিপ্রসন্ন তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ও সাধনার ক্ষেত্রে জননীর আনুকূল্য লাভ করেননি। দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও পুত্রের রাত্রিবাস যে মায়ের মনঃপূত হতো না সেকথা বলাই বাহুল্য। পরে পুত্রকে সংসারে বন্ধ করার চেষ্টাতে ছিল জননীর বিশেষ ভূমিকা। জননীর কাছ থেকে তাই হরিপ্রসন্নকে বিদায় নিতে হয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

শিশুকাল থেকে তিনি মাকে যত ভালবাসতেন, ততই ভয় করতেন। বস্তুতঃ, জননী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভয় মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকত। মঠে যোগ দেবার পর তিনি মায়ের সম্মুখে কিছুতেই উপস্থিত হতে চাইতেন না—সম্ভবতঃ পাছে মা তাঁর সন্ন্যাসজীবনে কোনও বাধার সৃষ্টি করেন, পাছে নতুন করে তাঁকে টানবার চেষ্টা করেন সংসারে। বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে যখন মঠের অবস্থান, সেই সময়ে একদিন নকুলেশ্বরী দেবী সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হরিপ্রসন্ন মহারাজ প্রথমে দেখা করতে রাজি হননি। গুরুভ্রাতারা অনেক বুঝিয়ে বলার পরে তিনি এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন—তাঁকে প্রণাম ও দুই-একটি বাক্য-বিনিময় করে কোনও রকমে সম্পন্ন করেন এই সাক্ষাৎকার পর্ব।

এর পর দীর্ঘকাল মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। একদা যেমন পরমহংসদেবের কাছে পুত্রের যাতায়াত নকুলেশ্বরী দেবীর ভাল লাগত না, পরবর্তী কালে তেমনই পুত্রের সন্ন্যাসজীবন বরণ করে নেওয়ার ব্যাপারটিও তিনি প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। এই নিয়ে একটি ক্ষোভ তিনি বহুদিন ধরে অন্তরে লালন করেছেন। শেষজীবনে তাঁর এই মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তিনি তখন তাঁর ভুল বুঝতে পারেন।

আমরা মাতাপুত্রের মিলন দেখছি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে, নকুলেশ্বরী দেবীর মনোভাব তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। প্রয়াগে তখন কুম্ভমেলা। নকুলেশ্বরী দেবী কুম্ভস্নানের জন্য এই সময়ে এলাহাবাদে এসে বিজ্ঞানানন্দজীর মুঠিগঞ্জ আশ্রমে উঠেছিলেন। সেখানে বাস করেছিলেন মাসাধিক কাল। ইতিপূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কোন স্ত্রীলোককে মঠে বাস করতে অনুমতি দেননি। একবার তাঁর পূর্বাশ্রমের ভগিনী এলাহাবাদে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। নিজের ভগিনীর ক্ষেত্রেও মহারাজজী তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাননি, তাঁর নির্দেশে নিকটবর্তী একটি ধর্মশালায় ভগিনীর থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এবার মায়ের বেলায় আর সেই নিয়ম খাটেনি। নকুলেশ্বরী দেবীর এলাহাবাদ মঠে অবস্থানকালে মহারাজজী তাঁর সেবাযত্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ) বলেছেন: "এবার দেখিলাম, মায়ের কত সেবাই তিনি নিজে করিলেন। বহুকাল পরে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট থাকিবার সুযোগ পাইয়া

৭ দ্রষ্টব্য: Swami Nirmalananda—His Life and Teachings—by His Disciples, Devotees and Admirers, Malabar Sri Nirmalananda Temple Committee, 1943, p. 35

জননীও পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বন্ধু সচ্চিদানন্দ মিত্রের উপর মহারাজজী তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানীকে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করাইবার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। বন্ধুবর বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত তাঁহার এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন।··· মাতৃদেবী যতদিন আশ্রমে ছিলেন, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম, মহারাজজী যেন ছোট একটি শিশুর মতো তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেন।···মহারাজের সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার অপূর্ব নিষ্ঠা ও তিতিক্ষা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া জননী বলিয়াছিলেন: "বাবা, তুই ঠিক পথই বেছে নিয়েছিস, ভগবান তোর মনের বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।"[৮]

মায়ের মনোভাবের এই পরিবর্তনের উল্লেখ করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েকজন ভক্তকে বলেন: "মা আমাকে এবার খুব আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা দিয়ে গেলেন। মা সংসারের জ্বালায় এতদিন ভুগে এখন বুঝেছেন। আমি যে-পথে চলেছি ওই পরম শান্তির পথ। তাই মা এবার খুব প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেছেন···।"[৯]

এলাহাবাদ থেকে বেলঘরিয়ার প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে সম্ভবতঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নকুলেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর চিত্তে তখন অশান্তির লেশমাত্র ছিল না।[১০]

জননীর দেহত্যাগের সংবাদপ্রাপ্তির পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েকজন ভক্তকে বলেন: "দেখ, আমার মা স্বর্গে গিয়েছেন। তিনি এখান [এলাহাবাদ মঠ] থেকে যাবার দিন আমাকে অনেক আশীর্বাদ করে গেলেন, সেই থেকে আমার মনও আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে।"[১১]

৮ প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায় সংকলিত, কলকাতা, (১৯৭৭), পৃঃ ৩০১—৩০২

৯ প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ৩০২

১০ এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধযোগী মহর্ষি বেঙ্কটরামন (রমণ মহর্ষি নামে যিনি সমধিক খ্যাত) ও তাঁর জননীর কাহিনী স্মরণ করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে প্রথম দিকে জননীর প্রতিকূল আচরণে এবং পরে মনোভাবের পরিবর্তনে সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। বেঙ্কটরামনজী সংসার ত্যাগ করে নির্জন স্থলে সাধন শুরু করলে তাঁকে সংসার-আশ্রমে ফেরাতে চেষ্টা করেন তাঁর মাতৃদেবী। পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মানসে একদা তাঁর সাধনক্ষেত্রে জননী উপস্থিত হয়েছিলেন। জননীর প্রস্তাবে বেঙ্কটরামনজী সম্মত হননি—তাঁর প্রভূত অশ্রুপাত সত্ত্বেও না। সাধক-পুত্র জননীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যেন পুত্রের সন্ন্যাসজীবনকে প্রসন্নচিত্তে স্বীকার করে নেন—উভয়ের পক্ষে সেটি কল্যাণকর হবে। তখনকার মতো নিরস্ত হলেও জননীর মনে শান্তি ছিল না। দীর্ঘকাল পরে শোকে তাপে জীর্ণ জননী নিজেই একদিন সংসার ত্যাগ করে রমণ মহর্ষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পুত্র তখন সিদ্ধযোগী। মা এসেছেন যোগী-পুত্র রমণ মহর্ষির কাছে পরমার্থজিজ্ঞাসু হয়ে। যোগী-পুত্রও তখন সশ্রদ্ধচিত্তে মাকে আশ্রয় দিয়েছেন আশ্রমে। শেষজীবন তিনি সেই আশ্রমে কাটান আশ্রমবাসীদের সেবা করে এবং রমণ মহর্ষির নির্দেশ অনুসারে সাধন করে। সেখানেই শান্তিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (A Search in Secret India—by Paul Brunton, B. I. Publications, (1970), pp. 285-89.)

১১ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-কৃত, পৃঃ ৮৬-৮৭

কবি সারদা

কবিতা সিংহ

॥ ১ ॥

আমি একজন মসিজীবী। দিনের মধ্যে কাজ ও অকাজের লেখা আমাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা লিখতে হয়। সেসব লেখার বিষয় বিচিত্র, আবেদন যদিও একই। জীবনমুখী। কিন্তু এত অনর্গল লেখা সত্ত্বেও, আমার জীবনে সবচেয়ে কম যদি কিছু লিখে থাকি তা রামকৃষ্ণ এবং রবীন্দ্রনাথের কথা। এঁদের নিয়ে যখনই লিখতে বসি, কেবলই মনে হয় যদি কোনভাবে, নিজেরই অজ্ঞাতে, আমার এই ছোটমাপের কলম দিয়ে তাঁদের বিশালতাকে খর্ব করে বসি।

আর সারদা। সারদা সম্বন্ধে সেই কৈশোরে সারদামঠের এক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাবার পর আর কিছু লিখেছি বলে মনে পড়ে না। এবং তাঁর সম্বন্ধে হয়তো—লিখবনাও কোনদিন। কারণ এ যে আমার আজন্ম সম্পর্কের কাহিনী।

আমার শৈশব থেকেই আমি আমার হাতের কাছে বই পেয়েছি। আমার স্মৃতির সহায়তা নিয়ে বলি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত আমার শয্যার পাশেই সাজানো থাকত।

আজ, বহু বছর বাদে, যখন দূরে থেকে পাঠক হিসাবে দেখি, তখন আশ্চর্য হয়ে ভাবি কখন লেখা হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রায় একশোটি কবিতা। আর কখন আমার অনেক বহু-আলোচিত কবিতায় আসন পেতে বসলেন রামকৃষ্ণ স্বয়ং। আর সারদা।

শৈশবেই সারদার সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু কবি সারদার সঙ্গে দপ্ করে একদিন আমার ষোলবছর বয়সের এক গোধূলীতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। সেই থেকেই তাঁর ভিতরে তাঁর সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়টিকেই খুঁজে ফিরেছি। এবং শেষ পর্যন্ত, আজ আমার জীবনের প্রবীণ প্রান্তে এসে জেনেছি 'কবি' পরিচয়টিই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

'কবি' শব্দটির অর্থ, জ্ঞানী। কিন্তু আমার কাছে এই শব্দটির অর্থ আরও ভুবন-বিস্তারী, আরও মহাজাগতিক।

বিশ্বের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির ভাবনার মূলে হল কবিতা। যে-কোনও সার্থক চিত্রকলা, ভাস্কর্য সঙ্গীত কিংবা নৃত্য কি আমাদের কবিতার উপলব্ধিই দেয় না? সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই, তা সে নাটকই হোক, বা ছোট গল্প. উপন্যাস বা প্রবন্ধই হোক—তার যখনই সার্থকতা তখনই তা মূলতঃ কবিতা।

এই সূত্রে একটু ব্যক্তিগত কথাও বলি। আমার শৈশবে হাতের কাছে পেয়েছিলাম আমার পিতা-মাতার বিবাহে পাওয়া উপহার গীতাঞ্জলি আর গাঢ় সবুজ রেক্সিনে সোনালী হরফে লেখা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের খণ্ডগুলি। কথামৃত আমার কাছে কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না। কথামৃত আমাকে তার আপন সাহিত্যগুণেই জয় করেছিল। পরবর্তী জীবনে আমার বিবাহের সময় আমার মাতুল কুমার অলক মিত্র আমাকে আমার প্রিয় এই সেট্‌টি উপহার দিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ' ও 'কবি রামকৃষ্ণ।' কথামৃতের মাধ্যমে কেবল রামকৃষ্ণই নয়, তাঁর আশেপাশের মানুষগুলিকেও আমি ধীরে ধীরে জানতে আরম্ভ করি। এই জানায় আমাকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যুগিয়ে সাহায্য করেন আমার পিতৃপ্রতিম রামকৃষ্ণ-সারদা গতপ্রাণ মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত মহাশয়। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কথামৃত রচনা করেছিলেন নাটকের আঙ্গিকে। যাকে এমন পর্যন্ত বলা যায় যে দলিল-নাটক। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কেবল স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ঘরের বর্ণনা, কুশীলবদের পোশাক, হাবভাব, অবস্থান ইত্যাদির এমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে করে কথামৃতের প্রতিটি পৃষ্ঠা এক-একটি দৃশ্য হয়ে ওঠে। শ্রীম-দর্শনে আমরা দেখি

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কথামৃত অভিনীত হোক। তিনি বার বার বলেছেন, যদি কেউ কথামৃতের যথার্থ ধ্যান করে, অর্থাৎ তার মনের মঞ্চে কথামৃতের অভিনয় করে তাহলে সে, মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতোই পুনরভিনয়ের আনন্দ পাবে।

কথামৃতের মঞ্চে কত বিচিত্র চরিত্রের আগমন। রামকৃষ্ণের বেশির ভাগ আপনজনই সহায়-সম্বলহীন টিন্-এজারদের দল। সেইসব নবীন যুবারাই যে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমুখ হয়ে উঠবেন তা সেদিন কি কেউ স্বপ্নেও অনুমান করেছিল? বরং রামকৃষ্ণকে সমালোচনা করেছিল বাউণ্ডুলে ছোক্‌রাদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। এঁদেরই সঙ্গে পশ্চাৎপটে ছিলেন সারদা। সারদাকে কেবল কথামৃতে নয়, লীলাপ্রসঙ্গেও পেয়েছি। কিন্তু আমার কবি সারদাকে তখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। কারণ আমার প্রয়োজন ছিল সারদার মুখের কথার। তাঁর প্রত্যক্ষ ভাষার।

মনে পড়ে, একদিন, শেষ বিকালের আলোয়, একা শ্রীশ্রীমায়ের কথা পড়তে পড়তে, হঠাৎ আমার সামনে দপ্ করে উঠল সারদার কবি-পরিচয়। সেই থেকেই তিনি আমার কাছে—'কবি সারদা'। আজ জীবনের প্রবীণ প্রান্তে এসে জেনেছি—সারদা যে কবি, একথা সকলেই জানেন। এ আমার ষোড়শ বর্ষের কোন স্পর্ধিত আবিষ্কারের নূতনতা নয়। তবে এ-প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণে রেখেছি তা হল, আমরা জানি রামকৃষ্ণ-সারদার এক বিশাল সাম্রাজ্য আছে। সেখানে তাঁদের পূজা ভক্তি-প্রেম রসে। সেখানে অনেক 'শ্রীশ্রী' লাগানো অনেকভাবে শ্রদ্ধা জানানোর রীতি। কখনো শ্রীশ্রীমা, কখনো শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী, কখনো শ্রীশ্রীঠাকুর। কিন্তু সেই ভক্তি-সাম্রাজ্যের বাইরে থেকেও যাঁরা রামকৃষ্ণকে এই বিশ্বের অনন্য ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করেছেন, সেই মানুষ-গুলির কথা আমরা যেন স্মরণে রাখি। যেমন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, মোক্ষমূলার, রোমাঁ রোলাঁ, অলডাস্ হাক্সলি, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, ক্রীস্টোফার ঈশারউড্ প্রভৃতি।

বিশ্বের অনন্যপুরুষ রামকৃষ্ণই প্রথম চিনেছিলেন কবি সারদাকে। বলেছিলেন,--'ও সরস্বতী। জ্ঞানদায়িনী'। রামকৃষ্ণের শব্দ নির্বাচন ও বিশেষণ নির্বাচন ছিল অমোঘ। তিনি সারদাকে অন্য নানা ঐশ্বরিক বিশেষণে বিভূষিত করতে পারতেন। কিন্তু সহসা সব ছেড়ে, হঠাৎ সরস্বতীর কথা তাঁর স্মরণে এল কেন? 'সরস্বতী', 'জ্ঞানদায়িনী'?

আমাদের দেবভাষায় এবং মাতৃভাষায়ও 'কবি', শব্দটির অর্থ জ্ঞানী। ক্রান্তদর্শী। তাহলে 'জ্ঞানদায়িনী' এই বিশেষণে বিভূষিত করে, তিনি, সারদাকে কবিই বললেন না কি?

রামকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় তাঁর তরুণ অনুগামীরা একবার ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন তাঁরই অনুজ্ঞায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন, (বিবেকানন্দ) নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ) এবং কালী (অভেদানন্দ)। এই তিন তরুণ প্রথমেই যান সারদার কাছে। ভিক্ষা-প্রার্থী হয়ে। এবং বলেন: "জ্ঞানবিজ্ঞান সিদ্ধির জন্য আমাদের ভিক্ষা দিন।" পরে, এই কালী যখন স্বামী অভেদানন্দ হন তখন সংস্কৃতে তিনি সারদার নামে একটি অসাধারণ স্তবগাথা রচনা করেন। এই স্তব স্বামী অভেদানন্দ সারদাকেও শুনিয়েছিলেন। সারদা শুনে বলেছিলেন: "বাবা, তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।" এই স্তবের একটি ছত্র হল: "তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং।" স্বামী অভেদানন্দ সারদা সম্বন্ধে অন্যপ্রসঙ্গে বলেছিলেন: "তিনি জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী।" স্বামী শিবানন্দ বলেছিলেন: "তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী"। শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (যিনি ইঞ্জিনীয়র ছিলেন) বলেছিলেন: "মা উপরে রয়েছেন (দোতলায়)। আমি নিচে বসে। তখনো মাকে দেখিনি। দেখতে, গিয়েছি। —আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল।" এই ছত্রটিই এক অনন্য কবিতা। বিজ্ঞানানন্দ এই ছত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্য বলেছিলেন: 'তিনি চিন্তা-স্বরূপিণী'। স্বামী বিবেকানন্দ দেশে এবং বিদেশে বার বার সারদা সম্বন্ধে বলেছেন। তাঁর চিঠিপত্র, বক্তৃতা, আলাপচারিতায় তিনি বার বার নানা ভাবে সারদার উল্লেখ করেছেন। বিবেকানন্দ চিরকালই ছিলেন গোঁড়ামীর বিরোধী। কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছিলেন, মায়ের সম্বন্ধে তাঁর 'গোঁড়ামী' আছে।

সেখানে কোন যুক্তি চলে না, তর্ক চলে না। যখন প্রথম প্রথম রামকৃষ্ণ তিরোধানের পর তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন তখন পরিস্থিতি কিরকম ছিল বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "সেদিন আমায় সহানুভূতি দেখাবার কেউ ছিল না। শুধু একজন ছাড়া। কেবল সেই একজনের সহানুভূতিই আশীর্বাদ ও আশা বহন করে আনল। তিনি একজন নারী। আমার গুরুদেবের সহধর্মিণী।" আবার বলেছিলেন: "তিনি সর্বদা অতিলৌকিক স্তরে থাকেন। এবং সকলের মনের কথা জানেন। তিনি অন্তর্যামিনী।" একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

"আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। তিনি ভারতে পুনরায় মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে গার্গী মৈত্রেয়ী পুনর্বার ভারতে জন্মাবে।" স্বামী শিবানন্দ এই একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন: 'এযুগের সমগ্র নারী জাতির আদর্শ হলেন তিনি। ...দেখনা মার আগমনের পর থেকেই সব দেশের নারীজাতির মধ্যে কি অভিনব জাগরণ শুরু হয়েছে। তারা এখন নিজেদের জীবন পরিপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর। এখনও হয়েছে কি? এই তো সবে আরম্ভ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেমন গার্গী মৈত্রেয়ী সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি অদ্ভুত নারী-চরিত্রের বিকাশ হয়েছিল এ যুগে মেয়েদের মধ্যে তার চাইতে বড় বড় আধারের বিকাশ হবে। মেয়েদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়েই অতি আশ্চর্য শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়েই অতি আশ্চর্যজনক জাগরণ আসছে এবং আরও আসবে।"

সারদার সন্তানেরা তাঁকে দেখেন শতরূপে। বস্তুতঃ সহস্ররূপিণী তিনি। কিন্তু আমাদের চোখে এই অগণিতরূপিণী একটি মাত্র রূপেই সংবৃতা। যেমন একটি ক্ষুদ্রবীজে সংহত থাকে বহুসহস্র-মহীরুহের প্রজনন শক্তিধারী একটি মহীরূহ। কবি সারদাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে যেমন তার কবিরূপকে বের করা যায়, তেমনি এও বলা যায় যে, তিনি কবিতার এক পরম উৎসস্বরূপা। তাঁকে বিশেষ ও গভীর ভাবে যাঁরা জেনেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা অন্যতম। উনবিংশ থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে শব্দহীন বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল তার অন্যতম সূত্রধার ছিলেন এই ভগিনী নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের নিবেদিতা ছিলেন মুক্তপ্রাণা। এই নারী বাংলার নারী-শিক্ষা আন্দোলন, সামাজিক মুক্তির সঙ্গে যেমন জড়িত ছিলেন, তেমনি তাঁর আইরিশ রক্তে ছিল বাংলার মুক্তিকামী বিপ্লবীদের জন্য অসামান্য সহানুভূতি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদনার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র স্থাপনার প্রেরণা। পশ্চিমী অংকনরীতি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিবেদিতাই অবনীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিলেন ভারতীয় রীতির চিত্রকলার দিকে, এই অসামান্যা নারীর উৎসাহেই তরুণ নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা যান সেকালে স্বল্প পরিচিত অজন্তাগুহার ফ্রেস্কো দর্শন করতে। ভারতের অজ্ঞানতার অন্ধকারে স্বামী বিবেকানন্দের এই মানসকন্যা ছিলেন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাস্বরূপ। তিনি সারদাকে দেখেছেন সারদার অন্তঃপুরের ঘনিষ্ঠতায়। কাছে থেকে, পাশে থেকে, দিনের পর দিন ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

নিবেদিতা সারদার মধ্যে দেখেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীকে। তাই সারদার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'Day of days'—জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। এই প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, নারী সারদার কাছে যখন আসতেন তখন তিনি হয়ে যেতেন মাতৃদর্শনে আনন্দিত অকারণ খুশিতে ভরপুর ছোট একটি বালিকা। সারদা তাঁকে ডাকতেন 'খুকি' বলে। তাঁকে তিনি বিদেশিনী বলে কোনদিন দূরে রাখেননি। আমজাদ আর শরতের মায়ের মতো তিনি এই বিদেশিনীরও মা ছিলেন। সারদা কখনোই জাতিভেদ মানেননি। একপাতে সব জাতির সন্তানকে একসঙ্গে মুড়ি জিলিপি খাইয়ে তিনি আনন্দ পেতেন। এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও আজও আমাদের দেশের বহু নামকরা জ্ঞানী-গুণীজনেরা যখন জাতিভেদ নিয়ে বড়াই করেন এবং ছোঁয়া

ছুঁয়ি মেনে চলেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে 'অশিক্ষিত' ব্রাহ্মণ বিধবা সারদা নিঃসংকোচে বিদেশিনীদের সঙ্গে আহারাদি করেছিলেন। তিনি যদি যথার্থ ক্রান্তদর্শিনী না হন তাহলে কে হবেন ? তার এই উদারতা দেখে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

সারদার সবচেয়ে বড় সংযমী গুণ ছিল তাঁর আত্মসম্বরণ বা আত্মবিলোপের ক্ষমতা। সারদা কখনও রামকৃষ্ণের বিশেষ একজন, আলাদা একজন, সবচেয়ে আপন হয়ে উঠতে বা নিজেকে জাহির করতে চাননি। তাঁর কথায় ও কাজে এমন ভাব কখনও প্রকাশ হয়নি যাতে করে মনে হতে পারে যে তিনি রামকৃষ্ণের অন্য সব অনুরাগীদের চেয়ে আলাদা। অথচ রামকৃষ্ণ কিন্তু বার বার তাঁকে বিশেষ আসনে বসিয়েছেন এবং সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সারদার ভাব ছিল অতি বিনীত। অথচ বিশ্বে যা কখনও ঘটেনি সেই অসামান্য ঘটনা রামকৃষ্ণ ঘটিয়েছিলেন তাঁর সারদাপূজায়। রামকৃষ্ণ সারদাকে বিধিমতে পূজা করেছিলেন। তাঁর উপাসনা-মন্ত্রের একটি অংশ হল,

"হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ
ত্রিপুরা সুন্দরী
সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর,
ইহার শরীর মনে আবির্ভূতা হইয়া
সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

পূজা শেষ হবার পর, রামকৃষ্ণ তাঁর নিজের সমস্ত সাধনার ফল এবং জপমালা সারদার পায়ে চিরকালের মতো সমর্পণ করেছিলেন। নিবেদিতা বুঝেছিলেন, "সারদাদেবী ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী।"

সারদার ক্রান্তদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে তাঁর নিত্যসিদ্ধ আধুনিকতার প্রসাদগুণ দান করেছে। কোন বিষয়েই সারদার গোঁড়ামী ছিল না। এমন কি, তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছিলেন যে—গুরুর প্রতিটি নির্দেশই যে অন্ধের মতো পালন করতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

কবি অবহেলিতের কথা বলেন, কবি পতিতের কথা বলেন। কবির যুদ্ধ উচ্চ-নীচের ভেদাভেদের সঙ্গে ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার সঙ্গে। সারদাকে দেখি যখন তখন যে-কোন অবস্থায় যে-কোন মানুষকেই তিনি কৃপা করেছেন। সে স্টেশনের দেহাতী কুলিই হোক, কিংবা পার্শী হোক, মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান হোক, বা যে-ই হোক। এই বিশাল মহাজাগতিক হৃদয় কেবল কবিরই হতে পারে।

আজকের দিনে আমরা নারীমুক্তির কথা বলি। নারীমুক্তির প্রধান অন্তরায় কিন্তু সাধারণ মানুষের বক্র দৃষ্টিভঙ্গি। সারদা বলেছিলেন, সাধারণ লোক স্ত্রীলোককে ঠিক ভাবে দেখতে পারে না। পুরুষের এই অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বার বার নানা ভাবে উল্লেখ করেছেন ভার্জিনিয়া উলফ্, সীমঁ দ্য বেভোয়া এবং অন্যান্য নামী নারী-মুক্তিকামী লেখিকারাও।

আজও নারীর অন্তরে একটি ভাবনা লুকানো আছে, তা হল যেন তেন প্রকারে একটি বিবাহ। সারদা বার বার বলেছেন ঃ বিয়ে, বিয়ে কর কেন ? নিবেদিতার স্কুলে ভর্তি করে দাওনা। লেখাপড়া শিখুক। রামকৃষ্ণ ও সারদার সন্তান স্বামী শিবানন্দের একটি উক্তি একেবারে আজকের দিনের, এই মুহূর্তের উক্তি। তিনি বলছেন ঃ "মেয়েরা এখন নিজেদের জীবন পরিপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর।" এই উক্তি স্বামী শিবানন্দ কিন্তু সারদার প্রসঙ্গেই সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। পূর্ণ ভাবে বাঁচার যে আনন্দ সারদার তা ছিল। তাঁর নিজস্ব কোন দুঃখ ছিল না। তাঁর যতগুলি আলোকচিত্র আছে, তাতে দেখা যায়, তাঁর দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত। তিনি কুটনো কুটছেন, মাটির উঠোনে ন্যাতা দিচ্ছেন, রান্না করছেন, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কলকাতা থেকে আসা ছেলেদের জন্য দুধ ভিক্ষা করছেন। অথচ চোখ দুখানি স্বপ্নমাখা। দূরসঞ্চারী। করুণাগলিত। [ক্রমশঃ]

কোন পথে তার যাত্রা

দেবী রায়

বল, শুষ্ক-বক্তৃতায়—উপদেশে কি কাজ ?
সর্বাগ্রে দেওয়া চাই নিরন্নের মুখে অন্ন,
আর্তের পাশে
গিয়ে সেবকের ভূমিকায় যথার্থ দাঁড়ানো
নচেৎ, সব কিছুই হয়ে উঠবে আড়ম্বর,
কি প্রয়োজন ঐসব মূঢ়-সাজ !
নচেৎ, সদুপদেশ হয়ে উঠবে খামোকা এক প্রহসন
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই ভাল,
যদি পার তাকে নাও—কাছে টেনে নাও…
'ও ছন্নছাড়া মন'
আঁধার মানেই পেচক নয় কিংবা শৃগালও।
বোঝাও, ব্যাকুল হয়ে যে ডাকে
তার জটিলতা, ভয়, ভুলচুক এখুনি সরে যাবে
তার আঁধার নিশা—নিশা পোহাবে।
ভুলের বিনুনি থেকে জট খোলো, মানবহৃদয়
সূর্য-কে লক্ষ্য করে দ্যাখ—
কোন্ পথে, তার সুস্পষ্ট-যাত্রা অগ্রসর হয় !

হে অনির্বাণ

দেবাশিস নাথ

হে অনির্বাণ ! অযুত শতাব্দীপারে
তুমি কাল-মহাকাল !
যে আকাশ গোপন রাখে জ্যোতিষ্কবিলয়,
যে কুহর মুখর করে প্লাবনপ্রলয়,
যে তরল সম্পৃক্ত করে নিখিলপ্রণয়—
তার-ই বৈতালিক আমি জীবিতহৃদয় !
তুমি যে নিহিত চেতনা, রূপ-অরূপের !
প্রসবে প্রয়াণে তুমি—বীজ ও বিশ্বে—
তোমাতেই ফসল-ফসিল !
জীবন-স্ফটিকজলে শৈবাল ডেকে আনে
জীবনেরই অফুরান অজ্ঞান !
যে মরু উদ্বেল হয় উপলতুফানে,
যে নদী সঙ্গম পায় সমুদ্রের গানে,
যে প্রমা গহীনে ঘুমায় প্রতীকে-পুরাণে—
তার-ই বৈতালিক আমি জীবিতহৃদয় !
হে অনির্বাণ ! অযুত শতাব্দীপারে
তুমি কাল-মহাকাল !

উদ্বোধন

দিলীপ মিত্র

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে কণ্ঠস্বর—
'দুয়ার খুলে দাও' !
অনেক দিনের পুরনো দরজা
কাঁপছে থরথর করে।
ফুলের মালা আমার গলায় দিও না
তোমাদের কাছে আসতে আমার কষ্ট হয়,
ঝাপসা করে দেয় চোখের দৃষ্টি,
এখনও অনেক দূরে যেতে হবে !
তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।
দেওয়াল ভেঙ্গে যাচ্ছে এই কণ্ঠস্বরে,
আজ উদ্বোধন !

আর এক ভুবন

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

ধ্যানের মধ্যে জেগে ওঠে আমার সুন্দর।
জাগে পবিত্রতা, জাগে মোহমুক্ত প্রেম।
ভেতর বাড়িতে শুনি ঘণ্টাধ্বনি,
পদধ্বনি, কার ?
অন্ধকারে জ্বলে ওঠে পরিশুদ্ধ আলো,
সেই আলোর স্পর্শ এখন পূর্ণতা আনে
এখন আমার আকাশে ওড়ে
সাদা-নীল পাখির পালক।

আসে মৌন সুসময়, নামে প্রশান্তির ছায়া
আমি এরই মাঝে গড়ে তুলি আর এক ভুবন ॥

মিলন

প্রবীর মিত্র

পশ্চিম গগন কোণে
অস্তরবি যবে
রাত্রির ইঙ্গিত হানে
ঢালি রক্তরাগে।
পথিক চলিয়াছিল ধীরে
দিবসের সব কাজ শেষে
নিশীথের প্রশান্ত কিনারে
আঁধারেরে ধরিতে ভালবেসে

মনেতে বেজেছে কত ব্যথা
আনন্দে জেগেছে প্রাণ
গানেতে শুনেছে কত কথা
বেদনায় স্মৃতি কভু ম্লান
ঝরিয়াছে নব নব সুরে
চেতনের নিবিড় গভীরে
বারে বারে ডেকেছে কবিরে।

অনন্তের উৎস থেকে এসেছে আহ্বান
অনিত্য সৃষ্টিরে ঘিরি
নিত্যের নিত্য স্তবগান।
দিন শেষে রাত্রি আসে
আনন্দেরে ঘিরি দুঃখ নাচে।
আঁধারে ঝরিছে বারি
বেদনায় ফোটে আলো তারই।

মরণেরে বরণের মালা
বাতায়নে গাঁথে বসি বালা।
নিত্যের বাসর ঘরে
সত্যের সূর্যোদয় লাগি
আজি অভিসার রাতে
তোমার মিলন আশে
একা আমি জাগি।

প্রতীক্ষা

দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কবির জন্য এই কবিতা
যিনি আমাদের ছড়ানো ছেটানো শব্দগুলোকে সাজিয়ে
গড়ে তুলবেন ছন্দোময় বাক্য,
তা থেকে তৈরি হবে কাব্য—
পড়ে লোকের ভাল লাগবে।

সেই সুরকারের জন্যই দিন গুনছি
যিনি নানান যন্ত্রের হরেক সা রে গা-র মাঝে
আনবেন নিয়মের বাঁধন,
সৃষ্ট হবে সত্যিকারের সুর—
আমরা সুরের জগতে ভাসব।

সেই নেতার আশায় বসে আছি
যিনি বিচিত্র মানুষকে বেঁধে
ঐক্যের অখণ্ড সূত্রে
গড়বেন নতুন এক দেশ, নতুন এক সমাজ—
আমরা বেঁচে আনন্দ পাব।

ভুলে গেছি সেই স্নান

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের মধ্যে আগুন থাকে। সময় হলে
বোধির সীমান্ত ছুঁয়ে বাঙময় হয়।

দূরাগত আগুনের কণা
ঊর্ধ্বে তুলে লক্ষ লক্ষ ফণা
ছুটে যায় দূর বহুদূর,
সকলেরই প্রাণে বাজে
তিনে মিলে এক সুর ওঁ ওঁ ধ্বনি।

উৎস হতে ছুটে আসে প্রাণ-প্রস্রবণ—
প্রেম-প্রীতি ভালবাসা করুণার ধারা।

করুণার সেই ধারা আজো বহমান,
অগ্নিকণা প্রাণে প্রাণে নিত্য অনির্বাণ।
ভুলে গেছি শুধু সেই স্নান, সে উদাত্ত গান।
রণডঙ্কা শঙ্খসম, সুন্দর প্রভাত,
আগুনের উৎসমুখ, বিবেকের বাণী,
আনন্দপূর্ণ মূর্তি, অমৃতের কণা।



অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বড় বউ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

একুশ বৎসর বয়সে গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। গোপীমোহন বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বিষয়কর্ম শিখিতেছিলেন, সম্পূর্ণ শিখিতে পারেন নাই। যত্ন পরিশ্রমে, তাহা যেন করিলেন, কিন্তু তাঁহার তিনটি নাবালক ভাই আছে, বিমাতাও জীবিতা আছেন। প্রথম চিন্তা, বিমাতা তাঁহার সহিত এক সংসারে থাকিবেন কিনা?—তাহার উপর নাবালক ভাই মানুষ করা। অর্থ আছে, কুপথগামী না হয়। লেখাপড়া শেখে, অংশমত যে সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহা ভোগ করিতে পারে, কৃতী হয়, বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মান-মর্যাদা রক্ষা করে, এই সকল চিন্তা দিবানিশি তাঁহার মনোমধ্যে উঠিতে থাকে। বাড়িতে দুইটি বিধবা ভগ্নীও আছে, এ দুইটি তাঁহার সহোদরা তাহাদের নিমিত্ত তাঁহার পিতা কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই; সেও এক চিন্তা বটে। কিন্তু তাঁহাদের ভার তিনি স্বয়ং লইলেই চলিয়া যাইবে, তাঁহার অংশ হইতে তাঁহাদের খরচপত্র নির্বাহ হইলে আর কোন আপত্তি থাকিবে না। ভগ্নী দুইটি "চতুর্থী" করিবে, সেই কথা উপলক্ষে তাঁহার বিমাতার সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন এবং তাঁহার মনে যে সকল চিন্তা তাহাও খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, "মা, আপনার উপর এখন দুনো ভার পড়িল। আমাকে মানুষ করিয়াছেন, আর বড় দেখিতে শুনিতে হইবে না; কিন্তু আপনার আর তিনটি সন্তানকে মানুষ করিবার ভার আপনারই উপর। কেন না আমাদের পিতা নেই। বিমাতা উত্তর করিলেন, 'কেন গোপীমোহন, তুমি বড় ভাই রহিয়াছ, তোমাকে তিনি মানুষ করিয়া গিয়াছেন, আমার ভয় কি? তুমিই দেখিবে শুনিবে।" কিন্তু একথা শুনিয়াও গোপীমোহন নিশ্চিন্ত হইলেন না, সরল ভাষায় সরলভাবে বলিতে ত্রুটি করিলেন না; বলিলেন, "মা, সংসারে চক্রী-লোকের অভাব নেই। অর্থ বড় বিবাদমূলক, ইহাতে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা"।—আরও বলিতে যান, কিন্তু সরল প্রকৃতি বিমাতা এক কথায় তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া গোপীমোহনকে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "গোপীমোহন, ভয় করিও না যিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি আমাকেও তাঁহার সেবার অধিকারিণী করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই উপদেশে সংসার চিনিয়াছি। যদিও না চিনিতাম, তাঁহার শেষ কথা আমার ইষ্টমন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, তুমি আপনার ধর্ম কর্ম লইয়া থাকিও, গোপীমোহনকে তোমার গর্ভের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনে করিও, সাংসারিক কোন কার্যে ব্যস্ত থাকিও না, তাহারই উপরে ভার দিও। সে যদি তোমার ছেলেদের বঞ্চিত করে, করুক—তুমি কিছু দেখিও না। এই মনে বুঝিও যে, আমি তোমাকে বঞ্চিত করিলাম। যদি এইরূপ বুঝিয়া চল,—আমি স্বামী—আমার কথায় তোমার ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল হইবে। অশৌচ অবস্থায় দেবকার্যের অধিকার নাই। আমি আমার স্বামীর অভিমত কার্য করিব। আশীর্বাদ করি, যেন তুমিও তোমার কার্য নির্বিঘ্নে সমাধা করিতে পার।" গোপীমোহনের দ্বিগুণ চিন্তা বাড়িল। বিমাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সপত্নী-সন্তান যথার্থই ভার গ্রহণ করিবে, কোন কথা কহিলেন না।

গোপীমোহন সংসারধর্ম করেন। ভাইগুলিও বশ, কথামত চলে, স্কুলে যায়। বাড়িতে যখন মাস্টার পড়াইতে আসে, গোপীমোহন সেইখানেই বসেন। স্কুলের মাস্টারদের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কখন কখন নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাটীতে আহারাদি করান, এবং ভাইগুলির কথা বারংবার বলেন। মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতা—কিশোরীমোহন, রাধামোহন—একরকম লেখাপড়া শিখিতে লাগিল; যত চেষ্টা সেরূপ নয়,—যাহাই হউক এক

রকম শিখিতে লাগিল। কিন্তু ছোট—প্যারীমোহন—কিছুই শিখিতে পারে না। মাস্টারেরা বলিতে লাগিল, "ওটা পাগল, ওটার কিছুই হবে না।" ইহাতে গোপীমোহন সর্বদাই চিন্তিত থাকেন, ধমক দেন, কাছে বসাইয়া শেখান; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সকল চেষ্টাই বিফল হইল; বুদ্ধিবিকাশের লক্ষণ আর কিছুই দেখা গেল না, বরং গাঢ় জড়তা বয়সের সহিত বাড়িতে লাগিল। ললিতাদেবী—গোপীমোহনের স্ত্রী; তিনিও বিশেষ যত্ন করিয়া, কত বুঝাইয়া, নিজে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া দশম-বর্ষীয় প্যারীমোহনকে প্রথম ভাগ শিখাইতে পারিলেন না। প্যারীমোহনের সম্বন্ধে একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "ওর ত কিছুই হইল না, বিধাতার বিড়ম্বনা, কি করিবে বল? আর পীড়নে কোন ফল নেই; কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিত নয়;—ছোট ঠাকরুণ দেবসেবা করেন; প্যারীমোহন যত পারে, তাঁহার সেই কার্যে সহকারী হউক;—ফুল তুলুক, বিল্বপত্র আনুক, চন্দন ঘষুক। গোপীমোহন সম্মত হইলেন। ললিতাদেবী শাশুড়ীর নিকট এ কথা প্রস্তাব করিলেন; শাশুড়ী বলিলেন, "মা, আর কেন আমাকে তোমাদের কাজে জড়াও?" কিন্তু ললিতা-দেবী নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রবৎ দেবরকে সঙ্গে রাখিয়া যে সকল সাংসারিক কার্য তিনি করেন, তাহারাই দু' একটা কার্য করিতে বলেন। প্যারীমোহনের পক্ষে ইহা একটা আশ্চর্য মন্ত্র হইল। যে প্যারীমোহন পাঁচ বৎসরে বর্ণের ছবি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, দুই তিন দিনে ললিতাদেবী যে সকল সাংসারিক কার্য করেন, তাহা বুঝিতে পারিল এবং ললিতাদেবীর চক্ষের উপর সেই বৃহৎ সংসারের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। ললিতা-দেবী তাঁহার স্বামীকে বলিয়া, সরকারের সহিত তাহাকে বাজারে পাঠাইতে লাগিলেন। দু-এক দিনেই বাজার সরকার বুঝিতে পারিল যে, অবাগীর ব্যাটা প্যারীমোহন বাজার করা বেশ বোঝে,—এ গাড়লকে ঠকাইয়া দু'পয়সা রোজগার করিবার জো নেই। সরকার যখন বাজার করে, তখন প্যারী-মোহন কোনও কথা বলে না। যেন অন্যমনে আছে, কিন্তু দস্তুরী ব্যাটার সমস্ত কথা, বড় ভাজকে আসিয়া খবর দেয়। ভাজের কাছেই আবদার। আর কারও কাছে বড় কথাবার্তা কহে না।—ভাজকে বলিল, যে আমি বাজার করিতে পারি। ললিতা-দেবীও দু-দশ টাকার বাজারে তাহাকে গাড়ি করিয়া একা পাঠাইতে লাগিলেন; দেখিলেন, সে যেরূপ সামগ্রী আনে, আর কেহই সেরূপ পারে না। ক্রমে বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত, অপর সাংসারিক যাবতীয় কার্য সমস্তই প্যারীমোহন করিতে লাগিল। শান্ত, নীরবে কার্য করে। ভাজের সহিতই তাহার কথা। একদিন চুপি চুপি-বলিল, "বউ দিদি, বড় দাদাকে বলিও, মেজদাদা ও সেজদাদাকে আরও ভাল কাপড় দিতে।" ললিতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আর কিছু উত্তর করিল না—বোকা হইয়া রহিল। কিন্তু ললিতাদেবী কথাটি বোকার কথার ন্যায় বুঝিলেন না; গোপীমোহনকে প্যারীমোহনের কথা বলিলেন।

গোপী—কেন? আমি তো আমাদের অবস্থা-নুযায়ী বস্ত্র দি। তবে খোসপোশাকী হয় এ আমার ইচ্ছা নয়।

ললিতা।—যদি উহাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে,—ছেলে মানুষ পাঁচ জনকে সাজ গোজ করতে দেখে—

গোপী।—কাকে দেখে? কার সহিত মিশিতে দি? নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আমি স্বয়ং রাখি, পাছে পাঁচটা বয়াটে বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে উহাদের দেখা হয়। স্কুলের ভাল ভাল ছেলে আনাইয়া, প্রতি রবিবারে উহাদের সহিত আমোদ করিবার নিমিত্ত ভোজ দি। তুমিও বোকার কথায় এত জেদ করিতেছ কেন?

ললিতা।—নিতান্ত বোকা কিরূপে বুঝিব? যেরূপ সংসারের কার্য করিতেছে, এরূপ যে কেহ পারে, তাহা আমার ধারণা নাই।

গোপীমোহন ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, "তোমাদের আদরেই তো গেল।" এ কথা আর বাড়িল না। অন্য আর একদিন গোপীমোহনকে ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার কাজ কেন ওকে একটু একটু শেখাও না?" গোপীমোহন ক্রোধের সহিত উচ্চহাস্য করিলেন, বলিলেন—"তোমার দেখছি, দেওরের উপর সমস্ত ভার দিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। ক'এ আঁকড়ি দিতে জানে না, তাকে আমি বিষয়-কর্ম শেখাব? এ তোমার কুটনো কোটা বাটনা বাটা

নয়।" ললিতাদেবীর উত্তর, গোপীমোহন আশ্চর্য হইয়া শুনিলেন যে, প্যারীমোহন এখন পত্র লিখিতে পারে। ললিতাদেবী বাপের বাড়িতে যে সব পত্র পাঠান, তাহা আর সরকারকে ডাকাইয়া লিখাইতে হয় না। ললিতাদেবী যদিচ পড়িতে জানিতেন, কিন্তু সাদায় কালি দিতে হইবে বলিয়া লিখিতে শেখেন নাই। গোপীমোহন আরও শুনিলেন যে, প্যারীমোহন রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া ললিতাদেবীকে শুনায়। হিসাব পত্র মুখে মুখে করিতে পারে। ললিতাদেবীর নিকট টাকা লইয়া দু' পাঁচখানা ইংরাজী বই কিনিয়াছে। কাহার নিকট শিক্ষা পাইয়াছে, জানেন না, কিন্তু পড়িতে পারে নিশ্চয়। শেষ যে বইখানি কিনিয়াছে, তাহাতে চিঠি লেখা শেখা যায়। মাঝে মাঝে যেন দু' একখানা চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলে। এসকল কথায় গোপীমোহনের আনন্দের সীমা রহিল না। আদর করিয়া প্যারীমোহনকে ডাকাইলেন; কিন্তু প্যারীমোহন দাদার নিকট আসিয়া একেবারে জড়ভরত হইয়া গেল। গোপীমোহন বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া, কথার উত্তর না পাইয়া ললিতাদেবীকে বলিলেন, "বাঃ বেশ কালিদাস।" সে দিন গেল। ললিতাদেবী ছাড়েন না। গোপীমোহন একখানি খাতা দিয়া বলিলেন, "তোমার 'হিসাবী মুহুরীকে' দিয়া এগুলি ঠিক দেওয়াও দিকি।" সেই খাতাখানিতে ভুল ছিল, রেওয়া মিলে না, সে নিমিত্ত অবকাশমতো স্বয়ং হিসাব দেখিবেন বলিয়া, তাঁহার শয়নকক্ষে খাতাখানি আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরদিনই ললিতাদেবী বলিলেন, "তোমার খাতায় ভুল আমার কালিদাস ধরিয়াছে। ২১।।৵০ খরচ পড়িয়াছে। তাহার জমা নাই।" এই ভুল ধরিতে যথেষ্ট জমা খরচ বোধ থাকা আবশ্যক। প্যারীমোহন তাহা ধরিয়াছে শুনিয়া, গোপীমোহন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। ললিতাদেবী বলিলেন, "ভাল, তোমার এরূপ কাজ যত আছে, তাহা আমাকে দাও, কেমন না প্যারী পারে দেখ।" পরীক্ষায় স্থির হইল যে, যে সকল খাতাপত্র গোপীমোহন ললিতাদেবীর নিকট হিসাব নিকাশ করিতে দিয়াছিলেন, সত্যই যদি প্যারীমোহন তাহা রেওয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে মহুরীয়ানায় প্যারীমোহন অদ্বিতীয়। কেননা, একটি জমা খরচ, গোপীমোহন কয়েক দিন চেষ্টা করিয়া নিজেই বুঝিতে পারেন নাই। কাজকর্ম তো দেবেন, সংকল্প করিলেন। কিন্তু প্যারীমোহন তো তাঁকে যম দেখে। তাহার উপায়? সে উপায় ললিতাদেবী করিলেন। "যা তোমার আবশ্যক, পত্রে প্যারীমোহনকে হুকুম দিও।" গোপীমোহন হুকুম লিখিলেন, "প্যারী, তোমার দেওয়ানজীর নিকট গিয়া, জমিদারীর কাজকর্ম শিখিতে হইবে। কাল হইতেই কাজে যাইও।" দিন কতক বাদেই ললিতাদেবী আবার গোপীমোহনকে বলিলেন, "দেখ, প্যারী বলে যে, সে জমিদারীর কাজ কর্ম করিতে পারে। সে কি বলে, আমি বুঝিতে পারি না।" এবার ললিতাদেবীও স্বয়ং বিস্মিত। কেননা, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার স্বামী যে কার্য করেন, তাহা বালক সমস্ত সাংসারিক কার্য করিয়া, কিরূপে অল্প দিনের মধ্যে শিখিল। কিন্তু গোপীমোহন অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি দেখেন যে, দেওয়ানজী স্বয়ং প্যারীমোহনের নিকট অবনতশির, তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ভয় করে। দেওয়ানজী দু' একটা প্যারীমোহনের নামে নালিশ করিয়াছিল যে ছোটবাবু ছেলে মানুষ, এসব বোঝেন না, এমনি সব আলগা কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার উত্তর কি দিব? সেইসব নালিশ শুনিয়া গোপীমোহন বুঝিতেন যে, প্যারীমোহন ছাঁকা-জালে দেওয়ানজীকে ধরিয়াছে, যেরূপ তিনি স্বয়ং পারেন না। দিন কতক এইরূপে চলে। একদিন ললিতাদেবী গোপীমোহনকে বলিলেন, "প্যারীমোহন তালুক দেখিতে যাইতে চায়। তাহার মনের সন্দেহ—সকলই বেবন্দোবস্ত হইয়া আছে।" গোপীমোহনের আনন্দ হইল; প্যারী কার্যক্ষম বুঝিয়াছেন, কেননা, কলিকাতার জায়গা জমি বাড়ি ঘর দোরের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। কিন্তু ছেলে মানুষ একা যাবে। কাহার সহিত না বুঝিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ করিবে। দুই একখানা তালুকও সেরূপ সুশাসিত নয়। শেষ প্যারীমোহনকে যে তালুকে কোন ভয়ের কারণ নেই, সে তালুকে পাঠাইলেন। * [ক্রমশঃ]

* উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, পৃঃ ৩০২-৩০৬

প্রবন্ধ

'আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন'

স্বামী অলোকানন্দ

বৈচিত্র্যে ভরা এই জগৎ। বৈচিত্র্যেই তার সৃষ্টি, বৈচিত্র্যেই স্থিতি। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল, ফল, বীজ। আবার বীজ থেকে গাছ। ক্রমান্বয়ে এই বৈচিত্র্য চলছে। নদী বয়, পাখি গান গায়, গাছ ফুলে ফলে ভরে ওঠে, তৃণরাজি শ্যামলিমা প্রকাশ করে, সূর্য তাপ দান করে, চন্দ্র স্নিগ্ধ সুষমা বিতরণ করে। সুখ-দুঃখ, গ্রীষ্ম-বর্ষা, হর্ষ-শোক, ভাল-মন্দ—এইসব বৈচিত্র্য নিয়েই এই জগৎ। সাম্য সেখানে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবনের অর্থই হচ্ছে বিনষ্ট সাম্যভাব।"[১]

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন সৃষ্টির তথা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন তাদের মধ্যে সমতা বিনষ্ট হয় তখনই সূচনা হয় বৈচিত্র্যের। যাকে আমরা জগৎ-প্রপঞ্চ বলছি তা হল ঐ ত্রিগুণের অসাম্যে পরিণতি মাত্র।

প্রশ্ন জাগে, সমতায় অবস্থিত ত্রিগুণের অসাম্যে পরিণতি ঘটায় কে? সমস্ত 'শাস্ত্র-নিষ্কর্ষ' একটি শব্দমাত্র এখানে প্রযোজ্য—অজ্ঞান। এই অজ্ঞানবশেই শুদ্ধ-স্বত্ব-এক-স্বভাব ব্রহ্মের বহুভাবে বিবর্তন। প্রিজমের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মি যেমন বহুবর্ণে বিভক্ত হয়ে দর্শককে আমোদিত করে, সেইরূপ একই ব্রহ্ম মায়া বা অজ্ঞানরূপ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে নানা বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। এই বৈচিত্র্যই জগৎ-প্রপঞ্চের বৈশিষ্ট্য।

একস্বভাবসম্পন্ন ব্রহ্ম বহু হলেন কেন? শুভ্রশির উপনিষদ্ বলছেন, "একোঽহং বহুস্যাম, প্রজায়েয়েতি।"[২] এক আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। তিনি বহু হলেনও। আপ্তকাম যিনি তাঁর মধ্যে বহু হওয়ার ইচ্ছা কেন জাগে? এ প্রশ্নের সমাধান কূট দার্শনিক বিচারে বহুভাবে উপস্থাপিত ও খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু সমাধান কতটা হয়েছে জানি না। স্বামীজী তাঁর 'গাই গীত শোনাতে তোমায়' কবিতায় আমাদের সামনে যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। বলছেন: "আমি আদি কবি, / মম শক্তি বিকাশ রচনা / জড় জীব আদি যত / আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে / একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।" এই যে 'আপন রূপ' দেখার ইচ্ছা একে কি আমরা 'লীলা' বলে আখ্যায়িত করতে পারি?

তিনি তো তাঁর লীলাপোষ্টাইয়ের জন্য বহু হলেন, বৈচিত্র্য ঘটালেন; কিন্তু এই বিভিন্নতার চক্রে সাধারণ জীবের তো প্রাণ যায়। অবশ্য সেই প্রাণ যাওয়ার বোধ জীবের হয় না। জীবও চায় ঐ বৈচিত্র্যের রসাস্বাদন করতে। কারণও তার একই—অজ্ঞান। মূলে যে রোগের, যে বিষক্রিয়ার সূচনা হয়েছে তাই সবকিছুকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে কাঁটা ঘাস খেয়ে রক্ত দরদরিত হলেও আবার খেতে চায়। আগুনে পুড়লেও 'রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম'-এর মতো ছুটে যায় বৈচিত্র্যের রসাস্বাদনের জন্য।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব বৈচিত্র্যের পশ্চাতে একের সন্ধান করে না। রঙ, রূপের বৈচিত্র্য এতই মুগ্ধ করে রাখে যে তার স্রষ্টাকে দেখার ইচ্ছা হয় না। অজ্ঞান এমনই প্রবল। অজ্ঞান থেকেই জন্ম নেয় আশা-আকাঙ্ক্ষার। আশা-আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় জীব স্রষ্টাকে না খুঁজে, সৃষ্টির মধ্যেই সুখের পিছনে মরীচিকার মতো ছোটে। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'আশা' কবিতায় বলছেন: "নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজীকরে। / নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে॥" আর সেই নৃত্যের তালে তালে জীব তার আপন সত্তাকে ভুলে গিয়ে তার এই সৌন্দর্য, এই বৈচিত্র্যকেই

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড (১৩৭১), পৃঃ ২১২

২ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২য় বল্লী, ৬ষ্ঠ অনুবাক্

দেখে নিত্য সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক অনুভব করে। ক্ষণিকের জন্যও এ প্রশ্ন জাগে না যে সৃষ্টি যাঁর এত সুন্দর, সেই স্রষ্টা না জানি কেমন। রূপের পেছনে যে অরূপ, সীমার মাঝে যে অসীম বিরাজিত তার সন্ধান কেউ করে না।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি এ-সম্পর্কে একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন। মহারাজ জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য উপস্থিত। জনক একের পর এক প্রশ্ন করছেন, যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিচ্ছেন।

জনক—যাজ্ঞবল্ক্য কোন্ জ্যোতি পুরুষের ক্রিয়াদির সহায়ক হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য—হে সম্রাট, আদিত্যজ্যোতি।

জনক—সূর্য অস্তমিত হলে কোন্ জ্যোতি সহায়ক হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য—চন্দ্র।

জনক—সূর্য, চন্দ্র উভয়ই অস্তমিত হলে কোন্ জ্যোতি সহায়ক হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য—অগ্নি।

জনক—যখন সূর্য চন্দ্র অস্তমিত, অগ্নিও নির্বাপিত ; তখন কোন্ জ্যোতি সহায়ক হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য—শব্দ।

জনক—যখন শব্দও থাকে না তখন কোন্ জ্যোতি মানুষের সহায়ক হয় ?

যাজ্ঞবল্ক্য—আত্মাই তার জ্যোতি হয়ে থাকে। আত্মজ্যোতিসহায়েই সে বসে, চলে, কর্ম করে, ফিরে আসে।"

জনক—কে এই আত্মা ?

এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মতত্ত্ব-জ্ঞাপন করে বললেন, "যিনি বুদ্ধিতে উপহিত, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত এবং বুদ্ধি অভ্যন্তরস্থ স্বয়ং জ্যোতিঃপুরুষ।' যিনি রথ, অশ্ব, পথ, আনন্দ, মুদ, প্রমুদ, পল্বল, তড়াগ, নদী প্রভৃতি সৃজন করেন। আবার "সেই জ্যোতির্ময়, একাকী সঞ্চারী ও অমর পুরুষাত্মা নিকৃষ্ট নীড়টিকে প্রাণের দ্বারা রক্ষা করে স্বয়ং ঐ নীড়ের বাইরে বিচরণ করেন ; সেই অমর পুরুষ বিবিধ বিষয়ে উদ্ভূত বাসনার অনুগমন করেন।"

এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মতত্ত্বজ্ঞাপন করে একটি অতি মহৎ সত্য বললেন, "আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন।"[৩] অর্থাৎ লোকে তাঁর ক্রীড়াই দেখে, তাঁকে কেউ দেখে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সহজ বাংলায় বললেন, 'ঐশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর ঐশ্বর্য তাঁকে খোজে না।'[৪] বললেন : "সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ছবি, এইসব দেখেই অবাক। কিন্তু এই বাগানের মালিক যে বাবু, তাঁকে খোঁজে কজন ?"[৫]

এই সমস্ত রূপের রূপকার যিনি তাঁকে দেখে না কেন ? 'আগে যো সো করে বাবুকে' দেখে না কেন ? অজ্ঞান প্রভাবে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব অনায়াস-লভ্য বহির্জগতের রসাস্বাদন করে। বিধাতাপুরুষ তাঁর 'লীলা পোষ্টাইয়ে'র জন্য জীবকে সৃজন করেছেন বহির্মুখ করে, তাই জীব 'পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।' তাঁর ঐশ্বর্যে সবাই বিভোর। সেই ঐশ্বর্যের বশবর্তী কোন এক সাধক যখন অস্তায়মান সূর্যালোকে বিচিত্রিত সন্ধ্যার শোভা বর্ণনা করছেন তখন অন্তর্লোকের রূপদর্শী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলছেন : "এই সময় ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত, তাঁর সৃষ্টির নয়।"[৬]

যাঁরাই এই বাইরের রূপচ্ছটাকে খোলসমাত্র বোধ করে ত্যাগ করতে পারেন, রঙের বৈচিত্র্যকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে আসা আলোর বিচ্ছুরণ বোধে প্রিজম সরিয়ে আসল আলোকে দেখেন, তাঁরাই ধন্য, কৃতার্থ। তাঁরাই ধন্য যাঁরা অমৃতত্বলাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়সকলকে অন্তর্মুখ করেন।

৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৩।১৪
৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।১।২
৫ ঐ, ১।১২।৩
৬ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৭৮

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন

নীহার মজুমদার

ব্রাহ্মসমাজের অবিসংবাদী নেতা কেশবচন্দ্র সেনের জন্মের (জন্ম ১৯ নভেম্বর, ১৮৩৮) সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই রচনা। দুবছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। দেহরক্ষার পর রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য বহুধা বিস্তৃত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-দর্শন চিরন্তন চলমান নরনারায়ণেরই জীবনগাথা। রামকৃষ্ণজীবন এক মহাসংগম। রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় সেই মহাসঙ্গমে কত জ্ঞানীগুণী, সাধক, মনীষী, অভিনেতা, রাজকর্মচারী, জননেতা এবং নানান সম্প্রদায়ের লোক আনাগোনা করেছেন তার হিসেব নেই। পরমপুরুষও ইসলাম, খ্রীষ্টান, জৈন ইত্যাদি ধর্মের, বিভিন্ন যোগ ও তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন এবং সর্বোপরি সকল ধর্মীয় ভাবের সঙ্গে সময়ান্তরে মিশে আত্মদর্শনকে উপলব্ধি করেছিলেন। এরকমই এক ধর্মীয় আবর্তের কক্ষান্তরে তাঁর সঙ্গে সম্যক্ পরিচিতি ঘটে ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। প্রথম দৃশ্যের দূরত্ব বজায় রাখায় দৃঢ়-সংকল্পিত ব্রাহ্মসমাজকে শেষদৃশ্যে রামকৃষ্ণবাদে আপ্লুত হতে দেখি। সনাতন হিন্দু-ধর্মের সঙ্গে এই মতবাদের মৌল পার্থক্য হল—হিন্দুরা সাধারণতঃ সাকার এবং বহু দেবতাবাদী এবং নানান অবতারের পূজারী, আর ব্রাহ্মধর্ম নিরাকার, সগুণ এক ব্রহ্মে বিশ্বাসী। এমনই এক পরিস্থিতিতে হিন্দুধর্মের কথকঠাকুর এবং বিশ্বধর্মে প্রাজ্ঞ 'নিরক্ষর', পৌত্তলিক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। চরিত্রগত দিক দিয়ে তাঁর অগোছালো ভাব, বিবাহ করা সত্ত্বেও সাংসারিক জীবনে উদাসীন, স্কুল-কলেজীয় শিক্ষার অভাব, গ্রাম্যভাষা এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের শিক্ষাদীক্ষা, কেতাদুরস্ত সামাজিক আচার-আচরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ব্যবধান ছিল বিরাট।

এতদ্‌সত্ত্বেও ব্রহ্মবাদীদের রামকৃষ্ণবাদের প্রতি সবিশেষ অনুরাগ এবং তাঁর সঙ্গে সমাজ-নেতাদের সশ্রদ্ধ সংযোগ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিন্দুধর্মের কাছে ব্রাহ্মধর্ম আত্মসমর্পণ করেছিল, না দুটি ধর্ম নিকটতর হয়েছিল কিংবা নিছকই কয়েকটি বিষয়ে সহমত হয়েছিল—ইত্যাদির গবেষণায় প্রচুর অবকাশ আজও রয়েছে। কোনটি ঠিক? এ-বিচার স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সামগ্রিক মূল্যায়নের নিরিখে বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বে, তাঁর ধর্মদর্শনের ঔদার্যে ও বাস্তবতার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মবাদীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বীকার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত ঈশ্বর-চেতনাকে। রামকৃষ্ণ-কথিত হিন্দুধর্মে অবতার-পূজনকে যে-সকল ব্রহ্মবাদী একসময়ে হীন মনে করতেন, অধর্ম ভাবতেন অথবা ঈশ্বরসাধনায় অপপন্থা মনে করতেন তাঁদেরই পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে আগ্রহী এবং তৎ-উবাচ সহজ গ্রাম্যভাষায় ঈশ্বর বিশ্লেষণে সবিশেষ অনুপ্রাণিত হতে দেখা গেল। তবে এই ভাব-রূপান্তরই শেষ কথা নয়। সমাজ-নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা বা অনুরাগ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারে এঁদের সমর্থন এবং সঙ্গদানও অবশ্যই উল্লেখনীয়। এই সকল ব্যক্তিত্বের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁদের নাম আসে, তাঁরা হলেন কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মনীষী-বৃন্দ। এঁরা যে শুধু ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন তা নয়, পাণ্ডিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা, এবং সমাজ-নেতৃত্বের জন্য এঁদের নাম সর্বভারতীয়। কারও কারও আন্তর্জাতিক পরিচিতিও ছিল। ঈশ্বরমুখী যাত্রায় এই সকল শ্রদ্ধাশীল ব্রহ্মবাদিগণ এক বিরাট অনুগামীসহ রামকৃষ্ণের তৈরি প্রশস্ত হিন্দু-রাজপথে কখন যে চলে এসেছেন, তা তাঁরা যাত্রা শুরুতে ভাবতেও পারেননি।

ব্রাহ্মসমাজের শক্তিমান নেতা কেশব সেন। বিশ্বজোড়া পাণ্ডিত্য, উল্লেখযোগ্য ইংরেজী শিক্ষা, ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সম্বর্ধনা, ব্রাহ্মসমাজের এই প্রথিতযশা ব্যক্তিকে সারা ভারতের মধ্যে একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিল। তাঁকে বলা হতো 'প্রাচ্যের দ্বিতীয় যীশু'। ধর্মযাত্রার প্রারম্ভে

কেশব সেন বহু দেবদেবীর পূজাকে শুধু উপহাসই করেননি, পৌত্তলিকতা বলেও প্রচার চালিয়েছিলেন। ঈশ্বর বহুরূপে সমাজে সংসারে বিরাজমান এ ধারণা তাঁর কাছে হাস্যকর বলে মনে হতো। স্বভাবতই ব্রাহ্মসমাজও সেই মতানুসারী ছিল। সেই কেশব সেন কি করে রামকৃষ্ণ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সেটাই বিশেষ চমকপ্রদ। কট্টর ব্রহ্ম-তাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও কিসের অনুপ্রেরণায় তিনি রামকৃষ্ণ-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

ব্রাহ্মসমাজের শক্তিমান নেতা কেশব সেন। বিশ্বজোড়া পাণ্ডিত্য, উল্লেখযোগ্য ইংরেজী-শিক্ষা, ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সম্বর্ধনা ব্রাহ্মসমাজের এই প্রথিতযশা ব্যক্তিকে সারা ভারতের মধ্যে একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিল। তাঁকে বলা হতো 'প্রাচ্যের দ্বিতীয় যীশু'। ধর্মযাত্রার প্রারম্ভে কেশব সেন বহু দেবদেবীর পূজাকে শুধু উপহাসই করেননি, পৌত্তলিকতা বলেও প্রচার চালিয়েছিলেন। ঈশ্বর বহুরূপে সমাজে সংসারে বিরাজমান। এ ধারণা তাঁর কাছে হাস্যকর বলে মনে হতো। স্বভাবতই ব্রাহ্মসমাজও সেই মতানুসারী ছিল। সেই কেশব সেন কি করে রামকৃষ্ণ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সেটাই বিশেষ চমকপ্রদ। কট্টর ব্রাহ্ম-তাত্ত্বিক হওয়া সত্ত্বেও কিসের অনুপ্রেরণায় তিনি রামকৃষ্ণ-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?

কেশব সেন বাহ্যজগতের কাছে যা-ই প্রচার করে থাকুন না কেন, তাঁর মনের গহনতম কোণে রামকৃষ্ণ-ভাবনা ধীরে ধীরে স্থায়ী নিবাস তৈরি করছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি ক্রমেই জেনেছেন: ঈশ্বর একই। সেই পরমাত্মাকে ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্ম, যোগীরা বলেন আত্মা আর ভক্তেরা তাঁকে ভগবান বলে। মূলতঃ বস্তু একই। নামভেদ মাত্র। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে কেশব সেনের সাকারবাদী এবং পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে যে অন্ধ ধারণা ও গোঁড়ামী ছিল তাকে কালক্রমে মন থেকে তিনি ঝেড়ে মুছে ফেলতে বাধ্য হন। প্রাচীন ভারতীয় বৈদান্তিক চেতনায় দীক্ষিত পরমপুরুষ তো মানব-সেবাকেই ঈশ্বর-সাধনার নামান্তর বলেছেন। বলেছেন, ঈশ্বরবন্দনায় দিনাতিপাত না করে মানব-কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত থাকলেই ধর্ম। কেশব সেনকেও তিনি ঐভাবে ঈশ্বর-আরাধনার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বাস্তবকে মেনে নিয়ে মৌলিক বিশ্বাস অর্জনে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি কেশব সেনকে প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন: "দেখ তোমাদের উপাসনা শুনেছি। কিন্তু তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্বর তুমি আকাশ করিয়াছ; বড় বড় সমুদ্র করিয়াছ, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, সব করিয়াছ—এসব কথায় আমাদের অত কাজ কি?

"সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভিতর ছবি—এইসব দেখেই অবাক। কিন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দুই-একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়; যেমন, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্যি বলছি দর্শন হয়।"

ব্রাহ্ম নেতা পরম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেশব সেনের ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের দৌলতে তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে ক্রমেই ভাব-রূপান্তর হয়। এ যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। পরবর্তী কালে আমরা লক্ষ্য করব এই কেশব সেনই শ্রীরামকৃষ্ণকে শিক্ষিত-সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার বিশেষ ভূমিকা নেন। কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'New Dispensation' শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর আদর্শকে সমর্থন জানিয়ে সপ্রশংস তথ্যাদি প্রকাশ করতে শুরু করে। কেশব সেনের দেহান্তরের পর ধর্মতত্ত্বে লেখা হল: "রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের আচার্যদেবের (অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের) অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। ...বর্তমান সময়ে ইঁহার ন্যায় সাধু পুরুষ এদেশে নাই।" "পরম ধার্মিক মহাপণ্ডিত জগৎ-বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের

নিকটে শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে একপার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথাসকল শ্রবণ করিতেন। কোন দিন কোনরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিসসকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন।"

কেশব সেনের ধর্মবোধ ও ধর্ম-দর্শনে পরিপূর্ণতা আসে রামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের পরই। তাঁর সমাজে বক্তৃতা বা উপদেশেও এই ভাবরূপান্তর লক্ষণীয়। ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের আগে এবং সান্নিধ্যোত্তর সময়ে তাঁর মতবাদ ও ধর্মভাবনায় যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। ধর্মীয় উদারতার আহ্বান তিনি পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-উপদেশামৃতাবলী থেকে। কেশবচন্দ্রের প্রধান সহকর্মী প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকস্মুলারকে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন: "কেশব সেনের জীবনচরিত ও তাঁর শিক্ষাবিস্তারে আমি সন্ন্যাসীসম ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধার কথা সর্বান্তঃকরণে স্মরণ এবং তাঁর প্রতি আমাদের ঋণের কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করছি।"

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশ্বের ইতিহাস, দর্শন এবং ধর্ম যাঁর নখদর্পণে সেই নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ব্রাহ্মনেতা কেশব সেন কেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলেন? হলেন তাঁর অসাধারণ ধর্মীয় ঔদার্যে। ঠাকুর জানতেন গোঁড়ামী দিয়ে আর যাই হোক ধর্ম হয় না। মতবাদ পোষণ বা প্রচারে সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন উদারচিত্ততা। তিনি কি জানতেন না যে, কেশব সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাগণ তাঁর দর্শন সম্বন্ধে সূচনায় খুব একটা স্বস্তিদায়ক মত পোষণ করতেন না। ঠাকুর কিন্তু অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করেননি। বরং ওঁদের সকলকে কাছে টেনে নিয়েছেন, নিজস্ব ঈশ্বরীয় মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন নানান ভাবে। এভাবেই পরমপুরুষের প্রতি কেশব সেনের আত্মিক সমর্থন ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার কারণটি নিহিত।

কেশব সেনের ধর্মবোধ ও ধর্ম-দর্শনে পরিপূর্ণতা আসে রামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের পরই। তাঁর সমাজে বক্তৃতা বা উপদেশেও এই ভাব-রূপান্তর লক্ষণীয়। ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভের আগে এবং সান্নিধ্যোত্তর সময়ে তাঁর মতবাদ ও ধর্মভাবনায় যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। ধর্মীয় উদারতার আহ্বান তিনি পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-উপদেশামৃতাবলী থেকে। কেশবচন্দ্রের প্রধান সহকর্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৯৫খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকস্মুলারকে লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন: "কেশব সেনের জীবন চরিত ও তাঁর শিক্ষাবিস্তারে আমি সন্ন্যাসীসম ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধার কথা সর্বান্তঃকরণে স্মরণ এবং তাঁর প্রতি আমাদের ঋণের কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করছি।" স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "কেশব রামকৃষ্ণের পদতলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন এবং সেই মহাপুরুষের ধর্ম আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সময়ান্তরে রামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হলে তিনি ধীরে ওঁর পা ছুঁতেন যাতে তিনি পরিশুদ্ধ হতে পারেন। কখন কখন পরমহংসদেবকে তিনি বাড়িতে নিয়ে যেতেন অথবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নদীবক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিভ্রমণ করতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলে তাঁর মতামত নিয়ে সন্দেহ নিরসন করতেন। এতে দুজনের মধ্যে প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি হয়েছিল। এভাবেই কেশবের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। পরবর্তী কালে ধর্ম-বিধান সম্পর্কে যে মতবাদ প্রণয়ন করেছিলেন তা বহুবছর আগে সত্য সম্বন্ধে রামকৃষ্ণেরই মতবাদের অংশবিশেষ।"

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ঈশ্বরের মাতৃসত্তা এবং হিন্দু বহু-অবতারবাদের প্রতি কেশব সেনের পরবর্তী কালের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের মূলেও একমাত্র প্রেরণা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এনিয়ে আজ আর বিতর্কের কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

সর্বধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র

অমিয়কুমার মজুমদার

এতকাল পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতগুলি নিজ নিজ সীমানার মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে ; পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটেনি ; এক ধর্মমতের সঙ্গে অন্য ধর্মমতের সমঝোতার কোন সুযোগ আসেনি। গত ১০০ কি ১৫০ বছর ধরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী চিন্তানায়কেরা একে অন্যকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন মতের অন্তর্নিহিত বিরোধকে সরিয়ে রেখে অথবা বিরোধের সমাধান করে বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত ঐক্যের সূত্রটি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসাবে শিকাগোস্থিত দ্য পল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ফাদার রবার্ট ক্যাম্পবেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের ৭৫তম বার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেনঃ আজ উদার পন্থী খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকেই প্রাচ্যের দর্শন ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন ; তাঁরা চরম সত্তা হিসাবে নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন আবার মানুষের অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তার দিকেও তাঁদের ঝোঁক কিছু কম নয়। তাছাড়া তাঁদের লক্ষ্য ধর্মান্তরীকরণ নয়, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করা।[১]

এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি, পরস্পরকে বুঝবার আগ্রহ, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করা—এগুলি নিরন্তর আলাপ-আলোচনা। মোহমুক্ত মন নিয়ে অপরের ধর্মমতকে বুঝবার প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অতীতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে ঊনিশ শতকের মধ্যপাদে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই বিভিন্ন ধারায় সর্বধর্মসমন্বয়ের সিদ্ধান্তে এসেছেন।

কেশবচন্দ্রের পিতৃকুল ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব আর মাতৃকুল নিষ্ঠবান শাক্ত। ধর্মসাধনের এই দুটি ধারা কেশবচন্দ্রের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছাত্রাবস্থায়, তিনি দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হন এবং 'জীবনবেদ' গ্রন্থে তিনি স্বীকার করেছেন যে, ধর্মসাধনের পথে প্রার্থনাই তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। প্রথমে হিন্দু কলেজে ও পরে মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভের ফলে কেশবচন্দ্রের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি অনীহার উদয় হয়। হিন্দুধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠানকে তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। এই সময়ে কয়েকজন উদারচেতা খ্রীষ্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে এসে কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। মিশনারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজন বার্নস জেমস লং এবং ডাল কেবল কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন না, তাঁরা ভারতপ্রেমিক হিসাবেও খ্যাত ছিলেন।

খ্রীষ্টান মিশনারী-বন্ধুদের সঙ্গে কেশবচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাইবেল পাঠ করেন এবং বাইবেলের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান করতে থাকেন। এই সময়ে এড্‌ওয়ার্ড ইয়ং-এর কাব্যগ্রন্থাবলী কেশবচন্দ্রের প্রিয় পাঠ্য বিষয় ছিল এবং যে-সকল কবিতায় খ্রীষ্টধর্মের মহিমার কথা আছে সেগুলি তিনি নিয়ত আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্র নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছেন ; তিনি কোন নির্দিষ্ট সুসংহত ধর্মমত তখনও গ্রহণ করেননি। তথাপি ব্রাহ্মধর্ম যে বিশ্ব-প্রেমের ধর্ম এবং এই ধর্মের মাধ্যমে মানবজাতির বিভিন্ন অংশকে একত্র করা সম্ভব এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি আরও বলতেন যে, ব্রাহ্মধর্মের অনুশীলনের মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে এক শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মের সারতত্ত্ব আবিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী পড়তে শুরু করলেন এবং নিরন্তর প্রার্থনা ও যোগসাধনের মাধ্যমে এই সকল ধর্মের

১ দ্রষ্টব্য : Prabuddha Bharata, December 1968

অন্তর্নিহিত সত্যকে নিজের অনুভূতির আলোকে প্রোজ্জ্বল করে দেখতে লাগলেন। কেশবচন্দ্রের মতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ লক্ষণ এই যে সংস্কার থেকে তৃষ্ণার উদ্ভব, তৃষ্ণা থেকে দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু। বুদ্ধের উপদেশ সেই তৃষ্ণাকে জয় করে মৈত্রীকে অবলম্বন করা। এই মৈত্রীর অর্থ জীবে দয়া, ধর্মে সহিষ্ণুতা, সকল কাজে উদার সহানুভূতি। ইসলাম ধর্মের গণতন্ত্রপ্রীতি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ কেশবচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন ধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয়ে 'নববিধান'-এর আদর্শ স্থাপন করলেন। যুগে যুগে যত ধর্মবিধান প্রকাশিত হয়েছে সকলের ভিতর অঙ্গাঙ্গী যোগ নববিধানে প্রকাশিত হলো। নববিধানের মূলকথা হল, যে-পথ মানুষকে সমন্বয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তার সাধনই নববিধান। বর্তমান যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে যে বহুর প্রকাশ দেখি তাদের সকলকে সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। যদি কোন কারণে সামঞ্জস্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে। সে-ক্ষেত্রে নতুন করে সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করতে হবে। সামঞ্জস্যের মধ্যেই সত্য শিব সুন্দরের প্রকাশ। এই সামঞ্জস্য অন্তরের বস্তু, বাইরের নয়। কেশবচন্দ্রের মতে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মের ভিতর এক সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্ব নিহিত আছে। মনের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ না করলে নববিধানের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র, মুসলমান শাস্ত্র সকলের জন্য স্থান করে নিতে হবে। শুধু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে নয়। ধর্ম-জিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তিতে সকল ধর্মের আলোচনা করতে হবে। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী 'জীবনবেদ' গ্রন্থে নববিধানের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কেশবচন্দ্রের জীবন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় তিনি ঈশ্বরে মগ্ন; দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি সংসারের সঙ্গে মিলিত; তৃতীয় অবস্থায় তিনি বিশ্বকল্যাণে রত। নববিধানের আদর্শ কি এ-বিষয়ে কেশবচন্দ্র নিজেই বলেছেন: "হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদায় ধর্মশাস্ত্র মিলিল। নববিধানের বেদের অন্ত নাই। কেননা সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন। সমুদায় বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। যোগাদি ধর্মের সমুদায় অঙ্গকে ইনি আপন বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল প্রকার সাধনের প্রতি ইনি অনুরাগী। জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্মরাজ্য, সমুদায় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম—ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবেন।"[২]

নববিধানের আদর্শে পৌঁছানোর আগে কেশবচন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক ও মহাপুরুষদের সাধন-ভজননীতি নিজের জীবনে প্রয়োগ করলেন এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র চর্চার জন্য তাঁর অনুগামীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনের এবং সেই সকল ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত করলেন। খ্রীষ্টানধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনার ভার পড়ল প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপর; অঘোরনাথ গুপ্ত নিলেন বৌদ্ধধর্মের ভার এবং গিরিশচন্দ্র সেন নিলেন মুসলমান শাস্ত্র আলোচনার ভার। হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনার দায়িত্ব নিলেন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের উপর দায়িত্ব ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আলোচনার।[৩]

কেশবচন্দ্র সংকল্প করেই সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করেন। ধর্মের মাধ্যমে মনুষ্যজাতিকে এক সূত্রে গাঁথার সংকল্পে তিনি ছিলেন অটল। ব্রাহ্ম

২ আচার্য কেশবচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ রায়, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫
৩ কেশবচন্দ্র সেন, যোগেশচন্দ্র বাগল, (১৩৮১) পৃঃ ৭০

ধর্মের ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করবার জন্য সকল প্রকার কুসংস্কার বর্জন, গণতন্ত্রের উপর আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ধর্মকে গণমুখী ও প্রগতিশীল করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

॥ ২ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ দার্শনিক ছিলেন না। ধর্মতত্ত্ববিৎও ছিলেন না। তিনি বলতেন মা যখন আমাকে কৃপা করে চোখে আঙুল দিয়ে সত্যকে দেখিয়ে দিলেন তখন আমার ফিলসফির দরকার কি? তিনি ভক্তদের বলতেন। তোমার ফিলসফিতে কেবল হিসাব-কিতাব করে। কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না। পথে পথে কেঁদে কেঁদে ফিরতেন এই বলে, মা আমার বিচার বুদ্ধির মাথায় বজ্রাঘাত দাও। আরও বলতেন, বেশি শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়। শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার? সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয় ঈশ্বরলাভের জন্য।

সর্বধর্মসমন্বয় প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের আলোচনা ছিল বুদ্ধিবিচার বা মননশীলতার স্তরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রার্থনা ও যোগসাধনার সাহায্যে বিচারলব্ধ সত্যকে নিজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন ভাবে, সংকল্প করে, একটা সর্বধর্মসমন্বয়ের সিদ্ধান্তে আসেননি। তিনি মায়ের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন; তাঁর কথা ছিল মা যা করাবেন তাই হবে। তিনি বিভিন্ন ধর্মমতকে বিভিন্ন পথ বলেই গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, সকল পথের লক্ষ্য এক, অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ। এই প্রত্যয়টি অর্থাৎ সকল ধর্মই সমান সত্য—তিনি নিজের জীবনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার সাধনপ্রণালী, ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের সাধনপ্রণালী—সকল অবস্থার মধ্য দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ বিচরণ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, সকল ধর্মের লক্ষ্যই এক। অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে নির্বিকল্প সমাধির স্তরে উন্নীত করবার সংকল্প নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। চল্লিশ বছরব্যাপী নিরলস অদ্বৈত সাধনার ফলে তোতাপুরীর নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তোতাপুরীর নির্দেশ ছিল নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির পথ সুগম করবার জন্য শক্তির আরাধনা ত্যাগ করতে হবে। তিনি অদ্বৈত সাধনায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য সকল প্রস্তুতি নিয়েছেন কিন্তু বারবার শক্তিরূপিণী আনন্দময়ী মা সামনে এসে দেখা দিচ্ছেন। এই অবস্থাকে অনেক কষ্টে অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকল্প সমাধির গভীরে ডুব দিলেন। অনুভব হল আত্মাই ব্রহ্ম, শুদ্ধ সম্মাত্র। যে-উপলব্ধির জন্য তোতাপুরীর চল্লিশ বছরের সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তা তিন-দিনেই আয়ত্ত করলেন এবং এই নির্বিকল্প সমাধিতে তিনি তিনদিন তিন রাত্রি লীন হয়েছিলেন। এই অনুভূতির ফলে তিনি অদ্বয়ভূমিতে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর বোধ হলো যে বিশ্বচরাচরের সকল সত্তা, মানুষ, পশুপক্ষী, লতাগুল্ম, কীট-পতঙ্গ—এসবের সঙ্গে তিনি অভিন্ন। এই অবস্থায় গাছের ফুল ছিঁড়তে, তৃণদলের উপর দিয়ে বিচরণ করতে তাঁর কষ্ট হতো। কেননা এসবই তো চৈতন্য-স্বরূপ। এইদিক দিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতির মিল আছে। উভয়েই অহিংসা বা প্রেমকে উচ্চস্থান দিয়েছেন। বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন। একথা শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন না। তিনি বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার হিসাবে গণ্য করতেন এবং বলতেন যে 'বুদ্ধ' কথাটি 'বোধ' বা প্রজ্ঞা থেকে উদ্ভূত; অর্থাৎ তিনিই বুদ্ধ যাঁর চরম জ্ঞান হয়েছে। স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থেও এই মত প্রকাশ করেছেন যে, বৌদ্ধ পথ ও বৈদিক জ্ঞান-মার্গের পথ স্বরূপতঃ এক।

এক সর্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধিকে পাথেয় করে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐস্লামিক সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে এমন পরিবর্তন আনলেন যে হিন্দুর দেবদেবীর পূজার্চনা দূরে থাকুক, তাঁদের নাম পর্যন্ত তিনি উচ্চারণ করতে পারতেন না। ইসলাম ধর্মের সাধনায় গোবিন্দ রায় নামে একজন সুফি সাধককে শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বেশভূষা মুসলমান

সাধকের অনুরূপ করে নিয়েছিলেন ; দিনে পাঁচবার তিনি নামাজ পড়তেন। আল্লাকে ভক্তিভরে ডাকতেন। এমনকি মুসলমানী খাদ্যগ্রহণের প্রতিও তাঁর বিশেষ ঝোঁক এসেছিল। ইসলাম সাধনার স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনদিন অতিবাহিত করেছেন। স্বামী অখিলানন্দ তাঁর 'হিন্দু সাইকোলোজি' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই সাধনমার্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথম, সাকার ও সগুণ ঈশ্বরের উপলব্ধি ; দ্বিতীয়তঃ নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের উপলব্ধি ; তৃতীয়তঃ নিরাকার এবং নির্গুণ সত্তার উপলব্ধি ; দ্বিতীয় স্তরে মুসলমানদের আল্লার উপাসনা আর তৃতীয় স্তরে সুফিদের অধ্যাত্মসাধনা, যার মূল কথা হল "আনা-ল-হক্' আমিই সত্য বা আমিই ঈশ্বর। এই সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল আমার পৃথক কোন সত্তা নেই ; ঈশ্বরের সত্তায় আমার সত্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সাধনার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ব্যবহারিক ইসলামের সাহায্য ছাড়া বেদান্তের সত্য মানবজীবনে প্রয়োগ করা দুঃসাধ্য। ব্যবহারিক বেদান্তের গূঢ় অর্থ যদি কোন ধর্মে প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাহলে সেটা হল ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্ম সাধনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতীতি হল যে, উগ্রপন্থী মুসলমানদের অভিমত 'আল্লাই একমাত্র ভগবান এবং মহম্মদ তাঁর একমাত্র পয়গম্বর',—যথার্থ নয়।

খ্রীষ্টধর্মের সাধনের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাহায্য করেন শম্ভুচরণ মল্লিক। শম্ভুচরণ বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রে নিষ্ণাত ছিলেন এবং তিনিই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইবেল পড়ে শোনান এবং যীশুর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করেন। যীশুকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কাজেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়নি। তিনি শুধু যীশুর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ জানবার জন্য আগ্রহী ছিলেন। যীশুকে জানবার, বুঝবার আকাঙ্ক্ষা জগজ্জননী মার কৃপায় চরিতার্থ হল। একদিন যদুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরস্থিত বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় দেবশিশু কোলে ম্যাডোনার ছবি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্ময়ে অভিভূত হন। তিনি নির্নিমেষ নেত্রে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলেন ছবিটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং মেরী ও যীশুর মূর্তি থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করে তাঁর সমগ্র সত্তার রূপান্তর ঘটাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও অনুভব করলেন যেন তাঁর হিন্দুভাব ধীরে ধীরে তিরোহিত হচ্ছে। তাই কাতরকণ্ঠে তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা আমাকে নিয়ে তুমি এ কী করছ?" কিন্তু বৃথাই সে প্রশ্ন। এক বিরাট তরঙ্গ এসে যেন শ্রীরামকৃষ্ণের হিন্দুভাব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পরিবর্তে যীশুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভরে উঠল এবং তিনি দেখলেন গীর্জায় যীশুর মূর্তির সামনে ভক্তরা ধূপদীপ জেবলে আরাধনা করছে। এই অবস্থার মধ্যে তিনদিন অতিবাহিত করে চতুর্থ দিনে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর পাশ দিয়ে পদচারণা করছেন তখন তিনি এক অসামান্য রূপবান সৌম্যাকৃতি পুরুষকে দেখতে পান। সেই পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে তাঁর নিকটে এসে পৌঁছলেন। তাঁর দীর্ঘ আয়ত উজ্জ্বল দুটি চোখ, নাক যদিও একটু চ্যাপ্টা তবুও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের কিছু হানি হয়নি। পুরুষটি বিদেশী। তাঁকে দেখেই শ্রীরাম-কৃষ্ণের হৃদয় আলোড়িত হলো এবং তিনি উপলব্ধি করলেন "এই সেই যীশু যিনি মানবজাতির উদ্ধারের জন্য হৃদয়-শোণিত ঢেলে দিয়েছিলেন এবং মানুষের জন্য অপরিমেয় দুঃখ বরণ করেছিলেন।" যীশু শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁর সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন হলেন। তাঁর বাহ্যদশা লুপ্ত হলো। তিনি সগুণ ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যীশুর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার কথা স্বীকার করেছেন : "সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন।" রোমাঁ রোলাঁ স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে লিখেছেন, তিনি ছিলেন এই বঙ্গীয় যীশুর (রামকৃষ্ণের) প্রচারদূত সেন্ট পল।

যাঁরা ধর্মতত্ত্বের (থিয়লজি) ব্যাখ্যাতা তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের তিনদিনের জন্য মুসলমান হওয়া অথবা চারদিনের জন্য খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারটা যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার বলে মনে করেন না। আবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন স্পলডিং প্রফেসর হ্যোনার বলেছেন যে, সকল ধর্মই যে আমাদের একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় একথা সত্য নয়।[8] এই সমালোচকদের বক্তব্যের সমর্থনে অনেক দার্শনিক বলেন যে, খ্রীষ্টান ধর্মকে বেদান্তের প্রত্যয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, আবার বেদান্তকে ইসলামের প্রত্যয় দিয়ে বোঝান যায় না। কারণ, একজন হিন্দু 'আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন' বলতে যা বোঝেন একজন মুসলমান তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তেমনি একজন মুসলমান যখন বলেন, 'আল্লা দয়ালু' তখন একজন হিন্দু একথার তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারেন না। একথা কোন মতেই ভুললে চলবে না যে, প্রত্যেক ধর্মের পিছনে আছে একটা তত্ত্ব, কিছু পৌরাণিক কাহিনী, আচার অনুষ্ঠান, প্রতীক এবং সর্বশেষে উপলব্ধি। এর মধ্যে কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। হ্যোনার যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন তার জবাবে বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মতত্ত্ব (থিয়লজি) নিয়ে আলোচনা করেননি, করার প্রয়োজনও অনুভব করেননি। মরমী সাধক হিসাবে বিভিন্ন ধর্মের সার সত্যকে উপলব্ধি করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঈশ্বরলাভের পথ অনন্ত এবং প্রত্যেক ধর্মই সমান সত্য। 'ভাব মুখে' থেকে তিনি এই সত্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। অপরোক্ষানুভূতির স্তরে যে-সত্য উদ্ভাসিত হয় তা স্বতঃ প্রমাণ; তাকে বুদ্ধি বিচার দিয়ে আবার সমর্থন করার প্রয়োজন হয় না। যেখানে ত্রিপুটি বিলয় ঘটেছে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক হয়ে গিয়েছে, সেখানে কে কাকে জানবে, কে কাকে শুনবে? অলডাস্ হাক্সলি তাঁর 'পেরেনিয়াল ফিলসফি' বইতে এই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, বিভিন্ন যুগের মরমী সাধক, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—যাই হোন না কেন—পরমতত্ত্বের উপলব্ধির ব্যাপারে প্রায় একই ভাষায় তাঁদের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। এইদিক থেকেই অপরোক্ষানুভূতির যথার্থতা মেনে নিতে হয়।

সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রশ্নে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। 'সমন্বয়' কথাটি যদি সিনথেসিস্ (synthesis) অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহলে বলতেই হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় করেননি। বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা জৈন দর্শনের অনেকান্তবাদের সামিল। আসল কথা, সত্য হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিমান। সত্যের নানা দিক বা ভঙ্গি আছে। এক একটা ধর্ম এক একটা দিককে অবলম্বন করে অগ্রসর হচ্ছে। যাকে আমরা ধর্মে ধর্মে বিরোধ বলে মনে করি, তা হল আসলে অধ্যাত্ম অনুভূতির পথে বিভিন্ন সোপানমাত্র। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত মত পরস্পর বিরুদ্ধ নয়; তারা ধর্ম সাধনার ক্রমিক সোপান। স্বামী বিবেকানন্দ একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করেছেন। যদি কোন লোক বিভিন্ন কোণ থেকে সূর্যের ফটোগ্রাফ নিতে থাকে তাহলে প্রত্যেকটি ফটোই ভিন্ন প্রকারের হবে; কিন্তু প্রত্যেকটি ফটো বিভিন্ন হলেও তারা যে একই সূর্যের ফটো, একথা তো অস্বীকার করা যাবে না।

কেশবচন্দ্র এই প্রসঙ্গে দুটি কথার উপর জোর দিয়েছেন, 'সামঞ্জস্য' এবং 'সন্ধি'। তিনি বলেছেন বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে; তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে হবে। সামঞ্জস্য ও সন্ধির কথা বললেই বুঝতে হবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে-সকল ত্রুটি আছে সেগুলির পর্যবসান ঘটাতে হবে; আর যেখানে সামঞ্জস্য করা সম্ভব হবে না সেখানে সন্ধি স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ ত্রুটি বিচ্যুতি মেনে নিয়ে তাকে গৌণ জ্ঞান করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সন্ধি বা আপোষ করে নিতে হবে। যেমন ধরা যাক হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাকে কেশবচন্দ্র বর্জন করতে বলেছেন। হিন্দুরা পৌত্তলিকতা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রতিমাপূজা আসলে প্রতীকোপাসনা। তাছাড়া, সাধনের ক্ষেত্রে প্রতিমাপূজার স্থান তৃতীয়। বলা হয়েছে : উত্তমা সহজাবস্থা দ্বিতীয়া ধ্যান ধারণা। / তৃতীয়া প্রতিমাপূজা / হোমযাত্রা চতুর্থিকা ॥ /এখন প্রতিমাপূজা প্রকৃতপক্ষে

8 The Study of Religions, H. D, Lewis and R. L, Slater, of P. 145

প্রতীকোপাসনা—এই কথা স্বীকার করলেই, অথবা প্রতিমাপূজা নিম্নাধিকারীর জন্য অভিপ্রেত, এই কথা মেনে নিলেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভব অন্য প্রকারের। কেশবচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন: "তোমরা সাকার মানো না। তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি প্রেম আরও বাড়বে। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর।"

॥ ৩ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দেখবার জন্য, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর বাসস্থানে যেতেন। বেলঘরিয়ার বাগান বাড়িতে কেশবচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন, তোমারই ল্যাজ খসেছে। অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসারের বাহিরেও থাকতে পার আবার সংসারেও থাকতে পার। আবার কেশবচন্দ্রও দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করবার জন্য। কেশবচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মহাপুরুষেরা জগতে আসেন যুগপ্রয়োজন মেটাবার জন্য। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই সাক্ষাৎকারের আগে তিনি সমাধি অবস্থায় কেশবচন্দ্রকে দেখেছেন। ২৮ মার্চ ১৮৭৫ তারিখের 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখেন যে, পান্ডিত্যের গভীরতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে চরিত্রের সরলতার সংমিশ্রণ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখা যায় এমন আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর, ধ্যানগম্ভীর, কোমলহৃদয় পুরুষ—ঠিক স্বামী দয়ানন্দের বিপরীত। হিন্দুধর্মের গভীরে যে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ তা এই মহাপুরুষদের জীবন থেকেই প্রতিভাত হয়। কেশবচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তা এই কথায় পরিস্ফুট হয়েছে: "তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়। রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়। তবে কার সঙ্গে কথা কব। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়।"

'জীবনবেদ' গ্রন্থে কেশবচন্দ্র লিখেছেন যে, জীবনে তিনি যে যে মহাপুরুষের সংস্রবে এসেছেন তাঁদের সকলের কাছ থেকেই তিনি এমন সম্পদ পেয়েছেন যা তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ ও সার্থক করেছে। এই দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'দ্য লাইফ এ্যান্ড টিচিংস অব্ কেশবচন্দ্র সেন' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই কেশবচন্দ্র তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের ধারণাকে আরও বিস্তৃত, ব্যাপক ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবার সংকল্প গ্রহণ করেন। নববিধানের বীজ 'জীবনবেদে'র মধ্যে পাওয়া যায় সত্য এবং নববিধানের ধারায় 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। শ্লোকসংগ্রহে বাইবেল, জেন্দ-আবেস্তা, কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে সমন্বয়সূচক উক্তি সংকলিত করেছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু সরকারিভাবে নববিধান ঘোষণা করা হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তারিখে। ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ এই পাঁচ বছর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে অধ্যাত্মজীবনের নানা দিক নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তাঁর সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের জন্য; আবার শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন তাঁর অসামান্য আধ্যাত্মিকশক্তির জন্য। অবশ্য কেশবচন্দ্রের নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা এবং দল গঠনের প্রচেষ্টাকে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই অনুমোদন করেননি এবং একথা তিনি স্পষ্টভাবেই কেশবচন্দ্রকে জানিয়েছেন। তথাপি কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল সুগভীর। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে কথাপ্রসঙ্গে এক ভক্ত বলেন যে, কেশবচন্দ্রের নববিধান খুব কার্যকরী হয়নি, কারণ তাঁর অনুগামীরাই তাঁর স্বৈরাচারী স্বভাবের জন্য তাঁকে বর্জন করেছেন।

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মায়ের ইচ্ছাতেই হয়তো এরকম হয়েছে। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, কেশবচন্দ্রকে যত লোক শ্রদ্ধা করে শিবনাথ শাস্ত্রীকে তত লোক শ্রদ্ধা করে না কেন? অবশ্য, শেষদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ একথাও বলেছিলেন যে, সংসার ত্যাগ না করে কেশবচন্দ্র ধর্ম-শিক্ষা দিচ্ছেন বলে তাঁর শিক্ষা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

নববিধান ঘোষণার পেছনে সামাজিক কারণ যেমন আছে তেমনি ব্যক্তিগত কারণও আছে। বিতর্কিত কুচবিহার বিবাহের পরে কেশবচন্দ্র ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও ভগ্নহৃদয় নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, বিপক্ষদলের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে, নৈরাশ্যে বিপর্যস্ত কেশবচন্দ্র আচার্যের কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর অনুগামীরা প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করবেন। এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তাঁর অনুগামীরা বরাবরই সন্দেহ করেছেন কুচবিহার বিবাহে কেশবচন্দ্রের আগ্রহ প্রকাশের কারণ তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদার লোভের শিকার হয়েছিলেন। তাছাড়া রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিলিয়ে দিয়ে তিনি যে ভুল করেছিলেন তাও দেশবাসী ক্ষমার চোখে দেখেননি। কেশবচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল: গর্ভধারিণী জননীকে আমরা যে চোখে দেখি, জাতির জননী মহারানী ভিক্টোরিয়াকেও সেই চোখে দেখতে হবে। আর রাজদ্রোহ শুধু রাজনৈতিক অপরাধ নয়। নৈতিক পাপ, কারণ ঈশ্বরের নির্দেশেই জাতির সংকটের যুগে মঙ্গলময় ইংরেজ ভারতের শাসনভার নিয়েছেন।

মনের এই দোদুল্যমান অবস্থায়, জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে, নিজ মর্যাদা, সম্ভ্রম ও নেতৃত্ব ফিরে পাবার জন্য একমাত্র পথ হলো ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা। সেইজন্য নব-বিধানের পথ গ্রহণ করলেন কেশবচন্দ্র সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রায়ই বলতেন, 'আমি' রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করে, তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের রহস্যের সন্ধান পেয়ে কেশবচন্দ্রের জীবনে রূপান্তর ঘটে। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর অহংবোধ লুপ্ত করবার শক্তি পেয়েছিলেন এবং শেষ জীবনে মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণগান ও প্রার্থনার উপর জোর দিয়েছেন। 'জীবনবেদ' গ্রন্থে কেশবচন্দ্র লিখলেন: "গীর্জায় যাইব কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব, তাহা কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা তাহাই অবলম্বন করিলাম।" কেশবচন্দ্র ধনজন মান অভিমান সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্বমাতার বুকের মধ্যে ডুবে গেলেন। অন্তিম অবস্থায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দেখতে গেছেন তখন প্রসন্ন বলছেন, "তাঁর অবস্থা আর একরকম হয়ে গেছে। আপনারই মতো মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন শুনে হাসেন—কাঁদেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও দেখি মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ। বলেছেন, "মা আমি জ্ঞান চাই না; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, মা আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর আমি কিছুই চাই না।" কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন, "যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি। মা বড় মধুর নাম।" কেশব-চন্দ্র তন্ময় হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম কথা শুনতেন আর বলতেন 'জ্ঞান ও ভক্তির এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কখনও দেখিনি'। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশবচন্দ্র বলতেন, আপনি আর কতকাল নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন? আমি জোর করে বলতে পারি, আপনাকে দেখবার জন্য দলে দলে ভক্তগণ এখানে সমবেত হবেন। উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি প্রত্যেক মানুষের পায়ের ধুলার ধুলা, কেউ যদি এখানে আসতে চায় তাকে অভ্যর্থনা করব। কেশবচন্দ্রের স্পষ্ট উক্তি: আপনার আবির্ভাব বৃথা হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ব্যর্থ হয়নি। সমসাময়িক ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্তরালবাসী এক কর্মযোগী

পলাশ মিত্র

"আমি যে-সব কাজ করতে চেয়েছিলুম কিন্তু এখনো হাত দিতে পারিনি, তোকে সেগুলি করতে হবে—বিশেষতঃ কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।"[১] পুত্র রথীন্দ্রনাথকে (জন্ম ২৭ নভেম্বর ১৮৮৮। এবছর তাঁর জন্মের শতবর্ষপূর্তি হল।) এ-কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর পরে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ "বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়ে সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল।"[২] রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে রথীন্দ্রনাথ যে শুধু 'কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায়' সক্রিয় হলেন তাই নয়, পিতার ব্রতসাধনার বহুমুখী কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিবেদিত করে আমৃত্যু তিনি নিজেকে অন্তরালে রেখে গেলেন। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পিতা ও তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই পূর্ণতা লাভ করেছে।'

বালকবয়স থেকেই যে পরিবেশের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন তা তাঁর মানসগঠনে সহায়ক হয়েছিল। বাড়ির নিজস্ব ধ্রুপদী পরিমন্ডল তো ছিলই, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমাজের প্রথম সারির নানা বৃত্তির নানা মানুষ। তৎকালীন সমাজেই তখন তাঁরা প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তা ছাড়া স্কুলের প্রচলিত শিক্ষায় মানুষ হননি রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এরকম শিক্ষা পছন্দ করতেন না। এ-সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথের উক্তি ঃ "কলকাতার দু-একটা ইস্কুলে যে অল্পদিনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা এত পীড়াদায়ক যে তার স্মৃতি তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কখনো ভুলতে পারেননি। নিজের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠাতে তাই গোড়া থেকেই তাঁর আপত্তি ছিল।"[৩] বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই যে-স্কুল খুলেছিলেন সেখানেই হাতে-খড়ি হয়েছিল রথীন্দ্রনাথের। সঙ্গে অবশ্যই ভাইবোনেরা ছিলেন। আমাদের দেশে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তার কথা আমাদের অজানা নয়। শুধু কেতাবী বিদ্যে বা লেখাপড়া নয়, 'লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক কান চোখ ও অবয়ব মাত্রেরই খুব চর্চার প্রয়োজন আছে'—এ-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। ছেলেরা ডানপিটেমি করলে তিনি ভয় পেতেন না, কখনো শাসন করতেন না। এবং সেই কারণেই, রথীন্দ্রনাথের নিজের কথায় ঃ "অল্প বয়স থেকেই আমার স্বাধীনতা ছিল—যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় চড়া, মাছধরা, নৌকা বাওয়া, লাঠি-সড়কি খেলা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি সবরকম খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপ করার।...বাবা নিজেই আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন।"[৪]

শিলাইদহে থাকাকালীন রথীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। ইংরেজী পড়াতেন খাঁটি ইংরেজ লরেন্স। "শিলাইদহে থাকতে বাবা আমাদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে যেমন নজর দিয়েছিলেন, অন্য দিকে মা চেষ্টা করতেন আমাদের সবরকম ঘরকন্নার কাজ শেখাতে। ...এইরকম করে শহরের জটিলতা ও কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে ও পিতামাতার স্নেহের অন্তরালে আমরা কয় ভাইবোন বড় হতে লাগলুম।"

শিলাইদহে থাকার সময় থেকেই একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১ পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৮৭, পৃঃ ২৪৪

২ ঐ

৩ ঐ, পৃঃ ৩০১

৪ ঐ, পৃঃ ৩০-৩১

পরে যখন শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হল এই বিদ্যালয়, তখন তার অন্যতম প্রথম ছাত্র হলেন রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় চারটি পরিচিত ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য। "এই পাঁচজন ছাত্র নিয়েই বিদ্যালয় আরম্ভ হল শতাব্দীর প্রথম বছরে।"

এর আগে কঠোর জীবনের মুখোমুখি হবার জন্য হিমালয়-ভ্রমণে রথীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে এর চমৎকার বর্ণনা আছে। যৎসামান্য উদ্ধার করি: "বিদ্যালয়টি খোলবার ব্যবস্থার জন্য আমাদের সকলকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাবার উপক্রম করছেন এমন সময় একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বাবার দেখা হল। নিবেদিতা তখন ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাবছিলেন। তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ—আমাদের দেশের ছেলেরা যেন দলে দলে হিমালয় পাহাড়ে পদব্রজে বেড়াতে যায়, বিশেষতঃ তীর্থগুলি দেখে আসে। নিবেদিতা চুপ করে বসে থাকার পাত্রী ছিলেন না; যখন যা মনে আসত তখন তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করতেন। বেলুড় মঠের কয়েকজন স্বামীজীকে ধরলেন হিমালয়-ভ্রমণের দল জোগাড় করতে। বাবা যেই নিবেদিতার কাছ থেকে শুনলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম দলটিকে নিয়ে সদানন্দ স্বামী কেদার-বদরী রওনা হবেন, তখনি তাঁর ইচ্ছা হল আমাকেও তাঁদের সঙ্গে পাঠান। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আমাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, স্বামীজীর সঙ্গে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ করে এলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠোর জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব। গেরুয়া বসন, ঘাড়ে কম্বল, পায়ে ভারী মিলিটারি বুটজুতো—এই অদ্ভুত বেশে আমরা ট্রেনে চাপলুম।"[৫] এই দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। সহযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমূল্য মহারাজ। এই অমূল্য মহারাজ পরে হন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শঙ্করানন্দ।

বিদ্যায়তনিক প্রচলিত শিক্ষার ঘেরাটোপে রথীন্দ্রনাথকে বন্দী করতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। "বোলপুরে ··· [রথীন্দ্রের] পড়াশুনোর সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে। ডিগ্রির প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছি—রথীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেই-দিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।"[৬] এই 'দৃষ্টি রাখা'র মহত্তম কর্মে কোনও অবহেলা করেননি বলেই কেদারনাথের মতো হিমালয়ের একটি দুর্গমতম তীর্থে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে অদ্বিধায় পাঠিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তৃপ্ত যে, "সেখানে রথী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মতো গিয়া সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখন আর সে কোথাও ভ্রমণ করিতে ভয় করিবে না।"[৭]

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শান্তিনিকেতন আশ্রমে থেকেই রথীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে পড়াশুনো চালাতে লাগলেন। কেননা "কলকাতার কলেজে আমাকে পড়তে দিতে বাবার ইচ্ছা ছিল না। তাই রয়ে গেছি শান্তিনিকেতন আশ্রমেই। মোহিতচন্দ্র সেনের কাছে পড়ছি মিলটন ও সেক্স্‌পীয়র, জগদানন্দবাবুর কাছে বিজ্ঞান ও অঙ্ক, আর বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পড়াচ্ছেন পালি ও সংস্কৃত।" কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতা একই জায়গায় স্থির থাকে না। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার সুরু হয়। দেশের দুরবস্থায় বাঙালীর মন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। রথীন্দ্রনাথও নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। "বাবা তখন স্বদেশী গান তৈরি করছেন। এক-একটি গান বাঁধা হয় দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী বাবার কাছ থেকে সেগুলি শিখে নিয়ে, দেশময় ছড়িয়ে যাবার আগেই, শান্তিনিকেতনের চারদিকের গ্রামে সেগুলি প্রথম পরিবেশন করে আসেন। আমরা দুজনেও তাঁদের পেছু পেছু বেতুম।"[৮]

৫ পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ৫৪

৬ রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭৮

৭ ঐ, পৃঃ ১২৫

৮ [অন্যজন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার]। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র

ক্লান্তিহীন রথীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে জুজুৎসুও শিখে ফেলেছেন। ওকাকুরার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে আনালেন সানো সান নামে একজন জুজুৎসু-শিক্ষক। জুজুৎসু শেখার কারণ, "ইংরেজের সঙ্গে লড়াই যদি করতে হয় তবে জুজুৎসু কাজে লাগবে বলে আমাদের ধারণা ছিল।" এই সব ঘটনা ও মানসিকতা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, দেশপ্রেমের জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্পর্শে রথীন্দ্রনাথের রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার ভারতপ্রেম তাঁকে বিস্ময়মুগ্ধ করেছিল। আপন অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে রথীন্দ্রনাথ লিখছেন: "স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বিদেশী হয়েও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ভারতীয় আচার-বিচার, ভাবধারা, ধর্ম—সব বিষয়ের প্রতিই তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। ভারত যে অধীন হয়ে থাকবে তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।··· বেলুড়-মঠে বহু লোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তাদের স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করা, তাদের মনে স্বাধীনতা-কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া তাঁর নিত্যকর্ম ছিল।"[৯]

দেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব কী অপরিসীম ছিল, বিপ্লবী যুবকরা বিবেকানন্দকে, বিবেক-বাণীকে শিরোধার্য করে কিভাবে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন, তার ইতিহাস অজানা নয়।[১০] রথীন্দ্রনাথকেও যে বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ প্রেরণা জুগিয়েছেন, সে-তথ্য পাই তাঁর নিজের রচনায়। "স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ স্বদেশীয় কয়েকজন মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টায় আমরা উদ্বুদ্ধ হলুম খাঁটি দেশাত্মবোধে। যে-উত্তেজনার আগুন আমাদের বুকের মধ্যে দীর্ঘকাল চাপা ছিল, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেটা যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল এবং ক্রমশঃ দেশপ্রেমের সে আগুন ছড়িয়ে গেল বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।"

এর পরের ঘটনাবলী রথীন্দ্রনাথের জীবনে অন্য তাৎপর্য এনে দিল। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করলেন তিনি। স্বদেশে ফিরে তাঁর মনে হল, তিনি "যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী-অঞ্চলের একজন সুসম্পন্ন কৃষাণ।" চাষবাস নিয়ে গবেষণামূলক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চারুশিল্প ও কারুশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তরিক। উত্তরকালে এই সব বিষয়ে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "(রথীন্দ্রনাথ) চিত্রবিদ্যায় কৃতবিদ্য না হলেও প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। কাঠ এবং চামড়ার কাজে—বিশেষ করে কাঠের কাজে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাকে প্রতিভা বললে অত্যুক্তি হয় না। ইদানীং সিমেণ্টের সাহায্যে নানা-বিধ সুদৃশ্য দ্রব্য প্রস্তুতের পরীক্ষায় নাকি নিযুক্ত ছিলেন। শুনেছি বলেছিলেন, এবার ছুতোরের কাজ ছেড়ে আমি রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু করেছি।"[১১]

বিজ্ঞানের ছাত্র রথীন্দ্রনাথ, শিল্পী রথীন্দ্রনাথ, গ্রন্থকার রথীন্দ্রনাথ, উদ্যান রচনায় পারদর্শী রথীন্দ্র-নাথ—পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন। "পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নিজস্ব জীবন বলে তাঁর কিছু ছিল না। পিতার কর্মেই একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন" বলে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে-মন্তব্য করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নেই। পিতা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে ঘিরেই যেন রথীন্দ্রনাথের জীবনের পূর্ণতা। পুলিনবিহারী সেনের কথায়: "তার বাইরে কোন ক্ষেত্রে নিজের স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে তিনি কখনো ব্যগ্র হননি। নয়তো তাঁর পিতার কীর্তির কাছে নিষ্প্রভ হলেও, সে-স্বাক্ষর সম্পূর্ণ জলের লিখন না-ও হতে পারত।"[১২]

৯ পিতৃস্মৃতি, পৃঃ ১০২

১০ বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দকে কী গভীর শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন, সে সম্পর্কে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের 'স্বামী বিবেকানন্দ: মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে' (উদ্বোধন কার্যালয়) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

১১ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'পরিচয়' অংশে হীরেন্দ্রনাথ দত্তর আলোচনা দ্রষ্টব্য; পৃঃ ৩১৪

১২ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' রচনা দ্রষ্টব্য; পৃঃ ৩০৯

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায়ও তাঁর উদ্যোগ-আয়োজন বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁর রচিত প্রাণতত্ত্ব (১৩৪৮) ও 'অভিব্যক্তি' (১৩৫২) এই দুটি তাঁর ক্ষমতার দীপ্ত প্রমাণ। On the Edges of Time (১৯৫৮) আখ্যায় যে-আত্মজীবন-স্মৃতি তিনি রচনা করেছেন, "আত্মাকে অন্তরালে রেখে জীবনস্মৃতি রচনার তা একটি পরম দৃষ্টান্ত।" এই ইংরেজী গ্রন্থটি প্রকাশের পর বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে বাংলায় একটি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে এটি প্রকাশিত হয়।[১৩] অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত তিনি অনুবাদ করেন। ১৯৪৪-এ এর প্রথম খণ্ড ও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

ছাত্রজীবনের অবসানকাল থেকেই পিতার জীবন-ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ (প্রয়াণ ৩ জুন ১৯৬১)। লোকলোচনের আড়ালে থাকতেই যেন তাঁর আগ্রহ বেশি। ভিড়ের কোলাহল এড়িয়ে চলতেন তিনি। সারাজীবন ছিলেন নেপথ্য-চারী। নিজেকে যথার্থভাবে মেলে ধরবার কোনও ইচ্ছাকেই তিনি আমল দিতেন কিনা সন্দেহ। "ভাষা ব্যবহারে তাঁর যতটুকু অধিকার ছিল তার সম্পূর্ণ চর্চা করবার অবসর তিনি হাতে রাখেননি" —রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-কথা উল্লেখ করে পুলিন-বিহারী সেন বলেছেন,"শিল্পকারুর যে-চর্চা করেছেন তা নিরহংকারভাবে লোকলোচনের অন্তরালেই করেছেন। ফলে একথা অনেকেরই জানা নেই যে, বর্তমানে এদেশে যেসব শিল্পকারু প্রচলিত তার কোন কোনটির প্রবর্তক তিনিই; যে-শিল্পবোধ বংশানুক্রমে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তা শ্রীনিকেতনের বিবিধ কারুপণ্যের সুষমা ও বৈচিত্র্য-সাধনে, শান্তিনিকেতনের শ্রীবিধানে নিয়োজিত হয়েছিল, এর মধ্যে তাঁর দান কতখানি তা আর স্বতন্ত্রভাবে চিনে নেবার উপায় ছিল না। বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কোন স্বীকৃতিতে তাঁর তেমন আগ্রহও লক্ষ্য করা যায়নি।"[১৪]

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম প্রথম ছাত্র রথীন্দ্রনাথ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে বিশ্ব-ভারতীর পরিকল্পনা করছেন রবীন্দ্রনাথ—এখানে পিতার পাশে আছেন তিনি। ১৯১৮-র ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপনের পর সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সেই যে এলেন, তার পর ১৯৫৩ পর্যন্ত "এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার উৎসরূপে থেকে সেবা করে যান।" রথীন্দ্রনাথই বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। বিশ্ব-ভারতীকে সুন্দর করে গড়ার সাধনায় তিনি নিরন্তর মগ্ন ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরে পিতার স্মরণে রবীন্দ্র-ভবন সংগঠনের কাজে রথীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "ভবিষ্যতে যদি রবীন্দ্র-ভবন রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাথ্যিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হতে পারে তবে যেন আমরা স্মরণ রাখি যে, রথীন্দ্রনাথই এর মূলে।"[১৫]

"রথীন্দ্রনাথের মেজাজটা ছিল বিজ্ঞানীর, মনটা ছিল আর্টিস্ট বা ভাবুকের"—একথা যেমন সমসাময়িকদের লেখা থেকে জানা যায়, তেমনি এ তথ্যও জ্ঞাত হই, "নিজে গুণবান বলেই গুণের সমাদর করতে তিনি জানতেন। কর্মীদের কার কি গুণ আছে সব খবর তিনি রাখতেন। তাঁর কার্যকালে সত্যিকারের কোন গুণী ব্যক্তির অনাদর হয়েছে এমন কথা শোনেননি" বলে মন্তব্য করেছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রথীন্দ্রনাথ "বিপদে আপদে নানাভাবে মানুষকে

১৩ পিতার স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে রথীন্দ্রনাথ যে আত্মজীবনী রচনা করেন 'On the Edges of Time' নামে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বন্ধুজনের অনুরোধে রথীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে বাংলা যে-গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন, মৃত্যুর জন্য সেই-কাজ রথীন্দ্রনাথের পক্ষে শেষ করা সম্ভব হয়নি। 'পিতৃস্মৃতি'র প্রকাশক জানাচ্ছেন, 'অবশিষ্ট অংশ (পৃঃ ৭৭-৭৮ ; পৃঃ ১০২ শেষ অনুচ্ছেদ থেকে, পৃঃ ২০৫) অনুবাদ করে দিয়েছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়।'

১৪ পূর্বে উল্লিখিত রচনা, পৃঃ ৩০১

১৫ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে সংযোজিত 'রথীন্দ্র-স্মৃতি' রচনা ; পৃঃ ৩১২

সাহায্য করতেন, কিন্তু সমস্তই গোপনে। ডান হাতে যা দিতেন বাঁ হাতও তা টের পেত না।”[১৬]

আচার-অনুশীলনে বাক্যে-ব্যবহারে তাঁর সহজাত সৌন্দর্য ও সংযমবোধের বিরল বৈশিষ্ট্যের কথা মনস্বী ব্যক্তিরা অকপটে যেমন স্বীকার করেছেন তেমনি শান্তিনিকেতনে তিনি যে বহু বৎসর বিনা বেতনে সেবা করেছেন, এ-কথা পরম কৃতজ্ঞতায় ও সশ্রদ্ধায় স্বীকার করে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমন কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন, যার আলোকে নেপথ্যচারী ও নানা গুণে গুণান্বিত এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গভীর-ভাবে জানার সুযোগ ঘটে। হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ “একদা যেসব কর্মী এবং অধ্যাপক নামমাত্র বেতনে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের আদর্শবাদ ও স্বার্থত্যাগের কথা অনেকে অনেক সময় বলেছেন। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ যে বিনা বেতনে বহু বৎসর শান্তিনিকেতনের সেবা করেছেন সে-কথার উল্লেখ খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি। এছাড়া আরো কোন কোন কথা আমরা সব সময়ে মনে রাখি না কিংবা ভেবে দেখি না। রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। পিতার বিত্ত ও সম্পত্তির উপরে পুত্রের অধিকার আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক টাকা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্ক-এ ডিপজিট রেখেছিলেন তাঁর একমাত্র উত্তরাধি-কারীর নিশ্চয় তাতে সায় ছিল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর সমস্ত গ্রন্থাবলী—বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি—তিনি বিশ্বভারতীকে দান করলেন। তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূর সাগ্রহ সম্মতি না থাকলে কি কখনো তা সম্ভব হতো? এসব তো বড় ছোটখাট ত্যাগ নয়। কিন্তু এই ত্যাগের কথা দেশবাসীর মুখে কখনো উচ্চারিত হয়েছে বলে আমি শুনিনি।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গোরা’ উপন্যাস (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) রথীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, “শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু।” রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ। পিতাকে সুখী করার জন্য তাঁর আত্মনিয়োগ তথা অন্তরালের সর্বত্যাগীর ভূমিকা প্রত্যক্ষ করার সময় তখনও আসেনি। সময় যখন এল, অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথের যখন পঞ্চাশ বছর পূর্তি, তখন পুত্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন এমন এক কবিতা, যার চেয়ে বড় প্রাপ্তি রথীন্দ্রনাথের কাছে আর কিছু ছিল না। রথীন্দ্রনাথ যে ভোজের পাত্রে ভোগের আয়োজন রাখেননি এবং ধনের প্রশ্রয় হতে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তা আর বেশি কে বুঝবেন বা জানবেন। পুত্রের উদ্দেশে পিতা লিখলেন ঃ

তোমার সকল চিত্তে,
সব বিত্তে
ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে
তার লাগি যশ নাই পেলে।
কর্মের যেখানে উচ্চ দাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে একপাশে।

মানবের ইতিহাসে
যে সকল খ্যাত নাম বহিতেছে উজ্জ্বল অক্ষর
তাদের অজানা লিপিকার
আপনার অকীর্তিত জীবনের হোমাগ্নিশিখায়
লাগায় রঙের দীপ্তি সে নাম-লিখায়।
প্রগল্‌ভ জনতা যত দেয় পুরস্কার
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান নিভৃতে নীরব বিধাতার।[১৭]

পিতার আরব্ধ কর্মে নিবেদিত-প্রাণ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর গণদেবতার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, কিন্তু পিতার আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে আপন অন্তর আকাশ ভরিয়েছিলেন আনন্দের স্রোতে, রথীন্দ্রনাথের কাছে এই ছিল মহত্তম পুরস্কার।

১৬ পূর্বে উল্লিখিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত'র রচনা দ্রষ্টব্য ; পৃঃ ৩১১

১৭ ‘পিতৃস্মৃতি’র ‘পরিচয়’ অংশে পুলিনবিহারী সেন এই কবিতাটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছেন লোকসমাজে এ-কবিতাটির তেমন প্রচার নেই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।



আনন্দের সন্তান

স্বামী বিবেকানন্দ ও নামরহস্য

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

বিবেকানন্দের রসিকতার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে শুরু করা যাক নামগান দিয়ে—সেটাই রীতি বাংলাদেশে—'নামৈব কেবলম্'।

নামরহস্যে স্বামীজীর বিশেষ প্রীতি ছিল। মজাদার একটা নতুন নাম না-দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না। বাল্যকাল থেকেই ঐ অভ্যাস। বিবেকানন্দ নামক বিধাতা, পরিচিতদের ললাটে নতুন নামাক্ষর লিখে দেবার দায় গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রূপ-কৌতুক স্নেহ-শ্রদ্ধা—সর্বকিছুর স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর দেওয়া নামগুলির মধ্যে।

নামরহস্যের প্রথম শিকার তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। উল্টোদিক থেকে তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের নামরহস্যের শিকার হয়েছিলেন বলেই কি? এত সুন্দর নাম তাঁর—নরেন। তাকে কিনা শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন 'নরেন'। শ্রীরামকৃষ্ণের নরেনও শ্রীরামকৃষ্ণকে বহুনামে ও পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন—'পরমহংস', 'পরমহংস মশাই,' 'দক্ষিণেশ্বরের বামুন,' 'পাগলা বামুন,' 'মূর্তি পূজক ব্রাহ্মণ', 'বৃদ্ধ', 'বুড়ো' এবং 'ঠাকুর' আরও ছিল। ব্যাকুল আত্মনিবেদনের সুরে বলেছেন—'প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর—বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।'—

স্বামীজী একবার বলেছিলেন—সব যায়, পোড়া নামের মোহ যায় না। তাই কি তিনি নাম নিয়ে ছেলেখেলা করতেন। নামের আর রূপের সঙ্গে মানুষের আত্মা যেন জড়িয়ে না পড়ে—এই বোধ হয় ছিল তাঁর নিগূঢ় অভিপ্রায়। রাম নামক জনৈক যুবক (যিনি পরে 'রাম-মহারাজ' হয়েছিলেন) স্বামীজীর জীবনের শেষপর্যায়ে মাঝে মাঝে শনিবার বেলুড়ে গিয়ে রবিবার পর্যন্ত থাকতেন। একদিন গেছেন—স্বামীজী ছাগল দুইবেন—রামকে দেখেই বললেন—'ক্যাবলা, ছাগলটা ধরতো, দুইবো।' খানিক পরে তাঁর মনে হল, ছেলেটাকে ঠিক নামে না-ডেকে 'ক্যাবলা' বলে ডেকেছি বলে হয়তো বেচারা দুঃখ পেয়েছে। তখন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'নাম একটা নাম মাত্র—যেমন লোকে বলে বিবেকানন্দ।'

'নাম একটা নাম মাত্র'—তখন তাঁর বর্ষণে বদান্য হতে সন্ন্যাসীরও বাধা ছিল না।

বিবেকানন্দ-রচিত নামাবলীর এক খুঁটে বাঁধা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নাম—অন্য খুঁটে নিজের নাম—মধ্যে বহুতর জনের নাম-লাঞ্ছন।

গুরুভাইদের সন্ন্যাসী-নাম স্বামীজীরই দেওয়া। নামগুলি অদ্ভুত সার্থক। একটি নাম বোধ হয় স্বামীজী দিয়ে উঠতে পারেননি, আর গণ্ডগোল সেখানেই। অতি গুরুভার 'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নামটি স্বামীজীর দেওয়া নয় বলেই মনে হয়—কারণ গলাধঃকরণের এবং উদ্‌গিরণের পক্ষে এহেন কঠিন বস্তু তিনি স্বতই দিতে পারেন না। আমেরিকা থেকে ত্রিগুণাতীতানন্দকে এক অগ্নিময় পত্র লিখলেন: তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ্। একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়,—তা 'হরি' এই নামে নয়, ঐ যে গম্ভীর নাম—'অঘভগনর কবিনাশন ত্রিপুরমদমঞ্জন অশেষ নিঃশেষ কল্যাণকর'—প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দ পুরুষ পালায়।—[তোর] নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধহয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে—কিন্তু কি জাঁহাদারি যমতাড়ানো নামই করেছ!"

একই দমে এমন উদ্বুদ্ধ ও উচ্ছল বিবেকানন্দই হতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ছিলেন স্বামীজীর মানস সন্তান 'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক।

নরেন্দ্রনাথের আদরের চোটে 'কালী' (স্বামী অভেদানন্দ) হলেন 'কেলো'—আদরাধিক্যে 'কেলুয়া'—সেক্ষেত্রে তাঁর সাথী শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) 'ভুলুয়া' না হয়ে যান কোথায়? স্বামীজী বরাহনগর

মঠে তাঁর এই দুই অনুগত অনুচরকে 'কেলুয়া-ভুলুয়া' বলে ডাকতেন। শরৎ বিচ্ছিন্নভাবে 'শরতা শালা' সম্বোধনও শুনতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের 'লেটো' (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) সহজ সুরে গভীর জ্ঞানের কথা বলে হয়ে উঠলেন 'প্লেটো'—স্বামীজীর কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যরাও নব নামে বঞ্চিত হননি। সবকটি নাম নরেন্দ্রনাথের দেওয়া না হতে পারে কিন্তু নামগুলি প্রচারের স্বেচ্ছাদায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষকে স্বামীজী 'জি-সি.' বলে ডাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক ভক্ত যজ্ঞেশ্বর-চন্দ্র চন্দ্রের নাম হয়েছিল 'দমদম মাস্টার'। কারণ তিনি দমদমের এক স্কুলে মাস্টারি করতেন। 'দমদম মাস্টার' বলে, তাই বলে 'শাঁকচুন্নি মাস্টার'? শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথির রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন সগৌরবে তাঁর উক্ত নামকরণের ইতিহাস বিবৃত করেছেন :

"জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্য বিদিত হৈনু শাঁকচুন্নি নামে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক ভক্ত গোপাল ঘোষের নাম 'হুটকো গোপাল।' এই অপূর্ব নামটির হেতু—ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হুট্ করে আসতেন আবার হুট্ করে পালিয়ে যেতেন। 'হুটকো' নাম শ্রীরাম-কৃষ্ণেরই দেওয়া। এই 'হুটকো'-র প্রতিবেশী হওয়ার অপরাধে গড়পারের সতীশ দত্তের নাম হল 'মুটকো' বা 'মুট্কু'। নাম দিলেন অবশ্যই নরেন্দ্রনাথই।

(প্রতাপ) হাজরার পদবীর এক বিচিত্র অনুবাদ করেছিলেন তাঁরই 'ফ্রেন্ড' নরেন্দ্র—'থাউজেন্ডা'। হাজার=থাউজেন্ড+আ=থাউজেন্ডা। সরল প্রাণে সদাই হৈ-চৈ লাগিয়ে রাখতেন হরমোহন মিত্র। হরমোহনকে স্বামীজী 'পাগলা হরমোহন'-ই বলতেন, এবং তাঁর সশব্দ স্বভাবের জন্য বলতেন, 'হারমো-নিয়াম'। শিকাগোর হেল-ভবনকে স্বামীজী নিজের আস্তানা মনে করতেন—যে বাড়ির কর্তা, পরম খ্রীষ্টান জর্জ হেল স্বামীজীর সম্বোধনে—'ফাদার পোপ' এবং তাঁর পত্নী—'মাদার চার্চ'। জাপানী শিল্প শাস্ত্রী কাকাজু ওকাকুরা যদি জানতেন স্বামীজীর হাতে তাঁর নামের কী দুর্দশা হয়েছিল। স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ওকাকুরা ভারতে এসেছিলেন। তাঁর সেই অক্রুর—ভূমিকার জন্য—ধ্বনিসাদৃশ্যের জন্যও বটে—ওকাকুরা স্বচ্ছন্দে হয়ে দাঁড়ালেন—'অক্রুর খুড়ো'।

অন্য সকলকে তো নাম দিলেন—কিন্তু নিজের নাম?

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে যখন নিজের শ্রাদ্ধ করে এবং নাম পুড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তখন তিনি নাম নিয়েছিলেন—'বিবিদিষানন্দ'। শোনা যায়, 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম নেবার ইচ্ছা ছিল তাঁর; কিন্তু শশীর অধিক দাবীর কাছে সানন্দে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী কেবলই খ্যাতির মালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পথ চলতেন। ব্যাপারটাকে নিরঙ্কুশ করবার জন্য নাম বদলাতেন বার বার। কখনও 'বিবিদিষানন্দ' কখনও 'সচ্চিদানন্দ', কখনও 'বিবেকানন্দ।' ভারত ছেড়ে যাবার সময়ে নাম থাকল 'বিবেকানন্দ'। আমেরিকার ধর্ম মহাসভায় সেই নামের গলায় বরমাল্য পড়ল বলে সেইটাই ইতিহাসে উঠে গেল—আর বদ্‌লাবার কোন সুযোগ রইল না। কিন্তু তিনি নিজে কোন নামটিকে ভালবাসতেন? মেরী হেল দেখেছিলেন—ভারত থেকে পাঠানো এক চিঠিতে স্বামীজীকে 'নরেন' বলা হয়েছে। 'নরেন'—সে আবার কি?

স্বামীজী লজ্জিতভাবে লিখেছেন তাঁকে—"ওটা একটা নামের অপভ্রংশ।...নামটা খুবই কাব্যিক। চিঠিতে সংক্ষেপে নামটা লেখা হয়েছে। গোটা নামটা হল, নরেন্দ্র—অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্র বা রাজা। স্বামীজী নিশ্চয় জানতেন, সকলে তাঁকে কি বলে পাশ্চাত্য দেশে—তাঁর নামের অর্থ না জেনেই—তাঁকে দেখেই—'Prince among men।' সে-কথা বলেছে—রাজা মহারাজদের বন্ধুবান্ধবেরা পর্যন্ত। উদ্ভট, নয়কি? কি করা যাবে, আমাদের দেশের নামগুলো ঐ রকম। নামটা ছাড়তে পেরে আমি খুশি।" ছাড়তে পেরে খুশি। ছাড়তে কি সত্যিই পেরেছিলেন? পৃথিবীর খ্যাতির পেরেক বিবেকা-নন্দ নাম তাঁর ললাটে সেঁটে দিলেও কলরব যখনই শান্ত হয়েছে, ভিতর থেকে তৃষ্ণা জেগেছে একটি নাম ফিরে পাবার জন্য—অশ্বিনীকুমার দত্তকে বললেন ব্যাকুল হয়ে—'না-না, নরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়নি—আমায় ডাকুন, ঐ নরেন নামেই ডাকুন—ঠাকুর যে নামে আমায় ডাকতেন।'

নর্মদা অমরকণ্টক

অজিতকুমার মাইতি

কল্যাণ সেবাশ্রমের ১৩ নং ঘর। অমরকণ্টকে আমাদের রাতের আস্তানা। বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বাঞ্চলের এক উচ্চ শৃঙ্গ মহাকাল। তারই এক নিভৃত অঞ্চল অমরকণ্টক। শৃঙ্গের উচ্চতা মাত্র ৩৪৯৩ ফুট হলেও শীতের তীব্রতা কম নয়। চারদিকে সবুজ অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়, মাঝখানে এক ফালি কংকরময় ছোট উপত্যকা। ধূসর, বন্ধুর কিন্তু মনোরম। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ পরিবেশে যেন ধ্যানমগ্ন অমরকণ্টক; ধ্যানমগ্ন অমরকণ্ঠেশ্বর। অমরকণ্ঠেশ্বর নীলকণ্ঠ। এই নীলকণ্ঠ থেকেই উদ্ভূত শংকরকন্যা নর্মদা।

এই অমরকণ্টকই মহাকবি কালিদাসের অমরকাব্য 'মেঘদূতে' বর্ণিত আম্রকূট। রামগিরি থেকে প্রিয়তমার উদ্দেশে বিরহী যক্ষ প্রেরিত মেঘদূতের অলকা যাত্রার পথে প্রথম বিশ্রামস্থল আম্রকূট। আম্রকূট পাহাড়ের তৎকালীন রূপের বর্ণনা সুন্দরভাবে দিয়ে রেখেছেন মহাকবি তাঁর রচিত 'মেঘদূতের' পাতায়। আম্রকূটের 'রেবা' নামক বিশীর্ণ জলধারাই এই সর্বপাপহারিণী নর্মদা। 'রেবা' নর্মদারই দ্বিতীয় নাম। সেকথা পরে।

সাতপুরা পর্বতের দিক থেকে একটানা বয়ে আসছে হিমেল বাতাস। গরম জামাকাপড় গায়ে জড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছি নর্মদাকুণ্ডের কাছে। বিরাট চত্বরের মাঝখানে একাদশ কোন বিশিষ্ট এক কুণ্ড। পাঁচ-সাত হাত গভীর জল। স্থির, স্বচ্ছ ও শীতল। এই কুণ্ডের মধ্যেই স্ফুরিতা পুন্যসলিলা নর্মদা। কুণ্ডের মাঝখানে মন্দিরের মধ্যে জলের নিচে বিরাজিত নর্মদেশ্বর মহাশংকর। কণ্ঠোদ্ভূতা কুমারী কন্যা নর্মদার সঙ্গে শংকর যেন এখানে একাত্ম। মহাশংকরের নীলকণ্ঠ থেকে এখানেই পতিতপাবনী নর্মদার প্রথম আবির্ভাব। নর্মদার সূক্ষ্ম স্রোতোধারা এই কুণ্ড থেকেই গড়িয়ে চলেছে ভারতবর্ষের প্রাণধারা রূপে। কুণ্ডের উত্তর তীরে মুখোমুখি দুই মন্দির। এক মন্দিরে দণ্ডায়মান শ্বেতধবল পূর্ণাঙ্গ অমরনাথ শংকর। আর এক মন্দিরে কৃষ্ণকায়া তপস্বিনী শংকরকন্যা নর্মদা। উভয়ের প্রতি উভয়ের অপলক দৃষ্টি। পিতার নয়নে বাৎসল্যসিক্ত অপার করুণা—ভক্তির আবেগে আপ্লুত কন্যার নয়ন।

অরণ্যবেষ্টিত নিভৃত এই পর্বতশীর্ষে এক সময় গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন শিবশঙ্কর। সহসা শঙ্করের নীলকণ্ঠ থেকে নির্গত হলেন এক অপরূপা কন্যা। সদ্য নির্গতা কন্যা শঙ্করের দক্ষিণ চরণের উপর দাঁড়িয়ে শুরু করলেন তপস্যা। যুগের পর যুগ অতিবাহিত। এক সময় ধ্যান ভঙ্গ হল শঙ্করের। চকিতে লক্ষ্য করলেন তিনি তাঁর চরণ স্পর্শ করে থাকা তপস্যারতা কুমারী কন্যাকে। পুলকিত পিতার স্নেহস্পর্শে তপস্যা ভঙ্গ হল কন্যার। তপস্যায় সন্তুষ্ট পিতা তাপসী কন্যার নাম দিলেন নর্মদা। বর দিলেন নর্মদার ধারা হবে অমৃতময়ী। তাঁর সলিলস্নানে জীব হবে সর্বপাপমুক্ত। নর্মদার সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন শঙ্কর।

অরণ্যবেষ্টিত নিভৃত এই পর্বতশীর্ষে এক সময় গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন শিবশংকর। সহসা শংকরের নীলকণ্ঠ থেকে নির্গত হলেন এক অপরূপা কন্যা। সদ্য নির্গতা কন্যা শংকরের দক্ষিণ চরণের উপর দাঁড়িয়ে শুরু করলেন শংকরের তপস্যা। যুগের

পর যুগ অতিবাহিত। এক সময় ধ্যান ভঙ্গ হল শঙ্করের। চকিতে লক্ষ্য করলেন তিনি তাঁর চরণ স্পর্শ করে থাকা তপস্যারতা কুমারী কন্যাকে। পুলকিত পিতার স্নেহস্পর্শে তপস্যা ভঙ্গ হল কন্যার। তপস্যায় সন্তুষ্ট পিতা তাপসী কন্যার নাম দিলেন নর্মদা। বর দিলেন নর্মদার ধারা হবে অমৃতময়ী। তাঁর সলিলস্নানে জীব হবে সর্বপাপমুক্ত। নর্মদার সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন শঙ্কর। পিতার আশীর্বাদ নিয়ে নর্মদা স্রোতস্বিনী হয়ে গড়িয়ে পড়লেন বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালার মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ উপত্যকাভূমিতে। শুরু হল নর্মদার যাত্রা। সেই যাত্রার শেষ দীর্ঘ আটশ মাইল পথ পরিক্রমার পর আরব সাগরের বুকে আত্মসমর্পণে।

নর্মদা পশ্চিমগামিনী। মধ্যপ্রদেশের সাডোল, মান্দালা, নরসিংহপুর, জব্বলপুর, হোসাঙ্গাবাদ, মাণ্ডেয়া, সরগোন জেলা অতিক্রম করে পৌঁছেছে গুজরাট। গুজরাটের ব্রোচ জেলার মধ্য দিয়ে নর্মদা প্রবেশ করেছে মহাসমুদ্রে। এই দীর্ঘ আটশ মাইলের মধ্যে নর্মদার তীরে কত পর্বত, কত অরণ্য, কত তৃণভূমি, কত শস্যক্ষেত্র, কত পল্লী, কত নগর। ভারতবর্ষের এক বিরাট অঞ্চলের প্রাণধারা অমৃতানন্দদায়িনী নর্মদা। যুগ যুগ ধরে নর্মদার তটে গড়ে উঠেছে শত শত শিব মন্দির, শত শত শৈব সাধকের আশ্রম। শৈব সাধকদের কাছে নর্মদার প্রতিটি কঙ্করই যেন শঙ্কর।

কুণ্ডের পূর্বতীরে দুটি মন্দির। একটিতে পার্বতী ও অপরটিতে বালাসুন্দরী। পশ্চিমতীরেও মন্দির দুটি। এক মন্দিরে একাদশী, আর-এক মন্দিরে কৃষ্ণ-মনোহর। দক্ষিণতীরে কিন্তু মন্দির তিনটি। গৌরীশঙ্কর, শ্রীরামচন্দ্র, এবং ঘণ্টেশ্বরের। উত্তর পূর্ব কোণের মন্দিরে গোরখনাথজী, এবং উত্তর পশ্চিম কোণের মন্দিরে রোহিনীদেবী। নর্মদা-কুণ্ডের চারদিকেই বাঁধানো চাতাল, বাঁধানো সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি নেমে গেছে কুণ্ডের জল অবধি। নর্মদার পুন্য স্রোতোধারা কুণ্ড থেকে একটি সরু নালা বেয়ে বেয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। ছোট ধুসর উপত্যকাভূমি বেয়ে এবং আরও দুটি সঙ্গিনী সাবিত্রী ও গায়ত্রীকে নিয়ে নর্মদা নেমে চলেছে কপিলধারার দিকে। সেখান থেকে প্রপাত হয়ে আরও নিম্নভূমিতে—বিন্ধ্য-সাতপুরার মধ্যবর্তী শ্যামল উপত্যকায়।

নর্মদার আরেক নাম রেবা। নর্মদার এই 'রেবা' নাম গ্রহণ—সে এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। অমরকণ্টকের গভীর অরণ্যভূমির এখানে তখন ছিল এক বাঁশের বন। সেই বনের তলদেশেই ছিল নর্মদার উৎস। ঝিরঝির করে আপন খেয়ালে বইত নর্মদা। জনগণের নিকট কোন পরিচয়ই ছিল না তার। গভীর অরণ্যের জন্য মানুষের যাতায়াতও ছিল না বড় একটা এই অঞ্চলে। অরণ্যের মধ্যে ছিল প্রচুর হরীতকী ও আমলকীর গাছ। এক সময় দূর গাঁয়ের এক দরিদ্র পাহাড়িয়া—হরীতকী ও আমলকী কুড়োতে কুড়োতে চলে এসেছিল পাহাড়ের মাথায়। সঙ্গে তার দশ-বারো বছরের মেয়ে।…

আপাততঃ নর্মদা মন্দিরে শুরু হয়েছে সন্ধ্যারতি। মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি ও ভক্তযাত্রীদের নর্মদাস্তব, রেবাস্তব ইত্যাদিতে মন্দির প্রাঙ্গণে এক ভক্তির পরিবেশ। নর্মদার আরেক নাম রেবা। নর্মদার এই 'রেবা' নাম গ্রহণ—সে এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। অমরকণ্টকের গভীর অরণ্যভূমির এখানে তখন ছিল এক বাঁশের বন। সেই বনের তলদেশেই ছিল নর্মদার উৎস। ঝিরঝির করে আপন খেয়ালে বইত নর্মদা। জনগণের নিকট কোন পরিচয়ই ছিল না তার। গভীর অরণ্যের জন্য মানুষের যাতায়াতও ছিল না বড় একটা এই অঞ্চলে। অরণ্যের মধ্যে ছিল প্রচুর হরীতকী ও আমলকী গাছ। এক সময় দূর গাঁয়ের এক দরিদ্র পাহাড়িয়া—হরীতকী ও আমলকী কুড়োতে কুড়োতে চলে এসেছিল পাহাড়ের মাথায়। সঙ্গে তার দশ-বারো বছরের মেয়ে। হঠাৎ তৃষ্ণা পেল বাবার। কাঁধের ঝোলা থেকে একটা পাত্র দিয়ে আদেশ করল মেয়েকে একটু জল নিয়ে আসার

জন্যে। মেয়েটি আস্তে আস্তে বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এল। ভিজে-কাদা-মাটি। ঝুঁকে পড়ে খাবার জন্য পাত্র ভরে নিল নালার জল। যেই জল ভরা শেষ—সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। ছুটে এল বাবা আর্তনাদ শুনে। কিন্তু বাবার চোখের সামনেই তলিয়ে গেল শিশুকন্যা। আর্তনাদ মিলিয়ে গেল সেই বাঁশঝাড়ের মাটির নিচে। সামান্য ঝিরঝিরে নালা। অতলে তলিয়ে যায় কি করে? বিস্ময়ে ও শোকে পাথর হয়ে গেল বাবা। বুক চাপড়াতে লাগল অধীর হয়ে।

এমনি সময়েই সদ্য কন্যাহারা শোকোন্মাদ পিতার সামনে আবির্ভূতা হলেন সর্বপাপহারিণী নর্মদা। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন: "এই আমার উৎস-তীর্থ। তুই প্রচার কর এই তীর্থের। দুঃখ দূর হবে তোর।" পিতা ফিরে চাইল তার হারানো কন্যাকে। নর্মদা বললেন: "সে তো মিলেছে আমার দেহে। উপায় নাই ফিরিয়ে দেওয়ার।" মেয়ের রেবা নাম জেনে নর্মদা আশ্বাস দিলেন পিতাকে—"আমার বরে অমর হবে তোর কন্যা। রেবা হবে আমার দ্বিতীয় নাম। সর্ব পাপমোচনের জপমন্ত্র হবে রেবা। পৃথিবীর বুকে যতদিন থাকবে নর্মদা ততদিন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবে তোর কন্যা রেবাও।"

মন্দিরের পুরোহিত এক সময় হাত দিয়ে দেখিয়েছিলেন সেই স্থানটি। বাঁশ—বেণু। তাই নর্মদেশ্বরেরও অপর নাম বেনেশ্বর। নর্মদা-উৎস প্রচার হলেও কুণ্ড বা মন্দিরগুলি নির্মাণ হয়েছে অনেক পরে। ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে যতদূর জানা যায়, নর্মদা উৎসকে সর্বপ্রথম তীর্থ হিসাবে পরিচিত করে তোলেন দ্বিতীয় পেশোয়া প্রথম বাজীরাও। তারও অনেক পরে নর্মদাকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ভোঁসলা রাজাদের আমলে। এই ভোঁসলাদের আমলেই মন্দির নির্মিত হয় কয়েকটি। এখানকার প্রাচীনতম ধর্মশালাটি তৈরিও করেছেন হোলকার রানী অহল্যা বাঈ। প্রাকস্বাধীনতাকালে অমরকণ্টক ছিল রেওয়া রাজার অধীনে। রেওয়া থেকে অমরকণ্টক প্রায় দেড়শ মাইল। সে-যুগে রেওয়া ছিল রাঘেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

অমরকণ্টকের আর-এক প্রান্তে শোন নদের উৎস শোনমুড়া। নর্মদার প্রথম প্রপাত কপিলধারা এবং দ্বিতীয় প্রপাত দুধধারাও এই অমরকণ্টকে। তাছাড়া আছে ভৃগুকমণ্ডলু, মাই-কি-বাগিয়া ইত্যাদি আরও দর্শনযোগ্য রমণীয় স্থান।

প্রবাদ আছে, গঙ্গায় অবগাহনে যে ফল নর্মদা দর্শনেই নাকি সেই ফল। তাই নর্মদা যুগে যুগে সর্বপাপহারিণী, ভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী। শঙ্কর-কন্যা নর্মদার উৎসভূমি অমকণ্টক তাই আজও অগণিত পুণ্যলিপ্সু মানুষকে আকর্ষণ করে চলেছে।

এক সময় দুর্গম তীর্থ থাকলেও অমরকণ্টক আজ আর দুর্গম নয়। বন কেটে গড়ে উঠেছে বসতি; পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে সড়ক; কংক্রিট পোস্ট বেয়ে বেয়ে এগিয়ে গেছে বিদ্যুৎ। সড়ক পথে বাস চলাচল করছে নিয়মিত। পেন্ড্রারোড স্টেশন থেকে অমরকণ্টক পাহাড়ী পথে মাত্র আটাশ মাইল। বিলাসপুর-কাটনী সেকশন রেলপথের এক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন পেন্ড্রা রোড। পেন্ড্রারোড থেকে নিয়মিত বাস আছে অমরকণ্টকের। ঐ রেলপথের অনুপপুর স্টেশন থেকেও নিয়মিত বাস আসছে অমরকণ্টকে। বাস আসছে অমরকণ্টকে ডিন্ডোরী, সাডোল, জব্বলপুর থেকেও। তবে বিলাসপুর পেন্ড্রারোড হয়েই অমরকণ্টকে আসা সুবিধা। হাওড়া-নাগপুর লাইনের অন্যতম জংশন বিলাসপুর।

প্রবাদ আছে, গঙ্গায় অবগাহনে যে ফল নর্মদা দর্শনেই নাকি সেই ফল। তাই নর্মদা যুগে যুগে সর্বপাপহারিণী, ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। শঙ্কর-কন্যা নর্মদার উৎসভূমি অমরকণ্টক তাই আজও অগণিত পুণ্যলিপ্সু মানুষকে আকর্ষণ করে চলেছে।

রর পাম্পঘর

সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ

দেহপিঞ্জরের পাম্প ঘরকে আমরা হার্ট (Heart) বলেই চিনি। বাংলা নাম 'হৃদ্‌যন্ত্র', বিজাতীয় প্রভাবে এটিকে হার্ট বলতেই আমরা অভ্যস্ত। এই হার্ট নিয়ে কবিতা, গল্প, গাথায়, কত যে রসসিক্ত রোমান্টিক কাহিনীর অবতারণা হয়েছে তার শেষ খুঁজে মেলা ভার। অথচ এই হার্টের চেহারা কিন্তু আদৌ গল্প, গাথায় স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

রক্তঘেষা বাদামী রঙের চেহারা। দৈহিক ওজন আট থেকে নয় আউন্স। হাত মুঠো করলে যেমনটি দেখতে হয়, মোটামুটি হার্টের চেহারাটি ঐ আদলের। কতকটা ন্যাসপাতির আকৃতি বিশেষ। 'হৃদ্‌ধারার' খোলসে এটি আবৃত।

এটি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। সঙ্কোচন আর প্রসারণের সাহায্যে শরীরের এধার থেকে ওধারে রক্ত ছড়ানো আর গ্রহণের কাজ করে। সংকোচনের সাহায্যে রক্ত বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেয় আর প্রসারণের মাধ্যমে আবার সেটি টেনে নেয় নিজের থলিতে।

বুকের বাঁ ধারে যে ফুসফুসটি রয়েছে তাকে ঘেঁসে আছে হার্ট। হার্টের গোড়া থাকে বুকের উপর দিকে, মাথাটি ঝুলে থাকে বাঁ দিকের স্তনের বোঁটার আধ ইঞ্চি নিচে।

হার্টের মধ্যে রয়েছে চারটি পাম্পঘর। দুটি অরিকল (auricle) ও দুটি ভেন্ট্রিকল (ventricle) ঘর। এদের মধ্যে ভেন্ট্রিকল ঘর দুটির দায়িত্ব একটু বেশি। এদের মাংসপেশীও অপেক্ষাকৃত মোটা একটি ঘর ফুসফুসের দিকে রক্ত পাম্প করে আর অন্যটি দরকার মতো সারা দেহে রক্ত ছড়িয়ে দেয়। হিসাব করলে দেখা যাবে হার্ট এভাবে প্রতিদিন ষাট হাজার মাইল রক্তচালনা করে। এই হারে কাজ করলে একটি পাম্পিং মেশিন চার হাজার গ্যালনের একটি ট্যাংক একদিনে অনায়াসে ভর্তি করে দিতে পারে।

মুষ্টিযোদ্ধাদের হাতের পেশির শক্তি আমরা অনেকেই দেখেছি। অবাক বিস্ময়ে ভেবেছি, কি সাংঘাতিক হাতের জোর রে বাবা। মুষ্টি যুদ্ধের সময় হাতের পেশির যতটা খাটুনি হয়, তার চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ খাটুনি করে হার্ট। হার্টের কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেহের কোন পেশি যদি কাজ করতে যেত, তা হলে সে পেশির অন্তিম দশা অনেক আগেই দেখা দিত। শরীরের কোন পেশিই হার্টের মতো অতখানি শক্তিশালী নয়। অবশ্য মেয়েদের জরায়ুর-পেশির শক্তি হার্টের চেয়ে খানিকটা বেশি। কারণ সন্তান ভূমিষ্ঠ করানোর দায়িত্ব ঐ পেশির উপরেই ন্যস্ত থাকে। তবে একথা মনে রাখতে হবে জরায়ু-পেশি সারাজীবনে কয়েকবার সন্তান জন্মদানের সময় শক্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। অপরপক্ষে হার্টকে শক্তি পরীক্ষা দিতে হয় গর্ভে থাকাকালীন অবস্থা থেকে আমৃত্যু।

হার্ট একেবারেই বিশ্রাম নিতে পারে না এ-কথা বলা বোধ করি ভুল হবে। কারণ হার্টও বিশ্রাম নেয়। কিন্তু কখন ? দুটো স্পন্দনের অর্থাৎ দুটো পালসবিটের মাঝখানের সময়ে। শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হার্টের বাম পাম্পঘরটি এক সেকেন্ডের দশ ভাগের তিন ভাগ সময় নিয়ে থাকে। এই ফাঁকে হার্ট আধ সেকেন্ড বিশ্রাম নেয়। অন্য একটি সময়েও হার্টের কাজ কিছুটা কমে যায়। যখন আমরা ঘুমোই। ঘুমানোর সময় রক্তবাহী অনেক-গুলি সূক্ষ্ম নালী অর্থাৎ ক্যাপিলারিজ অকেজো হয়ে থাকে। ফলে ঐ নালী দিয়ে হার্টকে আর রক্ত পাঠাতে হয় না। স্বভাবতই তখন হার্টের কাজ

কমে যায়। এই সময়ে অনেকের 'পালস্ রেট' অর্থাৎ নাড়ীর গতি ৭২ থেকে ৫৫-তে নেমে আসে।

যাই হোক এত বড় একটা কাজের কাজির 'ভাল-মন্দ' তেমন করে আমরা কিন্তু দেখি না। অবশ্য দু' একজন আবার খুব বেশি হার্টের খবরদারি করতে চান। ফলে অনেক সময় বিনা কারণে এঁরা নিজেকে ভাবিয়ে তোলেন। হার্ট সম্বন্ধে বেশি না ভেবে সামান্য একটু সতর্ক হলেই চলে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে হয়, হার্ট লাফিয়ে চলছে অথবা থেমে থেমে চলছে। এটা হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যেমন চলছে চলতে দিন। এমনটি হয়েই থাকে। সময়ে সময়ে হার্টের চলাফেরার মধ্যে খানিকটা বেসুরো তাল ফুটে ওঠে। যাঁরা গাড়ি চালান তাঁকে হয়তো লক্ষ্য করেছেন, তাপ-প্রজ্বলন যন্ত্রটির মধ্যেও মাঝে মাঝে এধরনের ত্রুটি দেখা যায়। হার্টের মধ্যে তাপ প্রজ্বলনের শক্তি আছে। নিজেকে সংকুচিত করার সময় হার্ট এই শক্তির সাহায্যে প্রেরণা পাঠায়। অনেক সময় এই প্রেরণা বা শক্তিতরঙ্গের মধ্যে তারতম্য ঘটে। প্রেরণার গতি বেশি হলে হার্ট লাফিয়ে চলে, কম হলে থেমে থেমে চলে।

রাতে অনেকে বিকট স্বপ্ন দেখে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকেন। পরক্ষণেই জেগে ওঠে দেখেন বুক ঢিপ্‌ঢিপ করছে। হার্টের গতি অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। মনে ভয় ঢুকে পড়ে। হার্ট কেন এভাবে ছুটে চলছে? এটি আর কিছু নয়, ঘুমের ঘোরে যে বিকট স্বপ্নের সঙ্গে আমরা দৌড়াই, হার্টও সেই সময় পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে থাকে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য মনে ভয় হলে, ঐ ভয়ের জন্য হার্ট আরো তাড়াতাড়ি দৌড়ায়। ঐ সময়টিতে 'শান্ত' হয়ে থাকলে কিন্তু ভয় থাকে না; হার্টও শান্ত হয়ে স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকে। এই সময়ে যদি কোনভাবেই মনকে শান্ত করা না যায়, তবে কানের পেছনে গলার দিকের মাড়ির কাছটিতে আস্তে আস্তে মালিশ করতে হবে। এখানে ভেগাস নার্ভ (Vagus Nerve) থাকে। এই নার্ভটি অনেকটা ব্রেকের কাজ করে। এটাতে 'ম্যাসাজ' করলে হার্ট শান্তভাব ধারণা করে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়।

টেবিলে বসে কাজ করার সময় হঠাৎ বুকের কাছে অনেক সময় ব্যথা ওঠে। অমনি ভয় হয়। মনে হয় এই বুঝি 'হার্ট-অ্যাটাক' হল। আসলে হয়তো ব্যাপারটাই অন্য ধরনের। এটা 'পাকস্থলীতে' কোন অসুবিধা ঘটলেও হতে পারে। পেটে বায়ু জমলে এটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতিভোজন বা গুরুপাক খাবার খেলেও এমনটি হতে পারে। হার্টের গোলমালেও অবশ্য প্রথম প্রথম এধরনের ব্যথা দেখা দেয়। তবে সেটি সাধারণতঃ অতিরিক্ত খাটুনির পর বা অস্থিরতার পর দেখা দিতে পারে। তখন এই ব্যথার সাহায্যে হার্ট 'সিগন্যাল' দিয়ে সাবধান করে দেয়। হার্ট জানিয়ে দেয়, তোমার এই অস্বাভাবিক খাটুনি বা তোমার এই অবস্থার সঙ্গে আমি আর পাল্লা দিয়ে চলতে পারছি না।

এইসব কারণে হার্টকে খানিকটা তরতাজা রাখার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কিভাবে আমরা হার্টকে পুষ্টি জোগাব? এজন্য বেশি কিছু করার প্রয়োজন নেই। কারণ হার্ট নিজের পুষ্টি নিজেই রক্ত থেকে জোগাড় করে নেয়। যদিও হার্টের ওজন শরীরের ওজনের দুশো ভাগের একভাগ, তবু শরীরে যত রক্ত সরবরাহ হয় তার মাত্র কুড়ি ভাগের একভাগ রক্ত পুষ্টির জন্য হার্টের দরকার হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হার্টের চার পাম্পঘর থেকে যে-সব রক্ত চলা-ফেরা করে, হার্ট কিন্তু ভুল করেও সেই রক্ত থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে না। হার্টের যে দুটি 'করোনারি আর্টারি' আছে হার্ট তাদের থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে। এই দুই 'আর্টারিতে' কিছুমাত্র গন্ডগোল শুরু হলেই মানুষের মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায়। কেউ জানে না কখন কিভাবে এটা ঘটবে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শৈশব থেকে অথবা অনেক সময় জন্ম থেকেই ঐ 'করোনারি আর্টারিতে' চর্বি জমতে থাকে। ক্রমে ক্রমে চর্বির আধিক্যে আর্টারি বন্ধ হয়ে

যায় অথবা 'আর্টারির' মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। এভাবে যখন 'আর্টারি' অকেজো হয়ে পড়ে, তখন হার্টের যে অংশটি এই 'আর্টারি' থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতো সে অংশটি পুষ্টির অভাবে অকেজো হয়ে যায়। হার্টের মধ্যে তখন একধরনের ক্ষত 'টিস্যু' জন্ম নেয়। এই ক্ষত যত বড় হবে, হার্টের বিপদও তত বেশি হবে।

মোটের ওপর হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য খানিকটা সতর্ক থাকা উচিত। এজন্য প্রথমেই দেখতে হবে, শরীরের ওজন অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে কিনা। প্রতি পাউণ্ড অতিরিক্ত চর্বির জন্য হার্টকে অতিরিক্ত খাটুনি করতে হয়। এভাবে রক্তচাপ তখন বাড়তির দিকে এগোয়। সেইজন্য শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করতে হবে। বয়স অনুপাতে যতটুকু ওজন দরকার তার চেয়ে বেশি ওজন যেন না হয়।

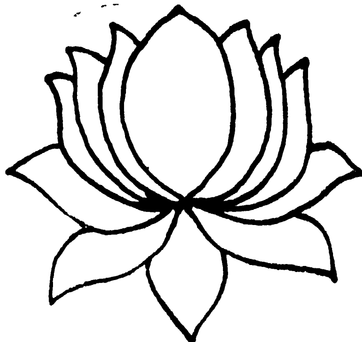
যাঁরা সিগারেট খান, তাঁরা অজান্তে প্রতিদিন খানিকটা করে 'নিকোটিন বিষ' শরীরে সংগ্রহ করেন। এই নিকোটিন শরীরের আর্টারিকে সংকুচিত করে। এতে চাপের সৃষ্টি হয়। এছাড়া 'নিকোটিন' হার্টকে উত্তেজিত করে। ফলে হার্টের গতি তখন স্বভাবতই বেড়ে যায়। সেইজন্য হার্টকে স্বাভাবিক রাখার জন্য সিগারেট-নেশা বিসর্জন দিতে হবে।

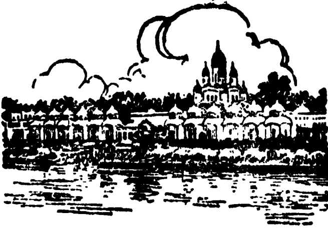
যাদের মেজাজ খিটখিটে তারা অজান্তে হার্টকে বিপাকে ফেলেন। কারণ খিটখিটে মেজাজ হলে 'এ্যাড্রিন্যাল গ্লাণ্ড' (Adrenal Gland) উত্তেজিত হয়। ফলে নিকোটিনের প্রতিক্রিয়ার মতো এগুলিও আর্টারির স্থিতিস্থাপকতা গুণ নষ্ট করে। 'আর্টারিগুলি' কঠিন হয়। ফলে রক্তের চাপ বাড়তে থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়। অতএব আমাদের সবসময়ে খোশ মেজাজে থাকা উচিত।

আমরা বিশ্রাম নিলে হার্টও বিশ্রাম পায়। সেই-জন্য সময় মতো খানিকটা ঘুমানো হার্টের পক্ষে ভীষণ উপযোগী। এছাড়া হাল্কাধরনের মেজাজী বই পড়েও হার্টকে বিশ্রাম দেওয়া যায়।

হার্ট সুস্থ রাখার জন্য মৃদু ব্যায়াম খুব উপকারী। দিনে এক থেকে দু-মাইল হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাস করলে ভাল হয়। এজন্য উঁচু-নিচু জায়গায় ওঠানামা করলে, যেমন, কোন বাড়ির পাঁচ-ছতলা ওঠার জন্য সবটা 'লিফট্' ব্যবহার না করে দু-তলা পর্যন্ত হেঁটে ওঠে তারপরে 'লিফটের' সাহায্যে উপরে উঠলেও খানিকটা ব্যায়াম হতে পারে। যাদের আর্টারিতে ফ্যাট জমতে শুরু করেছে এই ধরনের ব্যায়ামে রক্ত চলাচলের নতুন 'গলি পথ' সৃষ্টি হতে পারে। তখন হঠাৎ একটা আর্টারি বন্ধ হলেও হার্টের তেমন ক্ষতি হয় না।

হার্টকে সুরক্ষার জন্য এমন খাদ্য খেতে হবে যার মধ্যে পরিমিত চর্বি থাকে। বেশি চর্বিযুক্ত খাদ্য সবসময় খেলে উপকারের চেয়ে অপকারের পাল্লা ভারি হবে।





মাধুকরী

স্বামী বিবেকানন্দ

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দেখিতে দেখিতে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। স্মরণ করি আমরা তাহার জীবন ও বীরবাণী। মাঘের পুণ্য তিথিতে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে; সহস্র সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ—যাহারা তাঁহার জীবনে সর্বাপেক্ষা পূজার ও সেবার বস্তু ছিল, যাহাদের দুঃখ ও পতিত অবস্থা সর্বাপেক্ষা তাঁহার মর্মস্থল স্পর্শ করিত—অন্ন পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে; গীত-কীর্তনে, ভাব-স্পন্দনে জাহ্নবীতীর মুখরিত করিয়া ঐ বীর-বৈরাগী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্মরণ করি আজ আমরা তাঁহার অমর গাথা ঃ

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়,
বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

শাস্ত্রে আছে, যে বংশে একজন ত্যাগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার চতুর্দশ পুরুষ মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। এক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙালীকে মুক্তির পথে অর্ধেক অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যে বাংলায় বিদ্যাসাগরের প্রাণ ও বিবেকানন্দের প্রেম-বৈরাগ্য বাঙালীর সম্পদ, সে বাংলা মহৈশ্বর্যশালিনী, গৌরবমালিনী।

এক কথায় বলিতে গেলে, বিবেকানন্দ একজন খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বাঙালীতে যাহা ছিল, বাঙালীতে যাহা আছে, বাঙালীতে যাহা হইবে, একাধারে এক বিবেকানন্দে সে সকলেরই সমাবেশ হইয়াছিল। বাঙালীর মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের চারিশত বৎসর পরে, পুনরায় নিদ্রিত ভারতকে ধর্মপ্রাণতায় মাতোয়ারা করিয়া ভারতবাসীকে প্রেমপূর্ণ বাণীতে বিবেকানন্দ ডাকিয়াছিলেন, উঠ ভাই মায়ের সন্তান, নিখিল জগৎ ডাকিছে তোমায়। তোমার এত দেবার সামগ্রী, যাহার জন্য পৃথিবী তৃষিত, তবু ঘুমিয়ে রয়েছ তুমি।' সে কি মন-মাতানো প্রাণ-ভুলানো আশা-সঞ্চারিণী বাণী!...

বিবেকানন্দের বীর-বাণীতে পরমহংসদেবেরই লীলাভিনয়, বরাভয়কর বাণী শত শত আর্তজনকে মঙ্গল-পথ দেখাইল, প্রাণদান করিল, নিদ্রিত বাঙ্গালা বিবেকানন্দের বিজয়-ঘোষণায় মুখরিত হইয়া উঠিল, যেন বহুদিন পরে পূজা-মন্ডপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। ঐ গৈরিকে মানবকে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ করিবার ছিল না কি। ঐ গেরুয়ায় যেমন ত্যাগ, তেমনই তেজ; যেমন প্রেম, তেমনই কর্ম ছিল; যেমন ভক্তি, তেমন জ্ঞান; যেমন প্রতীচ্যের রজ-শক্তিবিকাশ, তেমনই প্রাচ্যের সত্ত্বগুণ সমাবেশ; শঙ্করের বৈরাগ্য, রামানুজের বিষ্ণুভক্তি, কর্মযোগীর কর্মকুশলতা, জ্ঞানযোগীর জগদালোড়ন-কারিণী চিন্তাশক্তি। তিনি যে স্পন্দনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারই ক্রিয়ায় আজ ভারতমহাবারিধি স্পন্দিত ও বিক্ষুব্ধ; আজ যে বাঙালী আত্মসম্মান-জ্ঞানে দীক্ষিত, তাহা সেই মহাপুরুষেরই পবিত্র জীবনব্যাপী উজ্জ্বল আদর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

বহু পুণ্য-বলে বঙ্গমাতা বিবেকানন্দকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। মাতার দরবিগলিত ধারা মুছাইতে, নিদারুণ মর্মপীড়া ঘুচাইতে, দুঃখ-দৈন্য দূর করিতে বিবেকানন্দ বাঙালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি করিয়া মাতৃপূজা করিতে হয়; সংসার সুখ, বিলাস-বৈভব, সমৃদ্ধি, সম্পদ, কামিনী-কাঞ্চন পরিহার করিয়া কেমন করিয়া মাতৃপূজায় বসিতে হয়, তিনি দেখাইয়া গেলেন;—তিনি

উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, বহুজনসাপেক্ষ যে মাতৃপূজা তাহার মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া ভাইদের ডাকিয়াছিলেন—উদ্বুদ্ধ বাঙালী তাহার উদ্বোধন উদ্‌যাপন করুন।

এই স্মরণীয় দিনে আমি অকিঞ্চন ঐ মহা-পুরুষের জীবনকথা কোন্ ভাষায় কি বলিব। আমেরিকা প্রবাসকালে তিনি কিয়ৎকাল মিশিগ্যানের শাসনকর্তার বিধবা পত্নী মিসেস ব্যাগলির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইনি যুক্তরাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ বিদুষী রমণী। তিনি বলিয়াছেন, স্বামীজীর অবস্থানে গৃহ যেন "অবিরত মঙ্গলপ্রবাহে পূর্ণ ছিল", "তিনি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয়াছেন। মানুষ যে তাঁহার মতে এত অমল-ধবল, এত নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, তাহা আমি ভাবনায়ও আনিতে পারিতাম না। উহাই তাঁহাকে অন্য সকল মানব হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সৌন্দর্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিত না ; তিনি প্রায়ই বলিতেন 'আমি তোমাদের তীক্ষ্ণধী বিদুষীগণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে চাই ; আমার পক্ষে ইহা একটি অভিনব ব্যাপার, কারণ আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃপুরচারিণী ; আমরা অনুভব করিতাম, যেন এক জ্বালাময়ী ঐশীশক্তি পুরাকালের খ্রীষ্ট-শিষ্যদিগের ন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। ত্যাগ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী যতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার কথা বর্ণনা করিতে করিতে সহসা উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণেই ত্যাগ বৈরাগ্যের চরম সীমা স্বরূপ 'সন্ন্যাসীর গীতি' শীর্ষক কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন।"···

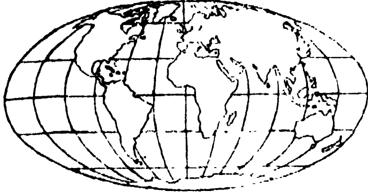
রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মলোক হইতে টানিয়া আনিয়াছি ; নরেন্দ্র সমাধিমগ্ন ছিল, আমি জগতের কল্যাণের জন্য ওকে টানিয়া আনিয়াছি ; নিজেকে যেদিন জানতে পারবে, দেহ রেখে চলে যাবে"—সেই যুগাবতার রামকৃষ্ণ-বাণী তিনি বহন করিয়া জগৎকে বিলাইয়াছিলেন। সর্বধর্মসমন্বয়কারী রামকৃষ্ণ-বাণী, যখনই সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই অতি ক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন : "যাঁহারা রামকৃষ্ণ নামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপে দাসজাতসুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহাধর্মতরঙ্গ—যাহার শুভ্র-শিখরে এই মহাপুরুষমূর্তি বিরাজ করিতেছেন ধনজন বা প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়মপ্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্তকালের জন্য লীন হইয়া যাইবে ; আর যদি জগদম্বা পরিচালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শক্তিসঞ্চার রোধ কর ?"

তাই ভারতবাসীকে ডাকিয়াছিলেন, যুগযুগবাহী আধ্যাত্মিকতার অধিকারী তোমরা ভাই, নীচ প্রবৃত্তি পরিহার কর। "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানু-করণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? ···হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী ; ভারতবাসী আমার ভাই ; মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই ; ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর দিবারাত্র বল, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

আজ এই মহাপুরুষ-বাণী মোহাচ্ছন্ন ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে, দিকে দিকে ধ্বনিত হউক।*

* ভারতবর্ষ, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ৭৫—৭৬

সংগ্রহ : প্রদ্যুৎকুমার গঙ্গোপাধ্যায়



বাতায়ন

আজকের জাপান

টোকিও-র যন্ত্রণা

জাপান কি টোকিওকে রাজধানী রাখবে এবং তার ধনসম্পত্তি ও জনগণকে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে দেবে? না, নিউইয়র্কের মতো নিজদেশের এবং সেই সঙ্গে দেশ-বহির্ভূত শহর হয়ে যাবে? এই সব নানারকম কথা উঠছে। তবে এটা ঠিক যেভাবে চলছে, সেভাবে আর চালানো যাবে না।

সমস্যার মূল হচ্ছে: টোকিও কর্মস্থল হিসাবে ভাল, তবে বাস করবার পক্ষে ভাল নয়। টোকিও এবং তার শহরতলিতে জাপানের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ বাস করে। কিন্তু তারা পৃথিবীর যে-কোন শহরের বাসিন্দাদের চেয়ে ছোট বাড়িতে থাকে, বেশি দূরে কর্মস্থলে যায়, থাকা খাওয়ার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ কম পায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত টোকিওবাসীদের ধারণা ছিল শহরের কাজই হল কর্ম ও অর্থোপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি। কিন্তু এখন তাদের ধারণা বদলাচ্ছে। তারা ভাবতে আরম্ভ করেছে যে তারা প্রথম শ্রেণীর শহরে বাস করেও তৃতীয় শ্রেণীর শহরের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তারা খেলাধুলো ও স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে। কিন্তু তা পাচ্ছে না। অবশ্য এমন নয় যে, শহরে হট্টগোল বেড়েছে বা বেশি জনাকীর্ণ হয়েছে। বরং লন্ডন বা নিউইয়র্কের চেয়ে এই শহর আরও নিরাপদ জায়গা; এখানে খুন জখম কম হয়। তবে যুব অপরাধ (Juvenile delinquency), স্কুলে মারামারি, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার —এসব অবশ্য বেড়ে চলেছে।

জাপানীদের শৃঙ্খলাপরায়ণ অভ্যাসের জন্য শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। বিদেশীদের কাছে, যারা তাদের দেশে উচ্ছৃংখলতা দেখতে অভ্যস্ত, জাপানীদের উপরের ভদ্রতা ও সব বিষয়ে পরিমিত ব্যবহার তাদের ভিতরের যন্ত্রণা ঢেকে রাখে। টোকিওবাসীর হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ দেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি।

শহরের কেন্দ্রস্থিত সম্রাটের রাজপ্রাসাদ থেকে ৫০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে টোকিওতে তিন কোটি লোক বাস করে। বৃহত্তর টোকিওতে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায়, সেটি চুম্বকের মতো লোককে আকর্ষণ করছে। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কর্মে নিযুক্ত লোক ছিল ১৩৪ লক্ষ। ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়েছে ১৪৪৭ লক্ষ। এখানে বিদেশীদের সংখ্যা মাত্র এক লক্ষ। জাপানীদের ভয়, যদি বিদেশীদের বেশি আসতে দেওয়া হয় তা হলে অন্যান্য প্রাচ্য দেশ হতে অ-দক্ষ (unskilled) কর্মীতে ও তাদেরপরিবার-বর্গে দেশ ভরে যাবে। এখানে পাশ্চাত্যের খুব উন্নতধরনের দক্ষ কর্মীদের আসতে দেওয়া হয়। জমির দাম বেড়ে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এমনই দাঁড়িয়েছে যে 'উদ্বোধন'-এর এক পৃষ্ঠার সমান জমির দাম প্রায় পৌনে এক লক্ষ টাকা। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী টোকিও এবং তার নিকটবর্তী শহর কানেগোয়ার মিলিত মূল্য সমগ্র ইউনাইটেড স্টেটস্‌-এর মূল্যের চেয়ে বেশি। লোকপ্রতি খোলা জায়গা লন্ডনের তুলনায় দশাংশ। শহরের মাঝখানে ২৮৫ একর সবুজ জায়গা আছে যা সম্রাটের প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত। এর কোন কোন অংশগুলিতে পার্ক হয়েছে। মনে

হয় সম্রাটের দেহত্যাগের পরে এই সমস্ত খোলা জায়গাটি জনগণের জন্য দান করলে, সেটাই হবে সম্রাটের ভাল স্মৃতিরক্ষা।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য নানা সংস্থা ভাবছে যে, সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হল শহরকে স্থানান্তরিত করা। তা সম্ভবই বা হবে না কেন? ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে টোকিও রাজধানী হবার আগে আরও ছয় জায়গায় দেশের রাজধানী ছিল। আবার অনেক টোকিওবাসীর ধারণা হচ্ছে যে 'আমার শহর' যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। তবে তাকে নয়টি স্বাবলম্বী অংশে ভাগ করতে হবে যার প্রত্যেকটির বাসিন্দাদের কর্মসংস্থান ও অবসরবিনোদনের সুযোগ থাকবে।

[উৎস: The Economist 9—15 April, 1988, P. 19]

'আমি বোধ হয় এই বলছিলাম'

জাপানের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন এক, কিন্তু তার অর্থ হয় অন্য অনেক রকম। যখন কোন মন্ত্রী কোন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলেন, 'আপনি খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার তুলেছেন' তখন ধরা মুস্কিল যে তার দ্বারা তিনি কি বোঝাচ্ছেন—পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার কিছু আশা আছে, খুব আশা আছে অথবা কোনই আশা নাই। শ্রোতৃগণকে বলার সময় বা ভাব অনুযায়ী তাঁর মনের ভাবকে ধরতে হবে। ওসাকা সিটি ইউনিভার্সিটির রাজনীতির অধ্যাপক টৌসিও কোমো বলেছেন যে, জাপানী রাজনীতি হচ্ছে 'হাওয়ার রাজনীতি' (politics of atmosphere)। বিরুদ্ধপক্ষের একজন কাজুহিসা ইনু আরও খোলাখুলি নিষ্কলঙ্ক সরকার গঠনের জন্য এইরকম ভাষার কুজ্ঝটিকা বন্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, যদি সাধারণ জাপানীরা রাজনীতিজ্ঞরা কি বলেন, তা যদি বুঝতে না পারে, তাহলে সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি বিদেশীরা মনে করে তাদেরকে যা বলা হচ্ছে, তার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা, তাহলে ব্যাপারটা আরও খারাপ। মিঃ ইনু এই সব চিন্তা করে একটি সরকারি কমিটি গঠন করতে চান, যার কাজ হবে পার্লামেন্টে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ নির্দিষ্ট করা। তিনি মনে করেন রাজনীতিজ্ঞরা অকারণে কঠিন জাপানী শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁদের হেঁয়ালী ভাষা ব্যবহারের প্রচণ্ড ঝোঁক। এমনকি সরল কথাগুলিও তাঁরা পার্লামেন্টে হেঁয়ালিভাবে ব্যবহার করেন। যদি কোন মন্ত্রী বলেন যে, কোন কাজ তিনি 'যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করবেন', তার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় যে তিনি হয় সামান্যমাত্র করবেন বা করবেন না। "আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব" মানেই হচ্ছে সাদাসিধে 'না'।

মিঃ ইনু ৫১টি এইরকম—হেঁয়ালি শব্দ বা বাক্যাংশ বেছেছেন যেগুলি গতবৎসর পার্লামেন্টে ব্যবহৃত হয়েছিল। নতুন প্রধানমন্ত্রী মিঃ নোবোরু টাকেশিৃ এই বিষয়ে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন "আমার কথাগুলি স্পষ্ট, কিন্তু তাদের অর্থ অনেক সময়ই স্পষ্ট নয়।"

[উৎস: The Economist, 12—18 March, 1988 P. 24]

সংগ্রহ ও উপস্থাপন: জলধিকুমার সরকার



গ্রন্থ পরিচয়

রূমী এবং তাঁর সুফীতত্ত্ব

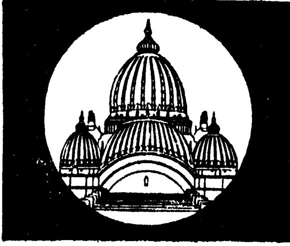
মৃণাল ব্রহ্মচারী

জালালুদ্দিন রূমী এ্যাণ্ড হিজ তাসাউফ—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। শোভারাণী পাল, এম. আই. জি. হাউসিং এস্টেট, ব্লক সি/২, ৬০১৬৭, বি. টি. রোড, কলকাতা—৭০০ ০০২। একশো আশি টাকা।

ভারতীয় চিন্তায় ও মননে সুফীতত্ত্ব একেবারে অপরিচিত নয়। বস্তুতঃ মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে তুর্কীস্তান থেকে একদা যে শুধু বিজেতারাই সাম্রাজ্য বিস্তার করতে ভারতে এসেছিলেন তাই নয়, অনেক নতুন চিন্তাধারাও ক্রমান্বয়ে এসেছিল। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গীত যেমন একদা ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি ইসলামও ভারতবর্ষের ধর্মচেতনায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। আবার ইসলামেরই এক বিশিষ্ট ধারা সুফীতত্ত্ব—যার মূলকথা হল প্রেমের পথ ধরে ঈশ্বরের সাধনা—ভারতের চিরায়ত ধর্মসাধনার মধ্যে তার যথার্থ অনুরণনকে একদা আবিষ্কার করেছিল। নানক, কবীর, এমনকি বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও আমরা যে ভক্তিবাদ দেখতে পাই, তার সঙ্গে সুফীতত্ত্বের যথেষ্ট মিল আছে। সে মিল যতটা না বহিরঙ্গে, তার চেয়েও অনেক বেশি চেতনার গভীরতায়। বাংলার বাউলের মন-উদাস-করা গানেও একই সুর, একই ভাবনা। বাউলের পোশাকও সুফী দরবেশের পোশাকের সমগোত্রীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে হরেন্দ্রচন্দ্র পালের গবেষণা গ্রন্থ JALALU'D-DIN RUMI AND HIS TASAWWUF ভারতীয় পাঠকের নিকট একটি মূল্যবান উপহার। বলাবাহুল্য ইংরেজী ভাষায় রচিত গ্রন্থ হিসেবে বহির্বিশ্বেও এ গ্রন্থের সমাদর হওয়া উচিত। কোন গবেষণাপত্রই সাধারণ পাঠকের কথা ভেবে রচিত হয় না। যেহেতু প্রত্যেক গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীলাভের প্রত্যাশী থাকেন এবং পরীক্ষকদের আপন পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অবহিত করতে চান, তাঁর রচনায় এই মানসিকতার একটা প্রতিফলন দেখা যায়। ফলতঃ গবেষণা গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ যতটা দেখা যায়, রসের সন্ধান ততটা মেলে না। কদাচিৎ যে ব্যতিক্রম চোখে পড়ে, তার উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থটির নাম করা যায়। এর পাতায় পাতায় লেখকের গভীর চিন্তা এবং প্রচুর অধ্যয়নের পরিচয় বর্তমান, কিন্তু বক্তব্যের ঋজুতা এবং মননের গভীরতা সত্ত্বেও লেখক সাহিত্যিক সরসতাকে কখনই বিসর্জন দেননি। তাই দেখি অতি কঠিন বক্তব্যকে লেখক প্রকাশ করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়, সরস ভঙ্গিতে। গ্রন্থকার ভূমিকায় প্রকাশনা সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত অভিমান ব্যক্ত করেছেন। এরকম দুঃখ তাঁর একার নয়। বিশ্ব-ইতিহাসে অনেক চিন্তাশীল মানুষকে একই রকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বর্তমান গবেষক যদিচ তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন, তবুও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে তাঁকে উচ্চতর ডক্টরেট দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং অনেক মনীষী যে তাঁর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তা মনে রেখে লেখক তাঁর দুঃখ কিছুটা লাঘব করতে পারেন।

সুলিখিত এবং সুবিন্যস্ত বইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এর তৃতীয় অধ্যায় যার বিবিধ পরিচ্ছেদে লেখক সুফীতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। নিঃসন্দেহে এ তত্ত্ব খুব সহজ তত্ত্ব নয় এবং বিস্তারিত আলোচনাও একজন গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়েছে। এবং সে কারণেই তাত্ত্বিক আলোচনা অজস্র উদ্ধৃতিতে কিছুটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে যা সাধারণ পাঠকের নিকট হয়তো সহজপাচ্য নাও হতে পারে।

স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে সাধারণ পাঠকের নিকট পৌঁছানো লেখকের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাঁরা ফার্সী সাহিত্যের এবং ব্যাপকতর অর্থে ঐস্লামিক দর্শনের পঠনপাঠনে ব্যাপৃত তাঁদের কাছে এ-গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। ভবিষ্যতে যাঁরা এবিষয়ে আরও গবেষণা করতে উৎসাহী হবেন তাঁদের কাছে হরেন্দ্রচন্দ্র পালের এই গবেষণাপত্রটি অবশ্যই একটি আকর-গ্রন্থের মর্যাদা পাবে।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী বম্বে রামকৃষ্ণ মিশন গত ২৮ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালন করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে গত ১১ সেপ্টেম্বর বম্বে পৌরসভার বিবেকানন্দ উদ্যানে ১০ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি ও বম্বে পৌরসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দিবাকর এন. রাওতে। ঐ দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বহুসংখ্যক যুবক-যুবতী অংশ গ্রহণ করেন। ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি ওয়ার্লি'তে অবস্থিত বোম্বে মিশনের শাখাকেন্দ্রে মার্বেল পাথরের তৈরি স্বামী বিবেকানন্দের একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। শেষের দিন বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠান ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। তাছাড়া এসব অনুষ্ঠানের পূর্বে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বম্বে মিশনের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোয়েম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন, তামিলনাড়ু গত ২—৪ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী-উৎসবের অঙ্গ হিসাবে 'নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ-বাণীর প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের উদ্বোধন করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী পি. ভি. নরসীমা রাও। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচার গত ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর 'ভারতীয় নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান' বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে পণ্ডিতমণ্ডলী, শিক্ষাবিদ্‌, ছাত্র ও শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী সেমিনারের উদ্বোধন করেন এবং সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

নতুন শাখাকেন্দ্র

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এবং তৎপরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রম (শিকড়া কুলীন গ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের শাখাকেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ট্রাস্টীগণ গত ১৫ অক্টোবর '৮৮ এক জনসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের হস্তে উক্ত ট্রাস্টের পরিচালনভার অর্পণ করেন।

ত্রাণ

বিহার ভূমিকম্পত্রাণ: মুঙ্গের ও মধুবনী জেলায় গত ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত ২০,০০০ শাড়ি ও ২০,০০০ ধুতি বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া মুঙ্গের জেলার হাসানপুর ও মধুবনী জেলার ঝঞ্ঝারপুরে 'নিজের ঘর নিজে তৈরি কর' প্রকল্প অনুযায়ী বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আসাম বন্যাত্রাণ: নওগাঁ জেলার মারিগাঁও মহকুমায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১৫০০টি ধুতি, ৫০০টি শাড়ি, ১০০০টি চাদর, ৮৮২টি শিশুদের পোশাক, ৪৯৪টি পশমী কম্বল এবং ১৬,৫৩৫টি পুরনো পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

মেঘালয় বন্যাত্রাণ: মেঘালয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পশমের পোশাক বিতরণ করা ছাড়াও চেরাপুঞ্জি আশ্রমের মাধ্যমে শেলার নিকটবর্তী রেঙ্গুয়া গ্রামের ত্রিশটি আদিবাসী পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ খরাত্রাণ: মালদা আশ্রমের মাধ্যমে ঐ জেলার ইংলিশ বাজার, গাজল এবং মানিকচক ব্লকের এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গুজরাট বন্যাত্রাণ: রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে রাজকোট ও জামনগর জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৩০০০ কিলোঃ বাজরা, ১৮০ মিটার খাকি কাপড়, ১৫০টি শাড়ি, ৬৫৬টি কম্বল, ২৭৬৬টি পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৩, ১৪০ কিলোঃ পশুখাদ্যও বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ: ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর ও ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে ৫,৯০৯ কিলোঃ চাল, ৪১০ কিলোঃ ডাল, ৩৮৮৭ কিলোঃ চিড়া ১০০ কিলোঃ গুড়, ৭৪৬৬টি শাড়ি, ৭৪৭৬টি লুঙ্গি, ১৩৬৮টি ধুতি এবং ৯১৩১টি পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র ১ম ও ১৯তম স্থান; নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের ছয়জন ছাত্র ২য়, ৩য়, ৫ম (দুজন), ১০ম ও ১৪শ স্থান এবং পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের পাঁচজন ছাত্র ৭ম, ১১শ, ১৬শ, ১৭শ এবং ১৯শ স্থান লাভ করেছে।

আই. বি. টি. এম., কলিকাতা কর্তৃক আয়োজিত 'ইনফরমেশন রেভলউশন' (Information Revolution)। বিষয়ের উপর বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশন আলং বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর একজন আদিবাসী ছাত্র প্রথম স্থান লাভ করেছে।

উদ্বোধন

গত ৪ সেপ্টেম্বর কামারপুকুর আশ্রমের নবনির্মিত কর্মী-ভবনের এবং ৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালপাড়া আশ্রমের সংস্কৃত (Renovated) মন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ।

বহির্ভারত

সিয়াটল বেদান্ত সোসাইটি (ওয়াশিংটন): গত ৮—১২ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এই আশ্রম পরিদর্শন করেন। ১০ সেপ্টেম্বর তিনি এই আশ্রমের সাধনকেন্দ্র (Retreat centre) তপোবনে প্রস্তাবিত বেদান্ত মন্দিরের নির্মাণস্থান উৎসর্গ করেন। সে-অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপর বক্তৃতা ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের স্মৃতিচারণ করেছেন।

সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি: গত জুন মাসে সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী তিন দিন ভাষণ দিয়েছেন। সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের স্মরণে 'এ গাইড টু এ স্পিরিচুয়্যাল লাইফ' নামে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি (নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া): গত অক্টোবর মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবারে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা করেছেন। ২ অক্টোবর ভাষণ দিয়েছেন স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। তাছাড়া প্রতি শনিবার মায়ের কথা আলোচনা হয়েছে এবং ৮ অক্টোবর ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার: গত অক্টোবর মাসে প্রতি রবিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া স্বামী আদিশ্বরানন্দ

প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার যথাক্রমে 'পাতঞ্জলযোগসূত্র' ও 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর উপর ক্লাস নিয়েছেন।

নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি : এ বছর (১৯৮৮) স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বেদান্ত সোসাইটিতে বিভিন্ন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের উপর ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গত ১০ জানুয়ারি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী' এবং ৩১ জানুয়ারি বর্তমান যুগে 'স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ের উপর ভাষণ দেন স্বামী তথাগতানন্দ। ১৪ ফেব্রুয়ারি 'স্বামী বিবেকানন্দ ও আন্তধর্ম পরিপ্রেক্ষিত' বিষয়ে ভাষণ দেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতা রাব্বি আশার ব্রুক। ৫ জুন ভাষণ দেন নিউইয়র্ক কমিউনিটি চার্চের ধর্মযাজক রেভারেন্ড ডি. এস. হ্যারিংটন। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'বিবেকানন্দ ও মুক্তির জন্য জীবাত্মার সংগ্রাম'। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রেভারেন্ড হ্যারিংটনের পিতাও একজন ধর্মযাজক ছিলেন এবং তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোর পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়ন-এ দুবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনে তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর বেদান্ত সোসাইটিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব (জন্মাষ্টমী) পালিত হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ 'বেদান্ত ও বিশ্বজনীন ধর্ম' বিষয়ে ভাষণ দেন। তাছাড়া সেপ্টেম্বর মাসের প্রতি মঙ্গলবার 'গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং প্রতি শুক্রবারে ভগবদ্গীতার ক্লাস নেওয়া হয়েছে। শনিবার ও রবিবার সমবেত কণ্ঠে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে।

স্যাক্রামেণ্টো বেদান্ত সোসাইটি : গত অক্টোবর মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ক্লাস নিয়েছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ ও স্বামী গণেশানন্দ। তাছাড়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ছ'টায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় স্বামী প্রমথানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপর ক্লাস নিয়েছেন এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর উপর আলোচনা হয়েছে। এবং ১২ অক্টোবর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উপনিষদের উপর একটি বিশেষ ক্লাস নিয়েছেন।

দেহত্যাগ

গত ১১ সেপ্টেম্বর '৮৮, স্বামী শিবরূপানন্দ (রমেশ) হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে বিকাল ৪-৪০ মিঃ দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল তিয়াত্তর বছর। ক্রমাগত কিডনি ও হৃদ্যন্ত্রের অসুখে ভুগছিলেন বলে তাঁকে গত ১৬ জুলাই সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল।

স্বামী শিবরূপানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বম্বে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। যোগদানের কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, শিলং, রাজকোট শ্যামলাতাল কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আলমোড়া কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট্ অব কালচারের কর্মী হন। অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি অনেকেরই প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৪ ও ১০ অক্টোবর যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার ভক্তিপ্রসঙ্গ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ অন্যান্য শুক্রবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।



বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিগত ৯, ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর বিলোনীয়ায় ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের অর্ধবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত ২৬টি আশ্রমের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। বেলুড় মঠের অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী শান্তিদানন্দ সভাপতিত্ব করেন। পিছিয়ে পড়া মানুষ ও অনুন্নত গ্রামের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সভায় আলোচনা হয়। ভাব প্রচার পরিষদের উদ্যোগে ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে বিলোনীয়ায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে সারা ত্রিপুরা ভিত্তিক সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা, বিতর্ক ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যোগদানকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ১২০ জন।

চকগোলাপ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা মেদিনীপুর): স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৯ সেপ্টেম্বর চকগোলাপ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্থানীয় নৈপুরসুধা ইনস্টিটিউশনে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে দুজন মহিলাসহ মোট একান্ন জন রক্তদান করেন।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব টরণ্টো নামে একটি সংস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ কানাডার টরণ্টো শহরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার করে চলেছে। আমেরিকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে প্রচারকার্য করে থাকেন। এবছর সেখানে গিয়েছিলেন স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী ভাষ্যানন্দ, স্বামী তথাগতানন্দ এবং স্বামী ভাস্করানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরণ্টো প্রতি বছর একটি সাধন শিবির (Retreat)-এর আয়োজন করে। এবছরও তার আয়োজন করা হয়েছিল। টরণ্টো থেকে ২০০ কি.মি. দূরে কিনমাউণ্টে এবার ১ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের সাধন-শিবির উপলক্ষে সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ যোগদান করেছিলেন। সম্প্রতি সোসাইটির জন্য একটি নতুন বাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। গত ১০ জুলাই ঐ বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হয়। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজীর সেদিন একটি ভাষণ দেন। গত ১১ জুলাই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ টরণ্টো বেদান্ত সোসাইটিতে যান এবং ১৪ জুলাই পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এই কয়দিন তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ১৩ জুলাই রাত্রে তিনি 'পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের বাণী' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন।

পরলোকে

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অধ্যাপক কামিনীকুমার দে গত ১ আগস্ট '৮৮ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর। প্রয়াত অধ্যাপক দে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বরিশাল (অধুনা বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করেন ও পরে গুরুদাস কলেজে বিভাগীয় প্রধান হন। তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছেন।



বিজ্ঞান সংবাদ

শিশুদের জন্য বিরাট পরিকল্পনা

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালিতে এই ব্যাপারে বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO), ইউনিসেফ (UNICEF), বিশ্বব্যাংক (World Bank), ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, এবং রকফেলার ফাউন্ডেসন মিলে যে 'টাস্ক ফোর্স' ফর চাইল্ড সারভাইভ্যাল' নামক সংস্থা গড়েছিল তখন থেকে শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। যদি শিশু-মৃত্যুর হার ১৯৬০-র মতো থাকত, তাহলে ১৯৮৬-তে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা যা হয়েছে, তার চেয়ে আরও ৭০ লক্ষ বাড়ত। 'টাস্ক ফোর্স'-এর অধিকর্তা, ডাঃ উইলিয়াম ফেগির মতে, শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটলে জনসংখ্যা কমবে। 'টাস্ক ফোর্স'-এর হিসাব মতে জন্মহার এখনই কমছে। জন্ম ও শিশুমৃত্যু নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। বাবা-মা তাদের শিশুসন্তানের মৃত্যু হলে তার জায়গায় অন্য সন্তান কামনা করে। তাছাড়া বর্ধিত জন্মহার শিশুদের ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ার কারণ ও ফলশ্রুতি উভয়ই। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ডাঃ ফ্রেড সাই এর মতে যেসব শিশু তাদের জ্যেষ্ঠের জন্মের দুই বৎসরের মধ্যে জন্মে, তাদের শৈশবে মৃত্যুর সম্ভাবনা, যারা অনেক পরে জন্মে তাদের তুলনায় দ্বিগুণ হয়। তা ছাড়া পুষ্টির ব্যাপারে পরিবারে জনসংখ্যাও বিবেচ্য বিষয় (বিশেষতঃ আফ্রিকায়, যেখানে মায়েদের গড়ে ছয়-সাত বা আরও বেশি সন্তান)। দেখা গেছে যে সপ্তম সন্তানের মৃত্যুর সম্ভাবনা দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তানের সম্ভাবনার চেয়ে চল্লিশ শতাংশ বেশি। দরিদ্র দেশের মায়েদের ভগ্নস্বাস্থ্যও শিশু মৃত্যুর ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণের দিকটা দেখলেই চলবে না। বৎসরে ৫০ লক্ষ শিশু আন্ত্রিক রোগে (পাতলা দাস্ত হওয়ার জন্য) মারা যায়। স্যানিটারি পায়খানা তৈরি করে এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সজাগ করলে আন্ত্রিক রোগ কমে। তরল দাস্ত হলে বিভিন্ন লবণমিশ্রিত জল (Oral rehydration salts) পান করালে শরীর হতে অপব্যয়িত জলীয় ভাগ প্রত্যর্পিত হয়। এতে থাকে শর্করা এবং সামান্য লবণ (যতটুকু অন্ত্রনালীর দেওয়াল চুঁইয়ে রক্তে প্রবেশ করতে সাহায্য করে)। মুখ দিয়ে পান করিয়ে রক্তের জলীয় ভাগ প্রত্যর্পণ করার ব্যাপারটি সকল জাতীয় সরকারই পছন্দ করেছে। দামে সস্তা এই লবণ অন্য দেশ হতে আমদানি করতে হয় না। এই লবণ চিনি ও ভাতের ফেনের সঙ্গে মিশিয়ে যে-কেউ পানীয় তৈরি করতে পারে। ১৯৮০-তে চার কোটি লবণের প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছিল; ১৯৮৬-তে হয়েছিল ৩০ কোটি প্যাকেট। দরিদ্র দেশের ৬০ শতাংশ লোক এখন এই পানীয় পেয়ে থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার হিসাবে ১৯৮৯-তে এই চিকিৎসায় ১৫ লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষা হবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা টিকা দেওয়ার কর্মসূচীও খুব গুরুত্বসহকারে নিয়েছেন। এর মূল লক্ষ্য, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ শিশুকে বিধ্বংসী ছয়টি রোগ হতে রক্ষা করা। রোগগুলি হল, পলিওমায়েলাইটিস (যা পক্ষাঘাত করে), হাম, ঘুংড়িকাশি, ডিপ্থিরিয়া, যক্ষা, এবং ধনুষ্টংকার। মনে হচ্ছে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সত্তর শতাংশ ফল পাওয়া যাবে। তবে সব দেশে একই ধরনের ফল হবে না। উন্নতশীল চারটি দেশে— চীন, ভারত, নাইজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে ৪৯ শতাংশ শিশু এখনও টিকা দেওয়ার আওতায় পড়েনি। আফ্রিকার অনেক দেশে টিকা দেওয়া সহজ কথা নয়। কারণ সেখানকার অনেক দেশের সরকারের এরূপ করার ক্ষমতা নাই।

আরও কয়েকটি ব্যাপার আছে। কয়েকটি দেশের সরকারের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য, টিকা দেওয়ার প্রাথমিক উদ্যম চলে যায়। তাছাড়া কয়েকটি দেশের (যেমন পাকিস্তানের) নিজেদের প্রয়োজনীয় টিকা তৈরি করার ক্ষমতা থাকলেও অন্য অনেক দেশকে টিকা আমদানি করতে হয়।

মনে রাখা দরকার শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার এই যে বিপ্লব, তা আরম্ভ করতে যেমন বেগ পেতে হয়েছে, এটি চালু রাখতেও সেই রকম বেগ পেতে হবে।

(The Economist 19-25 March '88 pp. 91-92)

সূচীপত্র ॥ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ পৌষ ১৩৯৫

দিব্য বাণী : ☐ ৮০৯

কথাপ্রসঙ্গে : ☐ "আমি মৃত্যুঞ্জয়" ☐ ৮১০

প্রবন্ধ

শ্রীমা সারদাদেবী : বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ☐ নীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৮১৩

দ্বিজেন্দ্রলালের ধর্মচেতনা : জীবনে ও কাব্যে ☐ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ☐ ৮৩০

শতাব্দীর লেখক টি. এস. এলিঅট ☐ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ☐ ৮৩৯

গান্ধী—নেহরু, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা ☐ অমলেশ ত্রিপাঠী ☐ ৮৪১

ধারাবাহিক-নিবন্ধ

কবি সারদা ☐ কবিতা সিংহ ☐ ৮১৮

ভ্রমণ-কাহিনী

ত্রিপুরার তীর্থে ☐ দিলীপকুমার দত্ত ☐ ৮৫০

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

'জিন' পরীক্ষাদ্বারা ভাবী রোগ নির্ণয় ☐ ৮৪৪

স্মৃতিকথা

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের চারটি টুকরো স্মৃতি ☐ স্বামী আত্মস্থানন্দ ☐ ৮২৩

কবিতা

সারদাদেবী-প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্ ☐ শ্যামল সেন ☐ ৮২১ প্রণমি মা ☐ প্রদোষকুমার পাল ☐ ৮২১

বিশ্বনাবিক ☐ সমরেশ মণ্ডল ☐ ৮২১ তোমার কাছে দাঁড়ালে ☐ ব্রহ্মচারী সৈকতেশ ☐ ৮২২

বিবেকানন্দ ☐ নরেশশংকর দাশগুপ্ত ☐ ৮২২ যৌবন ভাঙে নিষ্ঠুর আঙুলে ☐ তরুণ মুখোপাধ্যায় ☐ ৮২২

যে আলোকে প্রাণের প্রদীপ ☐ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ☐ ৮২২

নিয়মিত বিভাগ

মাধুকরী : বিবেকানন্দ জন্মের ১২৫ বছরে উপলব্ধি ☐ গোপাল হালদার ☐ ৮২৪

বাতায়ন : পশ্চিম জার্মানী : অর্থনীতি ও শিল্প ☐ ৮৪৬

আনন্দের সন্তান : "পূর্ণ তিনি মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়" ☐ ৮৪৭

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : বড় বউ ☐ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ☐ ৮৫৩

গ্রন্থ পরিচয় : জ্ঞান-ভক্তি কথা ☐ তারকনাথ ঘোষ ☐ ৮৫৫

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ☐ ৮৫৬ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ☐ ৮৫৭

বিবিধ সংবাদ ☐ ৮৫৮ বিজ্ঞান সংবাদ ☐ ৮৬০

সম্পাদক **স্বামী নির্জরানন্দ** সংযুক্ত সম্পাদক **স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**

৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বার্ষিক সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ত্রিরিশ টাকা ☐ সডাক ছত্রিশ টাকা ☐ আজীবন (৩০ বছর পর নবীকরণ সাপেক্ষ) গ্রাহকমূল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়) : ছশো টাকা

প্রতি সংখ্যা : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি



স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র

উদ্বোধন

৯১তম বর্ষ

মাঘ ১৩৯৫—পৌষ ১৩৯৬ (জানুয়ারি ১৯৮৯—ডিসেম্বর ১৯৮৯)

☐ আগামী মাঘ সংখ্যা থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮-র মধ্যে আপনার নাম ও গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য (সাধারণ গ্রাহকমূল্য : তিরিশ টাকা, সডাক ছত্রিশ টাকা) জমা দিন।

☐ ভি. পি. পোস্টে পত্রিকা পাঠাতে অনুরোধ করবেন না।

☐ অনুগ্রহ করে "Udbodhan Office" এই নামে মনিঅর্ডার/ব্যাঙ্কড্রাফট্ / পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠাবেন। চেক্ পাঠাবেন না। নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত জমা দেওয়া চলে।

☐ বার্ষিক চাঁদার হার : ব্যক্তিগতভাবে কার্যালয়ে এসে পত্রিকা সংগ্রহ করলে—তিরিশ টাকা ;
ডাকযোগে পত্রিকা নিলে—ছত্রিশ টাকা ;
বাংলাদেশ—ষাট টাকা ;
বিদেশের অন্যত্র—{ একশো পঞ্চাশ টাকা [সমুদ্র-ডাক]
তিনশো টাকা [বিমান-ডাক] }

☐ এককালীন ছশো টাকা, অথবা কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা প্রথম কিস্তিতে দিয়ে পরবর্তী এগারো মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক (অনূর্ধ্ব বারোটি) কিস্তিতে বাকি টাকা জমা দিয়ে আজীবন গ্রাহক [৩০ বৎসরান্তে নবীকরণ সাপেক্ষ] হতে পারা যায়। ভারতবর্ষের বাইরে (বাংলাদেশ ছাড়া) থেকে কেউ আজীবন গ্রাহক হলে সমুদ্র-ডাক ও বিমান-ডাক সহ আজীবন গ্রাহকমূল্য যথাক্রমে ৩০০ ও ৫৫০ ডলার (আমেরিকান)।

☐ কার্যালয়ে চাঁদা দেবার সময় : সকাল ৯-৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০
শনিবার সকাল ৯-৩০ থেকে দুপুর ১-৩০ [রবিবার বন্ধ]

ঠিকানা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৩
টেলিফোন : ৫৫-২৪৪৭

১ পৌষ ১৩৯৫
১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮

বিনীত
কার্যাধ্যক্ষ



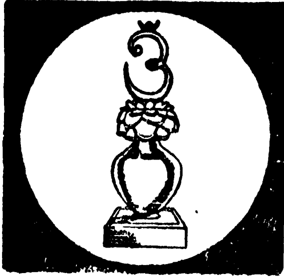
৯০তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা]

পৌষ, ১৩৯৫

দিব্য বাণী

একদিন আমাদের গুরুদেবের দেহান্তের দুঃখময় দিন এসে উপস্থিত হল।… আমাদের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। কয়েকটি "অদ্ভুত" ধারণা পোষণকারী অর্বাচীন তরুণের কথা কে-ই বা শুনবে? অন্ততঃ ভারতবর্ষের তরুণদের কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। মাত্র দ্বাদশজন বালক লোকের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলছে, বলছে যে, তারা সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করতে দৃঢ়সংকল্প। সেকথা শুনে সকলেই উপহাস করত। উপহাস ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করল। আমাদের ওপর রীতিমত অত্যাচার শুরু হল।… তারপর উপস্থিত হল আমাদের সকলের জীবনের এক চরম দুঃসময়; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনে যেন তা নিদারুণ দুর্ভাগ্যের রূপ নিল। একদিকে আমার মা-ভাইয়েরা। আমাদের পিতার সদ্যপ্রয়াণের ফলে আমাদের পরিবারকে তখন চরম দারিদ্র্য এসে গ্রাস করেছে। প্রায় প্রতিদিনই আমাদের অনাহারে থাকতে হত। পরিবারে একমাত্র আমিই ছিলাম আশা-ভরসা—একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমার দুপাশে তখন দুটি জগৎ। একদিকে আমাকে দেখতে হচ্ছিল যে, আমার মা এবং ভাইয়েরা অনাহারে মরণাপন্ন; আর অপরদিকে আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমার গুরুদেবের আদর্শ ভারত এবং সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণকর এবং তার প্রচার এবং বাস্তব রূপায়ণ করতেই হবে। সুতরাং আমার মনের মধ্যে দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই সংগ্রাম চলতে থাকল।… …সে কী হৃদয়-যন্ত্রণা; সেই যন্ত্রণার তীব্রতা ছিল অসহনীয়।… সেদিন আমাকে সহানুভূতি দেখানোর কেউ ছিল না।… শুধু একজন ছাড়া। কেবল সেই একজনের সহানুভূতিই আশীর্বাদ ও আশা বহন করে আনল। তিনি একজন নারী।… আমাদের গুরুদেবের সহধর্মিণী। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসহায়। আমাদের চেয়েও তিনি ছিলেন দরিদ্র।

স্বামী বিবেকানন্দ



কথাপ্রসঙ্গে

"আমি মৃত্যুঞ্জয়"

জগতে সবই বিনশ্বর। কারণ জগতই অনিত্য। আজ যাহা বিদ্যমান, দূরে বা নিকট অতীতে হয়তো তাহার অস্তিত্বই ছিল না, আবার দূরে বা অদূরে ভবিষ্যতেও তাহাকে দেখা যাইবে না। অতীতে যাহা ছিল বর্তমানে হয়তো তাহা আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে থাকিবে না। এই ভবিষ্যতের পরিধি একশো বছর, পাঁচশো বছর, হাজার বছর বা তাহার অধিকও হইতে পারে। অতীত সম্পর্কেও সেই একই কথা। কালের গ্রাসে সবই অবলুপ্ত হইয়া যায়। কালের দ্বারা সবই বাধিত। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ —এই তিন কালে অবাধিত এমন কোন কিছুই জগতে নাই। কাহারও, কোন কিছুরই কালের কবল হইতে অব্যাহতি নাই। 'কাল' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেও তাহা সূচিত হয়। 'কাল' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে 'কল্' ধাতু হইতে। 'কল্' ধাতুর একটি প্রধান অর্থ নাশ করা, ধ্বংস করা, গ্রাস করা। "কলনাৎ সর্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্তিতঃ"—সমস্ত প্রাণীকে যিনি নাশ করেন, গ্রাস করেন তিনিই কাল নামে অভিহিত। গীতাতে (১১।৩২) ভগবান বলিতেছেন ঃ "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ"—আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল।

মৃত্যুতে জীবনের নাশ, প্রাণের ধ্বংস; মৃত্যু সর্বগ্রাসী। তাই মৃত্যুর অপর নাম কাল। মৃত্যু বা কালের অধীন আমরা। মৃত্যুর শক্তি অবিসংবাদী, অমোঘ; তাহার প্রভাব অনতিক্রম্য। ইহা লইয়া কোন বিতর্কের অবকাশ নাই। কাল বা মৃত্যুর প্রভাব বা শক্তি শুধু একজনের কাছে পরাভূত। তিনি ঈশ্বর। তিনি সর্বেশ্বর। তাই কাল বা মৃত্যুরও তিনি ঈশ্বর। তিনি সর্বনিয়ন্তা। তাই কাল মৃত্যুরও নিয়ন্তা। কাল বা মৃত্যুর শক্তিক্ষেত্র, প্রভাবপরিধি জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া আবার জগতের সীমার বাহিরেও যিনি বিতত হইয়া রহিয়াছেন কাল বা মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিবে কেমন করিয়া?

জগতের বাহিরে কাল বা মৃত্যুর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, সেকথা ঠিক। কিন্তু জগৎ-অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষেত্রেও সে তাহার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ। মহাকাল সেখানে অসহায়। সেই ক্ষেত্রটি হইল মহাজনদের ক্ষেত্র। মানুষ কাল বা মৃত্যুর অধীন। মহাজনরাও মানুষ। তাই মহাজনগণের আয়ু সীমিত, তাঁহারাও মরণশীল। কিন্তু মরণশীল শুধু তাঁহাদের দেহ। দেহের তো বিনাশ হইবেই। স্বয়ং ভগবান দেহধারণ করিয়া যখন অবতার হইয়া আসেন তখন তাঁহাকেও মরণ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু দেহের নাশ হইলেও অবতারপুরুষের বিনাশ নাই। কারণ তাঁহার জীবন, তাঁহার বাণী, তাঁহার আদর্শের তো মৃত্যু নাই। কাল হইতে কালান্তরে তাহা বিদ্যমান থাকে। অবতারপুরুষ যে স্বয়ং ঈশ্বর অথবা তাঁহার অংশ—যিনি কাল বা মৃত্যুরও ঈশ্বর। তাই মৃত্যু সেখানে শক্তিহীন। তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের আদর্শ কাল বা সময়ের পরাক্রমের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অবশ্য মহাজনদের মধ্যে 'তর', 'তম' রহিয়াছে। সেই বিচারেই আমরা তাঁহাদের কাহাকে বলি অবতার, কাহাকে বলি অবতারকল্পপুরুষ, কাহাকেও আবার বলি সন্ত-মহাপুরুষ বা সন্ত-সাধক। তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ নিজেদের মধ্যে প্রকটিত করেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা তো শুধু ধর্মের জগতের ক্ষেত্রেই আমাদের বিচারকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। ধর্মের জগতের বাহিরে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী প্রতিভার কি অভাব আছে? নাই, সেকথা সত্য; কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের

কাছে অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার আবেদন ও আকর্ষণ যে বেশি ইহাও সত্য। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। ধর্মের ক্ষেত্র হউক অথবা অন্যত্র হউক, মহাজনদের 'অমরত্বে'র কারণ কি? কারণ ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ। যিনি যত বেশি সেই প্রকাশ নিজের জীবন, কর্ম ও আদর্শের মধ্যে প্রকট করেন তিনি তত কালোত্তীর্ণ।

কিন্তু একটি কথা। এই কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের তালিকায় পুরুষেরই সংখ্যাধিক্য। যে কয়জন নারীর নাম আমরা করিতে পারিব, সংখ্যায় তাঁহারা মোটেই উল্লেখযোগ্য নহেন। এই প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে একজনের কথা বিশেষ করিয়া মনে আসিতেছে। তিনি অবশ্যই একজন নারী; কিন্তু তিনি এমনই একজন যিনি একাই লক্ষ-কোটির সমান। আমরা সারদাদেবীর কথা বলিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার জীবন, তাঁহার কর্ম, তাঁহার আদর্শের মধ্যে অসাধারণত্ব কাহারও দৃষ্টিতে বিশেষ না পড়িতে পারে। কিন্তু সত্য সত্য-ই। সত্য স্বয়ং-প্রকাশ। যতই দিন যাইতেছে ততই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ এই নারী মহান ঐশ্বর্যে মানুষকে ঐশ্বর্যবান করিয়া গিয়াছেন। বটবৃক্ষের বীজ আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়; কিন্তু বীজ হইতে যখন ক্রমে মহীরুহরূপে সে আত্মপ্রকাশ করে তখন আমরা সবিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকি। কিন্তু বীজ হইতেই তো মহীরুহ। তাহার মধ্যে আকস্মিকতা কিছু নাই। গোলাপের নয়নবিমোহন সৌন্দর্যে আমাদের মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু তাহার পশ্চাতে সকলের অলক্ষ্যে অশ্রুতে রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে শিশিরের সে তপস্যা, তাহার কথা আমাদের মনে না থাকিলেও তাহা তো ঘটনা। সারদাদেবীর জীবন, কর্ম ও আদর্শ আজ দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়াইয়া যেভাবে মানুষের মনে আপন প্রভাবে স্পন্দন তুলিতেছে তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইলেও তাহাও ঘটনা। এবং ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।

সারদাদেবী নরদেহ ত্যাগ করিয়াছেন প্রায় সত্তর বছর আগে। তাঁহার তিরোধানের প্রায় সত্তর বছর পরে আমরা দেখিতেছি, যখন তিনি নরদেহে বর্তমান ছিলেন তখন নগণ্য সংখ্যক লোক তাঁহার কথা জানিত, তাঁহার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিত বা তাঁহার কোন বিশেষত্ব আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিত; কিন্তু ক্রমে যতই দিন যাইতেছে ততই মানুষ তাঁহার কথা জানিতে চাহিতেছে, তাঁহার সম্পর্কে আগ্রহী হইতেছে, তাঁহার অসাধারণত্ব মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতেছে। ইহজীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত আক্ষরিকভাবেই তিনি ছিলেন অবগুণ্ঠনবতী। জীবৎকালে তিনি তাঁহার বাহিরের রূপকে জগতের সমক্ষে অপ্রকাশ্য রাখিতে সমর্থ হইলেও, অপ্রকট হইবার পর তাঁহার আন্তর রূপের বেহিসাবী প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। স্বভাবে ব্রীড়াময়ী সারদাদেবী আজ যেন অসহায়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহে বর্তমান থাকিলে আজ তাঁহার অসূর্যম্পশ্যা সহধর্মিণীর 'পর্দা ফাঁক' হইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি যে সবিশেষ উপভোগ করিতেন সেবিষয়ে সন্দেহ নাই এবং 'রামলালের খুড়ী'কে যে তাঁহার নির্দোষ পরিহাসের শিকার হইতে হইত তাহাও অনুমান করিতে পারি।

কিন্তু সারদাদেবী কি করিবেন? ইহাই তো অপরিহার্য ছিল। ঈশ-উপনিষদের সেই মন্ত্রটি মনে পড়িতেছে:

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

—সোনালী আবরণে সত্যের মুখ আড়াল হইয়া আছে। হে বিশ্বপাতা, তুমি তোমার বাহিরের আবরণ উন্মোচন করিয়া দাও যাহাতে তোমার সত্য স্বরূপ আমি দেখিতে পাই।

ঈশ্বরের মাতৃরূপ সারদাদেবী। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাঁহার সেই চিরন্তনী মাতৃরূপ ক্রমেই উন্মোচিত হইয়া যাইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন: "ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই আমার সন্তান"। বাস্তবিকই তাই। সকলকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবৎকালেও কেহই তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া যায় নাই। তিরোধানের পর আরও অনেক বেশি মানুষ তাঁহার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেই আবার তাঁহার পরিচয়ও জানেন না। গত ১৩ ফাল্গুন ১৩৯৪ (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮) ইটালী হইতে এক দম্পতি বাগবাজারে 'উদ্বোধন কার্যালয়ে' আসেন। সঙ্গে

তাঁহাদের তরুণী কন্যা। দম্পতির বয়স চল্লিশের কোঠায়। ভদ্রমহিলার নাম জেম্মা (Gemma), স্বামীর নাম গিউসেপ্পে (Giuseppe), মেয়েটির নাম আগর (Agar)। কিছু বইপত্র কেনার পর জনৈক সন্ন্যাসী তাঁহাদের 'মায়ের বাড়ী'তে লইয়া যান। সন্ন্যাসী মায়ের ঘরের দরজার সামনে ভূমিষ্ট হইয়া মাকে প্রণাম করেন। তাঁহার দেখাদেখি তাঁহারাও ঐভাবে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী দেখিলেন ভদ্রমহিলা প্রণাম করিয়া উঠিয়া মায়ের ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। বেশ কিছুক্ষণ কাটিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন ভদ্রমহিলার দৃষ্টি তখনো মায়ের ছবির দিকে, আর তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

ভদ্রমহিলা সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইলেন। বলিলেন: "কে ইনি?" সন্ন্যাসী এতক্ষণ মায়ের সম্পর্কে কোন কথাই তাঁহাদের বলেন নাই। এখন বলিলেন: "ইনি আমাদের হোলি মাদার। আমরা যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তা যাঁর নামাঙ্কিত—শ্রীরামকৃষ্ণ—ইনি তাঁর পত্নী। আমরা তাঁকে 'মা' বা 'হোলি মাদার' বলি।" মহিলা বলিলেন: "উনি কি এখনো জীবিত?" সন্ন্যাসী বলিলেন: "না, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে উনি দেহরক্ষা করেছেন। উনি এই ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর জীবনের শেষ এগারো বছরের দীর্ঘকাল তিনি এই ঘরেই কাটিয়েছেন।" ভদ্রমহিলা বলিলেন: "কিন্তু আমি এই ঘরের মধ্যে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করছি। মনে হচ্ছে এই ঘর, এই জায়গাটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক স্পন্দনে ভরপুর হয়ে আছে। ওঃ, কত শান্তি, করুণা আর ভালবাসা তাঁর চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ছে। আমার মনে হচ্ছে উনি যেন আমার হৃদয়টাকে শান্তি, করুণা আর ভালবাসায় ধুয়ে দিচ্ছেন।" ("But I feel her living presence in this room. The room, the place—all are surcharged with a deep spiritual vibration, it seems. Oh, how much peace, how much grace and how much love is oozing out of her eyes! I feel—yes I feel—as if she is washing away my heart with peace, grace and love!") মহিলাটি ইংরেজী জানেন না। ইতালীয় ভাষায় উচ্চারিত তাঁহার কথাগুলির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিতেছিলেন তাঁহার স্বামী।

ভদ্রলোক বলিতেছিলেন, গত কয়েকবছর ধরিয়া তাঁহারা প্রতি দুই বছর অন্তর ভারতে আসিতেছেন। ভারতের প্রতি তাঁহারা একটি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করেন। তাঁহাদের মনে হয় ভারত যেন তাঁহাদের আসল মাতৃভূমি। ভারত তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়াছে। মুগ্ধ করিয়াছে ভারতের একটি বিশেষ চরিত্র। তাহা ভারতের গ্রহীষ্ণুতা। ভারত নির্বিচারে সকলকে আপন করিয়া লয়। মহিলাটি তখন তাঁহার স্বামীর কথার পিঠে এই কথাটি যোগ করিয়া দিলেন ইতালীয় ভাষায়: "আমরা বুঝিনি এতদিন—হয়তো ওঁরই (সারদাদেবীর) আকর্ষণেই আমরা বার বার ভারতে আসছি। ভারতের যে আকর্ষণ, ভারতের যে সকলকে আপন করে নেবার চরিত্র তা এখন আমি ওঁর দৃষ্টিতে পাঠ করছি। উনি যেন ভারতের চরিত্রের প্রতীক।" ("We didn't realise it—possibly it was her attraction that prompted us to visit India again and again. I now read in her glance the root of our attraction for India—India's character of making all her own. She represents the very spirit of India, as it were")।

মনে পড়িতেছে সারদাদেবীর অন্তিম অমৃতবার্তা: "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের জন্য রইল।" সেই আশীর্বাদ কত অমোঘ, কিভাবে তাহা অমৃতান্বিত করিয়া চলিয়াছে দেশান্তর ও কালান্তরের মানুষকে ইতালীয় ঐ মহিলাটি তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরের তিনি মানবীরূপ, মাতৃরূপ। তাই সারদাদেবীর জীবন অমৃতনিষ্যন্দী। অনাগত কালে সেই অমৃতধারায় সহস্র সহস্র মানুষ অভিসিঞ্চিত হইবে। যুগের পর যুগ আসিবে, সারদাদেবীর অমৃতজীবন মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়া চলিবে অমৃতলোকের যাত্রাপথে। তাই তো তিনি বলিয়াছিলেন: "আমি মৃত্যুঞ্জয়"।

শ্রীমা সারদাদেবী ঃ বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাসঙ্গিক অর্থ যদি 'বর্তমানে প্রযোজ্যতা' হয়, তবে মহাজীবন সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা নিরর্থক, কেননা, মহাজীবনের আবেদন সর্বকালেই প্রযোজ্য। তবে বর্তমানকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য যেহেতু সংশয়, সেহেতু এই আলোচনা।

শ্রীমা সারদাদেবী একশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে (১৮৫৩ খ্রীঃ ২২ ডিসেম্বর) শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। সেই শক্তি আজ বেলুড় মঠ ও সারদা মঠকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্ব জুড়ে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ব্যাপ্ত করে কাজ করে চলেছে। সেই শক্তি এই বিরাট কর্মযজ্ঞের মূলে তেমনি করেই প্রাণ ও গতি সিঞ্চন করছে যেমন করে নিঃশব্দে ঝরে পড়া শিশিরবিন্দু প্রভাতে গোলাপকে ফুটিয়ে তোলে।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটির পর একটি সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ সব সাধনার উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন একটি সরল কিন্তু বৈপ্লবিক বাণীতে —"যত মত, তত পথ।" এই অবস্থায় শ্রীশ্রীমা উপনীত ঠাকুরের কাছে। মাকে দেখে ঠাকুর খুশি হলেন। বললেন ঃ "এসেছ। বেশ করেছ।" তারপর একান্তে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কিগো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" শ্রীমায়ের তাৎক্ষণিক উত্তরটি আরও বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক ঃ "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? আমি তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" শ্রীমায়ের সমগ্র আচরণ ও জীবনচর্যা এই অঙ্গীকারের প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-সহযোগিতায় আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু আশ্বস্ত কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের সব সাধনায় ইতিপূর্বে সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। তাঁর 'ইষ্টপথে সাহায্য'-এর আর কি প্রয়োজন? প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। একথার উত্তরে ঠাকুরের সুস্মিত মৌনতাই তার প্রমাণ। মায়ের সহযোগিতা-সামর্থ্যকে তিনি স্বীকার করে নিলেন।

"তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি"— এই একটি কথায় প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমায়ের স্বরূপ এবং রামকৃষ্ণ-বেদান্ত আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা। সেইদিন থেকে এই আন্দোলনে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন ও ভবিষ্যতে হবেন, তাঁদের কাছে ব্রহ্ম ও শক্তির মতো শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা অভেদ। স্বামী বিবেকানন্দ আত্মনিবেদন করছেন ঃ "দাস তোমা দোঁহাকার সশক্তিক নমি তব পদে।" আর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং কি বলছেন? তিনি বলছেন ঃ "সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।"

তারপর ঘটল সেই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা যা পৃথিবীর অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে অদ্বিতীয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বসাধনার সমাপ্তিপূজা করলেন। আলিম্পন শোভিত পীঠে শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরাসুন্দরী বা ষোড়শী দেবীর ঘট, পট বা মূর্তির বদলে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বসালেন। মা পূজা দেখতে এসেছিলেন, পূজিতা হতে নয়। ঠাকুর তাঁকে ষোড়শোপচারে পূজা করলেন। পূজা শেষে প্রণাম করে আত্মনিবেদন করলেন, সেইসঙ্গে মায়ের চরণে তাঁর সব সাধনার ফল, জপমালা নিবেদন করে দিলেন।

এই পূজার তাৎপর্য এই যে, দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত পুরী সম্প্রদায়ের—যে সম্প্রদায়ভুক্ত রামকৃষ্ণপন্থী সন্ন্যাসীরা—আদি মঠ শৃঙ্গেরী মঠ। পুরী সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাক্ষী বা ষোড়শী। আচার্য শঙ্কর যে দেবী শ্রীবিদ্যাকে কামাক্ষী নামে কাঞ্চীপুরমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শৃঙ্গেরীতে তিনিই বিরাজমানা শ্রীযন্ত্রে, মঠের অধিষ্ঠাত্রীরূপে। আর তাঁকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীমা সারদাদেবীরূপে জীবন্ত প্রতিমাতে। ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে শ্রীমা যে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন ষোড়শীপূজার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুগামীদের কাছে ও উত্তরকালের কাছে তা জানিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন তাঁর

সঙ্ঘ চিরকাল শ্রীমায়ের শক্তিতে পরিচালিত হবে। দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে ধীরে ধীরে এই তত্ত্ব প্রকাশ পেল। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তা আরও স্পষ্ট হল। আজ তা একেবারে পরিষ্কার। শ্রীশ্রীমায়ের ব্যাকুল প্রার্থনায় বেলুড় মঠ স্থাপিত হল —সাধুদের আধ্যাত্মিক আস্তানা ও ভক্তদের জুড়োবার ঠাঁই। এইভাবে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠ এবং সমগ্রভাবে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত আন্দোলনের চালিকা ও পালিকা শক্তি শ্রীমা। সাধু, ভক্ত, গৃহস্থ সকলের জীবন ও সাধনা তিনি পালন-পোষণ করেন একান্ত স্নেহে-ভালবাসায়-ক্ষমায়-করুণায়। রামকৃষ্ণবেদান্ত সাধনা যে এত সরস, এত আনন্দময়—'স্বাদু পদে পদে'—তার মূলে শ্রীশ্রীমা।

এখন আমাদের প্রশ্ন—বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় শ্রীমায়ের জীবনচর্যা ও বাণী কতখানি প্রাসঙ্গিক? শ্রীমা দেহত্যাগ করেছেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ৬৮ বছর কেটে গেছে। এই ৬৮ বছরে পৃথিবীতে ভয়াবহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে, দেশ স্বাধীন ও খণ্ডিত হয়েছে। বর্তমান আধুনিক জীবন পাশ্চাত্য ভোগবিলাসের একান্ত অনুরাগী, শাশ্বত মূল্যবোধের বাণীগুলি সাময়িক আলোচনার বিষয়বস্তুমাত্র, নৈতিক মূল্যবোধ কমই অবশিষ্ট, বস্তুজগতের চাকচিক্যে চোখ অন্ধ, জাতীয় সংস্কৃতিতে অনীহা, অর্থের মানদণ্ডে মূল্যবিচার, সর্ব বিষয়ে অধোগতি অথচ নির্বোধ সুখে আমরা আত্মবিস্মৃত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আজকের দিনে কতখানি প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা হল অস্থিরতা, উদ্দেশ্যহীনতা। বস্তুজগতের চোখঝলসানো আকর্ষণ আর মনোজগতের বিক্ষিপ্ততায় আমরা আজ দিশেহারা। এ দুয়ের টানাপোড়েনে আমরা সকলেই বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার। মনের সঙ্গে মনে যোগ নেই, জীবনে জীবনে যোগ নেই। ফলে একটা হতাশ অস্থিরতা, একটা সামগ্রিক উদ্দেশ্যহীনতা আমাদের গ্রাস করেছে। বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বহির্জীবনের মান উন্নত করেছে ঠিকই, কিন্তু অন্তর্জীবনের শূন্যতার জন্য ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু মুখে রক্তসঞ্চার তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

এই অবস্থায় ৬৮ বছর আগের এক ৬৭ বছরের গ্রাম্য নারীর সহজ সরল জীবন কি নিশানা দেখাতে পারে? আজকের যুগ যন্ত্রণার প্রতিকার ও এগিয়ে যাবার প্রেরণা মায়ের জীবন থেকে কিভাবে আমরা পেতে পারি? বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বা আধুনিকতার সংজ্ঞা কি? মায়ের জীবনচর্যা কি অর্থে আধুনিক?

জীবনের বিপরীত তরঙ্গগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সেগুলি কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং বিরুদ্ধ পরিবেশে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার নাম যদি আধুনিকতা হয়, তবে শ্রীমায়ের জীবন এক সার্থক সর্বাত্মক আধুনিক জীবন। সংসারকে গ্রহণ করে সংসার উত্তীর্ণ হবার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন মা। ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা বার বার দিতে হয়েছে মাকে এবং প্রত্যেকবারই সসম্মানে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাইদের স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের হিংসা, নলিনী-দিদির শুচিবাই, রাধুর আবদার-অত্যাচার, ছোটমামীর পাগলামি—আরও নানাজনের নানা আচরণ—সব মা আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও তিতিক্ষায় সহ্য করেছেন। মায়ের আর্ষোক্তি—যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যে যেমন তাকে তেমন—প্রতিপদে পালন করে যা দেখিয়ে গেছেন মানিয়ে নেওয়া বা অ্যাডজাস্টমেণ্ট কালে বলে। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের পিঞ্জরে, শ্যামপুকুরের ছোট ভাড়া বাড়িতে, কাশীপুরের বাগানবাড়িতে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর কামারপুকুরে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে, জয়রামবাটীর গ্রাম্য পরিবেশে—সর্বত্রই তাঁর এই নীতির অনুসরণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখছেন, ঠাকুরের জীবন প্রধানতঃ পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে অতিবাহিত হয়েছিল। সুতরাং শত ঝঞ্ঝাটপূর্ণ প্রতিকূল সাংসারিক ক্ষেত্রে মানুষ কিভাবে আত্মস্থ থেকে দিব্য জীবনের আস্বাদ পেতে পারে তার পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বেশি পাই না। শ্রীমায়ের দিনগুলি কিন্তু পারিবারিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর সেই ঘটনাগুলি সাংসারিক দৃষ্টিতে অতি বিরক্তিকর ও ক্লেশদায়ক। অথচ মা তাঁর আচার ব্যবহারে সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আত্মস্থ। মায়ের এই ব্যবহারিক জীবন তো যে-কোনও কালের পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক।

বর্তমানে আমরা সকলেই মুখে প্রগতিবাদী,

অথচ মনে মনে অনেকেই বদ্ধচিত্ত। চিত্তকে যা ছোট করে, দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে, মনকে সংকীর্ণ করে, তা তো প্রগতি হতে পারে না। মায়ের দেখি এক স্বচ্ছ উন্মুক্ত দৃষ্টি, উদার চিত্তলোক, নির্মল অন্তঃকরণ। অন্ধ-কুসংস্কার, জাতপাত, ছুঁৎমার্গ, যুক্তিহীন নির্বোধ দেশাচার ও হৃদয়হীন প্রথার বিরুদ্ধে শ্রীমায়ের ছিল এক সংগ্রামী মনোভাব। মুসলমান আমজাদ যার চুরি-ডাকাতির দুর্নাম ছিল, আর পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাঁর কাছে ছিল এক। তাঁর নিজের মুখের উক্তি "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" এই সমদৃষ্টিতেই জাতপাতের বিরুদ্ধে মার নির্ভীক মত—"আমার ইচ্ছে হয় সবাইকে একপাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতের বড়াই আবার আছে।" মায়ের উদারতা ছিল আকাশের নির্মল আলোর মতো, বাতাসের স্বচ্ছন্দ গতির মতো। নিবেদিতা ও অন্যান্য বিদেশিনীদের সঙ্গে সেই যুগে তাঁর একসঙ্গে থাকা, খাওয়া চূড়ান্ত উদারতার নিদর্শন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই যাঁর জীবন-সত্য ছিল, সেই মা নিত্যকার পূজার আগে ঠাকুরের জন্য উদ্দিষ্ট নৈবেদ্য একটি ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের নিত্যভোগের এক বাটি দুধ পূজার আগেই অসুস্থ সেবকের হাতে তুলে দিয়েছেন "তোমার ভেতরেও ঠাকুর আছেন" এই বলে। কোয়ালপাড়া আশ্রমের ছেলেদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য শনি-মঙ্গলবার ঠাকুরকে সেদ্ধ চালের ভাত ও মাছ ভোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বালবিধবা ক্ষীরোদবালা, শবাসনাদেবী ও সরযূবালাদেবীকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে নিষেধ করে শরীরের যত্ন নেবার জন্য খাওয়া দাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরকম অজস্র ঘটনা ছিল মায়ের জীবনে নিত্যকার ব্যাপার। যা ছিল আজকের আধুনিক জীবনের তুলনায় অনেক ধাপ এগোনো।

তারপর, আজকের দিনের নারীমুক্তির ভাবনা তখনকার দিনেই মা অভিনব আধুনিক মন নিয়ে করেছেন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, স্বাবলম্বী হবে, স্বাধীন মতামত রাখবে—এ ছিল মায়ের দ্বিধাহীন মত। এক মহিলার কয়েকটি মেয়ে, বিয়ে দিতে পারছেন না, তাই চিন্তিত। মা স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন : "বে দিতে পারছ না, ভাবনার কি আছে? নিবেদিতা স্কুলে রেখে দাও লেখাপড়া শিখবে।" রাধুর বিবাহ নিয়ে মার কোন তাড়া ছিল না। বরং অল্প বয়সে বিবাহের বিরোধী ছিলেন তিনি। বলতেন : "আমাদের দেশে ছোটকাল থেকে মেয়েদের 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।' আজ যদি রাধুর বিয়ে না হতো, কেমন লেখাপড়া শিখত" ইত্যাদি। এখন 'Women's Lib' নিয়ে কত হৈ চৈ, আস্ফালন। কিন্তু নারীমুক্তির যথার্থ অর্থ আত্ম-মর্যাদাবোধ, মুক্তচিন্তা, স্বাবলম্বিতা, স্বাধীন মতামত, দৃঢ়তা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, নির্ভীকতা,—পুরুষের অনুকরণ নয়—এ সত্য মার জীবনে, আচরণে, মতামতে সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের মেয়েদের চিরকালের আদর্শ সম্বন্ধে শেষ কথা শ্রীশ্রীমা—একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

শুধু নারীমুক্তি নয়, মানবতাবোধ, বিশ্বৈক্যবোধ, এবং সর্বোপরি এক সার্বিক ভালবাসা ও মাতৃত্ব—এ ছিল মায়ের অন্তরের বোধ। ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর যেমন ছিল তীব্র প্রতিবাদ, আবার সন্তানজ্ঞানে তাদের প্রতি আপনবোধও ছিল তাঁর মর্মকথা—"তারাও তো আমারই ছেলে। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।" শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী সকলেরই তিনি মা, সকলের মধ্যেই তিনি—একথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ ও কথা-বার্তার মধ্যে প্রমাণিত। বিশ্বমাতৃত্ববোধ ছিল মায়ের স্বাভাবিক চেতনা, চেষ্টাকৃত বা আরোপিত নয়। শ্রীমায়ের মনে মনে সর্বদাই জপ চলত। শেষ বয়সেও দুর্বল শরীরে রাত্রে নিদ্রাহীনভাবে জপ চলত। মা বলতেন : "ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, আগ্রহ করে তখন দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত, নিয়মিত কেন, কেউবা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমার দেখতে হবে তো। তাই জপ করি আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো। এ সংসারে বড় দুঃখ-কষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়।'" অপর একজন ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর কিছু করতে হবে না, তাঁর জন্য তিনিই (শ্রীমাই) করছেন। ভক্তটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন সকলের জন্য তিনি জপ করেন কিনা বা

জপের সময় সকলের কথা মনে পড়ে কিনা। শ্রীমা বলেছিলেন, "যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি 'ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই করো।'" এই হচ্ছেন আমাদের মা, সন্তানগতপ্রাণা মা। মহাপ্রয়াণের আগের দিন যে শেষ বাণী তিনি রেখে যাচ্ছেন, তা মানবতাবোধ ও বিশ্বৈক্যবোধের চূড়ান্ত কথা: "যদি শান্তি চাও, কারুর দোষ দেখ না। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।" একি অদ্বৈতবোধেরও বাণী নয়? শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদের এর চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে?

কিন্তু এত কথার পরও একটা প্রশ্ন ভেতরে ভেতরে থেকে যায়,—মা কেন এসেছিলেন? ঠাকুর এসেছিলেন গীতোক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। স্বামীজী এসেছিলেন দেবশিশুরূপে ঠাকুরের আহ্বানে সপ্তর্ষিলোক থেকে। কিন্তু মা? হয়তো পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী হিসাবে। কিন্তু তাহলে মায়ের অবতরণ হেতু-সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। কিন্তু, অদ্বৈতে দুই স্বরূপ এক, আশ্রয়-আশ্রিত নয়। তবে মায়ের আগমনের হেতু? আহ্বানে যিনি আসেন, তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু সন্তানের দুঃখে কাতর মা নন। যেহেতু জগতের মা, সেইহেতু ব্যথা-বেদনা সন্তানের মনোময় কোষে ফোটার আগেই তিনি অতিমানসে অনুভব করেন। সন্তানের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা, যার প্রতিকারের জন্য কোন বাঙ্ময় প্রার্থনা পর্যন্ত নিরুচ্চার, মা সেই ব্যথার অহৈতুকী, প্রতিকার, মাতৃত্বের গরজে নেমে আসা করুণার প্রস্রবণ। যেন জীবনসমুদ্রে ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ-এর মধ্যে হঠাৎ ওঠা একটা মহা-জীবনের প্রবল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ, যা মূর্ত হবার জন্য বহু আগে থেকে চলে অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম কারণরূপে প্রস্তুতি, এবং তারপর তা ভেঙ্গে পড়লেও বহুক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে সমুদ্রবক্ষে তার কম্পনের প্রভাব বা রেশ। আমাদের ক্ষুদ্র-তরঙ্গ জীবনগুলি তাতে হয় উদ্বুদ্ধ, পায় গতি, অবশেষে বিলীন হয়ে যায় কালসমুদ্রে। ঠিক এইভাবে মায়ের সঙ্গেও সন্তানের নিত্য যোগ—"যেন জাতানি জীবন্তি"।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, শ্রীমা ই প্রথম নারীমূর্তিতে ব্রহ্মশক্তির অবতরণ। হিন্দুশাস্ত্রের নরলীলায় সব অবতারই পুরুষদেহধারী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছাপিয়ে গেলেন সব শাস্ত্রের সীমা। প্রতিষ্ঠা দিলেন নারীশক্তিকে অবতারশক্তিরূপে। স্বামীজী এ সত্য মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন বলেই বারংবার বলেছেন, নারীশক্তির জাগরণ ভিন্ন দেশ ও জাতির কোন আশা নেই। স্বামীজী লিখছেন: "মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি 'কো রাম?' দাদা, ঐ যে বলছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।" শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে দেশে নারীশক্তি জাগবে, এই ছিল স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বামী প্রেমানন্দজীও এক চিঠিতে লিখছেন: "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু মার?—বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। একি মহাশক্তি!!... যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, সব মার নিকট চালান করে দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! আমাদের কথা কি বলছিস, স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে!"

এইভাবে মাতৃমূর্তিতে ভগবদ্‌শক্তির আবির্ভাব না হলে অধ্যাত্মজগতে এক অপূরণীয় অভাব থেকে যেত। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, স্নেহে ভালবাসায় বড় করে তোলেন। সাধন-ক্ষেত্রে সাধক তাই ঈশ্বরকে মা রূপে পেতে চায়। স্বামীজী বলেছেন: "জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ কেবল এই অবস্থাতেই মানুষ চরম নিঃস্বার্থপরতা আয়ত্ত করতে ও কার্যে প্রকাশ করতে পারে।" সাধক চায়, তার সমস্ত অক্ষমতা দুর্বলতা ভুলে গিয়ে তার ইষ্ট তাকে

পরিপূর্ণ ভালবাসায় ক্ষমায় কোলে টেনে নেবেন, তাহলেই সে নিশ্চিন্ত। শিশুকালে যে মাতৃবক্ষ তার একমাত্র আশ্রয় ছিল, সাধনার ক্ষেত্রেও তা-ই তার কাম্য। এবং এক্ষেত্রে মায়ের সস্নেহ আশ্বাসই আমাদের ভরসা—"আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর, এটা সর্বদা স্মরণ রেখ যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন। ঠাকুরকে ডাক। আমি রইলুম। ভয় কি?" ইহলোকসর্বস্ব ভোগবাদী মানুষকে তার আপন স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্রহ্মশক্তির মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। মায়ের আবির্ভাবের এই মর্মার্থ ঠাকুর অবগত ছিলেন বলেই তাঁর 'ইষ্টপথে সাহায্য' করার কথায় ঠাকুর আশ্বস্ত হয়েছিলেন। এ কোন কল্পনা বা অনুমান নয়, এটাই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি।

একজন ভক্ত একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর আগে চলে গেলেন কেন?" মা উত্তরে বলেছিলেন: "বাবা, জানতো, ঠাকুরের জগতে প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য এবার আমাকে রেখে গেছেন।"

আবার এই মাতৃভাবে 'সদার্দ্রচিত্তা', 'পরমার্তি-হন্ত্রী' রূপের পাশাপাশি যে 'দুর্বৃত্ত-বৃত্তশমনং' রূপও আছে। সে-সম্বন্ধে দুর্বিনীত হৃদয়কে সাবধান করে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"ওরে হৃদে, (নিজের দেহ দেখিয়ে) একে তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) কখনও এমন কথা বলিসনি। এর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।"

কাশীপুরে থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মাকে বলেছিলেন: "দেখ, কোলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" শ্রীমা উত্তরে বলেছিলেন: "আমি মেয়েমানুষ, তা কি করে হবে?" ঠাকুর নিজেকে দেখিয়ে ভাবের ঘোরেই বলে যেতে লাগলেন: "এ আর কি করেছে, তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি করতে হবে।"

শ্রীমা বলেছেন, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তাঁরও দেহত্যাগের ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন: "না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে।" মা বলছেন: "শেষে দেখলুম, তাই তো অনেক কাজ বাকি আছে।" সে কার কাজ? কিসের কাজ? সে মায়েরই কাজ, সন্তানের আর্তি চিরকাল ধরে ঘুচাবার কাজ। এটাই মায়ের ঠাকুরকে 'ইষ্টপথে সাহায্য' করা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মায়ের এই পরিপূরক ভূমিকার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণাবতার।

শ্রীমায়ের জীবনদর্শনে তাই দেখি, ধর্মসাধন, কর্মসাধন, সংসারজীবন—সবকিছু এক আশ্চর্য সমন্বয়ে বিধৃত, এবং এইরূপ সর্বব্যাপক সমন্বয়ই যথার্থ আধুনিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা। যে অনন্ত চৈতন্যশক্তি একদা স্নেহে-ভালবাসায়-ক্ষমায়-করুণায় উদ্বেলিত মাতৃত্বের এক জমাট ভাবরূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা কালান্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো খণ্ড চেতনার মর্মমূলে নিরন্তর কল্যাণস্পর্শে অভিসিক্ত করে চলেছে, আর উন্মুখ হয়ে আছে অনাগতের জন্য। তাঁর এই উন্মুখতা, এই অভিসিঞ্চন দেশকাল ছাপিয়ে চিরন্তন।

বৃহৎ বনস্পতি যেমন ছায়াদান করে, তাপহরণ করে, ভূমিক্ষয় রোধ করে, ক্ষুদ্র উদ্ভিদের আশ্রয়স্থল হয়, তেমনি নীলকণ্ঠের মতো কার্বনডাইঅক্সাইড ধারণ করে মানুষের প্রাণবায়ু অক্সিজেন সরবরাহ করে। তার প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন আসে না। মহা-জীবনও তেমনি ক্ষুদ্রজীবনকে ক্লেদমুক্ত করে, উজ্জীবিত করে। চিরকাল ধরে একাজ চলতে থাকে। তাই সর্বলোকের পক্ষে তা প্রাসঙ্গিক। শ্রীশ্রীমা "ভারতের প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি" শুধু নন, "নবীন আদর্শের অগ্রদূত"-ও—সর্বকালে, সর্বযুগে।

কবি সারদা

কবিতা সিংহ

[পূর্বানুবৃত্তি : অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ সংখ্যার পর]

আজ থেকে একশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাংলার ছোট্ট একটি গ্রামে সারদার জন্ম। তাঁর পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু কন্যাসন্তানটি মানুষ করেছিলেন পরমযত্নে। দুঃখ এবং অভাব, আকাল এবং খরার জীবন সারদা স্বচক্ষে দেখেছেন। আজ থেকে একশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে নারী প্রগতি থেকে কত কত দূরে ছিল তা আজ আমরা ভাবতেও পারি না। তখন সতীদাহ এক গৌরবের ঘটনা ছিল। পাঁচ-সাত বছরে বালিকার বিবাহ না হলে তা-ই অস্বাভাবিক ব্যাপার হতো। জয়রামবাটী থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতা আসতে তিন দিন সময় লাগত। প্লীহা সারানোর জন্য আগুনের ছ্যাঁকা ছিল অতি স্বাভাবিক। তারকেশ্বরের হত্যা দেওয়াকেও মানুষ প্রবলভাবে বিশ্বাস করত। সেই পটভূমিকে পিছনে রেখে সারদা বলছেন : "পঞ্চতপাটপা এসব মেয়েলী—যেমন ব্রত সব করে না ?" পঞ্চতপা হল চারপাশে আগুনের বেড়া রেখে তার মধ্যে সারাদিন কাটানো। এভাবে নির্দিষ্ট কয়েকদিন। সারদা 'পঞ্চতপা' অবশ্য নিজেও করেছিলেন। পঞ্চতপার মতো ব্রত বা স্ত্রীআচার একেবারেই মেয়েলী ব্যাপার, এ-জ্ঞান যেমন সারদার ছিল, ঠিক তেমনই আবার সারদা বলছেন : "ভক্তের কোন জাত নেই।" জাতের বড়াই তিনি ভেঙেছেন। আবার সারদা লোকাচারও মেনেছেন। কিন্তু একথা জেনেই মেনেছেন যে, সমাজে থাকতে হলে সব সময় বিরোধ করা চলে না।

সারদা ছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নারী। এই অভাব-অনটনের পৃথিবীতে দাঁড়িয়েই তিনি কবি হয়েছেন। অবশ্যই সারদার বেশির ভাগ কবিতা আধ্যাত্মিক। যদিও আধ্যাত্মিক নয়, কেবল নিছকই কিছু কবিতাও এই সংকলনের অন্তর্গত হয়েছে।

কবির দর্শন কখনো কখনো প্রতীকী হয়, অলৌকিকও হয়। সেই দর্শনের দু-একটি বিন্দু

একটু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করছি। বেশ কয়েক বছর আগে একবার বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। আমি এবং আমার একজন বান্ধবী মন্দির দেখে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ সামনে দেখলাম এক প্রবীণ সাধুকে। আমাদের সামনে সামনে, আপন মনে হাসতে হাসতে চলেছেন সন্ন্যাসী। ধীরে ধীরে যেন একটি শিশুর মতো সন্ন্যাসী সারদামন্দিরে এসে দাঁড়ালেন। আমরাও সন্ন্যাসীর পিছন পিছন তাঁর অলক্ষ্যে এসে দাঁড়ালাম। শুনলাম সন্ন্যাসী সারদার সুন্দর মূল্যবান শাড়িসজ্জিত ফটোগ্রাফটির দিকে তাকিয়ে হাসছেন আর বলছেন : "আহা! কি সুখেই আছো মা, মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, পরনে নতুন শাড়ি! আর তখন তো দুটো ছেঁড়া কাপড় সম্বল ছিল!" এমনি আন্তরিক কথা বলার ভঙ্গিতেই রামময় মহারাজ ধরা পড়ে গেলেন। ইনিই তাহলে মায়ের সেই বালক সেবক ?

আমরা প্রণাম করে বললাম : "আপনি নিশ্চয় রামময় মহারাজ! মায়ের কথা বলুন একটু!"

হেসে বললেন : "কি আর বলব, দুটো ছেঁড়া শাড়িও জুড়ে জুড়ে পরেছেন কখনো কখনো! কত কষ্ট করেছেন!" এই ছিলেন সারদা। সার দানকারিণী। তিনি সার দিতে এসেছিলেন। নিতে আসেননি কিছুই। এমন কি দীক্ষাদানের সময়ে কখনো কখনো গুরুদক্ষিণাটুকুও তিনি তুলে দিয়েছেন শিষ্যের হাতে। গঙ্গাস্নানে গিয়ে সারদা ফল দান করছেন এক পাণ্ডাকে। ফল দান করে কি বললেন সারদা ? ফলটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে তিনি বললেন : "ফল আমি দিলুম বটে, কিন্তু দানের ফল তোমার!" আমরা এই সারদাকে ধরতে চেয়েছি সম্পূর্ণতঃ কবি হিসাবে। সারদা কবিতা লেখেননি ; তাঁরই মুখের কথা দিয়ে তাঁর কবিতাবলী আমি সাজিয়েছি। কেবল 'ঠাকুর' শব্দটির জায়গায় 'তিনি' শব্দটি আমি ব্যবহার করেছি।

কখনো কখনো কোন কোন কবিতায় টল টল করে উঠবে। হয়তো সারদার যা প্রধানভাব, মাতৃভাব, তারও কিছু চিহ্ন উঁকি দেবে। কিন্তু আমাদের নিবেদনে কবিতাই হবে প্রধান লক্ষ্য।

কবিতা নিবেদনের কারণে কখনো হয়তো ছোটখাটো উল্লেখের প্রয়োজন হবে। সেখানে থাকবে ঘটনার উল্লেখমাত্র, কিংবা পরিস্থিতির। কিন্তু কখনই ব্যাখ্যা নয়। কারণ সারদাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সূর্যকে সূর্যই ব্যাখ্যা করতে পারে, জোনাকী নয়।

সংকলন শুরু করার আগে ভগিনী নিবেদিতার লেখনী-নিঃসৃত একটি রচনা উপস্থাপিত করছি। এটি আসলে একটি চিঠি। কিন্তু শুধু কি চিঠি? এটি সারদাকে উৎসর্গ করা একটি সহস্রদল কবিতা-কমল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সারদার আদরের 'খুকি' ভগিনী নিবেদিতা সারদাকে আমেরিকা থেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ১৯১০-এর ১১ ডিসেম্বর ভোরবেলা তিনি গীর্জায় গিয়েছিলেন সারা বুলের জন্য প্রার্থনা করতে। সারা বুল তখন মৃত্যু শয্যায়। নিবেদিতার এই চিঠিকে কবিতার আকারে নিবেদন করে নাম রেখেছি—'অমল নীরবতা'।

অমল নীরবতা

আমার আদরিণী মা আমার
আজ সকালে,
খুব সকালে গির্জায় গিয়েছিলাম
গিয়েছিলাম সারার জন্য প্রার্থনা করতে।
সেখানে
সকলেই যীশু জননী মা মেরীকে চিন্তা করছিলেন
কিন্তু
আমার মনে হঠাৎ তোমার চিন্তা এল
তোমার সেই প্রিয় মুখখানি
তোমার হাতের সেই বালা দুগাছি
তোমার স্নেহ-টলটল দৃষ্টি
তোমার শুভ্র শাড়িখানি—
এ সবই যেন আমার চোখের সামনে।
আমি কি ভাবছিলুম জানো মা?
ভাবছিলুম
সন্ধ্যারতির সময়
আমি কত নির্বোধের মতো
তোমার ঘরে বসে
ধ্যান করবার চেষ্টা করেছি।

কেন আমি তখন বুঝতে পারিনি
যে তোমার চরণ তলে
একটি ছোট শিশুর মতো থাকলেই
যথেষ্ট হতো।

প্রিয় মা,
ভালবাসায় ভরা তুমি,
সে ভালবাসা
আমাদের এই জগতের মতো
উদ্দাম উত্তেজনায় ভরা নয়,
সে ভালবাসা
শুধু শান্ত এক শান্তি—
সে শান্তিতে সকলের কল্যাণ,
সে শান্তিতে কারো অমঙ্গল কামনা নেই।
এ এক দিব্য-বিকিরণ
ক্রীড়া আর কৌতুকে মাখা।
প্রিয়তম মা,
আমার ইচ্ছা হয়
তোমার কাছে
একটি সুন্দর বন্দনা-সঙ্গীত,
একটি প্রার্থনা স্তোত্র পাঠাই।
কিন্তু তা-ও
মনে হয়
বড় উচ্চধ্বনি, বড় কোলাহলময় হয়ে উঠবে।

সত্যিই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি,
তোমার কাছে আমাদের উপস্থিতি হওয়া উচিত
প্রশান্ত নীরবতায়।
ঈশ্বরের সমস্ত বিস্ময়কর সৃজনই নীরব।
তা নীরবে সকলের অলক্ষ্যে
আমাদের জীবনে প্রবেশ করে।
বাতাস, সূর্যকিরণ, উদ্যান আর গঙ্গার সৌন্দর্য-
এই নীরব সৃজনগুলি
সব তোমারই মতো।

সত্যিই তাই। এই নীরব নিসর্গের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মতোই সারদা। নিরলঙ্কার লজ্জা-পটাবৃতা। সকলের চোখের সামনে সে আপনার ঐশ্বর্যদ্বয়ার উম্মুক্ত করে না। অনুসন্ধানী চোখ তাঁকে খুঁজে ফেরে।

নিবেদিতা তাঁকে দেখেছিলেন। তাই শান্তি পেয়েছিলেন।

নিবেদিতাকে দিয়ে এমন মর্মস্পর্শী কবিতা যিনি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবার সেই সারদার কবিতাবলীর উপস্থাপনে আমরা অগ্রসর হব।

॥ ২ ॥

ছেলেবেলা

ছেলেবেলা গলাসমান জলে নেমে
গরুর জন্যে দলঘাস কেটেছি।
আমি রাঁধতুম বাবা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিতেন।*

ক্ষেতে মুনিষদের জন্য
মুড়ি নিয়ে যেতুম।

এক বছর পঙ্গপাল সব ধান কেটেছিল
ক্ষেতে ক্ষেতে
সেই ধান কুড়িয়েছি।

ক্ষেত থেকে তুলো এনে **
কত পৈতে কেটেছি।

ভাইদের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যেতুম
আমোদর নদই ছিল আমাদের গঙ্গা।
ছেলেবেলা ঘড়া নিয়ে
একটু আধটু সাঁতার কেটেছি।

আকাল

একবার কি দুর্ভিক্ষই লাগল
কত লোক যে না খেতে পেয়ে চলে আসত
আমাদের আগের বছরের ধান মরাই বাঁধা ছিল।

বাবা সেই ধানের চাল দিয়ে
কড়ায়ের ডাল দিয়ে
হাঁড়ি হাঁড়ি খিঁচুড়ি—
রাঁধিয়ে রাখতেন।

এক একদিন এমন হতো এত লোক এসে পড়ত
যে কুলোত না
আবার চড়াতে হতো।

আর সেই গরম গরম খিচুড়ি—
শিগগির জুড়োবে বলে
আমি দুহাতে বাতাস করতুম।
আহা,
ক্ষিদের জ্বালায় সকলে
খাবার জন্য বসে আছে।

একদিন একটি মেয়ে এসেছে—
মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে
তেলের অভাবে, চোখ উম্মাদের মতো।

এসেই গরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজানো ছিল
তা-ই খেতে আরম্ভ করলে।

এত বলছি খিচুড়ি আছে দিচ্ছি
তার আর ধৈর্য মানছে না।

খিদের জ্বালা কি কম ?
খানিকটা কুঁড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল
এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

[ক্রমশঃ]

* মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই সারদাকে ভাত রাঁধতে হতো। সারদা বড় হাঁড়ি ছোট ছোট হাতে নামাতে পারতেন না। তাই বাবাকে হাঁড়ি নামাবার জন্য ডাকতেন।

** শিশু অবস্থায় তাঁর মা তাঁকে কার্পাস তুলোর ক্ষেতের ধারে শুইয়ে, তুলো চয়ন করতেন।

সারদাদেব্যাঃস্মরণস্তোত্রম্

শ্যামল সেন

প্রাতঃস্মরামি জননীং জগতাং বরেণ্যাং
যস্যাশ্চরিতমপরং ন হি ধ্যানগম্যম্ ।
যস্যাঃ পদারবিন্দং হি যোগিভিরগম্যং
তাং সারদামমরাভ্যাং সহ রামকৃষ্ণম্ ॥

প্রাতর্ভজামি বরদাং ভবরোগধাত্রীং
ভক্তিং প্রযচ্ছ বরদে শরণাগতান্ বৈ ।
মাতঃ প্রসাদমমৃতং হৃদয়ে বিষিঞ্চ্য
পৃথ্ব্যা মঘাদিদলনং কুরু দেবি নিত্যম্ ॥

প্রাতর্নমামি বিমলাং জগদীশ্বরীং বৈ
লজ্জাপটাভরণ-ভূষিতামম্লানাং তাম্ ।
সন্তানপালনমিচ্ছাময়ীং হি পূজ্যাং
মুক্তিং বিধাত্রীং জননীং প্রণতেষু মাতঃ ॥

শ্লোকত্রয়মিদং ভক্ত্যা প্রাতর্নিত্যং পঠন্তি যে ।
সারদায়াঃ কৃপাং লব্ধ্বা কৃতকৃত্যা ভবন্তি তে ॥

বিশ্বনাবিক

সমরেশ মণ্ডল

যে নাবিক দক্ষতায় কালের রাখাল
তার পথের পাশে অনাবশ্যক
মাইল স্টোনের মতো বছরের হিসাব ।

পাথরের গা থেকে নক্ষত্রের আলো
গলে পড়ার মতোই সীমাহীন নৈঃশব্দ্য
প্রতিদিন মহান করে চলেছে বিশ্বনাবিককে ।

এসো আজ নূতন করে আলোর ভিতরে
পাখির গানে, গ্রামীণ পর্ণকুটিরে জেগে উঠি
শ্রমে ফুটে উঠুক ফুল, স্বেদে স্বাস্থ্যের সৌরভ
দুটি ডানার বিস্তারে উড়ে যাক
চোখের কোণ থেকে যত অলস অলীক প্রজাপতি ।

যে নাবিক দক্ষতায় সীমাহীন আলোকদিশারী
এসো তার সুদীর্ঘ পালে
শান্তি ও শ্রমের হাওয়া-বেগ তুলে
ছুটাই আরো তড়িৎ-তরণী ।

প্রণমি মা

প্রদোষকুমার পাল

শিশুর প্রথম ডাক যে মা
মানবের গুরু যে রে মা
তার সেবাতেই পাবিরে মা
বিপদের মুখে আসিবে মা

দুঃখ হরিবে ভজনে মা
পবিত্র হবিরে স্মরণে মা
সংসার মাঝে রয়েছে মা
একমনে তুই সাধরে মা

মনের সুখেতে ডাকরে মা
ডাকার মতো ডাকিলে মা
নাগাল পাবিরে ধরিতে মা
ধ্যানেতে জ্ঞানেতে স্বপনে মা

মধুর শোনায় ডাকিতে মা
কোমল রূপটি দেখায় মা
অমৃতসুধা বিলায় মা
চাঁদের হাসিতে শোভিছে মা
স্নেহময়ী সে যে জননী মা

অপার তোমার মহিমা মা
তোমারই অভয়ে না ডরি মা
সবার উর্ধ্বে তুমি আছ মা
ধরাতে এসেছ তুমি শ্রীমা
তোমার চরণে প্রণমি মা ।

তোমার কাছে দাঁড়ালে

[স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদিত]

ব্রহ্মচারী সৈকতেশ

তোমার কাছে দাঁড়াবে বলে
রাত্রিকে উপেক্ষা করেছে হেলায়।
অলীক আলপনা মুছে গেলে
পরিচিত প্রাক্-মধ্যাহ্ন বেলায়—
বৃক্ষদল মাথা তুলে
জীবনের উত্তরণের খেলায়
সবুজ পাতা মেলে
ধরেছে সূর্যকে।
শৌর্যকে বর্ম করে বাঁধবে বলে
বর্শাকে তুচ্ছ করেছে হেলায়।
ভয়ের মুখোশ ছিঁড়ে গেলে
সম্বলহীন নিঃসঙ্গ বেলায়—
অমিত বীর্য মুখ তুলে
বেদনার রক্তাভ খেলায়
আনন্দ-পাত্র মেলে
ধরেছে আত্মাকে।
তোমার কাছে দাঁড়ালে
আড়ালে থাকে না কিছু,
শৌর্যের বর্ম বেঁধে দাঁড়ালে
সরালেই যাবে পাহাড়
নিচু মাথা থাকে না নিচু।

যৌবন ভাঙে নিষ্ঠুর আঙুলে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী হয়েছে স্মৃতি তোমার অভাবে—
শূন্যতা ঘোচে না তবু। প্রত্যহের দেনা
বেড়ে ওঠে। কানে বাজে সুমোহন বাঁশি
রাখালিয়া সুরে, ব্যপ্ত করে দশ দিক।
একদিন তুমি ছিলে হায়, সত্য কত
সেই হাসি, যুঁই ফুল, সুবঙ্কিম দৃষ্টিপাত
বড় চেনা ছিল, আজ স্মৃতির আকার—
অদূরে সুদূরে তবু তোমার আহ্বান
শুনি, কাঁদি একা; চীনে বাদামের মতো
আমার যৌবন ভাঙে নিষ্ঠুর আঙুলে।

বিবেকানন্দ

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

যত বারই মানুষ থেমে যায়
তুমি হাত ধরে তুলে ধরো।

বনস্পতির মতো ঋজু হতে তুমি শেখাও;
শেখাও প্রেম, মানবিকতার গান।

কুয়াশার ঘোর তবু এখনও থেকে গেছে,
থেকে যায়;
অন্ধকারের ছিন্নলীলা অপ্রতিহত
নুব্জ দিন ঠেলে চাপা কান্না ভেসে আসে,
কান পাতো;

যত বারই মানুষ থেমে যায়
থেমে গেছে
তুমি হাত ধরে তুলে ধরো;
আবার হাত ধরো ভারতবর্ষের,
শেখাও প্রেম, মানবিকতার গান।

যে আলোকে প্রাণের প্রদীপ

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

[স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি]

পদ্মে এত আগুন জ্বলতে পারে
শুচি শুভ্র নিগূঢ় এক আগুন
কোরক জুড়ে কিন্তু ভালবাসা
বুকের মধ্যে চাকের মতো ক্ষরে।
বুকের ওপর হাত রেখেছেন যেন—
ব্যথার মধ্যে পরম চন্দ্রোদয়
ভালবাসার এমন গহন বেগ
জ্ঞান-কর্ম-সত্তা বিভাব পাবে।
এ জ্ঞান কর্ম কী দিয়ে যে গড়া
হাত ছোঁয়াতেই আপন হয়ে ওঠে
যেমন করে সন্ধ্যাদীপখানি
নিজের হাতে লাবণ্যময় জ্বালাই।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের চারটি টুকরো স্মৃতি

স্বামী আত্মস্থানন্দ

পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ছিলেন শ্রীমায়ের সন্তান। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ তিনি। তাঁর স্নেহধন্য আমি। তাঁর ভালবাসা পেয়েছি অনেক। তাঁর কিছু সেবা করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। এক সময় আমার মন যখন খুব খারাপ, তখন তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন আমায়, আবার সময়মত শাসনও করেছেন আমাকে।

বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের সম্বন্ধে আমি এখানে চারটি কথা বলব।

(১) বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে প্রায়ই বলতে শুনতাম একটি কথা: "আগে রামকৃষ্ণ পরে মিশন। রামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে মিশনের কোন অর্থ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে মিশনকে চলতে হবে।"

(২) আমি তখন রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে। কাজে একবার কলকাতা এসেছি। রাঁচিতে 'বাঘা' বলে আমাদের একটি কুকুর ছিল। অনেকদিন বাইরে থাকার পর বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজকে নিয়ে রাঁচিতে ফিরেছি। গিয়ে দেখি বাঘা বেশ রোগা হয়ে গেছে। মহারাজ জানতে চাইলেন বাঘার রোগা হবার কারণ। তখন বললুম: "আমি ছিলাম না। আমার খাবারের ভাগ থেকে সন্দেশ, দুধ, ভাত ইত্যাদি দিতুম। আমি নেই বলে কেউ হয়তো দেয়নি"। শুনে মহারাজজী ক্ষুণ্ণ হলেন। সব সাধু-ব্রহ্মচারীদের বললেন: "তোমরা এতজন রয়েছ এখানে। একটা প্রাণীর একটু খাওয়া জোটে না! কেউ একটু দুধ দিতে পারলে না!" তারপর দেখি, যতদিন তিনি ছিলেন স্যানেটোরিয়ামে মহারাজ তাঁর সন্দেশটা বাঘাকে রোজ দিতেন। আর বাঘাও রোজ ঠিক সময়ে হাজির হয়ে মহারাজের কাছ থেকে সন্দেশটি নিয়ে মুখ নিচু করে আনন্দে লাফাতে লাফাতে ফিরে যেত দেখেছি, বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের বাঘার প্রতি প্রীতি। এই প্রীতি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল।

(৩) পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ একটি ঝোল খেতেন। তাতে তেল, ঝাল ও মশলা কিছু থাকত না। স্বাদহীন ঝোল। এটিকে তিনি বলতেন 'নিরাকার ঝোল।' তিনি এই 'নিরাকার ঝোল' অম্লান বদনে খেতেন।

(৪) আমি তখন পূজনীয় বিরজানন্দজী মহারাজের সেবা করি। মঠেই আছি। বিরজানন্দজী মহারাজ থাকতেন মঠ বাড়িতে, যে-ঘরে পূজনীয় সুধীর মহারাজ—নির্বাণানন্দজী মহারাজ থাকতেন। বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ঐ বাড়িতেই থাকতেন পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরে (স্বামীজীর ঘর এবং এখন যেখানে পূজনীয় ভরত মহারাজ থাকেন তার পাশের ছোট ঘরটিতে)। বিরজানন্দজী মহারাজের সেবা করার ফলে একদম সময় পেতুম না শ্রীঠাকুরের মন্দিরে বসে জপ-ধ্যান করতে বা সন্ধ্যা আরতিতে যোগ দিতে। মনটা ভীষণ খারাপ। পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজীকে মনের কথা বলেই ফেললুম একদিন। পূজনীয় মহারাজ যে-উত্তর দিলেন আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে। "কালীঘাটের গঙ্গা দেখেছিস?" তিনি বললেন। "হ্যাঁ, যা নোংরা, চান করা যায় না। কোনমতে একটা ডুব দিয়ে উপরে উঠে আসতে হয়।" —উত্তর দিলুম আমি। "ঠিক ঐ রকমই যো সো করে সব করে নিতে হবে, ডুব দিতে হবে"—বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ বললেন।



মাধুকরী

বিবেকানন্দ জন্মের ১২৫ বছরে উপলব্ধি

গোপাল হালদার

যদিও 'বিবেকানন্দ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী' তবু তাঁকে '…জাতীয় চেতনার এবং মানবমাহাত্ম্যের নানা দিকের প্রেরণার উৎসরূপেই বিশেষ নিকটতম' বলে অনুভব করেছেন প্রবীণ মার্কসবাদী পণ্ডিত গোপাল হালদার তাঁর 'বিবেকানন্দ —জন্মের ১২৫ বছরে উপলব্ধি' নিবন্ধে।

স্বামী বিবেকানন্দের একশ পঁচিশ বৎসরের জন্মজয়ন্তী এ-সময়ে (১৯৮৭-১৯৮৮) অনেকখানে পালিত হচ্ছে। শুধু তাঁর স্বদেশে নয়, পৃথিবীর প্রধান সভ্যদেশেরও অনেক কেন্দ্রে। অবশ্য সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং জীবনদর্শনকে নিজ-নিজ দৃষ্টি, শ্রদ্ধা এবং আদর্শ অনুযায়ী যথাশক্তি প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, মানুষের রুচি যেমন বিভিন্ন, দৃষ্টিশক্তিও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেমনি বিভিন্নভাবে নিবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। সকলের শ্রদ্ধা এবং আদর্শের মধ্যে একটা মিল থাকলেও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতি তা আকৃষ্ট হবে, তাতে কিছু না কিছু পার্থক্যও প্রকাশিত হবে। বোধহয় কোন জীবন্ত বা মহৎ মানুষের জীবন শুধু একভাবে দেখা চলে না। কতকটা তাঁদের প্রতিভার নানামুখী বিকাশের আর মহত্ত্বের নানারূপ বিস্তারের কারণেই সেই একই মানুষ এরূপ সত্যের নানা রূপের আদর্শস্থানীয় হন। নানা দৃষ্টিপক্ষ থেকে যতই দেখা হোক, সত্যের প্রকাশকেন্দ্র যে তাঁর একই জীবন—তাও সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করি। এই কথা মনে রেখেই আমি আমার দৃষ্টিতে বিবেকানন্দকে প্রধানতঃ যে-রূপে দেখেছি, এবং যে-ভাবে কিছু না কিছু উপলব্ধি করে থাকব, বিবেকানন্দের প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধি তা না-ও হতে পারে, স্বীকার করি। যাঁরা বিশেষ রকমের স্বামী বিবেকানন্দকে জীবনের প্রধানতম আলোকবর্তিকারূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে এক অধ্যাত্ম প্রেরণারূপে জীবনে যাঁরা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট এবং সক্ষম—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে পারি—আমার অনুভূত বিবেকানন্দ প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক আলোকস্তম্ভ নন; পার্থিব জ্ঞান কর্ম আর জাতীয় চেতনার এবং মানবমাহাত্ম্যের নানা দিকের প্রেরণার উৎসরূপেই তাঁকে বিশেষ নিকটতম বলে অনুভব করেছি। যদিও জানি, বিবেকানন্দ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসী।…

আমরা স্বামীজীকে প্রত্যক্ষ দেখিনি, কিংবা তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত নই, আর তাই হয়তো বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদের সম্পূর্ণতা অনুধাবনে অসমর্থ হই। আমরা অনেকেই তাঁকে জানি প্রধানতঃ তাঁর লেখা আর বক্তৃতা পড়ে; সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই কতকাংশে জানি তাঁর ভক্তদের কথা, লেখা এবং তাঁদের জীবন আর সাধনা দেখে। সেসবে সহজ মানবধর্মের একটা নির্মল স্পর্শ আমরা অনুভব করি। তবু আমরা অনেকেই সাধারণ মানুষ,—বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর নানা সমস্যায় বিজড়িত মানুষ; আবার বাংলাদেশেরও এই শতাব্দীর আধুনিক মানুষ। আধুনিক কালের প্রধান এবং বিরাট ভয়ংকর যে রূপ আজ পৃথিবীর মানুষকে মথিত, আলোড়িত করছে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেক সময়ে সকলকেই ভয়ে কম্পিত করে তুলছে, সে রূপকে আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। আবার সেই বিভীষিকা সত্ত্বেও পৃথিবীর আশ্চর্য রূপ আর মানুষের মহৎ চিন্তা-ভাবনা-তপস্যা, জ্ঞান-ভাবনা-

কর্মশক্তি, মানুষের আত্ম-বিচারের উজ্জ্বলতা মানুষ হিসেবে একেক বার উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। এই অদ্ভুত কালের একেকটি আশ্চর্য মহৎ প্রতিশ্রুতিও সেইরূপ সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করেছে—আমাদেরও করে। শতাব্দীর প্রারম্ভকাল আমাদের জীবনেরও প্রারম্ভকাল। বিবেকানন্দকে জীবনের সেই প্রথম পর্বেই যুগনায়ক হিসেবে দেখেছি। শতাব্দীর প্রতিশ্রুতি যেন তাঁর জীবনে শোনা গিয়েছিল। শতাব্দী অবশ্য এগিয়ে যায়, যুগ থেকে যুগান্তরে ইতিহাসের নতুন আয়োজনে পৃথিবী বার বার পরিবর্তিত হতে থাকে। নতুন কালের নতুন পর্বে নতুন যুগে অতীতের ঐতিহ্য নতুন রকমে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের প্রেরণা জোগায়। কখনো-বা একেবারে নতুন চেতনায় ভাবনায় অনুভূতিতে মানুষকে একটু না একটু পরিবর্তিত করে, চলন্ত যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। কাজেই সেই শতাব্দীর প্রভাতে যে রূপকে আমরা দেখেছি, শতাব্দীর সন্ধ্যায় তাকে আমরা এই অদ্ভুত শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় নতুন করে উপলব্ধি করি, নতুন কালের মধ্যে তার গহনতর জীবনসত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। অন্তত তাই স্বাভাবিক এবং সমুচিত—যদি আমাদের সে-শক্তি থাকে। বিবেকানন্দকেও যদি এ শতাব্দীর শেষের দৃষ্টিতে আমরা নতুন করে গ্রহণ করতে চাই, এবং আমাদের চেষ্টার মধ্যে কোন ফাঁকি না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই বলব হয়তো শতাব্দীশেষের এই মূল্যায়নও প্রয়োজনীয়। মিথ্যা না হলে অনুধাবনযোগ্য।

আমরা যখন প্রথম বিবেকানন্দকে পাই—তিনি অবশ্য তার পূর্বেই ধরাধাম ত্যাগ করে গিয়েছেন—তখন স্বদেশী আগুনে বাংলা উজ্জ্বল। সে আগুনে জাতীয় স্বাধীনতার একটা বৈপ্লবিক প্রেরণা ক্রমেই (১৯০৮ থেকে) জ্বলতে থাকে। আমরা বালকেরা না বুঝেও তখন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সেসময়ে বিবেকানন্দের বক্তৃতা, সদ্য-লেখা পড়ে তাঁকে আমাদের মনে হয়েছিল জাতীয় যুগনায়ক—সম্মুখে স্বাধীনতার যুগ, তিনিই তার নায়ক। তিনিই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে জাতির সত্যিকারের যা প্রয়োজন, ইতিহাসের নতুন চেতনা—যা শুধু ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন নয়—সে-সম্বন্ধেও জাগ্রত হতে বলেন। আমরা যেমন তাঁর লেখা থেকে একদিকে কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি বর্জন করার নির্দেশ পেলাম, স্বদেশী যুগের উদ্বোধনী বাণী পেলাম, অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর মানুষের সমারব্ধ কর্মযজ্ঞের এবং ভাবনার আদর্শের আহ্বান শুনলাম। শুনলাম আধুনিক কালের ডাক। বুঝলাম, এই আধুনিক কালের জীবন-মন্ত্র না গ্রহণ করলে আমাদের জাতি, সমাজ পঙ্গু হয়ে থাকবে। আমাদের এক কালের গৌরবের ঐতিহ্য মিথ্যা হয়ে যাবে। আমাদের দেশ আর জাতি পৃথিবীর মহৎ জাতিদের সঙ্গে সম-উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে না। বলা বাহুল্য, স্বামীজী তাঁর আধ্যাত্মিক আদর্শ আর অদ্বৈতবাদের আলোকে সেই সমাগত ভবিষ্যৎকেও মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর করবার কথাও বিশেষরূপেই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তথাপি আমরা তাঁকে জেনেছি প্রধানতঃ আমাদের নতুন কালের যুগনায়ক-রূপে, অতীত ভারতের মহৎ প্রবক্তারূপে, এবং আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষা আর আলোকে জাতীয় আদর্শের পথনির্দেশক হিসেবে। সামাজিক কুসংস্কারের অন্ধকারমুক্ত নতুন সমাজের উদ্বোধক হিসেবে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ধনী-দরিদ্র, শূদ্র-ব্রাহ্মণ—সকল ভারতবাসীর সমানাধিকারের প্রবক্তা হিসেবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি ভেদোত্তীর্ণ প্রাণবান নতুন জীবনের উদ্বোধক হিসেবে। সময়টা বৈপ্লবিক চেতনায় তখন চঞ্চল। সেই মুহূর্তে, মর্ত্যদেহে না হলেও, বিবেকানন্দ বিপ্লবাদর্শের মন্ত্রণাদাতা রূপেই আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই আলোকেই আমরা জানতাম, আমরা বুঝতাম, তাঁর মঠ আর মিশনের যে-সাধনা, তা নিশ্চয়ই ভগবৎচেতনায় উদ্বুদ্ধ ; কিন্তু সমরূপেই পশ্চাৎপদ জাতির, সমাজের দুর্ভাগ্য দরিদ্র নরনারীর শিক্ষার, শক্তিচর্চার, নবজাগরণের সংকল্পিত পন্থা—শুধুমাত্র ব্যক্তির অধ্যাত্ম-মুক্তির বা সাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শন স্বামীজীর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর বক্তৃতা, লেখা, প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশন—সবই একটা মুমূর্ষু জাতির বাস্তব, সামাজিক, আর্থিক, এককথায় সর্বাঙ্গীণ আত্মগঠনের ভিত্তিরচনা। হতভাগ্য এই জাতিকে, সকল দেশের মানবাত্মাকে সার্থক করে

তোলাই যেন বিবেকানন্দের আদর্শ। আমরা কৈশোরের চোখ খুলে দেখলাম—সে-যুগে (১৯০১-২০) বন্যায়, দুর্ভিক্ষে সাধারণভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় অসহায় সাধারণ নরনারীর জীবনকে সাহসে সম্মানে শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতেই বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশনের স্বামীজীদের চেষ্টা।

বিবেকানন্দের স্বল্প আয়ুর মধ্যে দশ বৎসরও ব্যাপ্ত ছিল না তাঁর কর্মজীবন। অর্থাৎ ১৮৯৩-এ শিকাগো, ধর্মসম্মেলনে সে-কর্মকাণ্ডময় জীবন প্রকটিত হল, আর ১৯০২-এ মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর আপনার প্রাণমন্ত্র বিশ্বের কাছে, বিশেষ করে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে অর্পণ করে তা সমাধি লাভ করেছে। তা বাংলার '১৯০৫'-এর স্বদেশীতে আপন প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। সত্য বটে, হিন্দুধর্মের উদার সত্যের পুনরুদ্ধার, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়াস এবং জাতির পুনর্জাগ্রত মর্যাদা ছিল তার একটি উপাদান। বিশেষ করে সংগ্রামময় প্রাণশক্তি, ডায়নামিক, মিলিটানট সাধনা অভিভূত করেছিল তখনকার সকল বাঙালীকে (কতকটা ভারতবাসীকেও)। বাঙালী স্বাদেশিকতা এইবার যেন নতুন তেজ, নতুন সাহস এবং সংকল্পের তাপে অনুরঞ্জিত হয়েছিল। অবশ্য তা তথাকথিত অদ্বৈতসাধনার অধ্যাত্ম রঙ ততটা নয়—বাঙালীর মন রাঙা হয়ে উঠেছিল বিবেকানন্দের ক্ষাত্র-বীর্যময় জাতীয়তার দানে, জাতীয় স্বাধীনতার সংকল্পে। সেই চোখেই বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মিশন এবং বিবেকানন্দ-প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণসাধনা এবং অদ্বৈত-বাদী প্রচারকেও আমরা দেখেছি। মনে করতে চেয়েছি—তা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সহায়ক; বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সাধনায় আমাদের রাজ-নৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা, এক শান্ত প্রাণদায়িনী সুস্থিরতা।

বাহ্যতঃ রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার কোন সম্পর্ক নেই, তবু অন্তরে-অন্তরে তখনকার বিপ্লবী ওরূপ অধ্যাত্মপ্রেরণার দ্বারা উজ্জীবিত এবং সঞ্জীবিত হত। সেদিনের বিপ্লবীরা আজ আর নেই, তবে তাঁদের স্মৃতি এখনও আছে। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাধারণ ইতিহাস অনেকেই জানেন; তাঁরা জানেন সেদিনের (১৯০৫-২৫) বিপ্লবীরা অনেকেই ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তায় অনুপ্রাণিত, বৈপ্লবিক কর্মে উদ্বুদ্ধ। কেউ-বা তাঁরা বিপ্লবকর্ম থেকে অধ্যাত্মপ্রেরণার বশে ধর্মপথে, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণও করেন। যাঁরা ১৯২০ পর্যন্ত বাংলার বৈপ্লবিক ধারার ইতিহাস লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা মনে-মনে অনুভব করেন লর্ড রোনাল্ডসের তৎকালীন (১৯১৬ ?) এই উক্তি একেবারে মিথ্যা বা অকারণ নয় যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে সেকালের বিপ্লবীরা আশ্রয় বা প্রশ্রয় পেয়েছেন।* উক্তিটাতে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন খুবই সংগত কারণেই আপত্তি জানিয়েছিলেন। সে আপত্তিও মিথ্যা নয়—তাঁদের সংগঠনের উদ্দেশ্য পলিটিক্যাল নয়। কিন্তু বিবেকানন্দের মৃত্যুর একপক্ষকালের মধ্যেই স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতা কেন মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন, তা আজ আর কারো অজানা নেই। মৃত্যুর পূর্বে বিবেকানন্দও জানতেন ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লব-উদ্দেশ্যে নিবেদিতা, এবং বিবেকানন্দ মঠ আর মিশনকে বৈপ্লবিক বা অবৈপ্ল-বিক কোন পলিটিকসেরই কেন্দ্র হিসেবে স্থাপন করেননি। বিবেকানন্দের সেই প্রতিষ্ঠান কোন কালে কার্যতঃ পলিটিকসের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হতেও চায়নি—চায় না, এটা খুবই সত্য। যেমন বিবেকা-নন্দের সমস্ত বাণী আর জীবন এক অর্থে পলিটিকস-নিরপেক্ষ—মঠ-মিশনও তেমনি তার অনুরূপ। কিন্তু প্রত্যেক মহৎ স্বাধীনতাকামী এবং প্রকৃত স্বদেশানুরাগীই পলিটিকসকে শুধু বিলাতি ধারার শাসনক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, কিংবা ক্ষমতাপ্রয়াসী পার্টিদের সংগ্রামক্ষেত্র বলে মনে করেন না। তাঁরা জানেন, পরাধীন দেশের পক্ষে, পলিটিকসের অর্থ জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা, মানুষের জীবনের প্রধানতম এক সাধনা। সেই সাধনার মধ্যে জাতির সমস্ত সৎ প্রয়াসের বীজ লুক্কায়িত থাকে, বৈপ্লবিক প্রেরণায় তাই ক্রমশঃ স্ফূর্ত হয়। বিবেকানন্দের সাধনাতেও জাতির সমস্ত সৎ প্রয়াসই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে—তাই তার এত মহত্ত্ব। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিদ্যানুরাগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, লোকসেবা—জনজাগরণের সহায়ক

* উক্তিটি করেছিলেন লর্ড কারমাইকেল—সংযুক্ত সম্পাদক

সকল প্রচেষ্টা পলিটিকস-বর্জিত আধ্যাত্মিক ভাবনায় এবং বাস্তব কর্মধারায় কোন-না-কোন ভাবে অঙ্কুরিত হয়। তাই তাঁকে বিপ্লবী না ভেবে বিদেশী শাসকদের উপায় কী? এই দৃষ্টিতেই বিবেকানন্দকে দেশে-বিদেশে বহু জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল অন্যজাতীয় মহৎ পুরুষ, ভারতীয় বিপ্লববাদের প্রধান এক উৎস বলে মনে করেছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করতে গেলেও শেষ হবে না। কারণ ভবিষ্যতেও এই পৃথিবীর সুধী-সমাজ যখন স্থির দৃষ্টিতে ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্ম এবং প্রসারের কথা লক্ষ্য করবেন, তাঁরাও এই অভিমতকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন। আর স্বাধীনতার পরে বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানই বর্তমান 'স্বাধীন ভারত'-এর পলিটিক্যাল কর্ণধারদের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—অবশ্য এখন স্বাধীনতার যুগে জাতীয় জীবনের পলিটিক্যাল বা নন-পলিটিক্যাল কোন সত্যকারের জনসেবার আয়োজন থেকে দূরে সরে থাকার প্রয়োজনও নেই। আসলে, বিবেকানন্দের সত্যিকারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সাধকদের সেরূপ জাতীয় চেতনার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা রক্ষণের জন্য ব্যস্ত হওয়ার কারণই বা কী—যদি তাঁরা নিজেদের সাধনা বিস্মৃত হয়ে পলিটিকসের দলাদলিতে আত্মবিস্মৃত না হন?

বিবেকানন্দের জীবিতকালে ভারতের পলিটিকসের অর্থ ছিল আবেদন আর নিবেদনের থালা বহন—কোন আত্মমর্যাদাবান পুরুষ সেই সঙ্কীর্ণ অর্থের এবং কর্মের রাজনীতি কি কোন দিনই গ্রহণ করতে পারেন? বিবেকানন্দ ঐরূপ পলিটিকসে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট ছিলেন না। আর সমগ্রভাবে দেখলে বলতেই হবে যে, মূলতঃ বিবেকানন্দ ভারতের তৎকালীন জীবনক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ অর্থে প্রকৃত প্রাণবান, পেট্রিয়ট, ডাইনামিক, মিলিটানট, নির্ভীক জীবনযাত্রার জীবন্ত বিগ্রহ।—সমগ্র জীবনকে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বে উদ্বোধনের সত্যদ্রষ্টা। তাই-ই বিবেকানন্দের জীবনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

একবার গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা তা বুঝি। বুঝি—ইতিহাসের মধ্যে বিবেকানন্দের উত্থানের আয়োজন সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই চলছিল। রামমোহন রায়, কলকাতায় হিন্দু কলেজের মারফত আধুনিক জ্ঞানের উন্মোধন, এবং আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, ডিরোজিও বা ইয়ং ইনডিয়ান দল, এমন-কি ১৮৫৭-র অকালবোধন, বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, হিন্দুমেলা বা জাতীয়মেলা, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা আর ক্রমস্ফুরিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দাবি উত্থাপন (নিশ্চয়ই তা 'আবেদন আর নিবেদনের থালা' বয়ে নতশিরে ক্ষমতার কাঙালপনা)—সুদীর্ঘ উনবিংশ শতাব্দীর এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি চলছিল। নরেন্দ্র দত্তের পরিবার-পরিবেশ ছিল তার দ্বারা প্রভাবিত। সেই শতাব্দীর অস্ফুট প্রেরণাকে কর্মে উজ্জীবিত করে তোলা ছিল ইতিহাসের প্রয়োজন—সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সকলে মিলে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে দৃঢ় কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করা। চোখের অগোচরে যে চেষ্টা চলেছিল, উনবিংশ শতাব্দীরই শেষপাদ লক্ষ্য করলেই তা এখন আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ একই কালে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিম ছিলেন সে-প্রকাশের পূর্বাভাস। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিবেকানন্দ আপন কর্ম সমাপ্ত করে তিরোহিত হন। সমগ্র ইতিহাসের দিক থেকে দেখি, তারই মধ্যে অগ্রগতির প্রথম দীপ্ত শিখা জ্বালিয়ে যান। আমাদের পরম সৌভাগ্য, সে-দীপশিখায় নব-নব প্রদীপ জ্বালাবার মতো লোকের অভাব তখনকার বাংলায় হয়নি। স্বদেশী যুগে তৎকালীন বাঙালী নেতাদের কথা—অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, বহু নমস্যদের কথা উল্লেখ করা এখন নিষ্প্রয়োজন। তবু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনে রাখা যে, বিবেকানন্দেরই সমকালীন পুরুষ রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন দীর্ঘদিন (১৯৪১),—আরব্ধ জাতীয় প্রয়াসকে সর্বরকমে—জ্ঞানে, কর্মে, প্রেমে—বিবেকানন্দের অনুগামী নয়, সহগামী রূপে, বাঙালীর এবং ভারতীয় সাধনার প্রদীপকে রবীন্দ্রনাথ দীপান্বিতায় পরিণত করে যান। আর সাহিত্যে সংস্কৃতিতে অধ্যাত্ম-প্রতিষ্ঠা ঘটল জাতির। অন্য প্রান্ত থেকে আর-এক উজ্জ্বল শিখা নিয়ে এগিয়ে আসেন (১৯২০-র আগেই) গান্ধীজী। তারপর থেকেই জাগরণের এই প্রভাত আর বাংলায় সীমাবদ্ধ

নয়, সমস্ত ভারত সমুজ্জ্বল। কিন্তু তখন (আনুমানিক ১৯২০) থেকেই একদিকে বিবেকানন্দের শিখা ক্রমশঃ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাংলা ছাড়িয়ে ভারতের নানা প্রান্তে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক—সমস্ত পবিত্র প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের সম্পদ হয়ে গেল। অন্যদিকে বিবেকানন্দ-ভক্তরা রাজনীতি-সৃষ্ট সেই জনজাগরণে কতকটা গৌণ হয়ে পড়তে থাকেন। একজন ছিলেন বিবেকানন্দের বাণীর সেবক—সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৪৭-এ ইতিহাসের একটা পর্ব শেষ হয়েছে ধরতে পারি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার যে পর্বটি ইতিহাসে দেখা দেয়, ১৯১৭-তে সে পর্বটি শেষ হয়ে একটা নতুন পর্ব আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরও অনেক দেশে তাকে স্বাগত করার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও কিছু। সাধারণভাবে বলা যায়, দেখা দেয় মহাযুদ্ধেরই ফল—পিপলস ওয়র-এর শেষে পিপলস লিবারেশন ন্যাশনাল লিবারেশন পিরিয়ড, সাম্রাজ্যবাদের অবসান করে জাতিসমুদয়ের স্বাধীনতা লাভের পর্ব। কোথাও তা এগিয়ে গেছে, কোথাও তত এগিয়ে যেতে পারেনি; কিন্তু অগ্রগতি চলেছে। জাতীয় স্বাধীনতা ক্রমশঃ জনগণতন্ত্রের রূপ নিয়ে উত্থিত হয়।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ থেকে আমরা বলি স্বাধীনতার যুগের আরম্ভ—যে যুগের প্রস্তুতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছিল আমরা দেখেছি, এবং বিবেকানন্দের বাণীতে তা একটা বিরাট প্রেরণারূপে বাংলা থেকে ভারতবর্ষে ছড়াতে থাকে। লক্ষণীয়—১৯৪৭-এ যে 'স্বাধীনতা' আমরা পেয়েছি তা জনগণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নয়, বিবেকানন্দের চিন্তিত বা সংকল্পিত স্বাধীনতা নয়। তিনি চাইতেন ভারতীয় ঐক্য এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। ভারতের সকল ভেদ-বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে মহাজাতিক যে ঐক্য গড়ে উঠেছে (ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি), ভারত ইতিহাসের ধারার যেটি মূল চরিত্র, সে ইতিহাসধারা পালটে দিয়ে ১৯৪৭-এ খণ্ডিত ভারত রচিত হল—এ কি বিবেকানন্দ চাইতেন? সকল ধর্মাশ্রয়ী ভেদ (বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ), বর্ণগত ভেদ, জাতি-উপজাতিগত ভেদ, এমনকি ভাষার নামে বিচ্ছিন্নতা—বর্তমান ভারতের এইসব ভেদকে বিবেকানন্দ কি চাইতেন? সমস্ত তুচ্ছ ভেদকে বৃহত্তর ভারতীয় চেতনার মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে গড়ে উঠবে ভারতীয় সংহতি (ইউনিটি ইন ইনটিগ্রিটি)—এই ছিল তাঁর অনুভূতি। এইসব পার্থক্যকে (ডাইভারসিটি) মিলিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এক ভারতবর্ষ, যার মধ্যে ভারতীয় সকল জাতির আত্মশাসন মিলিত ভারতের স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। পুরনো ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যকে আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান আর কর্মযজ্ঞের (টেক্‌নোলজি) মধ্যে প্রাণবন্ত করে রূপায়িত করবে—এই না ছিল বিবেকানন্দের আদর্শ? (তাঁর অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে মেলানো এই অভিমতকে 'বিবেকানন্দ-ইডিওলজি' বা 'বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ' বলতে পারি।) সেই বিবেকানন্দ-উদ্দিষ্ট ভাবাদর্শের কতটুকু ১৯৪৭-এ আমরা 'ক্ষমতা হস্তার্পণে'র সূত্রে 'ভারতে' পেয়েছিলাম? আর সেদিনকার সেই আত্মবঞ্চনার ফলে আজ ভারতে সর্বব্যাপী যে কুৎসিত ভেদ আর ক্লীবত্বের কর্দমে আমরা ডুবে যাচ্ছি—এই কি বিবেকানন্দের সহনীয় হত? অর্থাৎ একথা মানতেই হবে, বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অন্ততঃ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম।

বিবেকানন্দের তিরোধানের পরেও তাঁর প্রেরণা সত্যই তবু—অনেক বৎসর—অন্তত ১৯০৫ থেকে ১৯২৫-৩০ পর্যন্ত, আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাণ-সঞ্চার করত। ১৯৪০-এর পূর্বেই তা আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। কিন্তু কেন? সত্যই তা বিবেকানন্দের দোষ নয়। প্রথমতঃ, কালের নিয়মে সকল আদর্শই নব-নব প্রেরণার দ্বারা পরিপুষ্ট না হলে জীবন্ত থাকে না। একমাত্র সুভাষচন্দ্র ছাড়া বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন কয়জন নেতা? বিবেকানন্দের আদর্শ বলতে পারি '৪০-এর পর থেকে (বিশেষতঃ হিন্দু এবং মুসলমানের বিরোধিতায়) ১৯৪৭-এ এসে মৌখিক একটা ফাঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা অবশ্য বিবেকানন্দের নামে সভা-সমিতি, মূর্তিস্থাপন প্রভৃতি অনেক অনেক জিনিস আগের থেকে বেশি করছি। বিবেকানন্দের ভক্ত-সংখ্যা, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠও এখন অনেক। কিন্তু তাঁর ভাবাদর্শকে কালোপযোগী জীবনদানে বিশেষ

চেষ্টা করছি, তা বলতে পারি না। তবু জিজ্ঞাস্য —এ সবটাই কি আমাদের আত্মপ্রতারণা, কিংবা বিবেকানন্দকে ফাঁকি দেওয়া ?

একবার গভীরভাবে অনুধাবন করলে বুঝতে পারি : ইতিহাসের ঐতিহাসিক সাধনার অগ্রদূত হিসেবে বিবেকানন্দ সেই সাধনাকে স্থিরভাবে এগিয়ে দেবার মতো সময়, সুযোগ এবং আয়ু পাননি। বিংশ শতাব্দীতেই ইতিহাস বাংলাদেশে স্বদেশীয় যুগ নিয়ে এলেও ১৯১৭-র পরে যখন আমাদের স্বাধীনতার কর্মধারায়, ভাবনায় ভারতবর্ষের নানা মনস্বীর এবং কর্মবীরদের দানও এসে আমাদের জাতীয় চেতনাকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিতে চাইল, তখন আমরা যুগের সে আহ্বানে কান দিতে পারিনি। তখন দুটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল—স্বাধীনতার নতুন ধারণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল : শুধু উচ্চবর্গের ক্ষমতা-হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আয়ত্ত হয় না। জনশক্তির শাসনক্ষমতা আয়ত্ত না হলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় না। তার অর্থ, শুধু ডেমোক্রেসি বা রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, পুরোপুরি আর্থিক সামাজিক সর্বাঙ্গীণ সমাজশাসনের ক্ষমতা সমাজের সৃষ্টিশীল কর্মীশ্রেণীর হাতে না থাকলে, সমাজ-পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা শোষিত শ্রেণীর লাভ না হলে, জাতি আপনাকে বিকশিত করে তুলবার সুযোগ পায় না। আধুনিক সভ্যতাও শোষক শ্রেণীর কবলমুক্ত হয় না। বিবেকানন্দ একথা জানতেন না, তা নয়। এখানে তাঁর বাক্য উদ্ধৃত করে লাভ নেই, স্মরণ করাই যথেষ্ট। যথা, "আই অ্যাম এ সোস্যালিস্ট", "পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণের শাসন শেষ হয়েছে, বৈশ্যের রাজত্ব চলেছে, ভবিষ্যতে শূদ্রই হবেন শাসক।" এই মর্মের কথা নানা ভাবে, নানা ভাষায়, কখনো ভারতের কথা উল্লেখ করে, কখনো অন্যদেশের কথাপ্রসঙ্গে বলে, বিবেকানন্দ আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি প্রকাশ করেছেন, আর আমাদের পশ্চাৎপদ চেতনাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে চেয়েছেন।···

কাল তো থেমে থাকে না, ইতিহাসে যুগের পর যুগান্তর আসে। বিবেকানন্দ একটা যুগান্তরের শেষে যতদূর পেরেছেন ভাবীযুগকে দেখেছেন, কিন্তু ১৯১৭ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নতুন যুগ (যাকে তিনি মনে করেছিলেন শূদ্রের যুগ) যে সত্যই শোষকশ্রেণীর দাবি নিয়ে উদ্ভূত হবে, তা সম্পূর্ণ তাঁর অগোচর হওয়ার কথা নয়। অবতারের পরেও যেমন অবতার আসে, নতুন অবতারের দরকার হয় (ভক্তদের মতে), বিবেকানন্দের পরেও কাল এগিয়ে যাবে আরও আরও নতুন কালের দিকে। পূর্ণতর ভাবাদর্শ দাবি করে, এ ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকে নিয়ে, তাকে পূর্ণতর করবার দাবিও মনে হয় দেখা দেবে। যাঁরা বিবেকানন্দের সত্যিকারের অনুগামী, তাঁদেরও তাই চলতে হবে বিবেকানন্দকে নিয়েই—বিবেকানন্দের স্পিরিটকে নিয়ে, সীমা ছাড়িয়ে। এই দাবিটা ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে বিবেকানন্দেরই দাবি বিবেকানন্দের অনুগত ভক্ত, মঠ আর মিশনের ঐকান্তিক সাধক-কর্মীসমাজের কাছে। যা বিবেকানন্দ বলেছেন, মুখ্য বা গৌণ, তাই একমাত্র অবলম্বনই নয়, যুগধর্মে তার মধ্যেই কিছু যদি নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়ে থাকে, তবু তার একটুও ত্যাজ্য, পরিবর্তনীয় হবে না—নিশ্চয়ই এরূপ আচরণ বা তথাকথিত সাধনা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নয়।···চাই বিবেকানন্দকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ না করে বিবেকানন্দের প্রেরণায় ইতিহাসের পথে নতুন কালে এগিয়ে যাওয়া।

এই কথাগুলো ঔদ্ধত্য বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে বিবেকানন্দের স্থান কতকটা উপলব্ধি করে একজন সাম্যবাদী যেমন বলতে পারে—সাম্যবাদকেও বিবেকানন্দের মূল বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এদেশের জনসাধারণের অধিক বোধগম্য করে তোলা সমীচীন, তেমনি বলা যায়, বিবেকানন্দ-অনুগামীদেরও সেই যুগনায়কের শিক্ষা এবং সাধনাকে নতুন যুগের সমুচিত জ্ঞানে, ধ্যানে এবং সাধনায় সঞ্জীবিত করা সম্ভব। এই ১২৫ বৎসরের অনুষ্ঠানাদিতে বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাবানদের প্রয়োজন বিবেকানন্দ-আদর্শকে ইতিহাসের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া —পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তোলা।

মানুষের কাছে ইতিহাসের এই তো চিরকালের নির্দেশ : 'চরৈবেতি চরৈবেতি' ॥*

* চতুরঙ্গ, ৪৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৮৮ (চৈত্র, ১৩৯৪), পৃঃ ১০৫৩—১০৬০

দ্বিজেন্দ্রলালের ধর্মচেতনা : জীবনে ও কাব্যে

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৬৩ : এ বছর তাঁর জন্মের ১২৫ তম বর্ষ-পূর্তি) পারিবারিক পরিবেশ ও বাল্যজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন এক তেজস্বী পুরুষ। তাঁর উন্নত চরিত্র সেকালের শ্রেষ্ঠ সামাজিকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে উঠেছে। 'সুরধনী' কাব্যে দীনবন্ধু মিত্র কার্তিকেয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন :

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্যপ্রধান
সুন্দর সুশীল শান্ত বদান্য বিদ্বান…

কার্তিকেয়ের সাহিত্য রচনারও অভ্যাস ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি হল 'গীতমঞ্জরী'। এই 'গীতমঞ্জরী'তে রামচরিত, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে 'মাতৃস্নেহ, অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ' প্রভৃতির সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যা থেকে তাঁর নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা প্রসন্নময়ী দেবী অদ্বৈতাচার্যের বংশের কন্যা। স্বভাবতই তাঁর মধ্যে হিন্দু-ধর্ম, বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মচেতনা ছিল স্বতোৎসারিত। তাঁর চতুর্থ পুত্র দ্বিজেন্দ্র-অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মায়ের মৃত্যুকালীন ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"দ্বিজেন্দ্রের যে রোগে [সন্ন্যাস] মৃত্যু হয় তাঁহার জননীরও সেই রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। প্রথম দিন মূর্ছার পর তাঁহার একবার বেশ সহজ ও প্রশান্তভাব ছিল। তখন তিনি বলিলেন, 'তোমরা যতই আশ্বাস দাও না কেন, আমি বেশ বুঝিয়াছি, আমার এবার সারিবার কোন সম্ভাবনা নাই।… তোমাদিগকে তখন আর কিছু অনুরোধ করি না, কেবল এই বলি—আমার দেহের প্রতি মমতা করিয়া আমার জীবিতাবস্থায় গঙ্গালাভের বিঘ্ন করিও না।' তার পরদিন তাঁহার পুনরায় মূর্ছা হইল, আর ভাল জ্ঞান হয় নাই; আর মাত্র দুটি দিন জীবিত ছিলেন। তিনি পুত্রাদি আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিতা হইয়া নবদ্বীপ ধামে জীবিতাবস্থায় নীত হইয়াছিলেন এবং সেই ভরাভাদ্রের কুলপ্লাবী পবিত্র সলিলে যখন তাঁহার দেহ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল এবং 'ওঁ গঙ্গা-নারায়ণ ব্রহ্ম'—এই মন্ত্র তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল তখন তিনি স্বর্গারোহন করিলেন।"[১]

পিতার নৈতিক বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতার সঙ্গে মাতার নির্মল, পবিত্র চরিত্র ও ধর্মপ্রাণতার সম্মিলন দ্বিজেন্দ্র-জীবনে প্রভাব বিস্তার করাই স্বাভাবিক। শৈশবে রচিত কতকগুলি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের অভ্যন্ত ঈশ্বরভাবনা সুপরিস্ফুট। তাঁর দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ বর্ষ পর্যন্ত রচিত গান ও কবিতাগুলি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্যগাথা' (১ম খণ্ড) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। 'আর্যগাথা'র অন্তর্ভুক্ত 'ঈশ্বরস্তুতি শিরোনামের কবিতাগুলি তাঁর বাল্যজীবনের ঈশ্বর-চেতনার পরিচয় বহন করে। 'মন ভাব তাঁরে' গানের মধ্যে ঈশ্বরের অপার মহিমা বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

মন ভাব তাঁরে।
বিরাজিত যিনি আকাশ ভুবনে
বিশাল বিশাল নীল পারাবারে
তেজস্বী যাঁহার তেজে প্রভাকর
তাঁহার সৌন্দর্য শশাঙ্ক সুন্দর
মধুরতা যাঁর, রয়েছে বিস্তার
অযুত অযুত তারকার হারে।

শৈশব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃতি-প্রেমিক। সেই প্রকৃতির অন্তরালে বিশ্বনিয়ন্তার অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাসী :

১ দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী (২য় সংস্করণ), পৃঃ ৩৫

আহা কি মধুর দরশন
অরুণ কিরণময় হাসিছে ভুবন
প্রকৃতি সন্তানগুলি
তরুলতা হেলি দুলি
পুজিছে বিভুরে ফুলে মাথায়ে চন্দন।
গায়ক বিহগ সবে
মিলিত ললিত রবে
তাঁহার মহিমাগান করিছে কীর্তন।

কবির প্রার্থনা :

শেষ দিন দোষ ভুলে
লবে যবে কোলে তুলে
হৃদয়ের ভয়ভীতি হোক অবসান।

॥ ২ ॥

একুশ বৎসর বয়সে তরুণ দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত যাত্রা। বিলাত প্রবাসকালেই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়েছে। এই সময়েই তাঁর পিতামাতা লোকান্তরিত হয়েছেন। পশ্চিমী জীবনযাত্রা ও ভাবধারার সর্বগ্রাসী প্রলোভন থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি পরন্তু প্রবলভাবেই তাঁকে তা আচ্ছন্ন করেছে। অবশ্য একালের রচনাবলী ও চিঠি-পত্রে তাঁর মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীর জন্য দুঃখবোধ স্পষ্টই চোখে পড়বে কারণ পাশ্চাত্য জীবনের ঐশ্বর্য-ময়তা ও ভোগ-উপকরণের পাশাপাশি বিবর্ণ ও বিড়ম্বিত প্রাচ্য জীবন তাঁকে পীড়িত করেছে এবং সম্ভোগপূর্ণ পশ্চিমী জীবনধারাই তাঁর কাছে আদর্শ বলে মনে হয়েছে। ভারতের কৃষক সম্পর্কে 'বিলাতের পত্র'-এ লিখেছেন : "আমাদের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে এখানকার কৃষকের তুলনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, প্রভেদ কত; বোঝা যায় আমাদের কৃষকেরা কি গরীব, কি দুরবস্থাপন্ন। যেদিন যাহা পায় প্রায় সেদিনই তাহা ব্যয় করে। সঞ্চিত অর্থ নাই।··· ইহার কারণ কি? অন্যান্য কারণও আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস, বর্তমানে সন্তোষই ইহার মূল।··· আমি বলি, তাহাদের মনে সম্ভোগকামনা ও অসন্তোষই দেও,—উন্নতির সোপান রচিত হইবে।"[২]

ভারতীয় কৃষকের দারিদ্র্য সমস্যা হৃদয়বান কবিকে ব্যথিত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যেভাবে তার সহজ সমাধান করেছেন তা তাঁর সমকালীন জীবনে অতিমাত্রায় ভোগবাসনার পরিচয়ই বহন করে। পরবর্তী কালে এ-সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—তিনি ভারতীয় কৃষকদের সর্ব-নাশা দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণগুলি উপলব্ধি করেছেন, সেই সঙ্গে বিড়ম্বিত কৃষকজীবনের মহত্ত্বও তাঁর কাছে স্পষ্টতর হয়েছে। 'আলেখ্য' কবিতায় লিখেছেন :

ওরে চাষী, হারাস নে তোর
সবল দেহ, সরল জীবন,
সভ্যতার এই সংঘর্ষণে এসে।
হারাস নে তোর শুভ্র হৃদয়
বেশি বুদ্ধির ঘোরে পড়ে;
ধনে মানে ফতুর হসনে শেষে।······
হারাস নে তোর সরল ধর্ম
গঙ্গাস্নানে পুণ্য ভাবা
পরদারে মাতা বলে ভাবা
বৃক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞতা
সর্বভূতে দয়া মায়া······
—জগৎ খুঁজে এস গিয়ে
এখনো হে মিশনারী
কোথায় পাবে এমনধারা চাষী।

এই কালে ধর্মের ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করেছে। বাল্য ও কৈশোরের সহজ বিশ্বাস প্রবণতায় দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরে যে ধর্ম-চেতনা স্বতঃঅঙ্কুরিত হয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজ্ঞানমুখী, আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সংস্পর্শে তা বিনষ্টপ্রায়—তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে 'বিলাতের পত্রে' : "আজ ধর্মের শুষ্ক অনুষ্ঠানগত রাজত্ব শেষ হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞানের নবীন পতাকা আকাশে উড়িতেছে। ন্যায়, সত্য ও জ্ঞানের নবরাজ্য প্রসারিত হইতেছে।"[৩]

অবশ্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্পর্কে এই অভিমত ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস সূচিত করে না। প্রকৃত-পক্ষে বিলাতবাসকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে তাঁর রচনার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ মাঝে মাঝে পাওয়া

২ দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৪, পৃঃ ৭১৩
৩ ঐ, পৃঃ ৭০৯

যায়। মনে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস ও না-বিশ্বাসের মধ্যে তখন তার চিত্ত দোলায়িত।

বিলাত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ফিরেছেন পুরোপুরি সাহেব হয়ে আর তখনই তাঁর জীবনে এসেছে এক সংকটমুহূর্ত। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁর বিলাত যাত্রার শাস্তিস্বরূপ তাঁকে সামাজিকভাবে বর্জন করেছে। এই সময়কার কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে জীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী লিখেছেন: "ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর অদর্শনের পর দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়া তদীয় স্বজনগন যদিও মুখে খুব সন্তোষপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু কার্যতঃ সামাজিক ও অন্যবিধ আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত একটু স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। 'পাত্তানো' সম্পর্কের স্থলে—বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে এবংবিধ আচরণ তিনি হাস্য-মুখে অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিতেই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ যখন প্রকাশ পাইল যে, প্রকৃত অবস্থা শুধু তাহা নহে, তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে শোচনীয় ও সাংঘাতিক অর্থাৎ বিলাত যাওয়ার জন্য তদীয় আত্মীয়গণের মধ্যেও কেহ কেহ সামাজিক হিসাবে তাঁহাকে বর্জন করিতে কৃতনিশ্চয়—তখন অসহায় ও বড় অভিমানী দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয় আর একবার তাঁহার পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিল। এই অভাবিত প্রচন্ড আঘাতে তিনি স্তম্ভিত, আহত ও মুহ্যমান হইয়া গেলেন।"[৪]

এই সময় তাঁর হিতার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত করে সামাজিক অপরাধ স্বীকারের পরামর্শও তাঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় বা অসামাজিক কাজ বলে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেননি এবং প্রায়শ্চিত্ত করার যুক্তি সঙ্গত কারণও খুঁজে পাননি। বিলাতে থাকাকালে সে-দেশীয় সমাজ, জীবনচর্চা ও রীতিনীতি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করলেও দেশ ও জাতীয় সমাজের প্রতি তাঁর ভালবাসা অটুট ছিল একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে—অন্ততঃ সমকালে রচিত সাহিত্য সেই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বজনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি অতি মাত্রায় বিদেশী-ভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন এবং স্বদেশের সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠল। তার পরিচয়ও রয়েছে সাহিত্য-কর্মের মধ্যে। 'একঘরে' রচনার মধ্যে তিনি লিখেছেন: "এ-সমাজের বিষয় আর বিদ্রূপের ভাষায় আচ্ছাদিত ক্রোধে লেখা অসম্ভব। ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায় ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন। ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা। এই ভীরুতার রাজত্বের, এ অন্যায়ের ধর্মশালার, এ প্রবঞ্চনার রাজনীতির বিষয় বলিতে যদি শত শেলময়ী, দাবানলের স্ফুলিঙ্গময়ী, নরকের জ্বালাময়ী ভাষা থাকে তাহাই ইহার উপযুক্ত ভাষা।"[৫]

প্রায়শ্চিত্তের বিরোধিতায় কঠোরভাবে লিখেছেন: "এ মূর্খতার দালানে, এ শঠতার ভান্ডারঘরে, এ নীচাশয়তার আঁস্তাকুড়ে ঢুকিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত?··· বরং আমরা আপনাদের সমাজে এতদিন যে ছিলাম, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজি আছি। যে-সমাজে পদে পদে ভীরুতা, সত্যের গ্লানি, নির্মমতা, যে-সমাজে পদে পদে মিছা কথা, বিবেকের বেশ্যাবৃত্তি, সে-সমাজ হইতে এতদিন বাহির হইয়া আসি নাই, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজি আছি।"[৬]

সমাজের প্রতি বিদ্বেষ সংক্রামিত হয়েছে আনুষ্ঠানিক ধর্মে। পৌরাণিক দেবদেবী, এমনকি মহাপুরুষরাও তখন তাঁর কাছে উপহাসের উপাদান। 'এমন ধর্ম নাই' হাসির গানে তারই পরিচয়:

ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হো।
কার্তিক গণপতি
আর দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী
লক্ষ্মী সরস্বতী—
আর শচী, উষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম
সবই আছে, হিন্দুধর্ম তবে কিসে কম?

৪ দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ১৭১
৫ দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী (১ম খন্ড), পৃঃ ৬০৪-৬০৫
৬ ঐ, পৃঃ ৬০৫

ছেড়ো নাকো এমন ধর্ম
ছেড়ো নাকো ভাই
এমন ধর্ম নাই আর দাদা এমন ধর্ম নাই।...
ঐ কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর
আর শ্রীরাম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য নানক ও কবীর
হন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার ;
ব্যস—বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর
ছেড়ো নাক এমন ধর্ম...

হাসির গান বাদ দিলে তাঁর সাধারণ কবিতা ও নাটকের মধ্যে হিন্দুধর্মের অধঃপতনের জন্য গভীর দুঃখবোধ ও অতীতের জন্য গৌরববোধ একই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থের 'নবদ্বীপ' কবিতায় তারই পরিচয় পাই :

... সে ধর্ম কোথায়
আজি প্রিয়তমে ?—তাহা বঙ্গভূমি হতে
কোথায় গিয়াছে ভাসি ঘটনার স্রোতে।
তার স্থলে ভাবহীন প্রাণহীন সব
শুনিছ না বৈষ্ণবের শূন্য কলরব ?...
ধর্মের মুখোস পরি বিবেকের শূন্য
সিংহাসনে বসিয়াছে।...

কিন্তু একই কবিতায় বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহান ভারতীয় ধর্মের জন্য গৌরববোধ :

তবু এই সেই নবদ্বীপ ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে,
তার পদরজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি
প্রেমে সুপবিত্র আজো তার স্বর্ণধূলি ;
হোক সে পঙ্কিল আজি,—বিলুপ্ত বিভব
বিহীন সৌন্দর্য জ্ঞান প্রতিভা গৌরব
তবু চির পুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম—...

॥ ৩ ॥

প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে আবেগপ্রবণ-কবিসুলভ পরস্পরবিরোধিতা অত্যন্ত প্রকট। হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্ম, পৌরাণিক বা আধুনিক মহাপুরুষ জীবনের প্রতি আপাতস্পষ্ট বীতরাগ প্রকাশ পেলেও অন্তরের দিক থেকে তিনি সকল কিছুর প্রতিই শ্রদ্ধা আজীবন বহন করে গেছেন। হিন্দু সমাজ ও ধর্ম পরিত্যাগ করেও তিনি তা থেকে দূরে সরে যেতে পারেননি। 'এমন ধর্ম নাই' গানে যিনি শ্রীচৈতন্যকেও তাঁর ব্যঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি দেননি, তিনিই আবার লিখেছেন :

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায়
ও কে নেচে নেচে চলে
মুখে হরি বলে
ঢলে ঢলে পাগলেরই প্রায়।...
ও কে দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যারে তোরা দেখে যা।...

বৈষ্ণব চেতনা যে তাঁর মনকে কতখানি আচ্ছন্ন করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে দু'একটি ঘটনা ও কবির উক্তিতে। একদিন দেবকুমার রায়চৌধুরীর সমক্ষে 'আর কেন বা ডাকছ আমায়' ['পরপারে' নাটকের] স্বরচিত এই গানটি গাইতে গাইতে "স্বর চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিক একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলেন"। স্তম্ভিত দেবকুমারকে সেদিন তিনি বলেছিলেন : "দেখ তোমাদের ঈশ্বরকে আমি না দেখে ঠিক যে মানি, তা বলতে পারি না। তবে এই কীর্তন শুনলে বা কোন ভাবাত্মক গান শুনলে আমার যে কান্না আসে বা প্রাণটা কেমন 'হু হু করে ওঠে' সেটা কি জানি কেন আমার কেমন যেন একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা।...এর একটা কারণ বোধহয় এই (ঠিক জানি না অবশ্য) যে, আমার মা অদ্বৈত প্রভুর বংশের মেয়ে ছিলেন। কে জানে হয়তো তাঁরই সেই রক্তের ছিটে ফোঁটা এই আমাতেও এতদূরে এসে পৌঁছেছে।"[৭]

অনুরূপ কথারই প্রতিধ্বনি শুনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে : "দেখ পাঁচকড়ি আমার মাতামহকুল শ্রীমদ্ অদ্বৈতের বংশ। মা আমার বৈষ্ণবঘরের মেয়ে। আমি আকারে প্রকারে অনেকটা মার মতো দেখতে। আমার মনে হয়, আমি যদি কখনও ধার্মিক হই তাহা হইলে আমি বৈষ্ণব হইব। কারণ কে জানে কেন, কীর্তন শুনিলে আমার প্রাণের ভিতর একটা উদাস বিরহের ভাব জাগিয়া ওঠে। যেন মনে হয়, কাহাকেও হারাইয়াছি খুঁজিয়া পাইতেছি না।"[৮]

৭ দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার, পৃঃ ৫০৮

৮ ঐ, পৃঃ ৫০৯

বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল খাঁটি বাঙালী এবং উনিশ শতকের বাঙালী, যে বাঙালীর মধ্যে আবেগ-প্রবণতা, প্রবল জিদ, দৃঢ়তার সঙ্গে মিশে আছে সনাতন কোমলতা ; যে বাঙালী পাশ্চাত্য ভাবধারাকে আকুলভাবে বরণ করে নিয়েছে কিন্তু জীবনের সঙ্গে সংমিশ্রিত করতে পারেনি—যে বাঙালী যুক্তিগত ভাবে বিজ্ঞান ও বস্তুজগৎ কে স্বীকার করে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে একান্তভাবে আধ্যাত্মিক। "কাহাকে হারাইয়াছি অথচ খুঁজিয়া পাইতেছি না।"—আপাতদৃঢ়তার অন্তরালে এইটিই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতির স্বরূপ।

পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অন্তরস্থিত আবেগ উদ্দীপ্ত হয়েছে 'নবপ্রভা' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবাদ-পত্রে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার সমালোচনা প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকায় জনৈক স্বামী উত্তমানন্দের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল তারই একটি প্রতিবাদ পাঠান। সেখানে তিনি লিখেছেনঃ "শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ধারণা এই যে (১) রাসলীলা অপ্রামানিক অর্থাৎ Historical নহে এবং তাহা রূপক। বঙ্কিমবাবু যে প্রতিপাদ্য দুইটি প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা বলি না। মহাভারত যে Historical নহে এবং পুরাণগুলি যে কাল্পনিক, সেইটি তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রমাণ না করেন ততক্ষণ মূলপ্রশ্নের কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।··· শ্রীমৎ উত্তমানন্দও এ-বিষয়ে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে রাসলীলা রূপক হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার প্রধান কথা যে, রাসলীলা অপবিত্র এবং তাহা ধর্মের (যাহা পবিত্র জিনিস তাহার) রূপক হইতে পারে না। কিন্তু রাসলীলা যে অপবিত্র প্রেমের কাহিনী তাহার প্রমাণ কি ?

"···শ্রীকৃষ্ণকে দুইদিক হইতে দেখা যাইতে পারে। তিনি যদি স্বয়ং ঈশ্বর হন তাহা হইলে তাঁহার পাপপুণ্য বিচারের ক্ষমতা আমাদের নাই।··· যদি ঈশ্বর তাঁহার নৈতিক সহস্র হত্যার জন্য দোষী না হন তবে কৃষ্ণ (যদি তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হন) রাসলীলার জন্য কেন আসামীর ন্যায় কাঠগড়ায় দাঁড়াইবেন তাহা বুঝিতে পারি না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ঐতিহাসিক বা রূপক হোক। উচিত কি গর্হিত তাহা ভক্তের বিচারাধীন নহে।

"আর শ্রীকৃষ্ণকে যদি মনুষ্য বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে দশ বৎসর বয়সে গোপীগণের সহিত বিহার দূষ্য হইতে পারে না।···

"৩য় কথা। বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি উত্তমানন্দ স্বামী যে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা একান্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। এই বৈষ্ণব ধর্ম কামের ধর্ম নহে—ইহা প্রেমের ধর্ম।··· বৈষ্ণবদিগের মূলমন্ত্র প্রেম। তাহার পার্থিব বিকাশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলায়।···সে প্রেমের কাহিনী শুনিয়া ভক্তের হৃদয়ে কামের উদ্রেক হয় না—চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বর্ষিত হয়।

"বঙ্গদেশে অনেক পাপিষ্ঠ, ভণ্ড, হেয় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী আছে। সেইরূপ হিসাবে অনেক হেয় খ্রীষ্টান আছেন, বহু ব্রাহ্ম আছেন, মুসলমানও আছেন, শাক্তও আছেন কিন্তু এইটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ এই ধর্মের প্রচারক ছিলেন, রূপসনাতন বৈষ্ণব ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুও বৈষ্ণব ছিলেন ;···ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এখনও সহস্র সহস্র ভক্ত হরিপ্রেমে সন্ন্যাসী হইয়া আছেন।··· মনে রাখিতে হইবে—যে শত রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার মধ্যেও—দুঃখে, দৈন্যে, দুর্দিনে এই তারকব্রহ্ম হরিনামই এই অধঃপতিত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে শান্তি ও সান্ত্বনার পীযূষ বর্ষণ করিতেছে।

"উত্তমানন্দের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম জনসাধারণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সে ধর্ম স্বয়ং রামমোহন রায় প্রচার করিয়া সফল প্রযত্ন হইতে পারেন নাই। ফলতঃ কৃষ্ণচরিত্রের এই আদিকাণ্ড—এই সখ্য, এই প্রেম, এই বাল্যলীলা, এককথায় এই রাসলীলা বাঙালীর কাছে যেরূপ মধুর বোধ হয় মহাভারতের কৃষ্ণের দর্শনজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা ও কৌশল সেরূপ মনোহর বলিয়া বোধ হয় না। তাই যশোদানন্দনের এই ত্রিভঙ্গ মহিমা, এই বংশীবাদন, এই বনফুলহার বঙ্গবাসীর নিকট অতি প্রিয়।···আমরা মহাভারতের কৃষ্ণ ও রামায়ণের রামকে দূর হইতে প্রণাম করিতে পারি। কিন্তু আরাধনা করিব, ধ্যান করিব, প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব—ঐ বৃন্দাবনের চপল,

ননীচোরা ক্রীড়া প্রিয়, বংশীধারী, প্রাণারাম রাসবিহারী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে ॥"[৯]

দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু ও জীবনচরিতকার দেবকুমার রায় চৌধুরী লিখেছেন : "অতীন্দ্রিয় অন্যান্য ব্যাপারের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্বও বিচারসহ নহে বলিয়া তিনি প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করিতেন না। যদি তাহার ন্যায় হৃদয়বান্‌ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে একেবারে নাস্তিক হওয়া আমরা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস করিতাম।"[১০]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে অন্যের সঙ্গে তিনি যতই বিচার করুন না কেন, অন্তরের দিক থেকে তিনি কখনই নিঃস্ব ছিলেন না। বাহিরের কঠিন আবরণের অন্তরালে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কতখানি গভীর প্রত্যয়ে মাতৃকুলের ধর্মকে লালন করে গেছেন, উক্ত প্রতিবাদপত্রই তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে উত্তমানন্দের রচনা তাঁকে কখনই বিচলিত করতে পারত না যদি তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিরোধী কেন, উদাসীনও হতেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর এতদিনের বিতর্ক অকস্মাৎ এই একটি প্রতিবাদ পত্রের প্রেক্ষিতেই অর্থহীন হয়ে গেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

॥ ৪ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের তৃতীয় পর্যায় সুরু হয়েছে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে। কবির বয়স তখন ৪০ বৎসর —দাম্পত্যজীবনের আয়ু ১৬ বৎসর। দ্বিজেন্দ্রজীবনে এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পত্নীপ্রেমে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কতখানি মগ্ন ছিলেন এবং স্ত্রীবিয়োগ তার জীবনে কতখানি শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই কালে রচিত সঙ্গীত ও কবিতায়। পত্নী সুরবালা দেবী ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় "নিয়তির কুটিল কঠোর প্রাণে তাঁহার এত সুখ সহিল না।"

পত্নীপ্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবতই ঈশ্বরের বিধানের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন এবং বাহ্যিকভাবে ঘোরতর ঈশ্বর বিদ্বেষী হয়েছেন। এইসময় দুটি পীড়াদায়ক কাজের ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে—প্রথম, বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়া এবং দ্বিতীয়, অতীত স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলা। কঠিন বাস্তব স্বীকার করে নিয়ে দুটি শিশু সন্তানের পূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দায়িত্বটির জন্য তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে অস্বাভাবিক পথ। তিনি বিস্মৃতির সহায়ক হিসাবে তুলে নিয়েছেন সুরাপাত্র আর অতিরিক্ত বন্ধুসান্নিধ্য। এই বন্ধুসঙ্গ লিপ্সার কালেই ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক জিদ, বিতর্কস্পৃহা দেখা দিয়েছে। তাঁর নাস্তিকতাকে প্রকট করার জন্য বিতর্কের পথ বেছে নিয়েছেন। দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন : "স্ত্রীবিয়োগের পর কয়েক বৎসর তাঁহার এই সন্দেহ [ঈশ্বর সম্পর্কে] ভীষণভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল… কিন্তু তখনও সেই নিরন্তর দুর্গতির মধ্যেও বেশ দেখিতাম—তিনি যেন কোনমতে একটা কিছু নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বা অবলম্বন লাভের আশায় ঐ ভাবে সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে মর্মান্তিক আগ্রহে কেবল কি যেন অনুসন্ধান করিয়া হাতড়াইয়া বেড়াইতেন।"[১১]

প্রকৃতপক্ষে এই সময়টি হল পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ নবনির্মিত 'সুরধামে' যথারীতি হিন্দুপদ্ধতিতে পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি গৃহপ্রবেশ করেছেন এবং তার কিছু পরেই কিশোরপুত্র দিলীপকুমারের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। পুত্রের বয়স তখন ১২ বৎসর। এই সময় তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সমস্ত বাধা নিষেধ অতিক্রম করে 'সুরধামে' উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। স্বভাবতই দ্বিজেন্দ্রলাল স্বস্তিবোধ করছেন—তাঁর সমাজ ও হিন্দুঅনুষ্ঠান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। অনুষ্ঠানের পর আনন্দিত কবি দেবকুমারের কাছে বলেছেন : "সব বেশ সুসম্পন্ন হয়েছে। ভেবেছিলাম এ জীবনে কেবল ঐ 'একঘরে' হয়েই কাটাতে হবে। কিন্তু আজ ভাই, আমি যেন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করছি।"[১২]

৯ দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার, পৃঃ ৫১২-৫১৪
১০ ঐ, পৃঃ ৫০০
১১ ঐ, পৃঃ ৫০৪
১২ ঐ, পৃঃ ৪৬৬

সেই মুহূর্তের আনন্দেই তিনি সেদিন উপনয়নের আনুষ্ঠানিকতাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন—হিন্দু শাস্ত্রের নতুন তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন এবং দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত গ্লানি মুছে ফেলতে পেরেছেন: "যখন বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছিল, আমার মনে এমনই একটা অস্থিরতা ও অনুতাপ এল যে, তা আর কি বলব। এসব অনুষ্ঠানের আচার ও মন্ত্রাদিতে কি যে একটা বৈদ্যুতিক পবিত্র প্রভাব আছে, তা এর আগে আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি। কি চমৎকার উপদেশ। কি অপূর্ব, সব সুন্দর ব্যবস্থা।"[১৩]

এক জ্যোতিষী নাকি গণনা করে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) শেষপর্যন্ত ঘোর শাক্ত হয়ে উঠবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেটা বিশ্বাস করতে পারেননি কারণ তাঁর ধারণা ছিল তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব-প্রবণতাই প্রবল। জীবনের শেষ পর্যায়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ মানসমুক্তি ঘটেছে এবং জ্যোতিষীর কথাই সত্য হয়ে উঠেছে। সেই অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল তাঁর কিশোর-পুত্র দিলীপকুমার এবং সদ্যতরুণ ভাগিনেয়, পরবর্তী কালে রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

'সুরধামে' আগমণ ও পুত্রের উপনয়নের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে বাইরের সংঘাত অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। এবার তাঁর আত্ম-উন্মোচনের কাল সমাগত কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সন্ন্যাসরোগের সূত্রপাত। চিকিৎসকের পরামর্শ-মতো তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন, আহার-বিহারে যথেষ্ট সংযম রক্ষারও চেষ্টা করছেন কিন্তু সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীত পরিত্যাগ করতে পারেননি। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তখন তিনি কর্মব্যস্ত—সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনার কাজও চলেছে।

এই সময় নির্মলেন্দু কলকাতায় আসেন, মাতুলালয় 'সুরধামে' থেকে কলেজে পড়ার জন্য। পিতৃগৃহে ধর্মীয় পরিমণ্ডল নির্মলেন্দুকে কিছুটা অধ্যাত্মমুখী করেছিল। সুদর্শন ও সুকণ্ঠ নির্মলেন্দুর অভিনয়ের প্রতিও আকর্ষণ ছিল। আধ্যাত্মিক ও নাটক আকর্ষণে তিনি রামকৃষ্ণ-সন্তান গিরিশচন্দ্রের কাছে যাতায়াত সুরু করলেন। এই সূত্র ধরেই ক্রমশঃ তাঁর দক্ষিণেশ্বরের পথ চিনলেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে থাকতেন দিলীপকুমার। দ্বিজেন্দ্রলাল একথা জানতেন কিন্তু তার জন্য কোন উদ্বেগ বোধ করেননি। দিলীপকুমার লিখেছেন: "আমরা যেতাম এখানে ওখানে [দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়-মঠ, স্বামী সারদানন্দের কাছে]। পিতৃদেব বাধা দিতেন না কারণ তিনি জানতেন নির্মলদা আমার কতবড় শুভার্থী। তাছাড়া মুখে তিনি নিজেকে যতই নাস্তিক বলে জাহির করুন কেন, মনে মনে জানতেন তিনি কী।"[১৪]

বন্ধুবৎসল দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু বন্ধু ছিলেন যাঁরা তাঁর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতিসাধনই করেছেন বেশি। তাঁরাই দ্বিজেন্দ্র-লালকে রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। এঁদের একজনের সঙ্গে গিরিশপ্রসঙ্গ নিয়ে নির্মলেন্দুর বাদানুবাদ হয়। সে-খবর তিনি পৌঁছে দেন দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। বন্ধুর অপমানে ক্ষুব্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল নির্মলেন্দুকে ডেকে রীতিমত ভর্ৎসনা করেন এবং প্রসঙ্গতঃ তাকে জানান: "তোমার বাবা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন পড়াশুনো করতে। আমি চাই না, তুমি থিয়েটারী দলে মেশো।"

উত্তরে নির্মলেন্দু বলেন, "গিরিশবাবুর কাছে আমি যাই থিয়েটারী দলে মিশতে না,—সৎকথা শুনতে।"

মুখের ওপর জবাব দ্বিজেন্দ্রলাল সহ্য করেননি। তিনি তীব্রতর ভাষায় জানিয়ে দেন: "এখানে যদি থাকো, আমার কথা শুনতে হবে।"[১৫]

মাতুল—ভাগিনেয়ের এই বিরোধের ফলে নির্মলেন্দু 'সুরধাম' ত্যাগ করে সস্তা মেসে গিয়ে আশ্রয় নেন কিন্তু এই ঘটনাসূত্রেই দ্বিজেন্দ্রলাল পুত্রের কাছ থেকে গিরিশচন্দ্রের ভক্ত পরিচয়টি জানতে পারলেন,

১৩ ঐ, পৃঃ ৪৫৫

১৪ স্মৃতিচারণ—দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২০৫

১৫ ঐ, পৃঃ ২০২

চেনবার সুযোগ পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। এই সময়ই একদিন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং 'সুরধামে' এসে উপস্থিত হলেন, উভয়ের ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে। সেদিন কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র দিলীপকুমারকে আশীর্বাদ জানিয়ে তার ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করে-ছিলেন। এরপর দিলীপকুমার পিতৃদেবের হাতে তুলে দেন 'কথামৃত।' 'কথামৃত' পাঠের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল সেটা দিলীপকুমারই জানিয়েছেন তাঁর 'স্মৃতিচারণে'। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন, "ওরে, কথামৃত পড়লে আর মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] ছিলেন নিখাদ সোনা।"[১৬]

এসময় দিলীপকুমার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হলেও নির্মলেন্দুর মতো মনে করেন না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হয়—দ্বিজেন্দ্রলালের কাছেও মাঝে মাঝে দিলীপকুমার সিদ্ধান্তের জন্য গিয়ে দাঁড়ান। এইরকম একটি ঘটনা নিয়ে পিতাপুত্রের সংলাপ :

আমি (দিলীপকুমার)··· নির্মলদার সঙ্গে কাল হঠাৎ তর্ক বাধল। আমি পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি বটে—আরও আপনার ভরসা পেয়ে—

পিতৃদেব—রোস, রোস, আমার ভরসা মানে ?

আমি—বাঃ, আপনি সেদিন বলেননি যে পরমহংসদেব সাধু একথা তেমনি জলজ্যান্ত সত্য, যেমন সত্য—ঐ দোরটা দোর।

পিতৃদেব (প্রসন্ন) বলেছি, আর বলার পরে কথাটা শুধু যে ফিরিয়ে নেব না তাই নয়, আরো একটু জুড়ে দেব—তাঁর ভাবে ভোলা ছবি দেখলে মনে না হয়েই পারে না যে তিনি মহাপুরুষ।

আমি (সংক্ষেপে)—আমিও বলি—তিনি মহা-পুরুষ, যুগাবতার অপাপবিদ্ধ সবই মানি, কিন্তু তিনি একেবারে সাক্ষাৎ ভগবান—এ গোঁড়ামি নয় ? বলুন তো ?

পিতৃদেব (হেসে) কী করে বলি বল ? আমার চোদ্দপুরুষও কেউ ভগবানকে দেখেনি যে রে।

আমি (থমকে গিয়ে, বিজ্ঞভাবে)—তা বটে, তবে কি বলব—আমার বলা উচিত নয় যে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান হতে পারেন না ?

পিতৃদেব—নিজের ধারণা বলবি না কেন ? তবে বেশি জোর করে বলা ভাল নয়—তিনি কী হতে পারেন আর কী হতে পারেন না। তবে এ আমার কথা নয় বাবা ; সেদিন তোর দেওয়া 'কথামৃত'-তেই পড়েছিলাম—আর পড়ে একটু চমকে গিয়েছিলাম বৈ কী।"[১৭]

এর আগেই গিরিশচন্দ্রের 'সুরধামে' আগমন। গিরিশের মুখ থেকে রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শোনার পর তিনি যখন নির্মলেন্দুর মাতুলালয় ত্যাগের শক্তি-উৎসটি বুঝতে পেরেছেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। তার প্রমাণ রয়েছে দেবকুমার রায়চৌধুরীর কথায়। দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য বন্ধুদের অগোচরে তাঁর কাছ থেকেও 'কথামৃত' ও 'রামকৃষ্ণ জীবনী' সংগ্রহ করেছেন বার বার।

এবার তোরে চিনেছি মা
আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা
(এবার) পাঠিয়ে দিচ্ছি যমের বাড়ি।···

ভবার্ণবে দিশাহারা
পাচ্ছিলাম না কূলকিনারা
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা
(অমনি) তারা বলে দিলাম পাড়ি।

জীবন-সায়াহ্নে দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত 'পরপারে' নাটকের একটি গান। কিন্তু 'পরপারে'র গান-গুলিকে শুধু নাটকের গান বলে মনে করা যায় না। এই গানগুলির মধ্যেই আছে দ্বিজেন্দ্র-লালের পরিণত উপলব্ধির সূত্র। এতদিন যেন তিনি তাঁর অন্বেষিত অন্তরটি খুঁজে পেয়েছেন —সে আশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছে 'কথামৃত' ও রামকৃষ্ণ জীবনী। দিশাহারা দ্বিজেন্দ্রলাল পেয়েছেন ধ্রুব-তারার দেখা। এই সত্যের দিকেই তাঁর হৃদয় ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়েছে এবং সেটাই ছিল অনিবার্য। তাঁর বাঙালী-মন শুধুমাত্র মস্তিষ্কের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকেনি। স্বাভাবিক হৃদয়বত্তা তাঁকে ভাবুক করেছে। উনিশ শতকীয় বাঙালী জীবনচর্যায়

১৬ স্মৃতিচারণ—দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২০৮

১৭ ঐ, পৃঃ ২০৬-২০৮

যুক্তিবাদের বেগ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে ভক্তিবাদেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি প্রবর্তিত যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদের সমন্বিত ধারাকে খুঁজে পেয়েছেন।

এইকালে তিনি তিনখানি নাটক রচনা করেছেন —পৌরাণিক 'ভীষ্ম' ও সামাজিক 'বঙ্গনারী' এবং 'পরপারে'। নাটক তিনটির সাহিত্যিক মূল্য আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। এই নাটক তিনটিতে তাঁর ধর্মজীবনের পরিণতি প্রদর্শনই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যে-কবি এক সময় বিদ্বেষবশে লিখেছিলেন:

যদি চোরই হও কি ডাকাতই হও
তা গঙ্গায় দাও গে ডুব
আর গয়া কাশী পুরী যাও সে
পুণ্যি হবে খুব—

তিনিই উপলব্ধি করেছেন গঙ্গামাহাত্ম্য—ভীষ্ম নাটকের সুবিখ্যাত গান:

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে
শ্যামবিটপীঘন তটবিপ্লাবিনী
ধূসর তরঙ্গভঙ্গে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি!
কলকল্লোলিনী গঙ্গে॥

'পরপারে' নাটকের ভবানীপ্রসাদ শ্যামাভক্ত উদাসী মানুষ। মাতৃনাম গান করে শান্তি পায়, শান্তি দেয়। এ চরিত্রটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন মানসিকতার প্রক্ষেপণ ঘটেছে—একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই চরিত্রের একটি গান 'আর কেন মা ডাকছ আমায়' গাইবার সময় তাঁর ভাবাবেগের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সেদিনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে জীবনীকার লিখেছেন: "আমি তাঁহার অতখানি পরিবর্তন দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, কিছুক্ষণ তাই বাক্যস্ফূর্তি হইল না।"[১৮]

সেই মাতৃমন্ত্রে ছিল কবির অকৃত্রিম শরণাগতি:

"আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে
বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি
মা, তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেয়েছি শ্যামা
আর তো তোমায় ছাড়ব না মা
ওমা ঘরের ছেলে পরের কাছে
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।"[১৯]

'বঙ্গনারী' নাটকের মধ্যে কেদার চরিত্রটিও এক আকর্ষণীয় সংযোজন। পরার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কেদার নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে অপরের জন্য কারাগারও বরণ করেছে। তার মুখে বিচিত্র ভাষার গালাগালিতে আছে সহজ সারল্য। সে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব ও নিষ্কাম কর্মের প্রতিভূ। নাটকের অপর চরিত্রের (সদানন্দের) কথায় তার পরিচয় ফুটে উঠেছে: "এরকম সরল গোঁয়ার ভটচার্যি বাংলার ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজি শিক্ষার সংঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তারই দু'এক টুকরো এখানে ওখানে পড়ে আছে··· এ জিনিস ভারতের নিজস্ব··· এ আর কোন দেশে নাই।"[২০]

ভারতীয় হিন্দু সমাজে তথাকথিত মূর্খশ্রেণীর মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল খুঁজে পেয়েছেন জীবনের অনাবিল মহত্ব। তাঁর মানসমুক্তিই এই নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গি গড়ে তুলেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল নব্যবঙ্গীয় প্রজন্মের প্রতিভূ—তিনি যুক্তিবাদী ও জড়বাদে বিশ্বাসী—এ পরিচয়ে তাঁর আংশিক চরিত্রই ফুটে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্র আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল মানুষ, আধ্যাত্মিকতা তাঁর জন্মগত। সেই আধ্যাত্মিকতাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে জীবনের শেষ লগ্নে।

১৮ দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫০৮
১৯ দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী (২য় খণ্ড), পৃঃ ৩১১
২০ ঐ, পৃঃ ৪৭৪

শতাব্দীর লেখক টি. এস. এলিঅট

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে-কোন বড় লেখক সম্পর্কে তাঁর শতবার্ষিকীতে মূল্যায়ণ করা কঠিন ; সে-লেখক যদি টমাস স্টার্নজ এলিঅটের মতো বিশ্ববিশ্রুত হন, তা হলে তো সে-কাজ আরও কঠিন। বার্নার্ড শ'-সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'শতাব্দীর মানুষ'। টি. এস. এলিঅট (জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮) সম্বন্ধে বলা যায়, 'শতাব্দীর লেখক'। কবি, নাট্যকার, সমালোচকরূপে তো তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেইছেন, এ ছাড়া বেশ কিছু ভাল সামাজিক প্রবন্ধাবলীর তিনি রচয়িতা। 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা দেওয়ার তিনি যে-প্রচেষ্টা করেছেন, তাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এলিঅট যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন তখন তাঁকে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে পড়াশুনা করতে হয়েছিল। তাঁর অধ্যাপকদের মধ্যে একজন, আর্ভিং ব্যাবিট, বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এলিঅট ছিলেন ব্যাবিটের ভক্ত, তাই বৌদ্ধধর্মের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এক সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার কথাও ভেবেছিলেন।

আধুনিকতার অন্যতম প্রবর্তক এলিঅট। তাঁর প্রভাবের পরিধি শুধু পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর "প্রেলিউডস" কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির অসামান্য অনুবাদও আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে :

You tossed a blanket from the bed,
You lay upon your back, and waited ;
You dozed, and watched the night revealing
The thousand sordid images
Of which your soul was constituted.

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমোচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে এলিঅটের "দি জার্নি অব দি ম্যাজাই" কবিতার অনুবাদ করেছেন "তীর্থযাত্রী" নামে। বাঙালী কবিদের উপর এলিঅটের প্রভাব নিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর 'মিঃ এলিয়ট অ্যামাং দি অর্জুনস' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। 'এলিঅটের কবিতা' অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

"এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যতঃ এই আত্ম-সচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্ম-সচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন।... সাহিত্যের ইতিহাস যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার, সে-বোধও এলিঅটের সাহায্যে তীব্র হল। তিনি আমাদের সাহিত্য অর্থাৎ এক প্রকার কর্মের দীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্ধন দুইই করেন।"

যুগান্তকারী 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' (১৯২২) কাব্যের শেষ সর্গে এলিঅট একটি সুন্দর ভারতীয় নিসর্গ-চিত্র অংকন করেছেন :

Ganga was sunken, and the limp leaves
Waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant.

গঙ্গার ঘোলাটে জল তলায় ঠেকেছে, এবং নিস্তেজ পাতাগুলি
বৃষ্টির অপেক্ষা করছে, কালো মেঘেরা ওদিকে
দূরের হিমবন্তের ওপর পুঞ্জিত।

(অনুবাদ : বার্ণিক রায়)

এই পঙ্‌ক্তিগুলির একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, এখানে আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে, অর্থাৎ 'The Waste Land' বা 'পড়ো জমি' কাব্যের শেষাংশে নতুন সুর। এই নতুন সুরের জন্য এলিঅটকে প্রাচ্যের অভিমুখে আসতে হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত কাব্যটিতে মোটামুটি নৈরাশ্যের ধ্বনিই ঝঙ্কৃত। এই নৈরাশ্য কাব্যের নামকরণেই রয়েছে। যে-আধুনিক সংস্কৃতি তার মূল্যবোধ ও সৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে বিধ্বস্ত ও বন্ধ্যা পড়ো জমি তারই প্রতীক। সেখানে মৃত বৃক্ষ কোন ছায়া দেয় না মানুষকে মূষিকের সুড়ঙ্গে বাস করতে হয়। মেঘের পরে মেঘ জমেছে এবং ফলে যে-আঁধারের সৃষ্টি হয়েছে তা আসন্ন বৃষ্টিপাতের সূচনা করে। এই বর্ষণের আসন্নতার মধ্যে রয়েছে পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশা।

'পড়ো জমি'তে যে-এলিঅটকে আমরা পাই সে-কবি হতাশায় ক্লান্ত ও সংশয়ে দীর্ণ। ক্রমশঃ তিনি "অ্যাশ-ওয়েনেসডে"র পথ চেয়ে 'ফোর কোয়ার্টেটস' (১৯৪৩)-এর গভীর বিশ্বাস ও আস্তিক্যে উপনীত হবেন। এই কাব্যে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে। কাল থেকে মহাকালে এবং শব্দ থেকে নৈঃশব্দ্যে। তাঁর পঙ্‌ক্তিগুলি এসেছে মন্ত্রের মতো এবং উচ্চারণের পরেও থেকে গেছে মূর্ছনা :

Words move, music moves
Only in time ; but that which is only living
Can only die. Words, after speech, reach
Into the silence.

("Burnt Norton")

শব্দেরা চলিষ্ণু, সুরও চলে শুধু
কালে কালক্ষেপে ; কিন্তু যা কিছু জীয়ন্ত
সে শুধুই মরে। শব্দেরা কথার শেষে
পেঁছায় নৈঃশব্দ্যে।

(অনুবাদ : বিষ্ণু দে)

এলিঅট যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন তখন তাঁকে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধ-ধর্ম বিষয়ে পড়াশুনা করতে হয়েছিল। তাঁর অধ্যাপকদের মধ্যে একজন, আর্ভিং ব্যাবিট, বৌদ্ধ-ধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এলিঅট ছিলেন ব্যাবিটের ভক্ত, তাই বৌদ্ধধর্মের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এক সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার কথাও ভেবেছিলেন।

এলিঅটের নানা রচনায় ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও মরমিয়াবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড', 'ফোর কোয়ার্টেটস' এবং দুটি কাব্যনাট্য 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথীড্রাল' ও 'দ্য ককটেল পার্টি' এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগবদ্গীতা ছিল এলিঅটের প্রিয় গ্রন্থগুলির অন্যতম। তাঁর 'দান্তে'—প্রবন্ধে তিনি গীতা-সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই গ্রন্থ : "the next greatest philosophical poem to the 'Divine Comedy' within my experience." ("আমার অভিজ্ঞতাতে 'ডিভাইন কমেডি'র পর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাব্য।")

'দ্য ড্রাই স্যালভেজেসের' তৃতীয় অংশ এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে আরম্ভ হচ্ছে : "I sometimes wonder if that is what Krishna meant…" ("আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কৃষ্ণ কি তাই বোঝাতে চেয়েছেন…")

'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের' শেষের দিকে এলিঅট 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্' স্মরণ করেছেন এবং শান্তির ললিত বাণী দিয়ে কাব্য শেষ করেছেন :

Shantih Shantih Shantih

(শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ)

গান্ধী—নেহরু, ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

অমলেশ ত্রিপাঠী

শতাব্দীর পঞ্চম দশকে সদ্য স্বাধীন এশীয় ও আফ্রিকী দেশের উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে উঠেছিল 'ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার বিতর্ক'। পরবর্তী কালে ঐতিহ্যের বদলে 'প্রবহমানতা' ও আধুনিকতার বদলে 'পরিবর্তন' শব্দ ব্যবহার চালু হয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলতে থাকেন মহাত্মা গান্ধী যদি হন ঐতিহ্য তথা প্রবহমানতার প্রতীক, তবে নেহরু হলেন আধুনিকতা তথা পরিবর্তনের। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে। গান্ধী ও তাঁর নরমপন্থী গুরু গোখলে, এমনকি, চরমপন্থী তিলকের মধ্যে একটা প্রবহমানতা সুস্পষ্ট। দাদাভাই নওরজি কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) যে 'স্বরাজ'-কে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তিলক যাকে, অন্য অর্থে হলেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন, ১৯২০-তে তাই ছিল গান্ধীর লক্ষ্য। ১৯৩০-এ পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য বলে ঘোষিত হলেও ক্রিপ্‌স-দৌত্য পর্যন্ত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্থেই তার ব্যাখ্যা করা হতো। আবার উপায়-এর ব্যাপারে চরমপন্থীদের কাছে গান্ধীর ঋণ কম নয়। সত্যাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গুণগতভাবে পৃথক হতে পারে, কিন্তু ব্যাপক অর্থে বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ তার মুখ্য অঙ্গ। চরমপন্থীদের মতোই গান্ধী কাউন্সিলকে মায়া মনে করতেন, ১৯২৪-এ স্বরাজীদের কাছে এবং ১৯৩৬-এ দক্ষিণপন্থীদের কাছে অনেক দ্বিধার পর তিনি কাউন্সিল প্রবেশের বিষয়ে আত্মসমর্পণ করেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এত সরব হয়েও তাদের অমিত বীর্য ও অসামান্য আত্মদানের বহু প্রশংসা তিনি করেছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অহিংসাবাদী বলেছেন, ভীরুতার চেয়ে হিংসা শ্রেয়। ধর্মযুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ থাকলেও দুয়ের মধ্যে সেতু বেঁধে দিয়েছিল গীতা। গান্ধীর সঙ্গে হিন্দুধর্মের নাড়ীর যোগ কোনও দিন কাটেনি। অশনে বসনে, চলনে বলনে, সত্য-অহিংসা-অস্তেয়ভিত্তিক নৈতিক মানদণ্ড ব্যবহারে, রামরাজ্যের আদলে স্বাধীন ভারত গড়ার স্বপ্নে গান্ধী বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে নিজের ভাবনা ও জীবনচর্যার মধ্যে সংহত, সমন্বিত, প্রতিফলিত করেছিলেন।

অন্য দিকে তাঁর পুত্রাধিক শিষ্য নেহরু বাইরে থেকে আধুনিকতার প্রোজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। শৈশবে ব্রুকস সাহেব তাঁর মধ্যে থিওসফির বীজ কতটা বুনতে পেরেছিলেন বলা যায় না, তবে কৈশোরের প্রারম্ভেই হ্যারো-কেমব্রিজের ধারা বর্ষণে তা ধুয়ে মুছে যায়। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, তখন cyrenaicism অর্থাৎ ভোগবাদ ছিল তাঁর জীবন-দর্শন। অমিতবিত্ত পিতার প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুত্রের, পশ্চিমী সভ্যতার আবহাওয়ায় পালিত এবং ওয়াইল্ড, পেটার প্রভৃতির ডেকাডেণ্ট সংস্কৃতিতে লালিত যুবকের না ছিল ধর্মবিশ্বাস না স্বভাবসংযম। এমনকি সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা (মাদাম কুরি, আইনস্টাইন, প্ল্যাক) যখন পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয় জাগাচ্ছেন, বের্গসঁ ডারুইনের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ, নেহরুকে বিচলিত হতে দেখি না। ভারতীয় চরমপন্থা সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতি ছিল বাহ্যিক, ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য হলেও সমাজতন্ত্রে আগ্রহ স্বল্প।··· নেহরু বলেছিলেন, "দশ বছর আগে যখন দেশে ফিরলাম, আমি তখন ভারতীয়ের চেয়েও ইংরেজ ছিলাম বেশি। জগৎটাকে আমি ইংরেজদের চোখে দেখতাম।"

ভারত তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন গান্ধীর মধ্যে। অব্যবহিত পরে—রায়বেরিলির কৃষকের মধ্যে। মনে হল গান্ধীই তো 'আর্কটাইপাল' কৃষক, যিনি সকল শোষণবন্ধনমুক্ত স্বনির্ভর গ্রামসমাজের মধ্যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন আর সে-স্বপ্ন লক্ষ লক্ষ কৃষকের মনে সঞ্চার করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে

এত ব্যাপক ও জোরদার করেছেন। কিন্তু চৌরি-চৌরার পর অসহযোগ প্রত্যাহার তাঁর মনে সংশয় জাগাল। গান্ধীর পথে কি ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হবে? কৃষক ফিরে পাবে তার হৃত সম্পত্তি ও সম্মান? ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাসেলসে ঔপনিবেশিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে, রাশিয়া ঘুরে, তাঁর মনে মার্ক্সবাদী সমাধানের বিকল্প জাগল। গান্ধীর বোধিবাদী, অবৈজ্ঞানিক, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা আধুনিকতার পরিপন্থী। এ কি নয় পুনরুজ্জীবনের আলেয়া? প্রাক্-শিল্পবিপ্লবকালীন অতীতমুখী বিশ্ববীক্ষা? তাঁর মনে হল আধুনিকতার চাবিকাঠি—কৃৎ-কৌশলের আমূল পরিবর্তন ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের অবলোপ, প্রয়োজন হিংসাত্মক বিপ্লব।

১৯২৮ ও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী ও নেহরুর মনোমালিন্য 'হিন্দ স্বরাজ'-এর ভাবনার সঙ্গে মার্ক্স-বাদের লড়াই, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার লড়াই।...

১৯২৯-এ তিনি বললেন, গান্ধীর নেতৃত্ব মানলেও অহিংসাকে তিনি নীতি বলে মানেন না; তিনি সমাজতন্ত্রী ও রিপাবলিকান। এই ঘোষণায় অবশ্য একটা ক্ষমাপ্রার্থনার সুর লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ার আদর্শ অনুকরণ করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। ভারতের মাটি ও জলে তৈরি হবে ভারতীয় সমাজতন্ত্র। তা কথা কইবে ভারতীয় ভাষায়। অর্থাৎ এ সমাজতন্ত্র ঠিক মার্কসীয় সমাজতন্ত্র নয় বরং গান্ধীর (বা উইলিয়াম মরিসের) ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ধার ঘেঁষা।...

অন্য দিকে গান্ধীও যে তাঁর মধ্যযুগীয় চিন্তায় অটল অচল ছিলেন তাও নয়। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার দিকে প্রবণতা তাঁর বাড়ছিল। বর্ণাশ্রমে আস্থা নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি। অথচ ১৯২৫-এর পর থেকে হরিজন-সমস্যা তাঁকে বিচলিত করে এবং ১৯৩২-৩৩-এ তা রাজনৈতিক সমস্যাকেও ছাপিয়ে যায়। পুনা চুক্তিতে বর্ণহিন্দুকে কঠিন ত্যাগে বাধ্য করেন তিনি। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমে অছিতত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ও শ্রেণী-সংগ্রামের ঘোর বিরোধী গান্ধী ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রাক্কালে, লুই ফিসারের কাছে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের কথা বলছিলেন। ভারী শিল্পের প্রচণ্ড বিরোধিতা আর তিনি করছেন না। সীমা-বদ্ধ ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে তাকে সংযত রাখতে চেয়েছেন। কুটিরশিল্পকে তা সহায়তা করবে—গ্রাস করবে না, পরিবেশকে দূষিত করবে না, গ্রামকে শহরের বস্তিতে পরিণত হতে দেবে না, সরল জীবনচর্যাকে ভোগবাদের হাতে সঁপে দেবে না। পঞ্চায়েত ও সমবায় এই দুই স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে গ্রামের স্বনির্ভর রাজনীতি ও অর্থনীতি। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্কিং কমিটি কৃষক ও মালিকের অন্তর্বর্তী মধ্যস্বত্ব বিলোপের সিদ্ধান্ত নেয়। গান্ধীর লক্ষ্য নেহরুর লক্ষ্যের অনেক কাছে এসেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গে দেখি মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যবহারে ও আলোচনায় গান্ধী যতটা সহিষ্ণুতা ও উদারতা দেখিয়েছেন নেহরু ততটা নয়। গান্ধীর হিন্দুধর্ম তো শুধু হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর ঈশ্বর ঈশোপনিষদের সর্বব্যাপী ঈশা, যিনি সর্বদেশকাল ব্যাপী। তাঁর চোখে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আলাদা শুধু আচারের ক্ষেত্রে। তাঁর দৈনন্দিন প্রার্থনার সুর বৈদিক মন্ত্র থেকে কোরানের সুরায় বাঁধা। যিনি খিলাফতকে অসহ-যোগের সঙ্গে মেলান, ১৯২৮-এ পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ সমর্থন করেন, জিন্নার দিকে বারংবার প্রীতির হস্ত বাড়ান, এমনকি মাউন্ট-ব্যাটেনকে জিন্নার হাতে সরকার গঠনের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলেন, যিনি দিল্লী, কলকাতা ও বিহারে মুসলিম প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে হিন্দুদের বিরাগ-ভাজন হন ও শেষ পর্যন্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বলি হন, তাঁর মতো সেক্যুলার কে? অন্য দিকে নেহরু রিপোর্ট তৈরি হওয়ার সময়, ১৯৩৭ ইউ. পি. মন্ত্রিসভা গঠনের বেলায়, জিন্নার সঙ্গে আলোচনায়, ক্যাবিনেট মিশনের পরবর্তী ঘোষণায় নেহরুর অসহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাঁর সেক্যুলারি-জম অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপীয় ঐতিহ্য থেকে পাওয়া আর গান্ধীর সেক্যুলারিজম ভারতীয় মূল থেকে আহরিত। যে-অর্থে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ হিন্দু হয়েও সেক্যুলার, গান্ধীও সেই অর্থে সেক্যুলার।...

বস্তুতঃ গান্ধী ও নেহরুর ভূমিকা পরিপূরক, পরস্পরবিরোধী নয়। ঐতিহ্য ও আধুনিকতা কী,

ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করলে তাও হবে পরিপূরক। ঐতিহ্যের মধ্যেই কিছু সম্ভাবনা থাকে যা আধুনিকীকরণে সহায়তা করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রকৃত হিন্দুধর্মের নবব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল। তারও আগে সংস্কৃত ভাষার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যসৃষ্টিতে, পরাশরস্মৃতিকে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে। তারও আগে রামমোহনের উপনিষদ্ ব্যাখ্যা ও রামকৃষ্ণের সমন্বয় হিন্দুধর্মের একটা যুক্তিবাদী, সর্বজনীন, উদারপন্থী ভিত্তি তৈরি করেছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে কী বিরাট সম্পদ ও সম্ভাবনা নিহিত আছে তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তাঁরা এও জানতেন এই ঐতিহ্য সম্পূর্ণ নয়। তারও প্রয়োজন আছে বিদেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, নীতি, প্রযুক্তি আহরণের। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে গান্ধী জোর দিয়েছিলেন ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর ; আর নেহরু বিদেশ থেকে উপাদান আহরণের উপর। দুয়ে মিলে বৃত্ত সম্পূর্ণ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস যত্ন সহকারে পড়তে শুরু করেন নেহরু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, জেলে বসে। যখনই তিনি জেলে থাকতেন, এটাই ছিল তাঁর প্যাশন। লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার, গ্লিমপসেস অব ওয়ার্লড হিস্টরি, ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া পড়লে বোঝা যাবে ভারত ও এশিয়ার ঐতিহ্য কী-ভাবে তাঁকে আছন্ন করছে। এক দিকে পাশ্চাত্য জগতের বৃহৎ যন্ত্র, অন্য দিকে সারনাথ বুদ্ধ, এক দিকে টেনেসিভ্যালি প্রকল্প, অন্য দিকে অজন্তার গুহাচিত্র, এক দিকে ইউরোপীয় কর্ম ও উদ্যোগের প্রচণ্ড গতিবেগ, অন্য দিকে মহাভারতের শূন্যময় শান্ত পরিণাম, আর গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ। বইয়ের বাইরে এসে দরিদ্রের কুটিরে দেখলেন সে-ঐতিহ্য সমানে চলেছে, বাইরের বৈপ্লবিক বিপর্যয়ের আঘাতে ভেঙে পড়েনি ধৈর্য, বীর্য, শান্তি, প্রেম, ত্যাগের আদর্শ। গান্ধী চাইছিলেন এর উৎসমুখে ফিরে যেতে, নেহরু চাইছিলেন এর নিরুদ্ধ স্রোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারা বইয়ে দিতে। স্বাধীনতার পর পারমাণবিক মারণাস্ত্রের ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড দেখে অহিংসাকে তিনি নীতি বলে মানছিলেন। বেন্থামীয় উপযোগিতাবাদের ওপর নির্ভর না করে ব্যক্তির গুণগত উত্বর্তনের পেছনে ধর্মের প্রেরণা সঞ্চার দরকার, এমন উপলব্ধি তাঁর হচ্ছিল। সমাজতন্ত্র তাঁর কাছে অন্ধ বিশ্বাস ছিল না, ছিল "এ হিউম্যানিস্টিক ক্রিড, প্লেসিং ইট্‌স মেজর এমফ্যাসিস অন দি ফুলফিলমেণ্ট অব দি ইণ্ডিভিজুয়াল।" এর পেছনে মার্ক্সকে দেখি না, দেখি শ'কে, টনিকে, উইলিয়াম মরিসকে, হয়তো বা গান্ধীকে। স্তালিনের কৃষি আধুনিকীকরণের অমানবিকতা দেখে তিনি ওদিকে যাননি, উন্নত কৃৎকৌশল দ্বারা উৎপাদনবৃদ্ধি ও সমবায়িক বিতরণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়রক্ষার পণ বেছে নিয়েছিলেন। হয়তো তাতে জোতদার ও ধনী চাষীদের সুবিধে বেশি হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্যটা মন্দ ছিল না।

এখানে দেখব তিনি ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণ ব্যক্তি ও সমাজ, মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চাইছেন যা ভারতের প্রকৃতিগত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা সর্বজনীনতা ছিল যা বেদান্ত সঞ্চারিত করে দিয়েছিল ভারতীয় চিন্তাধারায়। যেটা সামাজিক ন্যায়ে প্রতিফলিত করার দায়িত্ব তিনি আমাদের উপর অর্পণ করে গেছেন। তাঁর শতবার্ষিকীর লগ্নে যেন তাঁর অনারব্ধ বা অসমাপ্ত কাজের ক্ষুদ্র সমালোচনা দিয়ে দায় না সারি। রুশো বলেছিলেন, "কমনওয়েলথের স্রষ্টা তিনি যিনি এক শতাব্দীতে ফসল বোনেন, অন্য শতাব্দীতে ফসল তুলবেন বলে।" ফসল তিনি বুনে গেছেন, তার আগাছা কেটে, তাতে সার-সেচ দিয়ে, তাকে ঘরে তুলে এবং সর্বোপরি, সকলের মধ্যে সুষম বন্টন করে আমাদের দায়িত্ব পালন করার দিন এল।*

* জওহরলাল নেহরুর জন্মশতবর্ষ (জন্ম: ১৪ নভেম্বর ১৮৮৮) উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৪ নভেম্বর, ১৯৮৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

'জিন' পরীক্ষাদ্বারা ভাবী রোগ নির্ণয়

কোন কোন ধূমপানকারীর ফুসফুসে ক্যানসার হয়, আবার কেউ কেউ সারাজীবন আরামে ধূমপান করে চলেন। কোন লোকের ৪০ বৎসর বয়স হবার আগেই হৃৎপিণ্ডের অসুখ হয়; আবার তার ভাই হয়তো পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে চলেছে। কেন এরূপ হয়—চিকিৎসকরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর উত্তর জানতেন না। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ঠিক ততটা অজানা নয়। প্রজনন-শাস্ত্র মতে মানুষের সকল বিশেষত্বের ও বিভিন্নতার জন্য দায়ী তার 'জিন' (Gene)। জিনগুলি প্রত্যেক দেহকোষের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোম (chromosome)-এর মধ্যে থাকে যা বংশগতির কারণবস্তু। গত কয়েক বছর ধরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা 'জিন' এর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝেছেন যে, এক ধরনের জিন-গোষ্ঠী হৃৎপিণ্ডের অসুখের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে, অন্য ধরনের গোষ্ঠী ডায়াবেটিসের, এবং তৃতীয় ধরনের জিনগোষ্ঠী ক্যানসার হবার সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বৈজ্ঞানিকরা বিচ্ছিন্ন তালু (cleft palate) ও দুইরকমের মানসিক রোগের জিন চিহ্নিত করেছেন। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে একদল ব্রিটিশ গবেষক জীব-কোষে জন্মসূত্র লব্ধ এক ধরনের প্রোটিন পেলেন, যার সঙ্গে এইড্স (AIDS) হবার যোগসূত্র রয়েছে। অনেকেই জানেন যে, এইড্স ভাইরাস শরীরে ঢুকলে সকলের এইড্স রোগ হয় না; কারও কারও হয়। 'কোলাবোরেটিভ রিসার্চ' নামে এক আমেরিকান সংস্থা কিছু-দিন আগে জীবকোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম-এ থাকা সমগ্র জিনগুলির পরস্পর সংযুক্তির (linkage) একটা তালিকা প্রকাশ করেছে। এর দ্বারা, যেসব রোগ (সংখ্যায় প্রায় ৩০০০) বংশগতি সূত্রে (hereditary) মানুষের হয়, সেগুলির অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হবে। তার ফলে, যাদের ঐ সব রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে তারা নানা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে।

প্রজনন শাস্ত্র (genetics) মতে মানুষের সকল বিশেষত্বের ও বিভিন্নতার জন্য দায়ী তার জিন যা সে তার পিতা-মাতা থেকে পায়। অবশ্য জিনসম্পর্কীয় নতুন অনু-সন্ধান পদ্ধতিগুলি এখনও অনেকাংশে বিবেচনাধীন। যাঁরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের রক্ত নিয়ে ১৪টি অসুখের সম্ভাবনার ব্যাপারে ৪০ ধরনের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এই রোগগুলির মধ্যে আছে ক্যান-সার, ডায়াবেটিস, দাঁতের অসুখ, হৃৎপিণ্ডের করোনারি অসুখ প্রভৃতি। অবশ্য গবেষকরা খুব বেশি আশা করা সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছেন। বর্তমানে পরীক্ষার দ্বারা ত্রুটি-পূর্ণ জিনকে সরাসরি ধরা সম্ভব হচ্ছে না। ত্রুটিপূর্ণ জিনের আশেপাশে সুস্থ জিনগুলির সাজানো ব্যবস্থা (যা 'মার্কার' নামে অভিহিত হয়) লক্ষ্য করে ত্রুটিপূর্ণ জিনকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই প্রথা কিন্তু পরোক্ষ (indirect) উপায়। তাছাড়া ত্রুটিপূর্ণ জিন ছাড়াই সন্তান পিতামাতা হতে মার্কার জিন পেতে পারে। এর উপর, এই পরীক্ষাগুলি সময়সাপেক্ষ এবং এতে খরচ পড়ে অনেক। মনে হয় নব্বই-এর দশকে ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সরাসরি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা হতে এ-বিষয়ে অগ্রগতির অনেক খবর আসছে।

হৃৎপিণ্ডের অসুখ:

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডালাস-এর ইউনিভারসিটি অফ টেকসাস হেল্থ সায়েন্স সেন্টার হতে দুজন বংশগতিবিশারদ ডক্টর মাইকেল ব্রাউন ও ডক্টর জোসেফ গোল্ড-স্টাইল, একটি জিনের মিউটেশন (Mutation) অনিয়ন্ত্রিত এলো-মেলো পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন, যার সঙ্গে ৪০-৫০ বৎসর বয়সে

অকালীন এ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস (Atherosclerosis—যা হতে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়) রোগের সম্পর্ক রয়েছে। এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে আরও কয়েকটি জিন চিহ্নিত হয়েছে যাদের সঙ্গে ৬০ বৎসর বয়সের হৃৎপিণ্ডের অসুখ সংশ্লিষ্ট। হৃৎপিণ্ডের অসুখ সংক্রান্ত জিন চিহ্নিত করার কাজে কয়েকটি বায়োটেক্ (Biotech) সংস্থা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে চলেছে। 'ক্যালিফোর্নিয়া বায়োটেকনোলজি' মনে করে, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তারা এ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস-এর জিন চিহ্নিত করতে পারবে। ঐ সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, "কাদের এই অসুখ হবে এটা যদি আমরা বলতে পারি, তাহলে একটা মস্ত কাজ হবে। জিনকে অবশ্য পরিবর্তন করা যাবে না, কিন্তু দুশ্চিন্তা, ব্যায়াম, ধূমপান, খাদ্য—এগুলির পরিবর্তন সম্ভব"।

ক্যানসার:

আশির দশকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিকরা জানালেন যে, ক্যানসার ব্যাপারে প্রায় ৪০টি জিন সম্পর্কিত। এগুলি দেহকোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, তবে এগুলি বিকল হলে ক্যানসার হতে পারে। মিনেসোটা মেডিকেল স্কুল হতে ডাঃ ইউনিস জানাচ্ছেন যে, ৭০ শতাংশ ক্যানসার সৃষ্টিকারী জিন পিতামাতা হতে প্রাপ্ত ক্রোমোজোমের দুর্বল অংশে থাকে। এই দুর্বল অংশগুলির উপর এক্স-রে, এবং কয়েকটি রাসায়নিক সামগ্রী সহজেই ক্ষতি সাধন করতে পারে। ডক্টর ইউনিস লিউকিমিয়াতে এবং কয়েক প্রকার ফুসফুসের টিউমারে এই ধরনের পরিবর্তন দেখতে সক্ষম হয়েছেন। পেট্রোলজাত সামগ্রী, বিশেষতঃ কীটনাশক ওষুধ, ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে দুই জোড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অনুরূপভাবে, তামাকজাত দ্রব্য এবং ধোঁয়া আর একটি ক্রোমোজোমকে আক্রমণ করতে পারে।

এইডস:

লক্ষ লক্ষ লোক এইডস ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশের রোগ দেখা যায় না। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা এখন জানতে পেরেছেন যে, কাদের এই রোগ হবে তা আংশিক ভাবে নির্ভর করে তাদের জিন-এর উপর। লণ্ডনের সেন্ট মেরিজ হসপিট্যাল মেডিকেল স্কুলের ডাঃ পিনচিং মানুষ ও জন্তুর দেহকোষের গায়ে ছয় ধরনের প্রোটিনের সংযোগ (combination) লক্ষ্য করেছেন। এক ধরনের সংযোগ যাদের দেহকোষে পাওয়া যায়, তার এইড্স রোগকে প্রতিহত করে; আর এক ধরনের সংযোগ হলে এইড্স রোগ হবার খুব সম্ভাবনা; এ-ছাড়া অন্য ধরনের সংযোগে রোগ হবার প্রবণতা মাঝামাঝি।

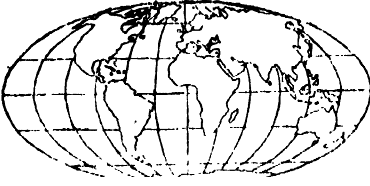
গর্ভে থাকা সন্তানকে পরীক্ষা করে তার প্রৌঢ়, বা বৃদ্ধ বয়সে কি রোগ হতে পারে, তা জানা একেবারে অসম্ভব নয়।

উপরোক্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে আসা গবেষণালব্ধ ফলের অর্থ কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে আবার মনে করেন যে, তাঁদের শরীরস্থ জিনের খবর তাঁদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যতে কি অসুখ হবে, এ-বিষয়ে সংবাদ পিতামাতা কি ভাবে নেবেন? অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যত বেশি ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে, তত বেশি অনিশ্চয়তা এসে যাচ্ছে। জিন পরীক্ষা দ্বারা রোগের প্রবণতা ধরা যায়, রোগ যে হবেই তা বলা যায় না। অজাত শিশুর অসুখের সম্ভাবনা শুনে যদি কেউ শিশুকে নষ্ট করে বা ভাবী অসুখের সম্ভাবনা শুনে যদি কেউ নিজ জীবিকার ধারা পরিবর্তন করে, তাহলে কি ভাল হবে? ভবিষ্যতে অসুখের সম্ভাবনার কথা তো অনেকেই শুনছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধূমপান তো আজও লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানির কারণ হচ্ছে।

তাঁরা আরও দেখেছেন যে মেদবৃদ্ধি, অপুষ্টি এবং রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি আরও কয়েকলক্ষ লোকের জীবন নাশ করছে। তবে ইউ. এস. অফিস অফ ডিজিস প্রিভেনশনের ডাইরেক্টর মাইকেল ম্যাকগিনিস-এর মতে পরীক্ষা দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ জিন চিহ্নিত করা থাকলে তখন লোকে 'কেন আমার হল' বলতে পারবে না, বলবে 'আমার কেন হল না'।*

* (Reader's Digest, April 1988-এ প্রকাশিত 'Genes that predict Disease' প্রবন্ধ অবলম্বনে।)

উপস্থাপন: জলধিকুমার সরকার



বাতায়ন

পশ্চিম জার্মানী : অর্থনীতি ও শিল্প

পশ্চিম জার্মানীতে কারখানায় রোবোট বাড়ছে, কিন্তু চাকরি কমেনি

ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর অনেক কারখানাতেই এখন রোবোটদের রমরমা। এইসব কারখানার 'অ্যাসেম্বলি লাইনের' দিকে তাকালেই চোখে পড়বে সার সার যন্ত্রকর্মী, কেউবা আকারে বড়, কেউবা ছোট, নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছে। কেউ তাদের ইস্পাতের লম্বা হাত দিয়ে ধাতব পাত জোড়া লাগাচ্ছে, কেউ জোড়-মুখ ঝালাই করছে, কেউ ড্যাসবোর্ড ইউনিটকে যথাস্থানে বসাচ্ছে এবং নিজে-দের কাজ কতটা নিখুঁত হল পরীক্ষা করছে। সব কিছুই যেন হয়ে যাচ্ছে কোনও মানুষের চোখ বা হাতের সাহায্য ছাড়াই। টেকনিসিয়ানরা কেবল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন, রোবোটরা যাবতীয় নির্দেশ পাচ্ছে কম্পিউটার থেকে।

মোটর গাড়ি নির্মাণকারী 'আউদি' সংস্থার দুটো কারখানাতেই এই চিত্র। আউদি-তে মোট কর্মীসংখ্যা ৪০ হাজার, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এর ব্যবসার পরিমাণ ছিল হাজার কোটি ডি এম (এক ডি এম ভারতীয় মুদ্রায় এখন প্রায় আট টাকা) বাভারিয়ার ইনগোলস্টাট ও নেকারসুলম-এ আউদি-র দুটো কারখানাতে শুধু ঝালাইয়ের কাজই করে ৫৪২টি শিল্প রোবোট। রোবোটরা উঁচুতে ঝালাই, ভারি ভারি যন্ত্রাংশ সরানোর মতো কঠিন কাজও করে। আবার স্প্রে পেইন্টিং-এর মতো স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর কাজও বাদ দেয় না। কারখানার পরিচালন কর্তৃপক্ষ তাদের রিপোর্টে লিখেছেন, রোবোটের সাহায্যে উৎপাদনের এই যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থায় বিপদের সম্ভাবনা যেমন কমেছে, তেমনি সবসময় একইরকম উচ্চমানের উৎপাদনের পথও প্রশস্ত হয়েছে।

জার্মান কারখানাগুলিতে রোবোটের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বছর খানেক আগে ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে ১২ হাজারের মতো রোবোট ঝালাই, ঢালাই, রঙ করা ও যন্ত্রাংশ জোড়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। অথচ ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৫০০। ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সংখ্যাটা ২০ থেকে ২৫ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দূর প্রাচ্যের তুলনায় তখনও অবশ্য আরও অগ্রগতির সুযোগ-সম্ভাবনা থেকে যাবে। জাপানে এখন ১০ হাজার শিল্পকর্মী পিছু রোবোট আছে ৪০ টি, ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী তুলনায় এখনও অনেক পিছিয়ে, মাত্র ৮টি।

রোবোটরা নিরলসভাবে তিন শিফটে কাজ করে। তারা সবেতন ছুটি বা কফি খাওয়ার সাময়িক বিরতি নেয় না। শারীরিক অসুস্থতারই দোহাই দেয় না। তাহলে কি তারা চাকরির সুযোগ নষ্ট করে দিচ্ছে? অনেক শ্রমিকেরই গোড়ায়, এরকম আশংকা ছিল, কিন্তু এই আশংকা নিতান্তই অমূলক। স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যা-লয়ে শিল্পোৎপাদন ইনজিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান হান্স-য়ুর্গেন ভার্নেকে দেখিয়ে দিয়েছেন, জার্মানীতে শিল্প রোবোটের শতকরা প্রায় ৬০টি ব্যবহৃত হয় যে মোটর গাড়ি শিল্পে, সেখানেই গত তিন বছরে সব-চেয়ে বেশি নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মোটর গাড়ি শিল্পের রোবোটের কদর বেশি মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এ। এই দুটি ক্ষেত্রেই রোবোট অত্যন্ত কাজের বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অ্যাসেম্বলী বিভাগের পরিধিটা অনেক ব্যাপক বলে রোবোটের এখনও শৈশব দশা কাটেনি। রোবোট তৈরির ব্যাপারে ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী অনেকাংশে স্বনির্ভর, ১০টির মধ্যে ৯টিই জার্মানীতে তৈরি। বাকি মাত্র ১০ শতাংশ আমদানি করতে হয় জাপান থেকে। জার্মানীতে রোবোট তৈরি করে ফোকসভাগেন, বশ, সিমেন্স রেইস, ক্রুস ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।*

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আজকের জার্মানী (ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর কলকাতাস্থ কনসুলেট জেনারেল দপ্তর থেকে প্রকাশিত), জানুয়ারি, ১৯৮৮



আনন্দের সন্তান

"পূর্ণ তিনি মধুরিমায়, রঙ্গে, লীলায়"

যেমন দেবা তেমনি দেবী। রঙ্গরসেও জুড়ি নেই শ্রীরামকৃষ্ণের, জুড়ি নেই শ্রীমায়েরও। সেক্ষেত্রেও তিনি স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। একদিন মাকে রঙ্গরসে উচ্ছল হয়ে উঠতে দেখে একজন ভক্তমহিলা বললেন : "মা, তুমি এত ঠাট্টাও জান।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এক মহিলা এসেছেন। তাঁর স্বামী কুসঙ্গে পড়ে বিপথগামী হয়েছেন। শুনেছেন দক্ষিণেশ্বরের এই সাধু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। যদি তিনি কোন ওষুধ বা দৈব মাদুলি-কবচ দেন যাতে তিনি তাঁর স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারেন। রহস্য করবার জন্যই বোধ হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন নহবতে। বললেন : "সেখানে একজন মহিলা আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ধর। তাঁর এসব মন্ত্র-ওষুধ জানা আছে। তিনি সঠিক ওষুধ বাতলে দেবেন।" মহিলাটি গভীর আর্তি নিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। মা বুঝলেন রঙ্গপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণের এটি একটি রসিকতা। তিনিও কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন : "আমি আর কি জানি বাছা, তিনিই জানেন ওষুধ। তুমি তাঁরই কাছে যাও। তাঁকেই গিয়ে ধর।" মহিলাটি সেকথা শুনে আবার গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, রসিকতাটি জমেছে। সুতরাং আবার তাঁকে পাঠালেন নহবতে। বললেন : "না, না, উনিই জানেন ওষুধ। তুমি জোর করে ওঁকে গিয়ে ধর।" বিপন্ন মহিলাটি ছুটলেন আবার মায়ের কাছে। মা-ও রসিকতার প্রত্যুত্তরে তাঁকে ফেরৎ পাঠালেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর আবার মায়ের কাছে। অতঃপর ব্যথাতপ্ত নারীর অসহায়তায় বিগলিত জননী রসিকতাকে আর অগ্রসর হতে দিলেন না। তাঁর হাতে তুলে দিলেন পুজোর একটি বিল্বপত্র। বললেন : "এতেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" হয়েও ছিল তাই। কিন্তু রসিকতার উপযুক্ত জবাব দিতে কসুর করেননি রঙ্গপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী।

মা তখন কাশীতে। একদিন বিকেলে কয়েকটি মহিলা এসেছেন। তাঁরা মায়ের কথা শুনেছেন, কিন্তু কখনো দেখেননি। তাই তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। মা বারান্দায় বসেছিলেন। তাঁর আশে-পাশে গোলাপ-মা প্রভৃতিও আছেন। গোলাপ-মা বয়সে প্রবীণ, চেহারাতেও বেশ ভারিক্কী ভাব—অভিজাত্যের ছাপও সুস্পষ্ট। প্রথম দর্শনে মহিলাদের মধ্যে একজন প্রথমে এগিয়ে গিয়ে গোলাপ-মাকেই প্রণাম করলেন। তিনি ভেবেছেন তিনিই শ্রীশ্রীমা। গোলাপ-মাও তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির ভুল ভেঙে দিয়ে মায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন : "ঐ উনিই মা-ঠাকরুণ।" মায়ের সাদাসিধে চেহারা দেখে মহিলাটি ভাবলেন গোলাপ-মা নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে রহস্য করছেন। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। গোলাপ-মা আবার বললেন : "উনিই মা-ঠাকরুণ।" মহিলাটি তখন এগিয়ে গেলেন মাকে প্রণাম করতে। যেই মায়ের পায়ে হাত দিতে যাবেন অমনি মা হাসতে হাসতে গোলাপ-মাকে দেখিয়ে বললেন : "না, না উনিই মা-ঠাকরুণ।" মহিলা স্বভাবতই অপ্রস্তুত। তিনি তখন আবার এগিয়ে গেলেন গোলাপ-মার দিকে। ফলে হাসির রোল উঠল সেখানে। এতে মহিলাটি আরও ঘাবড়ে গেলেন। হতচকিত মহিলাটি কি করবেন বুঝতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত ভাবলেন গোলাপ-মাই আসল মা। তিনি রসিকতা করছেন তাঁর সঙ্গে, তাই গোলাপ-মাকেই মা সাব্যস্ত করে শেষবারের মতো এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। এবার গোলাপ-মার প্রচণ্ড ধমক : "তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা নেই? দেখছ না, মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?"

মায়ের মুখের দিকে তাকালেন মহিলাটি। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি ঐ মহিলার দিকে। সে-দৃষ্টিতে শুধু কি প্রসন্নতাই ছিল, দুষ্টুমিও কি ছিল না?

মা জয়রামবাটীতে আছেন। মায়ের এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা বোন ভাবিনী সেদিন মায়ের বাড়িতে বসে আছেন। ভক্তরা তাঁকে 'ভাবিনী-মাসী' বলে ডাকেন। ভাবিনী-মাসীর বৃদ্ধা মা তখন অসুস্থ। মা সে-খবর শুনেছেন। তাই ভাবিনী-মাসীর হাতে তাঁর মায়ের জন্য কিছু ফল দিয়েছেন। এমন সময় রাঁচি থেকে কয়েকজন ভক্ত এসে উপস্থিত। তাঁরা সঙ্গে এনেছেন অনেক ফল। দেখে ভাবিনী-মাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: "আহা, পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথমে আমারই বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। বাবা তখন পাগল ভেবে তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন না। সেই বিয়ে হলে এসব জিনিস আমারই ঘরে আসত।" মাসীর সেই আক্ষেপ শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। মায়ের মুখেও একটু হাসি দেখা গেল। কিন্তু অন্য সকলের হাসিতে যে উপহাস-জনিত উপভোগ্যতা ছিল, মায়ের হাসিতে তার লেশমাত্রও ছিল না। সে হাসিতে ছিল পরম সহমর্মিতা ও মমত্ব। মাসীকে তিনি বললেন: "তা নে না, তোর আর কি কি চাই।" পাছে মাসী সঙ্কোচ বোধ করেন তাই সেবককে বললেন: "ঠাকুরের জন্য তুলে রেখে পেঁপে, বেদানা, আরও কিছু ফল ভাবিনীকে দাও তো।" পরে মাসীকে বললেন: "পেঁপে যেন তোর মাকে খাওয়াসনে, বড় ঠাণ্ডা।"

রামময় (পরে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ) তখন ছেলেমানুষ। জয়রামবাটীর কাছে বদনগঞ্জ স্কুলে পড়েন। প্রতি শনিবার স্কুলের ছুটি হলে মায়ের কাছে আসেন জয়রামবাটীতে। মাকে সংসারের নানা কাজে সাহায্য করেন। রবিবার থেকে সোমবার, আবার ফিরে যান। শ্রীমার কাছে ইতিমধ্যে তাঁর দীক্ষাও হয়ে গিয়েছে। মা খুব স্নেহ করেন তাঁকে। বলেন: "রামময় আমার মেয়ে।" একদিন মায়ের কাছে অনেক ভক্ত এসেছে। সবাই পুরুষ ভক্ত। রাত্রে তারা মায়ের বাড়িতে থাকবে। তাদের খাবার তৈরি করতে হবে। মাকে সাহায্য করার জন্য কোন মেয়ে ভক্ত সেদিন ছিল না। মা রামময়কে দিয়ে অনেক আটা মাখিয়েছেন। নলিনীদিকে তিনি বললেন: "নলিনী তুই রুটি সেঁক। আমি ও রামময় তোকে বেলে যুগিয়ে দিই।" মা ছোট শ্বেতপাথরের চাকিতে ছোট বেলুন দিয়ে একখানা করে রুটি বেলছেন আর রামময় বড় কাঠের চাকিতে মোটা বেলুন দিয়ে ক্ষিপ্রহাতে একসঙ্গে তিনখানা করে রুটি বেলছেন। কাজ বেশ এগিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ নলিনীদি বলে বসলেন: "পিসীমা, তোমার চেয়ে রামময়ের রুটি ভাল ফুলছে।" যেই না বলা আর অমনি মা ছোট বালিকার মতো ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করে বললেন: "তবে আমি আর বেলব না, ও-ই বেলুক। আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলাম। আর রামময় দুধের ছেলে, গলা টিপলে মুখ দিয়ে দুধ বেরোবে—ও আমার চেয়ে ভাল রুটি বেলছে!" বলেই মা বেলুন-চাকি সরিয়ে দিয়ে বসে রইলেন। রামময়ও বেলুন-চাকি সরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাকে বললেন: "আপনি যদি না বেলেন, তবে আমিও বেলব না। আমিও চললাম।" আর নলিনীদিকে ছদ্ম-ক্রোধে বকলেন: "দুজনে একসঙ্গে দিচ্ছি, তুমি কি করে বুঝলে কোনটা আমার, আর কোনটা মায়ের? আমি কখনো মায়ের চেয়ে ভাল রুটি বেলতে পারি?" রামময়ের এই কথায় মায়ের রাগ গলে জল। মা আবার বেলুন-চাকি টেনে নিয়ে রুটি বেলতে বসলেন। যেন কিছুই হয়নি।

একদিন নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন এসেছেন 'মায়ের বাড়ী'তে। নিবেদিতা বাঙলা বুঝতে পারতেন, কিন্তু ভাল বলতে পারতেন না। দু-চারটে বাঙলা শব্দ শিখেছিলেন অবশ্য। সেদিন এসে মাকে বললেন: "মাতাদেবী আপনি হন আমাদিগের কালীমাতা।" ক্রিস্টিনও ইংরেজীতে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। শুনে মায়ের সে কি হাসি! বালিকার মতো উচ্ছল হয়ে সহাস্যে তিনি বললেন: "না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বের করে থাকতে হবে তাহলে সারাক্ষণ!" মায়ের কথাগুলি সেখানে উপস্থিত একজন কেউ ইংরেজীতে তর্জমা করে দিলেন। নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন মায়ের উত্তর শুনে সহাস্যে

বললেন : "না, না, আপনাকে কষ্ট করে জিব বের করতে হবে না। আমরা এমনিই আপনাকে কালী-মাতা রূপে দেখব, আর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখব শিব-রূপে।" মাকে আবার ওঁদের কথা বাঙলায় তর্জমা করে দেওয়া হল। শুনে মা হাসতে হাসতে বললেন : "আচ্ছা, তাহলে না হয় দেখা যাবে।" নিবেদিতা, ক্রিশ্চিন এবং উপস্থিত সকলে মায়ের সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

কলকাতায় মা তখন প্রথম এসেছেন। কলঘরে গিয়েছেন। যেই কল খুলেছেন অমনি 'ফোঁস ফোঁস' শব্দ হচ্ছে শুনেই 'ওগো সাপ গো!' বলে ছুটে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সবাইকে বলছেন, "কলের মধ্যে সাপ ঢুকেছে।" শুনেই সকলে হেসে কুটি-পাটি। কল অনেকক্ষণ বন্ধ থাকলে যে নলের মধ্যে বাতাস জমে এবং কল খুললেই সেই বাতাস সবেগে বেরিয়ে এসে ঐরকম শব্দ হয় তা কলকাতার লোকের জানা, কিন্তু মায়ের তো সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। হাসতে হাসতে যখন সবাই তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন তখন তিনিও সকলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। পরবর্তী কালে ভক্তদের কাছে ঘটনাটি বলতে বালিকার মতোই মজা পেতেন তিনি।

কলকাতার একটি ভক্ত পরিবারের বউ-এর সম্বন্ধে অন্যদের কাছে খুব প্রশংসা করছেন মা। বললেন : "বউটি খুব বুদ্ধিমতী। ঘড়িতে দম দিতে জানে।"

মায়ের মাথায় মাঝে মাঝে ছেলেমানুষী চাপত। একদিন মা একটি ছোট ছেলেকে খোসামোদ করছেন : "দে বাবা, চারটি ফুল তুলে—লক্ষ্মী ধন আমার।" যেন ফুল তোলার লোকের অভাব! একাধিক সেবক ও সেবিকা ও ভক্তরা তাঁর যে-কোন আদেশ পালনের জন্য সদা উন্মুখ। কিন্তু পাঁচ বছরের বালিকার মতো তিনি বায়না করছেন ঐ বালকটির কাছে। সে-ও কিছুতেই তুলবে না। আর মা-ও ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত বয়স্ক বালিকাটিরই জয় হল। মা ছেলেটিকে দিয়ে ফুল তোলালেন।

ঠিক ঐরকম একদিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামের এক বুড়িকে ধরে অনুনয় করতে শুরু করলেন : "দে মা,পায়ে একটু হাত বুলিয়ে, পা-টা বড় কামড়াচ্ছে।" বুড়িও কিছুতেই মায়ের কথা শুনবে না। সে বলে : "সারাদিন খেটেখুটে আমি এখন ক্লান্ত। এখন সন্ধ্যাবেলা একটু কোথায় জিরোবো,না, আবার বলে পায়ে হাত বুলিয়ে দে। আমি পারব না।" মা তবুও দুষ্টুমি করে বলে চলেছেন : "দে না, একটু হাত বুলিয়ে। কি আর করবি, বাছা বল!" বুড়ি আর কি করে! অগত্যা খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুড়ি মায়ের পায়ে হাত বুলোতে শুরু করল। পাঁচ মিনিট হয়েছে কি হয়নি, মা বললেন, "যা আর বুলোতে হবে না। তুই বিশ্রাম কর।"

বুড়ি তো অবাক। এতক্ষণ ধরে বায়নাক্কা করে পাঁচ মিনিট হতে না হতেই বলে 'আর বুলোতে হবে না!' প্রৌঢ়া বালিকাটির মুখে তখন দুষ্টুমির ঝিলিক।

বাগবাজারে ভাড়াটে বাড়িতে মা আছেন। একদিনের ঘটনা। নিবেদিতা, লক্ষ্মীদিদি, অন্যান্য মহিলাভক্তরা সব সেখানে আছেন। মায়ের প্রশ্রয় পেয়ে নিবেদিতা দুহাত-দুপায়ে ভর দিয়ে সিংহ সেজেছেন। সিংহের ডাক নকল করে তর্জন গর্জন করে হুলুস্থুল কাণ্ড করে দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর তাঁর ওপরে চেপে বসলেন লক্ষ্মীদিদি জগদ্ধাত্রী হয়ে। ওঁদের কাণ্ড দেখে দমফাটা হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন সবাই। সকলের সঙ্গে মা-ও হেসে লুটো-পুটি। আনন্দময়ীর সেই আনন্দরঙ্গে বাগবাজারের ভাড়াবাড়ি তখন আনন্দবাজারে রূপান্তরিত।

উপস্থাপন : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

ত্রিপুরার তীর্থে

দিলীপকুমার দত্ত

উদয়পুর। আগরতলার বটতলা বাস স্টেশন থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মাত্র পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পথ। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের পাকদণ্ডীর ঘূর্ণিপাকে টলায়মান বাসের মধ্যে বিমানযাত্রার স্মৃতিগন্ধ অনিবার্যভাবেই ভেসে আসছিল। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল প্রধানতঃ সেগুন আর পাহাড়ী বাঁশের আদিম বুনো গন্ধ। ছোট্ট শহর 'বিশাল গড়ে'র পর থেকেই প্রকৃতির মাদকতা ক্রমবর্ধমান। 'চড়িলাম', 'ছেচুরী মাই' ছাড়িয়ে আসার পর ত্রিপুরার প্রকৃতি আর বীরভূম, বাঁকুড়ার প্রকৃতি একাকার। লাল মাটির বাড়িঘর রুক্ষতা আর সজীবতার সহাবস্থান, বহুদূরে, অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর নীলাভ দ্যুতি, শাল-সেগুন-অর্জুনের ছায়াঘেরা উঁচুনীচু অরণ্যপথ রূপসী অথচ খর-ব্যক্তিত্বময়ী নারীর মতোই যেন ভুলতে দেয় না কিছুতেই। বীরভূমকে কেন্দ্র করে এ-ধরনের প্রকৃতির সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়ের প্রেমস্নিগ্ধ মিতালি। প্রকৃতির এ হেন পরিবেশে এসে পড়লেই আমি যেন আমার দুরন্ত দামাল ছেলেবেলাকে একান্ত করে ফিরে পাই—তার স্পর্শে, গন্ধে, চঞ্চলতায় মন বিভোর মাতাল হয়ে ওঠে।

বাসে ঠিক একঘন্টার মাথায় 'বিশ্রামগঞ্জ'। গঞ্জই বটে। অজস্র দোকান পাট, হাটবাজার; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকারী কার্যালয়। এখান থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিমে অন্য একটা পথ চলে গেছে 'সোনামুড়া'—ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত। ওপাশে কুমিল্লা জেলা। সে পথের 'মেলাঘর'-এ নেমে রাজঘাট থেকে যাওয়া যায় নীরমহল, রাজস্থানের জয়পুরের মতো 'লেক-প্যালেস।' পনেরো-কুড়ি মাইল পরিধির সরোবর রুদ্রসাগরের বুকে নীরমহল—ত্রিপুরার রাজার বিশাল প্রাসাদ। নেপাল বর্মণের মতো অনেকেই তাদের ছোট ছোট নৌকায় তিন-চার কিলোমিটারের জলপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে দেবার ও সেখান থেকে নিরাপদে রাজঘাটে ফিরিয়ে আনার ভার নেবে হাসিমুখেই। পরিত্যক্ত ও ভঙ্গুর হলেও প্রাসাদের (মুঘল) স্থাপত্য-রীতি আজও দর্শককে মুগ্ধ করে। সৌরশক্তি-চালিত বিদ্যুৎব্যবস্থা রাতের আঁধারে জলের বুকে ফুটিয়ে তোলে আলো ঝলমল এক অতিকায় জাহাজের ছবি। প্রাসাদ পর্যবেক্ষণে দর্শকের সর্বক্ষণ খুব ভাল এবং একান্ত অনুগত একজন সঙ্গী—নীরমহলের রক্ষণা-বেক্ষণকারী অমূল্যচরণ দাসের আশ্রিত বিশাল এক বাঘা সারমেয়। সম্মান-দক্ষিণা দুটি মাত্র বিস্কুট।

বিশ্রামগঞ্জের তিন-চার কিলোমিটার পরেই পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা পথে মিনিট ছ-সাত একটানা চড়াই। এখান থেকেই পশ্চিম-ত্রিপুরাকে পিছনে ফেলে দক্ষিণ ত্রিপুরার শুরু। অপূর্ব মনোহারী দৃশ্যাবলী। চড়াই শেষে উতরাই পথে বাস নেমে আসে 'বাগমা'। নদী পার হয়ে বাজার ছাড়ার পরই আবার উর্ধ্বমুখী যাত্রা। নিবিড় অরণ্যপথে মুহুর্মুহু ইউ-বাঁক বা 'হেয়ার-পিন বেন্ড' বেশ কিছুক্ষণ শরীরটাকে সর্ব-মুখী এক বিচিত্র দোলনার দোলায় আচ্ছন্ন করে রাখে। উতরাইপথে ছোট ছোট উপত্যকা। ফালি ফালি চাষজমিতে সবুজ-হলুদের জাজিম বিছানো। কাঁচা ধানের গন্ধে বাতাস মেদুর। নির্জন প্রকৃতির রহস্যময় নীরবতা যেন বলে ওঠে—"If you do not understand my silence, you will not understand my words"—'আমার নীরবতার অর্থ যদি না বোঝ, আমার কথাও তাহলে বুঝবে না।' তা, বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে অব্যক্ত ভাষায় সে বলে যায় অনেক কথাই। চাষীদের ছোট ছোট শান্ত গ্রাম—'শালগড়া', 'ধবজনগর', 'গোকুলপুর'। স্ট্যান্ডকে ঘিরেই যেটুকু ব্যস্ততা। সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড় পাশে, পিছনে সরে গিয়ে এক সময় চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। অল্প পরেই সুভাষনগর। উদয়পুরের সীমানার শুরু এখান থেকেই। আরও পরে রাধাকিশোরপুর পার হয়ে সেন্ট্রাল রোডে উদয়পুর স্টেশন। আগরতলা থেকে পৌনে দু-ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে দিয়ে টি. আর. এস. ছশো চব্বিশ নিউ টাউন রোড ধরে জগন্নাথদীঘি বা অমর সাগরের পাশ দিয়ে চট্টগ্রাম সীমান্তে ভারতের শেষ সীমানা সাব্রুমের দিকে মিলিয়ে যায়।

সাধারণের কাছে উদয়পুরের প্রধান আকর্ষণ মাতাবাড়ি,—ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর মন্দির— অমরপুরের পথে মাইল তিন-চার। একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান এই মাতাবাড়ি,—সতীর কর্তিত দক্ষিণ চরণের অধিষ্ঠান, ভৈরব ত্রিপুরেশ। এককালে কলকাতা থেকে পথ ছিল গোয়ালন্দ ঘাট, চাঁদপুর হয়ে চট্টগ্রাম মেলে কুমিল্লা স্টেশন, সেখান থেকে রাধাকিশোরপুর হয়ে। এই ত্রিপুরসুন্দরী-মন্দিরের সঙ্গে রঘুপতি-গোবিন্দমাণিক্য কাহিনীর কোন যোগসূত্র নেই। মধ্যে কলসাবশিষ্ট ত্রিপুরসুন্দরীর বর্তমান চারচালা মন্দির ও সামনের মণ্ডপ তৈরি গোবিন্দমাণিক্যেরও শতাব্দীকাল পূর্বে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের আমলে। পথের বামে উঁচু টিলার শিখরে মন্দির, ধাপে ধাপে সিঁড়ি গেছে। মধ্যে অনেকখানি চত্বর পার হয়ে শেষ হয়েছে মন্দির চত্বরে। নিচের চত্বরে পুজোপকরণের সারি সারি দোকান। উপর চত্বরে আম-কাঁঠালের বেশ কিছু গাছ। নিচের অংশ বাঁধানো, বসার জায়গা। মণ্ডপের সামনেই গর্ভগৃহের দ্বার, পশ্চিমে ভোগ দরজা। মন্দিরের-প্রাচীন বিগ্রহ বুড়ি-মা,—ত্রিপুরসুন্দরীর আদি ও মূল বিগ্রহ, আকারে খুব ছোট। সেটি পাশে স্থাপিত। সম্মুখে নবকলেবর বড় আকারের মূর্তি, দুটিই কষ্টিপাথরের। বস্ত্র-অলংকারে পুষ্পমাল্যে আচ্ছাদিত দুটি মূর্তিই। মধ্যে ভৈরব ত্রিপুরেশ্বরের দুটি ত্রিশূল। মন্দিরের পিছনে টিলা সিঁড়ি বেয়ে সমতলে নেমেছে কল্যাণসাগরের পাড়ে। এদিকেও মাঝে প্রশস্ত চত্বর পুজা-সামগ্রীর বিপণিতে পূর্ণ। বিশাল সরোবর কল্যাণ সাগর। ঘাটে দাঁড়ালে অসংখ্য বিশালাকার মাছ আর কচ্ছপের হুড়োহুড়ি দেখে শিশুর মতো উচ্ছল হয়ে ওঠে মন।

কপালে সিঁদুর তিলক রক্তাম্বর পরিহিত পুরোহিত। মন্দির চত্বরে বলিদানের হাড়িকাঠ, দেবীকে উৎসর্গের জন্য মানতকারী মানুষগুলি দলে দলে ছাগবৎস নিয়ে তার দিকে এগিয়ে চলা। এসব দেখে মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের প্রেমোপচারে পুজারতী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে, প্রেমপূর্ণা বালিকা অপর্ণাকে, আপনার বক্ষশোণিত উৎসর্গ করে রক্ত স্রোতের বিভীষিকা চিরতরে লোপ করতে চেয়েছিলেন যিনি দেবীর যথার্থ পূজক সেই জয়সিংহকে।

উদয়পুরে আর এক আকর্ষণ গোমতী তীরের শান্ত নির্জন অরণ্যের গভীরে বিগ্রহশূন্য ভুবনেশ্বরী মন্দির। নিউ টাউন রোড থেকে সেন্ট্রাল রোড, বদরসাহেব বাড়ি রোড হয়ে গোমতীর তীরে বদর সাহেবের বাড়ি ঘাট আড়াই-তিন কিলোমিটার। রিক্সায় মিনিট বারো। হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের দেবতা বদর সাহেব, ঘাটের উপরেই তাঁর মসজিদ। ঘাটের কিছু আগে পড়বে বামে একই চত্বরে তিনটি শিবমন্দির, যার স্থাপত্যরীতিতে মিশেছে মুঘল ঘরানার দুটি করে গম্বুজ,—একই ছাদের নিচে মণ্ডপ আর গর্ভগৃহের মাথায়, পিছনের গম্বুজ আকারে ও উচ্চতায় বড়। ঘাটে এসে পথ ঘুরে চলে গেছে উদয়পুর জেলখানার দিকে।

আমার সামনে সেই গোমতী, যার গর্ভে নাকি বিসর্জিতা দেবী ভুবনেশ্বরীর বিগ্রহ, যা আসলে বাৎসল্যরসধারায় প্রকৃত মনের জাগরণে মানুষ হয়ে ওঠা রঘুপতির মনুষ্যত্বহীনতার, হিংসা-ক্রোধ-অশুভ শক্তির দম্ভে উন্মত্ত পশু সত্তারই বিসর্জন। গোমতীর ধারায় সে-কাহিনী যেন ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। গোমতীর জলধারা সোনামুড়া হয়ে প্রবেশ করেছে কুমিল্লায়। অপর পাড়ে বামে সামান্য দূরে চোখে পড়ছে খুব উঁচু পাহাড়ী টিলা, বালি নুড়ি আর ঘন জঙ্গলে ভরা। ওরই শিখরে ভুবনেশ্বরীর শূন্যগর্ভ মন্দির।

গোমতীর বিস্তৃতি খুব বেশি নয়, কিন্তু তীব্র স্রোতের জন্য পার হতে সময় লাগল মিনিট পনের। অপর পাড়ে রাজনগর। দু-একটি সামান্য পসরার ছোট দোকান। দেওয়াল-মেঝে-দরজা ছাদ সবই বাঁশের। সেরকমই একটি ছোট কুঠুরীতে রাজনগরের অস্থায়ী ডাকঘর। পাড় ধরে নদীর গতিমুখে নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন সরু পথ ক্রমে নদীতীর ছেড়ে এগিয়ে গেছে দূরে কোন গ্রামের দিকে। আর নদী ও পথের মাঝে গড়ে উঠেছে বিরাট এক পাহাড়ী টিলা। গ্রামের পথ ছেড়ে সরু পথ বামে উঠে গেছে টিলার শিখরে। ডানদিকে টিলার মাঝামাঝি এক জীর্ণ কুটিরের সামনে কয়েকটি ছাগশিশুর সঙ্গে খেলায় মত্ত জীর্ণ মলিন বস্ত্রে এক দ্বাদশী বালিকা।

অপর্ণাই কি ! দু-পাশে ঝোপ-ঝাড় অরণ্য টিলার আর এক শিখর প্রান্তে জগন্নাথ মন্দির। এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। গাছ ও শিকড়ের জটাজালে আবদ্ধ জাহ্নবীর মতোই তার দশা। বৃক্ষচূড়ে বিশ্রম্ভালাপে রত পক্ষিদম্পতী। চড়াইপথ বামে বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সামনে। তার আগে গোবিন্দমাণিক্যের রাজপ্রসাদ, ঘন জঙ্গলে ঢাকা। মন্দিরের অদূরে অনেক নিচে গোমতীর কলস্রোত। এই উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়েই কি রঘুপতি গোমতীর জলে প্রতিমা নিক্ষেপ করে অন্তরকে হিংসামুক্ত ও শুচিস্নিগ্ধ করে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বালিকা অপর্ণার কাছে ? স্নেহ, প্রেম, করুণা, মমতার কাছে আত্মসমর্পিত হয়েছিল হিংসা আর রক্তের নেশা।

চারপাশের শান্ত নির্জন ধ্যান-গম্ভীর প্রকৃতি মনকে প্রশান্ত করে তোলে। মন্দিরের চারপাশ কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। গোটা চত্বরে অজস্র বেলগাছ। সামনে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট একটি আশ্রম—ভুবনেশ্বরী আশ্রম। বাঁশের দরমায় ঘেরা ছোট্ট একটি ঘর, একটি ছোট্ট দেবমন্দির, বাঁশের দরজার ভিতরে মৃন্ময়ী প্রতিমা। আশ্রমে কেউ থাকেন বোঝা যায়, এখন জনপ্রাণী কেউ নেই। সামনে একটি নলকূপ। নদীর ওপারেও মুখোমুখি অরণ্যসঙ্কুল উঁচু টিলা। মনে হয়—কলস্বিনী গোমতীর তীরে আশ্রমের এই ছোট্ট ঘরখানি দেখেই যেন কবি ব্যক্ত করেছিলেন—ধন নয়, মান নয়—ছোট্ট নদীতীরে একটুকু বাসার পরম আশার কথা।

মন্দিরের সামনে ডানদিকের কোণে পূর্ত দপ্তরের একটি নিয়মরক্ষা ফলক, যাতে উৎকীর্ণ রয়েছে দুটি মাত্র বাক্যে ক'টি সামান্য তথ্য :

"ভুবনেশ্বরী মন্দির (খ্রীষ্টাব্দ ১৬৬০)—মহারাজা গোবিন্দম[illegible] দ্বারা নির্মিত এই মন্দিরে একটি মণ্ডপ আছে, যাহার চারচালা ছাদের উপর একটি স্তূপের ন্যায় অংশ এবং খাঁজকাটা কারুকার্য আরোপিত হইয়াছে। মূল মন্দিরটির চারিপার্শ্বস্থ ইষ্টকনির্মিত প্রাকারের চতুষ্কোণায় গোলাকার আলম্বআছে এবং উহার উপরে একটি কলস আছে।" প্রাকারের ছিটেফোটাও অবশ্য বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। চারিটি সোপান। মন্দিরের গঠন বদর সাহেবের বাড়ি রোডে দেখা শিবমন্দিরগুলির গঠনেরই প্রায় অনুরূপ। তবে আকারে অনেক ছোট। নদীর ওপারে চোখে পড়ে লাল প্রাচীর ঘেরা উদয়পুর জেলখানা, উঁচু একটা টি.ভি. টাওয়ার। গর্ভগৃহের মধ্যে গল্প-গুজবে মত্ত ছিল স্থানীয় দুই কিশোর দিলীপ বরজ আর দেবব্রত ঢালি। উদয়পুর হাই-স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র দেবব্রত, আর সেখানেই এক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানে কাজ করে দিলীপ, তার ভাষায় 'ইঞ্জিনীয়ারিং-এর দোকান।' অতি উৎসাহের সঙ্গে ঘন ঝোপ জঙ্গল দু-হাতে সরিয়ে আমাদের নিয়ে চলল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখাতে। ওদের কথায় প্রাসাদ ছিল সাততল বিশিষ্ট, বর্তমানে দুটি মাত্র তল অবশিষ্ট। বনগাঁদা, বিছুটি, শ্যাওড়া, ভেরেণ্ডার দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভগ্নাবশেষ প্রাসাদটিকে গ্রাস করে রেখেছে। বোঝা যায় বিশাল জায়গা জুড়ে ছিল প্রাসাদের অবস্থান। দিলীপের অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখলাম দূরে টিলার নিচের জদীঘি, চারপাশের নিবিড় অরণ্যে ছায়াচ্ছন্ন, প্রায় অস্ফুটশরীর। প্রাসাদ দেওয়ালে ফাটলে ফাটলে বড় অশ্বত্থের মহা সমারোহ।

এই কি সেই মন্দির, যার অভ্যন্তরের জীবধাত্রী-দেবী ভুবনেশ্বরীর বিগ্রহ পশ্চাৎমুখী করে দিয়ে রক্তলোলুপ পুরোহিত বিমূঢ় জনগণকে বিভ্রান্ত করে বলেছিলেন—"ঠাকরুণ কোথায় ? ঠাকরুণ এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন।" ভুবনের ভারহীন ভীরু অসহায় মানুষগুলিকে ধিক্কৃত করে বলেছিলেন—"তোরা ঠাকরুণকে রাখতে পারলি কই ?···মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি।" আর ঋজুপথের সরল মানুষগুলি আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে কাতর ক্রন্দনে মথিত করে তুলেছিল রাজনগরের বাতাস। এই কি সেই মন্দিরসোপান, মন্দিরচত্বর,—যেখানে রক্তের ধারা উতরাই পথে স্রোত হয়ে নামত, মিশে যেত খরস্রোতা গোমতীর স্রোতে ? বাতাসে যেন ভেসে আসে রাজার মথিত হৃদয়ের প্রশ্ন—"এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে ?"

কেমন যেন একটা বিচিত্র অনুভূতি চেতনাকেও গ্রাস করে ফেলতে চায়।



অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

বড়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[অগ্রহায়ণ ১৩৯৫ সংখ্যার পর]

প্রতিপত্রে বুঝিতে পারিলেন যে, প্যারী আশ্চর্য দক্ষতার সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে; অশাসিত মহল শাসিত হইয়াছে। প্যারীমোহনকে ফিরিয়া আসিতে পত্র লিখিলেন, সে পত্রের উত্তর তাঁহার নিকট আসিল না: উত্তর ললিতাদেবীর নিকট আসিল। মর্ম এই যে, দাদাকে বুঝাইয়া আর দিন কতক তাহাকে জমিদারীতে রাখিতে হুকুম হয়। নিতান্ত আবশ্যক, গঙ্গায় একটি চর উঠিয়াছে। সেই চর লইয়া অপর এক জমিদারের সহিত বিবাদ বাধিতেছে, প্যারীমোহনের বাসনা—সে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে। কারণ, সে চর করগত হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। এ সকল কথা গোপীমোহনকে বলিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ, বিবাদের কথা শুনিলে গোপীমোহন স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, তাহাতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইবে। অবশ্য ললিতাদেবী কথা গোপন করেন নাই, চিঠিখানি স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া পরদিন গোপীমোহন, প্যারীমোহন যে তালুকে আছেন, তথায় রওনা হইলেন। আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত যত হউক আর না হউক, প্যারীমোহনের নিমিত্ত আকুল হইলেন, না জানি বালক কি ফ্যাসাদ বাধাইয়াছে। পত্র পঁহুছিতে যতদিন প্রায় ততদিনে তিনি স্বয়ং পোঁছিবেন, এই ভাবিয়া তিনি রওনা হইলেন। পঁহুছিয়া দেখেন, স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষ পক্ষে শতশত লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা চর দখল করিতে জমায়েত হইয়াছে। প্যারীমোহন ঘোড়াসওয়ার হইয়া হুকুম দিতেছে, "মার"! এবং স্বয়ং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগে ছুটিল, লাঠিয়ালেরা পশ্চাৎ ছুটিল। ঘোরতর দাঙ্গা হইতে লাগিল। বিপক্ষপক্ষ প্যারীমোহনের আক্রমণে হটিয়া গিয়া তাহাদের সীমানায় দাঁড়াইল। গোপীমোহন বলিলেন, "কি করিতেছিস"? অমনি প্যারীমোহন অশ্ব হইতে নামিয়া পূর্ববৎ জড় হইয়া গেল; ওদিকে বিপক্ষদলের আরও লোক জমায়েত হইল। তাহারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। লাঠিয়ালরা গোপীমোহনের মুখ চাহিয়া বলিল "হুজুর হুকুম দেন, ছাতু করিয়া দি"। হুজুর হুকুম দিলেন না। বিপক্ষদল আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্বপক্ষের লাঠিয়ালরা হুকুম না পাইয়া পৃষ্ঠ দিল। বিপক্ষ-দল হইতে একটি সড়কি আসিয়া গোপীমোহনের মাথায় বিঁধিয়া গেল। প্যারীমোহন চকিতের ন্যায়, দাদাকে অশ্বের উপর উঠাইয়া পলাইল। সড়কি বাহির হইল, কিন্তু রক্তমোক্ষণে গোপীমোহন অতিশয় কাহিল। প্যারীমোহন অতি সন্তর্পণে বাড়ি আনিলেন। আঘাত হেতু হইয়া গোপীমোহন পক্ষাঘাতপীড়ায় শয্যাগত হইলেন। এইরূপে ছয় মাস যায়। সংসার ক্রমে বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। কিশোরীমোহন ও রাধামোহন এখন সাবালক, একজন 'এল. এ' দুইবার ফেল ও আর একজন এণ্ট্রান্স দুইবার ফেল হইয়া পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছে। এখন গান বাদ্য শিক্ষা হয়। প্যারীমোহন ললিতা-দেবীকে বলিল, মেজদাদা সেজদাদা ঢের টাকা খরচ করিতেছে, আমি আর টাকা রাখিতে পারিব না। ললিতাদেবী বলিলেন, "কেন, চাইলেই তুই দিবি কেন? যদি তোরে কিছু বলে, তুই ওঁর নাম করবি, যে উনি মানা করেছেন।" প্যারীমোহন বলিল, "দাদাকেও মানবে না।"

প্যারীমোহন ঠিক বুঝিয়াছিল। গোপীমোহন শয্যাগত হইবার পর নানান ধরনের লোক মেজবাবু ও সেজবাবুর নিকট যাওয়া আসা করে। সময় নাই অসময় নাই, বাবুদিগের জুড়ী হুকুম হয়। এসকল কথা গোপীমোহনের কানে গিয়াছে। ভাইদের তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিয়াছে। বাবুস্বয় ইয়ার বক্‌সি লইয়া সর্বদাই বলেন যে, তাঁহার বড় দাদা বাল্যকালাবধি শাসন করিয়া ছোটটাকে পাগল করিয়াছেন এবং তাহাদেরও

খেতে পরতে না দিয়া পিঁজরায় পুরিয়া রাখিয়া একরকম উন্মুক বানাইয়াছেন। ইয়ার বক্সির উত্তর, "এরূপ বেরসিক ভাইও কারও দেখি নাই।" মোসাহেব কতক কতক কর্মচারীরাও পরামর্শ দেয় যে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই চিরকাল আছে; হুজুর সাবালক হয়েছেন, আপনার সম্পত্তি আপনি বুঝে লওয়া ভাল। এরূপ উপদেষ্টা ও শ্রোতা সংযোগে যেরূপ হয়, তাহাই হইতে লাগিল। যেরূপ কুৎসিৎ ধুমধাম্ হয় হইতে লাগিল। গোপীমোহন সমস্তই শুনিলেন, —চক্ষে জল পড়ে। ললিতাদেবী যতদূর চাপিয়া রাখিতে পারেন, রাখেন। একদিন শুনিলেন যে, পূজার দালানে একজন বেশ্যা মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে ও মুরগীর হাড়গোড় ছড়ান ছিল। ক্রোধে অধীর হইয়া গোপীমোহন ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকাইলেন। উভয়ে চক্ষু লাল করিয়া উপস্থিত হইল; খুব ব্যাজার ভাব। গোপীমোহন গাঙ্গাইয়া গাঙ্গাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহারাও উত্তর দিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া গোপীমোহন যেমন তর্জন করিয়া উঠিতে যান, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু পিতৃলোকে উপস্থিত হইল। পিতৃস্থান অপবিত্র হইয়াছে শুনিয়া বংশধর প্রাণত্যাগ করিলেন।

ললিতাদেবী তাঁহার নিজের সহোদরকে ডাকাইয়া পার্টিশন স্যুটের নালিশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উকিলকে বিশেষ উপদেশ—যেন পার্টিশনে পূজা-বাড়ি তাঁহার জিম্মায় থাকে বা প্যারীমোহনের অংশে পড়ে। একদিন প্যারীমোহন তাঁহাকে বলিলেন, "বউ দিদি, আমি আমার অংশ লইব না। আমি দাদাদের দিলাম। ললিতাদেবী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "মূর্খ, ওরা কি তোকে খেতে পরতে দেবে? দূর করে তাড়িয়ে দেবে।" প্যারীমোহন চুপ করিল। ললিতাদেবী বুঝিলেন আর বুঝাইতে পারিবেন না। তাহার পর মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "তোর অংশ থাকিলে, তোর পিতৃপুরুষের নাম থাকিবে। আমার জীবনস্বত্ব বই তো নয়। তোর থাকিলে ঠাকুর সেবা চলিবে। ওরা তো শালগ্রাম নুড়ি বলিয়া ফেলিয়া দেবে।"

প্যারী।—বউদিদি, তার যো নেই। বাবার উইলে পূজার খরচ দিতেই হবে। বড় দাদার উপর ঠাকুর সেবার ভার ছিল, এখন তোমার উপর হবে। পরে তুমি যাহাকে বলিয়া যাইবে, সে ভার সে পাইবে।

ললিতাদেবী জানিতেন, বুঝিলেন সত্যকথা। শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর চলিবে কিসে?"

প্যারী।—তাহার ভাবনা নেই।

ল।—কিসে?

প্যা।—তোমার মনে আছে? আমি একদিন শালগ্রামকে দেখিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ও নুড়িটে কি?" তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?"

ল।—না।

অনেক দিনের কথা সত্যই তাঁহার স্মরণ ছিল না।

প্যা।—তুমি বলিয়াছিলে,"ঠাকুর। ইনি সকলের কর্তা। ইনি সব করিতে পারেন ও সব করিতেছেন। এঁর হুকুম ভিন্ন গাছের পাতাটিও নড়ে না।" অন্য কেহ বলিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না। তুমি বলিলে, আমি অমনি দেখিতে পাইলাম, সত্যই ঠাকুর।

ল।—ঠাকুর তো তোকে আর হাতে করে এনে খেতে দেবে না।

প্যা।—দেবে।

ললিতাদেবী কণ্টকিতকলেবরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে জানিলি?"

প্যা।—আমায় পড়া শেখালে কে? আমায় কাজকর্ম শেখালে কে?

ল।—তোরে কি ঠাকুর শিখিয়েছে?

প্যা।—হ্যাঁ। আমি একদিন ঠাকুরকে চুপি চুপি বলিয়াছিলাম, "ঠাকুর আমি বড় বোকা; আমাকে মানুষ করে দেবে? এই দেখ, ঠাকুর আমাকে মানুষ করিয়াছেন। আমার যা যখন হয়, আমি ঠাকুরকে মনে মনে বলি, আর ঠাকুর সব বলে দেয়। ঠাকুর আমায় বলেছেন, আমায় খেতে দেবেন।"

ল।—তুই কি ঠাকুরকে বলেছিলি, "ঠাকুর, আমাকে খেতে দিও।"

প্যা—তা কেন বলবো। তোমায় কি কখন বলি যে, তুমি আমায় খেতে দিও, তুমি তো আপনি দাও। ঠাকুর আমাদের কুল-দেবতা; ঠাকুরই তো খেতে দিচ্চে।*

* উদ্বোধন, ১ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৮



গ্রন্থ পরিচয়

জ্ঞান-ভক্তি কথা

তারকনাথ ঘোষ

অপরোক্ষানুভূতি, শ্রীশ্রীরামগীতা, শ্রীশ্রীরাম-লীলাগীতিঃ রামপদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনাঃ অনিলহরি চট্টোপাধ্যায়। ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০ ০১২। মূল্যঃ পঁয়ত্রিশ টাকা।

আচার্য শঙ্কর-বিরচিত প্রথম গ্রন্থটিতে 'শ্রীমদ্ বিদ্যারণ্য মুনিকৃত টীকাবলম্বনে মর্মানুসারী ব্যাখ্যা' করা হয়েছে। বিদ্যারণ্য মুনির মূল টীকা সন্নিবিষ্ট হলে গ্রন্থটির আকর্ষণ ও মূল্য বর্ধিত হতো। সম্ভবতঃ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সে-প্রয়াস করা হয়নি। বর্তমান সম্পাদক মহাশয় পরবর্তী সংস্করণের মূল টীকা সংযোজনের কথা চিন্তা করতে পারেন।

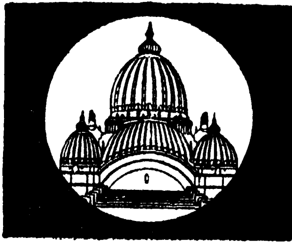
আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের আগে অনুবন্ধ চতুষ্টয় (গ্রন্থনাম, বিষয়বস্তু, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ) বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আত্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে আবরক অজ্ঞান, বিশেষতঃ অধ্যাসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কয়েকটি শ্লোকে আচার্য গৌড়পাদের মাণ্ডূক্য কারিকায় প্রতিপন্ন অজাতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। তত্ত্বব্যাখ্যানের তুলনায় সাধনোপায় বর্ণনায় আচার্য বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন, গ্রন্থকারও অনুরূপ পন্থা অনুসরণ করেছেন। কয়েকটি শ্লোকে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের শ্লোক বা শ্লোকাংশের ভাব (কোন কোন স্থলে মূল শ্লোকাংশ) সন্নিবেশ করা হয়েছে, বিশেষতঃ পঞ্চদশাঙ্গ রাজযোগের বর্ণনা ও তদনুসারী সাধনামূলক শ্লোকগুলি (১০২-১৪২) তেজোবিন্দু উপনিষদের মন্ত্রের অনুরূপ বা রূপান্তর। আচার্য পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগকে হঠযোগ বলে উল্লেখ করেছেন (১৪৩)।

প্রকাশনার সুবিধার জন্য, 'অপরোক্ষানুভূতির' সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামগীতা' ও 'শ্রীশ্রীরামলীলাগীতি' একত্র গ্রথিত হয়েছে।—ব্যাসপ্রণীত অধ্যাত্মরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় রামগীতা। অজ্ঞানরূপ অপারবারিধি পার হওয়ার জন্য লক্ষ্মণ রামের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেছেন; রামের সেই উপদেশ রামগীতা এবং সে উপদেশ বেদান্তনির্ভর। বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়াযোগে শুদ্ধচিত্ত সাধক সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবেন, উদ্দেশ্য—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অবরোধ। বাসনামূল কর্মদ্বারা অজ্ঞান দূর হয় না, তা চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হয় মাত্র। জ্ঞানকেই চরম মর্যাদা দেওয়া হলেও উর্জিতা ভক্তির (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে যার উল্লেখ আছে) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (৫৮ শ্লোক)।—এই গ্রন্থে মহীধরকৃত টীকা সংযোজন করে সরলার্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

'শ্রীশ্রীরামলীলাগীতি' গ্রন্থকারের স্বকীয় রচনা অনুষ্টুপ ছন্দে দশোত্তরশতশ্লোকী রামায়ণ-'রামনাম সংকীর্তন'-এর ভঙ্গীতে বন্দনাযোগে রামায়ণী কথা। স্বভাবতই ভক্তিনির্ভর এই গ্রন্থটির রচনাভঙ্গী সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী। প্রখ্যাত সুপণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সরল পদ্যে শ্লোক-গুলির বঙ্গানুবাদ করেছেন।

গ্রন্থদুটির মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়—অশুদ্ধি বিরল। তবে প্রায়ই সমাসবদ্ধ পদকে, কোথাও কোথাও সন্ধিযুক্ত শব্দগুচ্ছকেও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে—বিশেষতঃ সংস্কৃত রচনায় এটি গুরুতর ত্রুটি। রামগীতার দ্বিতীয় শ্লোকে রাজা 'নৃগ'কে ভ্রমক্রমেই 'নৃপ' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিদ্যানুরাগী সুধীসমাজে গ্রন্থদুটি সমাদৃত হবে আশা করা যায়।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

গত ১৭-২০ অক্টোবর বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিদিন প্রতিমা দর্শনের জন্য প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ২০ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি শাখা-কেন্দ্রেও যথারীতি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বামীজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব

পুনে রামকৃষ্ণ মঠে গত ১২-১৪ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী-উৎসব পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী তপস্যানন্দজী মহারাজ।

রাজকোট আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর তৃতীয় পর্যায়ে ৩—১৩ অক্টোবর গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করেছিল।

মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোমে জন্মবার্ষিকীর অঙ্গ হিসাবে ১০—২৩ অক্টোবর জনসভার আয়োজন করেছিল।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে গত ২৬-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ঢেঙ্কানল জেলার অথমল্লিক মহেন্দ্র হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে জাতীয় সংহতি শিবির পরিচালনা করে। এটি ছিল ভুবনেশ্বর মিশনের পরিচালনায় পঞ্চম শিবির। উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলার প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি এই শিবিরে যোগদান করে।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ ঃ গত অক্টোবর মাসে মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৩১৫০ টি ধুতি, ১৩৬০ টি শাড়ি, ১১৫০টি চাদর, ৩৮৬৬টি বয়স্কদের পোশাক, ১৯৯০টি শিশুদের পোশাক, ১৩৭টি বিছানার চাদর এবং ৪২৮৯টি পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই ত্রাণ-শিবির বন্ধ করা হয়েছে।

আসাম বন্যাত্রাণ ঃ ধুবড়িতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৪৮০টি পশমী কম্বল, ৬১৯টি শাড়ি, ৮১০টি ধুতি, ৪২৭টি বিভিন্ন রকম বস্ত্র, ১২৯টি বাসনপত্র, ২১১৫টি পুরনো পোশাক, ২৪টিন বিস্কুট বিতরণ করা হয়েছে।

দিল্লী বন্যাত্রাণ ঃ দিল্লীর ট্রান্স-যমুনা কলোনী অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শিশুখাদ্য, বিস্কুট ও ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। দিল্লী আশ্রমের মাধ্যমে সেখানে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত একটি স্বাস্থ্যশিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। এই শিবিরে বন্যার ফলে অসুস্থ ২৮০৬ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ ঃ অক্টোবর মাসে ঢাকা, বরিশাল, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, বালিয়াটি ও হবিগঞ্জ জেলার বন্যা-কবলিত অঞ্চলে ৪০,৫৯২টি শাড়ি, ৩৭,৫৭৫টি লুঙ্গি, ১৭,৯১৪টি ধুতি, ২৬,৮৪৯টি পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ২৪০ কিলোঃ কলাই ও ৫১৩ কিলোঃ চিঁড়া বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ময়মনসিংহ জেলায় ৯০০০ কিলোঃ আটা, ৯০০০ কিলোঃ চিনি, ৯০০০ কিলোঃ কলাই, ১১৯২.৫ কিলোঃ সব্জির বীজ বিতরণ করা হয় এবং ৯ হাজার পরিবারের শিশু ও মা-কে ৩৬ হাজার 'ওরাল স্যালাইন' দেওয়া হয়।

পরিদর্শন

গত ৫ অক্টোবর মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী পি. এ. সাংমা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী এস. পি. সোয়ার এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে চেরাপুঞ্জী আশ্রম পরিদর্শন করেন। সেখানে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী খেলা-ধুলার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

গত ১৮ অক্টোবর ত্রিপুরার রাজ্যপাল জেনারেল কে.ভি. কৃষ্ণ রাও আগরতলা আশ্রম পরিদর্শন করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী জ্যেষ্ঠানন্দ (জয়কৃষ্ণ) গত ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছ-টায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। বছর ছয়পূর্বে পক্ষাঘাতে তাঁর শরীরের বাঁদিক অসাড় হয়ে যায়। তিনি ছিলেন স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বারাণসী সেবাশ্রমেরই কর্মী ছিলেন। সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী মৈত্রেয়ানন্দ (হীরালাল) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২ অক্টোবর রাত্রি ৮-০৫ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর। তিনি মূত্রনালীর অসুখে ভুগছিলেন। এজন্য তাঁকে দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে চিকিৎসার জন্য সেবাপ্রতিষ্ঠানে আনা হয়েছিল।

স্বামী মৈত্রেয়ানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অধুনা বাংলাদেশস্থ বরিশাল আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তাঁর যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে দেওঘর, বেলুড় মঠ, বৃন্দাবন, কনখল ও রাঁচি স্যানেটোরিয়াম-এর কর্মী ছিলেন। সহজ সরল ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

স্বামী পুণ্যাত্মানন্দ (প্রসাদ) গত ১৮ অক্টোবর দুপুর ১২-১৫ মিঃ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কনখল সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী পুণ্যাত্মানন্দ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি কনখল, নরেন্দ্রপুর, চণ্ডিগড় ও রায়পুর কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি অবসর নিয়ে কনখল আশ্রমে বাস করছিলেন। কঠোর তপস্বী-জীবনের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

বহির্ভারত

প্রভিডেন্স বেদান্ত সোসাইটি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র): গত ২ অক্টোবর এই বেদান্ত সোসাইটির হীরকজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এ-বছর এই সোসাইটির ষাট বছর পূর্ণ হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় এক জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমেরিকা'। সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মিস্টার ইটালো এল. পেলিনি, যিনি এই সোসাইটির শুরু থেকে এর কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত, সোসাইটির ষাট বছরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার: গত নভেম্বরে প্রতি রবিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া স্বামী আদীশ্বরানন্দ প্রতি শুক্রবার পাতঞ্জল যোগসূত্র এবং প্রতি মঙ্গলবার গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ-এর উপর ক্লাস নিচ্ছেন।

গত ১৪ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী আর. প্রেমদাস কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শন করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গত ১৮ অক্টোবর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে বিশেষ পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচহাজার ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর কালীকীর্তন পরিবেশিত হয়। গত ৮ নভেম্বর রাত্রিতে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২০ অক্টোবরও ২২ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাবতিথিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী কমলেশানন্দ। ৯ অক্টোবর 'সারদানন্দ হল'-এ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ স্বামী নির্জরানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী সত্যব্রতানন্দ যথারীতি ধর্মালোচনা করছেন।



বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মব[illegible]র্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সেমিনার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৮—৩০ সেপ্টেম্বর তিনদিন ব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর জনাকীর্ণ দ্বারভাঙ্গা হলে সেমিনারের উদ্বোধন করে আচার্য রাজ্যপাল অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান ঐতিহাসিকের দৃষ্টি-কোণ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। স্বামীজী ছিলেন সেই প্রতিবাদীদের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের মানুষ। তিনি বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে সাংস্কৃতিক ও মানসিক দিক থেকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন।" উদ্বোধন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাস্করানন্দ রায় চৌধুরী, ভাষণ দেন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ভারতী রায়, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী যুক্তানন্দ এবং অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)। ধন্যবাদ দেন সহ-উপাচার্য (অর্থ) দিলীপকুমার সিংহ। দ্বারভাঙ্গা হলে এদিন বিপুল সংখ্যক শ্রোতৃসমাগম হয়েছিল। পরে ভিড় এত বেশি হয়ে যায় যে হলের দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কোন বক্তৃতা বা আলোচনা সভায় এ-ধরনের ঘটনা বিরল।

সেমিনারের দ্বিতীয় দিন (২৯ সেপ্টেম্বর) আলোচনা হয়েছিল বালীগঞ্জ সায়েন্স কলেজে। আলোচনার বিষয় ছিল : স্বামী বিবেকানন্দের [illegible] সভা পরিচালনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। ভাষণ দেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু, স্বামী প্রভানন্দ, অধ্যাপক সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুপ্রকাশ সান্যাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ-চর্চার উপর বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্যসচিব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩০ সেপ্টেম্বর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় দিনের আলোচনাচক্র পরিচালনা করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালযের উপাচার্য নিমাইসাধন বসু। এদিন আলোচনার বিষয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রভাবনা। ভাষণ দেন অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক হোসেনুর রহমান এবং অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মূল আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব খুবই উপভোগ্য হয়।

সরকারীভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের উপর আলোচনা-চক্রের আয়োজন করলেন। উপস্থিত সকলে মন্তব্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এর-তুল্য উচ্চমানের সভা ইদানীংকালে অনুষ্ঠিত হয়নি।

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা : গত ২৩ আগস্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, সাধুসেবা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির পর প্রধান অতিথি স্বামী স্মরণানন্দ 'স্বামীজীর কর্মধারা' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তিনি 'স্বামীজীর মতে আত্মবিশ্বাসই

সকল উন্নতির সোপান' বিষয়ে বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পারিতোষিকও বিতরণ করেন। স্বামী নির্জরানন্দ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

গত ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো দিবস পালন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মস্থানন্দ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন।

২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ধর ভাষণ দেন।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, বানীয়া ফুলটুকারি (দঃ ২৪ পরগনা) গত ৩০ আশ্বিন থেকে ৩ কার্তিক পর্যন্ত সমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার প্রতিদিনই ভক্তগণকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম বদরপুর (অসম) গত দুর্গা পূজা উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেছে। এই আশ্রমের পক্ষ থেকে অসমে বন্যাত্রাণের জন্য কিছু অর্থও গুয়াহাটি রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠানো হয়েছে।

রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষ্ণনগর, নদীয়াঃ গত ৭ ও ১২ অক্টোবর এই আশ্রমে দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৭ অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ এবং বিকালে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ দিনের অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেন স্বামী অনাময়ানন্দ এবং স্বামী প্রভাকরানন্দ। ১২ অক্টোবর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্ধ্যায় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দের পরিচালনায় 'সঙ্গীতে কথামৃত' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়েছে।

পরলোকে

প্রাক্তন বিপ্লবী, প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ গৌরহরি ভট্টাচার্য গত ২৬ আশ্বিন ১৩৯৫, পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর।

অতি কিশোর বয়সেই তিনি বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর (রাখাল মহারাজ) সান্নিধ্যে আসেন এবং বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে তিনি যুগান্তর দলের সঙ্গে যোগদান করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর শ্রদ্ধেয় রাখাল মহারাজের অনুপ্রেরণায় স্বামীজীর আদর্শে সংগঠনমূলক সমাজ সেবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। পরে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সতের বছর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পান। এবং ব্রহ্মচারী হিসাবে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। কিন্তু পিতামাতার আবেদনে শ্রীশ্রীমা গৌরহরিকে সংসারে ফিরে যেতে বলেন ও পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী ডাক্তারি পড়ে আর্তপীড়িতদের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। সে অনুসারে তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের অনেকেরই সান্নিধ্য লাভ করেন। ডাক্তারি পড়ার সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে কিশোর ও যুবকদের সংগঠিত করে তাদের চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষা দিয়ে 'মানুষ তৈরী' করার উদ্দেশ্যে 'আদর্শ ছাত্র সমাজ', 'আদর্শ ভ্রাতৃ সমাজ', 'আদর্শ কর্মী সমাজ' 'সম্বুদ্ধ ভারত' ও 'সন্তান সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার কলিকাতা জেলার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং 'অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তিনি আজীবন দুঃস্থ ব্যক্তিদের সেবা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত গৃহী সন্তানদের সংখ্যা আরও ক্ষীণ হয়ে গেল।

বেলুড় মঠের দীক্ষিতা ও উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহিকা পুষ্পদেবী মুখোপাধ্যায় গত ২২ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪-২৫ মিঃ তাঁর রানাঘাটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন।



বিজ্ঞান সংবাদ

ভারতবর্ষে এইড্‌স রোগী কতজন

সারা পৃথিবীতে এখন এইড্‌স (AIDS) রোগ নিয়ে তোলপাড় চলছে। গত শ্রাবণ সংখ্যায় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এই অসুখের উপর প্রবন্ধ বার হয়েছে। ভারতবর্ষে যে এই রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা সকলেরই জানা। অন্যসব জীবাণু (Bacteria) বা জীবপরমাণু (Virus) আক্রমণের মতো এইড্‌স ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই সকলে এইড্‌স রোগী হয় না। অনেকের মধ্যে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং তারা রোগাক্রান্ত হয় না, যদিও তাদের রক্ত পরীক্ষা করে বলা যায় যে, অতীতে এই ভাইরাস তাদের শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল। অর্থাৎ রক্তে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা ধরা পড়লেই তাকে 'রোগী' বলা যাবে না, রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তবে তাকে রোগী বলা যাবে। ভারতবর্ষে কতজন এইড্‌স রোগী পাওয়া গেছে, এই নিয়ে সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এদেশে এইড্‌স রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার ভার ন্যস্ত হয়েছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (I. C. M. R— আই. সি. এম. আর)-এর উপর। সম্প্রতি এই কাউন্সিল প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে: জুন, ১৯৮৮ পর্যন্ত কাউন্সিলের বিভিন্ন রেফারেন্স সেন্টারগুলি ২২ জন এইড্‌স রোগী পেয়েছে; এদের মধ্যে আছেন ১৫ জন ভারতীয় এবং ৭জন বিদেশী। যতদূর জানা গেছে ভারতীয়দের মধ্যে ১১ জনের দেহে এই ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিদেশে; একজনের এদেশে জীবাণু-আক্রান্ত রক্তদানের ফলে রোগ হয়েছে, আর একজন মহিলা ভাইরাস পেয়েছেন তাঁর বিদেশে-আক্রান্ত স্বামীর কাছ হতে। দুজন বারবিলাসিনীর—একজন বম্বেতে ও একজন পণ্ডিচেরিতে এই রোগে মৃত্যু হয়েছে। সব রোগীদেরই জ্বর, ওজন হ্রাস ও বারে বারে সুবিধা-বাদী জীবাণু (opportunistic infection, অর্থাৎ যেসব জীবাণুর অন্য লোককে আক্রমণের ক্ষমতা নাই কিন্তু প্রতিরোধবিহীন লোককে আক্রমণ করতে পারে) দ্বারা আক্রমণ হয়েছিল। সাতজন স্নায়ুশিরার অথবা মানসিক অসুখে ভুগেছিলেন, একজন বিদেশী 'ক্যাপোসি সারকোমা' নামক ক্যান্সার হয়েছিল। রোগের লক্ষণ ধরে চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও দুজন বিদেশী ও ১৪ জন ভারতীয় এদেশেই মারা গেছেন। অন্য বিদেশীরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের দেশে ফিরে গেছেন। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী মধ্য আফ্রিকায় উচ্ছৃংখল জীবন-যাপনের পরে ভারতে এসে রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর সুবিধাবাদী-জীবাণুর আক্রমণের চিকিৎসা চলছে, এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে তিনিই একমাত্র এইড্‌স রোগী।

['HIV Infection in India', I. C. M. R, June 1988]

শ্বাস-প্রশ্বাসের বৈদ্যুতিক উদ্দীপক

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মিলে সোভিয়েত রাশিয়ায় সারা ইউনিয়ন বৈদ্যুত-বলবিদ্যা ইনস্টিটিউট নির্দিষ্ট হারে ও বিস্তারে মধ্যচ্ছদার (ডায়াফ্রাম) শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বিদ্যুতের সাহায্যে উদ্দীপিত করার নতুন ডিজাইন করা একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে; যন্ত্রটির নিয়মিত উৎপাদনও শুরু হয়েছে। সরাসরি মধ্যচ্ছদায় বা অক্ষত ত্বকের মাধ্যমে বিশেষ ইলেকট্রোড বসিয়ে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়। নানা কারণে সৃষ্ট তীব্রতা স্থায়ী ধরনের শ্বাসকষ্ট নিবারণ বা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্রসমূহে বা বাড়িতে যন্ত্রটি ব্যবহার করা যায়, যেমন, আঘাত বা শল্যচিকিৎসাজনিত শ্বাসকষ্ট নিউমোনিয়া, হাঁপানি বা শ্বাসযন্ত্রের অন্য কোন গোলযোগের ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটি ফলপ্রদ।

[সোভিয়েত সমীক্ষা, ২৩তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃঃ ২৫]